সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

———::০::———

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

——:০:——

কলিকাতা,

২।১, রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৭[illegible], বলরাম দের ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

আ

ই

খ

গ

চ

জ

দ

ম

য

র

হ

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

কলিকাতা,

২।১, রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৭[illegible], বলরাম দের ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

আ

ই

খ

গ

চ

জ

দ

ম

য

র

হ

দোলনচাঁপা

১

হে চিরসুন্দর হরি! উন্মীলি' নয়ন
বন্দি' তব রাতুল চরণ,
মালঞ্চে পশিনু যবে আনন্দে মগন,
হেরিলাম সকলই মোহন!
যে দিকে ফিরাই আঁখি,—অমিয়ার ধারা,
রত্নের বেদীর মাঝে শোভার ফোয়ারা!

২

কুন্তলে মোহন চাঁপা, সিঁথিতে রঙ্গন,
মুচকিয়া হাসে ঊষা রাণী;
পাণিতলে ফুটন্ত গোলাপ অতুলন,
আহা! রাঙ্গা চরণ দুখানি
পূজিতে শিউলি আর কামিনী ঝরিছে,
কি সৌরভ! যেন ধূপ গুগ্‌গুল জ্বলিছে!

৩

হেরিলাম এক ধারে হাসিছে ডালিয়া,
সোহাগিনী বিলাতী কুসুম;
প্রজাপতি-পাথা সম চারু সর্ব্বজয়া!
গৌরীপ্রেমে আনন্দে নিঝুম
হাসে শত রক্তজবা,—মৃদুল সৌরভ,
শোভা পায় ক্র্যান্‌শিস্‌সিরা উদ্যানগৌরব!

৪

নারী মাঝে রম্ভা যেন ফুটিছে চামেলী,
নিজ গন্ধে নিজেই আকুল!
প্রগল্‌ভা ঝুমকা হাসে করি' রঙ্গকেলি,
ঊষা যেন পরিয়াছে দুল!
সারা রাত্রি যামিনীরে প্রদানি' আসব
নিশিগন্ধা ক্লান্তা এবে, তবু কি বৈভব!

৫

নব দুর্ব্বাদল পরি' ল্যাভেণ্ডার চাঁপা
প্রৌঢ়া সম অবাধে হাসিছে!
তীব্র গন্ধে অলিবৃন্দ আলাভোলা, খ্যাপা,
গুঞ্জরিয়া আনন্দে বসিছে
ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপাত্রে; হরির চরণে
ভক্ত-ভৃঙ্গ লিপ্ত যথা ক্ষিপ্ত গুঞ্জরণে!

৬

মোহিনী অপরাজিতা হাসিছে সুহাসি,
চারিধারে নীলিমা প্রকাশি';
রূপ-গরিমায় ভোর ফুল রাশি রাশি
ঢলে পড়ে লাবণ্য বিকাশি'!
এক পাশে তুই শুধু,—গন্ধ অতি মৃদু,
রে দোলন চাঁপা! কেন লুকাস ও মধু?

৭

শুভ্র বাস, শুভ্র দেহ, ও রূপের তুল
কোথা পাব আহরি' উপমা?
বঙ্গ-গৃহে যেন বাল-বিধবা অতুল
তপস্বিনী দেবী নিরুপমা!
চাঁপা হাসি, ফল্গু যেন নয়নের কোণে
বহে যায় দিবানিশি গোপনে গোপনে!

৮

নিশাশেষে তুই যেন পাণ্ডুর চন্দ্রমা,
সীতা যেন অশোকের বনে!
গোবিন্দ-বিরহ-ব্রত পালে যেন রমা,
মহাদুখে বারুণী-ভবনে!
ম্লানপ্রদীপের জ্যোতি সমাধি উপরে
তুই ফুল! হেরি তোরে অশ্রুবারি ঝরে!

৯

আঁধারে মাণিক তুই, যেন অলকায়
বিরহিণী যক্ষবিমোহিনী,
গৌরীশৃঙ্গে তুই যেন মগ্ন উপস্থায়,
উমারাণী হিমাদ্রি-নন্দিনী!
ক্ষীণ আশা-জ্যোতি সম ঘোর নিরাশায়
রে দোলনচাঁপা! তোর ও মূরতি ভায়!

১০

ঘোর কলুষিত চিত্তে অনুতাপ আসি'
হয় যথা ঈষৎ উদয়,
শ্মশানবৈরাগ্য যেন—মুহূর্ত্তেক হাসি'
ভক্তি যথা হৃদি উজলয়,
সীতারে বিসর্জ্জি' যেন সোনার প্রতিমা,
শেষ রাত্রে মিটি মিটি দেয়ালি-গরিমা!

১১

নিকষে কনকরেখা বহুল নিশায়
যেন ম্লান তারকার ভাতি!
চিরবিরহিণী নাথে পাইয়া নিদ্রায়
আনন্দে পোহায় যথা রাতি;
সারা দিন হো হো করি' কাটায়ে জীবন,
দিনান্তে মুহূর্ত্তকাল হরি-সঙ্কীর্ত্তন!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা।

ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান ও অতি সাধারণ অভিযোগ—তাঁহার রচনা অশ্লীল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই অভিযোগের বিষয় আলোচিত হইবে।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ অত্যন্ত সম্প্রতি ও অনাবশ্যক কঠোরতার সহিত আনয়ন করিয়াছেন।—"যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ স্ফুরিত কদম্ব ও দাড়িম্ব দর্শনে কুভাবনায় কণ্টকিত হইয়া রাত্রিজাগরণ করিতে লাগিলেন। * * * * এই সময় দ্বিজ ভারতচন্দ্র, স্বীয় প্রভু—'সদাজ্যোৎস্নাময় দুই পক্ষ' সেবী নৃপনন্দনের জন্য কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন।" এ স্থলে ভারতচন্দ্র যে অশ্লীলতার প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া শিষ্যসংগ্রহে ব্যস্ত হয়েন নাই, পরন্তু তিনিই সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত, সে কথা পরে বুঝাইব। কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক মহাশয় পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্যের পরই যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে উভয় মন্তব্যের সমন্বয় করিতে কষ্ট পাইতে হয়। "কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম খাঁ গায়েনের ওস্তাদি গানের মূর্চ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের পুরাণপাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব বিকীরণ করিতে লাগিল, তাহা

এই রাজনৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।” যিনি বলিয়াছেন,“অন্নদামঙ্গলরূপ ধর্ম্মমণ্ডপে তিনি (ভারতচন্দ্র) বাই-নাচ দেখাইয়াছেন ;” আবার, “বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্ন-পতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত ; কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের ছাঁচে ঢালা সুন্দর মার্জ্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনত্ব পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা সোনার মূল্যে বিকাইয়াছে,” তিনি হীন আদর্শে রচিত, কুরুচি-কলুষিত, অসার কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য এই সকল কামোদ্দীপক বটিকায় মধুর ভাব পাইয়াছেন! তিনি এই সকল নিন্দিত কবিতাকে “রাজনৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মৃদু হাস্য করিতে” দেখিয়াছেন! নৈতিক জীবনের ভগ্নপতাকাতলে সমবেত সমাজস্থ ব্যতীত অপরের নিকট এইরূপ বোধ হইবার কারণ কি ?

যাহা হউক, অশ্লীলতার অভিযোগে “বিদ্যাসুন্দর”ই ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অশ্লীলতার অভি-যোগের আলোচনা করিবার জন্য আমরা স্বতন্ত্রভাবে “বিদ্যাসুন্দরে”র আলো-চনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

“বিদ্যাসুন্দরে”র গল্পাংশ সংক্ষিপ্ত ও সামান্য।—পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে বীরসিংহ নামধারী নৃপতি ছিলেন।

“বিদ্যা নামে তা'র কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।”

বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, যে তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিবে, “পতি হবে সেই সে তাহার।” অনেক রাজপুত্র আসিলেন ; কেহই বিচারে জয়ী হইতে পারিলেন না। কাঞ্চীর রাজপুত্র সুন্দরের অনন্যসাধারণ রূপগুণের কথা শুনিয়া বীরসিংহ তাঁহার নিকট ভাট প্রেরণ করিলেন।

ভাটের নিকট সকল কথা শুনিয়া “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন”—স্থির করিয়া, বিদ্যালাভ জন্য সুন্দর বর্দ্ধমানে যাত্রা করিলেন।

সুন্দর মনোরম বর্দ্ধমানে উপনীত হইলেন। বিদ্যাশিক্ষার্থীর বেশে সুন্দর পুরে প্রবেশ করিলেন। পুরমধ্যে সরোবর দেখিয়া রাজপুত্র সরোবরকূলে “আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে”। পুরনারীরা সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিল ; তাহারা সুন্দরকে দেখিয়া মুগ্ধা হইল। যখন “সূর্য্য যায় অস্ত-

গিরি আইসে যামিনী", সেই সময় মালিনী সেই স্থানে উপনীতা হইল। "কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম"। সে নিজপরিচয়ে বলিল,—

"বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।
ভালবাসে রাজারাণী সদা আসি যাই॥"

হীরার নিকট রাজবাড়ীর সকল সংবাদ পাওয়া যাইবে বুঝিয়া ও কার্য্যসিদ্ধির আশায়, সুন্দর তাহাকে মাসী বলিয়া তাহার গৃহে বাসা লইলেন। সে অর্থ সম্বন্ধে সুন্দরকে যথাসম্ভব প্রতারিত করিল। শেষে তাঁহার পরিচয় পাইয়া সে বলিল, -

"বাপধন বাছা রে বালাই যাক্ দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর॥
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে॥

হীরার নিকট সুন্দর রাজবাড়ীর সংবাদ লইলেন। শেষে এক দিন তিনি স্বয়ং মালা রচনা করিলেন। তিনি পুষ্পময় রতিমদন রচনা করিয়া কৌটা মধ্যে এমনই কৌশলে মদনের হস্তে ধনুর্ব্বাণ রক্ষা করিলেন যে, কৌটার আবরণমোচনকালে শর মোচনকারীর বক্ষে আসিয়া পতিত হইবে। সুন্দর একটি শ্লোকে নিজ পরিচয় লিখিয়া দিলেন।

এ কার্য্য সময়সাপেক্ষ। সুতরাং সে দিন ফুল লইয়া যাইতে মালিনীর বিলম্ব হইল। বিদ্যা বড় অসন্তুষ্টা হইলেন। কিন্তু এই অভিনব উপহারে তাঁহার অসন্তোষ রবিকরে স্বচ্ছ কুজ্ঝটিকার মত অপসৃত হইয়া গেল। বিদ্যা মালিনীর নিকট সুন্দরের পরিচয় জানিয়া ভাবিলেন, পূর্ব্বে যে সকল রাজপুত্র আসিয়াছিল, —

"সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই, তারা দাস অবিদ্যার॥
জিনিবেক যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥"

বিদ্যাও প্রতিদানে পুষ্পপ্রতিমা প্রেরণ করিলেন,—চিত্রকাব্যে সংস্কৃত শ্লোকে নিজনাম লিখিয়া দিলেন।

পূজায় প্রীতা হইয়া ইষ্টদেবী সুন্দরের সহিত বিদ্যার মিলনে সম্মতি জানা-

লেন। মালিনী সুন্দরকে রথের পার্শ্বে আনিল। বিদ্যা সুন্দরকে ও সুন্দর বিদ্যাকে দেখিলেন,—"শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে"। (১) কিন্তু কি উপায়ে উভয়ের মিলন হইবে? বিদ্যা দৈবকৃপায় নির্ভর করিলেন। "রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন", সেই জন্য "শূন্য হৈতে নারায়ণ" তাঁহাকে হরণ করিয়াছিলেন। এ দিকে সুন্দরও দেবীর পূজা আরম্ভ করিলেন। দেবী—

"সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া॥
তাম্র পত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁদকাটি দিলা ফেলাইয়া॥"

দেবীর কৃপায় "মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ"। সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিরহতাপতপ্তা, বাঞ্ছিতমিলনপ্রয়াসিনী, অধীরা বিদ্যার মন্দিরে উপনীত হইলেন; সহসা যেন "ভূমিতে চাঁদ উদয়"। সসখীগণ বিদ্যা বিস্ময়-বিহ্বলা,—"হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল রাজহংস দেখি হয়"।

উভয়ে সাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। বিদ্যা বিচারে পরাজিতা হইলেন। গান্ধর্ব্ববিবাহ নিষ্পন্ন হইল। বিরহে উভয়েরই "পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান।" এ দিকে সুন্দর সন্ন্যাসিবেশে রাজসভায় যাইয়া বিদ্যার সহিত বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা বিপদ গণিলেন। যদি বিদ্যা বিচারে পরাজিতা হয়েন, তবে ত কন্যাকে এই সন্ন্যাসীর করে অর্পণ করিতেই হইবে! হায়! "গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।" সন্ন্যাসী বলিলেন, -এখন আর ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না; কারণ, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" রাজা "আজি নহে কালি" বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সুন্দরও এই কথা লইয়া বিদ্যাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু "লোকে বলে পাপ কায ক' দিন লুকায়?" বিদ্যার কলঙ্ককথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রাণী যথেষ্ট আক্ষেপ করিলেন; শেষে সতী হিন্দু গৃহিণীরই মত কন্যাকে বলিলেন,—এ কলঙ্কে কলঙ্কিতা হইবার পূর্ব্বে "না মিলিল দড়ী না মিলিল কড়ি কলসী কিনিতে তোরে?" বিদ্যা যত মিথ্যায় সত্যগোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, রাণীর ক্রোধ ততই ঘৃতাহুতিপুষ্ট পাবকের মত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর রাণী শয়নমন্দিরে যথায় রাজা বৈকালিক নিদ্রাসুখভোগ

(১) পাঠক মার্লোর কথা স্মরণ করিবেন।—'Whoever loved that loved not at first sight?'

করিতেছিলেন, তথায় উপনীতা হইলেন। রাণীর অতিকঠোর শাণিত বিদ্রূপে ও তিরস্কারে রাজার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। কর্ত্তব্যাহেলনদোষে দোষী কোটালকে "জান বাচ্চা এক খাদে" প্রোথিত করিবার আদেশ হইল। কোটাল অপরাধী ধৃত করিবার জন্য সাত দিন সময় লইল।

কোটাল বিদ্যার মন্দিরে সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইল। কিন্তু কে সাহস করিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিবে? অপরাধী নিশ্চয়ই নাগ। কোটালের বড়ই বিপদ,—

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥"

কোটাল ও তাহার সহচরগণ নারীবেশে সেই কক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুন্দর সুড়ঙ্গপথে উপনীত হইলেন; তিনি বিদ্যার চিন্তায় এমনই তন্ময় যে, চতুরের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। এ দিকে কোটাল দেখিল,

"চক্ষুর নিমিষ আছে দেহে আছে ছায়া।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া॥"

তখন তাহারা সুন্দরকে ধরিল।

কোটাল ও তাহার সহকারীরা সুড়ঙ্গপথে মালিনীর গৃহে উপনীত হইল। নিগৃহীতা মালিনী আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু "যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ, ইহা কব কার কাছে।"

এ দিকে সুন্দর ধরা পড়িয়াছেন শুনিয়া বিদ্যা ধরাতলশায়িনী হইলেন। রাণী সৌধচূড়া হইতে অপরাধীর মুখ দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন; কাহার এমন সুন্দর পুত্র? হায়!

"কি কহিব বিদ্যার কপাল পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥"

পুরনারীরা কোটালের হস্তে সুন্দরের নিগ্রহ দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল;—"হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার?"

সুন্দর রাজসভায় নীত হইলেন। রাজা সুন্দরকে দেখিয়া ভাবিলেন,— "কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব?"

মালিনী বলিল,—

"সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয়॥"

রাজা সুন্দরকে বলিলেন, তোমার সত্য পরিচয় দান কর, তোমাকে "কাটিতে বাসনা নাহি ঠেকেছি মায়ায়।" সুন্দর পরিচয় দিলেন,—

"বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ   বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান॥

*   *   *   *   *   *

আমি বিদ্যার লাগিয়া   আমি বিদ্যার লাগিয়া
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া॥"

আমি বিচারে বিদ্যাকে জয় করিয়াছি ত্যাগ করিব না। রাজা ক্রোধে আদেশ দিলেন,—"নাহি দিল পরিচয় কাট রে কোটাল"; কিন্তু ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন, সহসা আদেশ পালিত না হয়,—অপরাধী ভয়ে শ্মশানে আত্ম-পরিচয় দিতে পারে।

এই সময় সুন্দরের পালিত, মালিনীগৃহ হইতে সভায় আনীত শুক, সুন্দরের পরিচয়দান করিল। মালিনীও সেই পরিচয় দিয়াছিল। গঙ্গা ভাট কাঞ্চীপুরে গিয়াছিল; তাহাকে আনিবার আদেশ হইল।

এ দিকে মশানে সুন্দর কালীস্তুতি করিলেন। দেবী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া সুন্দরকে অভয় দিলেন। তখন—

"কোটালে সৈন্যের সনে   বান্ধিলেক জনে জনে
ডাকিনী-যোগিনী-ভূতগণ।"

ভাট সুন্দরকে কাঞ্চীপুরের রাজকুমার বলিয়া চিনিল। রাজা স্বয়ং মশানে গমন করিলেন। সেই স্থানে সুন্দরের অনুগ্রহে বীরসিংহ দেবীদর্শন করিলেন। রাজা সুন্দরকে—

"সিংহাসনে বসাইয়া   বসনভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।"

যথাকালে বিদ্যা পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র লইয়া বিদ্যাসুন্দর কাঞ্চীপুরে গমন করিলেন।

বিদ্যা ও সুন্দর কালীর দাসদাসী,—"শাপেতে ভূতলে আসি" দেবীর পূজার প্রচার করিলেন। শেষে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া উভয়ে "আনন্দে দেবীর সঙ্গে স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে।"

খৃষ্ট-ধর্ম্ম-যাজক ওয়েঙ্গার বলেন, এই অখ্যানবস্তু নাটকোপযোগী। ইটালীয়ান গীতিনাট্যের সহিত ইহার সাদৃশ্যও আছে। (২)

কোনও বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন,—"বিদ্যাসুন্দর আদিরসপ্রধান। ইহার কয়েক স্থলে কতকগুলি অশ্লীল বর্ণনা আছে, তাহা অবশ্য এখনকার বিজ্ঞদিগের রুচিতে নিন্দনীয় হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিয়া ধরিলে ইহার অপর সমুদয় অংশ আগাগোড়া মধুর ও মনোহর।" (৩) পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ সমালোচকও এই ভাবে বলিয়াছেন,—অপক্ষপাত হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভাষার মাধুর্য্যে ও বর্ণনার ঐশ্বর্য্যে এই 'রোমান্টিক' গল্পের রচনা প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহার গতি কুনীতিমূলক,—এবং বাঙ্গালী মহিলা পাঠিকাদিগের পক্ষে ইহার পাঠ অনিষ্টকর। (৪) আর এক জন সমালোচক, "বিদ্যাসুন্দরে"র মেরুদণ্ড ধর্ম্ম, ইহা স্বীকার করিয়াও, "বিদ্যাসুন্দর"কে "অশ্লীলতার চারুশিল্প" বলিয়াছেন। (৫)

সুখের বিষয়, "বিদ্যাসুন্দর" যে কেবল অশ্লীলতার প্রচারকল্পে অশ্লীল পাঠের পাঠ্যপুস্তকরূপে রচিত নাও হইতে পারে, এরূপ মতের পোষকও বিদ্যমান। আমরা এক জন লেখকের মত উদ্ধৃত করিলাম;—"বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানটী রূপক বলিয়া মনে হয়। বর্দ্ধমান-রাজ-সরকারের উপর জাতক্রোধ হইয়া তিনি (ভারতচন্দ্র) বিদ্যাকে বর্দ্ধমানরাজদুহিতা সাজাইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিদ্যা জ্ঞানরূপা প্রকৃতির অন্য রূপ। তৎকালে নবদ্বীপে প্রগাঢ় বিদ্যানুশীলন হইত, এবং দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে বিদ্যোৎসাহী যুবকবৃন্দ নদীয়ায় ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার জন্য আগমন করিত। ন্যায়শাস্ত্ররূপ বিদ্যার কূটতর্কের মীমাংসা শাস্ত্রাধ্যায়ী সুন্দর-রূপ যুবকের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। সুন্দর বিদ্যালাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সুদূর কাঞ্চীপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে তাহাই সুন্দরের মশানরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মালিনীর সাহায্য ব্যতীত সুন্দরের বিদ্যালাভ যেরূপ অসম্ভব ছিল, অধ্যাপকের নির্দ্দেশ ব্যতীত

---

(২) The Calcutta Review, vol. XIII., 1850.

(৩) রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

(৪) The Calcutta Review, vol. XIII., 1850.

(৫) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শাস্ত্রজ্ঞানলাভ তদ্রূপ দুঃসাধ্য। বিদ্যালাভপ্রত্যাশায় সুন্দরের মালা গাঁথা ও মালিনীর নিগ্রহ, বিদ্যাধ্যায়ীর অসীম অধ্যবসায় ও উপদেষ্টাগণের প্রভাব-খর্ব্বের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বিদ্যানুশীলন জন্য জ্ঞানার্থীর অনুরাগ যুবকের যুবতীপ্রেমাকাঙ্ক্ষার অনুরূপে সূচিত হইয়াছে।" (৬) বর্ত্তমান ক্ষেত্রে লেখক বিদ্যাকে "জ্ঞানরূপা প্রকৃতির অন্যরূপ" মাত্র বলিবার পর "বিদ্যাসুন্দরে"র প্রকৃত অর্থ হইতে দূরে গমন করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে রূপকের অর্থ শেষ পর্য্যন্ত স্থির রাখিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছে,—ব্যাখ্যাও স্থানে স্থানে অসংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয়, ভারতচন্দ্র "বিদ্যানুশীলন জন্য বিদ্যার্থীর অনুরাগ" বর্ণনার নামে "যুবকের যুবতীপ্রেমাকাঙ্ক্ষা"র নিকৃষ্টতম আদর্শের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন; যাহা কবিতার কাম্য কাননে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহাকে তিনি কাব্যকুসুমসুশোভিত করিয়াছেন। ইহাতে, তাঁহার উদ্দেশ্যের গুরুত্বে, তাঁহার কৃত কর্ম্ম দোষমুক্ত হয় না।

যদি মনে করা যায়, ইংরাজকবি টেনিসন যেমন শিক্ষিতা মহিলাদিগের পুরুষের সমকক্ষতাভিলাষের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবর্ষণ করিতে "প্রিন্সেস্" কাব্য রচনা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত ব্যবধান কেহ দূর করিতে পারে না, ভারতচন্দ্রও তেমনই "বিদ্যাসুন্দরে" বুঝাইয়াছেন,—"গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়",—নারীহৃদয়ের প্রেমতৃষ্ণা বিদ্যায় তৃপ্ত হয় না; তাহা হইলেও, ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাবশ্যক অশ্লীলতার অভিযোগের খণ্ডন হয় না।

বিস্ময়ের বিষয়, ভারতচন্দ্রের ভক্ত সমালোচক ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, "ভারতের প্রায় কোন রচনাই অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরের মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণবিষয়ক ধুয়াগুলি যে কেন লিখিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না—সেগুলি আমাদের রুচিতে অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইল।" (৭) এই ধুয়াগুলিতেই "বিদ্যাসুন্দরে"র প্রকৃত অর্থ স্বপ্রকাশ।

"বিদ্যাসুন্দর" গোবিন্দগীত। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। অনুবাদক রূপকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণরূপে কবি পার্থিব ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সহিত মানবাত্মার

(৬) বিশ্বকোষ,—ত্রয়োদশ ভাগ।

(৭) বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

সম্বন্ধ বুঝাইয়াছেন। কৃষ্ণ একাধারে মানব ও দেবতা। প্রথমে তিনি গোপীরূপে বর্ণিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখে আকৃষ্ট—মায়াময় জগতের আনন্দে ব্যাপৃত। রাধা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য। রাধা স্বীয় অসামান্য সৌন্দর্য্যে ও চরিত্র-মাধুর্য্যে কৃষ্ণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাকে ভ্রমমুক্ত করেন। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যসুখ হইতে কৃষ্ণের মুক্তি ও গোপীর সহিত তাঁহার মিলনের স্বর্গীয় সুখ—মানব-প্রেমের পরিণতি-রূপে বর্ণিত। সে বর্ণনা এমন সমুজ্জ্বল যে, তাহার যথাযথ অনুবাদ করা অসম্ভব। (৮)

বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জন ঐতিহাসিক, এই মত সম্ভব বলিয়া, গোপীগণ যে পঞ্চেন্দ্রিয়মাত্র, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য, "গীতগোবিন্দে"র প্রথম সর্গের ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৯) আমরা এই কয়টি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম,—

পীবর যৌবনভরে অবনতকলেবরে
কোন গোপনারী করে কৃষ্ণে আলিঙ্গন ;
অনুরাগ ফুল্ল প্রাণ, পঞ্চমে তুলিয়া তান—
গাহিছে মধুরগান মোহিয়া শ্রবণ।
বিলোল কটাক্ষশোভা আঁখিযুগে মনোলোভা,
ধরিছে দ্বিগুণ বিভা হরির আনন ;
কোন বা গোপের বালা হৃদয়ে প্রণয়জ্বালা,
তন্ময় ধেয়ায় কালা—মুখ বিমোহন।
কোন নারী কুতূহলে— যেন সে কি কথা বলে—
কপোল পরশে ছলে অধরে মোহন ;
হেরি হরিমুখ 'পরে পরশ পুলকভরে
তৃষিত অধরে করে সরস চুম্বন।
শিরীষকোমল দেহ প্রবেশিতে চাহে কেহ
নদীকূলে কুঞ্জগেহ—বেতসে গঠন ;
প্রণয়ে অধীরা নারী বিলম্ব সহিতে নারি'
হরির দুকূল ধরি' করে আকর্ষণ।

(৮) Edwin Arnold.

(৯) R. C. Dutt—Literature of Bengal.

বিপিনে গোপিনী রাজে, পুলকিত বনমাঝে
হরির বাঁশরী বাজে শ্রুতিবিনোদন;
কেহ নাচে হরিসঙ্গে করতালি দিয়া রঙ্গে
মিশে বাঁশী-স্বর-সঙ্গে বলয়শিঞ্জন।

বিদেশীয় সমালোচকদিগের মধ্যে এক জন বলেন, এই গ্রন্থ যে রূপক, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই;—ইহা কৃষ্ণপ্রেমার্থিনী রাধার কথা। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাকে ঈশ্বরের জন্য আত্মার ব্যাকুলতার রূপক বলেন। (১০) আর এক জন ইহাতে সন্দেহমাত্র করেন না। তিনি বলেন, প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হইলেও, এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, "গীতগোবিন্দ" কবির ইচ্ছাকৃত রূপক। (১১)

রাধাকৃষ্ণের রূপকের প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুবাদক করিতে পারিয়াছেন কি না, আত্মায় ও পরমাত্মায় মিলনের প্রকৃত অর্থ কি, এ সকল তর্ক আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের পক্ষে অনাবশ্যক। "গীতগোবিন্দ" যে রূপক, ইহা বিদেশীয় সমালোচকগণও যে স্বীকার করিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহাই প্রদর্শিত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

বৈষ্ণবমতানুবর্ত্তিগণের বিভাগানুসারে ভক্তি পঞ্চ ভাবের। প্রথম ভাব, যোগীন্দ্রগণোপভুক্ত শান্তি। দ্বিতীয় ভাব, দাস্য; ইহা অপেক্ষাকৃত সক্রিয়। তৃতীয় ভাব, ভীমার্জ্জুনাদি কৃষ্ণের পরিচিতগণের উপযুক্ত সখ্য। চতুর্থ ভাব, বাৎসল্য; ইহাতে দেবতাকে অপত্যস্নেহ দান করা হয়। পঞ্চম ভাব, মাধুর্য্য; গোপীগণের তন্ময় কৃষ্ণপ্রেম ইহারই বিকাশ। (১২) বিজাতীয় সমালোচকদিগের বিশ্বাস, বৈষ্ণবমত প্রথমতঃ সর্ব্ববিধকুসংস্কারমুক্ত ছিল। সেরূপ বিশুদ্ধ মত সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে না। যখন শৈবমত অজ্ঞজনগণের ভীতিতে প্রতিষ্ঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বৈষ্ণবমতের প্রচারকগণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতে কুসংস্কার মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সর্ব্বজনগ্রহণোপযোগী করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বৈষ্ণবমত সৌন্দর্য্যাত্মক হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবমত সর্ব্বজন-

---

(১০) Frazer—Literary History of India. ইনি রূপকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিয়া ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার ও সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবের পরিচয় দিয়াছেন।—লেখক।

(১১) Waber—History of Indian Literature.

(১২) Wilson—Religious Sects of Hindus.

গ্রাহ্য হইয়া উঠিলে, সমাজের সর্ব্বস্তরের সর্ব্বপ্রকার লোক এই মতের বিশাল বক্ষে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। কুসংস্কারে কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবমত ও প্রেমসাধনার মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা অতিক্রান্ত হইল। এ দিকে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, নৃপগণসেবিত ধর্ম্মে ও ধর্ম্মমতে বিলাস ও আতিশয্য প্রবেশ করে। নৃপতিবৃন্দসেবিত হইয়া বৈষ্ণব মতেরও সেই দশা হইল। মন্দিরে নর্ত্তকীর লাস্যলীলা দেবার্চ্চনার অঙ্গ হইয়া উঠিল। (১৩)

ধর্ম্মমতসম্বন্ধীয় কুটিল তর্কের জটিলজালে জড়িত হইয়া বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে যাইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান বিষয়ের পক্ষে সে তর্ক যেমন অনাবশ্যক, সে তর্কের মীমাংসা করিতে আমাদের অনিচ্ছা ও অক্ষমতাও তেমনই অধিক। বহুজনসেবিত ধর্ম্মমতমাত্রই শ্রদ্ধেয়। বৈষ্ণবমত সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ মতপ্রকাশ করিব না; শিল্পে ও সাহিত্যে তাহার বাহ্যিক বিকাশ-প্রদর্শনই আমাদের বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দুশিল্পের শেষ বিরাট কীর্ত্তি সকল সংগঠিত। শিল্পের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, ৯০০ খৃঃ হইতে ১৩০০ খৃঃ পর্য্যন্ত চারি শতাব্দীতে ভারতে ও য়ুরোপে নৃপতিগণের বিশেষ যত্নে স্থপতি-শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছিল। যাহাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ইণ্ডো-জার্ম্যানিক জাতি বলেন, সে জাতির স্থপতিশিল্প এই চারি শতাব্দীতে উন্নতি ও সম্পূর্ণতা-লাভ করে। এই সময়মধ্যেই গথিক ও হিন্দুশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট কীর্ত্তি সকল রচিত। আবার য়ুরোপে ও ভারতে এই সময়ে স্থপতিশিল্প রাজপ্রাসাদে আপনাকে বিকশিত করে নাই—ধর্ম্মমন্দির সুশোভিত করিয়াছে। তবে ভারতে শিল্প প্রাচ্য দেশের স্বাভাবিক নিয়মে সত্বর সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, গথিক শিল্পের অবনতির সূচনামাত্র হইবার পূর্ণ এক শতাব্দীকাল পূর্ব্বে, অবনতির অতলে পতিত হইতে আরম্ভ হয়।

এই সময়ের মধ্যে উড়িষ্যায় বহু বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হয়। ডাক্তার হণ্টার বলেন, বিষ্ণুমন্দিরে যে সকল অশ্লীল চিত্র ক্ষোদিত, শিবমন্দিরে সে সকলের স্থান নাই। মন্দিরচূড়ায় চক্র দেখিলে যেমন বিষ্ণুমন্দির ও ত্রিশূল দেখিলে শিবমন্দির বুঝিতে বিলম্ব হয় না, মন্দিরে অশ্লীল ভাস্করকার্য্য দেখিলে তেমনই বিষ্ণুমন্দির ও তাহার অভাব দেখিলে শিবমন্দির স্থির করা যায়। সুখের

(১৩) Wilson ও Hunter.

বিষয়, শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ও অশিক্ষিত জনগণ, হয় এই সকল ভাস্কর-কার্য্যের নিন্দা করেন, নয় ত এই সকলকে আধ্যাত্মিক রহস্য বলিয়া মনে করেন। এই সকল ভাস্কর-কার্য্যে যাত্রিদলের মনে কোন প্রভাব সংস্থাপিত হয় না। (১৪) জগন্নাথের জন্মোৎসবে মন্দিরাভ্যন্তরে যে অভিনয় হয়, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। তাহার কথাতেও এই ইতিহাসকার স্পষ্ট বলিয়াছেন,—বৈষ্ণব মতের এই সকল অঙ্গকে বিচারকের ভাবানুসারে, হয় একান্ত অশ্লীল, নয় ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রহস্য বলিতে হয়। (১৫)

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্দিরে এইরূপ ভাস্কর-কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দির চারি অংশে বিভক্ত; যথা, (১) ভোগ-মন্দির, (২) নাটমন্দির, (৩) মোহন, (৪) দেউল। (১৬) এই সকল অশ্লীল চিত্র প্রধানতঃ দেউলে ও মোহনে ক্ষোদিত। রাজেন্দ্রলাল মনে করেন, এই সকল ভাস্কর-কার্য্য যে অশ্লীল রুচির অশ্লীল বিকাশমাত্র নহে, ইহাই তাহার প্রধান প্রমাণ। সকল ধর্ম্মেই দুর্নীতি নিন্দিত। দুর্নীতি যে দেব-মন্দিরে অশ্লীল চিত্রে আত্মবিকাশ করিয়াছে,—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দুর্নীতির এইরূপ আত্মবিকাশে ধর্ম্মশাস্ত্রের ও পুরোহিতগণের সম্মতিদান অসম্ভব। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনার জন্য এ সকল চিত্র ক্ষোদিত হয় নাই। এই সকল চিত্র কোন ধর্ম্মভাবের নিদর্শনমাত্র। (১৭) সে রহস্য বহুশতাব্দীর কুজ্ঝটিকায় ও সর্ব্ববিধ পবিত্র স্মৃতির ও সংস্কারের আবরণে আবৃত। সে কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিবার শক্তি আমাদিগের নাই, সে আবরণ মুক্ত করিবার যোগ্যতার অভাব আমরা অবশ্যই অনুভব করিয়া থাকি—না করিয়া পারি না।

জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" নব্য রুচিতে "অশ্লীল"। কিন্তু তাহা বৈষ্ণব-দিগের আদরের বস্তু। কথিত আছে, দেবতা স্বয়ং কবিকে এই পুস্তক-রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং পুস্তক সমাপ্ত হইলে তাহা তাঁহার ভক্তের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। "গীতগোবিন্দে"র যশের কথা শুনিয়া

(১৪) Hunter—Orissa. কিন্তু শিবমন্দিরেও এইরূপ ভাস্করকার্য্য বিদ্যমান।—লেখক।

(১৫) Hunter—Orissa.

(১৬) এই চারি অংশ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।—লেখক।

(১৭) Rajendra Lala Mittra—Orissa.

উড়িষ্যার রাজা স্বয়ং আর একখানি গীতগোবিন্দ রচনা করেন। রাজ-আদেশে পুরোহিতগণ জয়দেবের রচিত পুস্তকের সহিত রাজার রচিত পুস্তক মন্দিরমধ্যে সংস্থাপিত করিলে, জগন্নাথ স্বয়ং রত্নবেদী হইতে অবতরণ করিয়া রাজার পুস্তক মন্দির হইতে দূরে প্রক্ষেপ করেন, এবং জয়দেবের পুস্তক সাদরে হৃদয়ে সংস্থাপিত করেন। (১৮)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈষ্ণব শিল্পে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে নব্যরুচির অননুমোদিত "অশ্লীলতা" স্বপ্রকাশ। এ অবস্থায় ইহাকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রহস্য ব্যতীত অন্য কিছু মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থও এই রহস্য-সম্বন্ধীয়। যাঁহাদের তাহাতে সন্দেহ আছে, তাঁহারা জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" মিলাইয়া পাঠ করিবেন;—সন্দেহের আর কারণ থাকিবে না।

কাযেই "বিদ্যাসুন্দরে" কবির বিরুদ্ধে দোষারোপ অন্যায়। সমালোচকের "উহা অশ্লীল বা অসৎকাব্য" (১৯) এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি যে স্থানে বলিয়াছেন,—"যদি কোন স্থানে কবির কাব্যের সহিত তন্ময়ত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে তাহা অশ্লীল স্থানে", (২০) সে স্থানে তিনি নিন্দা করিতে যাইয়া ভারতচন্দ্রের প্রশংসাই করিয়াছেন।

"বিদ্যাসুন্দর" হইতে ইহার প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক কয়টি স্থান নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথমসর্গে "গড়বর্ণনে"—সুন্দরের কথা—

"বেণী বিননিয়া চূড়া চিকণিয়া হেলয়ে মলয়বায়॥
মৃদু মৃদু হাসি বাজাইছে বাঁশী কোকিল বিকল তায়॥"

সুন্দরের পুরপ্রবেশান্তে "পুরবর্ণনে"—

"ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধরতনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু,
পীতধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে॥"

"সুন্দরের মালিনীসাক্ষাতে"—

---

(১৮) Hunter—Orissa.

(১৯) নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়—"ভারতচন্দ্র"—সাহিত্য, ১২৯৯।

(২০) নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়—"ভারতচন্দ্র"—সাহিত্য, ১২৯৯।

"এ কি অপরূপ রূপ তরুতলে।

* * * *

মোহন চিকণ কালা নানা ফুলে বনমালা

কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে॥

* * * *

ভারত দেখিয়া যারে ধৈরয ধরিতে নারে

রমণী কি তায় যায় মুনি মন টলে॥"

"মালিনীর বেসাতির হিসাবে"—

"পসারি গোপের নারী বসিয়াছে সারি সারি

রসের পশরা পীতনাটে॥

* * * *

মুন্‌শীব রাধা তায় তুমি মোহ পাও যায়

ভারত কি করে সেই ঠাটে॥"

"বিদ্যার রূপবর্ণনে" বিদ্যা "কুঞ্জবিলাসিনী" উক্ত হইয়াছেন।

"বিদ্যাসুন্দরের দর্শনে"—

"কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল।

* * * *

তেয়াগিয়া লোক লাজ কুলের মাথায় বাজ

ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল॥

রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে

চিত না ধৈরয ধরে পিক কল কল॥

দেখিব সে শ্যাম রায় বিকাইব রাঙ্গা পায়

ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল॥"

বিদ্যাসুন্দরের মিলন-বর্ণনায় কবি "রাধাকৃষ্ণে রাস হাসপরিহাস" বলিয়াছেন।

সুন্দরের সহিত বিদ্যার মিলনের কথা যখন প্রকাশিত হইল, তখনকার কথায় কবি বলিয়াছেন,—

"যায় যাক জাতি কুল, কে চাহে তাহার মূল,

ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥"

"কোটালের চোর অনুসন্ধানে"—

"এ বড় চতুর চোর।
গোকুলে নন্দকিশোর॥"

"কোটালগণের স্ত্রীবেশে"—

"চল সবে চোর ধরি গিয়া।

*   *   *   *   *

সে বটে বসনচোরা, তাহারে ধরিয়া মোরা,
পীত ধড়া লইব কাড়িয়া॥"

"নারীগণের পতিনিন্দায়"—

"বাঁধা আছি কুল ফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যাম চাঁদে দিবসে আঁধার॥
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর॥ (২১)
শ্যাম অখিলের পতি—"

এই স্থানেই কবি বিদ্যার কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছেন। "শ্যাম অখিলের পতি"; তাঁহার প্রেমে কলঙ্ক কোথায়?

ইহার পর "রাজসভায় চোর আনয়নে"—

"কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যাম রায়॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দগুণ গায়॥"

বীরসিংহ সুন্দরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দান করিয়া তাঁহার কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই কবি বলিয়াছেন,—

"ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রু ভাবে মিত্র পদ পায়॥"

"চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসায়"—

"লোকে মোরে বলে মিছা চোর"

*   *   *   *

দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর আমারে বলে কঠোর॥
সবে করে পাপ ভুঞ্জিবারে তাপ মোর পদে দেয় ডোর॥"

---

(২১) বৈষ্ণব কবিগণ ননদিনীর প্রতি কখনই সদয় নহেন।—লেখক।

"রাজার নিকট চোরের শ্লোক পাঠে"—

"মোর পরাণ পুতলি রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায় নাহি মানে কোন বাধা॥
রাধা সে আমার আমি সে রাধার আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান রাধা সে মনের সাধা॥"

এই তন্ময়তার পরিচয় নানাস্থানে আছে। ভাট মুখে বিদ্যার কথা শুনিয়া সুন্দরের—

"বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।"

তখন সুন্দর বিদ্যাকে দেখেন নাই। সুতরাং এই ব্যাকুলতা কলুষিত-কামনা-প্রসূত এমন মনে করিবার কারণ কোথায়? জন্মান্তরে বিশ্বাস বা বিদেশীয় আত্মার দ্বিভাগ (dichotomy) মত পোষণ না করিলে ইহার সহজ মীমাংসা হয় না। সমালোচকগণ ইহা বিবেচনা করেন নাই।

বিদ্যাও সুন্দরকে দর্শনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে মন প্রাণ অর্পন করিয়াছিলেন। অন্যান্য রাজকুমারগণের সহিত সুন্দরের তুলনা করিয়া তিনি বলিলেন,—

"বিদ্যাপতি এই,তারা দাস অবিদ্যার।" "অবিদ্যা" হিন্দুদর্শনে অপরিচিত নহে।

সুন্দরবিরহে বিদ্যার "পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান।" সুন্দরও বিদ্যাকে বলিয়াছেন,—

"এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল॥"

আবার বিদ্যাই তাঁহার "তপ যপ যাত যাগ ধন ধ্যান ভজন।"

"সুন্দর সমাগমের পরামর্শে "হীরা যখন সুন্দরকে গোপনে আনিবার পক্ষে বহু বিঘ্নে বিপদের সম্ভাবনার কথা বলিল, তখন বিদ্যা সে সকল বিঘ্ন অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিলেন। বিপদের কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। উপায় অবশ্যই হইবে। সুন্দরের পক্ষে কি অসম্ভব? কৃষ্ণ কিরূপে রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন?—

"বেষ্টিত ভূপতি জাল বর আইল শিশুপাল
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্টি ছিল।

রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন শূন্য হৈতে নারায়ণ
হরিলেন তেঁই সে হইল ॥
তেমনি আমার মন তাঁহে চাহে অনুক্ষণ
ভয় করি বাপ ভাই মায় ।
রুক্মিণীর মত করি হরি হয়ে লউন হরি
এই নিবেদন তাঁর পায় ॥”

গ্রন্থমধ্যে আরও প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু আর উদ্ধৃত করা সঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা এই সকল স্পষ্ট প্রমাণেও “বিদ্যাসুন্দর”কে গোবিন্দগীত বলিতে সম্মত হইবেন না, তাঁহাদিগের মত পরিবর্ত্তন একরূপ অসম্ভব।

শেষ কথা, সুন্দর রাজপুত্র, “বড় রূপগুণযুত”, বিদ্যাকে বিচারে জয় করিবার মত বিদ্যাশালী, বীরসিংহ তাঁহাকে আনিতে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজসভায় আসিয়া বিদ্যালাভের চেষ্টা করিতে পারিতেন। তিনি তাহা করেন নাই। বহু প্রহরীর সতর্কদৃষ্টি তাঁহার গমনাগমন লক্ষ্য করিতে পারে নাই। সে গমনাগমন—বিদ্যাসুন্দরের মিলন অতিপ্রাকৃত। পিতার অজস্র চেষ্টাও গৌতমবুদ্ধের হৃদয়ে মুক্তিকামনার বীজপতন নিবারিত করিতে পারে নাই। তেমনই অতি নীরস হৃদয়েও প্রেম প্রভাব সংস্থাপন করে। আর এক জন বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,—

“প্রেম কি যাচ্‌লে মিলে, খুঁজলে মিলে ?
সে আপনি উদয় হয়—শুভযোগ পেলে।”

এই আধ্যাত্মিক মিলন লোকচক্ষুর অন্তরালেই নিষ্পন্ন হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বা বিদ্যাসুন্দরের প্রেম আধ্যাত্মিক মনে না করিলে, লোকলজ্জা, কুলভয় প্রভৃতির অনায়াসে অতিক্রম অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই মিলন সময়-সাধ্য—সাধনা কালসাপেক্ষ। কালের অধিষ্ঠাত্রীর সহায়তা ব্যতীত সাধনার সিদ্ধি হয় না। কালী কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিল, সুতরাং “বিদ্যাসুন্দর” সম্বন্ধীয় আলোচনা এই স্থানেই শেষ করিলাম। বিস্ময়ের বিষয়, যাঁহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির কবিতার অবৈধ প্রেমের কীর্ত্তনে মুগ্ধ, তাঁহারা ভারতচন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কর্ম্ম।

আমি সুখ-দুঃখ-মূল—আমিই জীবন,
আমার অভাব মৃত্যু—মৃত্যু নাহি আর ;
বিশ্বের বৈচিত্র্য আমি নূতন নূতন
সূত্ররূপে গাঁথি নিত্য সৌন্দর্য্যের হার।
মোর ঘাত-প্রতিঘাতে বিচিত্র পরশে
এ বিশ্ব-বীণায় উঠে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,
কভু তীব্র হলাহলে—কভু সুধারসে
দগ্ধ করি স্নিগ্ধ করি নিখিল সংসার !
চির-উপেক্ষিত হীন ভিখারীর ভালে
পরাই অম্লানজ্যোতি মহিমা-মুকুট,
ধনগর্ব্বদৃপ্ত জনে ঢাকি ধূলিজালে
ভরিয়া গৌরবভস্মে তার করপুট।
অন্তরের তৃষ্ণা ত্যজি' যে পূজে আমারে,
অনন্ত সম্পদ আমি দান করি তারে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

যুদ্ধ ও সন্ধি।

১

বিনোদচন্দ্র সরমাসুন্দরীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনযাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ অগ্রজ অতুলচন্দ্র সস্ত্রীক পৈত্রিক ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতুলচন্দ্রের স্ত্রী সুবালা বড় বৌ। বিনোদচন্দ্রের স্ত্রী সরমা মেজ বৌ। ঈশ্বরের কৃপায় বিনোদচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল, এবং সেই কৃপা ঘনীভূত হইয়া উত্তরোত্তর বিনোদের সুখবৃদ্ধি করিতেছিল। বিনোদের পুত্র অধর এইবার এণ্ট্রেন্স পাশ করিবে।

অতুলচন্দ্রের উপর ঈশ্বরের কৃপা কন্যারূপে বর্ষিত হইয়াছিল। অতুলচন্দ্রের গতিক দেখিয়া ভয় হইয়াছিল যে, এবংবিধ কৃপাবারি-বর্ষণ স্থগিত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইবে। গগনে মেঘের পুনঃসঞ্চার দেখিয়া অতুলচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন যে, পৈত্রিক-ভদ্রাসন সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইয়া প্রথম কন্যার বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবেন।

অতুলচন্দ্র উত্তর-পশ্চিমে একটা ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতেন। বিনোদচন্দ্র গুড়ের ব্যবসায় করিতেন।

বড় বৌ কখন মেজ বৌকে দেখেন নাই। সরমা অতি সমাদরে বড়বৌ ঠাকুরাণীর অভ্যর্থনা করিল। বড় বৌ অতি সাবধানে তাহা গ্রহণ করিয়া মেজ বৌকে বাধিত করিলেন। অতুলচন্দ্র বিনোদের গুড়ের ব্যবসায়ের উন্নতির উপর লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন, এবং বিনোদচন্দ্র অগ্রজের ক্ষীণ শরীর লক্ষ্য করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিল।

বিনোদচন্দ্রের পুত্র অধর সকলকে যথাবিহিত প্রণামপুরঃসর আপ্যায়িত করিয়া সেবায় নিযুক্ত হইল। অতুলচন্দ্রের কন্যা পুঁটী পিতৃব্যের গুড়ের কারখানা দেখিবার নিমিত্ত বহির্ব্বাটীতে গেল।

একটু অবসর পাইলে বিনোদ রন্ধনশালায় পত্নীর নিকট গিয়া বলিল, "দাদা কেন আসিয়াছেন, জান?"

সরমা একটু হাসিয়া বলিল, "পৈত্রিক ভদ্রাসন বিভাগ করিতে।" বিনোদ ভাবিল, "সরমা কি বুদ্ধিমতী"!

সরমা ভাবিল, "বিনোদ কি বোকা!"

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর উভয় পক্ষ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

২

পরদিন প্রভাতে অতুলচন্দ্র তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কামরায় সহধর্ম্মিণী সুবালার সহিত পরামর্শ নামক মানবধর্ম্মে রত হইলেন।

সেই সুন্দর ভদ্রাসন, বড় বড় কামরা, সুসজ্জিত শয্যা, বৃহৎ উদ্যান, বিস্তীর্ণ জলাশয়, গরুবাছুরের পাল, সুবালা সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহার মধ্যে কতটা পৈত্রিক সম্পত্তি, এবং কতটা বিনোদের নিজের সঞ্চিত, তাহা অতুলচন্দ্র জ্ঞাত ছিলেন না। বহুবৎসর পূর্ব্বে পিতার মৃত্যুর পরে অতুলচন্দ্র একবারমাত্র বাড়ী আসিয়াছিলেন; তখন কনিষ্ঠ বিনোদ স্কুলে পড়িত। পিতৃহীন সহোদরকে মাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া অতুলচন্দ্র কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়া-

ছিলেন। তখন কয়টা গরু ছিল, এবং পুষ্করিণীটা কত বড় ছিল, এবং আম-বাগানটা কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিংবা বহির্ব্বাটীতে কয়টা কামরা ছিল, এবং পুষ্করিণীর উত্তরাংশের তালগাছ কয়টা জন্মাইয়াছিল কি না, তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাতা যখন কাশীতে দেহত্যাগ করেন, তখন সেখানে বিনোদের সহিত অগ্রজের সাক্ষাৎ হয়। বিনোদ বলিয়াছিল, "দাদা, এবার বাড়ীটার কি হইবে?" অতুলচন্দ্র বলিয়াছিলেন,— "ও সব ভাবনা তোমায় করিতে হইবে না।"

সুবালা বলিল, "তুমি এত দিন উপার্জ্জন করিয়া কি ছাই করিয়াছ? তুমি কাঙ্গাল, আর এরা নবাবের মত সমস্ত বিষয়টা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।"

অতুলচন্দ্র। "এখন উপায়? ইহার মধ্যে আমার কতখানি ভাগ, তাহা ত নির্দ্ধারণ করা শক্ত। উপরন্তু একটা গুড়ের কারখানা করিয়া বিষয়টা জটিল করিয়া ফেলিয়াছে।"

সুরমা। "তুমি চিরকালই হতভাগা থাকিয়া যাইবে। এ বিষয় সমস্ত তোমার। তুমি চুল চিরিয়া হিসাব করিয়া লও, নচেৎ তোমার সহিত আমার ইহজন্মে সম্বন্ধ নাই।"

৩

অতুলচন্দ্র গৃহিণীর ন্যায়সঙ্গত বিচারে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, পৈত্রিক ভদ্রাসন ও স্থাবর সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ভাবে কনিষ্ঠের হস্তগত হইয়াছে। তাহার উদ্ধার করা সহজ কথা নয়। তজ্জন্য কাঠখড় চাহি, উকীলের পরামর্শ চাহি, এবং একবার সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া চাহি। অতুলচন্দ্র একবার ভাবিলেন যে, "ইহাতে বিনোদের মত কি?" হয় ত পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিলে বিনোদ অর্দ্ধেকটা অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহা ছাড়া সম্ভব নহে, কেন না, বিনোদ নিজে পরিশ্রম করিয়া সম্পত্তিটা বর্দ্ধিত করিয়াছে। ইহাই তাহার সম্পূর্ণ চালাকী।

ক্রমেই অতুলচন্দ্র ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেই অস্থিরতা ক্রমে ঘোরতর ঝটিকারূপে মস্তকে বহিতে লাগিল। সহজ কথায়, অতুলচন্দ্র রাগিয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া হিতাহিত-জ্ঞান হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন।

ক্রমে গৃহিণী ও কর্ত্তা উভয়ে যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন গুপ্ত

পরামর্শ একটা প্রথা, তেমনি আড়ি পাতিয়া শুনাও একটা প্রথা। আত্মরক্ষার্থ ইহা অনেক স্থলে উপকারে আসে। অতুলচন্দ্রের পরামর্শ সরমার দাসী গদার মা অতি পরিষ্কারভাবে কান পাতিয়া শুনিয়াছিল। গদার মা পুরুষানুক্রমে (স্ত্রীবিভাগে) এই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে কান পাতিয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

গদার মা বিনোদকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিত, এবং গদার মৃত্যুর পর বিনোদের বাড়ীতে আর চুরি করিত না। এইরূপে স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া গদার মা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে ত্রুটী করিল না। কথাটা বিনোদের কানে উঠিল, এবং কালক্রমে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই সরমার কানে গেল, এবং কান হইতে মরমে প্রবেশ করিল।

সেই শান্তির উদ্যানে একটা বেতর ঝড় বহিল। পাড়ার বন্ধুবর্গ তাহার লক্ষণ বুঝিল।

৪

সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, অতুলচন্দ্র পাড়ার হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য ও ভজহরি মোক্তারের সহিত প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে গেলেন। হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে গুড়ের কারবারে কর্ম্মচারী ছিলেন। তহবিল আত্মসাৎ করিয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, বেলা দশটা বাজিয়া গেল, অথচ কেহ ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না।

সরমা বড়বৌকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তুমি আজ দুধ কিনিতে দিয়াছ কেন? আমাদের গরুর যথেষ্ট দুধ হয় ত?"

বড়বৌ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ সংসারে কার দুধ কে খায়? পুঁটীর অল্প দুধে কুলায় না, আর আমার ইচ্ছা নাই তোমাদের দুধ লইয়া পুঁটীকে খাওয়াই। আমরা কয় দিন আছি মাত্র, তার জন্য এত কথা কেন?"

ইত্যবসরে পুঁটী অধরের হাত ধরিয়া বাগানে আম পাড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া বড়বৌ ধীরপাদবিক্ষেপে কন্যার নিকট অগ্রসর হইলেন, এবং কোন কারণ ব্যক্ত না করিয়া পুঁটীর পৃষ্ঠে ক্রোধের উচ্ছ্বাসটা প্রচুরভাবে ঝাড়িয়া দিলেন। পুঁটী মুখব্যাদান করিয়া কাঁদিল, এবং অধর ত্রাসে দৌড় দিয়া পুষ্করিণীর পাড়টা পার হইয়া গেল।

গদার মা জিজ্ঞাসা করিল, "আহা! মেয়েটাকে অত মারা কেন?"

সুরমা। মেয়েটা ত আর তোমাদের নয় যে, তোমরা বসিয়া বসিয়া তার মাথাটা খাইবে। তুমি নিজের কাজে যাও।

তৎপরে পুঁটীর উপর যথাবিধি নীতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া এবং অত বড় ডাগর মেয়ের অত বড় ডাগর ছেলের সঙ্গে হাস্য তামাসা করা অবৈধ তাহা বুঝাইয়া দিয়া বড়বৌ পুনরায় খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরে অতুলচন্দ্র বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সুবালা জিজ্ঞাসা করিল, "পরামর্শ স্থির হ'ল ?"

অতুলচন্দ্র। হাঁ; উকীলের পরামর্শে বুঝিতে পরিলাম যে, গুড়ের কারখানা ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তির পুরা অর্দ্ধেক আমার।

৫

সুবালা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। গুড়ের কারবার স্বতন্ত্র হইলেও জমীটার অর্দ্ধেক যায় কোথা ? তাঁহার বোধ হইল যে, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে। এই অন্যায় অনুষ্ঠানে এবং পুঁটীর দশা ভাবিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতুলচন্দ্র ব্যথিতচিত্তে অনেক আশ্বাসবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

বিনোদ হঠাৎ দশটার গাড়ীতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। বিনোদ একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম কি, কেহ জানিত না।

সেই অভিনব সংবাদ পাড়ায় রাষ্ট্র হওয়াতে সকলে বলিল, বিনোদ কলিকাতায় কৌন্সিলির পরামর্শ লইতে গিয়াছে।

কৌন্সিলির পরামর্শ! কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! কার খাইয়া বিনোদ বড়-মানুষ? অগ্রজ অতুলচন্দ্র জ্বলিয়া রুদ্রমূর্ত্তি হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, "ওর গুড়ের কারখানায় আগুন লাগাইয়া দে!"

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য আসিয়া বলিল, "উহা অপেক্ষা সোজা উপায় আছে। এ ভদ্রাসন ত আপনারই, ইচ্ছা করিলে আপনি নিজের তালা লাগাইয়া রাখিতে পারেন। আপনি সকলকে বলিয়া দিন যে, আপনারই টাকা লইয়া এ কারবার চলিয়াছিল, এবং আপনিই ইহার পুরা লাভের দাবীদার।"

এ কথা সুবালার বড় ভাল লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ গ্রামস্থ ভদ্রলোকের সমক্ষে অগ্রজ অতুলচন্দ্র বিহিতভাবে সপ্রমাণ করিলেন যে, চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদ হইতে এই গুড়ের কারবারের মূলধন ও খরচা তিনি দিয়া আসিতেছেন।

সকলে বলিল, "ঠিক। আপনিই এ লাভের সম্পূর্ণ মালিক। আমরা জানি, বিনোদ বাবু গুড়ের কারবার হইতে দশ হাজার লাভ করিয়াছেন, এবং তৎসমস্ত তাঁহার স্ত্রীধনে পরিণত করিয়াছেন।"

বড়বৌ স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে পৈত্রিক সম্পত্তি বিনোদ কিছুই পাইতে পারে না, কেন না, তাহার অর্দ্ধাংশের দাম প্রায় দশ হাজার টাকা। এখনই গুড়ের কারখানা দখল কর ও বাটী হইতে উহাদের তাড়াইয়া দাও।"

৬

বাড়ী হইতে তাড়াইবার কথা সরমার কানে গেল। সরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাক্স গুছাইল, এবং অধরকে ডাকিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অধর বলিল, "মা, আমরা যাব কোথা? উনি কি ইচ্ছা করিলে আমাদের বাড়ী হইতে তাড়াইতে পারেন?"

সরমা বলিল, "বাবা, উঁহারা গুরুজন, পিতার সমান। আমাদের শান্তভাবে চলিয়া যাওয়া ভাল।"

অধর পুরাতন ও নূতন বহিগুলি, পুরাতন ও নূতন কাপড়গুলি একে একে গুছাইতে লাগিল। গদার মা ছুটিয়া গ্রামে গেল, এবং তাহার আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া বাগানের পাকা আম ও বাটীর পুরাতন বাসনগুলি সুবিধা বুঝিয়া একে একে সরাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে বিনোদ কলিকাতা হইতে ফিরিল। তখন সরমা ঘাটে বসিয়া।

বিনোদ ধীরে ধীরে সরমার নিকট গিয়া বসিল। বিনোদ বলিল, "সরমা, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

সরমা বলিল, "কিসের সর্ব্বনাশ?"

বিনোদ। গুড়ের কারবারে আমার পাঁচ হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে, এবং আরও পাঁচ হাজার টাকার দাবী করিয়া পাওনাদারগণ আমার ও দাদার অন্যান্য সম্পত্তি ক্রোক করাইবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। তাহারা দাদাকেও জড়াইয়াছে। দাদাকে না জড়াইলে তাহারা ভদ্রাসন বেচিতে পারিবে না।

সরমা আকাশের দিকে চাহিল, এবং পুনর্ব্বার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "এখন উপায়?"

বিনোদ। উপায় কেবল এই যে, দাদাকে প্রমাণ করিতে হইবে, তাঁহার সহিত গুড়ের কারবারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না, এবং ভদ্রাসনে আমার কোনও অধিকার নাই। আমি এখন তোমাকে ও অধরকে লইয়া পথের ভিখারী। বাকি কেবল দাদার অনুগ্রহ।

৭

সন্ধ্যা গিয়া যেমন প্রভাত হয়, তাহাই হইল। সরমার চক্ষুর জল শিশিরের সহিত শুকাইল। বিনোদ গ্রামের মান্য গণ্য জমীদার জ্ঞানদাবাবুর বাটীতে স্ত্রীপুত্রকে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

বেলা দশটার সময় গুড়ের কারখানায় তালা পড়িয়া গেল, এবং বড়বাবুর তরফে লোক খাড়া হইল। তাহার দাপটে কারখানার কর্ম্মচারিগণ ভাগিয়া গেল।

অপরাহ্নে সদরালার আদালত হইতে নাজীর সাহেব ক্রোকী পরওয়ানা লইয়া রঙ্গস্থলে উপনীত হইলেন। অতুলচন্দ্র ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ও সব চালাকী আমি জানি! ঐ গুড়ের কারখানা আমার, কেবল আমার, ইহাতে বিনোদের কোনও অংশ নাই। গ্রামস্থ লোক সকলে সাক্ষী।"

সকলে বলিল, "হাঁ, ইহা ঠিক।"

নাজীর সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সেই কথাই ঠিক। তবে প্রমাণের প্রয়োজন নাই।"

বিনোদ দূর হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিল, এবং বলিল, "নাজীর সাহেব! ইহাতে দাদার কোনও অংশ নাই। আমি প্রমাণ করিব। আমার দায়ে দাদার সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে না।"

গ্রামের ভজহরি মোক্তার কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কিসের ক্রোক?"

নাজীর পরওয়ানা পাঠ করিয়া শুনাইলেন যে, ইহাতে বিনোদ ও অতুলচন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকার দাবী দিয়া বিনোদের পাওনাদারগণ উভয়ের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করাইতেছেন।

তাহার পর মুচী ঢাকে কাঠি দিল। গ্রামস্থ লোক কাণ্ডটা বুঝিল। অতুলচন্দ্র হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সকলে বলিল, "উঁহাকে তুলিয়া লইয়া যাও। ইনি নিজের জালে নিজেই পড়িয়া গিয়াছেন।"

৮

ধীর নিস্তব্ধ নিশি। অতুলচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ! এখন উপায়? আমার হাতে এক হাজার টাকাও যে নাই।"

বিনোদ সরমার নিকট গেল। সরমার মুখের জ্যোতি আবার মুখে আসিয়াছিল। সরমার সম্মুখে আবার কত শান্তির আশা, কত সুখের ছবি একে একে নৃত্য করিতেছিল।

সরমা নিজের পুরাণো বাক্স হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর হস্তে দিল, এবং স্বামীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "এগুলি বড়ঠাকুরের পায়ে রাখিয়া দাও।"

সেই আত্মত্যাগ বড় বৌর হৃদয়ে ছুরিকার ন্যায় বিঁধিল। বড়বৌ আসিয়া সরমাকে কোলে লইলেন, এবং না জানি কোন্ সনাতন স্বর্গীয় বিধানানুসারে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষিত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে উভয় ভ্রাতা গহনার পুঁটুলিটি লইয়া জ্ঞানদা বাবুর নিকট গিয়া গহনাগুলি বন্ধক রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া আসিলেন, এবং পাওনাদারগণকে সন্তুষ্ট করিলেন

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিষয় ভাগ হইল না। গুড়ের কারবারও বন্ধ হইল না; বরং তিন বৎসরের মধ্যে উভয়ের দশ হাজার টাকা লাভ হইল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুঁটীর বিবাহ জ্ঞানদা বাবুর পুত্রের সহিত ঘটা করিয়া হইয়া গেল। বিবাহসভায় জ্ঞানদা বাবু সরমা দেবীর গহনাগুলি অতি আদরে পুত্রবধুকে পরাইয়া দিলেন, এবং সকলকে বলিলেন, "এ যাঁহার গহনা, আমার পুত্রবধূ যেন তাঁহারই মত হয়।"

তিব্বতের ষোড়শ-মহাস্থবির।

বিগত তিব্বত-অভিযানের সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কৌতূহলোদ্দীপক কতিপয় দুর্লভ বস্তু তিব্বতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল বস্তুর অধিকাংশই লণ্ডন ও কলিকাতা মিউজিয়মে সুরক্ষিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের শিরো-দেশে যে ষোড়শ-মহাস্থবিরের উল্লেখ হইয়াছে, উহার প্রতিমূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত কোনও মিউজিয়মে রক্ষিত হয় নাই।

গত জানুয়ারী মাসে হোম ডিপার্টমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ বাক্ একটি চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহার কয়েক দিন পরেই লর্ড কিচেনারের আসিষ্টাণ্ট মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল বেনন ঐরূপ আর চারিটি মূর্ত্তি আমাকে দেখিতে দেন। কর্ণেল বেননের মুখে শুনিলাম, ঐরূপ আর এগারটি মূর্ত্তি লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ওয়াডেল ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। এই ষোলটি মূর্ত্তি গ্যাংচির (Gyantse) সন্নিধানে ঞেঙিং বিহারে বিগুমান ছিল। ইংরেজ সৈন্য গ্যাংচি দুর্গ বিধ্বস্ত করিলে, ঐ দুর্গ ও তৎসন্নিহিত স্থানের দ্রব্যসমূহ বিজেতৃগণের হস্তগত হয়।

মিঃ বাক্ ও কর্ণেল বেনন যে পাঁচটি মূর্ত্তি আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন, তাহা আমি গত ফেব্রুয়ারী মাসে এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশনে প্রদর্শন করি, এবং সেই সঙ্গে ষোড়শ-মহাস্থবির শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। নিম্নে ষোড়শ-স্থবিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

স্থবির শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। মনু বলেন, * যাহার কেশ পক্ক হইয়াছে, তাহাকেই স্থবির বলে না। যিনি যুবক হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, দেবগণ তাঁহাকেই স্থবির বলিয়া জানেন। অতএব মহাস্থবির শব্দের অর্থ,—পরমশাস্ত্রজ্ঞ। পালি ভাষায় স্থবিরকে থের্ বলে। থের্ বৌদ্ধ ভিক্ষুর এক সম্মানসূচক উপাধি। যে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করিবার পর অন্ততঃ দশ বৎসর কাল নিষ্কলঙ্কে জীবনযাপন করিয়াছেন, তিনি থের্-পদবাচ্য। এইরূপ যে ভিক্ষু অন্ততঃ বিশ বৎসর কাল পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন; তাঁহাকে মহাথের্ বলে। তিব্বতীয় ভাষায় মহাস্থবির বা মহাথের্‌কে নে-তেন্-ছেম্-পো বলে। এই শব্দের আবয়বিক অর্থ,—মহা-আসন-স্থির। আমি যে পাঁচটি মহাস্থবিরের মূর্ত্তি সোসাইটীতে প্রদর্শন করি, উহার প্রত্যেকটিই ৪॥ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। মূর্ত্তিগুলি রক্তচন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত। চীন-দেশীয় শিল্পের অনুকরণে ঐ সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তিগুলির উপরে চন্দন ও সিন্দূরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয়, গ্যাংচি বিহারের লামাগণ উহা পূজা করিতেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির পাদদেশে স্বর্ণ অক্ষরে তিব্বতীয় ভাষায় এক একটি বচন উৎকীর্ণ আছে। মিঃ বাকের প্রদত্ত মূর্ত্তির পাদদেশে যে বচন উৎকীর্ণ ছিল, তাহা এই :—

* ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥—মনু ; ২। ১৫৬।

"ফাগ্—পা—নে—তেন—চেম্—পো—মোয়ি—পু—ত্—ন—মো।"

উল্লিখিত বচনের সংস্কৃতানুবাদ এইরূপ :—

"আর্য্য মহাস্থবির-বজ্রায়ণীপুত্রায় নমঃ।"

অন্যান্য মূর্ত্তির পাদদেশেও ঐরূপ বচন উৎকীর্ণ আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মহাস্থবিরের নাম দৃষ্ট হয়। ষোলটি মূর্ত্তিতে সর্ব্বশুদ্ধ ষোলটি মহাস্থবিরের নাম উৎকীর্ণ আছে। উক্ত ষোড়শ নাম * নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) দ্বিভুজ, (২) অঙ্গণিক, (৩) অজিত, (৪) বনবাসী, (৫) কালিক, (৬) বজ্রায়ণীপুত্র, (৭) ভদ্রিক, (৮) কনকবৎস, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) বাকুল, (১১) ধৃতবর্ত্ম, (১২) পিণ্ডোল ভরদ্বাজ, (১৩) নাগসেন, (১৪) ভবিক বা সিবক, (১৫) ধর্ম্মত্রাত বা ধর্ম্মাত, এবং (১৬) রাহুল।

বজ্রায়ণীপুত্র সিংহলের লোক। তাঁহার দুই হস্তে চামর, এবং তিনি ১০০০ অর্হৎ কর্ত্তৃক পরিবৃত। বাকুল উত্তর-কুরুর লোক। তাঁহার দুই হস্তে নকুল, এবং তিনি ৯০০ অর্হৎ কর্ত্তৃক পরিবৃত। বনবাসী নামক স্থবির সপ্তপর্ণী গুহায় অবস্থান করেন। তাঁহার মধ্যমাঙ্গুলিতে চামর বিদ্যমান, এবং তিনি ১৪০০ অর্হৎ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। সিবকের হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা নামক সুবিখ্যাত মহাযান গ্রন্থ। তিনি ১৪০০ অর্হৎ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া গিরিরাজ বিহুলে বাস করেন। এইরূপ অন্যান্য স্থবিরেরও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই বজ্রাসনের উপর আসীন। যে স্থবির যে দেশের লোক, প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

---

* জাপানদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত-পরিব্রাজক কাওয়া-গুছি-একাই চীন-ভাষার বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে ষোড়শ-স্থবিরের যে নামতালিকা বাহির করিয়াছেন, তাহা এই :—

(১) সুপিণ্ড, (২) তন্দক, (৩) অসিত, (৪) ইজ্যাত, (৫) কালিক, (৬) বজ্রায়ণীপুত্র, (৭) ভদ্রিক, (৮) কনকবৎস, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) নকুল, (১১) পুনর্বসু, (১২) পিণ্ডোল, (১৩) নাগসেন, (১৪) সিবক, (১৫) চুতহন্দক, (১৬) রাহুল।

তিব্বতীয় 'নে—তেন—চু—ড্রুক্' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত নাম দৃষ্ট হয় ;—

(১) ফ্যাগ্—ক্রি (২) যন্—লগ্—চুঙ্, (৩) ম—ফম্—প, (৪) নগ্—ন নে, (৫) দুস্—দেন, (৬) দো—র্জে—মো—য়ি—বু, (৭) জঙ্—পো, (৮) সের—বেউ, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) বাকুল, (১১) লাম—ক্রান্—তেন্, (১২) পিণ্ডোল ভরদ্বাজ, (১৩) লু—য়ি—ডে, (১৪) ব্রিদ্—বো—প, (১৫) ধর্ম্মাত, (১৬) ড—চেন—জিন্।

তদ্ভিন্ন তিব্বতীয় ভাষায় নেতেম্ চুরুক্ বা ষোড়শ-স্থবির-স্তোত্র নামক যে গ্রন্থ আছে, উহাতে প্রত্যেক স্থবিরের জন্মস্থান ইত্যাদি স্পষ্টতঃ বর্ণিত আছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, ষোল জন স্থবির এক সময়ে বা এক দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। অঙ্গণিকের জন্মস্থান কৈলাস পর্ব্বত। বনবাসী মগধের সপ্তপর্ণী গুহায় জন্মগ্রহণ করেন। বজ্রীপুত্র লঙ্কা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। কনকবৎসের নিবাস কাশ্মীর। বাকুল উত্তর-কুরুতে (Eastern Turkestan) সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। কালিক তাম্রলিপ্তের লোক। নাগ সেন বাহ্লীক দেশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য স্থবিরের জন্মস্থান অন্যান্য দেশ।

অঙ্গণিক, অজিত, পিণ্ডোল, বাকুল, ভদ্রিক, রাহুল ও সিবকের নাম পালিত্রিপিটকের অন্তর্গত থেরগাথা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। অতএব, এই সাত জন স্থবির খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, ষোড়শ-স্থবিরের মধ্যে নাগ সেন অন্যতম। মিলিন্দ-পঞ্হ নামক পালি গ্রন্থে নাগ সেনের বিবরণ পাওয়া যায়। নাগ সেন বক্ত্রিয় গ্রীকরাজ মিলিন্দ বা মিনান্দের সমসাময়িক; অতএব খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। ধর্ম্মত্রাত নামক অপর এক জন স্থবিরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি বসু মিত্রের মাতুল, অতএব রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, উল্লিখিত ষোল জন স্থবির খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাত শত বৎসর মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; যদিও তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ ও পরোপকারিতায় বিস্মিত হইয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ এই ষোলটি নাম এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া ধরায় ধর্ম্মালোক বিতরণ করাই ইহাঁদের জীবনের ব্রত ছিল।

যদিও ভারতে সহস্র সহস্র স্থবির প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে অপর কোন স্থবিরই উল্লিখিত ষোড়শ-স্থবিরের ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় বৌদ্ধবিহারে প্রতিদিন উক্ত ষোড়শ স্থবিরের পূজা হইত। মহাযান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থবির-পূজার প্রথম সূত্রপাত হয়। তদনন্তর ভারতীয় শ্রমণগণ খোটান দেশে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন; খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে

খোটান দেশ হইতে এই প্রথা চীন দেশে নীত হয়। চীন হইতে উহা ঐ সময়ে তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়। পাগ্‌সাম্ জোন্‌জাঙ্ নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ইতিহাসের ৩২৭-৩৩০ পৃষ্ঠায় স্থবির-পূজার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে খোটানের এক জন নরপতি চীনসম্রাট থেজুঙ্ কর্ত্তৃক আহূত হন। তিনি চীন রাজধানীতে এক প্রকার নৃত্যাভিনয় দেখাইয়াছিলেন। উহাতে ষোড়শ-স্থবিরের অভিনয় হইত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীজ্ঞান অতীশ বাঙ্গলা দেশ (বিক্রমপুর) হইতে তিব্বতে গমন করেন। তিনি তথায় একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই স্থানে পরবর্ত্তী কালে ঞেঙিং বিহার প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং উহাতে ষোড়শ-স্থবিরের পূজা হইবে। আমি দিব্য চক্ষুতে এই স্থানে ষোড়শ-স্থবিরের মূর্ত্তি দেখিতেছি।"

তিব্বতীয় ভাষায় ষোড়শ-স্থবিরকে নেতেন্ চুরুক্ বলে। তিব্বতের সর্ব্বোত্তম বিহারসমূহে অদ্যাপি মহা আড়ম্বরে নেতেন্ চুরুকের পূজা হয়। তথাপি নেতেন্ চুরুকের প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। দার্জ্জিলিঙ্, কাটামুণ্ডু, এমন কি, হ্লাসা নগরীতেও নেতেন্ চুরুকের মূর্ত্তি দুর্লভ। গ্যাংচি ও ঞেঙিং বিহার অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এই হেতু গ্যাংচিতে নেতেন্ চুরুকের (ষোড়শ-স্থবিরের) উৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। কর্ণেল বেনন যে কয়েকটি মূর্ত্তি পাইয়াছেন, তাহা তিনি হস্তান্তরিত করিবেন না। তিনি ইংলণ্ডে নিজের গৃহে উহা সযত্নে রক্ষা করিবেন,—এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

৪। রথযাত্রা।

কা! কা!—একটা কাক উষাকে অভিবাদন করিয়া, এবং আমার চতুর্দ্দিকে নিদ্রিত গলিত-দ্রব্যভোজী শত-সহস্র কাককে প্রথম সঙ্কেত জ্ঞাপন করিয়া, আমাকে জাগাইয়া দিল। এই গভীর খিলান-মণ্ডলের প্রতিধ্বনিকারী প্রস্তরারণ্য,—ঐ অশুভ বায়স-সঙ্গীতকে আরও যেন বাড়াইয়া তুলিল।

এই বায়সেরা মন্দিরেরই কুলঙ্গিতে বাস করে। কেন না, ইহারাও একটু পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এই প্রতিধ্বনির বিরাম নাই—চতুর্দ্দিকেই ইহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। মন্দিরের প্রস্তরময় বীথিগুলির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং উচ্চ নিম্ন সমস্ত দালানে আমার চতুর্দ্দিকে, পাকচক্রাকারে ঐ শব্দ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ কাকগুলা আমার নিকট অদৃশ্য। সমস্ত মন্দির এই কা-কা-রবে অনুরণিত। মন্দিরের পবিত্র ছায়াতলে যে সকল দেবতা বাস করেন—এই প্রাভাতিক অভ্যর্থনা-গীতি তাঁহাদের চিরপ্রাপ্য।

শেষ দীপটি পর্য্যন্ত নিভিয়া গিয়াছে। চন্দ্রমা আর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন না। গতকল্য অপেক্ষা আজিকার রাত্রি এই মন্দিরে যেন আরও ঘনীভূত। শীঘ্রই প্রভাত হইবে—ইহা বুঝিবার জন্য বিহঙ্গ-সুলভ তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন। মন্দিরের সানুগুলি গোরস্থানের ন্যায় আর্দ্র, সেই জন্য শৈত্য-বিভ্রম উপস্থিত হইতেছে। কিছুই দেখা যায় না। কদাচিৎ দুই একটি অপরিস্ফুট আলোকছটা,—(যে অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, তাহা অপেক্ষা কিছু কম অন্ধকার, এইমাত্র)—দুই একটি ক্ষীণ রশ্মি, খিলান-মণ্ডলের বায়ুরন্ধ্র দিয়া—ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতেছে। পরে বিভিন্ন দিক্ হইতে, এই কা-কা-রবের সহিত পালোকের 'ফর্‌ফর্' শব্দ, ডানার 'ঝটাপট্' শব্দ সংযোজিত হইল। এইবার কৃষ্ণবর্ণের পিণ্ডগুলি উড়িয়া যাইবে।.........

এইবার আলোক আসিয়াছে।.........এ দেশে আলোক যেমন শীঘ্র চলিয়া যায়, তেমনই আবার শীঘ্র আইসে,.........এত শীঘ্র যে নাট্যবিভ্রম বলিয়া মনে হয়। সুদূরপ্রসারিত স্তম্ভশ্রেণী পাণ্ডুর স্বচ্ছতায় অনুরঞ্জিত হইল;—উহা এত স্বচ্ছ যে মনে হয়, বুঝি দূরস্থ বস্তুর ছায়াপাত হইয়াছে। ধূসরবর্ণ পাতলা রেশমী কাপড়ের অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া, অ-করস্পৃশ্য বিবিধ শোভন ছবির ছায়াবাজি যেন দৃষ্ট হইতেছে। মন্দির-দালানের বিভিন্ন প্রকাণ্ড বিভাগগুলি নেত্রসমক্ষে প্রকাশিত হইল; দালানের চতুষ্পথগুলি শেষ প্রান্তে মিলাইয়া গেল। আমার পশ্চাদ্ভাগে, যেখানে গতকল্য সায়াহ্নে এক জন পুরোহিতের নিকট রথযাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, সেই রোষদীপ্ত-বিকটাকার-জন্তু-চিত্রময় বীথিটিতে সেই জন্তুদের ছায়া-ছবি আবার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যে সকল নরমূর্ত্তি ভূতলে শুইয়া ছিল, সেই সকল মল্‌মল্-বস্ত্র-পরিহিত মূর্ত্তিগুলি খাড়া হইয়া উঠিল;—বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, পশ্চাতে শরীর হেলাইয়া, যাতায়াত করিতে লাগিল। এই অবাস্তব, বর্ণহীন, ঐন্দ্রজালিক

দৃশ্যের মধ্যে, এই শুভ্রবসন স্বচ্ছ মূর্ত্তিগুলির পদসঞ্চারশব্দ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

গতকল্য যে সানের উপর আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহার নিকটে একটা পাথরের সিঁড়ি মন্দিরের ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। একটু হাতড়াইয়া—ঠাণ্ডা দেওয়ালের উপর হাত বুলাইয়া সেই সিঁড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

ছাদের উপরে উঠিলাম। আমি এখন একাকী। গুরুভার, সমতল, খিলান-মণ্ডলের উপর এই ছাদ মরুভূমির ন্যায় ধূধূ করিতেছে। ইহা বড় বড় পাথরের চাক্‌লা দিয়া বাঁধানো। উহার দুই ধার প্রসারিত হইয়া দূরবর্ত্তী আকাশের জলদচূড়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিম্নতলের ন্যায় এখানেও ছায়াবাজির দৃশ্য ;—আর একটি পাণ্ডুবর্ণের চিত্রাবলী। এখানে একটু ফর্‌সা হইয়াছে, কিন্তু এখনও দিন হয় নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরে যেরূপ সমস্তই অবাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল, এখানেও সেইরূপ মনে হইতেছে। এই বিস্তীর্ণ ময়দানের চতুর্দ্দিকে যে জলদ-চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে, উহা বাষ্পরাশি বই আর কিছুই নহে ;—রাত্রিকালে এই বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়াছে মাত্র। এই বাষ্পরাশি ঈষৎ নীল রঙ্গের তুলা-ভরা গদীর ন্যায় এরূপ স্থূল যে মনে হয়, আর একটু নিকটে গেলেই উহাকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করা যাইতে পারে। সমস্ত ভূমি ঐ তুলারাশির মধ্যে এরূপ মগ্ন হইয়া আছে যে, কালো কালো কতকগুলা তালপক্ষপুঞ্জ অথবা তালপত্রগুচ্ছ উহার মধ্য হইতে শুধু মাথা বাহির করিয়া আছে। ঐগুলি উচ্চতম তালবৃক্ষের চূড়াদেশ।

'সমুদ্রাভ মণি'র ন্যায় রঙ্গ—দিব্য শোভন-স্বচ্ছ—এক প্রকার হরিৎ আলোকে উদয়গিরির দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল ; যেন তৈলের একটি ফোঁটা নৈশ-গগন-তটে মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইল। ও দিকে অস্তাচলদিগন্তে একটি স্থূল লোহিত গোলক অবসাদে ম্রিয়মাণ—একটি পুরাতন গ্রহ শ্রান্ত-ক্লান্ত—একটি প্রাচীন জীবলোক পৃথিবীর অতিসান্নিধ্যবশতঃ ভয়ে আকুল;—ইনি অস্তমান চন্দ্রমা। এক্ষণে মন্দিরের সমস্ত কাকগুলা জাগ্রত হইয়া কা-কা রব করিতেছে। নিম্নদেশ হইতে আকাশের সর্ব্বদিক হইতে, যেখান দিয়াই উহারা চলিয়া যাইতেছে—ঐ কা-কা-ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। . . . . . .

প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের আর বড় বিলম্ব নাই। রথের চারিটা প্রকাণ্ড চাকা। টানিবার রসিগুলি ভূতলে বিছাইয়া রাখা হইয়াছে।

এইবার পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা—যে মন্দিরাকৃতি ক্ষুদ্র গৃহে পূজা-অর্চনা করিয়া তাহারা রাত্রিযাপন করিয়াছিল, সেখান হইতে নামিয়া আসিল। তাহাদের সম্মুখে, অষ্টাদশবর্ষীয় এক দল বালক, ত্রিশিখা-বিশিষ্ট মশাল ধরিয়া আছে; এবং বাহিরে আসিয়া, উদীয়মান দিবালোক যেমন-যেমন বর্দ্ধিত হইতেছে, অমনই এক একটা করিয়া মশাল উহারা নিভাইয়া দিতেছে। এই বৃদ্ধ পুরোহিতেরা, এক এক জন করিয়া ক্রমান্বয়ে সেই দূরস্থ কৃষ্ণবর্ণ সোপানের উচ্চতম ধাপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; এবং ধাপ হইতে ধাপান্তরে ক্রমশঃ যেমন নামিতে লাগিল, ঐ গূঢ়ধর্ম্মচারীদিগের শুভ্রকেশ মূর্ত্তিগুলি প্রভাতের তরুণ আলোকে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যাহাতে স্বকীয় ইষ্টদেবের ত্রিশূল-চিহ্নটি আরও বিস্তৃতভাবে অঙ্কিত হইতে পারে, এই জন্য উহাদের ললাটের উপরিভাগ হইতে মস্তকের চূড়াদেশ পর্য্যন্ত মুণ্ডিত। পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে এমনই উদাসীন যে, উহারা প্রায় উলঙ্গ—একখণ্ড বস্ত্রমাত্র উহাদের গায়ে জড়ানো রহিয়াছে। বর্ণভেদের চিহ্ন-স্বরূপ, শোণের শুভ্র সূক্ষ্ম সূত্রগুচ্ছ জটা পাকাইয়া তির্য্যক্‌ভাবে বক্ষের উপর লম্বমান। মন্দিরাকৃতি সেই শোভা-গৃহের জান্‌লা ও রথ—এই উভয়ের মধ্যে রেশ্‌মী বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি পদ-সেতু—যাহার উপর দিয়া কিছু পূর্ব্বে স্বর্ণবিগ্রহটিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—সেই সেতুটি এক্ষণে উঠাইয়া লওয়া হইল। এইবার এক দল কৃষ্ণকায় বাদক এরূপ সজোরে বাদ্য বাজাইতে লাগিল যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং এই বাদ্য এরূপ বজ্র-ভীষণ ও শোকভারাক্রান্ত যে, শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এক দল লোক ঢাক পিটিতেছে; অপর এক দল বিরাটাকার তূরী-সমূহ—সেই প্রচ্ছন্ন দেবতার অভিমুখে উত্তোলন করিয়া, উহাতে প্রাণপণে ফূৎকার করিয়া অমানুষিক ধ্বনি বাহির করিতেছে।

রথ সাজানো হইয়াছে। চৌঘুড়ি গাড়ীর অশ্বচতুষ্টয়ের অনুকরণ করিয়া চারিটা বড় বড় কাঠের ঘোড়া রথের সম্মুখভাগে স্থাপিত হইয়াছে। এই তেজীয়ান রোষদীপ্ত পক্ষিরাজ ঘোড়াগুলি পা ও ডানার আস্ফালনে আকাশকে তাড়না করিতেছে। লাল রেশমের দুর্ভেদ্য যবনিকার মধ্যে বিগ্রহটি প্রচ্ছন্ন। বিগ্রহ-সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে 'ঝুলানো বাগিচা'র ন্যায় কতকগুলি পুষ্পিত কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রের ঝালরে দুই তিন গজ লম্বা বৃহদাকার লোলক-সমূহ ঝুলিতেছে। স্বাভাবিক পুষ্প ও জরী-জড়ানো পুষ্পমালা দিয়া এই লোলকগুলি রচিত। এই চক্রবিশিষ্ট অট্টালিকার সকল তলার উপরেই

কতকগুলি উলঙ্গপ্রায় বালক অধিষ্ঠিত; প্রথমে উহারা বস্ত্রসজ্জার মধ্যে—পুষ্প-গ্রথিত রেশম-মণ্ডিত মঞ্চতলে লুক্কায়িত ছিল, উহারাই বিগ্রহের পার্শ্ব-রক্ষী। যে সময়ে নিম্ন হইতে সেই ভীষণ তূর্য্যধ্বনি হইল, অমনই উহারাও উপর হইতে তূরীনাদ করিতে লাগিল।

এইবার সুলক্ষণ হস্তীদিগকে আনা হইল। উহারা নূতন জরীর পোষাক ও মুক্তাখচিত জরীর টুপি পাইবার জন্য, আপনা হইতেই হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তাহার পর চলিয়া গিয়া চির-অভ্যস্তভাবে পুরোহিতদিগের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। সহযাত্রিগণ এখনও অচল স্থির। যুবকেরা, সম্মুখভাগে চারি সারি বাঁধিয়া, ভূতল-প্রসারিত চারিটা বিস্তীর্ণ রজ্জুর ধারে ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বীথির যে ধারে মন্দিরের প্রাচীর – সেই ধারটি এক্ষণে তমসাচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত, বিষাদময়। কিন্তু অপর ধারে, ব্রাহ্মণদিগের আবাস-গৃহের সম্মুখে, জনতার বৃদ্ধি হইয়াছে—উহারা একদৃষ্টে রথের দিকে তাকাইয়া আছে। গবাক্ষ, গুরুভার-স্তম্ভ-সমন্বিত বারাণ্ডা, বিকটাকার পশুমূর্ত্তিভূষিত সোপানাবলী—শিশু ও বৃদ্ধগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। বিশেষতঃ সেখানে রমণীগণের জনতা। উহারা জরীর পাড়ওয়ালা শাড়ী পরিয়াছে, উহাদের গলায় পুষ্পমালা ঝুলিতেছে, অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার ঝক্‌মক্ করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ, পুরোহিতদিগের জন্য উপহারসামগ্রী আনিয়াছে; কেহ বা চূর্ণ-পাত্র হস্তে করিয়া, ভূতলস্থ নক্‌সা-চিত্র যেখানে যেখানে লুপ্ত হইয়াছে, সেই সকল নক্‌সা আবার তাড়াতাড়ি ফুটাইয়া তুলিতেছে। স্থানে স্থানে নূতন হল্‌দে ফুল বসাইয়া দিতেছে।

কিন্তু এই উষ্ণপ্রধান দেশে, নবভানু-উদ্ভাসিত মুক্ত আকাশ মানবের সমৃদ্ধি-আড়ম্বর-প্রদর্শনের পক্ষে কি প্রতিকূল! যখন আমি মন্দিরের ছাদ হইতে নামিয়া আসি, তখনও শেষাবশিষ্ট মশালগুলির দীপ্তি—স্খলিতপদ উষার অৰ্দ্ধস্ফুট আলোকে অক্ষুণ্ণ ছিল। তখনও সমস্তই কুহকময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রভাতিক গগনের অভিনব অকলুষ স্বচ্ছতার মধ্যে সে কুহক ছুটিয়া গিয়াছে। এখন এই আকাশে আর কিছুই নাই, সর্ব্বত্র কেবলই অপরিসীম বিশুদ্ধতা—মনোহর হরিদ্বর্ণ - কি-এক প্রভাময় হরিদ্বর্ণ —পাণ্ডুর হরিদ্বর্ণ—যাহার নাম নাই—যাহা বর্ণনাতীত। ইহার পর, সমস্তই যেন হীনপ্রভ ম্লানচ্ছবি। এক্ষণে মন্দিরপ্রাচীরে জরাজীর্ণতা ও রক্তিম কুষ্ঠক্ষত সকল প্রকাশ পাইতেছে। এখন যেন সমস্তই বেশী বেশী দেখা যাইতেছে।

এ সমস্ত ঢাকিয়া রাখিতে হইলে, হয় নিশার আবরণ আবশ্যক, নয় দুনিরীক্ষ্য মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্তপ্রভার প্রয়োজন। রথের বিলাস-সজ্জা নিতান্তই স্থূল ও শিশুচিত্তহারী। হস্তীদের পরিচ্ছদ জীর্ণ ও বহু-ব্যবহৃত। যুবতী ললনাদের মুখমণ্ডল ও কণ্ঠদেশের বিশুদ্ধ তাম্র-আভা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, উহাদের দীনহীন মলিন চীরবস্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভারতের বার্দ্ধক্য ও অবনতি, এই সব আনুষঙ্গিক স্মৃতি-মন্দিরের ধ্বংসদশা, উহাদের উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ধূলিধূসর জীর্ণতা—এমন কি, এই মহাজাতির বর্ত্তমান হীনতা—সমস্তই, এই ছলনাময় মুহূর্ত্তে, আমার নিকট অপ্রতিবিধেয় বলিয়া মনে হইতেছে। অতীতের লোক—অতীতের ধর্ম্ম—এই উভয়েরই যুগচক্র যেন ঘুরিয়া গিয়াছে, উহারা শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

তথাপি এখানে বিদেশীয় ভাবের গন্ধমাত্র নাই। এই প্রাচীন সাজসজ্জার মধ্যে, আধুনিক কালের ছোটখাটো খুঁটি নাটি সামগ্রী প্রবেশ করিয়া ইহা বেসুরো বেখাপ্পা করিয়া তুলে নাই। বিধর্ম্মী একমাত্র আমিই এই উৎসব-অনুষ্ঠানের সহকারী। ... ...

ফলতঃ এই সূর্য্যই এ দেশের মহা-ঐন্দ্রজালিক। সূর্য্যই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া তুলে। সূর্য্যের এই আকস্মিক উদয়ে কি জানি কি একটু কারুণ্য-রস আছে, যাহা মন্দিরের সহিত—আজ যে দেবতার পূজা হইবে, সেই দেবতার সহিত—একতানে মিশিয়া যায়। দিগন্তে একটি-মাত্র মেঘখণ্ড। আমরা যে ধরণীর ধূলিকণাস্বরূপ—আমাদের দৃষ্টি হইতে এই মেঘখণ্ডটি সূর্য্যকে এখন পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। একটি ঘোর তাম্রবর্ণ কটিবন্ধের উপরিভাগে সূর্য্যদেব অগ্নিশিখা বিকীর্ণ করিতেছেন। বিষ্ণু দেবের ত্রিশূলচিহ্নের ন্যায় তিনটি অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত। ইহারই মধ্যে এই প্রকাণ্ড অট্টচূড়াগুলি সূর্য্যদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। এই রক্তিমাভ পাষাণস্তূপগুলি —গগনচুম্বী মন্দিরগুলি দেব-মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষোদিত প্রস্তরময় মূর্ত্তি-অরণ্যের মধ্যে, শুকপক্ষিগণের শত সহস্র নীড় রহিয়াছে। বিবিধ মুখভঙ্গি-অঙ্গভঙ্গি-বিশিষ্ট লোহিত মূর্ত্তির মধ্যে ও বাহু জঙ্ঘার জটিল মিশ্রণের মধ্যে—সেই উচ্চ শূন্য দেশে উহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—চীৎকার করিতেছে।

রথের শীর্ষদেশে, গিল্টিকরা কাজগুলি ঝক্ মক্ করিতেছে। এইবার যাত্রাকাল উপস্থিত। তূরীধ্বনি করিয়া যেই সঙ্কেত করা হইল, অমনই

পেশী-স্ফীত-বাহু শতসহস্র লোক রজ্জুর নিকটে সার দিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত যুবক-মণ্ডলী—এমন কি, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও ভক্তি ও প্রীতি-সহকারে এই সাধারণ কার্য্যে যোগ দিল। এইবার রথ টানিবার উদ্যোগ হইতেছে। লোকেরা রমণী-সুলভ বিবিধ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। এই সকল ভাবভঙ্গীর সহিত উহাদের নেত্রস্ফূর্ত্ত পৌরুষিক তেজ ও স্কন্ধদেশের বিশালতা মিশ খাইতেছে না। উহারা গুরুকেশভার উন্মোচন করিয়া, এবং বলয়-ভূষিত বাহু উত্তোলন করিয়া, কেশে দৃঢ় গ্রন্থি বন্ধন করিল।

পুনর্ব্বার সঙ্কেত। ঢাক ঢোল সরোষে বাজিয়া উঠিল; সজোরে তূরীনাদ হইতে লাগিল; তাহার সহিত মানব-কণ্ঠ-নিঃসৃত মহা নিনাদ সম্মিলিত হইল; বাহুর পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইল;—রজ্জুগুলিতে টান পড়িল। কিন্তু এই বিরাটযন্ত্রটি একটুও নড়িল না। গতবর্ষের রথযাত্রার পর হইতে, উহা স্থূল মৃত্তিকার মধ্যে আবদ্ধ।

এক জন প্রধানের অনুজ্ঞাক্রমে, আরও ভাল করিয়া সমবেত চেষ্টা আরব্ধ হইল। এইবার বোধ হয়, আর কোন বাধা হইবে না। আরও অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল; বক্ষোদেশে তুষার-শুভ্র-যজ্ঞসূত্রধারী বৃদ্ধগণ, তাহাদের শুভ্র সূত্র, এই কৃষ্ণ রজ্জুর সহিত সম্মিলিত করিল; জনতা হইতে একটা মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল; বাহু ও প্রকোষ্ঠের মাংসপেশী আরও দৃঢ় কঠিন হইয়া উঠিল। তবু কিছুই হইল না! রজ্জুগুলি সুদীর্ঘ মৃত ভুজঙ্গবৎ হতাশ হইয়া হস্ত হইতে ভূতলে স্খলিত হইল।

তথাপি উহারা বেশ জানে,—দেবতার রথ নিশ্চয়ই চলিবে। সহস্র বৎসর হইতে আবহমানকাল পর্য্যন্ত রথ অবাধে চলিয়াছে। যাহাদের বাহু এক্ষণে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, যাহাদিগের আত্মা বহুকাল-যাবৎ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া, অথবা মায়াময় ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বিশ্বাত্মার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে—সেই সব পূর্ব্বপুরুষের উদ্যম চেষ্টায় রথ এতকাল চলিয়াছে!

রথ অবশ্যই চলিবে। রথ চলিবে বলিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। সেই জন্য তাহারা অবিচলিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের নেত্রে অন্যমনস্কভাব; তাহাদের আত্মা ইহারই মধ্যে যেন তপঃক্লিষ্ট দেহ হইতে বিমুক্ত। এমন কি, হস্তীরা পর্য্যন্ত জানে যে, রথ চলিবে; তাই তাহারাও অতীব প্রশান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মনে যে চিন্তাপ্রবাহ চলিতেছে, আমাদের নিকট তাহা দুরবগাহ হইলেও, এই সব চিন্তায় তাহাদের

বৃহৎ মস্তিষ্ক পূর্ণ। তাহাদের মধ্যে যে হস্তী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সে বিলক্ষণ জানে, রথ এক সময়ে চলিবেই চলিবে। কেন না, তিন চারি পুরুষ হইতে বংশানুক্রমে, মানববাহুকে রজ্জু ধরিয়া রথ টানিতে তাহারা দেখিয়াছে;—শত বৎসর হইতে এইরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

চলে এসো! আনো ফিক্‌না, আনো কপিকলের রসারসি; উঠাও চাড়া দিয়া! এক দল মুটিয়ার কাঁধে কতকগুলা কাঠের গুঁড়ি আসিয়া পৌছিল। একটা গুঁড়ির প্রান্তদেশে একটু ছিল্‌কা উঠাইয়া, আবদ্ধ চাকাটির নীচে সেই প্রান্তভাগ স্থাপিত হইল; এবং গুঁড়ির উচ্ছ্রিত অপর প্রান্তের উপর অশ্বারোহীর ধরণে দশ জন লোক বসিয়া ঝাঁকারি দিতে লাগিল; ও দিকে, কপিকলের রসারসি ও রজ্জুগুলিতেও এক সঙ্গে টান পড়িল। এইবার সেই পর্ব্বত-শিখর একটু নড়িল! একটা আনন্দের কোলাহল সমুত্থিত হইল;—রথ চলিল!

ভূমিতে চারিটা গভীর খাত খনন করিয়া রথচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে চলিল। অক্ষদণ্ডের আর্ত্তনাদ, নিষ্পেষিত কাষ্ঠের কাতরধ্বনি, মনুষ্যকণ্ঠের কোলাহল ও পবিত্র তুরীর ঘোর নিনাদ যুগপৎ সমুত্থিত হইল। শিশু-সুলভ আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইল; সমস্ত আস্য-বিবর উদ্ঘাটিত হইল; জয়ধ্বনি করিবার জন্য সমস্ত অশুভ্র দন্তপাতি বিকশিত হইল; সমস্ত বাহু শূন্যদেশে উৎক্ষিপ্ত হইল; এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া লোকেরা রজ্জুতে টান্ দিতে বিস্মৃত হইল;—রথ থামিল! সমবেত আকর্ষণের প্রথম আবেগে, প্রায় ত্রিশপদ অগ্রসর হইয়াছিল, আবার রথ ভূমিতে অবদ্ধ হইয়া পড়িল। হস্তীরা রথের পিছনে পিছনে আসিতেছিল, রথ সহসা থামিয়া যাওয়ায়, উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল। আবার সমস্ত গোড়া হইতে আরম্ভ হইল।

কিন্তু এবার শৃঙ্খলার সহিত আরম্ভ হইল। লোকেরা কপিকলের রসারসি, ফিক্‌না-আদি আনিতে গেল। এই অবসরে, রমণীগণ পুরোহিত-জনতার মধ্যে তাড়াতাড়ি আসিয়া—এমন কি, নিরীহ হস্তিগণের প্রায় পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণবিগ্রহের গুরুভারে, ভূতলে যে রথ্যা খনিত হইয়াছে, তাহা চুম্বন করিবার জন্য তাহাদের এই উন্মত্ত আগ্রহ। এই সময়ে সৌর-কর মন্দির-চূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া জনতার উপর পতিত হইল, এবং উহাদিগকে নবতর শোভায় সজ্জিত করিল। সমস্ত নগ্ন বাহুতে ধাতব বলয় ঝক্‌মক্ করিতেছে; রমণীগণের মুখমণ্ডলে, শলাকা-বিদ্ধ নাসিকাপুটে, হীরা-

মাণিক্যের ভূষণ ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, অতিসূক্ষ্ম রঙ্গিন্‌ মল্‌মল্‌ অথবা জরীর পাড়-বিশিষ্ট মল্‌মলের ভিতর দিয়া, মীনাক্ষী শিবানীর বক্ষের ন্যায় নির্ম্মল কণ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে।

এইবার এই বিরাট যন্ত্রটি দমকে-দমকে ভীষণ বেগে চলিতেছে। মধ্যে-মধ্যে থামিতেছে—আবার চলিতেছে।

এই গতিক্রিয়া ও পৈশিক বলের উদ্দাম বিলাস-লীলা দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া চলিবে। এই যাত্রাপথের পশ্চাদ্‌ভাগে, ভূমি যেন শত শত হলের দ্বারা কর্ষিত হইয়াছে—সেই ভূমি, যাহা প্রাতঃকালে যেন 'রোলার' যন্ত্রে সমীকৃত হইয়াছিল, এবং শুভ্র নক্‌সা-চিত্রে ও সুষমান্বিত কুসুমসমূহে বিভূষিত হইয়াছিল!

যেখানে বীথির বাঁক্‌ ফিরিয়াছে, এবং যে দিকে রথটিকেও ফিরাইতে হইবে, সেই মন্দিরের কোণে রথ আসিয়া যখন অনেকক্ষণ থামিল, সেই অবসরে এক জন প্রদর্শক ও এক জন ব্রাহ্মণকে লইয়া, একটু নিস্তব্ধতা ও মুক্ত বায়ুর অন্বেষণে—সেই বৃহৎ দালানের জটিল অরণ্য—সেই সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ-শালা—সেই তমসাচ্ছন্ন অসংখ্য পার্শ্ব-দালানের ঊর্দ্ধদেশে—মন্দিরের সেই বিশাল বিস্তীর্ণ ছাদের উপর আবার আরোহণ করিলাম। প্রভাতে যেরূপ মরুবৎ শূন্য দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ। কিন্তু সপ্ত ঘটিকার সূর্য্যালোকে এই স্থানটি আরও ভগ্নপ্রায়—আরও দীনভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়-মান হইল। রক্তিম-ধূসরবর্ণ;—কালোৎপন্ন বলি-রেখার ন্যায় সর্ব্বত্র ফাট্‌ ধরিয়াছে—চীড় পড়িয়াছে। এখনও যথেষ্ট প্রভাত; সূর্য্য এখনও যথেষ্ট নিম্নে; এই ছাতের উপর এখনও বেশ বসা যায়; এমন কি, এই সব অমানুষী মন্দির-চূড়ার দীর্ঘ-প্রক্ষিপ্ত ছায়াতলে দিব্য আরামে শয়ন করাও যায়।

এই ছাদ, 'ষ্টেপ্‌' নামক রুসিয়ার অধিত্যকা ভূমির ন্যায় সুবিস্তীর্ণ। কিনারায়, বাদুড়ের ডানা-যুক্ত কতকগুলি পুরাতন ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি স্বকীয় চরণযুগল দর্শন করিবার জন্যই যেন বহির্দ্দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই;—সমস্তই সমতল। জীর্ণ শীর্ণ লুপ্ত-প্রলেপ দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত মন্দিরচূড়া ভিন্ন এখানে আর কিছুই নাই;—চূড়াদিগের মধ্যে এক একটা বিস্তৃত ব্যবধান-পরিসর। সমতল ছাদ হইতেও চূড়াগুলি সুদূরে অবস্থিত;—মন্দিরের আয়তন এতই বৃহৎ।

ইতস্ততঃ, খাতের আকারে কতকগুলি বিচরণভূমি, এখান হইতে দৃষ্টি-

গোচর হইতেছে। তমসাচ্ছন্ন মণ্ডপশালা-সমূহের মধ্যে—কোনরূপ প্রকারে যেন জায়গা বাঁচাইয়া এই বিচরণভূমি রচিত হইয়াছে। উহার মধ্যে যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাহাতে বটবৃক্ষ রোপিত ;—সেই বটবৃক্ষের সবুজ মাথাগুলি ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এবং তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। মন্দিরের যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—সেই ভীষণ গুপ্তস্থান—সেই দুরধিগম্য তমসাচ্ছন্ন সঙ্কেত-রহস্য-স্থানকে বেষ্টন করিয়া এই বিচরণভূমিটি অধিষ্ঠিত।

প্রাচীরের মাথায় যে সকল ছোট-ছোট দেবমূর্ত্তি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, তাহারা বোধ হয় এই রথযাত্রা দেখিবার জন্য সমুৎসুক। কিন্তু আমি এখান হইতে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। নিম্নদেশের চটুল গতিবিধি আমার নিকট প্রচ্ছন্ন ; এমন কি, নিকটস্থ নগর, গৃহ, মার্গ, সমস্তই আমার নিকট প্রচ্ছন্ন। আমার এই শূন্য মরুক্ষেত্র—সেই তাল-অরণ্যের সংলগ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, যাহার চূড়াগ্রভাগ দিগন্তকে নীলিম করিয়া তুলিয়াছে।

আমার এই দুর্নিরীক্ষ্য প্রজ্বলন্ত আকাশ-খণ্ডে, কাক চীল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে সবুজ টিয়া-পাখীগুলা উড়িয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্র টিকটিকি গিরগিটি বিচরণ করিতেছে। যে কাঠবিড়ালী ভারতের সমস্ত ভগ্ন মন্দির—সমস্ত বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে—তাহারা পরস্পরের অনুধাবন করিতেছে ; পবিত্র প্রস্তররাশির মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। এখানে নিঝুম নিস্তব্ধতা। এই দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত অদ্ভুতাকৃতি চূড়াগুলি আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে,—চূড়াগুলি এত অদ্ভুত ও এত উচ্চ যে, ইহা বাস্তুনির্ম্মাণ-পদ্ধতি-বিষয়ক য়ুরোপীয় সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধ। এই চূড়াগুলি ব্যতীত এখানে এমন আর কিছুই নাই, যাহা আমার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে। কিন্তু এই চূড়াগুলির নিস্তব্ধতা অনন্ত অসীম!

এই গগন-বিলম্বী মরুদেশের ছায়াতলে, শান্তি-আরামে এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। আমার প্রদর্শক ও ব্রাহ্মণ এই কবোষ্ণ পাষাণের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।··· ··· ···

নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিবিভ্রম বা ঘূর্ণি-রোগ উপস্থিত!··· ···ঐ অদূরে একটা চূড়া··· ··· এইমাত্র নড়িয়া উঠিল··· ···ঐ যে, আবার চলিতেছে! ··· ···

মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইলাম, পরে দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিলাম। ওহো! রথের চূড়াটিও মন্দির-চূড়ার অনুকরণে নির্ম্মিত। আমা হইতে

বহুদূরে, মন্দিরের সম্মুখ দিয়া রথটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি যেখানে আছি, তাহারই নীচে, আকৃষ্ট রজ্জু, উন্মত্ত জনতা, হস্তিবৃন্দ, সহযাত্রিদল—সমস্তই যেন একটা খাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। যে সিংহাসনের উপর অদৃশ্য বিগ্রহটি আসীন, তাহারই উপরিস্থ চূড়াটিমাত্র আমি দেখিতে পাইতেছি। কোনও জয়ধ্বনি কিংবা কোনও বাদ্যনির্ঘোষ শুনা যাইতেছে না। বিষ্ণু-রথের এই শেষ প্রতিবিম্ব আমার নেত্রবিম্বে পতিত হইল। ছাতের ধার দিয়া, প্রস্তররাশির মধ্যে যেন একটি মন্দির-চূড়া একাকী নিস্তব্ধভাবে আপনা-আপনি চলিতেছে!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভবভূতি ও কালিদাস।

এক জন ভাবুক ইংরেজ সমালোচক শেক্ষপীয়র ও মিল্টনকে অচলপ্রতিম ইংরাজী-সাহিত্যের যুগল স্বর্ণচূড়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিকবিগণের কথা ছাড়িয়া দিলে, কালিদাস ও ভবভূতিকেও সেইরূপ মহাগিরিসন্নিভ সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের যুগল স্বর্ণচূড়া বেশ বলা চলে।

আমাদের দেশের পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অবশ্য ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারাও কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ কবি বলেন; কিন্তু তাঁহারা ভবভূতিকে কালিদাসের সমান আসনে না বসাইয়া ভারবি, মাঘ ও নৈষধকার শ্রীহর্ষকে ঐরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরম্পরাগত যে শ্লোকত্রয় * প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় অনেক পাঠকেরই পরিচিত। ভবভূতি শুধু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক, 'পণ্ডিত'-সম্প্রদায় তাঁহাকে বড় আমলে আনেন নাই। কিন্তু রুচিপ্রকৃতি ও বিচার-

* (১) কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ।

(২) উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

(৩) তাবদ্ভা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ॥

শক্তিতে ইংরাজী-শিক্ষিত আমাদের ও এই পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ একটা প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহাদের বিবেচনার সহিত আমাদের বিবেচনা মিলিবে না, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই। আমরা কালিদাস ও ভবভূতিকেই সংস্কৃতসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিব। একের ভাষার অসাধারণ লালিত্য ও ভাবের অনুপম মাধুর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে, অপরের ভাষার অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও ভাবের বিরাট্ ঔদার্য্য আমাদের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। উপরন্তু, ভবভূতির নাটকত্রয়ে যে 'করুণাদ্ভুতরস' দেখিতে পাই, তাহা কালিদাসাদির কাব্য নাটকেও নিতান্ত বিরল।

যাহা হউক, আজ আমরা উভয় কবির তুলনায় সমালোচনা করিতে বসি নাই। ভবভূতির নাটক যে মর্ম্মস্পর্শী করুণ রস ও বিস্ময় ভক্তির উদ্রেককারী উদাত্ত ভাবে (Sublimity) অভিষিক্ত আছে, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই, এমন সামর্থ্য, এমন সাহস আমাদের নাই। কালিদাস ও ভবভূতির মধ্যে যে একটা চরিত্রগত প্রভেদ সকল পাঠকের চোখে পড়ে, তাহা লইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

রঘুবংশের প্রারম্ভে ও শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনায় কালিদাস বিশেষ সৌজন্য ও বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ভবভূতি তাঁহার নাটক-ত্রয়ের প্রস্তাবনায় একটা উৎকট দম্ভ ও অনধিকারী দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের প্রতি একটা প্রবল অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে ভবভূতির অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধার বাক্যগুলি পড়িয়া তাঁহার উপর বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, এবং কালিদাসের বিনয় ও সৌজন্যের সহিত তুলনা করিয়া বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলেন। হয় ত এই কারণেই 'পণ্ডিত'-সম্প্রদায় তাঁহার তাদৃশ আদর করেন নাই। কেন না, যে ব্যক্তি নিজের প্রতিভার, নিজের কৃত কর্ম্মের বড়াই করে, সংসারের দস্তর তাহাকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য প্রশংসা দিতেও নারাজ হয়; তাহার অহঙ্কারের এইরূপ শাস্তি না দিয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিকই কালিদাস ও ভবভূতির মধ্যে এই প্রভেদটি বড়ই বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু, এই প্রভেদের প্রকৃত নিদান কি, ইহা একবার বিচার করিয়া দেখিলে হয় না?

ভবভূতির নাটকত্রয়ের প্রস্তাবনা কয়েকটি পড়িলে, প্রাচীন যুগের নিষ্ঠা-বান্ জ্ঞানদৃপ্ত তেজস্বী 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত'-চরিত্রের একটি পরিস্ফুট চিত্র সম্মুখে দেখিতে পাই। পঞ্চতন্ত্রে দেখিয়াছি, যখন মহিলারোপ্য নগরের অমরশক্তি

নামক রাজা স্বীয় উন্মার্গগামী পুত্রগণের নীতিশিক্ষা ও চরিত্রসংশোধনের জন্য সকলশাস্ত্রপারগ 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' বিষ্ণু শর্ম্মাকে অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে অনেক বিত্তসম্পত্তি দান করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন সেই মহাতেজস্বী শুদ্ধাচারী বিদ্যাধনে ধনী 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' উত্তর করিলেন, 'আমি অর্থ লইয়া বিদ্যা বিক্রয় করিব না।' তিনি আরও আস্ফালন করিয়া বলিলেন, 'যদি ছয় মাসের মধ্যে আপনার পুত্রদিগকে নীতিশাস্ত্রপারগ না করিয়া দিতে পারি, তবে আমার নাম বদ্‌লাইয়া ফেলিব।' কি দারুণ তেজ! কি উৎকট দম্ভ! কি গভীর আত্মবিশ্বাস! ভবভূতিও এই জগতের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ নিভৃতে একান্তমনে অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যয়ন করিতেন, নিজের বিদ্যার ও প্রতিভার প্রভাবে নিজেকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ মনে মনে নিজের গৌরব অনুভব করিতেন; কখনও সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিতেন না, কখনও অর্থের বা যশের প্রত্যাশায় লালায়িত হইয়া ধনীর তোষামোদে রত হইতেন না। এই জন্য তাঁহার চরিত্রে একটা তেজস্বিতা ও কঠোরতা দেখিতে পাই।

পক্ষান্তরে, কালিদাস স্ফূর্ত্তিশীল ও মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সর্ব্বদা রাজসংসর্গে ও অভিজাতবর্গের সংসর্গে থাকিয়া তাঁহার রীতিপ্রকৃতি ও চালচলন মার্জ্জিত ও সংযত হইয়াছিল। কালিদাসের চরিত্রে ও রচনায় যে বিনয় ও সৌজন্য দেখা যায়, বোধ হয়, আমরা এতক্ষণে তাহার কারণ স্থির করিতে পারিয়াছি। নিজের বিদ্যা জাহির করা যে একটা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার, ইহা কালিদাস মার্জ্জিতরুচি অভিজাতবর্গের সংসর্গে বসবাস করিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ভাষায় কোথাও বাহাদুরীর চেষ্টা বা জাঁকের চিহ্ন দেখা যায় না। আরও এক কথা, কালিদাসের কবিত্বশক্তিলাভ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাতে অন্ততঃ এটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, তিনি অবিরত অধ্যয়ন করিয়া কঠোর সাধনার বলে পণ্ডিত ও কবি হইয়া পড়েন নাই; দৈবশক্তিতে, সরস্বতীর বরে, অর্থাৎ নৈসর্গিক প্রতিভার বিকাশে, তিনি ভাবুক ও কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ লোকের মনে ও মুখে অহঙ্কার স্থান পাইতে পারে না।

শেক্ষপীয়রের সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করা একটা 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যদি সেই তুলনার অবতারণা করি, তবে সেটা বোধ হয়

অভিজাতগণের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তাঁহাদের সংস্পর্শে শেক্ষপীয়রের রুচি মার্জ্জিত হওয়াতে তাঁহারও নাটকসমূহে কোনওরূপ অহঙ্কারের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনিও অবিরত অধ্যয়ন করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন নাই, নৈসর্গিক প্রতিভার বিকাশেই শ্রেষ্ঠ কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই তাঁহার রচনার কোথাও জাঁকের চিহ্ন দেখা যায় না। তাঁহার সমসাময়িক নাটককার বেন্ জনসনের সহিত তাঁহার তুলনা করিলেই, আত্মাভিমান ও বিনয়ের এই প্রভেদ বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

কালিদাস নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভার অস্তিত্ব যে একেবারেই জানিতেন না, বা বুঝিতেন না, এমন নহে। তবে তিনি শিক্ষা ও সহবতের গুণে সেই ভাবটা চাপিয়া রাখিতে পারিতেন। তাই সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, নিজের চেষ্টাকে বামন হইয়া চাঁদে হাত, খুঁড়িয়ে বড় হ'তে যাওয়া, ভেলায় চড়িয়া সমুদ্র পার, ইত্যাদি ভাবে খাটো করিয়া দেখাইয়াছেন, সূত্রধারের মুখ দিয়া 'আপরিতোষাদ্ বিদুষাম্' বলিয়া সভা মাৎ করিয়াছেন। কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, কালিদাসও যে নিজের আদর বুঝিতেন না, এমন নহে; তাহার প্রমাণ ঐ শ্লোকেই রহিয়াছে,—'বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ'। অথচ এমন কায়দা করিয়া কথাটা বলিয়াছেন যে, উহা সহজে ধরা পড়ে না, এবং উহাতে কাহারও মনে তাঁহার অহঙ্কারের জন্য বিরক্তির উদ্রেক হয় না।

কিন্তু ভবভূতি রাজসভাসুলভ ভব্যতার ধার ধারিতেন না, সভ্যসমাজের আদব কায়দা জানিতেন না, শিষ্টতার ফেরফার বুঝিতেন না; তাই মনের অহঙ্কার মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন। সেই অধ্যয়নরত 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' সমাজে সাধারণ লোকের সঙ্গে বড় একটা মিশিতে পারিতেন না, সাধারণ লোকের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধিতে, জ্ঞানে ও প্রতিভায়, তাঁহার কতটা তফাৎ, তাহা বেশ পদে পদে অনুভব করিতেন, সুতরাং একটা উৎকট অহঙ্কারের ভাব মনে মনে পোষণ করিতেন। সংসারে এক এক জন নিভৃতবাসী recluse প্রকৃতির লোক আছেন, তাঁহারা মিশুক বা সামাজিক প্রকৃতির নহেন। তাঁহারা সংসারের লোকের সঙ্গে বনিবনাও করিয়া থাকিতে জানেন না। ইঁহারা প্রায়ই সাধারণের প্রিয় পাত্র হইতে পারেন না। সংসার ইঁহাদিগকে আগু বাড়াইয়া গিয়া আদর অভ্যর্থনা করে না। কাযেই ইঁহাদিগের আত্মাভিমানে ঘা লাগে।

পান না, এ কথা ভুলিয়া যান, এবং কতক রাগে, কতক দুঃখে, কতক অভিমানে বলিয়া ফেলেন, আমাকে কেহ চিনিল না। ভবভূতির কথায় ও কার্য্যে আমরা এই ভাবটা বেশ দেখিতে পাই। তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তার প্রতি হতাদর সংসারের লোকের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে রচনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য, নিখিল শাস্ত্রজ্ঞান, অতুল শব্দবৈভব ও প্রভূত কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। পাছে কেহ তাঁহার রচনার এই সকল গুণ ধরিতে না পারে, সেই আশঙ্কায় প্রস্তাবনায় সেগুলির প্রতি দর্শক ও পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।* তিনি ভরতমুনির আমল হইতে প্রচলিত বাঁধাধরা নাট্যকৌশলের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে একটা নূতন পথ ধরিয়াছেন, নাট্যসাহিত্যে নূতন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন,† তজ্জন্য সমগ্র জগৎ তাঁহার স্তুতিবাদ করুক, এরূপ একটা আশা তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। আপনারা হয় ত এ সব দেখিয়া শুনিয়া হাসিবেন, কবির জাঁকের কথা পড়িয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িবেন, তাঁহার ন্যায্য

---

* বীরচরিতের প্রস্তাবনায় :—

বশ্যাবাচঃ কবেঃ কাব্যং সা চ রামাশ্রয়া কথা।
লব্ধশ্চ বাক্যনিষ্যন্দনিষ্পেষনিকষো জনঃ॥
মহাপুরুষসংরম্ভো যত্র গম্ভীরভীষণঃ।
প্রসন্নকর্কশা যত্র বিপুলার্থা চ ভারতী॥
অপ্রাকৃতেষু পাত্রেষু যত্র বীরঃ স্থিতো রসঃ।
ভেদৈঃ সূক্ষ্মৈরভিব্যক্তৈঃ প্রত্যাধারং বিভজ্যতে॥

মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় :—

যদ্বেদাধ্যয়নং তথোপনিষদাং সাংখ্যস্য যোগস্য চ
জ্ঞানং তৎকথনেন কিং নহি ততঃ কশ্চিদ্গুণো নাটকে।
যৎ প্রৌঢ়ত্ব মুদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং
তচ্চেদস্তি ততস্তদেব গমকং পাণ্ডিত্যবৈদগ্ধ্যয়োঃ॥

ভূম্না রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ
সৌহার্দ্দহৃদ্যানি বিচেষ্টিতানি।
ঔদ্ধত্যমায়োজিতকামসূত্রং
চিত্রা কথা বাচি বিদগ্ধতা চ॥

উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় :—

যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্ বশ্যেবানুবর্ত্ততে।
উত্তরং রামচরিতং তৎপ্রণীতং প্রযুজ্যতে॥

† বারান্তরে ভবভূতির কলাকৌশল ও নাটকীয় আদর্শের আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

প্রাপ্য প্রশংসা তাঁহাকে দিতে নারাজ হইবেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, কতখানি বেদনায় কবির কথা ফুটিয়াছে। মনে রাখিবেন, কবি নিভৃতবাসী, গ্রন্থপাঠরত ঋজুপ্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত। প্রতিবেশিগণ, তাঁহার সমসাময়িকগণ, তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার, তাঁহার 'চিত্রা কথা বাচি বিদগ্ধতা'র, তাঁহার 'বিপুলার্থা ভারতী'র, তাঁহার 'বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যম্'এর সমাদর করিলেন না। তাই কবি নিতান্ত আক্ষেপে, ঘৃণাভরে, দর্পের সহিত, ব্যথিত অভিমানের সুরে, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন,

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।

'আমি তোমাদের জন্য লিখি নাই। বেণা-বনে মুক্তা ছড়াই নাই।' তাহাও আবার সেই অরসিক-সম্প্রদায়কে সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন না, অবজ্ঞাসূচক (third person plural) তৃতীয় পুরুষ বহু বচন ব্যবহার করিলেন। তাহার পর আরও সুর চড়াইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন,—

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

এমন সময় আসিবে, যখন আমার সমজদার মিলিবে; অথবা এমন লোক কোথাও আছে, যে আমার গুণের মর্য্যাদা বুঝিবে। তোমরা আজকালকার আশপাশের দু' দশ জনই ত আর সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি নহ। লোক-লোচনের অন্তরালে নিভৃতনিবাসী অধ্যয়নরত জ্ঞানদৃপ্ত অমিতপ্রতিভ মিল্টনও সমসাময়িক সমাজে অনাদৃত হইয়া ঐরূপ কথা বলিয়া একদিন মন বাঁধিয়াছিলেন,—

'Fit audience find, though few.'

'I might perhaps leave something so written to aftertimes as they should not willingly let it die.'

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় এরূপ একটা উৎকট দর্প ও ব্যথিত অভিমানের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই। হয় ত কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই নাটকখানি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা, ইহাতেই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। তাই ইহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্দিহান হইতে পারেন নাই, একেবারে হাল ছাড়িয়া দেন নাই। হয় ত বার বার ধাক্কা খাইয়া কবির অন্তরে একটা তিক্ত ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। তাই পূর্ব্বের মত গলা চড়াইয়া মনের ঝাল ঝাড়িতে পারেন

নাই। এখানে সুরটা একটু নরম, কিন্তু এখানেও চাপা গলায় বেদনার কাতরোক্তি ফুটিতেছে। এখানেও সেই 'অরসিকে রহস্যনিবেদনে'র কথা, এখানেও সেই সমসাময়িকদিগের উদ্দেশে মৃদু ভৎর্সনা,—

সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতোহ্যবচনীয়তা।
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ॥

এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে সীতাদেবীর অকলঙ্ক চরিত্রের সঙ্গে কবির অতুলনীয় প্রতিভার যে একটা তুলনা ধ্বনিত হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়, কবির আত্মপ্রতিভার উপর বিশ্বাস কত দৃঢ় ও গভীর। ইহা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বস্ফীত রাজকবি শ্রীহর্ষ ও শূদ্রকের শূন্যগর্ভ আত্মশ্লাঘা নহে, ইহা বংশগৌরব ও আত্মমর্য্যাদারূপ পাষাণস্তম্ভদ্বয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের এই সামাজিক অধঃপতনের দিনেও আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজ হইতে এই মর্য্যাদা ও আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান আজও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্পী।

১

শত শিল্পী বহু-যত্নে রাজার আদেশে
বিরচিল প্রাসাদ নূতন;
মর্ম্মরপ্রাচীর 'পরে ফুল ফুটে, ফল ঝরে,
কত চিত্র, কত মূর্ত্তি বাস্তবের বেশে
শোভা পায়—নয়নরঞ্জন!
অলিন্দে স্তম্ভের সারি চিত্রবেশ নরনারী—
নয়নে করুণা, ঈর্ষ্যা, প্রণয় চঞ্চল,
শিলায় রেখেছে ধরি' স্থির—অবিচল।

২

পশ্চিমে চঞ্চল সিন্ধু মেখে, রবিকরে
ধরে নিত্য বিচিত্র বরণ;
তরঙ্গকল্লোল-ছলে পুর-বাতায়নতলে
জাগাইতে পুরজনে তূর্য্যধ্বনি করে
নিশাশেষে—গভীর গর্জ্জন।
দক্ষিণে প্রাসাদ-দ্বার আয়স কপাটে তার
তীক্ষ্ণধার শত শূল মৃত্যুবাণ প্রায়;
পূর্ব্ব দিক সুরক্ষিত সপ্ত পরিখায়।

৩

উত্তরে উন্নত শৈল এসেছে নির্ভয়
কল্লোলিত-সাগর-ভিতর;
পাষাণ-চরণে তা'র ঊর্ম্মিঘাত অনিবার
ফিরে ব্যর্থ-বেগ ঊর্ম্মি ক্রোধে ফেনময়;
কলকল উঠে নিরন্তর।
তারি পার্শ্বে পথ কাটি', ভাঙ্গি' শিলা, খুঁড়ি' মা
আসিয়াছে বহুদূর সাগরের জল—
অপগত-ঊর্ম্মিবেগ—ঈষৎ চঞ্চল।

৪

অদূরে সমুদ্রগর্ভে প্রশস্ত প্রস্তর
ঊর্ম্মিমাঝে তুলিয়াছে শির;

কিবা দিবা কিবা রাতি তরঙ্গ-গরবে মাতি
বেড়ি' তা'রে ফিরিতেছে চঞ্চল সাগর ;—
সে দাঁড়ায়ে অকম্পিত—স্থির।
তা'র 'পরে দৃঢ়কায় কারাগার শোভা পায়
নিঃসঙ্গ প্রবাসে জাগে ভীষণ-দর্শন ;
চারি পার্শ্বে তরঙ্গের গম্ভীর গর্জ্জন।

৫

সমাপ্ত প্রাসাদখানি। অন্তঃপুরে তা'র
উপবনে মন্দির মোহন ;
শিল্পিদল সুকৌশলে শিলামণিমুক্তাদলে
বিকশিত-শতদল সরসী মাঝার
রচিল সে সৌন্দর্য্য-স্বপন ;
মর্ম্মর-বেদীর গায় দীপ্তরত্ন শোভা পায় ;
শূন্য বেদী, দেবী-মূর্ত্তি নাহি তা'র 'পর।
কে রচিবে দেবী-মূর্ত্তি অনিন্দ্যসুন্দর ?

৬

আসিল তরুণ শিল্পী, রাজার চরণে
কর যুড়ি' করিল প্রার্থনা—
রাজার করুণা মাগি, এসেছি প্রসাদ লাগি'—
মাসত্রয়কাল পেলে বসিয়া বিজনে
দেবী-মূর্ত্তি রচিব, বাসনা।
যদি সে মন্দির মাঝে দেবী-মূর্ত্তি নাহি সাজে
যে শাস্তি দিবেন রাজা, ল'ব আমি তাই।
মাসত্রয়কাল শুধু—আর নাহি চাই।

৭

পড়িল সবা'র দৃষ্টি শিল্পীর উপর—
মুখে তা'র নাই শঙ্কালেশ ;
ওষ্ঠে, অধরের 'পরে কি দৃঢ়তা শোভা ধরে ;
আঁখিযুগে ফুটে তা'র কি আত্মনির্ভর !
অপেক্ষিছে রাজার আদেশ।
চঞ্চল সে সভাতল, সেই শুধু অবিচল ;
স্থির আঁখি চাহি' আছে রাজ-সিংহাসনে ;
জনতা-গুঞ্জন যেন পশে না শ্রবণে !

৮

এই শিল্পী—জানাইল রাজার স্থপতি—
করেছিল মন্দির-কল্পনা।
শুনি' তাহা নরপতি প্রসন্ন শিল্পীর প্রতি
আদেশিলা চাহি' তা'রে হরষিতমতি—
দেবী-মূর্ত্তি করিতে রচনা।
শিল্পীর নয়ন 'পরে শুধু মুহূর্ত্তের তরে
ঝলিল দামিনী-দীপ্তি—হরষ-বিকাশ।
ফিরিল আবাসে শিল্পী পরিপূর্ণ-আশ।

৯

প্রতি প্রাতে আসে শিল্পী—মন্দিরের দ্বার—
মনোরম কারুকার্য্যময়—
ধীরে ধীরে নিজকরে সাবধানে মুক্ত করে
প্রবেশিয়া অন্ধকার মন্দির-মাঝার ;
দীর্ঘদিন তা'রি মাঝে রয়।
কভু মুখ ফুল্ল তা'র কভু চিন্তা-অন্ধকার ;
ফিরে ঘরে নিবে যবে দিনান্ততপন—
লিখিয়া, মুছিয়া মেঘে বিচিত্র বরণ।

১০

সখীসাথে রাজবালা প্রভাতে, সন্ধ্যায়
আসেন সে ফুল্ল উপবনে ;
সখী সাজি ভরি' ফুলে রাখে তাঁ'র পদমূলে ;
বেদী'পরে শিল্পকীর্ত্তি দেবীমূর্ত্তি প্রায়
রাজবালা বসেন আসনে।
দেখা হ'লে দীপ্ত আঁখি ক্ষিতিতল লগ্ন রাখি'
সসম্ভ্রমে যায় শিল্পী কার্য্যে আপনার।
কুমারী ফিরেন ধীরে আবাসে তাঁহার।

১১

দুই মাস গেল কাটি' ; তিন মাস যায়,—
লোকে করে কত কানাকানি ;—
অদৃষ্ট বিরূপ যা'র কে রক্ষিবে তা'রে আর ?
প্রগল্ভ তরুণ শিল্পী মাতি' দুরাশায়
রাজরোষ শিরে নিল টানি'।

কেহ করে উপহাস, কেহ হাসে মৃদু হাস ;
কে কবে শুনেছে কোথা বসিয়া বিরলে
ধ্যানমগ্ন শিল্পী রচে মূর্ত্তি সুকৌশলে ?

১২

শেষ দিন আসি' শিল্পী রাজার সভায়
নিবেদিল সংবাদ তাহার—
আজ দিবাশেষ হবে দেবীমূর্ত্তি শেষ হ'বে,
প্রভাত উদিবে যবে তরুণ শোভায়,
খুলি' দিব মন্দিরের দ্বার।
এ চাহে উহার পানে, কি ঘটে কেহ না জানে,
তিরস্কার, পুরস্কার, কাল হ'বে স্থির।
কখন পোহা'বে নিশি—জনতা অধীর।

১৩

নিশাশেষ : সমুদিত তরুণ তপন :
ফুল-গন্ধ ভাসে মন্দ বাতে ;
কুসুমে শিশির-জলে রবি-কর ঝলঝলে।
আসিলা রাজার সাথে রাজপুত্রগণ,
রাজবালা মহিষীর সাথে।
মন্দিরের দ্বারদেশে নত-আঁখি—শুভ্রবেশে
ছিল শিল্পী ; মুক্ত করি' মন্দিরের দ্বার
সসম্ভ্রমে নামি' আসি' দাঁড়া'ল আবার।

১৪

প্রবেশিল দিবালোক অাঁধার মন্দিরে :
নেহারিল সবার নয়ন,—
স্থির সৌদামিনী হেন ঝলিল আলোক যেন,—
কৌশলে বিন্যস্ত শত দর্পণ প্রাচীরে
মূর্ত্তি'পরে ঢালিল কিরণ।
মর্ম্মরের মূর্ত্তি'পরে সে দীপ্ত আলোক-করে
উথলে অপূর্ব্ব শোভা, ফিরে না নয়ন ;
সৌন্দর্য্য-সুধায় মৃত্ত—মুগ্ধ হয় মন।

১৫

নিপুণ শিল্পীর যেন সার্থক স্বপন :
কি সৌন্দর্য্য অনিন্দ্যসুন্দর !
পাষাণ নয়ন'পরে কি মাধুরী খেলা করে :
অধরে স্ফুরিবে যেন অমিয় বচন !
এ কি শুধু নির্জ্জীব মর্ম্মর ?
বিস্ময়-আবেশ যবে টুটিল, বুঝিলা সবে—
রাজকুমারীর মূর্ত্তি বসিয়া বিরলে,
রচেছে তরুণ শিল্পী নিপুণ কৌশলে।

১৬

রোষে রাজা লৌহ-দণ্ড ধরি' নিজ করে
মূর্ত্তি 'পরে প্রহারিলা বলে ;
নির্দ্দয় আঘাতদণ্ডে পড়ে শিলা খণ্ডে খণ্ডে,
উৎপীড়িত শিল্প যেন কাঁদি' আর্ত্তস্বরে
গতপ্রাণ পড়ে ভূমিতলে।
মূর্ত্তি-শোকে দুঃখে ভাসি' মৌন শিল্পী ; রক্ষী আসি'
বন্দী করি' পরাইল আয়স-শৃঙ্খল।
কুমারী ফিরিলা ঘরে, আঁখি ছল ছল।

১৭

জ্যোৎস্না রাতি ; বিচরিছে ফুল-গন্ধ মাখি'
বসন্তের প্রথম পবন।
অন্তঃপুরে উপবনে বসি' রাজা শিলাসনে ;
বিষণ্ণা কুমারী পার্শ্বে—নত দু'টি আঁখি
নেহারিছে রাতুল চরণ।
যে হাসি অধরে তাঁর হয়েছিল অন্ধকার
চূর্ণিলা নৃপতি যবে মূর্ত্তি বেদী'পরে,
সে হাসি ফুটেনি আর প্রবাল-অধরে।

১৮

ফিরি' গেলা গৃহে রাজা, নেত্রে তন্দ্রা আঁকা।
রাজবালা উঠিলা যখন
শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-করে হেরিলা আসন'পরে
কারাগার-কপাটের মোচন-শলাকা ;
নৃপতির ছিল না স্মরণ।
তুলি' নিলা করতলে নয়নে আলোক জ্বলে,
হারা নিধি লভি' যেন পরম যতনে
লুকায়ে রাখিলা নিজ বক্ষের বসনে।

১৯

গভীর রজনী যবে, সুপ্ত পুরজন,
শয্যা ত্যজি' উঠিল কুমারী :
নিম্নতলে অবতরি' বহু কক্ষ পরিহরি'
করিল গোপন দ্বারে অর্গল-মোচন ;—
পুরোভাগে শোভে সিন্ধুবারি।
চলিলা উত্তর মুখে যেথা স্থির বারি-বুকে
শোভে ক্ষুদ্র তরীখানি মরালীর প্রায়,—
পদতলে রক্ত ঝরে, ফিরিয়া না চায়।

২০

তরীতে উঠিলা বালা, খুলিলা শৃঙ্খল,—
তরী ভাসি' চলিল সাগরে।
তখন সাগর-নীরে মেঘ উঠে ধীরে ধীরে,
ধীরে কাণাকাণি করে তরঙ্গ চঞ্চল,
হাসিয়া লুটায় বেলা 'পরে।
ভাসায়ে তরণীখানি উর্ম্মিদল দিল আনি'
শিলাকুলে—কারাগার উর্দ্ধে শোভা পায়।
তরী বাঁধি' রাজবালা উঠিলা শিলায়।

২১

প্রহরী নিদ্রিত দ্বারে।—পশিলা কুমারী :
রুদ্ধ দ্বার হেরিলা সম্মুখে ;—
মোচন-কুঞ্চিকা ধরি' ধীরে দ্বার মুক্ত করি'
বিস্তৃত প্রাঙ্গন মাঝে প্রবেশিলা নারী ;
সুদৃঢ় সঙ্কল্প জাগে মুখে।
লৌহ-দণ্ড ব্যবধানে কক্ষে কক্ষে দৃষ্টি হানে ;
দীপালোকে এক কক্ষে নেহারিলা শেষে,—
বসি' নিশি জাগে শিল্পী দীন বন্দিবেশে।

২২

কুমারী ডাকিলা তা'রে মুক্ত করি' দ্বার ;—
উঠিল সে মন্ত্র-মুগ্ধ প্রায় ;—
প্রাঙ্গন হইয়া পার, ছাড়ায়ে উত্তর দ্বার—
আসিলা শিলার কূলে, যেথা পারাবার
তরীখানি কৌতুকে নাচায়।
দৃঢ় পদে তরী'পরি দোঁহে আরোহণ করি'
মুক্ত করি' দিলা তা'র শৃঙ্খল-বন্ধন।
নাহি লক্ষ্য কোথা তরী করিবে গমন।

২৩

ততক্ষণে লুপ্তসুপ্তি রক্ষিগণ চায়,—
বন্দী লয়ে কে যায় রমণী !
যদি সে মানবী হ'বে কেমনে পশিল তবে
জলধি-রক্ষিত এই দুর্গম কারায়—
ধূলি সম প্রাণ তুচ্ছ গণি' ?
মুক্ত কারাগার-দ্বার ! চাহে সবে বারবার ;
তরণী ভাসা'ল শেষে তরী লক্ষ্য করি' ;
তরীর পশ্চাতে ছুটে তীরবেগে তরী।

২৪

তখন উঠেছে জাগি' সুপ্ত পারাবার,
তরঙ্গে ফুটিছে ফেনরাশি।
কুমারী তরীর 'পরে পরুষ-পবন-ভরে
চঞ্চল অঞ্চল উড়ে, কৃষ্ণ কেশ ভার।
রক্ষিদল ধরে বুঝি আসি' !
জলদে ঢাকিল ইন্দু, গর্জ্জিয়া উঠিল সিন্ধু ;
ডুবে তরী ; এক সাথে ঢাকে সিন্ধুবারি
অতলে—তরুণ শিল্পী, রাজার কুমারী।

বর্ম্মা।

ইতিহাস ও সামাজিক রীতি নীতি।

ইতিহাস পড়িয়া দেখা যায়, প্রায় সকল পুরাতন দেশের অধিবাসীদেরই ধারণা যে, তাহারা দেবতা হইতে উৎপন্ন, আর সে দেশের রাজবংশ স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ-সম্ভূত। জাপানের এইরূপ বিশ্বাস,—পুরাকালে দুই দেবযোনি—ভাই-ভগিনী—স্বর্গ হইতে সেতুপথে জলময়ী পৃথিবীর জলকল্লোল দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগিনীর মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া জলে পড়িল, আর জাপান দ্বীপ সৃষ্ট হইল। সেই দ্বীপে ভাই ভগিনী স্ত্রী-পুরুষ-ভাবে রহিয়া গেলেন। এই হইতেই জাপানের রাজবংশের আরম্ভ। চীনেদেরও কতকটা এইরূপ ধারণা। সে কথা চীন প্রবন্ধে পরে বলিব। কিন্তু বর্ম্মার রাজবংশের উৎপত্তি এরূপ দেবযোনি হইতে নহে। তাহাদের শাক্যবংশ ও শাক্যসিংহ লইয়াই সব।

বুদ্ধদেবের অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে শাক্যবংশের কোনও রাজা আসিয়া বর্ম্মায় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। আর বুদ্ধদেবের পাঁচগাছি চুল লইয়াই রেঙ্গুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের মতানুসারে, তাহারা ব্রহ্ম হইতে সকলের উৎপত্তির কথা বিশ্বাস করে। তাই তাহারা নিজেরা 'ব্রহ্মা' বা 'বর্ম্মা' নাম লইয়াছে।

বর্ম্মা দেশের লোক বুদ্ধগতপ্রাণ। হিন্দুস্থান তাহাদের চক্ষে বড়ই পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের দেবতার লীলাভূমি, তাহাদের মহা তীর্থধাম। অনেকে বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আসে। রেঙ্গুনের যে বড় প্যাগোডার কথা বলিয়াছি, তাহা বুদ্ধদেবের পূর্ব্বোক্ত পাঁচগাছি চুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুই জন বণিক ভারতবর্ষ হইতে তপস্যারত বুদ্ধের নিকট হইতে ঐ পাঁচগাছি চুল চাহিয়া আনিয়াছিল। ঐ মন্দির-গঠন হইতেই রেঙ্গুনের আদি উৎপত্তি। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'আলাম্প্রা' নামক এক জন রাজা রেঙ্গুনের আসল ভিত্তির স্থাপন করেন।

আলাম্প্রা এক জন সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। বনে বনে শিকার করিয়া জীবনযাপন করিতেন। পরে অনেক লোকের নেতা হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করেন। যেখানে অভিযান করেন, সেইখানেই জয়ী হয়েন। তখন বর্ম্মা দেশ ছোট ছোট নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেখানকার রাজারা

সর্ব্বদাই পরস্পর কলহ করিতেন। ক্রমে পেগু, আরাকান, টেনিসেরিম্—সবগুলিই তিনি জয় করিলেন, শেষে শ্যামেও যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তথাকার রাজধানী তাঁহার হস্তগত হইলে, সেই স্থানেই তিনি নিজে রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই আলাম্প্রা হইতেই বর্ম্মার শেষ রাজবংশের সূত্রপাত। এ সব বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় পলাশী যুদ্ধের সমসাময়িক; অর্থাৎ,—১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

তখন আসাম, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্য বর্ম্মা রাজ্যেরই ক্ষমতাধীন ছিল। বর্ম্মার রাজগণ এই পথ দিয়া আসিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে লুট তরাজ করিতেন। বারণ করিলে কর্ণপাতও করিতেন না। এই সূত্রেই প্রথম বর্ম্মা যুদ্ধ ঘটে। Campbell সাহেব সসৈন্যে ইরাবতীর ভিতর প্রবেশ করেন। একটিমাত্র তোপের আওয়াজেই রেঙ্গুন অধিকৃত হয়। সেখানকার কেল্লাগুলি শেগুন কাষ্ঠে নির্ম্মিত ও চন্দন কাষ্ঠের কারুকার্য্যে খচিত। রেঙ্গুন অধিকার করিয়া তিনি চারি দিকে সৈন্য পাঠাইয়া দেশ জয় করিতে লাগিলেন, এবং অতি অল্প আয়াসেই সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মরাজ আমেরিকান্ পাদরী জড্‌সন্‌কে সন্ধির প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন। এই পাদরী সাহেবের কথা পরে বলিব। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াণ্ডাবু নগরে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইংরাজ আরাকান, টেনিসেরিম ও আসাম দখল করিলেন, এবং যুদ্ধের খেসারত স্বরূপ এক কোটী টাকা পাওনা ধার্য্য করিলেন। এই অবধিই রেঙ্গুন ইংরাজের করতলগত রহিল।

ইহার অল্পদিন পরেই লর্ড ড্যাল্‌হাউসীর আমলে দ্বিতীয় বর্ম্মা-যুদ্ধ ঘোষিত হয়। দাবী, ইংরাজ বণিকদের উপর ব্রহ্মরাজ অত্যাচার করিয়াছেন। অমনই প্রায় বিনা যুদ্ধে নিম্ন বর্ম্মা বা পেগু ইংরাজ দখল করিয়া লইলেন।

আবার ইহার কিছু দিন পরে লর্ড ডফ্‌রিণের সময় তৃতীয় বর্ম্মা-যুদ্ধ ঘটে। সেই হইতেই বর্ম্মার স্বাধীনতা একেবারে অস্তমিত হইয়াছে। আমার সে সকল ঘটনা বেশ মনে আছে। রাজা মণ্ডলমীন্ মরিলে তাঁহার ছেলে থীব রাজা হন। জারজ বলিয়া অনেকে তাঁহার সিংহাসন-অধিকারে আপত্তি করেন। থীব ইংরাজী জানিতেন, এবং সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। রাজ্যের প্রধানা রাজ্ঞী, তাঁহার কন্যা 'সুপেয়ালাটে'র সহিত থীবর বিবাহ দিয়া, তাঁহাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। শুনা যায়, রাজ্যারোহণ করিয়াই বিদ্রোহের ভয়ে থীব

রাজবংশের ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি অনেক আত্মীয় স্বজনকে গুপ্তভাবে হত্যা করেন। সকল অসভ্য দেশেই ওরূপ হয়—দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবও ওরূপ করিয়াছিলেন। কিছু দিন রাজত্ব করিবার পর আবার আর এক গোল উঠিল যে, শেগুন-কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী 'বর্ম্মা-বম্বে ট্রেডিং কোম্পানী'র উপর থীব অত্যাচার করিয়াছেন। ট্রান্সভাল্এ উইট্ল্যাণ্ডারদের উপর অযথা ব্যবহার উপলক্ষ করিয়াই বুয়র্ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। পরে আবার এক দোষারোপ হইল যে, থীব ফরাসী জাতির সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রুশিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে, এই অছিলাতেই তিব্বত অভিযানের আবশ্যক হইল। এইরূপ নিত্য নিত্যই ইংরেজের তরফ হইতে নূতন নূতন দোষারোপ হইতে লাগিল। তখন অপার-বর্ম্মায় নূতন হীরার খনির কথা শুনিয়া অনেক ইংরাজ বণিকই তাহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিম্বার্লির স্বর্ণ ও হীরকখনির লোভই দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ তন্ত্র আত্মসাৎ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল কারণে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ বর্ম্মা যুদ্ধ ঘটে। রেঙ্গুন দখল করিতে একটি তোপের আওয়াজ করিতে হইয়াছিল, ম্যাণ্ডালেতে তাহাও আবশ্যক হয় নাই। বাঙ্গালা জয় করিতে যেমন আঠার জন মাত্র পাঠান সৈন্যই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ ইংরাজ সৈন্যের উপস্থিতিমাত্রেই বর্ম্মা জয় সম্পন্ন হইল। থীব ও তাঁহার মহিষীকে বন্দী করিয়া মান্দ্রাজে পাঠান হইল। ইংরাজগণ সমস্ত বর্ম্মা অধিকার করিলেন। এখন এই রাজপরিবারের অর্থাভাবে যার-পর-নাই দুরবস্থা হইতেছে।

তার পর হইতেই বর্ম্মার ভাগ্যচক্র ইংরাজের হস্তেই অবস্থিত। ক্রমেই দেশের উন্নতি, লোকবৃদ্ধি, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে। প্রথম প্রথম ভারতের রাজস্ব হইতে ব্রহ্মের শাসনব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অর্থ যোগাইতে হইত বটে, কিন্তু আজকাল বর্ম্মার আর্থিক উন্নতি হওয়াতে, তাহা দিতে হয় না, বরং কিছু উদ্বৃত্ত থাকে।

বর্ম্মা ইংরাজের হাতেই স্বাধীনতা হারাইয়াছে। মুসলমান জাতি কখনও বর্ম্মা জয় করেন নাই। তাহা হইলে বর্ম্মাতেও ভারতবর্ষের মত অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে এই মুসলমান-বিজয় বর্ম্মা ছাড়াইয়া 'ম্যালে' উপকূলে গিয়া পড়িয়াছিল। সেই কারণেই 'ম্যালে'র অধি-

বর্ম্মাকে এত হীনবল দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বে বর্ম্মা নিতান্ত হীনবল ছিল না।

বর্ম্মাবাসীদের আদিম নিবাস মধ্য আসিয়াতেই ছিল। চীনের ভিতর দিয়া তাঁহারা বর্ম্মায় আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। যে সকল আদিমনিবাসী-দের পরাস্ত করিয়া তাঁহারা বর্ম্মা দেশে বাস করেন, সেরূপ অনেক জাতি এখনও বর্ম্মায় দেখা যায়। তাহার মধ্যে 'কারণ' জাতি একটি। ইঁহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, এবং সেই কারণেই সকল বিষয়েই ইঁহারা উন্নত।

বর্ম্মাবাসী পুরুষগণ অতিশয় আলস্য-পরবশ। কেবল চুরোট খাইয়া, গল্প গুজোব ও আমোদ আহ্লাদ করিয়াই সময় কাটান। ধানের চাষ বর্ম্মার একটি প্রধান ব্যবসায়,—এত বড় ধানের আড়ৎ আর জগতে নাই। প্রতি বৎসর প্রায় ২০ কোটী টাকার ধান এখান হইতে রপ্তানী হয়। কিন্তু অনেক চাষা সুদখোর মাদ্রাজী চেটীদের হাতে উৎপীড়িত। বেশী সুদে অগ্রিম টাকা ধার করিয়া তাহারা বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ম্মায় প্রায় শতকরা ৩০ জন চীনে আসিয়া বাস করিয়াছে, এবং তাহারা বর্ম্মা রমণী বিবাহ করিয়া এক প্রকার শঙ্কর জাতি উৎপন্ন করিয়াছে। ইহাতে শুনা যায়, বর্ম্মার অনেক মঙ্গল ঘটিয়াছে। তাহাদের অপত্যগণ পিতার মত পরিশ্রমী—বর্ম্মা দেশের লোকের মত অলস নহে। কিন্তু অনেক চীনেম্যান্ দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ছেলেগুলিকে লইয়া যান—মেয়েদের রাখিয়া যান। মেয়েরা বর্ম্মার মত স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ হইতে চীন দেশে গিয়া সুখী হয়েন না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, এরূপ মেয়ের সংখ্যা এত বেশী যে, কোনও বিদেশী বর্ম্মায় যাইলে তাহারা তাঁহাদের উপপত্নী হইয়া থাকিবার জন্য দলে দলে যাতায়াত করিতে থাকে। বিদেশী লোক একা বর্ম্মা দেশে বেশী দিন থাকিলে তাহার আর নিস্তার নাই।

বর্ম্মা দেশের লোক ভাল কারিগর। ঘরে ঘরে রেশমের কাপড় বোনা হয়—কিন্তু বাড়ীতে ছাড়া তাহারা সে মোটা রেশমের কাপড় ব্যবহার করে না। মিহি রেশমের কাপড় চীন হইতে আমদানী হয়—তার দামও অনেক। সাজ সজ্জার বিষয়ে তাহাদের এত বাড়াবাড়ি যে, কাপড় একবার কাচাইলে আর সে কাপড় তাহারা বাহির হইবার কালে পরিবে না—কেবল বাড়ীতেই পরিবে।

বর্ম্মা দেশের কাঠের কাজ ও গালার কাজ অতি পরিপাটী হয়। আমি কতকগুলি গালা-পালিস-করা বড় বুড় কাঠের ও ঝুড়ির থালা ও গেলাস আনিয়াছি। এক একখানির বারো আনা মাত্র দাম। যে দেখে, সেই সুখ্যাতি করে, এত সুন্দর।

বর্ম্মাবাসীর বিবাহপ্রথা আমাদের বিবাহপ্রথা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাল্যবিবাহের তো নামগন্ধও নাই। ও সব অঞ্চলের কোনও দেশেই সমাজের দারুণ অনিষ্টকর উক্ত প্রথা নাই। দিন ক্ষণ দেখিবার ভার সর্ব্বত্রই আমাদের দেশের মত দৈবজ্ঞের উপর ন্যস্ত; তবে বর কনের হাতেই পরস্পরে বাছিয়া লইবার ভার। চীন বা জাপানে কিন্তু এমন নহে। সে সকল দেশে আমাদের দেশের মত বাপ মা যাহাকে পছন্দ করিয়া দিবেন, তাহার উপর কাহারও কথা নাই। আমাদের দেশের মত বর্ম্মার বর কনের বাড়ী গিয়া বিবাহ করেন। চীনে ও জাপানে কনেকে বরের বাড়ী সমারোহের সহিত আনাইয়া বিবাহ হয়। বর্ম্মায় স্ত্রীলোকের ক্ষমতা এতই বেশী যে, বিবাহের পর জামাতাকে অন্ততঃ কিছুদিন শ্বশুরঘর করিতেই হয়। ধূলাপায়েই কেহ কেহ দুই তিন বৎসর থাকেন। কেহ কেহ বা শ্বশুর-বংশের নাম লইয়া চিরকালই পোষ্যপুত্রের মত শ্বশুর-ঘরে থাকিয়া যান। এক জন জাপানীর নিকট শুনিয়াছি, জাপানেও এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে। কিন্তু চীনে স্ত্রীই শ্বশুর-ঘরে ক্রীতদাসী হয়েন।

এ সকল দেশের মধ্যে কোনও দেশেই বিবাহ ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। সামাজিক চুক্তিমাত্র। ইচ্ছা করিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। স্ত্রীর এ বিষয়ে স্বাধীনতা বর্ম্মা দেশে অত্যন্ত অধিক। শুনিয়াছি, স্বামীর বালিসের নীচে পান সুপারি গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া যাইলেই হইল। পঞ্চায়ৎ বিবাহ-ভঙ্গ-বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের এত স্বাধীনতাসত্ত্বেও বহু-বিবাহ যে কিরূপে প্রচলিত হইল, বুঝা যায় না।

ভূতে পাওয়া, ভূত ঝাড়ানয় বিশ্বাস ও সকল জাতিতেই আছে। প্রসব-কালে বর্ম্মা দেশের স্ত্রীলোকের যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না। কুসংস্কারপূর্ণ সকল পুরাতন দেশেই যেমন হইয়া থাকে, নীচ শ্রেণীর দাইদের হাতে সে সব ভার ন্যস্ত। পুরুষদের সে বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার নাই।

আবার ভূত তাড়ানও বটে। সে অসহ্য তাপে কি যন্ত্রণায় যে সময় কাটে, তা বুঝান যায় না; সাত দিন এইরূপ থাকিবার পর অষ্টম দিবসে তাহাকে 'ভেপার বাথ' অর্থাৎ গরম বাষ্পের 'ভাপরা' দিবার পরেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করান হয়। তাহাতে যে কত শিশু ও কত প্রসূতি মারা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের মত এইরূপ প্রথা এখনও অন্ধভাবে অনুসৃত হইতেছে।

ও সকল দেশেই আহার, ভাত ও মাছ। বর্ম্মা দেশে পচা মাছ চাট্‌নির মত ব্যবহৃত হয়; তাহাকে 'নাপ্পি' বলে। নাপ্পি বর্ম্মানের জিহ্বায় উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। রাঁধা ভাত ও তরকারী ফেরি করিয়া বিক্রয় হয়। আমাদের দেশের মত ও সকল রাঁধা খাদ্যদ্রব্য অস্পৃশ্য 'সকড়ি' বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্ম্মাবাসী সচরাচর মাটিতে উপু হইয়া বসিয়া হাত দিয়া আহার করে। চীনের প্রথা,—টেবিলে বসিয়া চপ্‌ষ্টিক দিয়া আহার করা। আহারান্তে বর্ম্মিজরা আমাদের মত হস্ত মুখ প্রক্ষালন করে। আহারের সহিত পানীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা ও সব দেশের কোথাও নাই। সকলেই সময়ান্তরে চা খায়। দুগ্ধ-পান প্রচলিত নাই। চুরোট বা তদ্রূপ কোন না কোন দ্রব্য সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে ধূমপান করে। বর্ম্মা ও মালয়ে পান সুপারী খায়। আফিন-সেবন জাপান ছাড়া অল্পবিস্তর সকল দেশেই প্রচলিত আছে।

স্ত্রীলোকের চুল রাখা সকল দেশেরই প্রথা, তবে মঙ্গোলিয়ান জাতির মত অত চুলের আদর আর কোন জাতিই জানে না। তাদের যেমন গোঁফ দাড়ি প্রভৃতি অন্যত্র চুল বড় জন্মায় না, তেমনই মাথার চুল সোজা ও বড় লম্বা হয়। পৃথিবীর কোন জাতির লোক এই সকল জাতির মত কেশের এত পারিপাট্য করে না। তারা চুলের সজ্জা লইয়াই সারাদিন ব্যস্ত।

বর্ম্মাজাতির পুরুষরাও বড় বড় চুল রাখে। বর্ম্মান্ সব চুলগুলি রক্ষা করে। চীনে মাথার মাঝে লম্বা বিনানী রাখে মাত্র।

স্ত্রীলোকের পায়ে গহনা নাই, যা কিছু আছে কানে, হাতে ও মাথায়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই চটি জুতা পায়ে দেয়। সকলেরই ঢলঢলে পোষাক পছন্দ। কাপড় চোপড়েই তাহাদের সজ্জার বেশী ভাগ দৃষ্টি। স্তনের উপর অবধি আঁটিয়া লুঙ্গি পরে বলিয়া, স্বাধীনভাবে চলা ফেরার ব্যাঘাত হয়। সেই কারণেই

বর্ম্মা জাতি অলস, এবং আমোদ ও সজ্জাপ্রিয়। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না। সেই জন্য অনেক সংসারেই লোকে ঋণগ্রস্ত। নাচ, গান, যাত্রা ইত্যাদি প্রায়ই হইয়া থাকে। ভেড়ার লড়াই, মুরগীর লড়াই, নৌকার বাচ খেলা সচরাচর দেখা যায়। তাহাদের দেশ ধনধান্যে পূর্ণ। আশ্রয়স্থান-নির্ম্মাণের জন্য শেগুন কাঠ ও আহারের জন্য চাউল অনায়াসে অপর্য্যাপ্ত জন্মায়। আহার ও আশ্রয়স্থান, এই দুইটি জীবনধারণের প্রধান আবশ্যক দ্রব্যের এত সহজে যোগাড় হয় বলিয়াই তাহারা এত অলস হইয়া পড়িয়াছে।

সকল দেশেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও এরূপ ঘটিয়াছে। তাই দেশ এত রত্নপ্রসূ হইলেও বর্ম্মাবাসী এখন আর তত লাভবান নয়। অধিকাংশ লাভই বিদেশী ব্যবসাদার ও সুদখোরের হাতে যায়।

বর্ম্মা দেশে সচরাচর শবদেহ গোর দেয়, এবং ফুঙ্গীদের শবদেহ দাহ করা হয়। আমাদের দেশে যেমন অশৌচ-পালন-রূপ একটি নিয়ম পালন করিতে সকলেই বাধ্য, ও সব দেশেও সেইরূপ। ঐ সময়ের জন্য আহার ও পরিধেয় সম্বন্ধে বাঁধা নিয়ম আছে। আত্মীয় বুঝিয়া অশৌচের দিন বাড়ে, কমে; সে সময়ে নিরামিষভোজনই কর্ত্তব্য। স্ত্রী মরিলে অশৌচ কম, স্বামী মরিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাপ মায়ের জন্য অশৌচ স্বামীর অশৌচের মত; তিন দিন নহে। আমাদের দেশে যেমন অশৌচ অবস্থায় সাদা ধুতি পরিধেয়, ও সকল অঞ্চলে সর্ব্বত্র সেইরূপ সাদা রঙ্গই শোকপ্রকাশের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইউরোপে কিন্তু সাদা রঙ্গ শোকব্যঞ্জক নহে।

বর্ম্মায় প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাউল ও শেগুন কাঠ। তাহা ছাড়া হীরার খনি ও বর্ম্মা-অয়েল নামক কেরোসিন-জাতীয় এক প্রকার খনিজ তৈলও পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এত থাকিতেও বর্ম্মা জাতি অতি গরীব। আলস্য ও অবিবেচনাই তাহার প্রধান কারণ। বর্ম্মারা কিন্তু কাঠের কাজে ও গালার কাজে উৎকৃষ্ট কারিগর। রেশমের ও বর্ম্মা চুরোটের অল্প বিস্তর কারবার চলে। আমি এ সকল জিনিসের কিছু কিছু নমুনা আনিয়াছি।

বর্ম্মাবাসীরা তাড়ি খায়,এবং মাতলামি করে। কিন্তু চীন দেশে অমন দেখি নাই। সকল দেশের সব পাপ-অভ্যাসগুলি বর্ম্মাবাসীরা আজকাল অনুকরণ করিয়াছে। শুনিলাম, তাদের দেশে মদ বা আফিন কিছুরই এত প্রচলন ছিল না। এখন চীনেদের কাছ থেকে আফিম্ ও পাশ্চাত্য জাতির ও ভারত-বাসীর নিকট মদ খাইতে শিখিয়াছে। একটা তাড়িখানার কাছে

দাঁড়াইয়া কতকগুলি লোকের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিলাম। তারা অতি অশ্লীল ভঙ্গী করিয়া আমায় ভেঙ্গচাইতে লাগিল! কিন্তু চীন দেশে কত আফিম্ খাবার আড্ডায় গিয়াছি, তারা কেহ কিছু বলে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষ বর্ম্মাবাসীর তীর্থস্থান। অনেক যাত্রী বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আসেন। আমি যখন দেশে ফিরিতেছি, তখন কতকগুলি ভদ্রবংশীয় স্ত্রী ও পুরুষ তীর্থ করিতে আসিতে-ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অনুসন্ধান করিতেন,—আমার কতগুলি ছেলে মেয়ে। ছেলে মেয়েতে আমাদের ঘর ভরা, এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। আমি চীন দেশেও এই পরিচয় পাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে অশেষ আনন্দ অনুভব করিতে দেখিতাম। বৃদ্ধারা স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিতেন; তাঁহাদের প্রথম প্রশ্নই এই। অল্পবয়সীরা শুনিতে চান, অথচ মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না,—প্রশ্ন করিবার অবসরের জন্য অপেক্ষা করেন; অথবা অন্যের মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে চেষ্টা করেন। বিবাহিত ও ছেলেপুলে হইয়াছে জানিলে যেন একদল-ভুক্ত মনে করেন, এবং মিশিবার স্বাধীনতা আরও বাড়ে। ছেলেপুলের কথা শুনিলে সকল দেশের স্ত্রীলোকেরই আনন্দের সীমা থাকে না, পুরুষদের আনন্দ অতটা বেশী বলিয়া মনে হইত না। সকলেই ছোট ছেলে ভালবাসে। আমিও যখন অন্যের ছেলেকে আদর করিতাম, স্পষ্ট বুঝা যাইত, তাদের মা বাপের মনে আনন্দ উথলিয়া উঠিত।

জীর্ণ পর্ণকুটীর হইতে বাহির হইয়া এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বর্ম্মা আমার নিকট ভিক্ষা চাহিল। তার ছেলেটিও বাপের দেখাদেখি এসে হাত পাতিল। তার শরীরে কোনও রোগলক্ষণ নাই। তার স্ত্রীকেও দেখিলাম। গরীব হইলেও বেশ ভূষা স্বামী অপেক্ষা অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার সঙ্গে রৌপ্য মুদ্রা ছাড়া আর কিছু ছিল না। দিতে ইতস্ততঃ করিয়া একটি ক্ষুদ্রতম রৌপ্যমুদ্রা কুষ্ঠীর হাতে দিলাম। হিন্দীতে বলিলাম, দু জনে ভাগ করে নিও। ছেলেটি হাতে না পেয়ে বড়ই বিষণ্ণ হইল। জাহাজে ফিরিয়া আসিয়াও মনে হইতে লাগিল, তার হাতে কিছু দিয়া আসি।

মন্দিরে এক জন স্ত্রীলোক তাঁর ছোট ছেলেটিকে জানু পাতিয়া বসিয়া উপাসনা করিতে শিখাইতেছিলেন। আমার সে দৃশ্য বড়ই ভাল লাগিয়া-ছিল। ছেলেমানুষের ভাবে ও আধ-আধ কথার স্বরে যেমন এক স্বর্গীয়

ভাব প্রকাশ পায়, তারও প্রত্যেক অবয়বে প্রত্যেক কার্য্যে সেই ভাব পরিস্ফুট।

বর্ম্মার দোকানে জিনিস কিনিতে গিয়া অন্যত্র জিনিস কেনার মত অত বিরক্তি বোধ হয় না। বোধ হয়, তাহার একটি কারণ, স্ত্রীলোকেরা বেচে বলিয়া। চীনে দেখিতাম, এক জন পুরুষ দোকানী পাঁচ ডলার মূল্য বলিয়া দশ সেণ্টে জিনিস বেচে। এত ঠকাইবার প্রয়াস! কিন্তু বর্ম্মার দোকানে স্ত্রী-লোকেরা প্রায় ঠিক ঠিক দাম বলে। বেশী দর দস্তুর করিতে হয় না। অসহায় বিদেশী বলিয়া স্ত্রীলোকসুলভ করুণ ভাব তাদের ব্যবহারেও দেখা যায়।

একটি ছাউনিওয়ালা বাজারে কিছু জনতা দেখিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি লোক জড় হইয়া কিসের মীমাংসা করিতেছে। এত লোক, তবু গোল নাই। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আরও গোলমাল শুনা যাইত। একটি নম্রমুখী যুবতীর সম্মুখে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিল। যুবতী নিজের দোকানে বসিয়াছিলেন, নীচের একটি দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ বর্ম্মণ যেন মর্ম্মাহতের মত বসিয়া ছিল; তার পাশেও অনেক লোক। একটি সুরাতী মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে? শুনিলাম,— এই যুবতীটি বৃদ্ধের স্ত্রী, হালে বিবাহিতা। রমণীটির সহিত দোকানে প্রত্যহ এক বর্ম্মা যুবক আসিয়া অনেকক্ষণ অবধি গল্প করে— রমণী তাহাকে চুরোট উপহার দেন। বৃদ্ধের প্রথম পক্ষের ছেলে দুপুরবেলা ভাত দিতে আসিয়া দেখিয়া গিয়া বাপকে বলিয়াছে। তাই বৃদ্ধ, ব্যাপার কি, ভাল করিয়া জানিবার জন্য, নিজে আসিয়াছে। তার মুখের ভাব বড়ই কষ্টব্যঞ্জক— প্রতি-শোধেচ্ছার মত প্রচণ্ড ভাব নহে। যেন সন্দিগ্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতেছে, কেন এমন অসময়ে এমন হলাহল পান করিলাম। যুবতী নম্রমুখী, কিন্তু অনুতপ্তা বলিয়া মনে হইল না। তার যেন প্রধান ভয়, এ সব গোলমাল শুনিয়া যদি সে বর্ম্মা যুবক আর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না আসে! নয় ত প্রণয় ক'রে পা বাড়াতে কাতর, এমন ভাব তাহার ছিল না। সে যেন মনে মনে সবাইকে মিনতি করছিল,— যে ছায়াতরু সে আশ্রয় করেছে, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা না হয়। স্ত্রীলোকেরা তার দোষ ঢাকিয়া তার পক্ষ-সমর্থন করিতেছিল। সকল পুরুষদেরই বৃদ্ধের জন্য টান। কে জানে কেন, বৃদ্ধের জন্য আমার অণুমাত্রও সহানুভূতি হইল না। অবিবেচনার কার্য্যে,

এক দিন যখন লেক্‌পার্ক দেখিতে যাইতেছিলাম, রাস্তায় একটি আধবয়সী বর্ম্মা রমণী কাঁদিতেছিল। তাকে দু জন লোক সাবধানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে বড়ই আকুলভাবে কাঁদিতেছিল। কাঁদ্‌ছে, ইহা বুঝিতে আর ভাষা জানা আবশ্যক হয় না; তবে কি জন্য ও কাহার জন্য কাঁদিতেছে, জানিবার জন্য আমার ঘোড়া গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে জানিয়া বলিল, সর্পাঘাতে উহার ছেলে মরিয়াছে, তাই কাঁদিতেছে। কান্নার বুলি,—"তুমি গেলে আমি রহিলাম, তোমাকে আর ঘরে গিয়ে দেখতে পাব না, সে ঘরে কেমন ক'রে থাক্‌বো ?" ঠিক কি আমাদের দেশের মত কান্নার বুলিটি! তার সঙ্গীরাও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বুঝাইতেছে। ঠিক কি আমাদের দেশের মত! পথে যে দেখিতেছে, যে শুনিতেছে, সেই চোখের জল ফেলিয়া যাইতেছে। ঠিক কি আমাদের দেশের মত!

শ্রীইন্দুমাধব।

খেয়ালী সভার চিঠি।

মাননীয় সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আমরা, খেয়ালী সভার সভ্যগণ, অদ্য একটি আবেদন লইয়া মহাশয়ের নিকট উপস্থিত। ভরসা করি, আমাদের প্রস্তাবের অনুমোদন ও আমাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া সভাকে চরিতার্থ করিবেন।

আমরা সর্ব্বদাই খেয়াল দেখি, এবং মাঝে মাঝে 'খোয়াব' দেখি। আমরা কোন প্রকার নেশা করি না সত্য, কিন্তু একবারে সব নেশা পরিত্যাগ করিলে পাছে মহাদেবের অপমান করা হয়, এই ভয়ে প্রত্যহ বিকালে আমরা সকলেই কিঞ্চিৎ সিদ্ধি পান করিয়া থাকি। সিদ্ধিতে খেয়ালও দেখি, এবং আবকারী রাজস্বের মাত্রাও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, আমাদের রাজভক্তি দেখাইবারও সুবিধা হয়। সংসাররূপ দই মন্থন করিয়া তাহার মাখনটুকুর জন্য সর্ব্বদাই আমরা লোলুপ। নিজেদের খেয়ালে সর্ব্বদা আমরা এতই ভোরপুর যে, অন্য লোকের ছল ধরিবার বা তাহাদের কার্য্যের ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার জন্য কখনও আমাদিগকে মাথা ঘামাইতে হয় না। আমরা

ফাঁকি দিবার চেষ্টা কখনও করি না। আমাদের খেয়ালে বেসুর বড় একটা দেখিতে পাইবেন না ; তবে সুরের ঢং ওস্তাদি নাও হইতে পারে। কিন্তু কোনও গতিকে যদি কখনও একটা নূতন খেয়াল আমাদের মস্তকে প্রবেশ করে, তাহা হইলে উহাকে আমরা সহজে মস্তিষ্ক হইতে তাড়াইতে পারি না। সুতরাং আমাদের সভার বিশেষ অধিবেশনে যে মন্তব্যটি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা মহাশয়কে জানাইতে ইচ্ছা করি।

আজকাল 'আত্ম-জীবনী' লিখিবার প্রবাহ বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 'আত্মজীবনী' লিখিবার এতটা বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি দেখিয়া আমরা ভীত ও দুঃখিত হইয়াছি। কেন না আমাদের বিশ্বাস যে, আত্মজীবনী লেখা কেবল আমাদের মত খেয়ালী লোকদেরই উচিত। কারণ, আমরা লোকসমাজে বড় একটা বাহির হই না ; লোকেও বড় একটা আমাদের চেনে না। অথচ আমাদের মত মূল্যবান ও আদর্শজীবনের ঘটনাগুলি না লিখিলে, সাধারণের শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তাই আমাদের ভয় হয় যে, অন্য সকলের 'আত্মজীবনী'তেই যদি মাসিকপত্রিকার সব পাতাগুলি পুরিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের 'জীবনী' প্রকাশ করিবার স্থান কোথায় রহিল।

আমাদের প্রথম আবেদন এই যে, প্রত্যেক মাসে আপনার পত্রিকার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা আমাদের 'আত্মজীবনী'র জন্য যদি ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমরা মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে বাঁধা থাকিব, এবং সভা হইতে আপনি যাহাতে প্রত্যহ বিকালে নিয়মিতরূপে এক ভাঁড় করিয়া সিদ্ধি পাইতে পারেন, (অবশ্য যদি অনুমতি করেন) তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমাদের ভয় হইতেছে যে, আপনি বোধ হয়, এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। আপনি ভাবিতে পারেন যে, আমাদের 'জীবনী' পড়িয়া জগতের এমন কি উপকারের সম্ভাবনা? কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, আপনি আমাদের যে চক্ষে দেখিতেছেন, আমরা কিন্তু নিজেদের ঠিক সেই চক্ষে দেখি না। যখন আয়নার সাহায্যে নিজে মুখ দেখা যায়, তখন কাহারও বোধ হয় খারাপ লাগে না। অন্যে যাহার নাককে 'খ্যাঁদা' বা 'চ্যাপ্‌টা' বলে, সে নিজে আয়নায় মুখ দেখিয়া বলিবে, 'কৈ, এমন কি খ্যাঁদা নেহাত মন্দ ত নয়?"

যা হোক, যদি প্রথম আবেদনটি অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের আর একটি প্রস্তাব আছে। আমরা আপনার 'সাহিত্যে'র পুরাতন গ্রাহক।

হইলে অত্যন্ত সুখী হইব। আজকাল রাস্তায় ঢের 'হ্যাণ্ডবিল' বিতরণ করে, সেগুলি যদি একটু পরিশ্রম করিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া দেন, তাহা হইলে আপনার লিখিবার কাগজের অভাব না হইবারই কথা। 'আত্ম-জীবনী'টা ঐ কাগজগুলির পৃষ্ঠায় বেশ সুচারুরূপে মক্স করিতে পারেন। কালি কলমের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে আমাদের সভা হইতে একটি কলম ও এক দোয়াত কালি কিছুদিনের জন্য ধার দিতে পারি। আর আবশ্যক হইলে চাঁদার খাতা আমরা খুলিতেও প্রস্তুত আছি। সুতরাং 'আত্মজীবনী'তে প্রত্যেক মাসে 'সাহিত্যে'র পাঁচ সাত পৃষ্ঠা পূরণ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার না হইতে পারে। তবে আপনার 'বালকজীবনী' 'সাবানপিচ্ছিল' না হইয়া হয় ত 'তৈলপিচ্ছিল' হইতে পারে। নর্দ্দামার বর্ণনা হয় ত অতিরঞ্জিত ভাষায় না করিতে পারেন। শৈশবের দুই একটি 'লজ্জারাঙা' আচরণে (যথা গোয়ালঘরে লুকাইয়া তামাক খাইতে শেখা ইত্যাদি)* হয় ত আপনি লজ্জায় মাটি হইয়া যাইবেন। ঐ আচরণগুলি 'ছাঁকা' না দিয়া হয় ত দাগা দিয়া থাকিবে। যদিও ঐ আচরণগুলি কিসে অন্যায়, তাহা হয় ত অত অল্প বয়সে না 'তলাইবার'ই অধিক সম্ভাবনা ; যদিও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থাটা স্বহস্তে না করিয়া পরবর্ত্তী লেখকদের হস্তে সমর্পণ করাই পরামর্শসিদ্ধ,— তবু 'আত্ম-জীবনী' লিখিবার সাধ ত মিটিবে! অপরে যাহা করে, করুক ; যাহা বোঝে বুঝুক, আমরা কিন্তু ময়রার দোকানের ভন্‌ভনে মাছির ন্যায় আপনার 'জীবনী'র রসাস্বাদ করিতে পারিব, এমন ভরসা করি। আমরা আপনার কোন ছল ধরিব না। আপনি স্বচ্ছন্দচিত্তে সুস্থশরীরে, যাহা প্রাণ চায়, লিখিয়া যাইবেন। যাহাতে প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ চারি পাঁচ পৃষ্ঠা বোঝাই হয়, সে দিকে নজর রাখিবেন। আপনার মত লোককে আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তবে এত সুবিধা থাকিতেও যদি আপনি 'বালক-জীবনী' লিখিবার প্রলোভন যথার্থ বৈষ্ণবের মত ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা জানিব যে, আপনি নেহাত বেরসিক— আপনার প্রাণে কোনও 'সখ' নাই।

খেয়ালী সভার সভাগণ।

সহযোগী সাহিত্য।

হিন্দুদিগের পবিত্রপশু।

পি, ভি, ত্রিবিক্রম রাও জানুয়ারী মাসের "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে হিন্দুদিগের পশুপূজা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ফার্গাসন তাঁহার 'বৃক্ষ ও সর্পপূজা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন ভূখণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে পশুপূজার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তদ্ব্যতীত নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের (আমেরিকার) নানা স্থানে আজিও নাগপূজার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উভয় ভূখণ্ডের সর্ব্বত্রই প্রাচীন পশুপূজার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ভূখণ্ডের পুরাণ প্রথিত প্রাচীন আখ্যায়িকাতেও উল্লিখিত পশুপূজার স্পষ্ট নিদর্শন আছে এবং নানা স্থানে পশুপূজার প্রকৃষ্ট-পরিচয়-প্রকাশক অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত প্রাচীন মন্দিরমালা বা স্মৃতিস্তম্ভ প্রলীয়মান প্রাচীন প্রথা পদ্ধতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ষড়্‌দর্শনের উদ্ভাবক হিন্দুজাতি পৃথিবীর সভ্যেতর জাতিগণের মত আজিও পশুপূজার সাধারণ গণ্ডীসীমার অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতে পশুপূজা ও বৃক্ষপূজা একত্র প্রচলিত।

পশুদিগের মধ্যে গাভীই হিন্দুর নিকট পবিত্রতম। সুরাসুর-মথিত ক্ষীরোদসমুদ্রে যে চতুর্বিংশতি রত্নের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে গোজাতির আদি মাতা কামধেনু অন্যতম। রামায়ণে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র সসৈন্য বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, কামধেনুর প্রভাবেই, বশিষ্ঠ, আড়ম্বরের সহিত আতিথ্যসৎকারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গো-দর্শন ও গো-প্রদক্ষিণ করিলে পাপনাশ ও পুণ্যার্জ্জন হইয়া থাকে। কথিত আছে, গোদেহে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, সপ্তর্ষি, তীর্থ সকল, গঙ্গা ও অন্যান্য সমস্ত দেব দেবী অবস্থিতি করেন। মন্দিরমধ্যস্থ দেবতা সকলও যদি প্রাতঃকালে গাভীর পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়। ইহাকে বিশ্বরূপদর্শন কহে। গোপ্রদক্ষিণ ও গোজাতির পশ্চাদ্ভাগদর্শনের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প প্রচলিত আছে ঃ—একদিন দৈবক্রমে একটি গাভী গোচারণভূমি হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইয়াছিল। গাভী তাহার বৎসের সহিত সাক্ষাতের উপায়ান্তর না দেখিয়া বৎসের নিকট শেষবিদায়গ্রহণের জন্য ব্যাঘ্রের অনুমতি চাহিয়াছিল। ব্যাঘ্রও গাভীকে অনুমতি দিয়াছিল। গাভী অশ্রুপূর্ণনয়নে বৎসকে সদুপদেশ প্রদান ও নিজের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিল,—'তুমি কদাচ গোপাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিও না।' গাভী স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পুনরায় ব্যাঘ্রের সম্মুখে প্রত্যাগত হইলে ব্যাঘ্র গাভীকে সত্যপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাহার শৃঙ্গাগ্রে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিল। তদবধি গাভীগণের সম্মুখভাগ অপবিত্র। প্রসবোন্মুখী গাভীকে প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবী-প্রদক্ষিণের ফললাভ হয়। গৌতম ঋষি এই কৌশল অবগত থাকিয়া গোপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভূপ্রদক্ষিণলব্ধ্যা

গাভী হিন্দুকে 'বাহ্যাভ্যন্তরে' শুচি করিয়া থাকেন। হিন্দুর বিশ্বাস, মনুষ্যের আত্মা মনুষ্যজন্মের পূর্ব্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গো-জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। গোগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত জন্মের পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই জন্য অনেক তীর্থ-সরিতের জলে প্রস্তরময়ী শূন্যগর্ভা গোপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। যাত্রিগণ গোমুখে প্রবেশ পূর্ব্বক পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে বহির্গত হইয়া পাপক্ষালন করিয়া থাকেন। অশুচি ও অপবিত্র স্থান সকল গোর আগমনে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। গোময়লেপনে হিন্দুর দেবগৃহ পবিত্র হইয়া থাকে। সপ্তবিধ পবিত্র স্নানের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে গোময়লেপনপূর্ব্বক স্নান অন্যতম। দগ্ধগোময়-ভস্মের বিভূতি রচিত ত্রিপুণ্ড্রক শুদ্ধিবিধান করে। কারাগৃহ-প্রত্যাগত, অথবা কোনও পাপাচারী ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্তসাধনের পূর্ব্বে পঞ্চগব্য (গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি) ভক্ষণ করিতে হয়। পঞ্চগব্য ভক্ষণ না করিলে কোন ব্যক্তিই প্রায়শ্চিত্তের উপযোগী হয় না। চান্দ্রায়ণব্রত, চাতুর্ম্মাস্যাদিতে পঞ্চগব্যের ব্যবস্থা আছে। দুশ্চর চান্দ্রায়ণব্রতে পাপীকে গোময়-মধ্যস্থ অজীর্ণ ধান্যের চাউলের অন্নভোজন করিয়া ব্রতাচরণ করিতে হয়।

দুগ্ধ, ঘৃত, দধি প্রভৃতি সমস্ত পূজোপকরণ গাভী হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংস্কৃত-সাহিত্যের নানা স্থানে গাভীর পবিত্রতা কীর্ত্তিত আছে। পবিত্রতম অগ্নিগৃহও গোসাহচর্য্যে পবিত্রতর হইয়া থাকে। গোপূজা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। পূজান্তে গাভীকে গোগ্রাস দান করিতে হয়। শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পিণ্ড সকল গাভীকে প্রদত্ত হয়। গাভীর ললাটে ও পৃষ্ঠে পূজার চিহ্নস্বরূপ হরিদ্রা ও সিন্দূরবিন্দু লিপ্ত দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ জাতির মধ্যে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত বার্ষিক গোপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপালরূপে গোচারণ করিতেন। তিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রের সৃষ্ট ঝটিকাবৃষ্টি হইতে যাদবগণের গোকুল রক্ষা করেন।

বিবাহে ও শ্রাদ্ধকালে গোদান প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত। গরুড়পুরাণের বচনানুসারে মৃতাহের দ্বাদশ দিনে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে গোদান করিলে মৃতব্যক্তি অনায়াসে 'মহাঘোরে যমদ্বারে তপ্তা বৈতরণী নদী' উত্তীর্ণ হইয়া যান।

লিঙ্গায়ৎগণ প্রতিবৎসর বৃষভযাত্রা নামক গোপূজার অনুষ্ঠান করে। হিন্দু বালিকাগণ মৃন্ময় বৃষ নির্ম্মাণ করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা বৃষের পূজা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে গোধনের সংখ্যানুসারে লোকের ঐশ্বর্য্য সূচিত হইত। বৃষোৎসর্গ গোজাতির বংশবৃদ্ধির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রাদ্ধকালে ভারতের সর্ব্বত্র বৃষোৎসর্গ হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীদেবী হস্তীতে বাস করেন। কৌরবজননী গান্ধারী একবার হস্তিপূজায় পাণ্ডব-জননী কুন্তীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই ; তজ্জন্য কুন্তীর কনিষ্ঠ পুত্র অর্জ্জুন জননীর পূজার নিমিত্ত ইন্দ্রলোক হইতে ঐরাবত হস্তীকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে কার্ত্তিক মাসের কৌমুদী-উৎসবে পুত্রবধূ কর্ত্তৃক 'হস্ত্যালোক' নামক বৃহৎ দীপশিখা প্রজ্বলিত হইয়া পূজিত হয়। রামচন্দ্রের সৈন্য বানরগণ হিন্দুদিগের কর্ত্তৃক

মাধ্বাচার্য্যের উপাসকগণ বৃহৎ বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হনুমৎমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুর বাহন গরুড় হিন্দুদিগের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হয়। রবিবারের প্রাতঃকালে গরুড়-দর্শন বিশেষ সৌভাগ্যসূচক। বিনতানন্দন গরুড় দেবলোকে যাইয়া ইন্দ্রের প্রহরিবর্গকে পরাজয় করিয়া জননীর দাসত্বমোচনের জন্য অমৃত আনিয়াছিলেন।

প্রধান সর্প অনন্ত সহস্র-ফণামণ্ডিত—তিনিই হিন্দুপুরাণের অতলঃ (Atlas)। রামের অনুজ লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরাম, অনন্তের অবতার। তক্ষক ও বাসুকি সম্বন্ধেও এইরূপ নানা আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, জন্মান্তরে সর্পবধের পাপে শিশুসন্তানের অকালমৃত্যু হইয়া থাকে। মৃত গোক্ষুরা সর্পের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলে উক্ত দোষের প্রতিকার হয়। নিঃসন্তান পিতারা প্রস্তরফলকে গোক্ষুর সর্পের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। অশ্বত্থবৃক্ষতলে বা মন্দিরের মধ্যে ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাকে নাগপ্রতিষ্ঠা কহে। নাগ-চতুর্থী দিবসে ঐ প্রতিমূর্ত্তির পূজা হয়। হিন্দুরমণীগণ ঐ মূর্ত্তির উপরে দুগ্ধ ঢালিয়া দেন।

কথিত আছে যে, একটি ব্রাহ্মণবালক সর্পপূজার দিন কেতকীকুসুম চয়ন করিতে গিয়া সর্পদষ্ট হইয়াছিল। তাহার ভগিনীগণ সর্পপূজাব্রতের উদযাপন করিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করে। এই জন্য এই উৎসবকে ভাই ভাগিনীর উৎসব কহে। বল্মীকই গোক্ষুরা সর্পের বাসস্থান বলিয়া লোকে উহার গর্ত্ত পূজা করিয়া থাকে। এই পূজা করিলে শিশুগণের সর্ব্ববিধ গাত্রকণ্ডূতি নিবারিত হইয়া থাকে। কোন কোন রমণী এই পূজা-কালে কয়েকটি মরিচ ও এক-শস্যপরিমিত জলপান করিয়া ব্রতের নিয়ম রক্ষা করেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র। "বিশ্বপ্রাণ" নামক কবিতায় সাধারণের হস্তক্ষেপ করিবার উপায় দেখিতেছি না। "এ বিশ্ব-অন্তর-বাসী যে জীবন" "অন্ধকারে কাঁদে", এবং চন্দ্রাকারে হাসে", চন্দ্রাহত ভিন্ন আর কে তাহা সহজে অনুভব করিতে পারে? জীবন যে প্রহেলিকা, তাহা পৃথিবীর শৈশব হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে; যতীন্দ্র বাবু এত দিন পরে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদার "নরহরির রাজবিদ্রোহে" মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রোমান্ রমণী" উল্লেখযোগ্য। "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। প্রবন্ধের নামকরণে একটু ভুল হইয়াছে,—"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে"র পর "ও তাঁহার পরিবার" জুড়িয়া দিলে বেশ হইত। লেখক সুকৌশলে "যোড়াসাঁকোর সোনার পরিবারে"র যে স্তব করিয়াছেন, তাহা 'সোনা'র তুল্যমূল্য হইয়াছে, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত "জুলিয়াস সীজার" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে অনেক তত্ত্ব ও অনেক তথ্য আছে; "বুঝ লোক যে জান সন্ধান"। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের "ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন" পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

বঙ্গদর্শন। চৈত্র। "নৌকাডুবি" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত "ত্রিবন্ধুর" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর "জয়সঙ্গীত" কবিতায় গ্রথিত একটি বক্তৃতা। জাপানকে লক্ষ্য করিয়া উপসংহারে কবি যে উপদেশ দিয়াছেন,—

"এই ভালো, এই ভালো! আর যেন বাড়ে না পিপাসা।"

তাহা গৃহিণীর অঞ্চলবৎসল শ্যালিকার স্তুতিগায়ী বাঙ্গালী কবির যোগ্য হইয়াছে। হায় বাঙ্গালী! শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরসমুগ্ধ ভাবুকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, 'রঘুবংশে'র সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবারকার বিষয়—দিলীপের পুত্রলাভ। তাহার পরই শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় "দেশীয় মদ্য" লইয়া উপস্থিত। এই স্বদেশপ্রীতির যুগে "দেশীয় মদ্য" আদৃত হইবে, এমন আশা করা যায়। 'সিম্‌কিন'কে বর্জ্জন করিয়া—ভারতমাতার স্বাস্থ্য 'খাঁটী'তে পান করিবার সৎসাহস, কি বালিগঞ্জের বীরহট্টে বিরল হইবে? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। যাক,—"দেশীয় মদ্য" প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সফলতার সদুপায়" প্রবন্ধে বাঙ্গালা-ভাষা-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে বিদেশী রাজার উপর একান্ত নির্ভর ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বনের সাহায্যে উন্নত হইতে আহ্বান করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদে ও অন্যত্র বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রাদেশিক ভাষার অনেক ওকালতী করিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের রেজোলুউশন্ বজ্রে তাসের প্রাসাদ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গবাণীর বরপুত্র এখন ভাষার সার্ব্বভৌমিকতার পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। "সফলতার সদুপায়ে" রবীন্দ্র বাবু যেন 'খলে ঝাড়িয়া' অপূর্ব্ব মুন্সীয়ানা, তীক্ষ্ণ শ্লেষ, প্রগাঢ় রস ও তীব্র ধিক্কার ঢালিয়া দিয়াছেন। বহুকাল তাঁহার পঠিত প্রবন্ধে এমনতর বৈদ্যুতী অনুভব করি নাই! "এপার—ওপার" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর রচিত একটি কবিতা—রূপক।

প্রবাসী। চৈত্র। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" নামক সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। লেখক "সংস্কৃতভাষাজ্ঞানের প্রভাবে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি" সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করি। যাঁহারা মাতৃভাষার সেবায় প্রবৃত্ত, এবং যাঁহাদের বাঙ্গলা লিখিবার প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা ললিত বাবুর উপদেশের আলোচনা করিলে উপকৃত হইবেন। ললিত বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"ল্যাটিন বা Anglo-Saxon এর সহিত ইংরাজীর যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। * * একবারে ল্যাটিন বা Anglo-Saxon না জানিলে ইংরাজী ভাষার রীতি ও প্রকৃতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। একবারে সংস্কৃত না জানিলে যে বাঙ্গলা ভাষার সম্যক্ জ্ঞান আরও অসম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য।" আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ অসম্ভব। বাঙ্গলা ভাষার কর্ণধারগণের মধ্যে যাঁহারা দেবভাষার নাম শুনিলেও ধৈর্য্যচ্যুত হন, তাঁহারা ধীরভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করুন। ললিত বাবু 'টুলো পণ্ডিত' বা 'ইংরাজীর ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃতের ডিশ' নহেন, তিনি ইংরাজী বিদ্যার জাহাজ,—সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অনুরাগ থাকিলেও,

পক্ষপাত নাই। তিনি অপক্ষপাতে চিন্তা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আশা করি, তাহা গোঁড়ামীর ঝড়ে উড়িয়া যাইবে না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী "খোকার প্রতি" কবিতায় পিতৃ-স্নেহের 'রসান' দিয়াছেন। কিন্তু পিতৃস্নেহের দিব্য সৌরভে আমোদিত হইলেও, রচনাটির সর্ব্বত্র কলাকৌশল অক্ষুণ্ণ নাই।

"মোর সবটুকু স্নেহ গেছে নাকি নিয়ে তোর বোন!"

এই চরণে যতিভঙ্গ হইয়াছে। প্রমথ বাবুর 'লিরিকে'ও যদি এইরূপ অঙ্গবৈকল্য থাকিয়া যায়, তবে আর কাহার কাছে পারিপাট্যের আশা করিব?

"ডুবারী কি সব জলে ধরিবারে পারে কোথা তলা?"

অত্যন্ত অস্পষ্ট,—প্রথমদৃষ্টিতে এক প্রকার অর্থহীন। "শ্লোক" ও "কুহকে"র মিলনকে অগত্যা 'গোঁজামিল' বলিতে হয়। অক্ষম শিক্ষানবিশ এমনতর সাধারণ দোষে অক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু প্রমথ বাবুর ন্যায় লেখকের পক্ষে রচনার সৌন্দর্য্যসাধনে এরূপ ঔদাসীন্য ও বিতৃষ্ণা প্রশংসনীয় নহে। সকল রচনাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না,—কিন্তু উচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম সাহিত্যসাধনা, ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ঔদাসীন্য, আলস্য, বা উপেক্ষার দাস হইয়া অনেক লেখক নিজেদের রচনাকে বিবিধ দোষের আশ্রয়ে পরিণত করেন; পরিশেষে 'ম্যানারিজম্' ভিন্ন তাঁহাদের রচনায় আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সোমের সঙ্কলিত "জাপানী-ব্যায়াম-প্রণালী—জিউজিৎসু" প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—এ কথা এখন আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। নগেন্দ্র বাবু জাপানী আদর্শ ধরিয়া সেই পুরাতন সত্য আমাদের মনে প্রতিবিম্বিত করিতেছেন। এ দেশে 'জিউজিৎসু'র পরীক্ষা, প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা হইলে আমরা আনন্দিত হইব। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে মধ্যাহ্নরৌদ্রে 'প্যারেড' প্রহসনের পরিবর্ত্তে 'জিউজিৎসু' প্রবর্ত্তিত করিবার কি উপায় নাই?

অনাথা।

রামকান্ত দরিদ্রের সন্তান হইলেও বাল্যকাল হইতেই বড় বুদ্ধিমান। সাত বৎসরের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হইল। তখন রামকান্তের মা শান্তমণি জগৎ অন্ধকার দেখিল। একদিনের সম্বলও তাহার গৃহে নাই, স্বামীর কুলে এমন এক জনও নাই, যাহার গৃহে আশ্রয় লইয়া পাচিকাবৃত্তি দ্বারাও সে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে। তাহার শিশুপুত্রের মুখের দিকে চাহিতে সংসারে সে কাহাকেও দেখিল না। অগত্যা গ্রামের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, সুখ দুঃখের সহস্রস্মৃতিবিজড়িত জীর্ণ বাসগৃহখানির দিকে একবার কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, অভাগিনী পিত্রালয়ে যাত্রা করিল। রামকান্ত আর কখনও মামার বাড়ী যায় নাই। সে গরুর গাড়ী চড়িয়া একদিন সকালে পদ্মাতীরে এক নূতন গ্রামে উপস্থিত হইল। পদ্মাতীরবর্ত্তী রামজীবন-পুরে তাহার মামার বাড়ী। রামের মামার নাম ভজগোবিন্দ প্রামাণিক।

রামজীবনপুর গ্রামখানি ক্ষুদ্র। এখানে ভদ্রলোকের বাস বড় অল্প। শিক্ষিত ও ভদ্রের মধ্যে থানার দারোগা কেরামতুল্লা মিঞা ও পোষ্টমাষ্টার পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গ্রামের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দত্ত ভি, এল্, এম্, এস্, মহাশয়ের নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ-যোগ্য; কারণ, তিনি ভিন্ন দশ ক্রোশের মধ্যে আর ডাক্তার নাই।

এই তিন জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ভিন্ন গ্রামে আর যাহাদের বাস ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই দোকানদার ও কৃষক। এখানকার সামান্য একটি পাঠশালায় গ্রাম্যবালকেরা দোকান করিবার মত বিদ্যা অর্জ্জন করিত, এবং স্বরূপচন্দ্র শাহার মদের দোকানে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণের ধর্ম্মকথার আলোচনা চলিত। কেবল শনিবারে শনিবারে অপরাহ্ণ-কালে যখন ভজগোবিন্দ প্রামাণিকের কাপড়ের দোকানে "বঙ্গবাসীর গেজেট" পৃথিবীর সংবাদ বহন করিয়া আনিত, তখন তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিবার জন্য বাজারের অধিকাংশ দোকানদার সেখানে সমাগত হইত, এবং "নমো গণেশায়" হইতে আরম্ভ করিয়া প্রিণ্টারের নামটি পর্য্যন্ত পড়া হইয়া না গেলে, সে স্থানে লোকের ভীড় কমিত না। শনিবার রাত্রে ভজগোবিন্দের কতখানি তামাক পুড়িত, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; তবে ভজ-

গোবিন্দ সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক, এবং তাহার নাম ছাপার হরফে কাগজের উপর লেখা থাকে, এই দুইটি সম্মানের প্রলোভন তাহাকে এমন নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়াছিল যে, প্রতি শনিবার রাত্রে অতিরিক্ত তাম্রকূটের ব্যয়ে তাহার চিত্তে অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইলেও, সে কাগজ বন্ধ করিয়া অপব্যয়ের হাত হইতে অব্যাহতিলাভে নিশ্চেষ্ট ছিল।

ভজগোবিন্দ লোকটি কৃপণ হইলেও অনাথা ভগিনী ও অভিভাবকহীন ভাগিনেয়টিকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু ভজগোবিন্দের স্ত্রী কামিনীসুন্দরী এই দুইটি অনাহূত অতিথিকে তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। কামিনী বন্ধ্যা; তাই সে সকল সন্তানবতী নারীকেই ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত। শান্তমণি ও রামকান্তকে সে নূতন উপসর্গের মত দেখিতে লাগিল।

ভজগোবিন্দ পরম বৈষ্ণব; সেই দিন রাত্রে নামসংকীর্ত্তন শেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক একটি সুমধুর পদ মৃদুস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে সে গৃহে ফিরিয়া দেখিল, গৃহিণীর মুখ অন্ধকার; শয্যায় শয়ন করিয়া কামিনী ফোঁস ফোঁস করিয়া উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, এবং তাহার চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইয়া মলিন উপাধান সিক্ত করিতেছে। ঘরের মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া একটা মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে, আর একটা ক্ষুধার্ত্ত বিড়াল আহারের সন্ধানে মিউ মিউ করিয়া চৌকীর নীচে কাঠের বড় সিন্দুকের পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভজগোবিন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া কিছু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি কোনও অসুখ হয়েছে? ভাত রান্না হয় নি?"

গৃহিণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কহিল না, তাহার পর দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া যেন দেওয়ালকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ভাতের তোলো সিদ্ধ করিবার জন্য পঞ্চাশটে দাসী আছে কি না! মিন্সের ঢের পয়সা হয়েছে! যত রাজ্যের আপদ বালাই জুটিয়ে আনবে, আর আমাকে তাদের দানা সিদ্ধ করতে হবে! সুখের ত সীমা নেই।"

ভজগোবিন্দ বলিল, "ওহো, বোনটা এসে আশ্রয় নিয়েছে বটে! তা দুঃখ কি, তাকে আমি ব'সে খেতে দিচ্ছিনে; তোমারই একটু সুবিধে ক'রে দেব। রান্নাঘরের ভার তার হাতে ছেড়ে দাও।"

গৃহিণী এবার মাথা তুলিয়া নথ নাড়িয়া বলিল, "আহা! কি কথাই বল্লেন!

রান্নাঘরের সব ভার ওঁর হাতে দিই, আর সময়ে এক মুঠো ভাতের জন্যে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াই,'পাঁজী পুঁথি পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞি বেড়ায় গালে হাত দিয়ে!'"

ভজগোবিন্দ বলিল, "তা হ'লে আমিই উপোষ ক'রে মরি! আর তোমরা দু' দিকে দু' জন কোমরে কাপড় জড়িয়ে দু'গাছা ঝাঁটা নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধাও।"

ভজগোবিন্দকে হরিনামমাত্র সম্বল করিয়া সে রাত্রিটা অতিবাহিত করিতে হইল। হরিনামে প্রাণ মজে, কিন্তু ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না। প্রভাতে সে আপনাকে বড় কাহিল বোধ করিতে লাগিল।

২

বাড়ীতে একটি ঝি ছিল। সে দুবেলা দু' পাথর ভাত ও পূজার সময় একখানি নূতন কাপড় পাইত। সংসারের কোন কোন কাজ মাত্র করিবার ভার তাহার উপর ছিল। অর্থাৎ, অতিপ্রত্যূষে আসিয়া সে আইরি কাঠের প্রকাণ্ড সম্মার্জ্জনী পরিচালনা করিয়া গোয়ালঘরখানি পরিষ্কার করিত; কূপ হইতে জল তুলিয়া গাই গরুটার জাবনা মাখিয়া দিত; গোবর লইয়া ঘরের প্রাচীরে চাপড়ি দিত, বাজারে ভজগোবিন্দ মাছ তরকারী কিনিয়া রাখিত, সে তাহা বাড়ী লইয়া আসিত; এবং সময়ে সময়ে ধান ভানিয়া দিত। শান্তমণির ভ্রাতৃগৃহে পদার্পণের দুই দিন পরে এই ঝিটির চাকরী গেল।

সুতরাং সংসারে ঝি যে যে কাজ করিত, সেই সকল কাজের ভার শান্তমণির উপর নিক্ষিপ্ত হইল। কেবল বাজার হইতে মাছ তরকারী বহনের কাজটি তাহার পরিবর্ত্তে তাহার পুত্র রামকান্তের উপর পড়িল।

রামকান্তকে তাহার পিতা গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। সাত বৎসরের ছেলে রামকান্ত তিন চারিখানি বাঙ্গালা কেতাব শেষ করিয়াছিল। ভায়ের বাড়ীতে আসিয়া শান্তমণি একদিন ভজগোবিন্দকে বলিল, "দাদা! এখানে ত পাঠশালা আছে—রামকে পাঠশালায় দিলে হয় না?" দাদা বলিল, "পাঠশালায় দিলে ছোঁড়াগুলো বয়ে যায়, গুরুজনের কথা কানে তোলে না, বদখেয়ালী হয়। রামকে পাঠশালায় দিয়ে ওর পরকালটা নষ্ট করতে চাইনে, ও আমার দোকানে বেচাকেনা শিখুক।" কথাটা শান্তমণির বড় মনে ধরিল না। সে সজলনেত্রে বলিল, "দাদা, তাঁর মতলব ছিল, রাম একটু লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হয়।" ভজগোবিন্দ বলিল, "রামের বাবা আস্ত একটা গরু

তাই দু' পয়সা রোজগার ক'রে কোন রকমে পেটটা চালাচ্ছি।" কথাটা ভজগোবিন্দের স্ত্রী কামিনীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; সে নাসিকার অগ্রভাগ কুঞ্চিত করিয়া প্রতিবেশিনী সৌরভী দিদিকে বলিল, "মাগীর আবার বায়না দেখ! কুঁজোর চিৎ হ'য়ে শোবার সখ! উনি এখানে ভাড়া ভেনে খাবেন, আর পুত্তুর যাবেন পাঠশালে। বিদ্যে শিখে ছেলে মাকে চাকরী করে খাওয়াবে, আশাও ত কম নয়!" সৌরভী দিদি কিঞ্চিৎ সস্তায় একখানি কস্তাপেড়ে শাড়ী কিনিবার উমেদার ছিল; দোকানদার-পত্নীর মনোরঞ্জনের এমন সহজ সুযোগটি উপেক্ষা করিতে পারিল না; বলিল, "তা তো বটেই, তেমন যদি অদৃষ্ট হ'বে তো ভায়ের দোরে দুটি ভাতের জন্যে আসবে কেন? ভাগ্যে যে বোন তোরা ছিলি, দু' মুঠো দিয়ে লজ্জানিবারণ কচ্ছিস। তা নইলে যে পথে দাঁড়াতে হতো! তা বোন, তোর শরীরটেও ত ভাল নয়, আর সংসারের কাজও এমন জেয়াদা নয়, দুটো পেট বসিয়ে বসিয়ে কতদিন চালাবি? নিজের সুখ স্বস্তিও ত দেখ্‌তে হয়, রান্নার ভারটা ওর হাতে দে না কেন?"

কামিনী বলিল, "দিদি! আমি সে কথা ভেবে দেখিচি, কিন্তু বিশ্বাস পাইনে। চাল ডাল নুন তেল চুরী ক'রে যদি লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রী করে, তখন কি উপায় করবো?"

শুভাকাঙ্ক্ষিণী প্রতিবেশিনী বলিল, "ভাবনা কি লো বোন্? জিনিস এমন্ কসাকসি ক'রে দিবি, যেন কিছু সরাবার সুবিধা না পায়। তেল নুন ডাল মাছে দিয়ে বাঁচলে ত চুরী করবে?"

কামিনী দেখিল, এ পরামর্শ মন্দ নয়। পরদিন তাহার অসুখ হইল; শান্তমণিকে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, আমার আজ বড় অসুখ, তুমি আজ একবার হেঁসেলে যাবে? রান্নাবান্নার ত ঝঞ্ঝাট কিছু নেই।"

শান্তমণি বলিল, "এ আর শক্ত কথা কি! তোমার অসুখ বিসুখেও যদি তুমি পরিশ্রম করবে, তা হ'লে আমরা আছি কেন?"

কথাটার মধ্যে কিছুমাত্র অসরল ভাব ছিল না। কিন্তু অনুগ্রহপ্রত্যাশিনী বিধবা ননদের কথা বক্রভাবে গ্রহণ করিলে তেজস্বিতা-প্রদর্শনের বিশেষ সুবিধা; কামিনী সে সুবিধা ত্যাগ করিতে পারিল না। সে বলিল, "অসুখ বিসুখের খোঁটা দিচ্ছ, অসুখ কি আর কারও করে না? আমার যেমন পাপের ভোগ, পরের জন্যে দুবেলা সংসার ঠেল্‌তে ঠেল্‌তেই আমার জীবন গেল। আমার দশটা ভাই ভাইপো হাঁ ক'রে রয়েছে কি না!"

কথাটা শান্তমণির হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কিন্তু পরের আশ্রিতাকে অনেক সময় অন্যায় তিরস্কারও নীরবে সহ্য করিতে হয়। দুটি অন্নের জন্য অকারণে এ প্রকার অপমান সর্ব্বদা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিলেও, মধ্যে মধ্যে তাহার চক্ষে জল আসিত। সে অপমান বা অভিমানের অশ্রু নহে, স্বামীর আদর ও যত্নের কথা মনে করিয়া ও সেই সঙ্গে বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের তুলনা করিয়া তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুময় হইয়া উঠিত, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাকে আত্মসংবরণ করিতে হইত। আজও তাহার চক্ষু দুটি শুষ্ক ছিল না। শান্তমণি ধীরে ধীরে গৃহিণীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। কামিনী ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "কি-ই বা বলেছি? আমাকে দিলেন গাল, আবার উল্টে কান্না! এত যদি মানের ভয় ত মরতে এসেছিলি কেন এখানে? কেউ ত সেধে আনতে যায়নি। গতর খাটাতে হ'লে মরে যান্ আর কি!"

এ সকল কথা শান্তমণি শুনিয়াও শুনিল না। বাহিরের সকল কাজ সারিয়া সকাল করিয়া সে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিল; তাহার পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। কামিনী যথাসাধ্য অল্পপরিমাণ তেল লবণ চাল ডাল বাহির করিয়া দিল।

৩

শান্তমণি সেই যে পাচিকার কাজ গ্রহণ করিল, আজও করিল, কালও করিল। কামিনীর আজ জ্বর, কাল কাশী, পরশু মাথাধরা ও তাহার পরদিন বাতের বেদনা, এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু আহারে তাহার অরুচি নাই, আয়েসটাও অতিরিক্ত বাড়িয়া গেল। দেহ ক্ষীণ হওয়া দূরের কথা, হাতের অনন্ত জোড়াটা বাহুমূলে আরও আঁটিয়া বসিল। কিন্তু তথাপি পাড়ার দত্তগিন্নি শুধু হাতে কামিনীর নিকট দুই টাকা ধার করিতে আসিয়া, তাহার দেহ আধখানা হইয়া গিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না!

শান্তমণিকে দাসীর অধিক খাটাইয়া লইয়াও কামিনী তাহাকে দুটি মিষ্ট কথা বলিবার অবসর পাইত না। মাছ রাঁধিবার জন্য কামিনী যে পরিমাণ তৈল বাহির করিয়া দিত, তাহাতে অতি বড় পাকা রাঁধুনীও মাছকে না পুড়াইয়া আস্ত রাখিতে পারে না, এবং ডালে যদি লবণের ভাগ কম হইত, তবে তাহাও কামিনীর অতিসাবধানতার ফলে; কিন্তু এ সমস্তই শান্তমণির

একবার শাপাইয়া লইত, এবং তাহার গৃহিণীগর্ব্ব ষোলআনা চরিতার্থ করিত। একদিন বিড়ালে মাছ খাইয়া গিয়াছিল, তাই সেদিন কামিনীর মাসতুতো ভাই, অর্থাৎ ভজগোবিন্দের দোকানের মুহুরী কেনারামের পাতে ঝোলের অনুপাতে মাছের সংখ্যা কিছু অল্প হইয়াছিল, এই অপরাধে শান্তমণিকে অনেক কটু কথা শুনিতে হইল; কামিনী স্পষ্টাক্ষরে এ কথাও বলিল যে, বিড়ালে মাছ খাইয়াছে, এ অপবাদটা নিতান্তই অমূলক; সে একরাশি মাছ ভাতের মধ্যে লুকাইয়া তাহার পুত্র রামকান্তকে খাইতে দিয়াছে, এই জন্যই যোগ্যপাত্রে মৎস্যাভাব। ভজগোবিন্দ কিন্তু কোন দিন দুই পয়সার অধিক মাছ কিনিত না।

'মাছ' 'মাছ' করিয়া বাড়ীতে সেদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মত কোলাহল উপস্থিত হইল। দোকানে সেদিন বিস্তর মফস্বলের পাইকেড় কাপড় কিনিতে আসিয়াছিল; তাহাদিগকে বিদায় করিতে কেনারামকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইতে হইয়াছিল; প্রভাত হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া গৃহে ফিরিয়া যখন সে দেখিল,ঝোলের মাধ্যে টাাংরা মাছের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত, তখন সে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, কামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কোথা থেকে একটা আপদ এনে জুটিয়েছ—একে ত রান্নাবান্নার কিছু বোঝে না, তার উপর ভাতের সঙ্গে না আছে তরকারী, না আছে মাছ, বাপের জন্মে কখনও এমন খারাপ খাওয়া খাইনি।" কথাটা কেনারাম কেবল তাহার অর্দ্ধাঙ্গীকে শুনাইবার জন্যই বলে নাই, সুতরাং শান্তমণিও তাহা শুনিতে পাইল; গৃহিণীর উত্তরও শুনিল; কামিনী বলিল, "ঘরকন্নার যা কিছু জিনিস ছেলেটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াবে, তা মাছ তরকারী থাকবে কোথা থেকে? ছেলে ত নয় একটা রাক্ষস! দুবেলা দু' পাথর ভাত নৈলে পেট ভরে না। দুবেলা দু' মুঠো ভাতের যার সংস্থান নেই, সে কোন্ বিবেচনায় পুত্রকামনা করে?"

শান্তমণি এ কথার কোনও উত্তর দিল না। ভায়ের ভাতগুলি তাহার শয়নঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, এবং একখানি ছিন্ন মাদুরের উপর প্রসারিত মলিন শয্যায় পুত্রের পাশে শুইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। রামকান্ত তখনও ঘুমায় নাই, মা কাছে আসিয়া শয়ন না করিলে তাহার ঘুম আসিত না। সে তাহার মাতাকে শুষ্কমুখে অশ্রুসজলনেত্রে শয়ন করিতে দেখিয়া ক্ষুদ্রহস্তে ধীরে ধীরে তাহার মাতার গায়ে হাত বুলাইতে

লাগিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "মা! জল খাবিনে?" মা অশ্রু সংযত করিয়া বলিল, "না বাবা! আমার ক্ষিদে নেই।" রামকান্ত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিল, তাহার পর দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "মা! কাল থেকে আমি আর মাছ খাব না, তা হ'লে মামীমা তোকে বকবে না।" পুত্রের এই শিশুসুলভ সরল সান্ত্বনাবাক্যে শান্তমণির মনের কষ্ট যেন আত্মপ্রকাশের একটা পথ পাইল, অশ্রু-রাশি চক্ষু ছাপাইয়া তাহার গাল বহিয়া মলিন উপাধান সিক্ত করিল। রামকান্ত অঞ্চল দিয়া মায়ের চক্ষু মুছিয়া দিতে দিতে কাঁদিয়া ফেলিল, বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল, "মা! তুই কাঁদিস্‌নে; আমি বড় হ'য়ে টাকা রোজগার করব, তখন তোকে কেউ গাল দিতে পারবে না।" শান্তমণি অনেকক্ষণ নীরবে ভগবানকে স্মরণ করিল, মনে মনে বলিল, "হে নারায়ণ মধুসূদন, অভাগীর ছেলেটিকে রক্ষা কর, তার মুখের দিকে চাও, তাকে যেন আমি মানুষ করিয়া রাখিয়া মরিতে পারি, দয়াময়, আমার আর কোনও প্রার্থনা নাই।" তৈলহীন প্রদীপের শিখা ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল; তাহার পর খাবি খাইতে খাইতে দীপরশ্মি অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। শান্তমণি যে ঘরটিতে থাকিত, সেটি সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। সেই ঘরের পশ্চাতেই একটা ডোবা, এবং ডোবার ধারে কতকগুলি জঙ্গল। অন্ধকারের মধ্যে মশার দল সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া গুণগুণ শব্দে গান আরম্ভ করিল। রামকান্ত মশার দংশনে অস্থির হইয়া উঠিল। পুনঃপুনঃ কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিল, অথচ মা মনে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া কোন কথা বলিল না। শান্তমণি নিজের দেহ অনাবৃত করিয়া তাহার মলিন অঞ্চলে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল, এবং তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া, শ্রান্তিভরে শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

৪

মামার বাড়ী আসিয়া রামকান্ত বড় অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সাত বৎসর বয়সের মধ্যে সে কখন বিদেশে যায় নাই, ঘর বাড়ী ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন স্থানের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। এখানে আসিয়া সে দেখিল, পৃথিবী সম্পূর্ণ আর এক রকম। বাড়ী থাকিতে সে প্রত্যহ জামা জোড়া পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া দত্তদের হরির সঙ্গে বাঙ্গলা স্কুলে যাইত। এখানে আসিয়া সে দেখিল, যে পরিবারে সে প্রতিপালিত হইতেছে, সেখানে

দিয়া কখন কখন শ্রীচরণের সম্মানরক্ষা করিত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাহা চালের বাতায় আশ্রয় লইয়া বঙ্কিমভাবে বিরাজ করিত,—তিন চারি বৎসর ব্যবহারেও তাহা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ছিল! জামা গায়ে দিলে খৃষ্টানীভাব প্রকাশ পায় বলিয়া, ভজগোবিন্দ জামা জিনিসটা দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। রামকান্ত একদিন জামা গায়ে দিয়া বাহির হইয়াছে দেখিয়া ভজগোবিন্দ ভগিনীকে ডাকিয়া বলিল, "ও শান্ত! তোর ছেলে যে জামা গায়ে দেয়, কোন্‌দিন দেখচি ও মোচলমানের ভাত খেয়ে আসবে। বাবুগিরি টিরি এখানে খাট্‌বে না। আমার কাছে দোকান পাট করা শিখ্‌তে হবে। দোকানদারের বাবুগিরি সয় না।" রামকান্ত ছলছলনেত্রে বলিল, "মা! আমি জামা গায়ে দেব না, মামা বারণ কচ্ছে।" জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া সে মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া মামার দোকানে গিয়া বসিল।

সেখানকার বিচিত্র কোলাহল, কাপড়ের দর দস্তুর ও ক্রেতা বিক্রেতার তর্ক বিতর্ক, তাম্রকূটের ধূমকুণ্ডলী তাহার অসহ্য বোধ হইত। মামা তাহাকে এক এক দিন বিলাতী থান হইতে বড় বড় ছবি তুলিয়া দিতেন,—কোনটা ময়ূরের ছবি, কোনটা কদম্বমূলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের ছবি। ছবি লইয়া রামকান্ত মায়ের নিকট আসিয়া বলিত, "মা! এ ছবি আমাদের ঘরে টাঙ্গাব।" হঠাৎ তাহার বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া যাইত। সে মাকে জিজ্ঞাসা করিত, মা! বাড়ী যাব কবে?" মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "বড় হ, চাকরী ক'রে পয়সা আন্‌তে শেখ, তখন আমরা বাড়ী যাব।" "এখনই চ মা, আমার এখানে মন টিকচে না, ন্যাপলার জন্যে আমার বড় মন কেমন কচ্চে।" ন্যাপলা রামকান্তের এক জ্ঞাতি কাকার নয় মাসের ছেলে। রাম তাহাকে বড় আদর করিত, ন্যাপলাও রামকে দেখিলেই কচি হাত দুখানি বাড়াইয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত, এবং পথে লইয়া যাইবার জন্য রামকে ঠেলিত; রাম তাহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করিয়া তুলিত, কখনও বা তাহাকে কাঁধে তুলিয়া নাচিত, সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিলে চাঁদকে ডাকিয়া খোকার কপালে টিক দিয়া যাইতে বলিত, এবং যেদিন আকাশে নিবিড় মেঘ করিয়া প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিত, সেদিন সে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং আকাশে মেঘ বিদ্যুতের খেলা দেখাইত। সেই সকল কথা মনে করিয়া প্রবাসী বিরহী বালকের সুকোমল বেদনাবিদ্ধ

অশ্রুসজল চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে অবনত করিয়া মাটীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত।

কখন কখন তাহার উদাসীন চিত্ত তাহার মামার বাড়ীতে বা দোকানে কোথাও টিকিত না। সে পদ্মাতীরে বড় একটা বাবলা গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিত, এবং নদীর দিকে উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। রামজীবনপুরের পদতল ধৌত করিয়া পদ্মা পূর্ব্বমুখে দামুকদিয়া ঘাটের দিকে গিয়াছে। বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্নরৌদ্রে চারি দিক নিঝুম, বহুদূরে চরের উপর বালুকারাশি ঘূর্ণাবর্ত্তে কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশের দিকে উঠিতেছে। সেই চরের প্রান্ত-ভাগে কালো জল সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতেছে। তীরে সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর। শ্যামলতৃণদলশোভিত প্রান্তরের মধ্যে কোথাও বন-ঝাউর গুল্ম, কোথাও আকন্দের জঙ্গল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাবলাগাছগুলি মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে বা দূরে কোথাও ছাগল চরিতেছে, কোথাও রাখা-লেরা গরু চরাইতেছে। দুই একখানি পর্ণকুটীর মাঠের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত, তাহার চারি দিকে আম কাঁঠাল বা কলার গাছ,—ছায়ায় দুই একটি কুকুর শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। একটা নিমগাছের গুচ্ছ গুচ্ছ মুকুল হইতে সৌরভসঞ্চয় করিয়া উদাস মধ্যাহ্নবায়ু হা হা করিয়া বহিয়া যাইতেছে। মাঝিরা নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া আহারাদির পর নৌকার ছৈএর নীচে পাটাতনের উপর গামছা বিছাইয়া শয়ন করিয়াছে, কেহ জাল বুনি-তেছে। বড় বড় ঢাকাই নৌকা পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া ভিন্ন দেশে যাইতেছে, এবং অনেক দূরে রাজাপুরের কোলের কাছে পাটনা-গামী ষ্টীমারের কৃষ্ণবর্ণ ধূম চিমনীর ঊর্দ্ধ হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া ষ্টীমার-ঘাটের আরোহিগণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। বালক এই সকল দৃশ্যবৈচিত্র্যে আত্মহারা হইয়া পড়িত, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িত, মা এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া হয় ত বড় কাতর হইয়াছেন; তখন সে তাড়াতাড়ি আলের উপর দিয়া আমবাগানের পাশ দিয়া ঘোষেদের বাতাড়ের ধার দিয়া মামার বাড়ী ফিরিয়া আসিত।

৫

মামা একদিন বৈকালে বলিলেন, "যা রে রামা! রাখালীদের সঙ্গে বাগানে আম কুড়িয়ে আন। ঝড়ে অনেক আম পড়েছে।" সেইদিন মধ্যাহ্নে

তাহাতে আমের সর্ব্বনাশ হয়। বাগানের আমগুলি যে পাঁচ ভূতে কুড়াইয়া লইয়া যাইবে, ভজগোবিন্দ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বাড়ীর নিকটেই বাগান।

রাম বলিল, "মামা বলছেন, আম কুড়োতে যাব মা ?" শান্তমণি বলিল, "আর বেলা নেই, আকাশে মেঘ রয়েছে, এমন সময়ে কি বাগানে আম কুড়োতে যেতে আছে ?"

কথাটা কামিনীর কানে গেল। সে ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ উৰ্দ্ধে তুলিয়া নথটা সবেগে আন্দোলিত করিয়া বলিল, "ঝড় জলে ত মানুষ গরু সব মরে গেল! এই ত বাড়ীর কানাচে আমবাগান, পাঁচ জন লোকে কুড়িয়ে নেবে,তাই মামা বলেছে—রাখালীদের সঙ্গে গিয়ে আম নিয়ে আয়গে। তা ছেলে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস হচ্ছে না, ছেলে ত আর কারও হয় না! স্বর্গে বাতি দেবে আর কি ?"

কথাগুলি শুনিয়া শান্তমণির মনে বড় কষ্ট হইল। সে বলিল, "বৌ! তুমি অন্যায় রাগ কচ্চো। ওর শরীর একেই রোগা, তার উপর এই কালবৈশাখীর দিন, জোরে জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বচ্ছে, মেঘও লেগেছে; অতটুকু ছেলে— বৃষ্টি বাদলে ভিজলে কি বাঁচবে ? আমার ত আর কিছু নেই, ঐটুকুই আমার সম্বল, মা ষষ্ঠী যদি তোমাকে একটি দিতেন, তা হ'লে তুমি ছেলের দরদ বুঝতে।"

এবার কামিনী ভীমনাদিনী ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিল; বলিল, "ঐ অহঙ্কারেই তুমি গেলে! নিজের অন্ন জোটে না, ছেলে কাঁকে নিয়ে আমার দোরে এসে পড়তে লজ্জা করে না ? যার খাবে, তারই বুকে বসে দাড়ি উপড়োবে ? কলির স্বধর্ম্ম!"

রাম সজলনয়নে বলিল, "মা যাই, মামীমা বড় রাগ করেছে।" রাম চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। অপরাহ্নের ঝটিকায় যে মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল, তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া যেন একত্র জমাট বাঁধিল। প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। রাম একটা আমগাছের নীচে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল; বাগানের বাহিরে যাওয়াও কঠিন, দাঁড়াইয়া ভিজাও কষ্টকর। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বৃষ্টি থামিল না। সন্ধ্যার সময় রাখাল

শান্তমণি এতক্ষণ ঘর ও বাহির করিতেছিল। সে পুত্রকে কোলে লইয়া তাহার মাথা মুছিয়া দিল। শীতে রামের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সর্ব্বশরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়াছিল। শান্তমণি নিজের ঘরের মধ্যে একখানি মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর রামকে শোয়াইল; একখানি ময়লা কাঁথা দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল। কিন্তু রামের কাঁপুনি থামিল না। সেই রাত্রে তাহার বড় জ্বর হইল।

পরদিন শান্তমণি দেখিল, রামের দুই চোখ জবাফুলের মত লাল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে। ছেলেটিকে লইয়া সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না, নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আজ তাহার মনের কষ্ট বুঝিবার মানুষ কেহই নাই। শান্তমণি ছেলের কাছে বসিয়া থাকিল, তাহার মুখে জল দিতে লাগিল; আজ সে সংসারের কোনও কাজে হাত দিতে পারিল না।

কামিনীর গর্জ্জন আজ তিন গুণ বাড়িয়া গেল। সে বকিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল, "ছেলে ত পৃথিবীতে আর কারও নেই! রোগ বালাই ত আর কারও হয় না! সব তাতেই বাড়াবাড়ি!"

শান্তমণি কোন কথা বলিল না। তখন কামিনী ক্রুদ্ধভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া দুই হাত নাড়িয়া কুৎসিত ভঙ্গী করিয়া বলিল, "বলি আজ কি সংসারের কাজ হ'বে না? দশটা দাসী বাঁদী আছে না কি? দুপুর পার না হ'তেই ত এক পাথর ভাত গিল্‌তে বস্‌বে, চাল সিদ্ধ করে দেবে কে?"

শান্তমণি এবার কাতরভাবে বলিল, "বৌ, তুমি যদি ছেলের মা হতে, তা হ'লে বুঝতে পারতে, আমার মনে কি কষ্ট। ছেলের এমন অসুখ, আর তুমি আমার খাবার কথা তুলে খোঁটা দিচ্ছ! দুঃখিনী আমি, অনাথা আমি, তাই ব'লে কি এত বাক্যযন্ত্রণা দিতে হয়?"

কামিনী সক্রোধে বলিল, "কি? আমাকে তুই আঁটকুড়ী বল্লি? এত বড় মুখ! যার খাবেন, তারই কুচ্ছো করবেন। আসুক আগে মিন্‌সে, দুধ দিয়ে কালসাপ পুষচে! বাপে জমীদারী ক'রে রেখে গিয়েছে কি না, ব'সে ব'সে যত আপদকে পুষবে, আর আমাকে গঞ্জনা শুন্‌তে হবে। ছেলের মা হয়েছিস্ ব'লে বড় অহঙ্কার হয়েছে, ভগবান দর্প চূর্ণ করবেন, তেরাত্রিও যাবে না— যাবে না—যাবে না।"

৬

কামিনী সেদিন ইচ্ছা করিয়াই ভাত রাঁধিতে গেল না। রান্নাঘরে শিকল দেওয়া রহিল। মধ্যাহ্নে ভজগোবিন্দ দোকান হইতে বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, রন্ধনের কোন আয়োজন নাই, পত্নীর মুখখানি শ্রাবণের মেঘের মত অন্ধকার, ধানসিদ্ধ করিবার তোলো হাঁড়ির মত ভারি। ভজগোবিন্দ অচিরকালমধ্যেই জানিতে পারিল, ছেলের অসুখের একটা তুচ্ছ ছল ধরিয়া শান্ত ভাত রাঁধিতে যায় নাই, এবং কামিনীকে নানা রকম অকথ্য গালি দিয়াছে।

ভজগোবিন্দের মেজাজটা কিছু দমিয়া গেল। গুড় ও তেঁতুল দিয়া চিঁড়া ভিজাইয়া সে বেলা সে ভোজন শেষ করিল। কামিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কি খাইল, কেহ বলিতে পারে না। শান্তমণি মুখে জলবিন্দু দিল না। সে আশা করিয়াছিল, দাদা তাহার পুত্রের জ্বরের সংবাদ পাইয়া একবার দেখিতে আসিবেন। কিন্তু ভজগোবিন্দ সে দিকে অগ্রসর হইল না; দাওয়ায় বসিয়া গম্ভীরভাবে হুঁকা টানিতে লাগিল।

শান্তমণির প্রাণের দায়,অভিমান করিয়া থাকা চলে না; সে ভজগোবিন্দের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "দাদা, রামের কাল রাত্রি থেকে বড় জ্বর, একবার ডাক্তারকে ডাকালে হয় না?"

ভজগোবিন্দ হুঁকা হইতে মুখ নামাইয়া বলিল, "সামান্য জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে,তার জন্যে এত কুরুক্ষেত্র ব্যাপার করা কেন? ডাক্তার ডাকবারই বা কি আবশ্যক? পীতাম্বর ডাকমুন্সীর কাছ থেকে দু' পুরিয়ে কুনিয়ান কিনে পাঠিয়ে দেবো, গা জুড়োলে তাই খাইয়ে দিও।"

সমস্ত দিনের মধ্যে গা জুড়াইল না, কুইনাইনও খাওয়ান হইল না। দ্বিতীয় দিনও এই ভাবে গেল। শরীরে বিষম উত্তাপ, ভয়ানক পিপাসা, চক্ষু রক্তবর্ণ। দ্বিতীয় দিন রাত্রে রামকান্ত মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের সম্মুখে বসিয়া অভাগিনী বিধবা নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল। আজ তাহার দুঃখ ও বিপদ বুঝিবার লোক পৃথিবীতে এক জনও নাই।

হরিনামসংকীর্ত্তন শেষ করিয়া রাত্রি এগারটার সময় ভজগোবিন্দ বাড়ী আসিল। শান্তমণি বলিল,"দাদা! রাম আমার কেমন কচ্চে,এ দুদিনে গা একটু জুড়োলো না, ধান দিলে খৈ হয়। আমার এই বালা দুগাছি ছিল, এই নাও, বিক্রী ক'রে ডাক্তার দেখাও দাদা, আমার আর কে আছে?" শান্ত আর কথা

কহিতে পারিল না, তাহার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ভজগোবিন্দ প্রশান্তমনে সুবর্ণবলয় জোড়াটি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আজ ত অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছে, কাল সকালে ডাক্তার ডাকা যাবে। জ্বর হয়েছে, বসন্তও নয়, ওলাউঠাও নয়, দু চার দিন লঙ্ঘন দিলেই সেরে যাবে, তার জন্যে এত ব্যস্ত কেন ? জ্বর না হয় কার ?" কিন্তু মাতার মন ইহাতে প্রবোধ মানিল না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শান্তমণি পুত্রের সেবা করিল।

পরদিন সকালে শ্রীনাথ ডাক্তার রামকে দেখিতে আসিল। রামের বগলে থর্ম্মামিটার দিল, বুকে পিঠে চোঙ্গ লাগাইয়া পরীক্ষা করিল, তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিল, "এ যে দেখচি বাতশ্লেষ্মার জ্বর হইয়াছে, একেবারে বিকার চাপিয়াছে। পরামাণিকের পো, তুমি ছেলেটির ভালরকম চিকিৎসা করাও, রোগ কঠিন।" ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

কামিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "জ্বর আবার কঠিন ! মিন্সের টাকা নেওয়ার ফন্দী !"

ঔষধে কোন ফল হইল না। বিকারের যন্ত্রণায় রোগী ছটফট্ করিতে লাগিল। বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল। কখন বলে, "মা ! বাবার কাছে যাব ;" কখন বলে, "মা ! বাড়ী চল্।" আবার যখন জ্ঞান হয়, তখন বলে, "মা ! তুই কাঁদিস্ কেন, আমি ভাল হ'ব।"

কিন্তু রোগ দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। দুই সপ্তাহ দেখিয়াও শ্রীনাথ ডাক্তার কিছুই করিতে পারিল না, চোদ্দ দিনের দিন ডাক্তার গম্ভীরমুখে বলিল, "পরামাণিকের পো ! আমি ত বাপু ! প্রাণ দিতে পারিনে, তোমার এই ভাগ্নেটির পরমায়ু বড় অল্প।" শান্তমণি ডাক্তারের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িল, তাহার সংজ্ঞালোপ হইল।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে রাম রক্তবর্ণ চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মা, আমবাগানে বড় কাঁটা, আমি আর আম কুড়োতে যাব না মা !" মা পুত্রের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল, "ওরে আমার অঞ্চলের নিধি, ওরে আমার সাগর-ছেঁচা ধন, আমাকে তুই ফাঁকি দিয়ে কোথা যাস্, আমি আর কি নিয়ে থাকব ?" রাম কোন উত্তর দিল না। অন্তিম হিক্কায় তাহার

থামিয়া গেল। শান্তমণি আছড়াইয়া পড়িয়া ডাকিল, "রাম, বাপধন রে!"

ভজগোবিন্দ বলিল, "হরি হে! তোমার ইচ্ছা! টাকাগুলো মিছি মিছি ডাক্তারকে দিয়ে খাওয়াইলাম।"

কামিনী বলিল, "জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে গো! একে মাথার ব্যামো নিয়ে বাঁচিনে, আবার এই রাত্তিরকালে স্নান করালে!"

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা 'বিদ্যাসুন্দর'কে গোবিন্দগীত বলিয়াছি। কিন্তু তাহাতেই ভারতচন্দ্রের কবিতার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ মিথ্যা হইয়া যায় না,—হীনপ্রভমাত্র হয়। সুতরাং এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এখানেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের মধ্যে কাহার রচনার বিরুদ্ধে এই অশ্লীলতার অভিযোগ নাই? অভিড, কেটুলাস, প্রোপারসিয়াস, ফ্ল্যাকাস, বোক্যাচিও, আরিয়ষ্টো, ভল্‌টেয়ার, লাফনটেন, সেক্সপীয়ার, স্পেন্সার, ড্রাইডেন, কালিদাস,—কাহার রচনা এই অপবাদমুক্ত? ইংরাজ কবিগণ বাঙ্গালী পাঠকসমাজে বিশেষ পরিচিত, তাঁহাদের দুই জনের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

ভারতচন্দ্রের রচনাকে অশ্লীল বলিতে যাইয়া বাঙ্গালী সমালোচক বলিয়াছেন,—"সেক্সপীয়রের অশ্লীলতা, আমরা ভাবিয়া পাই না।" (১) তিনি ভাবিয়া পান নাই সত্য; কিন্তু য়ুরোপেই কোন কোন চিন্তাশীল লেখক পাইয়াছেন। রুসিয়ার কাউণ্ট টলষ্টয় সেক্সপীয়ারকে অশ্লীলেরও অধিক মনে করেন। তাঁহার মতে, সেক্সপীয়ার immoral,—তিনি পরিহাসে শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করেন। কাউণ্ট এই লেখকের এত অধিক আদরের কারণ বুঝিতে পারেন না। (২)

---

(১) নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়; 'ভারতচন্দ্র'।—সাহিত্য; ১২৯৯।

সেক্সপীয়ারের রচনা হইতে অশ্লীল অংশ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। স্বীয় পত্নীর চরিত্রে সন্দেহের কারণ পাইয়াছেন ভাবিয়া পস্‌থুমাস আপনার জননীর চরিত্রে যে সন্দেহের কথা বলিলেন, তাহা পাপচিন্তার বিকাশ, অপাঠ্য। (৩) ইহার সমর্থনে সমালোচক বলিবেন, "নাটককার হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাত দেখাইতে, পাপবৃত্তির চিত্র বা কার্য্য দেখাইতে পারেন।" (৪) কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বৃটিশ দার্শনিক বলেন, সর্ব্বজনবিদিত গুপ্ত ব্যাপার কেহ আপনার নিকটও বলিবে না। (৫) আবার ফরাসী সমালোচক বলেন, উপন্যাসে যাহা অশোভন নহে, নাটকে তাহা একান্ত অশোভন। উপন্যাস মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ, তাহা যথাযথ হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, তাহা বিজ্ঞান। তাহা পুস্তকাগারে পঠিত হইবে। কিন্তু নাটক রঙ্গালয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীর সমক্ষে অভিনীত হয়। দৃশ্যপটে ও আলোকে তাহা জীবন্ত হয়। শয্যা-কক্ষের দৃশ্য উপন্যাসে স্থান পাইতে পারে—নাটকে নহে। (৬) যদি সুরুচির আতিশয্য প্রকাশ করিতে হয়, তবে অশোভনকে সর্ব্বত্রই অশোভন বলা সঙ্গত।

প্রস্পেরোর নিকট কালিবানের মিরাণ্ডা-সম্বন্ধীয় কথা একান্ত অশ্লীল—শিষ্টসমাজে পঠিত বা রঙ্গমঞ্চে উচ্চারিত হইবার অযোগ্য। (৭) ম্যাকডাফের নিকট প্রতীহারের মদ্যপানের বিষময় ফলের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকেও শ্লীল বলা যায় না। (৮) ইংরাজ সমালোচকগণ ইহা অশ্লীল মনে না করিলে বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণ হইতে ইহা নির্ব্বাসিত হইত না। তথাপি হয় ত কোন সমালোচক বলিবেন, প্রথমোক্ত পদ পশুর প্রবৃত্তি-প্রকাশক ও দ্বিতীয়োক্ত পদ মদ্যপের মত্তাবস্থায় মত-প্রকাশ। কিন্তু সেক্সপীয়ারের অশ্লীলতা এইরূপ স্থলেই বদ্ধ নহে। "হ্যামলেটে" অভিনয়দৃশ্যে সুশিক্ষিত হ্যামলেট সরলা ওফিলিয়ার সহিত কথোপকথনে যে সকল অশ্লীল কথা কহিয়াছিলেন, তাহাতে লজ্জায় আরক্তা হইয়াও কুমারী কি প্রকারে স্বস্থানে উপবিষ্টা ছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহার জননী তাঁহাকে আপনার নিকট আসিয়া বসিতে

---

(৩) Cymbeline—Act II, Scene V.

(৪) নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়; 'ভারতচন্দ্র'।—সাহিত্য; ১২৯৯।

(৫) Carlyle.

(৬) Taine—History of English Literature.

(৭) The Tempest—Act I, Scene II.

(৮) Macbeth—Act III, Scene II.

বলিলে তিনি অম্লানবদনে যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতে এখনও বিদ্যালয়ে গুরুকে ও শিষ্যকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। (৯)

বলা বাহুল্য, এইরূপ অশ্লীলতায় সেক্সপীয়ারের প্রতিভা কলঙ্কিত হয় নাই, হইবে না। প্রকৃত প্রতিভা অগ্নির মত যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই সমুজ্জ্বল ও মলিনতামুক্ত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সেক্সপীয়ারের এই অশ্লীলতার কারণ কি? কারণ, তাঁহার সমসাময়িক সমাজের পরিচয়েই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সে সমাজ কিরূপ?

সেক্সপীয়ার স্বয়ং রঙ্গালয়সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রঙ্গালয় টেম্‌স্ নদীর তীরে অপরিচ্ছন্ন স্থানে সংস্থাপিত ও কর্দ্দমাক্ত পয়ঃপ্রণালীতে বেষ্টিত ছিল। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটাদি প্রায় ছিল না; লোকে সব কল্পনা করিয়া লইত। ছয় আনা, দুই আনা, এমন কি, এক আনাতেও প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যাইত। বৃষ্টি হইলে অনাবৃত স্থানে উপবিষ্ট দর্শকগণ বারিসিক্ত হইত। পথিপার্শ্বে মুক্ত পয়ঃপ্রণালীর দূষিত বায়ুতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল;—তাহারা সহজে অসুস্থ হইত না। অভিনয়-আরম্ভের পূর্ব্বে দর্শকগণ মদ্যপান করিত, ফলাহার করিত; সময় সময় পরস্পরকে প্রহারও যে না করিত, এমন নহে। কখন কখন অভিনেতাকে প্রহৃত হইতে হইত; সময় সময় কবিকে কম্বলে তুলিয়া উৎক্ষিপ্ত ও পাতিত করাও হইত। মদ্যপানের পর মত্ততা গাঢ় হইলে দর্শকদিগের বমনাদির জন্য মুক্তমুখ পিপা আনয়ন করা হইত। দুর্গন্ধে লোক অস্থির হইলে রঙ্গমঞ্চে গন্ধকাষ্ঠ জ্বালাইয়া ধূমে দুর্গন্ধ দূর করা হইত। রাজা প্রজা সকলেই সমান। সকলেরই ব্যবহারে সংযমের অভাব স্বপ্রকাশ। ভদ্রসমাজের ভাষাও অশিষ্ট। সমাজের উচ্চস্তরস্থদিগের গৃহে যে সঙ্গীত গীত হইত, এখন তাহা কেবল মদ্যবিক্রয়বিপণীতে শ্রুত হয়। (১০) এই সমাজের জন্য, এই সব দর্শকের জন্য, সেক্সপীয়ার তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী না হইলে বৃক্ষের বা জীবের অস্তিত্ব থাকে না। তাহার পুষ্টি হইলে বুঝিতে হইবে, সে অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী। সেক্সপীয়ারের সমসাময়িক সমাজের অবস্থা আমরা অবগত হইয়াছি। সেক্সপীয়ার এই সমাজে খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি সেই

(৯) Hamlet—Act III., Scene II.

সমাজের উপযোগী ছিলেন। (১১) সমসাময়িক সমাজে সেক্সপীয়ারের অশ্লীলতার কারণ সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।*

আর এক জন ইংরাজ কবির কথা বলিব। ড্রাইডেন অশ্লীল, কেবল নাটকে নহে—সর্ব্বত্র। ড্রাইডেনের অশ্লীলতার কারণও তাঁহার সমসাময়িক সমাজের ইতিহাসে প্রাপ্তব্য।

ইংলণ্ডে "পূতাচার-যুগের অবসানে রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌সের আগমনসময়ে ড্রাইডেনের প্রভাব ও প্রতাপ। তখন জনসাধারণের আনন্দসম্ভোগলালসার আতিশয্যে লজ্জা ভাসিয়া গিয়াছে। এই সময়ের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তখন শিক্ষাভিমানী সাহিত্যসেবকদলেরও অধঃপতন শোচনীয়। এডমণ্ড ওয়ালার, ক্রমওয়েলের সময় তাঁহার ও পরে চার্ল্‌সের সময় তাঁহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়া কবিতা রচনা করেন। প্রথমোক্ত কবিতার উৎকর্ষ দ্বিতীয়োক্ত কবিতাকে ম্লান করে। তাই তিনি চতুর সভাসদের মত অম্লান-বদনে বলেন,—রাজন্, কবিরা সত্য অপেক্ষা কল্পিতের রচনায় অধিক সফল হইয়া থাকেন। যখন সাহিত্যসেবকদিগের এইরূপ দুর্গতি, তখন সাধারণ জনগণের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; অধিক বর্ণনা অনাবশ্যক।

এই সময়ের অশ্লীলতা কেবল সাহিত্যেই স্বপ্রকাশ নহে—পরন্তু শিল্পেও আপনাকে বিকশিত করিয়াছিল। প্রথম চার্ল্‌সের সময়ের রাজসভার চিত্র-করের চিত্রিত চিত্রে ও দ্বিতীয় চার্ল্‌সের সময়ের রাজসভার চিত্রকরের চিত্রে কি প্রভেদ! ফরাসী সমালোচক টেন বলেন, প্রথমোক্ত চিত্র দেখিয়া দ্বিতীয়োক্ত চিত্র দেখিলে মনে হয়, যেন প্রাসাদ হইতে বিলাসাগারে প্রবেশ করিলাম। নারীচিত্রে এই দুই সময়ের চিত্রের প্রভেদ সুস্পষ্ট। প্রথমোক্ত চিত্রকরের চিত্রে চিত্রিতা মহিলাগণের মুখভাবে লজ্জা, সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্য বিক-শিত। দ্বিতীয়োক্ত চিত্রকর শ্লথবসনা, যৌবনসম্পদপ্রদর্শনব্যাকুলা, লজ্জাহীনা বিলাসিনীদিগের চিত্রমাত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ফরাসী সমালোচকের তীব্র সমালোচনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, ইহার অনুবাদ করিতে পারিব না।

"When we alternately look at the works of the court painters of Charles I. and Charles II., and pass from the noble portraits of

Van Dyk to the figures of Lely, the fall is sudden and great; we have left a palace, and we light on a bagnio.

"Instead of the proud and dignified lords, at once cavaliers and courtiers, instead of those fine yet simple ladies who look at the same time princesses and modest maidens, instead of that generous and heroic company, elegant and resplendent, in whom the spirit of the Renaissance yet survived, but who already displayed the refinements of the modern age, we are confronted by perilous and importunate courtesans, with an expression either vile or harsh, incapable of shame or of remorse. Their plump smooth hands toy fondly with their dimpled fingers; ringlets of heavy hair fall on their bare shoulders; their swimming eyes languish voluptuously; and insipid smile hovers on their sensual lips. One is lifting a mass of dishevelled hair which streams over the curves of her rosy flesh; another languidly and without constraint, uncloses a sleeve whose soft folds display the full whiteness of her arms. Nearly all are half-draped; many of them seem to be just rising from their beds; the rumpled dressing-gown clings to the neck, and looks as though it were soiled by the nights debauch; the tumbled undergarment silps down to the hips; their feet crumple the bright and glossy silk. Though shameless, with bosoms uncovered, they are decked out in all the luxurious extravagance of prostitutes; diamond girdles, puffs of lace, the vulgar splendour of gilt, a superfluity of embroidered and rustling fabrics, enormous head-dresses, the curls and fringes of which, rolled up and sticking out, compel notice by the very height of their shameless magnificences. Folding curtains hang round them in the shape of an alcone, and the eyes penetrate through a vista into the recesses of a wide park, whose solitude will not ill serve the purposes of their pleasures. (১২)

এই সময় রঙ্গালয়ে দর্শকদিগের নিকট সেক্সপীয়ারের নাটকও নীরস ও হাস্যোদ্দীপক। (১৩) এই সমাজের জন্য ড্রাইডেনের রচনা রচিত;—তাই ড্রাইডেন অশ্লীল।

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার কারণও তাঁহার সমসাময়িক সমাজের রুচিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সময়ের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুজা

---

(১২) Taine—History of English Literature.

পাঠক Court Beauties of the Reign of Charles II. গ্রন্থে এই সকল চিত্রের প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন। এই গ্রন্থের ভূমিকার লেখিকা এই সময়ের বিবরণ সংক্ষেপে অসাধারণ দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—লেখক।

খাঁ রাজসভায় যে বিলাসবাহুল্য ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তদীয় পুত্র সরফরাজ সে সকল পুষ্ট ও পূর্ণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর অতিরিক্ত স্নেহে নষ্ট সিরাজদ্দৌলা সেই যুগল প্রবাহে অমানুষী নিষ্ঠুরতার প্রবাহ যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট প্রজার মান সম্ভ্রম, রমণীর সতীত্ব যে মূল্যহীন ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি নিজ পরিবারে দুর্নীতির দূষিত বায়ুতে লালিত পালিত। আবার বর্ষাবারিপাতপুষ্টা তরঙ্গিণী যখন চঞ্চল আবর্ত্তে প্রবাহিত হইত, তখন বহুযাত্রিপূর্ণ পারাপারের খেয়ার নৌকা ডুবাইয়া মজ্জমান দুর্ভাগ্যদিগের জীবনরক্ষার্থ বিফল চেষ্টা দেখিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। (১৪) বহু নির্দ্দোষের মৃত্যুতে যে হৃদয় আনন্দলাভ করে, সে হৃদয় মানবের নহে,—পিশাচের।

রাজসভায় তখন বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে পাপের পূর্ণ প্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত। তাহার তরঙ্গতাড়নে সুরক্ষিতপ্রাসাদবাসিনী রাণী ভবানী হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই বিব্রত। দেশের প্রধানগণও কেহ কেহ রাজার দৃষ্টান্তে খাল কাটিয়া এই প্রবাহবারি আনিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাসনা-বিনাশই যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রশংসিত, নিবৃত্তি যে হিন্দুর নিকট মহাধন, কামনা-কল্মষ হইতে মুক্তিলাভ করাই যে হিন্দুর একান্ত প্রার্থিত, সেই হিন্দু, হিন্দু ভূম্যধিকারী, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণও মুসলমানের অনুকরণে, সভায় ও গৃহে, আহারে ও বিহারে, বিলাসের বাহুল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সামাজিক আচারও যে সে বাহুল্যে কলুষিত হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। আদর্শ সংক্রামক। রোগ দেহে একবার প্রবেশ করিলে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রই তাহার ফলভোগ করে—না করিয়া পারে না।

তখন অবিচারীর অত্যাচারে জনসাধারণের মেরুদণ্ড নত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ ও মানরক্ষা করিতে তাহাদিগকে চাতুরীর ও অসত্যের আশ্রয়ও যে লইতে হইত না, এমন নহে। রাজনীতি তখন সূক্ষ্ম চাতুরীমাত্র। রাজসভায় ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতা তখন সাহসের ও সরলতার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সত্য বটে, মানবের অধিকাংশ কার্য্যে স্বার্থই সর্ব্বপ্রধান উত্তেজক। কিন্তু যে স্বার্থপরতা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অবলম্বিত উপায়ের

(১৪) Laid's Account—*vide*—Hill's *Three Frenchmen in Bengal.*

ন্যায়ান্যায়-বিচার আবশ্যক বিবেচনা করে না, সে স্বার্থপরতা সমাজের পক্ষে ভীষণ ভীতির কারণ। সুজা খাঁর অনুগ্রহে নিরন্ন আলিবর্দ্দী একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যলাভলিপ্সার প্রবল উত্তেজনায় তিনি সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ, নির্ব্বোধ সরফরাজকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন, রাজদ্রোহী হইবেন না ; কিন্তু তিনি যাহাকে কোরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে আস্তরণাবৃত ইষ্টকখণ্ডমাত্র। (১৫) আলিবর্দ্দী যখন সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তৎকালে তাঁহার সহায় জগৎশেঠ সরফরাজের কর্ম্মচারিবর্গকে উৎকোচদান করিয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য,—তাহারা কামানে গোলাবারুদ না দিয়া মৃত্তিকামাত্র পূর্ণ করিবে। (১৬)

আলিবর্দ্দী উর্ব্বরক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করিয়াছিলেন। অল্পদিনেই প্রচুর ফলভারে সে তরুর শত শাখা নত হইয়াছিল। তদীয় স্নেহপুত্তল সিরাজদ্দৌলা সেই বিষময় ফল আস্বাদন করিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকদিগের ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়েন। দুর্ল্লভরাম, মাণিকচাঁদ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, এমন কি, রাজবল্লভও সহসা সিরাজদ্দৌলার অনিষ্ট করিতে পারিতেন না। জগৎশেঠ বিমুখ হইলেও তিনি সহসা সিংহাসনচ্যুত হইতেন কি না সন্দেহ। সেনাপতি মীরজাফর বিমুখ হইয়াছিলেন বলিয়াই পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। কবিকল্পিত সিরাজদ্দৌলার আক্ষেপ,—"অবিশ্বাসী - আততায়ী —বধিল জীবন"(১৭) সম্পূর্ণ সত্য। যাঁহারা অজ্ঞাতকুলশীল ইংরাজ বণিকের সহায়তায় অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নৈতিক আদর্শ বা দূরদর্শিতা কিছুরই প্রশংসা করা যায় না। রাজ্যলোভে, "আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর", সেই আলিবর্দ্দীর প্রিয় দৌহিত্র, স্বীয় প্রভু, শরণাগত সিরাজদ্দৌলাকে যে বিশ্বাসঘাতকতার বিষম ষড়যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করে নাই, তাহার পক্ষে স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বনাশ করা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।

---

(১৫) Riyazu s-Salatin.

(১৬) মুতাক্ষরীণ টীকা।

তৎকালীন রাজনীতির আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই এইরূপ ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ব্বত্র ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র সংগঠিত হইতেছিল। ষড়যন্ত্র গোপন করিবার জন্য ইংরাজ বণিক জাল দলীল লিখিয়া উমিচাঁদকে ভুলাইয়াছিলেন। তখন এই কলুষিত রাজনীতির এমনই প্রভাব যে, বঙ্গে ইংরাজ-রাজ্যের ভিত্তিস্থাপক লর্ড ক্লাইভ এ কার্য্য দোষাবহ বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। (১৮)

সকল জাতির চরিত্র ও শক্তি সমাজের নিম্নস্তরে উৎপন্ন হয়, শিল্প উচ্চস্তরে আরব্ধ হয়। (১৯) আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বাঙ্গালার সমাজের নিম্ন স্তর উৎপীড়নের অত্যাচারে নিস্তেজ,—পশুবৎ ব্যবহৃত, ক্ষমতা-লেশহীন। রাজসভায় তাহাদের ক্ষীণস্বর উপনীত হয় না, রাজকার্য্যে তাহাদের কোনরূপ অধিকার নাই, তাহারা কেবল রাজার ও প্রধানগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রম করে, আবশ্যক হইলে প্রাণ দেয়। উচ্চস্তরের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই স্তরের আদৃত শিল্পও কালোপযোগী। স্থপতিশিল্প সরলসৌন্দর্য্যহীন, গাম্ভীর্য্যবর্জ্জিত; কেবল বিলাসিনীর মত অনাবশ্যক অলঙ্কারভারে পীড়িত, অলঙ্কারের বাহুল্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্যহীনতা-গোপনে প্রয়াসী। মন্দিরে ও প্রাসাদে কেবল অলঙ্কারবাহুল্য—কেবল সম্পদ-প্রদর্শন-প্রয়াস। চিত্রে দেবমূর্ত্তিও দেবীমূর্ত্তির মত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত—কোন কোন দেবতা নারীজনের নাসাভরণের অত্যাচারও সহ্য করিয়াছেন। দেবী-মূর্ত্তির ত কথাই নাই। কর, চরণ, কণ্ঠ, অলঙ্কারে আবৃত; মধ্যদেশও অলঙ্কার-ভারে ভারাক্রান্ত। অলঙ্কারের এই বাহুল্য দেবীপ্রতিমায় আজও লক্ষিত হইবে। গণপতিও নারীঅলঙ্কারপরিধানের প্রলোভনমুক্ত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা আপনাদের চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছেন, চিত্রকর তাঁহাদিগের চিত্রে করধৃত কুসুমের বর্ণ সম্বন্ধে যত মনোযোগ দান করিয়াছেন, নয়নদ্বয় স্বাভাবিক করিবার তত চেষ্টা করেন নাই।

ভারতচন্দ্র এই সমাজের কবি। তিনি নানা দিকে ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ও তিনি উভয়েই উদ্ধত অভিমানে ক্ষমতাশালীর অসম্মান করায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি সম্পদ ও সম্মান উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—তখন তিনি সমাজের উপযোগী হইয়াছিলেন।

---

(১৮) Thornton—History of the British Empire in India.

ভারতচন্দ্রের পিতা ভূমিগত তর্কে বৰ্দ্ধমান-রাজমাতাকে গালি দিয়াছিলেন। রমণীর অসম্মান করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। যে সভায় তিনি কবিতা শুনাইতেন, সে সভায় পাত্রমিত্রাদিপরিবেষ্টিত সিংহাসনারূঢ় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়কবি "রায়গুণাকরে"র কবিতায় বংশপতি ভজানন্দ মজুমদারের "উভয়রাণীসম্ভোগ" শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। পুরুষের প্রেম যে অগ্নির মত স্বয়ং পবিত্র, এবং যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেও পবিত্র করে,—প্রাচ্য মহিলাদিগের এই ধারণা ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ভারতচন্দ্র "পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি"তে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপতির পত্নীদ্বয়কে পরস্পরের প্রতি একান্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণা ও স্বামীকে বশ করিবার জন্য মন্ত্রৌষধি পর্য্যন্ত ব্যবহারে ব্যাকুলা চিত্রিত করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সে চিত্র বিসদৃশ ও অশোভন বোধ হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদও "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়াছিলেন। "অশ্লীলতা" বিষয়ে তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" অপেক্ষা অনুজ্জ্বল নহে। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণও অতিরিক্ত সুরুচিপ্রিয় ছিলেন না। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, মাধব, রামেশ্বর, কে নব্যরুচিতে শ্লীল? ভারতচন্দ্রের আদর্শ সংস্কৃত কাব্যকারগণও নব্যরুচির বিচারে অশ্লীল। "মেঘদূতে"র ইংরাজী অনুবাদক সংস্কৃতকবিদিগের এই অশ্লীলতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কবিগণকে অশ্লীলতার অপরাধে অপরাধী মনে করা সঙ্গত নহে। ভারতীয় কবিদিগের রচনা পুরুষের জন্য, রমণীর জন্য নহে। য়ুরোপেও মহিলাবর্জ্জিত সুশিক্ষিত পুরুষসমাজে কথোপকথন হিন্দুকাব্য অপেক্ষা অশ্লীল হইয়া উঠে। রচনা মহিলাদিগের হস্তগত ও তাঁহাদিগের দ্বারা পঠিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, রচনাও সম্ভবতঃ অশ্লীল হইত। বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় রচনায় অশ্লীলতা কেহ দোষের মনে করে না। গিবন ও হিউম, দুই জনের মতে, ইতিহাসেও অশ্লীলতা দোষের নহে। যে মহিলাগণের হৃদয়ের বিশুদ্ধি রক্ষা করা পুরুষ অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেন, সেই মহিলাগণের পাঠসম্ভাবনা না থাকিলে, কল্পনাপ্রধান রচনাতেও শ্লীলতার আতিশয্য আবশ্যক বিবেচিত হইত না। তাহাতে যে জগতে পুণ্যের হ্রাস হইত, এমন মনে হয় না। যাহা স্বাভাবিক, তাহা পাপ হইতে পারে না; যাহা সর্ব্বজনবিদিত, তাহা সকলেই প্রকাশ করিতে পারে। যে হৃদয় অজ্ঞতাহেতু রা

বাহ্যিক সুরুচিতেই নিরাপদ, তাহার বিপদহীনতা বড়ই দুর্ব্বল—একান্ত ক্ষণভঙ্গুর। (২০)

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, "বিদ্যাসুন্দর" মহিলাসমাজে পঠিত হইবার সম্ভাবনার কথা ভারতচন্দ্রের স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। রাজ-সভায় "বিদ্যাসুন্দর" গীত হইত। তাহার অতি ক্ষীণধ্বনিও যে পূতাচারের প্রিয়ভূমি রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিত না, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

এ স্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত বৃটিশ দার্শনিক কার্লাইলের মত যেমন সর্ব্ববিধ অশোভন-ভাব-প্রকাশের বিরোধী, তেমনই অন্যপ্রকার মতও বিরল নহে। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও সমালোচক টেনের মত এই যে, সাধুতা ও সুনীতি সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক ; কিন্তু সাহিত্যের সহিত তাহাদিগের সংস্রব নাই।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এ সম্বন্ধে যখন যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে, তখন যথেষ্ট বিচার না করিয়া ভারতচন্দ্রকে দোষী স্থির করা অবিচার। যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মত গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহারাও যেন মনে করেন, অনেক মনীষী তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। ভারতচন্দ্র একক দোষী নহেন।

যাঁহারা ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল বিচার আবশ্যক মনে করেন নাই। অধিকাংশ সমালোচকই প্রচলিত মতের প্রবাহে তরণী ভাসাইয়াছেন, উজান বাহিয়া যাইয়া প্রকৃত অবস্থার নির্ণয় আবশ্যক মনে করেন নাই। প্রচলিত মত সহজেই গৃহীত হয়। কর্ষিত ভূমি যেমন বীজবপনের উপযোগী হইয়া থাকে, পাঠকগণের হৃদয় তেমনই প্রচলিত মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াই থাকে। ভারতচন্দ্রের কোনও সমালোচকই বলিয়াছেন,—"নূতনের প্রতিবাদ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে।" (২১) নূতন মত প্রচার করা কষ্টসাধ্য। আবার সুনীতির ও সুরুচির প্রচারক হইলে সহজেই একশ্রেণীর পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করা যায়। তাই অশ্লীলতা যাঁহাদিগের বেদ ও বাইবেল, কোরাণ ও জেন্দাবেস্তা, এমন অনেক লেখকও অশ্লীল বলিয়া ভারতচন্দ্রের নিন্দা না করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই।

---

(২০) H. H. Wilson. মিলটনও সযত্নে গোপন-রক্ষিত পবিত্রতাকে উচ্চস্থান দান করেন নাই।—Vide Areiopagitca.

বহুদিন পূর্ব্বে কোনও শ্রদ্ধেয় লেখক ভারতচন্দ্রের কথায় বলিয়াছিলেন, "আমরা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে তাঁহার সৃষ্টা মালিনীর সহিত এক বলিয়া বিবেচনা করি। কবি ভারত ও হীরা মালিনী এক ; বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়ন-কর্ত্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কর্ত্রী এক।" (২২) তিনি যে হাসিতে হাসিতে এ কথা বলিয়াছিলেন, উদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এ দেশে বিশুদ্ধ হাস্যরস কবিত্ব অপেক্ষাও দুর্ল্লভ। তাই এ কথাও কেহ কেহ গম্ভীর মতাভিব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। এমন বিশুদ্ধ হাস্যরস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, তাঁহারা দুর্ভাগ্য,—ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিবার নাই, বলাও একান্ত নিষ্প্রয়োজন। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীরই মত "চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়।" তিনি বিশেষ অবগত আছেন, সেক্সপীয়ার হইতে কিপ্‌লিং পর্য্যন্ত সকলেই "চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়।" বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে লিখিয়া "খাইতে" হয়, তাঁহারা সাহিত্যের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সমুন্নত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হইলেও, চেঙ্গড়াদিগকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন না ; অর্থাৎ, তাঁহারা যে সমাজস্থ, সে সমাজের প্রভাব-মুক্ত হইতে পারেন না। জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তি-গণ পরবর্ত্তিগণের নিকট "চেঙ্গড়া"। "কৃষ্ণকান্তের উইল" "আলালের ঘরের দুলাল"কে নিষ্প্রভ করিয়াছিল। আবার বঙ্কিমচন্দ্র যখন "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল" প্রকাশ করেন, তখন সকলেই মনে করিয়াছিলেন, বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসের উৎস মুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহার কিছুকাল পরে ঐ রচনারই প্রণালীতে রচিত একটি রচনা সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—এ রসিকতা এখন বস্তাপচা, বাতিলের বাণ্ডিলবন্দী হইবার উপযোগী। ইংরাজ কবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন,—

> বিজ্ঞ মোরা, বোধহীন বলি যত পূর্ব্ববর্ত্তিগণে;
> মোদেরো বলিবে তাই বিজ্ঞতর পরবর্ত্তী জনে। (২৩)

সাহিত্য ও শিল্প, কবি ও শিল্পী, সমাজের প্রভাব সকলকেই স্পর্শ করে। তাহা দোষের নহে।

পাশ্চাত্য রুচির আদর্শে প্রাচ্য কবির বিচার করাও একান্ত অসঙ্গত।

---

(২২) "তুলনায় সমালোচনা"—বঙ্গদর্শন : ২য় খণ্ড। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই প্রবন্ধের লেখক।—লেখক।

"যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরাজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল মনে করি, ইংরাজেরা করেন না। * * * আমাদের দেশের অনেক কবি * * বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মস্থর জোলার নভেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা!" (২৪)

সূক্ষ্ম বর্ণনা সম্বন্ধেও অনেক শিল্পীর মত, যাহা করিব, তাহা সম্পূর্ণই করিব! কোনও অংশ অযত্ন-সম্পন্ন করা অকর্ত্তব্য। ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্সের এই মত ছিল। আমরা ইংরাজীতে এমন কবিতাও পাঠ করিয়াছি, যাহার আবিল অশ্লীলতার তুলনায় ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা নির্ম্মল প্রবাহ-বারি।

শ্রমানন্দের জন্য নৈপুণ্যচালনক্রীড়া, অপরের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নৈপুণ্য-প্রকাশই ললিত শিল্প, বা কলা। সত্য বটে, কবিকল্পনা ভাস্করকে স্বরচিত নারীমূর্ত্তির প্রেমে মুগ্ধ, চিত্রিত করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও ভাস্কর স্বরচিত মূর্ত্তিমণ্ডলমধ্যে তন্ময় হইয়া বাস করিতে পারেন না; কোনও চিত্রকর স্বীয় সম্পূর্ণ চিত্রদর্শনে সদানন্দ থাকিতে পারেন না; কোনও কবি আপনার কাব্যপাঠই সর্ব্বোচ্চ সুখ মনে করেন না। ভাস্কর যখন মূর্ত্তিগঠন করেন, চিত্রকর যখন চিত্র-অঙ্কন করেন, কবি যখন কাব্যরচনা করেন,—তখন শিল্পী স্বয়ং যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করেন, সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ও সেই ভাবে রচনা বুঝিতে সক্ষম দর্শকের বা শ্রোতার কল্পনা না করিয়া পারেন না। সেই কল্পিত দর্শকের বা শ্রোতার কল্পিত প্রশংসা তাঁহাকে উৎসাহিত করে। সমসাময়িক শিল্পাদর্শ সকল শিল্পীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সকল শিল্পী সমসাময়িক সমাজ হইতে সেই আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং সমসাময়িক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই আদর্শকে আপনার প্রতিভাবলে আপন রচনার

উপযোগী করিয়া প্রকাশ করেন। বাহ্যাবরণ তাঁহার প্রতিভার স্বরচিত। তাহার সাফল্যেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়। তদনুসারেই তাঁহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ফিরিঙ্গি বণিক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভারত-যাত্রা।

The epic of Vasco Da Gama is an allegory of his nation's story in the East.—*Sir W. Hunter.*

ভারত-বাণিজ্যের অভিনব জলপথের সন্ধানলাভ করিয়াও পর্ত্তুগালের অধীশ্বর ভারত-যাত্রার আয়োজন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার শেষ জীবন নিরবচ্ছিন্ন রোগে শোকে অতিবাহিত হইয়া গেল।

সৌভাগ্যশালী ইমান্যুয়েল সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াই ভারত-যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে সুদীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার সংকল্প তাঁহার প্রজাবর্গের হৃদয়ে নানারূপ অপূর্ব্ব আতঙ্ক উদ্বেলিত করিয়া তুলিল! তাহারা ইমান্যুয়েলের অক্লান্ত অধ্যবসায়কে অশান্ত উন্মত্ততা বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল।

জনসমাজ স্থিতিশীল। কখন কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জনসমাজকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহদান করিলেও, লোকে সহসা তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। রাজকুমার হেনরী পর্ত্তুগালের জনসমাজকে স্বদেশের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া বিদেশে বৃহৎ বিজয়গৌরবলাভের জন্য পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়া গিয়াছিলেন। ইমান্যুয়েল তাহার জন্য সমুচিত আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, জনসমাজের নিকট উৎসাহলাভ করিতে পারিলেন না।

কোথায় ভারতবর্ষ, আর কোথায় পর্ত্তুগাল! ভারত-যাত্রাই যে সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির বিবিধ সমুন্নতিলাভের প্রধান কারণ বলিয়া ভবিষ্যতের

ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে, পর্ত্তুগালের অশিক্ষিত জনসমাজ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারা ইমান্যুয়েলের বাতুলতার কথাই চিন্তা করিতে লাগিল! এইরূপে ইমান্যুয়েলের রাজত্বের প্রথম বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারত-বাণিজ্যের জলপথের আবিষ্কারসাধনের অধিকার একমাত্র পর্ত্তুগালের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। তখনও পোপের পদমর্য্যাদা তিরোহিত হয় নাই। তাঁহার শাসন ধর্ম্মের শাসন বলিয়াও সুপরিচিত ছিল। তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য কোন খৃষ্টানসমাজের পক্ষে আফ্রিকার পথে ভারত-যাত্রায় প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা আটলাণ্টিক অতিক্রম করিয়া পৃথক পথের আবিষ্কারসাধনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। কলম্বস্ তাহার পথ প্রদর্শন করায়, ইংলণ্ড সেই পথে ভারত-যাত্রা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অষ্টাদশ নাবিক সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডের ইতিহাসবিখ্যাত নাবিকরাজ জন ক্যাবট সেই পথে ভারতবর্ষের সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

আধুনিক ইতিহাসলেখকগণ পর্ত্তুগালের জনসমাজকেই ভারত-যাত্রার প্রধান উত্তর-সাধক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। পর্ত্তুগালের মহাকাব্য—"লুসিয়াদ" পাঠ করিলে, তাহাতে আস্থাস্থাপন করা যায় না। "লুসিয়াদ" কাব্য হইলেও, সেকালের জনসাজের চিত্তবৃত্তির অকৃত্রিম ইতিহাস। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—পর্ত্তুগালের জনসমাজ যেন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ইমান্যুয়েলকে অভিশাপ দান করিয়াছিল!

তথাপি ইমান্যুয়েল অবিচলিত-হৃদয়ে সংকল্পসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে "সান্ গাব্রিয়েল" এবং "সান্ রাফেল" নামক দুইখানি অর্ণব-পোত সজ্জীভূত হইল। একালের তুলনায় তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, সেকালের তুলনায় তাহাই সুবৃহৎ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার সহিত দ্রব্য-ভাণ্ডার বহন করিবার জন্য আর দুইখানি ক্ষুদ্র পোত সংযুক্ত হইল।

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই শনিবার ইউরোপের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন টেগস্-নদীর তীরভূমি অপূর্ব্ব শোভায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সমবেত জনসমূহের সম্মুখে সমুচিত সমারোহে রাজাজ্ঞা বিঘোষিত হইল। স্বদেশের পবিত্র তটতল চুম্বন করিয়া ভাস্কো ডি গামা ১৬০ জন

সে দিন ধর্ম্মযুদ্ধোন্মত্ত অশান্ত বীরপুরুষের উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়বেগে অধীর হইয়াও, ভাস্কো ডি গামা কাতর-হৃদয়ে বিশ্ববিধাতার কৃপা ভিক্ষা করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজকুমার হেন্‌রী টেগস্‌-তীরে যে ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মিত করিয়া নাগরিকগণকে অজ্ঞাতসমুদ্রযাত্রায় উৎসাহদান করিতেন, সে দিন সেই পবিত্র মন্দিরের ঘণ্টানিনাদে জলস্থল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহারা এইরূপে ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইল, তাহারা পূর্ব্বেই পথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা জানিত,—আফ্রিকার পশ্চিম তট আশ্রয় করিয়া দক্ষিণাভিমুখে পোতচালনা করিলে, স্থলভাগের শেষ সীমায় উপনীত হইবে। সেই সীমা পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ নামে সুপরিচিত হইয়াছিল। অন্তরীপ অতিক্রম করিলেই ভারত মহাসাগর। তাহাতে পতিত হইয়া, আফ্রিকার পূর্ব্বতট আশ্রয় করিয়া, উত্তরাস্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিলেই, প্রাচ্য বাণিজ্য-পোতের চিরপরিচিত ভ্রমণপথ প্রকাশিত হইবে। কলম্বসের সম্মুখে এরূপ আশার আলোক পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার সমুদ্রযাত্রা চিরযাত্রা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। অশিক্ষিত জনসমাজ ভাস্কো ডি গামার সমুদ্র-যাত্রাকেও চিরযাত্রা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

বাণিজ্য-পোতের সমাগমের অভাবে আফ্রিকার পশ্চিম তট সভ্যসমাজে সুপরিচিত ছিল না। পূর্ব্বতটের অধিকাংশ বন্দরেই ভারতবাণিজ্যপোত গমনাগমন করিত। সুতরাং আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্বাংশের সমুদ্রকূলের জন-সমাজের নিকট ভারতবর্ষে গমনাগমন করিবার বাণিজ্যপথ সুপরিচিত ছিল। তাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে সেই পথে মালাবার উপকূলে গমনাগমন করিয়া ভারতবর্ষের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, উত্তরে পারসীক রাজ্য, পশ্চিমে আরব, মিশর ও আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল,—এই স্থলবেষ্টিত লবণাম্বুরাশি নিয়ত পোতচালনকোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইত।

যাহারা বাণিজ্য-সূত্রে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের সহিত পরিচিত হইয়াছিল, তাহারা বাণিজ্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে বাস করিতেও ত্রুটি করে নাই। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই য়িহুদীয় জাতির এক শাখা মালাবার উপকূলে বাস করিতে আরম্ভ করে। সূর্য্যোপাসক পারসীকগণ অদ্যাপি তদ্দেশে বাস করিতেছেন। আরব ও মিশর দেশের লোকেও বাণিজ্যসূত্রে

ভাস্কো ডি গামা যখন ধীরে ধীরে আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তৎকালে এসিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল? ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—তখন মধ্যএসিয়া তৈমুরলঙ্গের অশান্ত অত্যাচারে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে! আর্য্যাবর্ত্তের পাঠান সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে! দিল্লীশ্বর নামসর্ব্বস্ব সম্রাট হইয়া, দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র জনপদের অধীশ্বর হইয়াছেন! বঙ্গভূমি স্বাধীন পাঠান-শাসনে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যেও হিন্দু মুসলমানের কলহ-কোলাহল পুরাতন রাজশক্তি শিথিল হইয়া বিবিধ অভিনব ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে ভারতবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। স্থলপথ ত্যাগ করিয়া জলপথে পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হইত। তজ্জন্য বিপ্লব উপস্থিত হইলে, স্থলবাণিজ্য অপেক্ষা জলবাণিজ্য প্রবল হইয়া উঠিত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জলবাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পারস্য ও লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া মিশর ও আরব দেশের বণিক্‌গণ দলে দলে মালাবার-উপকূলে উপনীত হইয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন। সমুদ্রপথে জলদস্যুর উপদ্রব ছিল না। এসিয়ার অধিবাসিগণ ধর্ম্মপথে থাকিয়াই অর্থোপার্জ্জন করিত। মালাবার-উপকূলের বাণিজ্যপ্রধান বন্দরগুলি এইরূপে বহু জাতির আশ্রয়স্থল বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা হিন্দু হইলেও, সর্ব্বধর্ম্মের সমাদর রক্ষা করিতেন। লোকে নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করিত। ঘাটগিরি প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া উপকূলভাগকে মধ্য দেশের সমরকলহ হইতে রক্ষা করিত।

ভাস্কো ডি গামা এরূপ শান্ত সুশীল প্রাচ্য বণিকের ন্যায় ভারতযাত্রা করেন নাই। তিনি ফিরিঙ্গি বণিক। তাঁহার ধর্ম্মনীতি এসিয়ার ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা পৃথক্। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার রাজ্য,—তিনি সে দেশের রাজার রাজা। তিনি অজ্ঞানান্ধ নরনারীর পরিত্রাণের মুক্তিমন্ত্রদাতা। একাধারে এত অধিকার গ্রহণ করিয়াই ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারতযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন!

মুসলমানকে বাহুবলে পরাভূত করা সেকালের খৃষ্টান বীরপুরুষদিগের প্রধান কার্য্য বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল। সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, তরবারি-[illegible] তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

যে দেশে যে বিধান বর্ত্তমান আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া নববিধানের প্রচার করাই তাঁহাদের পুণ্যব্রত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

যাঁহারা এইরূপে তরবারি-বলে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তরকালে মুসলমানের স্কন্ধে সেই দুরপনেয় কলঙ্ক ক্ষেপণ করিয়া সাধুপুরুষ বলিয়া আত্মপ্রচার করিতেছেন। তথাপি নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসলেখকগণ অদ্যাপি খৃষ্টধর্ম্মের শোণিত-পিপাসার উল্লেখ করিতে ইতস্ততঃ করেন না।

কোন্ শ্রেণীর লোক এই সময়ে ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইত, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত, লোকালয়ে লাঞ্ছিত, কুকার্য্যপরায়ণ বলিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র ধিক্কৃত, চরিত্রহীনতায় পশুর ন্যায় অবনতিপ্রাপ্ত,—সেই শ্রেণীর নামগোত্রহীন নরাকার রাক্ষসগণই ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইত। * তাহাদের সম্মুখে কোনও বাধাই বাধা বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাহারা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একমাত্র অদম্য অধ্যবসায় না থাকিলে, এই শ্রেণীর চরিত্রহীন নরাধমগণ জগতের কোনরূপ বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইত না। অধ্যবসায়গুণে তাহাদের চরিত্রহীনতা সংকল্পসাধনের অন্তরায় হইতে পারে নাই। ইহাই তাহাদের সফলতালাভের প্রধান কারণ।

এই শ্রেণীর ফিরিঙ্গি বণিক্ যেদিন বাণিজ্যযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল, সে দিন ইউরোপ তাহাদের সহিত কোনরূপ পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে বিক্রীত হইতে পারে, এমন কোন্ পণ্য ইউরোপে উৎপন্ন হইত? সে দিন তাহারা ক্রয় করিতে, সুযোগ পাইলে,—লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সে দিন তাহাদের অদম্য অধ্যবসায় কেবল বাহুবলকেই অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া পূজা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল।

ভাস্কো ডি গামা যাহাদের সহিত সমুদ্র-যাত্রা করেন, তাহারা নাবিক, সৈনিক, কর্ম্মচারী, বণিক্,—একেধারে সর্ব্বময়। তাঁহার সহোদরও তাঁহার সহিত পোতারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন আফ্রিকার পশ্চিমতটের

---

* At the time of embarkation at Lisbon, selection was impossible; every one was enrolled who wished to go,—vagrants, lait-birds, debtors, criminals of every description, wretches, incapable by immorality and loss of character of obtaining employment at home,—whom Portugal was glad to banish to save the honor of their families.—Portuguese Disco-

শেষ সীমায় আসিয়া "উত্তমাশা অন্তরীপ" অতিক্রম করিলেন, সেদিন নিশান উড়াইয়া, জয়ধ্বনি করিয়া, রণবাদ্যরবে বিজয়ঘোষণা করিলেন!

তাহার পর ভারতবর্ষের বাণিজ্যপথের সন্ধানলাভ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। আফ্রিকার পূর্ব্বতট আশ্রয় করিয়া উত্তরাস্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর জনসমাজের অস্তিত্বের পরিচয় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ২৬শে এপ্রিল তারিখে গামা আফ্রিকার তটাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে পোতচালনা করিলেন। আফ্রিকা হইতে যে পথপ্রদর্শক (আড়কাঠি) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিতক্রমেই পোত সকল পূর্ব্বাভিমুখে পরিচালিত হইতে লাগিল। সেকালে বাণিজ্যপোত-চালন করিবার জন্য সমুদ্রতীরের ধীবরগণকে আড়কাঠি নিযুক্ত করা হইত। তাহারা বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করিয়া নক্ষত্র-দর্শনের অভিজ্ঞতায় পোতচালনার পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিত।

ভাস্কো ডি গামা এই উপায় প্রাপ্ত না হইলে, কালিকটের প্রসিদ্ধ বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। তাঁহার পথপ্রদর্শক নিপুণ নাবিক বলিয়াই প্রশংসালাভ করিতে লাগিল। তাহার নির্দ্দেশক্রমে ২৩ দিবস পোত-চালনা করিবার পর ভাস্কো ডি গামা পূর্ব্ব গগনে এক অপূর্ব্ব মেঘমালা দর্শন করিলেন। আড়কাঠি কহিল, যাহা মেঘমালারূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই ঘাটগিরির শিখরমালা!

১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে ভাস্কো ডি গামার বাণিজ্যপোত কালিকটের সম্মুখে ভারতভূমির "তালীবনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলায় উপনীত হইল। ফিরিঙ্গি বণিকের ভারত-যাত্রা সফল হইল। প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সহিত প্রতীচ্য সাম্রাজ্যের পরিচয় সাধিত হইল। সমগ্র প্রাচ্য রাজ্যের ইতিহাস অভিনব ঘটনাস্রোতে বিপর্য্যস্ত হইবার সূত্রপাত হইল।

মাদুরায় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে।

মাদুরা নগর পূর্ব্বে এক জন বিলাস-আড়ম্বর-প্রিয় রাজার রাজধানী ছিল। এখানে হরপার্ব্বতীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির আছে। "মীনাক্ষী" পার্ব্বতী শিবের গৃহিণী। মন্দিরটি আমাদের "লূভ্‌র্" প্রাসাদ অপেক্ষাও বৃহৎ, শিল্পকর্ম্মে ও খোদাই-কাজে অধিকতর ভূষিত, এবং তাহারই মত বিবিধ

দয়াশীল ত্রিবঙ্কুর মহারাজের প্রভাবে ও অনুগ্রহে আমি মন্দিরের অনেকটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিব; অন্তর্ভৌম কক্ষের মধ্যে নামিতে পারিব, দেবীর ঐশ্বর্য্যবিভব ও সাজসজ্জা দেখিতে পাইব, সন্দেহ নাই।

নগরটি অতিমাত্র ভারতীয়-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, বৈদেশিকদিগের প্রতি সাদর-আহ্বান-বিতরণে বিমুখ নহে। মন্দিরদর্শনের জন্য অনেক বৈদেশিক এখানে আসিয়া থাকে। অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে মন্দিরগুলিতে বৈদেশিকের প্রবেশ যেরূপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, এখানে সেরূপ নহে। মাদুরায় গিয়া যাহাতে আমি তত্রত্য গৃহস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে সাদরে গৃহীত হই, এই উদ্দেশে কতকগুলি অনুরোধপত্র ত্রিবঙ্কুরে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথমেই আমি ব্রাহ্মণদিগের গৃহে উপস্থিত হইলাম। ভারতে, ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও পরিশুদ্ধ।

গুরুভার, পিণ্ডাকৃতি, উচ্চ-"ভিত"-বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র একতলা গৃহ। এই মাদুরা নগরে ব্রাহ্মণদিগের যত গৃহ, সমস্তই এই আদর্শের। একটা বারাণ্ডা;—বারাণ্ডার থামের মাথায় বিকটাকার জীবজন্তুর মস্তক। একটা পাথরের সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি দিয়া গৃহের অভ্যর্থনাশালায় যাওয়া যায়। সেখান হইতে লতাপাতার কাজ করা অতীব ক্ষুদ্র তিনটি গবাক্ষ দিয়া নীচের রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘরে গৃহস্বামী আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ; চারিটি যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে;—ইহারা তাঁহার পুত্র। ইহাদের দীর্ঘ নেত্র নীলকৃষ্ণ অঞ্জনরেখায় অঙ্কিত। পরিচ্ছদের মধ্যে একটা ধুতি কোমরে জড়ানো; কিন্তু ইহাতে করিয়া তাহাদের উদাত্ত-ভাব, বিশিষ্টতা ও কুলগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। ঘরটি চুন্‌কাম করা, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কি একটা সুগন্ধি ধূপে আমোদিত; সাজসজ্জাও নিতান্ত অশোভন নহে। আরাম-কেদারাগুলি ক্ষোদিত আব্লুস্ কাঠের। দেয়ালের উপর, গিল্‌টি করা "ফ্রেমে" পুরাতন জলরঙ্গের ছবি সংরক্ষিত;—ছবিগুলি বিষ্ণুর অবতার-মূর্ত্তি। কুট্টিমতলে সুন্দর ভারতীয় গালিচা, এবং ফুলকাটা কাপড়ে আচ্ছাদিত গদী। আমার আগমনে ইহারা একটু বিস্মিত হইল; কেন না, বৈদেশিকেরা এখানে বড় একটা আইসে না; তথাপি, ভদ্রতা ও আতিথ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহের সমস্ত অংশ আমাকে দেখাইতে চাহিল। প্রথমে একটি অন্তঃপ্রাঙ্গন—প্রাচীরবেষ্টিত ও বিষাদময়। একটা "মকুর্টে মারা" বটগাছের ছায়ায় মেষ ও ছাগল বিশ্রাম

গৃহের ছাদ ;—ছাদে পায়রারা বাস করে ও কাকেরা আসিয়া বসে। সেখান হইতে, মাদুরার প্রাচীন রাজাদিগের প্রাসাদ দেখা যায় ;—উহা সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু-আরব-ধরণের বহুব্যয়সাধ্য প্রকাণ্ড স্মৃতিসামগ্রী ; তা ছাড়া পল্লী-প্রদেশের দূরস্থ তালকুঞ্জ পর্য্যন্ত মন্দিরাদি-সমেত সমস্ত নগরটি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। লাল রঙ্গের প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়াগুলি চারি দিক হইতে বিহঙ্গ-সঙ্কুল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত। অবশেষে উহারা আমাকে গৃহের পুস্তকাগার দেখাইল, —উহা দার্শনিক গ্রন্থে ও ধর্ম্মগ্রন্থে পরিপূর্ণ। ইহাতে সূচিত হইতেছে, আমার অভ্যর্থনাকারিগণ, অতীব বিশিষ্ট ও অতীব উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞানানুশীলনে নিরত। উহাদিগকে নগ্নকায় দেখিয়া প্রথমে সহসা যেরূপ মনে হয়, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আবার সেই অভ্যর্থনাশালায় আমাকে আসিতে হইল। সেখানে একটুখানি বসিলাম। সেই যুবকদিগের মধ্যে এক জন একটা দীর্ঘ, গিল্টি করা সেতার লইয়া মৃদুস্বরে দুই চারিটা সুমধুর গৎ বাজাইল। মহিলাদিগকে যে উহারা আমার সম্মুখে আনিবে না,—ইহা জানা কথা। কিন্তু বিদায়গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তিন চারি বৎসর বয়স্কা ছোট দুইটি বালিকাকে আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকা দুটি অতি শিষ্ট শান্তভাবে আমার নিকটে আসিল,—আদপে ভয় করিল না। উহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে,—শিকলে ঝোলানো, হৃৎপিণ্ডাকৃতি একটা সোনার তক্তি—এবং সেই শিকলটা কটিদেশে বেষ্টিত। তক্তিটা যথাযোগ্যরূপে নীচে নামিয়া আসিয়াছে। উহাদের হস্তপদ—গুরুভার বলয় নূপুরে ভূষিত। বালিকা দুটি যেন সৌন্দর্য্যের প্রতিমা ;—অনিন্দ্য-গঠন মনোমোহিনী যেন দুইটি ক্ষুদ্র দেবীমূর্ত্তি। রং উজ্জ্বল পিত্তলের ন্যায় ; দেহ সুষমা ও মাংসল ; হাসি-হাসি সুগভীর কালো চোখ,—পক্ষ্মরাজি অতুলনীয় ; চারিধারে কজ্জলের রেখা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হস্ত ও পদ।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল ক্রমে আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে চলিল। হস্তের গূঢ়াঙ্গুলি (Metacarpus) ও পদের গূঢ়াঙ্গুলি (Metatarsus) যদিও অপেক্ষাকৃত অনেক সবল ও পূর্ণাবয়ব আছে, ... অগ্রসর হইতেছে। আর প্রকৃত অঙ্গুলি সকল

ত ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। শিরা ও পেশী সকল দুর্ব্বল হইয়াছে; এবং হস্তের ও পদের অগ্রভাগের সহিত তাহাদিগের সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। এক তর্জ্জনী ভিন্ন পদের অন্য কোনও অঙ্গুলি যে স্থায়ী হইবে, সে আশাও নাই। তর্জ্জনীর স্থায়িত্বেও সন্দেহ আছে। এক্ষণে হস্ত ও পদের অবস্থা কিরূপ হইল, দেখা যাউক।

হস্ত ও পদের অস্থি সকল একই প্রকার। হস্তাগ্রের * দুই অস্থি ও পদাগ্রের দুই অস্থি তুল্য; এবং বাহুর এক অস্থি ও উরুর এক অস্থি তুল্য। হস্তকে সম্মুখের পদ বলিলে কোনও দোষ হয় না। চতুষ্পদ অবস্থায় যাহা সম্মুখের পদ, দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহাই হস্ত। সুতরাং এই দুই বস্তু, হস্ত ও পদ, একই পদার্থ। কিন্তু কালক্রমে ইহাদিগের গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; অবস্থান ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণের হস্ত ও পদের প্রভেদ মানুষের অপেক্ষা অনেক অল্প; মৎস্যদিগের এই প্রভেদ একবারেই নাই। তাহাদিগের সম্মুখের ডানা ও পশ্চাতের ডানার অবয়ব ও অবস্থান সম্পূর্ণ একরূপ।* বলা বাহুল্য যে, এই ডানাই প্রকৃত হস্ত ও পদের পূর্ব্বপুরুষ। হস্ত ও পদের পুরাতন ঐক্য সর্ব্বতোভাবে সমান নাই। পক্ষিগণের পশ্চাতের পদের উপর দেহের সমস্ত ভার ন্যস্ত; দেহভার-বহনার্থ সম্মুখের পদের আবশ্যক নাই। সম্মুখের পদ কালক্রমে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! তাহাদিগের পক্ষ আর কিছুই নহে, সম্মুখের পদের বিকৃতাবস্থা-মাত্র। তার পর মানুষ। মানুষকে আর পদ দ্বারা বস্তু গ্রহণ করিতে হয় না, এই জন্য ক্রমশঃ পদাঙ্গুলির অবস্থান্তর ঘটিতেছে। ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছি। হস্ত ও পদ যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবশ্যক অনুসারে যে জীব যে ভাবে হস্ত ও পদের ব্যবহার করিয়াছে, হস্ত ও পদও সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এক্ষণে হস্ত ও পদের অবস্থার একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাউক। সর্ব্বাগ্রে হস্তের দৈর্ঘ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে,

---

* কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্তকে হস্তাগ্র (forearm) এবং স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্তকে বাহু বলিব। কুঁচকি হইতে হাঁটু পর্য্যন্তকে উরু, এবং হাঁটু হইতে পায়ের পাতার উপরকার

উহা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতেছে। বানরাদির হস্তের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অসভ্য মানবের হস্তের দৈর্ঘ্য অল্প ; এবং অসভ্য মানবের অপেক্ষা সভ্য মানবের হস্তের দৈর্ঘ্য আরও অল্প।* সুতরাং হস্তের অস্থি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আসিতেছে। তবে মানব এক্ষণে নানা কার্য্যে হস্তের ব্যবহার করিতেছে, অতএব একবারে হস্তলোপের আশঙ্কা নাই। বরং কেবল এই কারণে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে, হস্ত কালক্রমে আরও উন্নত হইবে। কিন্তু কেবল এই কারণে নির্ভর করাও অসম্ভব। অন্য কারণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হস্তের অবস্থান এখন পূর্ব্বের মত নাই। হস্ত পূর্ব্বে মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; এখন ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতেছে। কথাটা এইরূপ :— মেরুদণ্ড মস্তকের নিম্নদেশ হইতে গুহ্যের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত স্থিত। উহা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডাস্থি সকলের সমষ্টিমাত্র। এখন মেরুদণ্ডের যে ভাগ বক্ষ ও পৃষ্ঠের সহিত সংযুক্ত, সেই ভাগ হইতে দক্ষিণে ও বামে কতকগুলি পঞ্জর (ribs) বাহির হইয়া বক্ষোগহ্বরকে (thorax) আবৃত করিয়াছে। এই পঞ্জর সকলের সংখ্যা পূর্ব্বে অধিক ছিল।† এক্ষণে স্কন্ধের ঊর্দ্ধভাগে আর পঞ্জর নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। মেরুদণ্ডের যে ভাগ স্কন্ধ হইতে মস্তকের অধোভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, তাহারও দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে পঞ্জরাস্থি বাহির হইত। সুতরাং গলা এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে ছোট ছিল ; হস্তমূল উপরে ছিল ; সুতরাং হস্তও এখন যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে, তখন তাহার একটু ঊর্দ্ধ হইতে, অর্থাৎ মস্তকের নিকটবর্ত্তী দেশ হইতে, বাহির হইত। এক্ষণে আর মেরুদণ্ডের ঐ ভাগ হইতে পঞ্জর বাহির হয় না। স্কন্ধ ও মস্তকের মধ্যভাগে মেরুদণ্ডের যে সকল খণ্ডাস্থি আছে, তাহারা পঞ্জরশূন্য। সুতরাং স্কন্ধ নীচে নামিয়াছে, এবং গলা বড় হইয়াছে। হস্তও বাধ্য হইয়া নীচে নামিয়াছে।‡ পঞ্জরাস্থির ক্রমে আরও ধ্বংস হইবে। এখনকার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পঞ্জরাস্থির যত ধ্বংস হইবে, § স্কন্ধও তত নীচে নামিবে ; হস্তও ততই নীচে হইতে বাহির হইবে। অবশেষে আর পঞ্জরাস্থিও থাকিবে না, স্কন্ধদেশও থাকিবে না, বুক পিঠও থাকিবে না, হস্তও থাকিবে না। কি

---

* Structure of Man.

† Structure of Man. p. 39, 41, 42.

‡ Structure of Man. p. 94.

সর্ব্বনাশ! এ কল্পনাকে দূরতর ভবিষ্যতে লইয়া যাইবার ভার আমি সম্পাদক মহাশয়ের বর্ত্তমান স্কন্ধে স্থাপন করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।

যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে পরিণামে এইরূপ দেহ-হীন অবস্থাই যে আমাদের ঘটিবে, তাহার বহু অন্তরায় আছে। তবে যদি এই জরা-ব্যাধি-মন্দির স্থূল-দেহ অতীব দূর ভবিষ্যতে লুপ্ত হয়, তাহা হইলেও কোনও দুঃখের কারণ নাই। কিন্তু সে বিষয়ে যেরূপ কল্পনাই সঙ্গত হউক না কেন, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, হস্ত পূর্ব্বে মানবদেহের যে স্থান হইতে বাহির হইত, তাহা মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; স্কন্ধ আর একটু উপরে ছিল। কালক্রমে হস্ত নীচে নামিয়া আসিয়া মস্তক হইতে একটু ব্যবধানে গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, স্কন্ধের উপরকার পঞ্জরাস্থির লোপ।

তাহার পর হস্তাগ্রের দুই খণ্ড অস্থি কি ভাবে ছিল, এবং এখন কি ভাবে আছে, তাহা দেখা যাউক। উপরে বলিয়াছি যে, মৎস্যের ডানা আমাদিগের হস্ত ও পদের পূর্ব্ববর্ত্তী। ডানা-অবস্থায় উহারা শরীরের দৈর্ঘ্যের সহিত সমকোণে বাহির হইয়াছিল। ক্রমে যতই হস্ত ও পদের আকৃতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই মস্তক হইতে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে ঐ দৈর্ঘ্যের সহিত প্রায় সমান্তরাল-ভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহার ফলে যে দিক মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা দূরবর্ত্তী হইয়াছে। সুতরাং ডানা অবস্থা হইতে ক্রমে প্রায় একটি সমকোণপরিমাণে বাহিরের দিকে হস্ত ঘুরিয়া গিয়াছে। তবেই দেখা গেল যে, হস্ত দৈর্ঘ্যে বড় ছিল, ছোট হইয়াছে; দেহের সমকোণে বাহির হইত, সমান্তরালভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল, ক্রমে দূরে অর্থাৎ নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে; আর শিরা পেশী সকলও পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও অসংলগ্ন হইয়াছে। এই অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, ইহার পরিণাম বুঝিতে বিশেষ কল্পনাশক্তির আবশ্যক হয় না।

এক্ষণে পদের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা দেখা যাউক। হস্ত দৈর্ঘ্যে খর্ব্ব হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে ধরা পড়ে; পদের খর্ব্বতা তত সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন মনে করি যে, হস্তাগ্রের ন্যায় পদাগ্রের দুইখণ্ড অস্থিও পাশাপাশি ছিল, এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় চতুষ্পদ-অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দেহভার পদাগ্রের উপর পতিত হইয়াছে, তখন স্বভাবতঃই মনে হয় যে, পদাগ্রের অস্থিদ্বয় অবশ্যই অনেক পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ আছে। প্রকৃত-পক্ষেও এই দুই খণ্ড অস্থির এক খণ্ড (tibia) যত অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে

দেহের আর কোনও অস্থিই তদ্রূপ হয় নাই। এই অস্থিখণ্ড উরু-অস্থির (femur) ঠিক নীচে ছিল না; একটু পার্শ্বে সরিয়া ছিল। কিন্তু দেহের দিকে আসায় এক্ষণে ঠিক উরু-অস্থির নীচে আসিয়াছে, এবং দেহের প্রায় সমস্ত ভার এই অস্থিকেই বহন করিতে হইতেছে। তাহার পর অপর অস্থিটির কার্য্য অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে ক্রমে উক্ত অস্থি দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং প্রথমোক্ত অস্থি (tibia) দেহের চাপে অধিকতর খর্ব্ব ও চাপা-লাগা-মত (compressed) হইয়া যাইতেছে। তবেই পদও ক্ষুদ্র ও পিষ্ট-বৎ হইল, উহার অস্থির আভ্যন্তরিক গঠনও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কতিপয় শিরা ও পেশী সকল নীচের সংযোগস্থান ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং অকর্ম্মা হইতেছে, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। এখন ইহার ভবিষ্যৎচিন্তা কঠিন হইবে না।

তাহার উপর আর এক বিষম সমস্যা উপস্থিত! পদের অবস্থান এখন পূর্ব্বের মত নাই। যেমন হস্ত ক্রমে নীচের দিকে নামিতেছে, তেমনই পদও উপরের দিকে উঠিতেছে। পদের দুরাকাঙ্ক্ষা মস্তকের দিকে 'উঠা।'* হস্তের নিম্নগতি ও পদের উর্দ্ধগতি। † সুতরাং তৎসম্পর্কীয় শিরা, স্নায়ু ও পেশী সকলেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই সকল কারণে কালক্রমে গুরুতর ফলের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। যাহা হউক, এই দ্বিবিধ গতিরই আর অগ্রসর হইবার এখনও অনেক বিঘ্ন আছে। নতুবা কালক্রমে আমরা কি আকার প্রাপ্ত হইব, তাহা চিন্তা করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, পদও পূর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্ব হইয়াছে, এবং মস্তকের দিকে উঠিয়াছে। যাহা হউক, হস্ত, পদ ও তৎসংলগ্ন অঙ্গুলি সকলের দুরবস্থা একরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এক্ষণে মানবদেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং পরিণামে সমগ্র দেহেরই বা কিরূপ অবস্থান্তর সম্ভব, তাহা ক্রমে দেখিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীশশধর রায়।

---

* Structure of Man. p. 94, 95.

† যেন ঠিক আমাদের বর্ত্তমান সমাজ!—লেখক।

মূর্ত্তি।

"রমণীর প্রেম শুধু কি স্বপন,
মৃত্যু কি তার শেষ ?"—
অশ্রু-সলিল-মগন নয়ন,
আননে অরুণাবেশ।

কাঁপিছে অলক অশোক-কপোলে,
পিছে কুন্তলভার,
শিরীষ-উরস-কম্পনে দোলে
সুন্দর মতিহার।

মণিবন্ধনে বাজিছে বলয়,
মঞ্জীর চারু চরণে,
উন্নত তনু অতি আভাময়
ব্যর্থ-প্রণয়-স্মরণে।

মত্ত আবেগে তুলিয়া সহসা
পুষ্পপেলব পাণি,
বাহু-বন্ধনে বেদনা-বিবশা
বাঁধিল হৃদয়খানি!

অনলোজ্জ্বল দৃপ্ত মূরতি,
বঙ্কিম গ্রীবাদেশ,
নিয়তিরে যেন সুধা'ল যুবতী,
—"মৃত্যু কি তার শেষ ?"

"আপন গর্ব্বে আপনি উচ্চ,
কঠিন অনবনত,
পুরুষেরে আমি ভেবেছি তুচ্ছ
দলিত তৃণের মত।

"শত হৃদয়ের প্রণয় অর্ঘ্য
ব্যর্থসাধন প্রণয়িবর্গ
ফিরেছে নয়ন-জলে।

'সবার কামনা বাসনার 'পরে
সুদূর সূর্য্য সম,
তরুণ রূপের উদয়শিখরে
হৃদয় জাগিত মম!

"আজি সে হৃদয়ে—হায় মূঢ় নারী!
রচি ভিখারীর পাত্র,
যাচিতেছি,—দীন অধম ভিখারী—
প্রণয়কণিকামাত্র!

রূঢ় পরশনে বীণা গীতহীনা,
ছিন্ন কনক-তার,
স্তিমিত নয়ন, স্তব্ধ নবীনা,
বাতায়নে দেহভার!

বাহিরে আলোকমগনা মেদিনী
পাষাণ প্রসূন পর্ণে,
শ্যামা মনোরমা হৃদি-আমোদিনী
বহু বিচিত্র বর্ণে!

শ্যামপ্রান্তরে শ্বেত পথরেখা,
জনহীন সুখসুপ্ত,
ক্রমে ক্ষীণতর—নাহি যায় দেখা—
তৃণ-তরঙ্গে লুপ্ত!

প্রান্তরপারে পুরাতন পুরী,
চিত্র-হৃদয়-রম্য,
মর্ম্মরময় শুভ্র মাধুরী

মণিময় শিখী ফিরিছে রঙ্গে
পথে প্রান্তরে কুঞ্জে,
জলধনু যেন মহীর অঙ্গে
খচিত তারকাপুঞ্জে!

দূরে দূরে গিরি—কনকোজ্জ্বল,
বিমল গগনপ্রান্ত,
নীল অনাবিল স্নিগ্ধ কোমল
শোভন স্বপন-ভ্রান্ত!

অবসাদ মোহ সহসা টুটিল,
তীব্র বেদনা বক্ষে,
আহত সিংহী জাগিয়া উঠিল
রোষচঞ্চল-চক্ষে।

উন্নত করি' সুন্দর তনু
দাঁড়াইলা অভিমানিনী,
উত্থিত যেন গুণহীন ধনু,
উদ্যত যেন ফণিনী!

তুলি' সদর্পে বাহুবল্লরী
কহিলা গর্ব্ব-উজলা;—
"ব্যর্থ বাসনা দিবা-বিভাবরী
বহিব এত কি অবলা?

"নাহি কি কুহক রূপ-যৌবনে—
দুর্লভ সুধা প্রণয়ে,
সে কি আসিবে না এ জীবন-বনে
তৃষা-প্রমত্ত হৃদয়ে?

"প্রণয়-কানন-হেম-কুরঙ্গ
শুধু কি নিত্য ছলিবে?
বিফল পীরিতি দহিবে অঙ্গ,
অমৃতে গরল মিলিবে?

"দুর্লভ যদি বাঞ্ছিত মোর,
দুর্দ্দম মম বাসনা।
নারীর সরম সুকঠিন ডোর
বাঁধিয়া রেখেছে রসনা!

"নয়নে বয়ানে ভাসে যেই ভাষা,
হাসি-মাঝে উঠে ফুটিয়া,
না পারে বুঝিতে—আশা ভালবাসা,
লাজ-ভয় যাবে টুটিয়া!

"কহিব তাহারে—আজি পড়ে মনে
অপরূপ প্রেমকাহিনী,
গরবের শিলা টুটিয়া কেমনে
বহিল এ প্রেম-বাহিনী!

পঞ্চ বরষ কার রূপরাশি
সতত নয়ন-লগ্ন,
পঞ্চ বরষ হৃদয় পিয়াসী
কার তপস্যা-মগ্ন?

"যদি নাহি শুনে, যদি হেলাভরে
ফিরায় আমারে, কি হ'বে?
সে লাজ সে বাজ হায়! প্রেমভরে
শির পাতি' ল'ব নীরবে?

"নহি আমি শুধু মাধুরী-আধার,
নবীনা—প্রেমানুরাগিণী,
হৃদয়ে ধরিলে পারিজাত-হার,
চরণে দলিলে নাগিনী!

"দস্যুর মত করি' লুণ্ঠন
মনোমন্দির তার,
প্রণয়-রতন করি' গ্রহণ
রচিব কণ্ঠহার!

"এই প্রেম মম অমোঘ, অমর,
অজেয়, বেদনা-দৃপ্ত,
হ'বে তার প্রেমে শুভ সুন্দর
সার্থক পরিতৃপ্ত !"

উল্লাসময়ী ঊষার উদয়,
পূর্ব্ব গগন-তট
হেমকুঙ্কুমে কি মাধুরীময়,
শোভার স্বপন-পট !

তরুণ রবির স্বর্ণ-কিরণে
ছিন্ন তিমির-বন্ধ,
ভাসিছে সরস ধীর সমীরণে
গীত গুঞ্জন গন্ধ !

চারু উপবন নীহারতরুণ
শিহরে মন্দ পবনে,
কেলি-কুতূহলী কপোতমিথুন
কুহরে কুঞ্জভবনে।

দূর বনান্তে অনিল প্রাসাদ,
শিখর উঠেছে উচ্চে,
শিল্পি-স্বপন যেন প্রতিভাত
অমল-গোলাপ-গুচ্ছে।

পুঞ্জকুসুম-রঞ্জিত নব
অশোক কুঞ্জতল,—
তুলিছে ললিত গুঞ্জন-রব
লোলুপ মধুপদল !

খসিছে শিথিল কুসুমকেশর,
পরাগ পড়িছে ভূমে,
ওঠে পল্লবে মৃদু মর্ম্মর
সুপ্ত-জড়িত ঘুমে।

সে বিতানতলে বসি' ধ্যানাসনে,
তরুণ তাপস প্রায়,
অজিৎ সিংহ—আয়ত নয়নে
কি কোমল দিঠি তায় !

চারুচম্পক-রুচিরকান্তি,
উন্নত বর দেহ,
অধরে হাস্য, ললাটে শান্তি,
আঁখি কল্পনা-গেহ !

ঘনকুঞ্চিত কুন্তল-দল,
সুঠাম তরুণ তনু।
রতির সুষমা-স্বপ্ন-বিভল
সুন্দর ফুলধনু ?

কাহার মাধুরী-মগ্ন আকৃতি
ভাসিছে প্রভাতী কিরণে ?
কোন অম্বর-সঙ্গীত-স্মৃতি
জাগিছে আকুল স্মরণে ?

হোথা বনপথে আসিছে যুবতী
কল-মঞ্জীর-চরণা,
যেন চঞ্চলা বিনোদব্রততী
পুঞ্জকুসুমাভরণা !

কুন্তল দোলে, অঞ্চল উড়ে,
মন্থর গতি গরবে !
কি রাগিণী বাজে স্বর্ণনূপুরে
বল্লভ পদ-পল্লবে !

যত চলে বালা, দোলে ফুলমালা,
অলকে মাণিক ঝলকে,
নব নব শোভা কি অমিয় ঢালা
বিকাশে পলকে পলকে !

কোথা পূর্ণিমা, কোথা নব উষা,
কোথায় তরুণী সন্ধ্যা ?
কল্লোলময়ী চির-অকলুষা
আকুলা অলকানন্দা ?

উঠিছে, ফুটিছে ও রূপরাশিতে
শতেক মাধুরী স্বপনে,
লাজ-বিজড়িত মধুর হাসিতে
কভু বা ভাসিছে গোপনে !

ধীরে ধীরে আসি' দাঁড়া'ল রূপসী
অশোক-কুঞ্জ-দ্বারে,
শিহরিল দেহ—বিলোলা বেতসী
প্রখর-তটিনী-ধারে !

তখনো অজিত ধ্যান-নিমগন,
অপরূপ বিভা আননে,
খুঁজিতেছে কোন সোনার স্বপন
কামনা-কল্প-কাননে ?

হেরিছে ধূসর গিরিবর-কোলে
হিল্লোলময় হ্রদ,
তীরে তরুবীথি—কূলে দোলে
কহ্লার কোকনদ !

বসি' তার তীরে নবীনা রূপসী
সুষমা-স্বপন-সৃষ্টি !
করুণা-স্নিগ্ধ চারু মুখশশী,
লোচনে মুগ্ধ দৃষ্টি !

শিলাসনে শোভে বাম করতল,
দক্ষিণে ফুলদণ্ড,
কমলকোমল চরণযুগল

তরুণ তনুর শোভাতে মুগুধা,
নিন্দিছে নব-নবনী,
নিখিল-মাধুরী-মন্থন-সুধা
অঙ্গে ললিত লাবণি ।

রূপের যুগল স্থির তরঙ্গ
নবযৌবনমঞ্জরী,
গড়েছে কুহকী শিশু অনঙ্গ
পুলকিত তনু-বল্লরী !

কুন্দ-কুসুমকোমল কপোল
পৃষ্ঠ অংশ উরসে,
কম-কেশদাম—লহরী বিলোল
মগ্ন পরশ-হরষে ।

বর বাহুযুগ সহসা প্রসারি'
উদ্দাম অভিলাষে,
কহিল যুবক,—তরুতলচারী,—
প্রেমগদ্গদ-ভাষে ;—

"এস বাঞ্ছিতা, এস চিন্ময়ী,
হৃদয়-পদ্মাসনে,
করহ ধন্য—কর মোরে জয়ী,
এই সাধ শুধু মনে !

থাক অন্তরে অন্তরতমা !
প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধা,
বাহিরে দীপ্ত রমণীসুষমা
পাষাণ-নিগড়ে গাঁথা !"

আকুল আবেগে দুই পদ গিয়া,
সুন্দরী গতিহীনা,"
"অজিতসিংহ !" উঠিল বাজিয়া
মধুরে [illegible]-বীণা !

যুবা অবিচল—স্বপন-আবেশে
নয়ন নিমেষশূন্ত,
জাগিছে গগনে বাঞ্ছিতা-বেশে
শত জনমের পুণ্য।

"অজিত !"—অশ্রু নয়নোপান্তে,
প্রেমে বিগলিত স্বর,
শিহরে যুবক যেন ধ্যানান্তে
ফুলশরাহত হর।

"অশোকা !"—নয়নে কি রোষদীপ্তি
কি ক্ষুব্ধ দৃপ্ত বাণী,
কে নিল কাড়িয়া না হ'তে তৃপ্তি
অমৃতপাত্রখানি ?

"অশোকা !" বাজিল ব্যাধ-খরশর
সরলা-হরিণী-বক্ষে,
কি ঘোর নিরাশা হৃদি-দাহকর
ভাসিল বিশাল চক্ষে !

বেগে অপসরি' দুই চারি পদ
দাঁড়া'ল বজ্রাহতা,
লজ্জা-অরুণ মুখকোকনদ,
হৃদয়ে দারুণ ব্যথা।

"ক্ষম সুহাসিনি, রূঢ়তা আমার,"
আদরে ধরিয়া কর,
কহিলা অজিত স্নেহের আগার,
মমতা-মুগ্ধ-স্বর।

"কেন নত আঁখি, কেন ম্লানমুখ,
কেন কম্পিত দেহ ?
না বুঝি সরলা, দিয়াছি যে দুখ,

আজি এ মঞ্জু মধুরিমা-সার
মাধবী উষার উদয়ে,
কহ কি কামনা জাগিছে তোমার
দেবীদুর্লভ-হৃদয়ে ?"

কাঁপিল আবেগে পুলকাঞ্চিত
দেহলাবণ্যলতা,
কহিল অশোকা,—"প্রিয়, বাঞ্ছিত,
শুন, এ মর্ম্ম-কথা ;—

পঞ্চ বরষ এ কুমারী-হিয়া
মগ্ন তোমারি ধ্যানে,
আকুলা সূর্য্যমুখী নিরখিয়া
ও রূপ-তপন পানে।

এনেছি—জীবন রূপলাবণ্য
কুসুমাঞ্জলি চরণে,
পুরাও বাসনা, কর গো ধন্য
দাসীরে জীবনে মরণে।"

এ কি বিস্ময় কল্পনাতীত !
এ কি অদ্ভুত ঘটনা !
অশোকা কি আজ হৃদয়-লালিত
প্রণয় করিল রটনা ?

যেন মণিময় দেব-মন্দির
ভূমি-কম্পন-বলে,
অবলুণ্ঠিত মৃক ধরণীর
তপ্ত ধূলির তলে।

অশোকার এই প্রেম-পরিণাম
ক্রূর নিয়তির খেলা,
ভাবি' শিহরিল যুবা অভিরাম

"অশোকা! অশোকা! অলকার দ্যুতি!
সরলতাময়ী বালা!
বহ্নিতে কেন দিয়াছ আহুতি
পুণ্য প্রণয়মালা?

আমি প্রমত্ত সুষমা-স্বপনে
মগন, আত্মহারা;
উছলে চিত্তে শতেক বরণে
সে সুধা-মাধুরী-ধারা!

সে রূপ যখন জাগিছে স্মরণে,
নাচিছে পুলকে ধমনী;
সেই রূপময়ী বিনা এ নয়নে
ধরণীতে নাহি রমণী!

ভু'ল ভালবাসা—এ মিনতি মোর,
অক্ষয়তেজোধারিণি!
ছিঁড়' বাসনার মায়াময় ডোর,
বনলতা যথা করিণী।"

ঝঞ্ঝাপীড়িতা যেন মাধবিকা
কাঁপিল সবেগে কামিনী,
জ্বলিয়া উঠিল রূপালোকশিখা
অমেঘবাহিনী দামিনী!

"নহে এ ক্ষুদ্র ক্ষণিক বাসনা,
উজল ইন্দ্রচাপ।
লালসা-লুব্ধা নারীর ছলনা
মরীচিকা অভিশাপ!"—

সরিল না কথা—ক্ষোভে আঁখিপথে
বহিতে চাহিল বারি,
বিদ্যুৎবেগে তরুতল হ'তে
চলি' গেল বরনারী।

তারকা-হীরক গাঁথি' কেশজালে
সন্ধ্যা দিয়াছে দেখা,
নয়নে করুণা,—নির্ম্মল ভালে
শশি-চন্দনলেখা।

ভ্রমিছে সন্ধ্যা—মৃদু-মদালস
অতিমন্থর গমনে,
নব-কুবলয়-স্নিগ্ধ পরশ
বরষি' দগ্ধ ভুবনে।

কাঁপে বনবীথি মন্দপবনে,
নিঝরিণী গীতি অধীরা,
ভরিছে ভুবন সুবাসপ্লাবনে
কুসুম-গন্ধ-মদিরা।

চন্দ্র-কিরণে তন্দ্রা-মগ্ন
শান্ত কানন-তল,
শোভিছে প্রান্তে নীরদ-স্বপ্ন
নীল 'অঞ্জনাচল'।

শৈলশিখরে কুন্দ-ধবল
চারু 'মর্ম্মর-মঠ';
অঙ্গনে চির-ছায়া-সুশীতল
বহু-পল্লব বট।

বহিছে নিম্নে কল-উল্লাসে
লীলা-চঞ্চলা 'মায়া';
নীল-নীরে কোথা জ্যোৎস্না হাসে,
কোথা চিত্রিত ছায়া।

অশোকা কি আজ ভাবিছে বসিয়া
নির্ঝর-শিলা-শয়নে?
কি আলোক ওই উঠিছে ভাসিয়া
নব-নীলাব্জ-নয়নে?

কহিলা তরুণী চাহিয়া চাহিয়া
সুদূর-চন্দ্র পানে ;—
"কি নিরাশা হায় ! উঠিছে ভাসিয়া
বেদনা-মথিত প্রাণে ?

হ'বে নাকি তা'র প্রেমে এ প্রণয়
সুন্দর সুপবিত্র ?
হেরিব কি ধরা চিরশিখাময়
মরু-মরীচিকা-চিত্র ?

কেমনে ভুলিব—কেমনে বাঁচিব,
হৃদয় বাঁধিব পাষাণে ?
চিরনিশিদিন মরণ যাচিব
বসি' বাসনার শ্মশানে ?

যতদিন আঁখি না মুদি মরণে,
ছাড়িব না তার সঙ্গ ;
রহিব মাতিয়া চির-প্রেমরণে,
কভু নাহি দিব ভঙ্গ !"

বলিতে বলিতে সহসা ফুটিল
আননে কি প্রেম-দর্প !
বিনোদিনী বেণী দুলিয়া উঠিল—
মণিরঞ্জিত সর্প !

"আজি নিরখিব, হে মোর তাপস,
কোথা মাধুরীর ধ্যানে
থাক প্রমত্ত নিশীথ-দিবস
স্বপ্ন বিবশ প্রাণে ;

আছ দূরে দূরে, ওহে দুর্লভ,
হে মোর চিত্তচোর,
যত যাবে দূরে, হৃদি-বল্লভ,

যদিও হে নাথ ! ঠেলেছ চরণে
এ মম হৃদয়-অর্ঘ্য,
দূর হ'তে তবু হেরিব নয়নে
আমার প্রণয়-স্বর্গ।"

এত বলি' বালা উচ্ছ্বাসভরে
ছাড়ি' নির্ঝর-তট,
উঠিল উচ্চ শৈলশিখরে
যথা 'মর্ম্মর-মঠ'।

ধীরে ধীরে খুলি' মন্দির-দ্বার
পশিল হর্ম্ম্য-মাঝে,
উছলি' উঠিল নয়ন-আসার
ব্যথা-বিজড়িত লাজে।

এ কি পবিত্র নিভৃত নীরব
অপরূপ তপোবন !
কোন বনে হেন সুষমা-বিভব
জুড়ায় নয়ন মন ?

কোথা ধ্যানাসনে নবতপস্বী ?
কেহ কোথা নাই কক্ষে !
কেবল চাঁদের রজত-রশ্মি
হাসিছে প্রাচীর-বক্ষে !

বাতায়ন-পথে স্তিমিতনয়নে
হাসে সুন্দর শশী,
এ কি ! এ কি ! ওই কুসুম-আসনে
কে রয়েছে একা বসি' ?

চাহিয়া চাহিয়া বিস্ময়ভরে
ফুল্ল কমল-লোচনে,
কহিল অশোকা, কম্পিতস্বরে

"এ নহে স্বপ্ন—এ নহে ভ্রান্তি,
এ নহে ইন্দ্রজাল :
মর্ম্মরে বাঁধা কুসুমকান্তি
নব বসন্তকাল !

একি এ মূর্ত্তি হৃদি-নন্দন
নিখিল-চিত্ত-হরা ?
এ কা'র তরুণ রূপের স্বপন
পাষাণে দিয়াছে ধরা ?

কা'র কামনার নন্দন হ'তে
রূপসী কিশোরী-বেশে,
চির-আরাধ্যা এসেছে মরতে
প্রেম-তপস্যা-শেষে ?

কে কুসুমরেণু সুধারসে মাখি'
গড়িল প্রতিমাখানি ?
চির-লাবণ্য দিল তাহে আঁকি
জ্যোৎস্না-তুলিকা টানি' ?"

নূতন চিন্তা সহসা জাগিল,
বিকৃত আনন নেত্র :
আশোকার দেহে কে যেন হানিল
বিষ-বৃশ্চিক-বেত্র।

কোথায় সে রূপ—সুষমাভূষণা
কুমারী-চিত্ত-মোহিনী ?
এ যে গরজিছে উদ্যতফণা
চরণদলিতা অহিনী !

"ওরে মায়াবিনী ! পাষাণরচিতা
মাধুরীর মরীচিকা !
ওরে জ্বলন্ত প্রণয়ের চিতা,
মরণ-বহ্নি শিখা !—

এইরূপে তা'র অন্তরে বসি'
ক'রেছিস্ পরিহাস ?
মোর সুখরাশি, ওরে রাক্ষসী,—
তুই ক'রেছিস গ্রাস ?"

ধরিল সবলে প্রতিমার পাণি,
নয়নে জ্বলিল ক্রোধ,
স্ফুরিল অধরে রোষাকুল বাণী,—
"প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ !"

* * *

হর্ম্ম্যসোপানে দাঁড়ায়ে অজিত—
প্রীতিব্যঞ্জিত আস্য ;
অধরে খেলিছে জ্যোছনা ললিত
সুখরঞ্জিত হাস্য।

পূর্ণ হৃদয় প্রেমগৌরবে,
নয়নে অশ্রুভার।
শোভে ফুলরাশি করপল্লবে,
কণ্ঠে কুসুমহার।

চন্দ্রকিরণে স্মিত-পুলকিতা
ধরণীর পানে চাহি'
কহিল অজিত,—"অয়ি বাঞ্ছিতা,
আজি আর খেদ নাহি !

সকল কামনা হয়েছে সফল,
সার্থক সব যত্ন,
পেয়েছি তোমারে চিরসম্বল
দেব-দুর্লভ রত্ন !

আজি এ ফুল-ফুলসম্ভারে
সাজায়ে মূর্ত্তিখানি,
হৃদয়ে বাহিরে হেরিব তোমারে
মানসী হৃদয়-রাণী !"

বলিতে বলিতে মন্দিরে পশি'
দেখিল চন্দ্রালোকে,
নাহি সে মূর্ত্তি!—পুন কি মানসী
লুকা'ল স্বপন-লোকে ?

হায়, বিধি হায়, দিলা অভাগারে,
কি পাপে এ ঘোর দণ্ড,
প্রাণের প্রতিমা কক্ষ-মাঝারে
চূর্ণিত শত খণ্ড!

মানসী-মুগ্ধ অজিতের বুকে
হইল অশনিপাত!
পড়িল ভূতলে অবনতমুখে,
উঠিল আর্ত্তনাদ!

শৃঙ্গে শৃঙ্গে গিরিগহ্বরে
বাজিল আর্ত্তধ্বনি,
বিটপে বিহগ সে আকুল স্বরে
জাগিল প্রমাদ গণি'।

এই কি অশোকা রাজপুত-সুতা
রূপ-গর্ব্বিতা বালা ?
অলকবন্ধে কই সে মুকুতা,
কণ্ঠে মাণিক মালা ?

কোথা সে দৃষ্টি তড়িত-জড়িত ?
গরবোন্নত গ্রীবা ?
কোথা সে মূর্ত্তি তেজোমণ্ডিত
নব বৈশাখী দিবা ?

এ যে সকরুণ শিশিরশীতল
শারদ পৌর্ণমাসী,
রূপ জ্যোৎস্নায় করে ছল ছল
নীহার অশ্রুরাশি।

ধীরে ধীরে উঠি' অঞ্চলাচলে,
মেঘমন্থর গতি,
জ্যোছনা-মগ্ন মন্দিরতলে
দাঁড়াইলা রূপবতী।

শোকাবেগে বালা উঠিল কাঁপিয়া,
কহিল, "হৃদয়নাথ!"
শেলসম হায়! বিঁধিয়াছে হিয়া
সে ভীম আর্ত্তনাদ।

আমি নৃশংসা হিংসায় মাতি'
দংশিনু ফণী সম,
গম্ভীর বিষাদ চির-অমারাতি
হৃদয় ছেয়েছে মম।

আর কি হেরিব সে দেব-আননে
স্বপ্ন-মধুর হাসি,
প্রতিভাদীপ্ত কমল-লোচনে
অলোক আলোকরাশি ?

মন্দিরদ্বারে আসি' ধীরে ধীরে
দাঁড়াইল বরযুবতী,
যেন সমুদিত ধরাধর-শিরে
করুণার চারু মূরতি।

ভগ্ন মূরতি বাহুতে বেড়িয়া
যেন প্রাণপণ বলে,
অজিত সিংহ রয়েছে পড়িয়া
কঠিন হর্ম্ম্যতলে!

শূন্য হৃদয়, শীর্ণ শরীর,
কালিমা ব্যাপ্ত আননে,
সুগভীর শোকে নয়নের নীর
শুষ্ক মলিন বয়নে।

কভু নিশ্চল শোকবিহ্বল
নীরব সংজ্ঞাহারা,
কভু সচেতন ব্যথা-চঞ্চল
আকুল পাগল পারা ।

নাহিক শান্তি, নাহি সান্ত্বনা,
নাহিক নিদ্রালেশ,
স্মৃতি-সর্পিণী তুলি' শতফণা
দংশে হৃদয়দেশ ।

সে দেবী-মুরতি, সে মধুর হাসি
নয়নে ভাসে না আর,
ছেয়েছে হৃদয়, হায় ! রাশি রাশি
নিবিড় অন্ধকার !

বহু প্রযত্নে সংবরি' শোক,
মানস-নয়নে চাহি'
খুঁজিছে অজিত সে রূপ-আলোক
অন্তরে অবগাহি' ।

দূরে—অতিদূরে—সরসীর তীরে
কুহেলি-মলিন ছায়া—
দেখিতে দেখিতে লুকা'ল তিমিরে
সে স্বপনময়ী কায়া !

নিশ্বাস ছাড়ি' নিদারুণ ক্লেশে
চাহিল বেদনাবেশে,
এ কি এ মূর্ত্তি গৃহদ্বারদেশে
দাঁড়ায়ে মোহিনীবেশে ?

সহসা হরষে দেহ শিহরিল,
হৃদয় আবেগময়,
জলনিধি যেন নাচিয়া উঠিল
নিরখি' চন্দ্রোদয় ।

"এ কি, এ কি ! তুমি ? স্মৃতিসঙ্গিনী
মানসী চিত্তহারিণী ?
নহ সে কিশোরী—রূপরঙ্গিণী
যৌবন-বন-চারিণী ?

যে রূপ হেরিনু মৃগয়ায় গিয়া
'মুকুর'-সরসী-তীরে,
ভেসেছি সতত যে রূপ লাগিয়া
আকুল অশ্রুনীরে ;

যে রূপের চারু প্রতিমা গড়িতে
করেছিনু প্রাণপণ,
যে রূপের ধ্যান তিলেক ছাড়িতে
কভু না চাহিত মন ;

সে রূপের এ কি মহা পরিণতি,
বিস্ময়করী শোভা !
সে কিশোরী আজি পূর্ণযুবতী
হৃদয়-নয়ন-লোভা !

এ কি প্রসন্ন রূপ-পূর্ণিমা,
এ কি লাবণ্য-বন্যা !
তুমি কি নিখিল-রমণী-মহিমা,
বিধির মানসী কন্যা ?

মূর্ত্তি ধরিয়া এলে কি আবার
অয়ি লাবণ্যবতী ?
এসো, আলো কর, হৃদয় আমার,
আমি অনন্যগতি ।

মুকুর সরসী ! জাগিল স্মরণে
সোনালী সন্ধ্যাবেলা,
সরসীর নীরে সেই আনমনে

মুকুর সরসী! অশোকা কাঁপিল,
হৃদি বিস্ময় মগ্ন;
হায়! এত দিন আমারে ছলিল
আমারি মাধুরীস্বপ্ন?

নীরব মূর্ত্তি! নিদ্রিত গেহ;
নির্জ্জন চারি ধার;
বিঁধিল অজিতে ঘোর সন্দেহ—
ছুরিকা তীক্ষ্ণধার।

না—না—এ যে মায়া—মম কল্পনা
আমারেই আজি ছলিছে;
মরীচিকারূপে মরম-বাসনা
আঁখি-সম্মুখে জ্বলিছে!

"আমি সেই—তব চিরপরিচিত
প্রেমবিমুগ্ধা দাসী,
এ হৃদয় মোর ক্ষুধিত তৃষিত
চিরদিন উপবাসী!

মায়া প্রপঞ্চ ঘুচিয়াছে আজি,
পেয়েছ নূতন দৃষ্টি;
নহি আমি নাথ! মায়া, ছায়াবাজী,
প্রেম-কল্পনা-সৃষ্টি।"

"চির-আরাধ্যা! প্রিয়ে! প্রিয়তমে!"
"বাঞ্ছিত! হৃদয়েশ!"
সকল যাতনা মধুর মিলনে
হইল স্বপনশেষ।

প্রাচীন মিশরের পুরোহিত।

It seems agreed, that the singular people Egyptians, and, by corruption, *Gypsies*,—passed the Mediterranean immediately from Egypt: and thier motley language,.........contains so many *Sanskrit* words, that their *Indian* origin can hardly be doubted. The authenticity of that vocabulary seems established by a multitude of Gypsy words, as—*angar* (অঙ্গার), charcoal;—*cashth* (কাষ্ঠ), wood; *par* (পার) a bank;—*bhu* (ভূ) earth: and a hundred more for which the collector of them could find no parallel in the vulgar dialect of Hindustan, though we know them to be pure Sanskrit, scarce changed in a single letter.—*Eighth Presidential Address, Asiatic Society, 1791.*

প্রাচীন মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বহুদিনের পুরাতন সম্বন্ধ। প্রাচ্যের জ্ঞানগৌরব বহুদিন হইতেই দূর দূরান্তরে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। প্রাচ্যের পণ্য-সম্ভারে যে কত নগর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, ইতিহাস এখন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মিশরবাসী ও ফিনিক্‌গণ প্রথমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে তরণী ভাসাইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল—সে আজ কত দিনের কথা। আরব উপসাগরের তীরবর্ত্তী কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া তাহারা অল্পকালের

মধ্যেই সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিল। প্রতীচ্যের সহিত ভারতের ইহাই প্রথম সম্বন্ধ।*

পুরাকালে বহুসমৃদ্ধিশালিনী রোম নগরী যখন জনপদের পর জনপদ অধিকার করিয়া সৌভাগ্যসম্ভ্রমে ধনরত্নে ধরাতলে গরীয়সী হইয়াছিল, তখন রোমের শ্যেন-দৃষ্টি হইতে মিশর রক্ষা পায় নাই। রোমকগণ তখন অত্যন্ত বিলাসী ;—য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান নগরী রোমের অধিবাসিগণ তখন কর্ম্মহীন, অলস, উল্লাসপ্রিয়, বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী, গর্ব্ব-মত্ত। রোমকদিগের তুষ্টির জন্য তখন নানাবিধ দুর্ম্মূল্য বিলাস-সামগ্রীর নিতান্ত প্রয়োজন হইত। ধূলিরাশির ন্যায় মুষ্টি মুষ্টি অর্থ ছড়াইয়া সেই সকল বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করিয়া রোমকগণ তখন আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। ভারতবর্ষ হইতে মিশরে ও মিশর হইতে রোমে সেই সকল অমূল্য বিলাস-সামগ্রী প্রেরিত হইত। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের সময় ১২০ খানি বাণিজ্যতরণী মিশর হইতে ভারত-অভিমুখে যাত্রা করিত ; এবং ভারতের অমূল্য রেশম, দুর্ম্মূল্য প্রস্তরাদি ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শীতাগমে মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। শুনিতে পাওয়া যায়, সলমনের সময় লোহিতসাগরের পথে ৪৮,৬০০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইত।*

ভারতবর্ষের সহিত যে মিশরের কেবল বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল, তাহা নহে ; আমরা মিশরের সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও কতকাংশে আবদ্ধ। কথাটা অনেকের নিকট একটু অপরিচিত হইবার সম্ভাবনা। টলেমি বলিয়াছেন, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-দিগের নিকট হইতে তিনি অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত তাঁহার আলেকজান্দ্রিয়ায় সাক্ষাৎও হইয়াছিল। আমাদিগের পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সিরিয়ার হায়ারপোলিস এক সময়ে ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র ছিল। † এ বিষয়ের আলোচনা সময়ান্তরে করা যাইবে।

---

* (1) The works of William Robertson—vol. XII.

(2) The Ancient History of the Egyptians by M. Rollin—vol. I.

* The Scripture history shows the traffic established by Solomon with India, through the Red Sea, to have been of very great consequence, producing *in one voyage*, no less than 450 talents of gold or £3,240,000 sterling.—The Ancient Egyptians—Wilkinsons ; vol I.

যাঁহারাই মিশর ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিশর ও ভারতের মন্দিরাদি ও প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তির সাদৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ** শুধু ইহাই নহে, মিশরের প্রবাদ-প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক কাহিনীর সহিতও ভারতের অনেক প্রবাদ-প্রসঙ্গের ও পৌরাণিক কাহিনীর অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়কের অভাবে এক দিন কণ্বাশ্রম-শোভনা শকুন্তলার দুঃখের সীমা ছিল না, সেই অঙ্গুরীয়কের বৃত্তান্ত সকলের নিকট সুপরিচিত। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসেও সেইরূপ একটি অঙ্গুরীয়ক-কাহিনী ঈষৎ-পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হয়।* যাহা হউক, ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন মিশরের এইরূপ নানা সম্বন্ধ আছে। এসিয়ার সহিত মিশরের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাষা ও ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া, কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, মিশরীয়গণ এসিয়া হইতেই উদ্ভূত। সেই মিশরের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে জাতিভেদ ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জাগত, মিশরের সামাজিক ইতিহাসেও সেই জাতিভেদপ্রথা পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রধান বর্ণে বিভক্ত। যদিও হেরডোটসের মতে সপ্ত বর্ণে, ডাইওডোরসের ও ষ্ট্রাবোর মতে তিন বর্ণে মিশর বিভক্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিশরে চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রথাই প্রচলিত ছিল। ভারতের মত মিশরেও সেই চারি প্রধান বিভাগ হইতে বহু শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতে যেমন ব্রাহ্মণ সর্ব্বজাতির শিরোমণি, মিশরেও তেমনি পুরোহিতসম্প্রদায়ই সকল সাম্প্রদায়িক বিভাগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মিশরের পুরোহিতকুলই ভারতের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়; তাই বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, মিশরের পুরোহিতসম্প্রদায় আর ভারতের ব্রাহ্মণ এক। ভারতের ক্ষত্রিয় ও মিশরের দ্বিতীয় জাতির মধ্যে সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষিত হয়। যোদ্ধা ও কৃষক লইয়া মিশরের ক্ষত্রিয়বর্ণ, উন্নত নাগরিকগণ বৈশ্য বা তৃতীয় বর্ণ, এবং সাধারণ জনগণই (The plebs) মিশরের শূদ্রবর্ণ, বা চতুর্থ জাতি। ভারতবর্ষের মত মিশরেও প্রত্যেক জাতি, আপন

** Scenery costumes and Architecture chiefly on the western side of India—Capt. Robert Melville.

* See the account of Amasis and Polycrates.

আপন জাতিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিত ;—ভিন্নশ্রেণীর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবার প্রয়াস করিত না।

ভারতে ব্রাহ্মণই মস্তক ; অন্যান্য বর্ণ কেহ বা দক্ষিণ হস্ত, কেহ বা বাম হস্ত, কেহ বা সেই বিরাট দেহের পদ-স্বরূপ। মিশরের ব্রাহ্মণ-বর্ণ কিরূপ ছিল, দেখা যাউক। বারেন্দ্র, রাঢ়ী, শ্রোত্রিয়, বৈদিক প্রভৃতির ন্যায় মিশরেও পুরোহিতগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সে বিভাগের মূলে গুণগত বা কর্ম্মগত পার্থক্যই প্রধান বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পুরোহিত স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পুরোহিত বিচারক, পুরোহিত শাসক, ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতা, শৃঙ্গারী, দেবমন্দিরে ছত্রচামরধারী, বলির পশু-পরীক্ষক, বলির পশু-রক্ষক, দেবমন্দিরনির্ম্মাণকারী স্থপতি, দেব-পরিচ্ছদকারী প্রভৃতি সকলেই সেই এক শ্রেষ্ঠ জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখামাত্র। কর্ম্মগত পার্থক্যের জন্য কেহ বড়, কেহ ছোট।

ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ের বাহু ও ব্রাহ্মণের বুদ্ধি একত্র মিলিত হইয়া, রাজ্য-সংরক্ষণে, ধর্ম্মসংস্থাপনে, সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। ক্ষত্রিয় নামমাত্র নৃপতি ছিলেন—প্রকৃত নৃপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁহারা অনায়াসে ধনরত্ন, রম্য হর্ম্ম্য, কনক-সিংহাসন, মণিময় শিরোভূষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যমধ্যে সিদ্ধাশ্রমে অজিনাসনে বসিয়া পরমারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। আর সিংহাসনারূঢ় নরপতি আসিয়া, সেই হোমধূমগন্ধামোদিত নবকুসুমিততরুশোভিত শান্ত আশ্রমদ্বারে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সংসারনির্লিপ্ত অনাসক্ত ব্রাহ্মণের আদেশ উপদেশের অপেক্ষা করিতেন। মিশরেও পুরোহিতশ্রেণী হইতে নৃপতি নির্দ্দিষ্ট হইত। যদি কখনও কোনও সমরব্যবসায়ী (ক্ষত্রিয়) রাজা হইতেন, তাহা হইলে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পৌরোহিত্যে দীক্ষিত হইতে হইত।* তিনিই তখন সমগ্র মিশর রাজ্যে ধর্ম্মের রক্ষক ও পরিচালক স্বরূপ রাজকার্য্য করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। দেব দেবীর মন্দিরে বলির ব্যবস্থা, প্রধান উৎসবকালে দেবমন্দিরে ভোগের ও সামাজিক ভোজনের ব্যবস্থা, শান্তি-সংস্থাপন বা সমর-বিঘোষণ, রণক্ষেত্রে রাজবাহিনীর পরিচালন বা সেনাপতি-

* If the choice fell on a soldier, he was immediately initiated into the order

নির্ব্বাচন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই তখন তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব পরিগণিত হইত। পৌরোহিত্যে দীক্ষালাভ একদিনে হইত না। দীক্ষার প্রারম্ভে অনেক আয়োজন আবশ্যক হইত। পুরোহিতদিগের বিদ্যামন্দিরে তাঁহাকে অনেক দিন ধরিয়া শিক্ষানবিশী করিতে হইত। ধর্ম্মতত্ত্ব, পূজাবিধি, দেশের শাসনপ্রণালী, নৃপতির কর্ত্তব্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাকে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইত। ভারতে যেমন, মিশরেও তেমনি রাজবিধি ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মণ রাজবিধির সৃষ্টি করিতেন। পাছে কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহার মানসিক অবনতি ঘটে, এই জন্য কোন ক্রীতদাস বা বেতনভোগী সাধারণ ভৃত্য তাঁহার নিকটে আসিতে পাইত না। পুরোহিতদিগের পরিণতবয়স্ক সুশিক্ষিত সন্তানগণ নিয়ত তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত।

পুরোহিতসম্প্রদায়ই সর্ব্বদা রাজকার্য্যে সহায়তা করিতেন। তাঁহারাই মন্ত্রী, তাঁহারাই বিচারপতি, তাঁহারাই রাজ্যের প্রধান অমাত্য, তাঁহারাই সর্ব্বকার্য্যে নরপতির উপদেষ্টা ছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কর্ত্তব্যপালনের ও সদাচারের উপাখ্যান শুনাইয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির উপদেশ দিয়া, তাঁহারা সর্ব্বদা রাজার ও সেই সঙ্গে দেশের কল্যাণবৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইতেন ;—রাজা অবনতমস্তকে তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ ও পালন করিতেন। পুরোহিতগণ ইতিহাস, জ্যোতিষ, ভবিষ্যৎ গণনা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। দেবদেবীর মন্দিরসংলগ্ন চতুষ্পাঠীতে এক এক সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ শিক্ষালাভ করিতেন। দেবসেবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে সঙ্গে বিদুষী ব্রাহ্মণীরাও থাকিতেন। মিশরের উচ্চবংশীয় ধনকুবেরদিগের পুরমহিলাগণ, এমন কি, রাজরাণীও এই কার্য্যে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং আপনাদিগকে সম্মানিতই মনে করিতেন। রমণীগণ কখনই প্রধান পৌরোহিত্যে বৃতা হইতে পারিতেন না। পতি পত্নী যে সর্ব্বদা একই দেব ও দেবীর পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা নহে।

পৌরোহিত্য বংশগত ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া প্রধান পুরোহিতের বংশধর যে প্রধান পুরোহিতই হইতেন, তাহা নহে। পুরোহিতগণ সপরিবারে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। তাঁহাদিগকে রাজকর দিতে হইত না ;—রাজভাণ্ডার বা সর্ব্বসাধারণের ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগের ভরণপোষণ চলিয়া যাইত। মিশরের ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ;—এক ভাগ রাজার, এক

ভিন্ন ভিন্ন পুরোহিতদিগের মধ্যে সম্মানের ও প্রতিষ্ঠার তারতম্য ছিল। প্রধান পুরোহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রধান প্রধান দেবতাদিগের পুরোহিতের সম্মান অন্যান্য পুরোহিত অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। পুরোহিতদিগের মধ্যে যাঁহারা দৈবজ্ঞ ছিলেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে খুব ভক্তি করিত। তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, রাজনীতিবিশারদ ও যাজনবিধি-অভিজ্ঞ ছিলেন; পুরোহিতদিগের প্রাপ্য ভূমিকর তাঁহারাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। যখন রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোনও নূতন বিধি প্রচলিত হইত, তখন প্রধান পুরোহিত ও দৈবজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া মিশরাধিপ সে বিধির প্রবর্ত্তন করিতেন না। সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া, ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের অভিমত আবশ্যক হইত বলিয়া, দেব দেবীর ক্রোধাপনয়ন বা আশীর্ব্বাদ-আনয়নে পারগ ছিলেন বলিয়া, পূজাবিধি তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল বলিয়া, পুরোহিতগণ মিশর-রাজের নিকট অধিক সম্মান লাভ করিতেন। দেশের কল্যাণকামনায় তাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেবীর পূজা করিতেন বলিয়া, অনেকেই স্বেচ্ছায় পুরোহিতদিগকে বহু ধনরত্ন দান করিতেন। মিশরবাসিগণ মনে করিত, যাঁহারা শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্রে তাহাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, ব্যক্তিবিশেষের ও সমগ্র জাতির কল্যাণকামনায় সর্ব্বদা পূজারত, তাঁহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সর্ব্বসাধারণের সুখসম্পদ অপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক। তাই পুরোহিতদিগকে দান করিবার সময় তাহারা মুক্তহস্ত ছিল।

ভারতবর্ষের ন্যায় মিশরেও পূজাবিধির বহু আড়ম্বর ছিল। পূজাবিধির আড়ম্বরবাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে এক দিন ভারতে ব্রাহ্মণশক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; ব্রাহ্মণ ভিন্ন সে সকল সূক্ষ্ম বিধি নিয়ম আর কেহ বুঝিত না, শিখিত না, বা শিখিবার উপায়ও ছিল না। ধর্ম্ম যাহার মুষ্টিমধ্যে নিবদ্ধ থাকে, সমাজে সে অচিরাৎ চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে—ভারতবর্ষই তাহার দৃষ্টান্ত। মিশরেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি মিশরীয় পুরোহিতদিগেরই করতলগত ছিল;—পুরোহিত ভিন্ন আর কেহ সে সমুদয় জানিত না, শিক্ষাও করিতে পারিত না; এমন কি, অনেক পুরোহিত পর্য্যন্ত সে সমুদয় সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিত। শুধু কতকগুলি ভাগ্যবানের হস্তেই ধর্ম্মের সারটুকু ছিল, আর অন্যান্য সকলে ধর্ম্মের বাহ্যিক

অংশে বিভক্ত ছিল বলিলেও বলা যায়। স্থূলাংশে অধিকার না জন্মিলে কেহই সূক্ষ্মাংশের অনুধাবনে অধিকারী হইতেন না। সূক্ষ্মতত্ত্বলাভেচ্ছু শিষ্যগণ নির্ম্মলচরিত্র, সংযমী, শান্ত, সুধীর ও সুশিক্ষিত না হইলে, তাহাদিগকে সে অধিকার দেওয়া হইত না। এ জন্য অনেক সময় আবার তাহাদিগকে অতি কঠোর কায়িক ক্লেশও সহ্য করিতে হইত।

পুরোহিতদিগের ভিতর দুই প্রকার লিখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি যে প্রণালী অবলম্বনে লিখিত হইত, তাহাকে Hieratic বলিত। অন্যপ্রকার লিখনপ্রণালী সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিত। ইহা ভিন্ন চিত্রাক্ষরও (Hieroglyphic) প্রচলিত ছিল। পুরোহিতসন্তানগণ জ্যামিতি, গণিত-শাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি শিক্ষা করিত। অধুনা বিলাতে বসিয়া প্রোফেসর মিল্‌নে যেমন ভূমিকম্পের গণনা করিয়া থাকেন, মিশরীয় পুরোহিতগণও সেই-রূপ গণনা করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের যন্ত্র ছিল না, শুধু গণনার দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধি করিতেন। মিশরীয়গণ অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসু ছিল। তখনকার যুগে কোনও জাতিই এ বিষয়ে তাহাদিগের সমকক্ষ ছিল না। হেরডোটসের ইতি-হাসে লিখিত আছে, মিশরীয়গণ যে দিন যে অভিনব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিত, সেই দিনই তাহা লিখিয়া রাখিত, এবং তাহার কারণনির্দ্দেশে ব্যগ্র হইত। এইরূপে ঘটনাবিশেষের একটা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের নির্ণয় করিয়া তাহারা দিনের পর দিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। পক্ষের পরে হউক, মাসের পরে হউক, বৎসরের পরে হউক, যখনই আবার সেই পূর্ব্বঘটনাটি প্রত্যক্ষীভূত হইত, তখনই তাহারা তদ্বিষয়ে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইত। এ সকল বিষয়ে পুরোহিতগণই সকলের শিক্ষক ছিলেন।

তাঁহাদিগের মনে মুখে এক ছিল। সমাজের উপদেষ্টার স্বরূপ তাঁহারা যাহা বলিতেন, আত্মজীবনেও তাহারই অনুসরণ করিতেন। সে কালের সেই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, তাঁহারা আপন আপন উন্নত চরিত্রের বলে অমল ধবল হিমাচলের ন্যায় আত্মগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সমাজমধ্যে মূর্ত্তিমান পবিত্রতাস্বরূপ বিরাজ করিতেন। তাঁহাদিগের যোগাশ্রম হইতে পূত হোমধূম উঠিয়া গগন সমাচ্ছন্ন করিত না বটে, তাঁহাদিগের তপোনিকুঞ্জ সামগানে মুখরিত হইয়া উঠিত না সত্য, কিন্তু দেশের ও সমাজের শাসক ও উপদেষ্টার স্বরূপ তাঁহারা যেরূপ কঠোর কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী ছিলেন, সর্ব্বদা চিত্তশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি লইয়া যেরূপ ব্যগ্র থাকিতেন, তাহাতে তাঁহারাও

ভারতবর্ষের সিদ্ধ তাপসের তুল্য ছিলেন। যদিও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই সাংসারিক ভোগসুখের উপাদান অল্প ছিল না, তথাপি তাঁহাদিগের জ্ঞান ও শিক্ষা, পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব সর্ব্বকালের জন্য তাঁহাদিগকে সংযত রাখিত; তাই তাঁহারা প্রাচীন মিশরসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও আমাদিগেরই মত বুঝিতে শিখিয়াছিলেন, "মা কুরু ধনজনযৌবন-গর্ব্বম্"।

ভারতের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মিশরের পুরোহিতসম্প্রদায়ও ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির প্রচার করিতেন না; ইহার জন্য তাঁহাদিগকে স্বার্থপর বলা যায় না। সংসারের কর্ম্মকোলাহল সুখ দুঃখ প্রভৃতি লইয়া সাধারণ মনুষ্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের জন্য দর্শনের বা ন্যায়ের বা ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বা-লোচনার কোনও প্রয়োজনই নাই—"তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল", সে মীমাংসায় তাহাদিগের কোনও লাভালাভ নাই; দেশের প্রত্যেকেই যদি দার্শনিক হইয়া উঠে, তাহা হইলে সংসার অচল হইয়া পড়ে। তাই পুরোহিত-গণ সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে সুমহান কর্ত্তব্যের উজ্জ্বল আলেখ্য লিখিয়া, সর্ব্বদা পাপের বিভীষিকা ও নরকের যন্ত্রণা দেখাইয়া, পুণ্যের শান্তি ও স্বর্গের সুখের বর্ণনা করিয়া,আত্মজীবনে সৎকর্ম্মের পথ দেখাইয়া,তাহাদিগকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু, শান্তিপ্রিয় ও সত্যনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিতেন—মিশর-সমাজকে সংযত করিতেন—সমাজ-হৃদয়ের উদ্দাম চাঞ্চল্য সংহত করিতেন। মন্ত্রমুগ্ধ সমাজ শিক্ষকের শিক্ষা ও জ্ঞান, চরিত্র ও আত্মশুদ্ধি দর্শনে করযোড়ে চরণে প্রণত হইত; এবং ভারতের ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণসেবার ন্যায়, পুরোহিতদিগের সেবা করিত, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদিগের আদেশ উপদেশ শিরে তুলিয়া লইয়া কৃতকৃতার্থ হইত।

ব্রাহ্মণ তপস্বীদিগের ন্যায় মিশরের পুরোহিতগণও বুঝিয়াছিলেন যে,আহার একটি গুরুতর ব্যাপার। সাত্ত্বিক আহারই উপাসনার প্রথম সোপান। তাঁহারা আরও বুঝিয়াছিলেন যে, আহারের সহিত শরীরের, শরীরের সহিত মনের, এবং মনের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই তাঁহারা আহারে ও বিহারে অতি-শয় সংযমী ছিলেন। আহারের ও পানের যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছিল, পুরোহিত-গণ কোনও ক্রমেই সে পরিমাণ অতিক্রম করিতেন না। অতি সাধারণ খাদ্য-সামগ্রী, কখনও কখনও অনতিতীব্র স্বল্প দ্রাক্ষাসুরা, সাধারণ বেশভূষা তাঁহা-

মৎস্য আহার করিতেন না। পলাণ্ডু, রশুন, বিন (Bean), মটর প্রভৃতিও নিষিদ্ধ ছিল। মেষ, শূকর প্রভৃতির মাংস পুরোহিতদিগের অখাদ্যমধ্যে পরিগণিত হইত। শূকরপালকগণ মিশরসমাজের সর্ব্বনিম্নাসন গ্রহণ করিয়াছিল। কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে চাহিত না—তাহারা দেব-মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পাইত না। এমন অনেক পুরোহিত ছিলেন, যাঁহারা লবণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আহারের ন্যায় দেহশুদ্ধির দিকেও তাঁহাদিগের প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা দিনমানে দুইবার ও রজনীতে আর দুইবার স্নান করিতেন। সর্ব্ব শরীর সর্ব্বদা লোমহীন থাকিত, তিন দিন অন্তর ক্ষৌর কার্য্যের নিয়ম ছিল। মুণ্ডিতমস্তকে, মুণ্ডিতদেহে তাঁহারা দিবারাত্রি চারি বার স্নান করিয়া দেহ-শুদ্ধি করিতেন। মিশরসমাজে ব্রত নিয়মাদির অভাব ছিল না। পুরোহিতগণ সকল ব্রত নিয়মই পালন করিতেন। মধ্যে মধ্যে আবার তাঁহাদিগকে উপবাস করিতে হইত; হিন্দুর মত নিরম্বু উপবাস কি না, তাহা বলা যায় না। কোনও কোনও সময় একাদিক্রমে ৪২ দিন কিংবা ততোধিক দিবস পর্য্যন্ত উপবাস চলিত;—সাত দিনের কম কখনই হইত না। উপবাসের প্রারম্ভে দেহ-শুদ্ধির ঘটা কিছু অধিক হইত।

অশনের ন্যায় পুরোহিতদিগের বসনভূষণও অতি সাধারণ ও সামান্য ছিল। কিন্তু উৎসবের সময় তাঁহারা জমকাল পোষাক পরিধান করিতেন। সকলের পরিচ্ছদই একরকম ছিল না; সম্প্রদায়বিশেষে পোষাক পরিচ্ছদেরও তারতম্য ছিল। প্রধান পুরোহিতগণ যখন দেবতার সমক্ষে পশু বলি দিবার আয়োজন করিতেন, অথবা শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গমন করিতেন, কি অভিষেকের পূর্ব্বে নরপতিকে স্নানাদি করাইতেন, তখন ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত আলখাল্লায় দেহ আবৃত করিতেন। উৎসব ও পুরোহিত-দিগের পদগৌরব অনুসারে নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইত। মন্দিরে পূজা করিবার সময় স্বর্ণহার, স্বর্ণবলয়, কুসুমমাল্য প্রভৃতি ধারণ করিবার রীতি ছিল। পুরোহিতগণ সাধারণতঃ কার্পাসনির্ম্মিত সাধারণ পরিচ্ছদই পরিধান করিতেন। পুরোহিতগণ তালপত্রের অথবা Papyrus বৃক্ষের (পেঁপে গাছ) বল্কলে বিনির্ম্মিত পাদুকা ভিন্ন অন্য পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। যেমন অশন, তেমনই ভূষণ ও তদুপযুক্ত বসন ছিল; আর

বিছাইয়া, তাঁহারা শয্যারচনা করিতেন। সেই তৃণ বা তালপত্রে বিরচিত শয্যার উপর মাদুর অথবা চর্ম্ম বিছাইয়া কোমল উপাধানের পরিবর্ত্তে কঠিন কাষ্ঠখণ্ডে শির রক্ষা করিয়া পুরোহিতগণ অনায়াসে নিশিযাপন করিতেন। পুরোহিতদিগের একের অধিক দারপরিগ্রহ করিবার নিয়ম ছিল না, কিন্তু অনেকে তাহাও করিতেন না। চিরদিন অকৃতদারই থাকিতেন।

যে সময় ভারতবর্ষের সহিত মিশরের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখন তথায় সিংহাসনে পুরোহিত, বিচারাসনে পুরোহিত, মন্ত্রী অমাত্য প্রভৃতিও পুরোহিত। তাঁহারা দীনবেশে, সামান্য আহারে, সামান্য ভূষণে তুষ্ট হইয়া, ধর্ম্ম-সংরক্ষণে, রাজ্য-সুশাসনে ও স্বার্থত্যাগ ও আত্মসংযমে সমাজের হিত-সাধনে নিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন। তখন ভারতবর্ষে যেমন ব্রাহ্মণ সুপ্রতিষ্ঠিত, মিশরে তেমনি পুরোহিত সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতেরও তখন সুবর্ণযুগ, মিশরেরও তখন সুবর্ণযুগ। আর কি সে দিন ফিরিয়া আসিবে?

সহযোগী সাহিত্য।

ভারতের আদিম অধিবাসী।

"ডন" নামক সুপরিচালিত মৈমাসিক হইতে আমরা এই প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিলাম।

ভারতবর্ষের প্রায় এক কোটী অশীতি লক্ষ অধিবাসী সুদুর্গম অরণ্য বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ ও ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত জলাভূমিতে বাস করিয়া থাকে। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের শীতল অরণ্য-সঙ্কুল পর্ব্বতে, ভারতবর্ষের উত্তর-প্রান্তস্থিত যাবতীয় গিরিমালার তরাই ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যে, মধ্য-ভারতের শৈলমালা প্রভৃতি স্থানে, এই সকল অধিবাসীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলেই তাহারা এরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাদিগের আবাসভূমি এরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত যে, তাহাদিগের সহিত পরিচয়-স্থাপন একরূপ অসম্ভব। ভারতবাসীরা জাপানের এনো ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে যত দূর অবগত আছেন, এই সকল স্বদেশবাসী অসভ্যদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদের সেরূপ অভিজ্ঞতা নাই।

ভারতের এই সকল আদিম অধিবাসীদের প্রধান বাসস্থান ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাতীর হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা ও উত্তরে এলাহাবাদ হইতে দক্ষিণে গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বনভূমিই তাহাদিগের প্রধান বাসস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। জাতিগত ও অন্যান্য সাদৃশ্যের হিসাবে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে, গণ্ডজাতি মধ্যভারতে, ভীল ও কোলি জাতি পশ্চিম-ভারতে, মেয়ার ও মীনা-জাতি রাজপুতানায়, কোল, সাঁওতাল ও ধাঙ্গড় জাতি বঙ্গদেশে, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের মধ্যবর্ত্তী

স্থানে, খণ্ডেরা-সকলেই প্রত্যেক অংশের অরণ্য-সঙ্কুল স্থানে সমবেত হইয়াছে। মধ্য-ভারতেই অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক অসভ্যজাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও আসাম ঠিক ইহার পরে স্থান পাইবার যোগ্য। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যবর্ত্তী স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্যজাতি বাস করে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকার জাতি, কেবল দক্ষিণ-ভারত ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আছে। প্রত্যেক জাতির নাম বিভিন্ন, এবং প্রত্যেকের নূতন প্রকার বিশেষত্বজ্ঞাপক চিহ্নও বর্ত্তমান। সীমান্ত প্রদেশের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগে সঙ্করজাতিসমূহ বাস করিতেছে। বহুদিন হইতে তাহারা অসভ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা যে আফগান, মঙ্গোলিয়ান ও ব্রহ্মদেশীয় মূল হইতে উৎপন্ন, তাহাদের শারীরিক গঠন ও অভ্যাস হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই জাতিসমূহ সমতল-ভূমির অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ ও বনভূমিনিচয়ের তাহারাই যথার্থ উপযুক্ত অধিবাসী। তাহারা না থাকিলে বনভূমি নিত্যবর্দ্ধনশীল বন্যজন্তুরই একমাত্র আবাসস্থল হইয়া থাকিত। বন্যজাতিসমূহ বন্যজন্তুদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। তাহারা না থাকিলে পার্ব্বত্য প্রদেশে বাসগৃহের চিহ্নমাত্র লোপ পাইত, এবং অরণ্য পরিষ্কার পূর্ব্বক বাসোপযোগী করিবার আশামাত্র থাকিত না। এই বন্যজাতিবৃন্দ অনেকটা বন্যজন্তুদিগেরই মত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তথাপি তাহারা অরণ্যচর পশুদিগের মতই স্বাধীন। অত্যাচারের প্রতি যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাবশতঃ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ লোকালয় ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এখনও এই বনচরদিগকে অত্যাচারে সেইরূপ বীতরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দাসত্ব ও যথেচ্ছাচারে ঘৃণা তাহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ।

মধ্যভারতের যে অংশ গোদাবরীর নিম্নতম উপত্যকার পূর্ব্বপ্রান্তে ও মহানদীর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত, উহাই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ভারতের অন্ধতম প্রদেশ। এই প্রদেশ উন্নতভূমি ও শৈলমালার সমাকীর্ণ, এবং ইন্দ্রবতী নাম্নী গোদাবরীর বৃহৎ শাখানদীর তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রদেশ সাধারণতঃ গণ্ডোয়ানা নামে পরিচিত। এখানকার অরণ্যভূমি এরূপ দূষিত বাষ্পে পরিপূর্ণ যে, বহুসংখ্যক ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারী জরীপ করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই বেতসজালজটিল, দীর্ঘতৃণসমাচ্ছন্ন ও শেগুন অরণ্যে পরিবৃত প্রদেশ সমুদ্র-সমতল হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই সকল পল্লীতে গণ্ডেরা অযত্ননির্ম্মিত পর্ণকুটীরে বাস করে। ইহারা একপ্রকার নগ্ন বলিলেই হয়। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি পল্লীর সন্নিহিত হইলে, ইহারা কুটীর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে, এবং সন্নিহিত শৈলমালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। বনে উহাদের বাস, বনজাত ফলমূলই উহাদের জীবনোপায়। স্থানে স্থানে ইহারা কুঠার ও অগ্নির সাহায্যে সামান্যরূপ কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। গোদাবরী-সন্নিহিত গণ্ডোয়ানার প্রান্তভাগে বা উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে ধান্যক্ষেত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। বনজাত ফলমূল জম্বু প্রভৃতি ও মৃগয়ালব্ধ মাংসই মধ্যবর্ত্তী গণ্ডদিগের প্রধান অবলম্বন। তাহারা নিপুণ-শিকারী; তীর-ধনুকের সাহায্যে সুন্দর শিকার করিয়া থাকে। মার্দ্দিয়ান পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্র-বতীর উত্তরভাগে 'গণ্ডোয়ানা' প্রদেশ অবস্থিত। এই স্থলে 'মারিয়া'দিগের বাসস্থান। তাহারাই

ইহার একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থলে 'গট্টর' জাতি বাস করে। ঠিক ইহার দক্ষিণে গোদাবরীতীরবর্ত্তী নিম্নভূমিখণ্ডের প্রান্তভাগে 'কোইস্' জাতির বাস। ইহারা সকলেই গণ্ডজাতির অন্তর্ভুক্ত; তাহাদের কথোপকথনের ভাষা এক হইলেও সামাজিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভাগের গণ্ডজাতির আদিম-কালীন আচার ব্যবহার সমতলভূমির হিন্দুদিগের সংস্পর্শে অনেকপরিমাণে সংস্কৃত হইয়াছে।

ভীলজাতি ভীলওয়ারা প্রদেশে বাস করে। এই প্রদেশ রাজপুতানা, খান্দেশ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের ইন্দোর প্রদেশের কিয়দংশ লইয়া গঠিত। মধ্য-প্রদেশের এই সকল স্থল পরিব্রাজকের অগম্য। পরস্পরসংলগ্ন বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া যে স্থানে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া এই গিরিবেষ্টনের মধ্য দিয়া বোম্বাই প্রদেশে নর্ম্মদা যে স্থলে প্রশস্ত নদীর আকার ধারণ করিয়াছে, সেই স্থল অবধি ভীলদিগের বাসস্থান। এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ভীলদিগের জন্য ব্রিটীশ গবর্মেণ্টকে নানাবিধ অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। ভীলদিগকে সুশাসিত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। অবশেষে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভীলদিগকে বশীভূত করিবার জন্য একটি ভীল-সেনাদল সংগঠনের প্রস্তাব করেন। সেনাদলে প্রবেশ লাভ করায়, ভীলদিগের উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতির বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শান্তিরক্ষা বা পুলিসের কার্য্যে ভীলদিগের অসাধারণ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহারা সুনিপুণ শিকারী, সুদক্ষ অরণ্যচর ও অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু। ইহাদের সত্যপ্রিয়তা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা কুকুরের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহা কখনও মিথ্যা হয় না। ভীলেরা সদাপ্রফুল্ল, সরলহৃদয়; কিন্তু অত্যন্ত সুরাপায়ী। পশ্চিম-ভারতের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্য বন্যজাতিসমূহকে কোলি জাতি কহে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তাহারা ভীলদিগেরই অনুরূপ। গুর্জ্জর ও মালব প্রদেশের 'গ্রাসিয়া,' কাণ্ডিস্বরের 'কাত্তিম' ও 'কাত্তুরি' জাতিরা বলে যে, তাহারা লঙ্কেশ্বর রাবণের বংশধর। সহ্যাদ্রির পাদমূলে তাহাদের বাসস্থান।

'খণ্ডেরাই' পূর্ব্বঘাট অদ্রিশ্রেণীর প্রধান অসভ্য অধিবাসী। তাহাদের দেশ গণ্ডোয়ানার পূর্ব্বসীমা হইতে বঙ্গোপসাগর অবধি ও উত্তরে মহানদী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খণ্ডজাতি গণ্ড ও ভীলজাতি অপেক্ষাও বর্ব্বর। তাহারা কৃষিকার্য্য ও যুদ্ধ বিগ্রহের অনুরাগী। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য তাহাদের প্রীতিপ্রদ নহে। পিতাকে তাহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তিনিই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। পিতাই একমাত্র পার্থিব দেবতা। তাঁহার অনুশাসন রাজ-আদেশের ন্যায় তাহারা পালন করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে খণ্ডেরা পিতৃদেবতার তৃপ্তির জন্য তাঁহার সম্মুখে মনুষ্য উৎসর্গ করিত। তজ্জন্য তাহারা সমতলভূমি হইতে মনুষ্য হরণ করিয়া লইয়া যাইত। ভবিষ্যৎ-প্রয়োজন-সাধনের জন্য তাহারা অপহৃত মনুষ্য প্রতিপালন করিত। পরে প্রয়োজন মত তাহাদিগকে বলি দিত।

নীলগিরি পর্ব্বতমালার শষ্পসমাচ্ছন্ন ক্রমনিম্ন ভূমিতে পর্ণনির্ম্মিত কুটীরে 'টোডা' জাতি বাস করে। তাহাদের কুটীরগুলির প্রবেশদ্বার অপরিসর ও অনুচ্চ। এই ক্ষুদ্র দ্বারপথে তাহারা হামাগুড়ি দিয়া যাতায়াত করে।

মধ্যে হিংস্রপ্রকৃতি 'হুরাস' জাতি, দীর্ঘকেশ বিভীষণমূর্ত্তি 'পুলিয়াব' জাতি ও ভ্রমণশীল 'মণ্ডার' জাতি উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোটনাগপুর অবস্থিত। তাহার পূর্ব্বভাগে ছোটনাগপুরের মালভূমি। এই বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত পর্ব্বতসমাকুল প্রদেশের কোথাও বা অরণ্য নিবিড়, কোথাও বা বৃক্ষসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই প্রদেশের বন্যজাতিরা অসংখ্য নামে পরিচিত। কতকগুলি এই পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। কিন্তু সকলেরই আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ প্রকার কথোপকথনের ভাষা প্রচলিত আছে।

এই প্রদেশের কোল জাতির কতিপয় শাখাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তন্মধ্যে 'মন্দা,' 'ভূমিজ,' 'কোল' ও 'লার্কা'রা যুদ্ধব্যবসায়ী। কোলেরাই উল্লেখযোগ্য। কোলেরা নৃত্যকলায় বিশেষ অনুরাগী।

ছোটনাগপুরের মধ্যভাগের সুবিস্তৃত মালভূমিতে 'মুণ্ডা' জাতি বাস করে। ছোটনাগপুরের মধ্যভাগে ও শাখানদীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশ তাহাদের প্রধান আবাসস্থল।

প্রত্যেক গ্রাম্য পঞ্চায়তের (Community) প্রধান ব্যক্তি বা মণ্ডলকে 'মুণ্ডা' বলে। সাধারণের মতানুসারে মুণ্ডা নির্ব্বাচিত হয়। সাঁওতালদিগের মণ্ডলেরা 'মুঞ্জি,' এবং 'ভূমিজ কোল'দিগের মণ্ডলেরা 'সর্দার' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্দারা সিংবঙ্গা অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রের উপাসক। সূর্য্যেরপত্নী। চন্দ্রের কলাপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব প্রবাদ কল্পিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে এক সময়ে চন্দ্র স্বীয় পতি সূর্য্যের নিকট অবিশ্বাসিনী হন। সূর্য্য বিশ্বাস-ঘাতিনী পত্নীকে কঠিন দণ্ড দান করেন। ক্রোধান্ধ হইয়া সূর্য্য স্বীয় পত্নীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। চন্দ্র পরমরূপলাবণ্যশালিনী ছিলেন; সে জন্য সূর্য্য অনতিবিলম্বে পত্নী-বিয়োগে ঘোরতর অনুতপ্ত হন। অতঃপর পত্নীবিয়োগে অনুতপ্ত হইয়া তিনি সময়ে সময়ে তাহাকে পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও শোভায় উদিত হইবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু একবার তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইবার নহে, এই জন্য এখনও তিনি প্রতিকলায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন।

মানভূমে 'ভূমিজ কোল'দিগের বাসস্থান। তাহারা অর্দ্ধ-অসভ্য, অর্দ্ধ-হিন্দু। তাহারা কখন কখন কুলীর কার্য্য, কখনও বা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদিগের প্রকৃতি অরণ্যেরই মত উচ্ছৃঙ্খল। প্রতিবৎসর মানভূম জেলা হইতে চা-বাগানে যে সমস্ত কুলী আমদানি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ভূমিজ কোলের সংখ্যাই অধিক। তাহারা মানভূম জেলার মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে সুবর্ণরেখা ও কোশাই নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে। তাহাদিগের দেশ পর্ব্বতমালার দ্বারা বিভক্ত বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। পশ্চিমদিকবর্ত্তী অসভ্য জাতিরা মুণ্ডাদিগের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্ব্বপ্রান্তবাসী অসভ্যেরা বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, এবং হিন্দু রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

কোলজাতির মধ্যে 'হসে'রাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। তাহাদিগকে লার্কা যুদ্ধজীবী কোলও বলে। তাহারা দীর্ঘাকার, সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠদেহ। ছোটনাগপুরের অসভ্য

সিংহভূম জেলার মধ্যবর্ত্তী মুক্ত মালপ্রদেশ তাহাদের অধিকৃত। এই স্থানটি কহ্লান নামে পরিচিত।

কোল-বংশের তিনটি শাখা ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক অন্ত্যজ জাতি ছোটনাগপুর মালভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে 'ওরায়ন' জাতি, গঙ্গাতীরে 'চেরস' জাতি, পালামৌ প্রদেশে 'প্যারিয়া' ও 'বিজিয়া' জাতি, মানভূম ও রাঁচিতে 'ঘেরিয়া', হাজারিবাগ 'বীরহোড়' প্রভৃতি জাতির আবাসস্থান।

সাঁওতাল জাতি বঙ্গদেশের পশ্চিমবর্ত্তী প্যালামৌ, হাজারিবাগ, মানভূম প্রভৃতির অরণ্যে ও রাজমহল শৈলশ্রেণীর পাদদেশে বাস করিয়া থাকে। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ সাঁওতাল পরগণা নামে অভিহিত।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'বেলুচী', 'পাঠান', 'ওয়াজিরি', 'গুণোটী', আফ্রিদি, 'মোমুন্দ', 'সোয়াৎ' প্রভৃতি জাতি বাস করিয়া থাকে। এই সকল অসভ্য জাতির কতকাংশ ইংরাজ গবর্মেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

হিমালয় গিরি-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত উত্তরসীমান্তবর্ত্তী ভূমির পশ্চিমপ্রান্ত হইতেই 'ভুটিয়া', 'খাসিয়া', 'বক্সা' ও 'থারু' জাতির বাসস্থান পরিদৃষ্ট হয়। 'লিম্বু', 'মুরমি', 'কিরান্তি' ও 'লেপচা' জাতি নেপাল ও সিকিম রাজ্যের, এবং 'মেচ' ও 'কয়' জাতি তরাই, দুয়ার ও উত্তর-বঙ্গের সীমান্তে দৃষ্ট হয়।

ভুটান রাজ্যের পূর্ব্ব হইতে আসামের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত হিমালয় প্রদেশে বহুতর অসভ্য জাতির বাস। এখনও বৃটিশ-গবর্মেণ্টের তাহাদের সহিত কোন সংস্রব হয় নাই। কেবল বাহিরের গিরিপাদমূলে যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের অধিকৃত স্থানের কিয়দংশ বৃটিশ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। নির্ব্বিবাদে ইংরাজ গবর্মেণ্টের বশ্যতাস্বীকার করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ইহারা তাঁহাদের নিকট হইতে নানারূপ নির্দ্ধারিত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে 'আকা', 'দালফা', 'মিরি', 'আবর' ও 'মিশমী'রাই উল্লেখযোগ্য। তাহারা ব্রহ্মপুত্র নদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ উপত্যকাভূমিতে বাস করে। দক্ষিণ উপত্যকা-ভূমিতে 'কামৃট', 'সিংপো' ও 'নাগা' জাতি বাস করে। নাগা শৈলমালার পশ্চিমপ্রান্তস্থ প্রদেশ, 'খাসিয়া', 'গারো', 'কাছাড়িয়া', 'মিকির' ও 'কুকি' জাতির অধিকৃত। শেষোক্ত জাতির আবাসস্থান হেলাকান্দি উপত্যকা হইতে চট্টগ্রামের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। "ভারতী" উনত্রিংশ বৎসরে পদার্পণ করিল। আমরা সানন্দে "ভারতী"র অভিনন্দন করিতেছি। * বাঙ্গালার মাটীতে আগাছারই একাধিপত্য; এখানে সাহিত্যের আবাদে কোনও মতেই 'সোনা ফলে না'। হয় ত আমরাই 'কৃষিকাজ জানি না'। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখি, এ দেশে আগাছাই বেশ গজায়, ক্ষেত ছাইয়া ফেলে। মাসিকপত্রের চাষ ত নাই বলিলেও চলে; আনাচে কানাচে মাসিকের যে সামান্য 'আওলাত' দেখিতে পাই,

বিলয়! জন্মমাত্রেই, সূতিকাগারেই, পুত্র-শিশুদের পেঁচো-প্রাপ্তি ও গঙ্গালাভ! কেবল দুঃখ করিয়াই নিস্তার নাই, নৈরাশ্যে মন ভাঙ্গিয়া যায়। এই দুর্দ্দিনে "ভারতী"র দীর্ঘজীবন আশার আলোর মত মনোরম মনে হইতেছে। কিন্তু এই হর্ষেও বিষাদ উপস্থিত! এই কি সেই ভারতী? হিমালয়নিঃসৃতা গঙ্গার ন্যায় যে ভারতী দ্বিজেন্দ্রনাথ হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য সরস স্নিগ্ধ করিয়াছিল, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ অতিসন্তর্পণে যাহার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, যে ভারতীর কমলবন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার লীলাভূমি, বর্ত্তমান সম্পাদিকা সেই পুণ্য প্রবাহ খবরের কাগজের 'ধাপা'য় মিশাইয়া দিলেন! এই কি সেই ভারতী? প্রৌঢ়ে সে জগদ্ধাত্রীর সৌন্দর্য্য কই? কচি খুকীর 'দেয়ালা' কি উনত্রিংশবর্ষীয়া ভারতীর পক্ষে কোনও মতে শোভন হইতে পারে? ভারতীর বিজ্ঞাপনে এবার অতিরিক্ত গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম। কিন্তু কথায় বলে, 'যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না'। প্রবাদটি সত্য। বৈশাখ-সংখ্যায় প্রবন্ধের 'বর্ষণ' তত আশানুরূপ নয়। বিজ্ঞাপনের ধুমধামেই অধ্যবসায় উপিয়া গিয়া থাকিবে। "মাঙ্গলিক" কি একটি কবিতা? যাহার আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা নাই, তাহারও "মাঙ্গলিক" রচিবার স্পৃহা হইতে পারে; 'কুঁজোও অনেক সময় চিৎ হইয়া শুইতে চায়,' কিন্তু ছাপাইয়া পাঠকের স্কন্ধে তাহা চড়াইয়া দিবার হেতু কি? সম্পাদিকা কি মনে করেন, তিনি ভারতীর প্রথম পৃষ্ঠায় যাহা ছাপাইয়া দিবেন, তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য ছাপাইয়া উঠিবে? "অসীমে মগন হয়ে শক্তি লাভ সসীম সাধনে" খুব উৎকৃষ্ট হেঁয়ালি, কবিতা নয়। কবির অনুমতি,—"বর্ষশেখরে চাহ;"—আচ্ছা, আমরা চাহিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোথায়, কোন দিকে, কাহার পানে চাহিব কবিবর? "বর্ষশেখর" চেতন, অচেতন, না উদ্ভিদ? তিনি নর, না নারী? যক্ষ, না রক্ষ? "নবভানুতেজে স্নান করিয়া" বসিয়া আছি, বলুন, আপনার "বর্ষশেখর" কে, তাঁহাকে দর্শন করি, আমার "হোক অক্ষয় বল সমাধান!" এমনতর দুর্দ্ধর্ষ কবিতা পড়িয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে হইলে প্রথমেই যে "অক্ষয় বল" মূলধন চাই,—হেঁয়ালী বুঝিবার বুদ্ধি না ধরিলেও, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরাও তাহা বুঝিতে পারি। যদি রাগ না করেন ত একটি পরামর্শ দি—স্বদেশবাসীকে যদি শক্তিশালী করিতে চান, তাহা হইলে এমন গুরুপাক শক্তিমন্ত্র পড়াইয়া তাহাদিগকে খামকা 'কাহিল' করিবেন না। "মাঙ্গলিকে"র শঙ্খ ঘণ্টা নীরব না হইতেই শ্রীমতী সরলা দেবী "আমার বাল্যজীবনী" লইয়া উপস্থিত। এ "বাল্যজীবনী"র উপযুক্ত সমালোচনা কমলাকান্ত করিতে পারিতেন, আমাদের সে দুঃসাহস নাই। আমরা কেবল দুই একটি প্রশ্ন করিব। "বাল্যজীবনী" বাঙ্গালী পাঠকের জন্য রচিত কি না? যাহারা বাঙ্গালা পড়ে, তাহারা বুঝিতে পারে, লেখিকার এমনতর কোনও সাধু উদ্দেশ্য আছে কি না? যদি সেরূপ কোনও সঙ্কল্প করিয়া লেখিকা কলম ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সে অভিপ্রায় পণ্ড হইয়াছে। "আমার সর্ব প্রথম যে নিজেকে মনে পড়ে সে তিন বছরের আমি।" ইহা স্মৃতিশক্তির পরাকাষ্ঠা বা ইন্দ্রজাল হইলেও, বাঙ্গালা নহে। "বালিকার সাবানপিচ্ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যত তাহারা মর্দ্দন ও ঘর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তত সেই অধীরা বালিকা * * * নর্দ্দমার দিকে ছুটিতেছে।" ধরিয়া রাখিবার এ কি অপরূপ ব্রহ্মাস্ত্র! ইহাতে কি বুঝিব? বাল্যকালে যে ভাষায় কথা

কহিতেন, অন্ততঃ সেই ভাষায় লেখেন না কেন? তাহা হইলে পাঠকদিগকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না, মাতৃভাষাও 'আস্ত' থাকে, এমনতর 'খাস্ত' হইয়া যায় না। প্রতিভা যাহা উদ্গিরণ করে, তাহাই 'ক্লাসিক' হইয়া যায়, এ কথা অস্বীকার করিব না; কিন্তু একটু বিচার করিয়া শব্দবিন্যাস না করিলে সহজবুদ্ধি সামান্য পাঠকের বিপত্তির সীমা থাকে না। এই দেখুন, "শেয়ালদহ ষ্টেশনের লাইনে কখানা খালি রেলগাড়ী পড়িয়া থাকিত। বিকালবেলা হাওয়া খাওয়াইবার জন্য লইয়া গিয়া কোন কোন দিন চাকররা আমাদের কয় ভাই বোনকে সেই গাড়ীতে চড়াইয়া দিত। একদিন তাহাতে বসাইয়া হঠাৎ তাহারা গাড়ী টানিতে লাগিল।" গল্পটি বেশ, এবং জমিতেছিল। কিন্তু "তাহারা" অর্থাৎ ভৃত্যগণ "গাড়ী টানিতে লাগিল" শুনিয়া মনে হয়, ভীম, হার্‌কিউলিস্‌, অন্ততঃ স্যাণ্ডো লেখিকার চাকর ছিল, নতুবা সাধারণ চাকরে ছাতু-লঙ্কার জোরে একটা 'ওয়াগন' টানিতে পারিবে কেন? হয় ত তাহারা 'ঠেলিয়া' থাকিবে;—হয় ত তিন বৎসর বয়সের এই কাহিনী লেখিকার ঠিক মনে নাই, তাই লিখিবার সময় একটু ওলটপালট হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে এই সামান্য ঘটনাটি 'অতিপ্রাকৃত' হইয়া পড়িয়াছে। হয় ত "খুব-বাল্যজীবনী" লিখিবার পথে এইরূপ বিবিধ অন্তরায়-কণ্টক বিদ্যমান। পাঁচ ছয় বৎসরের একটি ঘটনা এই,—"কিন্তু আশ্চর্য্য, আমার একবারে নিঃসঙ্গ মনে হইল না। আকাশ যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আলো যেন সঙ্গী রহিয়াছে; আর থাকিয়া থাকিয়া মনে মনে একটা অনুভব হইতে লাগিল, আমার যিনি শাস্তিবিধাতা ঈশ্বর তিনিও যে কোন্‌ এক জায়গায় রহিয়াছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগাইলেই যেন তাঁহার কাছে পৌছান যাইবে।" আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু আমরা যদি পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে এমনতর অনুভব করিতাম, এবং ঘুণাক্ষরে তাহা ঠাকুমা কি দিদিমার কর্ণগোচর হইত, তাহা হইলে রোজার হাতে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। সেই বয়সেই লেখিকার উপলব্ধি হইয়াছিল,—"তিনি (ঈশ্বর) আর আমি কি এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ!" বাস্তবিক দুনিয়ার গতি অতি আশ্চর্য্য! কেহ শৈশবে না চাহিয়া যাহা পায়, কত মুনি ঋষি তাহারই কামনায় যুগ যুগ যোগে মগ্ন থাকিয়াও হয় ত তাহা পান নাই! কালিদাস পার্ব্বতীর শিক্ষার কথায় বলিয়াছেন,—"প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।" ইহাও সেইরূপ। থিয়সফি সভায় হীরেন বাবুও বোধ করি ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না। লেখিকা বলিতেছেন,—"কিন্তু সেই অতি শৈশবে যেদিন ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণী-(!)-শূন্য বিশ্বকে দেখিয়া আমি নির্ভীক ছিলাম, যেদিন আমার মন যেন শিশুর কলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিল,—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে' ইত্যাদি * * * সেদিন আমার মনের সেই স্বাবলম্বন কোথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধ হয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নয়।" নিশ্চয় বলিতে পারি, এ ভাবনা লেখিকার একলার নয়, যে পড়িবে, তাহাকেই ভাবিয়া মরিতে হইবে। অত অল্প বয়সে অত বড় স্বাবলম্বন 'সহজাত' হইতে পারে, স্বপ্নজাত' হইতে পারে, কল্পনাজাত হইবারও বিশেষ আটক নাই। আমরা কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি। লেখিকা একবার অন্ধকারে দিদি ভাবিয়া "বুড়ী তিনকড়ি দাসীর কুঞ্চিতচর্ম্ম, বলিত, অপরিষ্কৃত গণ্ডে চুমু" খাইয়াছিলেন। ঘটনাটি বড় রম্য, অতি মধুর। ইহাতে আনন্দের

সঙ্গে শিক্ষাও আছে। অন্ধকারে কেহ 'চুমু' খাইও না। অন্ততঃ পকেটে দেশলাই রাখিও, আগে জ্বালিও, তাপ পর যোগ্যপাত্রে 'চুমু' অর্পণ করিও। খুব হুঁসিয়ার! নয় ত কোনও তিনকড়ি চাকরাণী তোমার সোনার 'চুমু' চুরী করিতে পারে। এখানে আর একটি প্রসঙ্গ আপনি উপস্থিত হইতেছে। লেখিকা এই চুম্বনকাণ্ডের পরের প্যারাতেই বলিতেছেন যে, "আর একবার একটী গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম।" তাহা হইলে বুঝিব কি যে, ছয় বৎসর বয়সে অন্ধকারে রামের 'চুমু' শ্যামকে দিয়া ফেলিলে অপরাধ হয়? "সেই লোল শ্লথ মাংসপিণ্ডকে ভালবাসিয়া আদর" করিয়াছিলেন, তাই কি চুম্বনের অদল বদল অপরাধের কোটায় পড়িল? উদ্দিষ্ট দিদির কপোলের বদলে যদি কোনও অনুদ্দিষ্ট দিদির কপালে পড়িত, তাহা হইলেও কি অপরাধ ঘটিত?—লেখিকা এই কয় পাতার মধ্যে কত কাণ্ডই করিয়াছেন! "রাজা ও রাণী"র রাজা আক্ষেপ করিয়াছিলেন,—

> "নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
> ক্ষমা তব: তাহারো দিলে না অবকাশ?"

শ্রীমতী সরলা দেবীর ভাবী বসোয়েলও বলিতে পারেন,—

> "লিখিতাম 'জীবনী' তোমার ভিক্ষা মাগি উপাদান:
> তাহারো দিলে না অবকাশ?"

ভাষা সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার খিচুড়ী এখন অত্যন্ত চলিত হইয়া পড়িয়াছে। "মড়া-দাহ" ও "শব-পোড়ান" এখন নিশ্চিন্তচিত্তে নাসায় সর্ষপতৈল দান করিয়া সুপ্তি সুখে মগ্ন—আর কেহ তাহাদের লইয়া টানাটানি করে না।—ইহাতে আর নূতনত্ব "নাই। আর "দৈবী অস্ত্র" উদ্যত করিয়া ব্যাকরণকে ভয় দেখাইয়া লাভ কি? 'অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে' আপনাদের করকমলে যে অস্ত্র বিরাজ করিত, যাহার নাম ছিল সম্মার্জ্জনী, "দৈবী" অসঙ্কোচে তাহার বিশেষণ হইতে পারে। কিন্তু অস্ত্র শব্দটি পুংলিঙ্গ, তাহার পক্ষে "দৈব" শব্দটিই পর্য্যাপ্ত। "ঐশ্বরী দান"ও "দৈবী অস্ত্র"র ভায়রা-ভাই। পুরুষের উপর নারী জাতির রাগ সুপ্রসিদ্ধ,—লেখিকা কি পুরুষ বিশেষণগুলির উপরও হাড়ে চটিয়াছেন?—তাহাদিগকেও "ভারতী"র কুঞ্জ হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছেন? শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" প্রবন্ধে পরিষদের ওকালতী করিয়াছেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এবং এই কৃতজ্ঞতারূপ নিরাকার বস্তুর দ্বারা আমরা অবাধে সম্পাদকের হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। কোনরূপ সাকার ভিক্ষার তিনি প্রত্যাশা করিবেন না। পরিষদের কর্ত্তব্য বলিয়া লেখক রামেন্দ্রবাবুর কল্পনায় যাহা আছে, সম্পাদক রামেন্দ্রবাবু তাহা কার্য্যে পরিণত করুন না। শ্রীযুক্ত হাভেলের লিখিত "দেশী তাঁত" সংবাদপত্রের উপযোগী,—উল্লেখ-যোগ্য, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এবারকার "ভারতীতে" আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই। "খেয়াল-খাতা" অস্পৃশ্য। "আমার বাল্যজীবনী"ও খেয়ালখাতারই অন্তর্গত; বোধ করি, সম্পাদিকার খেয়ালেই তাহার 'পূর্ব্বনিপাত' হইয়াছে। অন্য সুপ্রবন্ধ না থাক,—"একশ্চন্দ্র স্তমো হন্তি, ন চ তারাগণৈরপি।" বাল্যজীবনীই এ সংখ্যার পূর্ণচন্দ্র, খেয়ালখাতার তারাগুলি কাজেই নিষ্প্রভ হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "নববর্ষ" একবার "অমৃত-মন্দিরায়" পড়া গিয়াছে। কাহার খেয়ালে আবার খেয়ালখাতার আমলে আসিল?

তন্ত্র।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বিধি, বা নিয়ম, বা শাস্ত্র, এই অর্থেই তন্ত্র শব্দ ব্যবহৃত হইত। এখন তন্ত্র-শাস্ত্র বলিতে যে বিশেষ শাস্ত্র বুঝা যায়, উহা একটি গুপ্ত সাধনবিধি। এ প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই বিশেষ শাস্ত্রটির উৎপত্তির ইতিহাস ও বিবিধ তন্ত্রোক্ত সাধনের কালনির্ণয় প্রভৃতির পূর্ব্বে, প্রচলিত তন্ত্র-গ্রন্থগুলির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

দেবদেব মহাদেব, রুদ্র স্বরূপ; তিনি মহাকাল। কেবল সংহার বা প্রলয়েই যে মহেশ্বরের মহিমা প্রকাশিত, তাহা নহে; সাধকেরা ইঁহাকে শিবস্বরূপ মঙ্গলময় বলিয়া পূজা করেন। অতি প্রাচীন ঋষি-বচনেও আছে,— "রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" এই মহাদেবের মহাশক্তি মহাদেবী বলিয়া পূজিতা। এই মহাদেবীর পূজাই তন্ত্রের বিশেষ প্রতিপাদ্য। দুই তিনখানি বৈষ্ণব তন্ত্র দেখিয়াছি; কিন্তু ঐগুলি যে অত্যন্ত আধুনিক, এবং শক্তিপূজার তন্ত্রের অনুকরণে রচিত, তাহা এ দেশের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক-পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন। কালনির্ণয়ের প্রসঙ্গে সে সকল কথা পরে বলিব।

মাতৃরূপে আদিকারণ বা অনাদি শক্তির পূজা, তন্ত্রের বিশেষত্ব। অন্য কোনও প্রকার পূজাবিধিতে এই সুমধুর ভাবটি নাই; এ দেশেও নাই, বিদেশেও নাই। খ্রীষ্টানের সাধনায় মা বলিয়া পূজা নাই; মা বলিয়া দেব-সম্বোধনে খ্রীষ্টানের অত্যন্ত আপত্তি। হর-দুর্গা অভেদ মূর্ত্তিতে পিতা ও মাতা; এবং মাতৃস্বরূপ স্রষ্ট সন্তানের নিকট অধিক প্রিয়। এই ভাবটি সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। সময়ের কথা পরে বিচার করিব। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শক্তি অসহায় সন্তানের মাতা, এই ভাবটি শাক্তের তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রধান কথা। বৈষ্ণব ধর্ম্মে পুত্ররূপে পূজা আছে, পতিরূপে পূজা আছে, কিন্তু মাতৃরূপে নাই।

তন্ত্রে যে সকল গুপ্তসাধনবিধি আছে, বামাচার আছে, সেগুলি কিরূপে

আর একটি সাধারণ ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াই, বিশেষ বিশেষ তন্ত্রের স্থূল-মর্ম্ম বা সাধন-বিধির উল্লেখ করিব। তন্ত্র-শাস্ত্রের সাধারণ পরিচয়-প্রদানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বেদপাঠে বা বৈদিক অনুষ্ঠানে স্ত্রীশূদ্রাদির অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণীরাও দেবালয়ে বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করাইলে অর্ঘ্য বা অঞ্জলি দান করিতে পারেন। তন্ত্রের বিধানে স্ত্রী হউক, শূদ্র হউক, সকলেই মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে; এবং নিজে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শিবাদি ইষ্টদেবতার পূজা করিতে পারে। দেবপূজায় এই সাধারণ অধিকারের বিস্তৃতি তন্ত্র-শাস্ত্রের দ্বিতীয় বিশেষত্ব।

এ দেশে কত তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। জানিতে পারা যাইবে কি না, তাহাতেও সন্দেহ হয়। মূলতঃ একটা মোক্ষ-বিধি বা সাধনপ্রণালী যদি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা হইলে পরে অনেক সাধক তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন। এই জন্যই বিবিধ স্থলে শ্যামারহস্য, তারারহস্য প্রভৃতি এত রচিত হইয়াছে যে, এখন তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য।

আমরা শ্যামারহস্য, তারারহস্য, চামুণ্ডাতন্ত্র, বগলাতন্ত্র, ছিন্নমস্তারহস্য ও যুক্তযোনিমাহাত্ম্য সম্বলপুর অঞ্চলের হাতের লেখা পুঁথিতে দেখিয়াছি। এই গ্রন্থগুলিতে মহানির্ব্বাণের মানস পূজা, এবং কুলার্ণব ও কামাখ্যাতন্ত্রের বামাচার দেখিতে পাই। কোনও নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক।

তন্ত্রের সপ্তম গ্রন্থ (এই সংখ্যা-গণনায় সপ্তম বুঝিতে হইবে) বৃহৎ কালী-তন্ত্রের বিশেষ উল্লেখ করিব। এই গ্রন্থে দশমহাবিদ্যার স্বতন্ত্রপূজা বিধি আছে। হইতে পারে যে, এই পূজাবিধি অনেকের জানা আছে; তথাপি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক অংশে বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়া স্থূল কথাগুলি লিখিতে বাধ্য হইলাম। তাহা হইলে আমার মীমাংসা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না, পাঠকেরা অনায়াসে বিচার করিতে পারিবেন।

(১) কালী ;—ইঁহার তিনটি নাম পাওয়া যায়। যথা, কালী, কপালিনী এবং কুল্লা। পূজায় এই তিন নামে তিনবার আচমন করিতে হয়। ধ্যানে বলা হইয়াছে, ইনি চতুর্ভুজা, শবারূঢ়া. মহাভীমা, ঘোরদংষ্ট্রা, শিবা, মুণ্ডমালা-ধরা, ললৎজিহ্বা, দিগম্বরা ও শ্মশানবাসিনী। দক্ষিণ দিক হইতে হস্ত-

গণনা করিলে, ইঁহার দ্বিতীয় হস্তে খর্পর, তৃতীয়ে খড়্গ, চতুর্থে নরমুণ্ড এবং প্রথম হস্ত বরাভয়-প্রদানে উদ্যত। বীজমন্ত্রে তিনটি ক্রীং, দুটি হ্রীং ও দুটি হুং উচ্চারিত ও স্বাহা বলিয়া শেষ। একটি অষ্টদল পদ্মের চক্রের মধ্যে একটি বৃত্ত, এবং ঐ বৃত্তের মধ্যে চারিটি ত্রিভুজ; একের পরে অন্যের মধ্যে অঙ্কিত; এই চিত্রটির উপর দেবীর প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতে হয়।

(২) তারা;—বীজমন্ত্র ওঁ হ্রীং ক্রীং হুং ফট্; এখানে ফট্, কিন্তু কালীতে স্বাহা। দেবীর আসন—অষ্টদল পদ্মের মধ্যে একটি বৃত্ত, এবং বৃত্তের মধ্যে একটি ত্রিভুজ; ঐ ত্রিভুজের মধ্যে ত্রীং লিখিত হয়। প্রথম হস্তে পাশ, দ্বিতীয়ে খর্পর, তৃতীয়ে খড়্গ, এবং চতুর্থে ইন্দীবর। মণিবন্ধটি একটি সর্পে বেষ্টিত। ইনি শব-হৃদয়স্থিতা, অট্টহাসপরা, ও পিঙ্গলজটাবিশিষ্টা। ধ্যানে ইঁহাকে হুংকারবীজোদ্ভবাও বলা হইয়াছে। নেপালের তারার কথা ভবিষ্যতে বলিব।

(৩) ষোড়শী;—ইঁহার ও ভুবনেশ্বরীর আসন একটি ত্রিভুজমাত্র। ধ্যান—"বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ভুজাং ত্রিলোচনাং, পাশাঙ্কুশশরাং শ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং ভজে।" ইনি ও ভুবনেশ্বরী আসনে উপবিষ্টা, এবং ঐ আসন বহুদলযুক্ত পদ্ম।

(৪) ভুবনেশ্বরী;—ভুবনেশ্বরীরও ত্রিনয়ন। ইঁহার কুচ উন্নত; এবং বাম পদ অন্য পদে স্থাপিত। প্রথম কর বরাভয়প্রদ, দ্বিতীয় করে খর্পর, তৃতীয়ে অঙ্কুশ, এবং চতুর্থে পাশ।

(৫) ছিন্নমস্তা;—ইঁহার ছিন্ন মস্তক ও রুধির-ধারা-পানকারিণী দুইটি ডাকিনীর ছবির সহিত অনেকেই পরিচিত। দেবীর নগ্নমূর্ত্তি, "রত্যাসক্ত-মনোভবোপরি" স্থিত। আসন,—অষ্টদল পদ্মের মধ্যে একটি বৃত্ত, এবং ঐ বৃত্তের মধ্যে প্রথমে একটি ত্রিভুজ। ঐ ত্রিভুজের তিন কোণে হুঁ ফট্ লিখিত হয়। ত্রিভুজের মধ্যে পরে পরে তিনটি বৃত্ত অন্তর্ভুক্ত, এবং কেন্দ্রস্থলে একটি ত্রিভুজের মধ্যে হুঁ লিখিত হয়। বীজমন্ত্র—শ্রীং হ্রীং ক্লীং হুং হুং ফট্ স্বাহা।

(৬) ভৈরবী—ইঁহার আর এক নাম ত্রিপুরভৈরবী; এই নামটি পরে প্রয়োজনীয় হইবে। ইনি বস্ত্রাবৃতা, পদ্মাসনা ও গলদেশে মুণ্ডমালাভূষিতা। প্রথম হস্ত বরাভয়ে উদ্যত, দ্বিতীয় হস্তের মণিবন্ধে সর্প, তৃতীয়ে রুদ্রাক্ষমালা, এবং চতুর্থে গ্রন্থ। বীজমন্ত্র—হসৈং হসকরীং হসৈং।

(৭) ধূমাবতী। ইঁহার রূপটি বিশেষ যত্নে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন

আছে। ইঁহাকে স্তোত্রে ধূম্রবর্ণা, ধূম্রপানপরায়ণা ও মদিরাপানবিহ্বলা বলা হইয়াছে। ধ্যানটি যথাযথ দিতেছি :—

বিবর্ণা চঞ্চলা দুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষা ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধঘোণা চ কুটিলা ভৃশাং তু কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহাস্পদা॥

স্তোত্রে আবার বলা হইয়াছে,—

চর্ব্বন্তীমস্থিখণ্ডং প্রকটকটকটাশব্দসংঘাতমুগ্রং
কুর্ব্বাণা প্রেতমধ্যে কহহ কহ কহা হাস্যমুগ্রং কৃশাঙ্গী।

এই অতিভীষণ বর্ণনার পর আবার আছে,—

দুরারাধ্যা দুরাচারা দুর্জ্জনপ্রীতিদায়িনী।

বীজমন্ত্রটি এই,—ধূঁ ধূঁ ধূমাবতী ঠঃ ঠঃ।

(৮) বগলা ;—দ্বিভুজা এক হস্তে অসুরের জিহ্বা উৎপাটন করিতেছেন। অন্য কথা নেপালের তান্ত্রিক বিধির কথায় লিখিব।

(৯) মাতঙ্গী ;—ইনি সিংহাসনাস্থা ও চতুর্ভুজা। ইঁহার হস্তে অসি, অঙ্কুশ, খেটক ও পাশ। পূজা—কালীমন্ত্রে হইবে ; কেবল ধ্যান স্বতন্ত্র।

(১০) কমলাত্মিকা ;—ইনিও চতুর্ভুজা ; ধ্যান ভিন্ন অন্য পূজাবিধি ষোড়শীর মত। পদ্মের উপর ইঁহার আসন ; এবং দুটি হস্তী দুই দিক হইতে মাথায় জল ঢালিতেছে।

৮ম—মাতৃকাভেদ ও মাতৃকামাহাত্ম্যতন্ত্র। এই গ্রন্থে নানা প্রকার মারণ, উচাটন, বশীকরণাদির মন্ত্র আছে ; এবং মাতৃকাদের স্বরূপ-কথা আছে। মাতৃকা কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত। প্রথমে দেখা যায় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন জনের শক্তিতে তিনটি মাতৃকা কল্পিত ছিল ;— যথা, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী। তাহার পর আবার ঐন্দ্রী (শচী), কৌমারী (দেবসেনা) ও বারাহী মাতৃকা পাই। এই ছয়টির সমষ্টি লইয়া ষষ্ঠীদেবী। কুমারের জন্মে ইঁহারা শিশুপালন করিয়াছিলেন বলিয়া কুমার ষন্মাতুর ; এবং শিশুর মঙ্গলের জন্য ষষ্ঠীপূজা। কুত্রাপি বা উহার সহিত চামুণ্ডা ও চর্চ্চিকা যুক্ত হইয়া অষ্ট-মাতৃকা পাই। কোথাও বা সপ্ত-মাতৃকার উদাহরণে দেখিতে পাই,—ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী চৈন্দ্রী রৌদ্রী বারাহিকী

তথা, কৌবেরী চৈব কৌমারী মাতরঃ স্মৃপ্ত কীর্ত্তিতাঃ। এখানে ছয়টির সহিত কৌবেরী নূতন সংযুক্ত। মহাভারতের দুইটি স্থলে ও মার্কণ্ডের পুরাণে মাতৃকার সংখ্যা পাই ষোলটি। যথা,—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টী, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা।

মহাদেবের পার্শ্বচর ভূতগুলির নাম ছিল গণ; এবং তিনি নিজে ছিলেন গণপতি। তাহার পর মহাদেবের অধীনে ঐ গণগুলির নায়করূপে একটি স্বতন্ত্র গণপতি পাই। পরে উনি আবার মহাদেবেরই পুত্র হইলেন। মহাদেবের শক্তিতে যে একটি মাতৃকা, তাঁহাকে আবার সংখ্যায় অনেক দেখিতে পাই। যখন ঐ মাতৃকাগুলি ভবানীর পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখি, তখনও উহারা অসংখ্য। মালব দেশের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রস্তরলিপিতে ঐ দেশ মাতৃকা বা প্রেতিনীসঙ্কুলা ও ভয়ানক বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐ মাতৃকাবর্গে কালী নামও পাওয়া যায়। অভিধানেও আছে, কালিকা যোগিনীভেদে কৃষ্ণে গৌর্য্যাং ঘনাবলৌ।

মাতৃকাগুলিকে পূজায় বশ করিতে পারিলে সাধু ও অসাধু সকল কার্য্যই সাধন করিয়া লওয়া যায়, তন্ত্রে এইরূপ কথা আছে। উড্ডীশ (৯), ক্রিয়োড্ডীশ (১০, ও ফেৎকারিণী (১১) তন্ত্রে কেবল এইরূপ মন্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছু নাই। অধিকাংশ মন্ত্রের সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালা কথা মিশ্রিত পাই। উহাতে "ভাত পড়া" আছে, "কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা" আছে, এবং মন্ত্রের মধ্যে অনেক একালের কথা আছে। ফেৎকারিণীতে যে শ্মশানসাধনা আছে, উহাও মাতৃকামাহাত্ম্যের অনুরূপ। সাধনাটা শ্মশানে শবের উপর বসিয়া রাত্রিকালে করিতে হয়।

১২শ ও ১৩শ - কুমারী-তন্ত্র এবং রুদ্র যামল-তন্ত্র।

কুমারী-তন্ত্রে ও রুদ্রযামলে কুমারীপূজার বিশেষ বিধি ও কুমারীদিগের শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যায়। কুমারীনির্ব্বাচনে, জাতিভেদ করিলে পাপ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। কুমারী নিজে সাক্ষাৎ দেবীর প্রতিমা, এবং ভিন্ন ভিন্ন বয়সে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেবী। এই শ্রেণীবিভাগের স্থূল মর্ম্ম এই ;- কুমারী এক বৎসর বয়সে সন্ধ্যা, দুই বৎসরে সরস্বতী, তিন বর্ষে ত্রিধামূর্ত্তি, ৪ বর্ষে কালিকা, ৫ বর্ষে সুভগা, ৬ বর্ষে উমা, ৭ বর্ষে ভিল্লিনী, অষ্টমে গৌরী, নবমে রোহিণী, দশমে কন্যা, একাদশে রুদ্রাণী, দ্বাদশে ভৈরবী,

ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশে ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শে অম্বিকা। কিন্তু যৌবনোন্নতা কুমারীই পূজায় প্রশস্তা। কুমারীপূজা না হইলে কোনও যজ্ঞাদির ফল হয় না। গন্ধর্ব্বতন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র হইলেও, তাহাতেও এই ব্যবস্থা আছে। রাধাতন্ত্রেও কাত্যায়নীর পরিবর্ত্তে কেবল রাধা আছেন, এই যাহা প্রভেদ। গন্ধর্ব্বতন্ত্র (১৪) ও রাধাতন্ত্রের (১৫) বৈষ্ণব ভাবের কথা পরে বলিব।

১৬ হইতে ২১ ; -দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত যে তন্ত্র কয়েকখানির নাম করা গেল, উহাতে যে সকল বামাচারের কথা আছে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় অত্যন্ত অপবিত্র। ঐ সকল সাধনের কথা কুলার্ণব, কামাখ্যা, গুপ্তসাধন, নির্ব্বাণ, (মহানির্ব্বাণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ), নীল ও বৃহন্নীল তন্ত্রে বিশেষ ভাবে আছে। ঐ সকল অপবিত্র কথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গেলেও কল্পনা দূষিত হয়, এবং চিত্ত কলুষিত হয়। আমাদের দেশের নিষ্ঠাবান প্রাচীন শাক্তেরাও ঐ সকল অনুষ্ঠান অতি ঘৃণিত ও পাপপূর্ণ মনে করিয়া দূরে পরিহার করিতেন।

নীল ও বৃহন্নীল তন্ত্রে 'মহাচীন ক্রম' আছে। হিমালয়প্রদেশস্থ জাতি চীনজাতীয় বলিয়া কথিত হইত ; এবং এখন যে দেশ চীন বা চায়না নামে খ্যাত, উহার প্রাচীন নাম ছিল মহাচীন। এতৎপ্রসঙ্গে এইটুকু স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তন্ত্রশাস্ত্রে 'মহাচীন ক্রম'ও অবলম্বিত হইয়াছিল। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, দেবীপূজায় অবশ্যব্যবহার্য্য একশ্রেণীর জবা ফুল, ঐ চীন দেশের আমদানি ; এ দেশে ছিল না।

২২—২৫ ;—কঙ্কালমালিনী, জ্ঞানসংকলিনী, তোড়ল ও নিরুত্তর তন্ত্র, তান্ত্রিক যোগ বা হঠযোগের কথায় পূর্ণ। অর্ব্বাচীন বৌদ্ধযোগ ও দ্রাবিড়ী যোগ যে পতঞ্জলির নামে প্রসিদ্ধ যোগানুশাসন হইতে ভিন্ন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে দেখাইব। এই অর্ব্বাচীন যোগে যে সকল অদ্ভুত শারীরতত্ত্ব পাওয়া যায়, এবং থিয়সফিষ্টেরা যাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নিযুক্ত, তাহা এই সকল গ্রন্থে অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা চিরদিনই এই সকল যোগসাধন অগ্রাহ্য করিয়াছেন ; এবং আপনাদের সন্ধ্যা ও গায়ত্রী একমাত্র সাধনার সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

২৬ ;—একখানি গায়ত্রীতন্ত্রও পাওয়া যায়। ইহাতে যে প্রকার বিধান আছে, সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরা তাহা অবলম্বন করেন নাই। একটা

কথা বলিব; পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। আমার স্মরণ আছে যে, উপবীত হইবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র সন্ধ্যা ও গায়ত্রী মুখস্থ করিয়াছিলাম। আমার সেই সময়কার সাবিত্রীগুরু তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতি কয়েকটি নূতন মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে প্রসঙ্গচ্ছলে তান্ত্রিক সন্ধ্যা গায়ত্রীর কথা বলেন। তখনই শুনিয়াছিলাম যে, মন্ত্রগ্রহণ করিবার পর যদি গুরু আদেশ দেন, তাহা হইলেই তান্ত্রিক সন্ধ্যা গায়ত্রীর সাধ্যায় করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রীতে কিছু বিশেষত্ব দেখিলাম না। উহার সঙ্গে যে একটি দেবীধ্যান আছে, তাহাও সন্ধ্যার অন্তর্গত বলিয়া মনে হইল না।

২৭;—কামধেনুতন্ত্র নামে বঙ্গদেশে একখানি তন্ত্র প্রচলিত আছে। অন্যত্র কোন তান্ত্রিক পণ্ডিত এই গ্রন্থের নাম জানেন না। গ্রন্থখানি যে বাঙ্গালী পণ্ডিতের রচনা, এবং অত্যন্ত একালের, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ককারাদির যে তত্ত্ববর্ণনা আছে, তাহা হইতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত অক্ষরের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রগ্রন্থমাত্রেই জাতি-নির্ব্বিশেষে সাধনার অধিকার আছে। কিন্তু এই গ্রন্থেই কেবল শূদ্রাদির উপর কঠোর কটাক্ষ। এই কটাক্ষ ও তীব্রতা কেবল পুরুষ শূদ্রের প্রতি; কিন্তু সাধনার্থ কামিনীগ্রহণে আচণ্ডাল সকল জাতিই দ্বিজতুল্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানির নাম সর্ব্বশেষে উল্লেখ করিতেছি। এই তন্ত্রখানি পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, যে সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান এ দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, এবং কতকগুলি তন্ত্র-প্রদর্শিত বামাচার অনেক স্থলে অবলম্বিত হইয়াছিল, তখন তন্ত্রের দোহাই দিয়াই অনেক তান্ত্রিক আচার তিরোহিত করিবার জন্য, এই পবিত্র গ্রন্থখানির অভ্যুদয়। কুলার্ণবাদিতে যে সকল কুলাচার পাওয়া যায়, সেগুলি আদৃত ছিল বলিয়াই যেন কোনও প্রকারে তাহা স্বীকার করিয়া, মদ্যমাংসাদি পরিহার পূর্ব্বক কুলাচারের নূতন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে; এবং মোক্ষপথের জন্য আদর্শ সাধনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তান্ত্রিক প্রথায় শৈববিবাহের বিধান করিয়া, অনেক অপবিত্রতা-পরিহারের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে কামাখ্যা তন্ত্রাদির কথা যে, পরস্ত্রী না হইলে "সুধীর" সাধনা হইবে না, অন্য দিকে এই তন্ত্রের উপদেশ যে, ভৈরবীচক্রে

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কতকগুলি প্রবন্ধ সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র লক্ষ্য করিয়া। এই গ্রন্থনির্দ্দিষ্ট মানসপূজা সকল শ্রেণীর ঈশ্বরবিশ্বাসীর নিকট চিরদিন আদৃত হইবে। এই তন্ত্রোক্ত মোক্ষতত্ত্ব প্রাচীন অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমি যে কয়েকখানি তন্ত্রের পরিচয় পাইয়াছি, তাহারই কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এ বিষয়ে আরও কত গ্রন্থ আছে, কে জানে! এ পর্য্যন্ত ইংরাজী কিংবা বাঙ্গালায় তন্ত্রগুলির স্থূল মর্ম্ম লইয়া, অথবা গ্রন্থগুলির কালনির্ণয় বিষয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদি রচিত হয় নাই বলিয়া, গ্রন্থ-পরিচয় প্রবন্ধটি দীর্ঘ করিতে হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্নেহের জয়।

লোকনাথ যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তিনি ব্যতীত আর কেহ তাঁহার পত্নী রাধামণির অসাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথা জানিত না। তাঁহার স্বজনগণ ও কুটুম্বিনীরা রাধামণিকে পাকা গৃহিণী বলিয়াই জানিতেন। কেবল লোকনাথ বিষয়কার্য্য সম্বন্ধেও পত্নীর কুশাগ্রবুদ্ধির সাহায্য লইতেন। স্বামীর বিপুল সম্পত্তির কোন কথাই পত্নীর অজ্ঞাত ছিল না। তাই অপুত্রক লোকনাথ পরিণতবয়সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, চিকিৎসকগণ যখন তাঁহাকে উইল করিতে ইঙ্গিত করিলেন, তখন তিনি বিরক্তিপ্রকাশ করিলেন। লোকে বলিল, মরিতে বড় অনিচ্ছা; কিন্তু যম কাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছায় কাজ করে না। শেষে তাঁহার এক জন বন্ধু কথায় কথায় এমনও বলিলেন যে, উইল করিলেই মানুষ মরে না। তবে মরণ বাঁচন গালি নহে। কখন কি হয়, বলা যায় না। সময় থাকিতে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। লোকনাথ তাঁহার অযাচিত সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। উপদেশ উপেক্ষিত হইলে মানুষের আত্মাভিমান আহত হয়। বন্ধুগণ আর কেহ সে কথা

জানিতেন, রাধামণি সম্পত্তির যেরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তেমন আর কেহ পারিবে না। তাই তিনি উইল করিলেন না।

স্বামীর মৃত্যুতে রাধামণি তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। যে উপায়ে তিনি সুচতুর কমলাকান্তের নিকট প্রাপ্য টাকা আদায় করিলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিল, রাধামণি কেবল পাকা গৃহিণী নহেন,—পাকা বিষয়-বুদ্ধিশালিনীও বটেন। দুই এক জন স্ত্রীলোক পুরুষের বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; ইনি তাঁহাদের এক জন। সে সময় কমলাকান্তের মত চতুর ব্যক্তি অধিক ছিল না। তিনি লোকনাথের নিকট ঋণী ছিলেন। লোকনাথের মৃত্যু হইলে তিনি লোকনাথের সহিত তাঁহার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার বিধবার উপকারার্থ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; উদ্দেশ্য,—সম্পত্তি করতলগত করেন। রাধামণি তাহা বুঝিলেন; বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন, ভাল; ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য। তাঁহার স্বামী অনেকের কাছে টাকা পাইতেন; কমলাকান্ত প্রথমে সেই সকল আদায়ের উপায় করিয়া দিউন। প্রাপ্য টাকার হিসাব প্রস্তুত হইল; দেখিয়া কমলাকান্ত বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ঋণ মিটাইয়া দিলেন। তিনি ভাবিলেন, টোপ্ ফেলিলেন; সম্পত্তিটা হস্তে আসিলে ঐ টাকা দুই দিনে পাইবেন। কিন্তু কয় দিন যাতায়াত করিয়া তিনি বুঝিলেন, স্ত্রীবুদ্ধির নিকট তাঁহার বুদ্ধি নিষ্প্রভ; সম্পত্তি তাঁহার হস্তে আসিবে না!

এ দিকে রাধামণি সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার তিন কন্যা,—যোগমায়া, শ্যামাসুন্দরী ও তারাসুন্দরী। যোগমায়া লোকনাথের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যদুনাথ ও স্বামী রামেশ্বর রাধামণির সংসারেই ছিলেন। কন্যার মৃত্যুর পর রাধামণি বহুবার রামেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, "যদু আমার কাছে থাকুক। তুমি পুনরায় বিবাহ করিয়া ঘরসংসার কর।" রামেশ্বর বলিতেন, "আপনার মত মা আমি কোথায় পাইব?" রাধামণির বিশ্বাস হইয়াছিল, তিনি সম্পত্তির লোভে সংসার পাতাইতে অসম্মত;—স্ত্রীর মৃত্যুর পরও শ্বশুরালয়বাসী। তাঁহাকে লোভী জানিয়া রাধামণি তাঁহার হস্তে সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার দিলেন না। শ্যামাসুন্দরীর স্বামী রমানাথ অত্যন্ত অলসপ্রকৃতির লোক;

পাইলেন না। তারাসুন্দরীর স্বামী আশুতোষ—কর্ম্মঠ, চতুর ও পরিশ্রমী। রাধামণি তাঁহাকেই সে ভার দিলেন।

২

এক বৎসর কাটিয়া গেল। ব্যবহারে যেমন অস্ত্রের ধার তীক্ষ্ণ হয়—সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া আশুতোষের কর্ম্মক্ষমতা তেমনই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাধামণি সন্তুষ্টা হইলেন। তাঁহার অন্য জামাতা দুই জনের মনে ঈর্ষ্যা হইল,—কাজ পাইলে আমরাও দক্ষতা দেখাইতে পারিতাম।

কিন্তু হস্তে অধিক টাকা আসিলে মস্তিষ্ক শীতল রাখা সকল সময় সহজ হয় না; আশুতোষেরও হইল না। তিনি বুঝিলেন, এক বৎসরে রাধামণির সতর্ক দৃষ্টির প্রখরতার হ্রাস হইয়াছে,—তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করেন। এই সময় তহবিলের টাকা লইয়া তিনি কিছু গুছাইয়া লইতে পারেন। তহবিলের টাকা পূরণ করিয়া রাখিবেন, মধ্য হইতে তাঁহার কিছু লাভ হইবে; কেহ জানিতেও পারিবে না। অর্থলাভের আশায় ক্রমে তিনি আর অর্থনাশের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তহবিলে হাত পড়িল।

পৌষ কিস্তির টাকা বন্যার জলের মত আমদানি হইতে লাগিল। আশুতোষও ঘোড়দৌড়ের বাজিতে, কোম্পানির কাগজের বাজারে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মনে করে,—মারিত গণ্ডার, লুটিত ভাণ্ডার। আশুতোষও তেমনই হাতে প্রচুর অর্থ পাইয়া একেবারে প্রচুর লাভের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পড়তা পড়িল না, বাজি জয় করা দূরে থাকুক—দানও পড়িল না। ক্রমেই টাকা যাইতে লাগিল। যত টাকা যাইতে লাগিল, তিনি নষ্টধন-উদ্ধারের আশায় ততই জিদ করিয়া খেলিতে লাগিলেন;—মরা টাকার আশায় ঘরের টাকা পরকে দিতে লাগিলেন।

মার্চ্চ কিস্তির লাটের টাকা পাঠান হইল। রোকড় সহি করিতে যাইয়া আশুতোষ মজুদ তহবিলের অঙ্ক দেখিয়া শিহরিলেন। গোপনে তহবিল পরীক্ষা করিলেন। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? তহবিল বুঝাইয়া দিবার সময় না হইতেই অত্যন্ত সহসা তিনি মফঃস্বল-পরিদর্শনে বাহির হইলেন।

মফঃস্বল-পরিদর্শন আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অতর্কিত সঙ্কল্পে রাধামণির একটু সন্দেহ হইল।

৩

আশুতোষ মফঃস্বলে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে পরিদর্শনে চলিলেন। তাঁহার অসাধারণ উৎসাহে সকলেই বিস্মিত হইলেন। মফঃস্বল হইতে তিনি পুণ্যাহের দিন জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে আষাঢ়ের শেষে নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং পুণ্যাহের দুই দিন মাত্র পূর্ব্বে সদরে উপস্থিত হইলেন।

পুণ্যাহ হইয়া গেল। সালতামামির সময় উপস্থিত। শরীর অসুস্থ বলিয়া আশুতোষ কাগজপত্র শেষ করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে শারদীয়া পূজা উপস্থিত হইল। পূজার গোলে সেরেস্তার কাজ চাপা পড়িল। তাহার পর কয় দিনের অবকাশ। অবকাশান্তে কর্ম্মচারীরা যখন উপস্থিত হইলেন, তখন আর বিলম্ব করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এ দিকে হিসাবনিকাশে অযথা বিলম্ব দেখিয়া রাধামণির সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। তিনি কাগজপত্রের জন্য তাগিদ করিলেন।

সব প্রকাশ হইয়া পড়িল।

রাধামণি বলিলেন, তিনি আর কন্যা জামাতার মুখদর্শন করিবেন না।

আশুতোষ রাধামণিকে জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, এখন অনুনয়, বিনয়, অশ্রু, কিছুতেই কিছু হইবে না। ক্রোধের প্রথম বেগ অপনীত না হইলে, এ সব ব্যর্থ হইবে।

এ অবস্থায় লাঞ্ছিত হইয়া শ্বশুরালয়ে বাস অসম্ভব বুঝিয়া অগত্যা পত্নীকে ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া আশুতোষ শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। গমনকালে তারাসুন্দরী জননীকে প্রণাম করিলেন; রাধামণি মুখ ফিরাইলেন। তারাসুন্দরী কি বলিতে যাইতেছিলেন, অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

৪

আশুতোষ সপরিবারে নূতন গৃহে আসিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি একটি সওদাগরি আফিসে চাকরী করিতেন। সুদিনে আশুতোষ তাঁহার সহিত তত ঘনিষ্ঠতা রাখেন নাই সত্য, কিন্তু রাধামণির উপদেশে তারাসুন্দরী রাখিয়াছিলেন। পাকা গৃহিণী রাধামণি সর্ব্বদাই কন্যাকে বলিতেন,—“দেবর দরিদ্র বলিয়া যদি তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখ, লোকে তোমারও দুর্নাম করিবে, আমাকেও ভাল বলিবে না। যখন সামান্য ঘনিষ্ঠতা রাখিলে লোকে প্রশংসা করে, তখন সে ঘনিষ্ঠতা রাখাই কর্ত্তব্য।”

এখন দুই ভ্রাতা এক বাসা করিলেন। আশুতোষ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজ সহজেই জুটে না।

রাধামণি জামাতার উপর রাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কন্যার উপরও রাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার খাস দাসী বিদ্যা তাঁহার কন্যাদিগকে ও তাহাদের সন্তানগণকে পালন করিয়াছিল। সে প্রত্যহ না হউক, এক দিন অন্তর আসিয়া তারাসুন্দরীর ও তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের সংবাদ লইত। তারাসুন্দরী তাহার নিকট জননীর সকল সংবাদ পাইতেন।

নূতন গৃহে আসিয়া আশুতোষের বাহির অপেক্ষা ঘরেই অধিক বিপদ হইল। তারাসুন্দরীর প্রফুল্ল মুখ দিনান্তকনককিরণভ্রষ্ট সান্ধ্যগগনের মত অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সেই অজস্রসুখলালিতা সৌভাগ্যসম্পদযুতা পত্নীর সম্মুখে আসিলেই তিনি আপনাকে দারুণ অপরাধী মনে করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে তারাসুন্দরী যে মর্ম্মপীড়িতা, তিনি তাহা বুঝিতেন। তাঁহারও মনে হইত,—কেন লোভে পড়িয়া এমন কর্ম্ম করিলাম? আপনি লাঞ্ছিত হইলাম, দুর্নাম লইলাম, আর পত্নীকে মর্ম্মব্যথা দিলাম?

তারাসুন্দরীর মর্ম্মব্যথার আর অবধি রহিল না। স্বামী কেন এ কাজ করিলেন? তিনি কেমন করিয়া লোকের নিকট মুখ দেখাইবেন? তিনি মুখ দেখাইতে পারিতেন না। লজ্জায় ঘৃণায় তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত—চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িত। তিনি দারিদ্র্যদুঃখ সুখে ভোগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এ কলঙ্ককালি মুখে মাখিতে, হায়, বড় যাতনা। এখন উপায় কি? তিনি ভাবিয়া কোন উপায় পাইতেন না। পুত্র কন্যার মুখ চাহিয়া তিনি কাঁদিতেন, ইহারা নিরপরাধ, কিন্তু লোকের নিকট পিতার অপরাধ সন্তানকেও স্পর্শ না করিয়া যাইবে না। অণুবীক্ষণে যেমন জলবিন্দু-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র কীট বৃহৎ দেখায়, তাঁহার আত্মগ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে তেমনই স্বামীর অপরাধ অতি গুরু দেখাইত,—বুঝি প্রকৃত অপেক্ষাও গুরু দেখাইত।

এক দিন তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার অপরাধ কি? কিন্তু মনে সে চিন্তার অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে না হইতে তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। স্বামীর অপরাধই তাঁহার অপরাধ,—তাই তাহাতে তাঁহার হৃদয় আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইত।

এমনই ভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল। আশুতোষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যাতনা আপনার হৃদয়ে আর পত্নীর সম্মুখে।

এই অবস্থায় পৌষ মাসের মধ্যভাগে তারাসুন্দরী যখন বলিলেন, তিনি পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে যাইবেন, তখন আশুতোষ যেন বিশেষ সুস্থ বোধ করিলেন। নূতন গৃহে আসিয়া অবধি তারাসুন্দরী কোথাও গমন করেন নাই—কোন দিন কিছু চাহেন নাই। আশুতোষ মনে করিলেন, পত্নীর মনের গুরুভার অপনীত হইয়াছে। তাই তিনি বিশেষ সুস্থবোধ করিলেন।

আশুতোষের কনিষ্ঠ আফিসে ছুটী লইলেন। তিনি সঙ্গে যাইবেন। নৌকা ভাড়া করা হইল। নির্দ্দিষ্ট দিন তারাসুন্দরী যাত্রা করিলেন।

তারাসুন্দরী কিছু দিন হইতে একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত ব্যগ্রচিত্তা হইয়াছিলেন; কিন্তু সাক্ষাৎ করা ঘটিয়া উঠে নাই।

৫

"বৌঠাকুরাণী, ঐ ষ্টীমার দেখা যায়।" নৌকার অনাবৃত অংশ হইতে তারাসুন্দরীর দেবর তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। তারাসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন,—কূলে নৌকার পর নৌকা; তাহারই মধ্যে—তাঁহাদের নৌকার দুইখানি নৌকার পর—হংসমণ্ডলমধ্যে রাজহংসের মত বৃহৎ ষ্টীমার। তাঁহার নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"আমি সব সন্ধান লইয়া আসি"—বলিয়া দেবর কূলে অবতরণ করিলেন,—জনারণ্যে মিশিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দেবর ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, "অদূরে তাম্বু পড়িয়াছে।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি একটু লক্ষ্য করিও।"

দেবর কূলে নামিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক জন রমণী ষ্টীমার হইতে তীরে শিবিকায় আরোহণ করিলেন।

দেবর তারাসুন্দরীকে সংবাদ দিলেন।

তারাসুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তীরে অবতরণ করিলেন। তীর স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীতে পূর্ণ। উভয়ে সেই দলে মিশিয়া সাগরাভিমুখে চলিলেন।

সম্মুখে সাগর—নীলোর্ম্মিময়,—কামরূপী,—প্রভাতরবিকরপ্রফুল্ল; পশ্চাতে তীর,—জনসঙ্কুল,—ধূপগন্ধামোদিত—শঙ্খঘণ্টাদিরবমুখর। সম্মুখে সাগরের উচ্ছ্বাস—পশ্চাতে ভক্তির উচ্ছ্বাস।

৬

রাধামণির শিবিকা তাম্বুতে উপনীত হইল।

রাধামণি স্নান করিতে যাইবেন। সংবাদ পাইয়া তাম্বুর বাহির হইতে বৃদ্ধ কর্ম্মচারী সংবাদ দিলেন, তাম্বুর ধার হইতে সাগর পর্য্যন্ত পথ দুই পার্শ্বে কানাত দিয়া ঘেরা হইতেছে। কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, সামান্যমাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিলে ভাল হয়। শুনিয়া রাধামণি বলিলেন, "তীর্থ করিতে আসিয়াছি, অত সম্ভ্রম অনাবশ্যক।

রাধামণি স্নান করিতে চলিলেন। বিদ্যা দাসী সঙ্গে চলিল।

স্নান করিয়া রাধামণি যখন কূলে উঠিলেন, সেই সময় এক জন রমণী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাধামণি চাহিয়া দেখিলেন,- তারা! তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বাষ্পোচ্ছ্বাসে তারাসুন্দরীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি কষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন, বলিলেন,—"মা, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। আমি আর তোমার ঘৃণিত—কলঙ্কলাঞ্ছিত এ জীবন রাখিব না। মা, তোমার মাতৃপরিত্যক্তা কন্যাকে এই সাগরে বিসর্জ্জন করিয়া যাও।"

তারাসুন্দরীর অশ্রুধারা জননীর সিক্ত চরণ ধৌত করিতেছিল।

বিদ্যা দাসী থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল।

রাধামণি মুহূর্ত্তমাত্রে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু আর পারিলেন না,— মাতৃহৃদয়ে স্নেহ জয়ী হইল—স্নেহপ্রবাহে ক্রোধ ভাসিয়া গেল। তিনি সেই সৈকতে বসিয়া কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।

বহু কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি মাতা পুত্রীর উপর পতিত হইল। লোক জমিতে লাগিল। তারাসুন্দরীর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। রাধামণি তাহা দেখিলেন,— উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংবরণ করিলেন। তিনি আপনি উঠিয়া কন্যার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে উঠাইলেন, বলিলেন, "তারা, চল।"

তারাসুন্দরী উঠিলেন। তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না। জীবনে অনেক সময় বাক্য অনাবশ্যক; হৃদয়ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে বাক্যের অপেক্ষা রাখে না। রাধামণি চাহিয়া দেখিলেন, কন্যার মুখে দারুণ বেদনার চিহ্ন। তারাসুন্দরী দেখিলেন, বিগলিত স্নেহভাব।

উভয়ে তাম্বুতে আসিলেন।

৭

তাম্বুতে রাধামণি বিশেষ যত্ন করিয়া তারাসুন্দরীর দেবরকে আহার করাইলেন। কুটুম্বদিগকে তিনি স্বয়ং বিশেষ যত্ন আপ্যায়িত করিতেন। আর সকলের আহার শেষ হইলে পূজা শেষ করিয়া রাধামণি আপনার সামান্য খাদ্য পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জিদ করিয়া তারাসুন্দরীকে অগ্রে ষ্টীমারে পাঠাইয়া দিলেন; বলিলেন, "নৌকায় নিশ্চয়ই কষ্ট পাইয়াছিস্। যাইয়া বিশ্রম কর্।" অগত্যা তারাসুন্দরী ষ্টীমারে গমন করিলেন। বিন্দা সঙ্গে গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাধামণি ষ্টীমারে ফিরিলেন।

কামরায় প্রবেশ করিয়া রাধামণি দেখিলেন, তারাসুন্দরী কাঁদিতেছে। তারাসুন্দরী কামরায় জননীর প্রবেশ জানিতেও পারিলেন না। রাধামণি কন্যার পার্শ্বে বসিলেন; সস্নেহে ডাকিলেন,—"তারা!" কন্যা ফিরিয়া দেখিলেন,——মাতা। জননীর সেই স্নেহের আহ্বানে তাঁহার অশ্রু-প্রবাহ দ্বিগুণ বহিতে লাগিল।

রাধামণি সস্নেহে কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। জননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া তারাসুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাধামণি কন্যাকে বলিলেন, "তারা, চুপ কর। আমি তোদের উপর রাগ করিয়া কয় দিন থাকিতে পারি? তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে?"

বহুক্ষণ কাঁদিয়া তারাসুন্দরীর হৃদয়াবেগ প্রশমিত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "মা, তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়াছ। এখন আমি সুখে মরিতে পারিব।"

রাধামণি বলিলেন, "তারা, অমন কথা বলিতে নাই।" মাতৃহৃদয়ে অপত্য-স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রাধামণির নয়নযুগল আর্দ্র।

তারাসুন্দরী বলিলেন, "মা, তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে। কিন্তু আমার এ কলঙ্ক ত যাইবে না।"

রাধামণি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "সে জন্য ভাবিস্ নে। আমি তাহার উপায় করিব।" তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ড বহিয়া আসিয়া বিধবার পুণ্য শুক্লাম্বরে পড়িল।

তারাসুন্দরী মুখ তুলিলেন। ক্রন্দনস্ফীত নয়নে আনন্দের আলোক অমানিশাশেষে উষালোকের মত দেখাইল। তাঁহার মনের ভার দূর হইল।

তারাসুন্দরী দুই দিন স্নানদানাদি পুণ্যকার্য্যে জননীর সঙ্গে রহিলেন, মনে বিশেষ শান্তি পাইলেন।

দুই দিন পরে রাধামণির ষ্টীমার গৃহাভিমুখে ফিরিল।

৮

ষ্টীমার কলিকাতার ঘাটে উপনীত হইল। কয়খানি যান ঘাটে উপস্থিত ছিল। রাধামণির আদেশে বিন্ধ্যা দাসী একখানি যানে আশুতোষের গৃহে গমন করিল।

আশুতোষের নিকট যাইয়া বিন্ধ্যা জানাইল,—মা ডাকিয়াছেন। সহসা এ সংবাদে আশুতোষ কিছু বিচলিত হইলেন; বিন্ধ্যাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিন্ধ্যা প্রকৃত কথা বলিল না।

আশুতোষ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন।

বিন্ধ্যা বলিল,— মা শীঘ্র যাইতে বলিয়াছেন। এখনই চলুন।

আশুতোষের মনে আশঙ্কার ছায়াও পড়িল। কিন্তু ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনি কম্পিতহৃদয়ে যাত্রা করিলেন।

* * * * * * *

আশুতোষ শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন।

শ্বশুরালয়ে ভ্রাতাকে দেখিয়া আশুতোষের বিস্ময় অস্থির ব্যাকুলতার সীমায় উপনীত হইল। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ভ্রাতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হইল না। তিনি সংবাদ পাইলেন, রাধামণি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিকট চলিলেন।

সত্য সত্যই রাধামণি জামাতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আশুতোষ যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাধামণি বলিলেন, "তুমি সহসা চলিয়া গিয়াছ। কাযকর্ম্ম সব বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। এখন আদায়ের মুখ্য সময়; এখন এরূপ করিলে অসুবিধা হইবে। আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। যাইয়া দেখ, তহবিলে কত টাকা আছে।"

"যে আজ্ঞা!" বলিয়া আশুতোষ কাছারীতে যাইলেন। দেওয়ান কাগজ-পত্র লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রোকড়ের পাতা উল্টাইয়া আশুতোষ দেখিলেন, তিনি যে টাকা লইয়াছিলেন, তাহা রাধামণি স্বহস্তে "নিজ খরচ" বলিয়া রোকড়ে খরচ লিখিয়া দিয়াছেন। কালি কেবল শুকাইয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

চীন-জাহাজের যাত্রী।

যেমন হইয়া থাকে, সকল স্থানেই যাত্রী উঠিল ও নামিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর হইতে হংকং যাইবার সময়েই জাহাজে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভিড় ছিল। এই সময় জাহাজের উপর সকলজাতীয় সকল শ্রেণীর যাত্রীই একত্র দেখা যাইত। নানাপ্রকার লোকপূর্ণ যেন একটি ছোট সহরের মত। বর্ম্মা, ম্যালে, চীনে ও জাপানী স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বালিকা দিন রাত্রি একত্র থাকিতে দেখিয়া, তাহাদের আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি পরীক্ষা করিবার এমন সুবিধা আর হয় না। বিভিন্নজাতীয় য়ুরোপীয় ও আমেরিকানেরও অসদ্ভাব ছিল না। বন্দরে নামিয়া লোকের সঙ্গে মিশিবার ও কথা কহিবার এত সুবিধা হয় না। এখানে মিশিতে ইচ্ছা করিলেই মেশা যায়। এমন কি, সুধু এই সময়ে দেখিয়া এই সকল নানাজাতিগত কি কি মিল ও অমিল আছে, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। সকলেই আলাপ করিতে ব্যস্ত। ভাষা না জানিলেও অন্যের সাহায্যে সকল লোকের সকল কথা বুঝা যায়। আর আমার যথেষ্ট অবসর, যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ও নির্ভাবনায় নির্ম্মল বায়ুসেবনে স্বাস্থ্যের প্রফুল্লতাবশতঃ চিন্তাশক্তি বেশ প্রফুল্ল ছিল। যে যে ঘটনাগুলি দেখিয়াছি, মনে গাঁথিয়া গিয়াছে। এই জন্য এই সময়ের ঘটনাগুলির কথা এবং সেগুলি দেখিয়া আমার মনে যে যে ভাবের উদয় হইত, সে সকল এই প্রবন্ধে আলাহিদা করিয়া লেখা আবশ্যক মনে করিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ও বেশভূষাধারী হইলেও, সকলজাতীয় মানবে যে কতকটা ঐক্য আছে, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। যে সকল বিষয়ে মিল আছে, তাহার সহিত তুলনায়, অমিলগুলি অতি অল্প, অতিশয় নগণ্য।

সকল দেশের লোকেই যে এক রকম ভাবে, এবং অবস্থাবিশেষে প্রায় এক রকমই কাজ করে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রবাদ ও চলিত কথা দেখিলে বুঝা যায়। তুফানময় চীনসমুদ্রে কিছু দিন ত উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে যখন উঠিলাম, তখন আবার পূর্ব্বের মত লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এক জন চীনেম্যান অনেকগুলি পুস্তক সঙ্গে আনিয়াছিল। চীন ভাষায়

দিকে মাত্র ছাপা। তার মধ্যে একখানি পুস্তক চীনবাসীদিগের প্রবাদ ও চলিত-কথা-বিষয়ক। অনেকগুলি চীনদেশের প্রচলিত প্রবাদ তাহাতে একত্র সঙ্কলিত ছিল। বইখানির পাতার ভিতর শুক্‌নো ফুলের পাপড়ী দেওয়া ছিল। আমিও ঐ রকম বইয়ের ভিতর ফুলের পাতা রাখিতে ভালবাসি। ঐ স্থানই ফুলের পাতা রাখিবার বেশ স্থান বলিয়া মনে হয়।

যখন ইস্কুলে পড়িতাম, সেই সময় হইতেই আমি নানা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ করিতাম। এখনও আমার সে সংগ্রহের খাতা আছে। হাত-পাখার গায়ে প্রবাদগুলি লিখিয়া রাখিতাম,— সর্ব্বদা চোখে পড়িবে বলিয়া। আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের ভাল ভাল প্রবাদগুলি মুখস্থ করাই। প্রবাদ আমার বড়ই ভাল লাগে; যেন বহুকালের দেখে-শিখা জ্ঞানগুলি হীরক-খণ্ডের মত এক একটি ডেলায় সঞ্চিত রহিয়াছে। পুরাকালের জ্ঞান-জগতের সেইগুলি যেন Fossil remain.

এই বইখানি আমার বড়ই ভাল লাগিল। কতকগুলি প্রবাদের মানে সেই চীনের নিকট হইতে জানিয়া লইলাম। দেখিলাম, তার মধ্যে অনেকগুলির মত প্রবাদ, ইংরেজী, সংস্কৃত, বা বাঙ্গলাতে আমার জানা আছে। সেইগুলির মত ঠিক এক রকম। তাই বলিয়াছি, সকল দেশের লোকেই প্রায় এক রকম ভাবে, এবং অবস্থাবিশেষে একরকমই কায করে। তাহাদের মধ্যে, কতকগুলি প্রবাদ, Parallel passage ও বাঙ্গালা তরজমার সহিত নিম্নে লিখিলাম।

"নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং"— প্রদীপ নিভিয়া গেলে আর তাতে তৈল দিয়া কি হইবে? এ কথার মর্ম্মান্তিক তাৎপর্য্য প্রাচীন চীনেরাও বুঝিয়াছিল।

আর একটি প্রবাদে ঠিক এই শ্লোকটির মত ভাব।—

সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রো প্রণিহিতে রতঃ।
নিম্নগা যথাপঃ প্রবলা পাত্রমায়াতি সম্পদঃ॥

বড়ই সারগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ নীতিকথা। পিতার কোলে উঠিতে পাইলেন না বলিয়া অভিমানে যখন ধ্রুবের ঠোঁট ফুলিতেছিল, তখন তাঁহার মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"সুচরিত্র হও, ধর্ম্মপরায়ণ হও, সকল লোকের ও সকল জীবের মঙ্গলসাধন কর। তাহা হইলে জল যেমন সর্ব্বদা নিম্নগামী হয়, সকল সুখ সম্পদও উপযুক্তবোধে তোমাতেই আসিবে।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে একটি ইউরোপীয়, তাহার ভীমাকৃতি স্ত্রী ও দুইটি শিশু ছিল। মেম সাহেব অহরহ তাঁহার চীনে আয়ার সহিত কলহ করিতেন। এত চেঁচাইতেন যে, লোক জমিত। তাঁহার স্বামী Shekes-pear এর (কুঁদুলী-দমন) "Taming of the Shrew" নামক নাটকের "পিট্রু-সিওর" মত দেখিতে, এবং তিনি স্ত্রী অপেক্ষা আরও চেঁচাইয়া স্ত্রীকে খুব জব্দ রাখিতে পারিতেন। এক দিন স্ত্রী 'সেলুনে' বসিয়া একটি সিল্কের বডি শেলাই করিতে করিতে আয়ার উপর খুব রাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বামী আয়ার উপরে যেন আরও রাগিয়া চেঁচাইয়া—আয়াকে বকিতে বকিতে—টেবিল চাপড়াইয়া—কাচের গ্লাস ভাঙ্গিয়া—তাঁহার স্ত্রী যে রেশমের জামাটি শেলাই করিতেছিলেন, সেইটি লইয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ চুপ! আপনিই সেই জামাটি মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া, নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। এটি স্ত্রীকে জব্দ করিবার জন্য কেবলমাত্র রাগের অভিনয় বলিয়া মনে হইল। নয় ত আয়ার উপর রাগ করিয়া স্ত্রীর জিনিস লোকসান করিবেন কেন! তাঁহার কাছ থেকে ঐ অভিনয়টুকু যদি আমি শিখিয়া আসিতাম, আমারও অনেক কাজে লাগিত!

দ্বিতীয় শ্রেণীতে একটি জাপানী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে লইয়া 'এময়ে' যাইতেছিলেন। ইঁহার বৃহৎ গালার কারবার আছে। তিন জনই এক ঘরে থাকিতেন। তিন জনে সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ লইয়া ব্যস্ত। জাপানী রমণীরা সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেন ও উচ্চ রবে হাসিতেন। কে কত ভারী, তাই দেখিবার জন্য পরস্পরকে কোলে করিয়া তুলিতেন। পুরুষটিও স্ত্রীলোকদিগকে ও স্ত্রীলোকরাও পুরুষটিকে সকলের সম্মুখে কোলে করিয়া তুলিতেন। অন্যে অবাক হইয়া তাঁহাদের অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিত। তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সময় সময় স্ত্রীলোকরা এলোচুলে হাত ও গলা-কাটা নাইটগাউন মাত্র পরিয়া ক্যাবিন হইতে ডেকের উপর আসিতেন। একে বেঁটে আকৃতি, তাহাতে লম্বা কাল চুল, পায়ের গুল্ফ অবধি ঠেকিত। চোখ ছোট ও গাল উঁচু বলিয়া হাঁসিলেই চোখ দুটি বুজিয়া গিয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইত। সকলেরই চক্ষু সেই দিকে ছুটিত। ইহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইত না। যেমন বালক বালিকারা একত্রে খেলা করে, তাঁহারাও তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ স্বাধীনভাবে খেলা দেখিয়া আমাদের অনেকেরই কুটিল মনে কতই কুৎসিত কল্পনা আসিত।

জাহাজে আমি ছাড়া আর একটি হিন্দু পরিবার ছিল। এক ব্যবসাদার চোবে তাহার স্ত্রী ও একটি শিশু কন্যাকে লইয়া যাইতেছিল। স্ত্রীর কালো ফুল্-ষ্টকিং-পরা পায়ে রূপার অলঙ্কার ছিল; ঘাগ্‌রাটি রঙ্গিন ছিটের; নাকে নথ ও কানে বড় বড় অনেকগুলি মাকড়ি। তাহারা ডেকযাত্রী। আর তাহাদের পাশেই দুই জন জাপানী ও একটি জাপানী রমণী থাকিত। সেই জাপানীদের সঙ্গে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে চোবের স্ত্রীর এত বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল যে, যদিও সে তাহাদের কথা বুঝিত না, তবু দিনরাত্রি জাপানীদের কাছে থাকিত। সে হিন্দীতে ও তাহারা নিজের ভাষায় কথা কহিত। তবে ভাবে আন্দাজে অর্থের বিনিময় হইত। বুঝুক না বুঝুক্, সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে হাসি। জাপানীরা কলা ও গব আনিয়াছিল, চোবের স্ত্রীকেও খাইতে দিত। সে তাহা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই খাইত। চোবে নিজে কিন্তু কি সব ভাজাভুজি আনিয়াছিল, তাহাই খাইত। কাহারও ছোঁয়া খাইত না। কিন্তু চোবেকে দেখিতাম, স্ত্রীর যেন গোলামটি।

প্রথম শ্রেণীর সম্মুখে এক 'ম্যালে' ডেকযাত্রী ছিল। তাহার রঙ্গ খুব ফর্সা ও চেহারা উচ্চবংশীয় লোকের মত। মুখে বিষণ্ণভাব। সে সর্ব্বদাই চুপ করিয়া থাকিত। গরীব না হইলে আর ডেকযাত্রী হইবে কেন? কিন্তু ভদ্রোচিত মনে অভিমান ছিল। এক খানি বেতের ইজিচেয়ার সঙ্গে আনিয়াছিল; তার উপরেই দিনরাত বসিয়া বা শুইয়া থাকিত; কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও একটি দেড় বৎসরের ছেলে ছিল। সকলেরই অনিন্দ্যসুন্দর গড়ন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার ও মুখের ভাব। ডেকযাত্রী স্ত্রীলোকদের থাকিবার আলাহিদা স্থান ছিল। সেইখানে তাঁর স্ত্রী ও শিশুর থাকিবার কথা, কিন্তু সে রমণী স্বামীকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিত না। সেই চেয়ারখানির পাশে এসে সারা দিন বসিয়া থাকিত। পরস্পরের সঙ্গেও মুখে বেশী কথা নয়। চাহনিতেই প্রগাঢ় প্রণয় প্রকাশ পাইত। সে ছেলেটির অতি সুস্থ শরীর ও গোল গাল গড়ন। উলঙ্গ কোমরে একগাছি লাল ঘুন্‌শি ও মাথার মাঝে চুলে লাল ফিতা বাঁধা; বাকী মাথা কামান। সবে চলিতে শিখিতেছে। আধ-আধ বুলি বলে' দিন রাত সেই ডেকের উপর ট'লে ট'লে চলিয়া বেড়াইত। জাহাজ শুদ্ধ লোক অনিমিষনয়নে চাহিয়া থাকিত। আমার ক্যাবিন থেকে ঢুকিতে বেরুতে দেখা যাইত। সে দিক দিয়া গেলে আমার সে দৃশ্য হইতে চোখ আর ফিরিত না।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুইটি বর্ম্মারমণী একত্র থাকিতেন; তাঁহাদের সহিত কোনও পুরুষ ছিল না। তাঁহারা খালি পাইলেই আমাদের ডেক-চেয়ার দখল করিয়া বসিতেন। কাপ্তেনের কুকুরটি লইয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া খেলা করিতেন। অনেক রাত্রি অবধি একলা ছাদে ঘুমাইতেন। বুকের উপর অবধি লুঙ্গী বাঁধা থাকে বলিয়া তাঁহাদের চলা ফেরা যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাবের। জমীতে পা ঘেঁস্‌টাইয়া চলিতে হয়। রেঙ্গুনে এক দিন আসিবার সময় বর্ম্মানাচ দেখিয়াছিলাম। রমণীদল সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া একত্র অঙ্গ হেলাইয়া নাচে, দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু আমাদের দেশের মত নাচে চঞ্চল অঙ্গ-বিক্ষেপ নাই।

সকল জাতির স্ত্রীলোকের তুলনায় চীনজাতীয় স্ত্রীলোককে দেখিতাম, সবার অপেক্ষা ভিন্নপ্রকৃতি; মুখে হাসি নাই, উচ্চ কথা নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্র বসিয়া সন্তানের যত্ন করিতেন।

দেখিতাম, যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভাষা আলাহিদা বলিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিতে পারিত না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছেলেরা অনায়াসে পরস্পরের সহিত মিশিয়া খেলা করিত। যেন শিশুভাষা একটি আলাহিদা ভাষা, সকল শিশুই জানে। তাই তাহাদের পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে কষ্ট হয় না।

Fitz Jeraldএর যে বিখ্যাত সার্কাস আসিয়া কলিকাতায় খেলা দেখাইয়া গিয়াছে, তাহারা হংকং, সিঙ্গাপুর, পিনাং ইত্যাদি স্থানেও ঐরূপ খেলা দেখাইতে দেখাইতে আসিয়াছে। তাহারা আমাদের জাহাজেই ছিল। তাহাদের চাকর-বাকরদের দেখিয়া মনে হইত, নীচ শ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের আমাদের দেশের নীচজাতীয় লোকের সঙ্গে অনেকটা মিলে। পশুর মত আচার ব্যবহার—খাওয়া শোয়া। সুর ক'রে অঙ্গভঙ্গী করে কথা কওয়া, আর কথায় কথায় দিব্যি গালা; আর অশ্লীল বিষয়ের আলোচনা করা। তাহাদের ভিতর যে সব স্ত্রীলোক তারে ও ঘোড়ার খেলা দেখাইত, তাহাদেরও স্বভাব সংসর্গদোষে ঐরূপ হইয়াছে।

আর একটি দম্পতীর কথা বলিয়াই শেষ করিব। ইনি এক জন ফরাসী স্ত্রীলোক। প্রথম স্বামী ইঁহাকে কোনও কারণে আদালতের সাহায্য লইয়া পরিত্যাগ করেন। তার পর অনেক দিন ইনি রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী ছিলেন। চার পাঁচ বৎসর হইল, এক জন ইংরাজ যুবক সওদাগর ইঁহাকে বিবাহ

করিয়াছেন। দুটি মেয়ে হইয়াছে; তাহাদের মায়ের মত নীল নীল চঞ্চল চোখ। বিবাহের ছ' মাস পরেই প্রথম কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হয়। এখন ইনি সংসারী হইয়া বেশ সুখী হইয়াছেন। সর্ব্বদা শেলাইয়ের কাজ লইয়াই থাকিতেন। ছেলেদের যত্ন আদরের সীমা ছিল না। কাহারও সঙ্গে মেশা নাই। স্বভাবের কোনওরূপ চাঞ্চল্য নাই। প্রতি কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার সবই উচ্চ আদর্শের। অতীত জীবন হেয় হইলেও এখন তাঁহার প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়াছে। তার আর বিচিত্রতা কি? একবার ভুল হইলে কি আর শোধরান যায় না?

একটি লোক একটি চীনে ফুল আমাকে উপহার দিল, তার কতকগুলি পাপড়ী ঝরা ও অপরগুলি ঝরিয়া যাইতেছে। অমন ফুল আবার কেহ কাহাকেও উপহার দেয়! জাহাজে বলিয়াই সাজিল। জাহাজে ত ফুল ফুটে না; আর হংকংও প্রকৃতিদত্ত ফুলের রাজ্য নয়। যাহা ফুটে, তাহা অতি কষ্টে। কি চীনে, কি ইউরোপীয়ান, সকলেই দেখিলাম এখানে ফুল ভালবাসে। তাই ফুলের অসম্ভব দাম।

এক জন কথা কহিতে কহিতে চুরি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আবৃত্তি করিল। শুনিবামাত্রই বুঝিলাম, এটি ছন্দ, গদ্য নহে। তার ভাবার্থ আমাদের দেশের নিম্নোক্ত প্রবাদটির মত,—

চুরী বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়েন ধরা,
যদি পড়লেন ধরা ত অমনি গলায় দড়া।

হংকং হইতে এই চীনেম্যানটি উঠিয়াছিল। তার সঙ্গে অনেকগুলি চীনেভাষায় লিখিত বই ছিল। আমি সেগুলি প্রায়ই উল্টে উল্টে দেখিতাম। কাগজগুলি বড় পাতলা, এক পিট ছাপা। পরে জানিতে পারিলাম যে, তার মধ্যে একখানি বই চীনদেশীয় প্রবাদ ও Quotation সম্বন্ধীয়। এ কথা অন্য প্রবন্ধে বলিব। সকল দেশের লোকেই যে একরকম ভাবে, এই সকল প্রবাদ ও উদ্ধৃত কথাগুলি দেখিলে তা বেশ বুঝা যায়।

শ্রীইন্দুমাধব।

খুশ্‌হালের কবিতা।

খুশ্‌হাল।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে আফ্‌গান জাতির প্রিয় কবি খুশ্‌হাল খাঁর জন্ম হয়। যেমন আফ্রিদি, মোমন্দ, জাকা-খেল প্রভৃতি (Clan) বা গোত্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ 'খতক' নামক আর একটি (Clan আছে; খুশ্‌হাল তাহার অধিনায়ক ছিলেন। ইনি যৌবনে শাজাহাঁর সম্প্রীতি লাভ করেন; বার্দ্ধক্যে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হন। তাহার পরিচয় তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়। এই সময়ে ইনি অনেকবার মোগলের বিরুদ্ধে সৈন্যচালন করেন। কয়েকবার কবির ভাগ্যে জয়লাভও ঘটিয়াছিল। শেষদশায় শত্রু মিত্র কেহই তাঁহার সংবাদ রাখিত না; কবি অতি দুরবস্থায় তনুত্যাগ করেন। ইঁহার কবিতা 'পুস্তু' ভাষায় রচিত; ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। খুশ্‌হালের কবিতায় 'খতকে'র নির্ভীকতা, পাঠানের পরশ্রীকাতরতা, ও খুশ্‌হালের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল কবিতা অলঙ্কার-ভারে ব্যথিত নহে,—সহজ, সরল, পুরুষোচিতবীরত্বব্যঞ্জক।

দেবদারু ও বনলতা।

বর্ষায় বাড়িয়া বনলতা
উচ্চে উঠে দেবদারু বাহি';
'কত হ'ল বয়ঃক্রম তব?'
জিজ্ঞাসে তরুর মুখ চাহি'।

তরু কহে, 'বর্ষ' দুই শত,
মাস ছয় এ দিক ও দিক।'
লতা বলে, 'এতে বৃদ্ধি এই,—
সপ্তাহে যা' হ'ল মোর ঠিক?'

তরু কহে, 'বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ুও বৃদ্ধির কথা হ'বে তাঁর পরে!"

'খতক'।

যখন কোনও খতক চড়ে ঘোড়ায়,
বুকের প'রে লয় সে বাঁধি' ঢাল:
পাগ্‌ড়ী-প্রান্ত হেলায় উড়ে হাওয়ায়
শোভা করে দীর্ঘ বিশাল ভাল।

ঘোড়া যেমন ছুট্‌ছে হাওয়ার ভরে,
দেখ্‌ছে ফিরে, ছুট্‌ছে ছায়া তারি;
'সর্‌দার' হ'তে মন যে কেমন করে,—
সাধ ক'রে তাই খোঁজে মারামারি।

পৃথিবীর সার্থকতা।

মনে কর তুমি নাই,—অথচ তোমার
নিখিল বিপুল বিশ্বে পূর্ণ অধিকার।

এ কথা কেমন ?—শুধু কথামাত্র নায়।
গ্রহ তারা—পুষ্প ফলে বিচিত্রদর্শন—
বীজমন্ত্র সম—এই নিখিল ভুবন ;—
ব্যাখ্যা, অর্থ, সার্থকতা, সকলি 'জীবন'।

মিষ্ট বড় জীবনের সুখ,—
হায় যদি থাকে চিরদিন,
চিরকাল থাকিল না যদি—
গণ' তারে তুচ্ছ অর্থহীন।

কত না নূতন প্রেম হায় !—
দলিত কালের পায় পায় ;

জ্ঞান।

জন্মকালে বুদ্ধি যদি নাহি দেন বিধি,
কার সাধ্য সে নির্ব্বোধে দেয় জ্ঞাননিধি ?
জড়মতি কি করিবে করি' অধ্যয়ন ?
'কলপ্' মাখিয়া বুড়া পায় কি যৌবন ?

বীর।

যে করে প্রাণের সদা ভয়,
অর্থনাশে ক্ষুব্ধ যেই হয়,
হেন জন রাজা হ'য় কবে ?
রাজ্য জিনি' ভোগ নাহি হ'বে।

সিংহাসন, অথবা শ্মশান—
রাজাদের বিশ্রামের স্থান !
বীরোচিত নহে যার মন,
বৃথা তার হাজার পল্টন !

'সাকী'র প্রতি।

ওগো সাকী ! মদিরা বিলাও
পেয়ালা ভরিয়া বারেবার,
'মধুপান বিনা মধু যাবে'—
বলিও না—দোহাই তোমার !

আর কবে ফুল-দলে পাব
ফুল্লমুখী সুন্দরী সঙ্গিনী ;
কোন্ বাধা বাঁধে মোরে আজি—
হেন দিনে—বল ত রঙ্গিণী !

দেখ, কি বলিছে ওরা—শোন,—
কি বলিছে বাঁশীতে বীণায়,
'গেলে দিন আসে না ফিরিয়া'—
কি দারুণ, কি বিষম হায় !

রূপের মাধুরী।

মিথ্যা কথা, পদ্ম নহে তুলনা তাহার,
লজ্জা মানে মৃগনাভি কেশবাসে যার ;
কৃষ্ণ ভুরু ধনু তার, পক্ষ্মরাজি শর,
প্রতি শর লাগে হায় প্রাণের ভিতর।
তীক্ষ্ণ যেন তরবারি দু'টি আঁখি তার,
'প্রেমিকের প্রাণ ল'য়ে যুদ্ধ অনিবার।
অধরের কোণে কৃষ্ণতিল শোভমান,
খুলেছে হাব্সী শিশু চিনির দোকান !
প্রদীপ্ত আলোক সম রূপশিখা তার,
প্রেমিক পতঙ্গ ফিরে ঘিরি' অনিবার।
কপোল পরশে শুধু কাণের সে দুল,
অধর ছুঁইতে পায় লবঙ্গের ফুল !
অনিন্দ্য সে রূপ তার—রূপের মাধুরী,
কেবল পাষাণ প্রাণ, এই খেদে মরি !
কে জানে, কতই লোকে কত কি যে চায় ;
খুশ্হাল মুগ্ধ শুধু রূপের প্রভায় !

বসন্তে।

আবার ভাটেরা গান ধরিল নূতন,
নূতন কাহিনী বাঁশী কহে অণুক্ষণ।
থাকুন গুহায় যোগিবর,
আমি আজ যাব উপবনে ;
ওই দেখ বসন্তের ফুল—
আমায় যে ডাকিছে সঘনে !
স্থগিত রাখিতে ক্ষুধা ঘুমায় ভিখারী,
অধোমুখ আঁজো রাজা রাজ্যকথা স্মরি' !

দেখিতে যা' ভাল লাগে চোখে,
দেখিলে তা' দোষ যদি হয়,
তবে—তবে—তবে খুশ্‌হাল
আজন্ম আসামী সুনিশ্চয়!

নিয়তি।

দিন দিন নিয়তির নূতন ব্যাভার,
প্রণয়ে প্রশ্রয়ে তার নাহিক প্রত্যয়:
এক দণ্ডে শক্তিমানে করে ধূলিসার,
ধূলার কীটেরে তুলি'—তারি গাহে জয়!

নিশ্ছিদ্র নূতন তরী ডুবায় সলিলে,
ভগ্ন তরী কভু ঝড়-তুফানে বাঁচায়;
কি করিতে পারি হায়! আমি এ নিখিলে?
কে আছে সুহৃদ্ মম, কারে ডাকি হায়!

যাহা করি, বাধা দেয় নিয়তি তাহায়;
কেহ নাই শুনিবারে এ মম ক্রন্দন;
'অদৃষ্ট'—অদৃষ্ট যদি না থাকিত হায়,—
কিংবা মোরে দৃষ্টি হ'তে করিত বর্জ্জন!

মহতের দুঃখ হেথা, নীচের উন্নতি,
শিশু বালিকার অঙ্গে বস্ত্র শত শত,
ছিন্নবাসে লজ্জা পায় বরাঙ্গী যুবতী;
জ্ঞানীর না মিলে রুটী, মূর্খে মেওয়া যত!

বিশ্বাসী ভক্তের গৃহে আসন দুর্লভ,
বঞ্চকের ঘরে দেখ রক্ত মখ্‌মল!
সাজ সওয়ারের ভারে ক্লিষ্ট অশ্ব সব,
গর্দ্দভ আরামে খায় নব-তৃণ-দল!

আনন্দে সকল পাখী কেলি করে বনে,
বন্দী শুধু সেই—যার সুকণ্ঠ, সুঠাম!
সত্য কি কল্পনা ইহা—বুঝাব কেমনে?

ঔরংজেব।

ছিন্ন ভিন্ন আজি মোর আত্ম-পরিজন,
দুঃখে মগ্ন, কে কোথায় নাহিক সন্ধান;
অরাজক রাজ্য মোর, নামে জনপদ,
পরবাসে মরে প্রজা, দুঃখে ক্লিষ্ট প্রাণ।

কয় মাস ছিনু হায় দিল্লীর কারায়,
এবে আমি বন্ধুহীন—বন্দী রন্তিপুরে,
ঔরংজেব কিছুমাত্র ভাবে না সে কথা,
ক্ষতি কি পীড়নে তাঁর অন্যে যদি মরে!

আমা হ'তে অভাগাও আছে এই স্থানে,
এ বিলাপ নহে শুধু একাকী আমার,
সংখ্যায় বিংশতি 'সুবা' এই হিন্দুস্থানে,
ব্যাপিল বিংশতি সুবা ক্রন্দনে প্রজার।

সামন্ত সর্দ্দার যত সুবায় সুবায়,
বন্দী কেহ, নষ্ট কেহ সংশয়ে সন্দেহে;
শুধু রন্তিপুরে বন্দী দুই শত জন,
আরো কত আছে কারা—কত বন্দী তাহে!

প্রথমে পিতার পরে পশু-আচরণ,
তার পর উচ্চনীচে নাশে বহুজনে,
এ সত্য—যে মিথ্যা বলে—মিথ্যা কথা তার,
হেন জন নাহি দেশে ক্ষুব্ধ যে না মনে।

দাক্ষিণাত্য হ'তে আসি' তুলিয়া পতাকা,
করিল অনেকে ধ্বংস বিশ্বাস-ঘাতক;
প্রথমে মুরাদ সনে সন্ধির শপথ,
তার পর উজ্জয়িনী হরিল সে ঠক্!

আগ্রায় আসিল, কাল আসিল দারার;
বন্দী হ'ল শাজাহান; গেল বন্ধুদল;
পিতৃদশা পাইলেন মুরাদ ক্রমশঃ;

তার পর ফিরিল সে স্থজারে নাশিতে ;—
পলাইল শাহ স্থজা, হারি' কাজোয়ায় :
তার পর আজমীঢ়ে দারা সনে রণ ;
হারিয়া কৌশলে, দারা পশ্চিমে পলায়।

দারায় কৌশলে ধরি' জুনার মালিক
পাঠা'ল দিল্লীতে, দারা হ'ল দ্বিখণ্ডিত ;
হেথা স্থলেমান শেখ দারার কুমার
পড়িল খলের হাতে রুধিরে মণ্ডিত।

কত জন দিল্লী হ'তে হ'ল বহিষ্কৃত,—
কে জানে কোথায় তারা ত্যজে তপ্তশ্বাস ?
পিতৃকুল ক্রমমতে নাশে ঔরংজেব,
পারস্য আ'রব স্তব্ধ মনে পেয়ে ত্রাস।

শুধু দুই বর্ষে ঘটে এই প্রেত-লীলা ;
আরোহিল ধর্ম্মধ্বজী দিল্লী-সিংহাসনে ;
হত্যা, অত্যাচার বিনা অন্য কথা নাই ;
বাঁচিলে সে বেশী লোক র'বে না ভুবনে।

শঠতায় সংগঠিত অস্থি মজ্জা তার,
বাহিরে দেখায় যেন পেগম্বর পীর ;
বিচারিয়া দেখ যদি তার ব্যবহার —
বুঝিবে 'চক্রান্ত' তার মূলমন্ত্র স্থির।

মানুষে কোথায় বল করে হেন কাজ,
বন্দী করে—হত্যা করে আপন পিতায় ?
এমনি করুণা মরি ! এমনি হৃদয়,
আপন স্থবিধা' পরে দৃষ্টি শুধু হায় !

উৎপীড়িত অভাগার রাখে না সংবাদ,
সমান নির্দ্দোষ দোষী বিচারে তাঁহার ;
এই সে সম্রাট, হায় ! এই ঔরংজেব,—
এমনি চরিত্র তাঁর—এই ব্যবহার !

গোসানী-মঙ্গল।

গোসানী-মঙ্গল একখানি অতি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি। সন ১৩০৬ সালে কলিকাতা আলবার্ট কলেজের স্থযোগ্য অধ্যক্ষ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন এম্. এ. মহোদয়ের আগ্রহে ও আদেশে, কোচবিহারের অন্তর্গত গোসানীমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ডিমাই ১২ পেজী ১০০ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি গোসানী-মঙ্গলের একখানি অতি পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি কোচবিহারের অন্তর্গত বড়মরিচা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মৌলবী আমানতউল্লা চৌধুরী জমীদার সাহেবের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। দুইখানি বাঙ্গালা পুঁথির পাঠ কখনও সর্ব্বাংশে একরূপ হয় না। ইহা যেন একটা সাধারণ নিয়ম। স্থতরাং বলা বাহুল্য, এই মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গোসানী-মঙ্গলে স্থানে স্থানে পাঠের বিস্তর অমিল আছে। শেষোক্ত পুঁথিখানি

এক জন হিন্দু বৈরাগীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শুনা গিয়াছে, বৈরাগী প্রত্যহ যথাবিধি পুঁথিখানির পূজা করিতেন।

"গোসানী-মঙ্গল" কোচবিহার বা তৎপ্রদেশের আদি বাঙ্গালা কাব্য। ইহা ঠিক কোন্ সময়ে বিরচিত হইয়াছে, তাহা আজিও সম্পূর্ণ নির্ণীত হয় নাই। ইহাতে গোসানী দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনচ্ছলে কোচবিহারের রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী নামধেয় জনৈক কবি ইহার প্রণেতা। কবির পিতা করুণাকর দাস মহাশয় কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যে পরমসুখে বাস করিতেন। কবি 'মঙ্গলাচরণে' গাহিয়াছেন,—

হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা, বেহারে পালেন প্রজা,
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন।
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুণাকর,
পরম বৈষ্ণব গুণধাম॥

তাহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্ত ভেক,
চিত্তে হরি-চরণ-কমল।
তা'হে আদেশিলা দেবী, কহে রাধাকৃষ্ণ কবি,
সুমধুর গোসানী-মঙ্গল॥

এই কবি যে গোসানী দেবীর এক জন পরম ভক্ত, তাহা তাঁহার আবেগ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়-নিঃসৃত এই সুললিত কাব্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।

চণ্ডী দেবীই 'গোসানী' * নাম গ্রহণ করিয়া কোচবিহার অঞ্চলে আপনার পরিচয় ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, 'গোসানী-মঙ্গল' ঠিক এতদঞ্চলের চণ্ডী কাব্যেরই রূপান্তর, বা অনুরূপ একখানি কাব্য। রাজা কান্তেশ্বর এই 'গোসানী' দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। যে গ্রামে দেবীর মন্দির সংস্থাপিত, তাহা 'গোসানী-মারি' নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। গোসানী-মারিতে রাজা কান্তেশ্বরের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের বহুল নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান।

গ্রন্থখানি কবিত্বপূর্ণ। ইহার ভাষা সরল, বর্ণনা স্বাভাবিক ও ভাব পরিস্ফুট। গ্রন্থারম্ভে কবি বলিতেছেন ঃ—

বেহারে দক্ষিণ গ্রাম নাম জামবাড়ী।
সেই গ্রামে জাম বৃক্ষ আছে সারি সারি॥
সুবর্ণবরণ জাম ফলে বারমাস।
শ্রীফল বেলাদি তথা চির পরবাস॥

পার্ব্বতী সহিত শিব শ্রীফলের তলে।
একত্রে বসিয়া কথা কহে নানা ছলে॥
শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন।
এই রাজ্যে যত লোক সুখী সর্ব্বজন॥

* দেবতারা 'গোসাঁই' নামে খ্যাত, তাহা সকলেই জানেন। গোসাঁই—'গোস্বামী' শব্দের অপভ্রংশমাত্র। 'গোস্বামী'র স্ত্রীলিঙ্গ 'গোস্বামিনী' অপভ্রষ্ট হইয়া 'গোসাঁইনী', এবং তাহা পুনর্ব্বার অপভ্রষ্ট হইয়া 'গোসানী' রূপ ধারণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

সুবর্ণবরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে।
ঘরে ঘরে শিব দুর্গা পূজে কুতূহলে॥
চণ্ডী কহে বর দাও ভোলা মহেশ্বর।
এই রাজ্যে রাজা হ'ক নাম কান্তেশ্বর॥

কান্তেশ্বরের পিতার নাম ভক্তীশ্বর; মাতার নাম অঙ্গনা। অঙ্গনা,—

তন্ত্র মন্ত্র শুনে আর বেদ রামায়ণ।
কথায় প্রসঙ্গে উঠে চণ্ডীর পূজন॥
স্বামিমুখে শুনি সতী চণ্ডীর মাহাত্ম্য।
চণ্ডী পূজিবার তরে করিল মনস্থ॥

তার পর ভক্তবৎসলা মহামায়া চণ্ডী আসিয়া দম্পতী-যুগলকে স্বপ্নে দেখা দিলেন, এবং বলিলেন,—

শুন শুন ভক্তীশ্বর, শুনহ অঙ্গনা।
তোমা দ্বয় হ'তে প্রিয় নাহি কোন জনা॥
করহ আমার পূজা লহ ইষ্ট বর।
তোমার তনয় হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
রাখিবা পুত্রের তুমি কান্তনাথ নাম।
এ কথা কহিয়া দেবী হ'ল অন্তর্দ্ধান॥

আদেশমতে চণ্ডীর পূজা হইল। পূজার ফলে অঙ্গনা দেবীর গর্ভে সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত কান্তেশ্বর জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপরে কান্তেশ্বর,—

অল্পকাল গুরুস্থানে করি অধ্যয়ন।
বাঙ্গালা সংস্কৃত শিখে করিয়া যতন॥
ব্যাকরণ কাব্যশাস্ত্রে হইয়া পণ্ডিত।
তন্ত্র মন্ত্র আদি শিখে আর রাজনীত॥

এইরূপে দেবীর বরপুত্র কান্তেশ্বর অল্প দিনেই কৃতবিদ্য হইলেন। এমন অধীতশাস্ত্র রাজা যে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মানুরক্ত হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

গোসানী-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কবি বলেন,—

সসৈন্যে সাজিয়া রাজা করিল গমন।
চণ্ডীমণ্ডপেতে আসি দিল দরশন॥
পঞ্চগব্যে গোসানীরে করাইয়া স্নান।
সিংহপৃষ্ঠে গোসানীরে দিলেন আসন॥

'গোসানী'র আসন-দান শেষ হইবার পর ভক্ত রাজা দেবীর নিকট লক্ষ বলিদানের আদেশ করেন। মহাসমারোহে উৎসর্গ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই দেবীর সেবায়েতদিগকে 'দেউরী' বলে। গ্রন্থের শেষ এইরূপ,—

গোসানী ঠাকুরাণী যার দিকে চায়।
ধন জন পুত্রে সে আনন্দে বেড়ায়॥
ইহাকে শুনিয়া যে করিবে উপহাস।
অবশ্য গোসানী তারে করিবেক নাশ॥
গোসানী আদেশে এই পাঁচালী প্রকাশ।
হরি ভজ ওরে মন গুরুপদে আশ॥
পাঁচালী লিখিয়া হয় মনের উল্লাস।
গোসানী-মঙ্গল ভণে রাধাকৃষ্ণ দাস॥

উপরে যাহা যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহার ভাষা ও রচনা-প্রণালী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুঁথিখানি অতি প্রাচীন ও কোচবিহার অঞ্চলের আদি বাঙ্গালা কাব্য; কিন্তু উদ্ধৃত অংশগুলিতে ইহার ভাষার প্রাচীনতা আদৌ পরিলক্ষিত হয় না কেন? আমরা যে মুদ্রিতগ্রন্থাবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, তাহার পাণ্ডুলিপিতে

প্রকাশক মহাশয় সম্ভবতঃ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াই ইহার প্রাচীনত্ব লুপ্ত হইয়া থাকিবে। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। প্রাচীন সাহিত্যের সংশোধনাদি করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রাচীন 'রূপ' অক্ষুণ্ণ নাই, এই কারণে, এই পুঁথি-খানির কুচবিহারের সংস্করণে আমাদের আকাঙ্ক্ষা সফল বা প্রয়োজন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং এই গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। *

শ্রীআবদুল করিম।

বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা।

ধর্ম্মবিপ্লবে বঙ্গসাহিত্য অভ্যুদিত ও কালে কালে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে; ইহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় কেহ কেহ দেখাইয়াছেন। আধুনিক কালেও মুখ্যতঃ ধর্ম্মবিপ্লবেই বঙ্গভাষা প্রভূতপরিমাণে উপকৃত হইয়াছে। ইংরাজ-প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ মুদ্রাযন্ত্র সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন; তাঁহাদের সঙ্গে সংঘর্ষেই বাঙ্গালা গদ্য একপ্রকার সৃষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্মবিপ্লব ও বঙ্গসাহিত্য।

সাহিত্যের শক্তি, স্থায়িত্ব ও গাম্ভীর্য্য অনেকাংশে গদ্যের উপর নির্ভর করে। ইংরেজের পূর্ব্বে এই গদ্য বাঙ্গালায় ছিল না বলিলেই হয়। পাদ্রীগণ ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গদ্যে পুস্তকাদির প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন;—এই প্রবল আঘাতে আমাদের স্থিতিশীল সমাজের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। এই আঘাতের প্রতিঘাতস্বরূপ বঙ্গদেশে বীরপুরুষ রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তিনিই বঙ্গীয় গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এক দিকে উপনিষদ্, বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি সমুচ্চ দার্শনিক গ্রন্থনিচয়ের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গ-ভাষাকে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞান গবেষণার সমুচ্চ মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ করেন; আবার অন্য দিকে ঐশ্বর্য্যময়ী ইংরাজী ভাষা জনসাধারণ্যে সম্যক্ প্রচলিত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিয়া যান। এইরূপে বঙ্গদেশে এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত,

---

* এই প্রবন্ধটি সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত রঙ্গপুর কাকিনা নিবাসী বন্ধুবর সুকবি শেখ ফজলল করিম সাহেবের লিখিত পত্রাবলম্বনে সঙ্কলিত।—লেখক।

অচিন্ত্যপূর্ব্ব, বিশাল জ্ঞানসমুদ্রের মুক্ত বাতাস বহিতে থাকে। তাহা পাইয়াই ক্রমে বাঙ্গালীর হৃদয় বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়াছে। বঙ্গের সমাজে সাহিত্যে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের সম্মিলিত ভাবপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নবজীবন দিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য এই দুই স্রোতের সঙ্গমস্থলের চিরকল্লোল শুনিয়াছে, এবং সাহিত্যজগতে আপন পদবী খুঁজিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আদ্যন্ত ছন্দোময়ী কবিতা। প্রাচীন কবিগণের তেমন কোনও সাহিত্যাদর্শ ছিল না। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী ভিন্ন প্রকৃত সাহিত্য-নামের উপযুক্ত কাব্য প্রাচীন সাহিত্যে বিরল। তখন কবিগণ প্রায়ই স্বপ্নে আদিষ্ট হইতেন, এবং দেবদেবীর পরিতোষকল্পে কাব্য লিখিতেন। ধর্ম্মের একপ্রকার অঙ্গাবরণ পরাইয়া লেখাগুলি বাহির করিতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরে'র মত পুস্তকও কালীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন ধর্ম্মেরও তেমন উচ্চ আদর্শ ছিল না। স্তবস্তুতি, পূজার্চ্চনা, ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ছিল। চরিত্রের স্থৈর্য্য বা পবিত্রতা, চিত্তের স্বাধীনতা বা নৈতিক বল, প্রচলিত ধর্ম্মের কোথাও উদ্দিষ্ট ছিল না। শিব আশুতোষ; সময় সময় এক একটা দৈত্যকে বর দিয়া আপন সৃষ্টি বিপন্ন করিয়া ফেলিতেন। দুনিয়ার যত চোর, ডাকাত, ভবানীকে দুই একটা ছাগমুণ্ড দিয়াই নির্ব্বিঘ্নে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। পরলোকের কথা বলিতে পারি না, ইহলোকে তাহাদের কোনও বিচার ছিল না। মৃত্যু-কালে কৈলাসপর্ব্বত হইতে শিবদূত আসিয়া লগুড়াঘাতে যমদূতগণকে তাড়াইয়া দেবদেবীভক্তগণকে মোক্ষধামে লইয়া যাইত। যে দেশে সাহিত্যের আদর্শ কেবল ধর্ম্মশিক্ষা, স্পষ্টতঃ দেবদেবীভক্তি, সে দেশে দেবদেবীর আদর্শও যদি হীন হয়, তাহা হইলে, সাহিত্যকে পাতালমুখে গমন করিতে হয়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মতি, গতি ও রুচি ইংরাজ-প্রভাব-কাল পর্য্যন্ত নিম্নাভিমুখীই ছিল। ধর্ম্মশিক্ষাই সাহিত্যের আদর্শ হওয়ায় সাহিত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি স্ফূর্ত্ত হয় নাই। কবিগণের প্রতিভা বিকাশলাভের অবকাশ বা প্রণোদনা—কিছুই পায় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ, চণ্ডী ও মনসার মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, শ্রীচৈতন্যের চরিত্রবর্ণন, বা বিদ্যা-সুন্দরের আখ্যান, এই কয়টি পদার্থই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিষয়। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, প্রাচীন কবিগণ শত শত কবি মিলিত হইয়া এক এক বিষয়ে

এক একখানি কাব্য রচিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ করায় তাঁহারা নিজের স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে, বা পরের জিনিস অধিকারীর অজ্ঞাতে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপে অপূর্ব্ব চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রাচীন সাহিত্যে এক একটা কাব্য প্রণীত হইয়াছে।

কোনও প্রবল জাতীয় ভাব বা ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্যের উপর আস্থা না থাকায়, বরং পদে পদে ভাগ্য, দৈব, অথবা দেবদেবীর প্রসাদের উপরই একমাত্র নির্ভর থাকায়, প্রাচীন সাহিত্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অবাধে পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই। 'চন্দ্রধর' প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশ্বামিত্র বা প্রমিথিয়স্। কিন্তু মানবের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন কবির উদ্দেশ্য ছিল না। তাই চন্দ্রধরকে "কালী"র নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছিল। সাহিত্যের একটি অত্যুন্নত বীরপুরুষকে লৌকিক বিশ্বাসের যূপমূলে বলি দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে কবিকঙ্কণও কালকেতুর উন্নত চরিত্রকে ভীরুতা ও কলঙ্কের অতল জলে ডুবাইয়াছেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহ সপ্রমাণ হয় যে, তাঁহারা মানবজীবনের অথবা সাহিত্যের কোনও উন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সকল কাব্য লিখিতে বসেন নাই। দেবদেবীর অখণ্ড-মাহাত্ম্য-বর্ণনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; তাই দেবদেবীর পবিত্র পীঠতলে বারবার বীর-বলি প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কেবল স্থানে স্থানে কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবের নবোদিত সূর্য্যকিরণ প্রথমে রামমোহন রায়ের সমুন্নত ললাটেই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই রামমোহন রায়ের হৃদয়েই প্রথমে সাহিত্যের শুভ্র আদর্শ প্রতিবিম্বিত হয়। সেই আদর্শের আবির্ভাবের ফলে বঙ্গসাহিত্যে যে ভাববিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে এ দেশের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্র বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধ অথবা মুসলমানজাতির সংস্রবে শত শত বৎসরে যাহা ঘটে নাই, এক ইংরেজী ভাষা অতর্কিতে তাহার কোটি গুণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। রামমোহন স্বয়ং উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যথাশক্তি সাহিত্যের সেবা করিয়া যান। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তই এই আদর্শকে বঙ্গসাহিত্যে পরিণত ও কার্য্যকর করেন। তাঁহারা বঙ্গভাষার শিক্ষাগুরু। তাঁহারাই বঙ্গভাষাকে সুমার্জিত ও সুগঠিত করিয়া আগামিনী প্রতিভার উপযুক্ত রঙ্গভূমি

বঙ্গসাহিত্যের নূতন আদর্শ ও নূতন ধারা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরঙ্গের প্রথম ভেরীনিনাদ করেন। কাব্য, নাটক, প্রহসন, সনেট, গীতিকবিতা প্রভৃতি বিষয়ে এই উদ্ধতস্বভাব শিশু অতি উদ্দামভাবে ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালীকে নূতন গান শুনাইয়াছেন; প্রচলিত বিশ্বাস, ছন্দোবন্ধ, ভাষা ও ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্যমাত্র না রাখিয়া মধুসূদন পূর্ণ স্বাধীনতায় আপন হৃদয়ের আবেগে গান গাহিয়াছিলেন। তাহা প্রথম প্রথম রক্ষণশীল বঙ্গসমাজের কর্ণে ভাল শুনায় নাই। কিন্তু মধুসূদনের সেই উদাত্ত গান প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার অপ্রতিহত প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদন দত্ত; মহাকাব্য প্রভৃতি।

মধুসূদনের সময় হইতেই বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে এক নূতন বাতাস বহিতেছে, এবং বাঙ্গালীর সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হইয়াছে। মধুসূদনই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম পুরুষ কবি; ছন্দের ঝঙ্কার, ভাবের বিস্তৃতি ও প্রখরতা, প্রতিভার সামর্থ্য ও স্বাধীনতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণে কবি প্রকৃতপ্রস্তাবে পৌরুষ-ভাবাপন্ন বলিয়া উক্ত হইতে পারেন, সেই সমুদয়ই মধুসূদনে ভূরিপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-ভাবের সাধক ছিলেন। সুতরাং নারীহৃদয়সুলভ তারল্য ও মাধুর্য্যগুণে তাঁহাদের কাব্য পরিপূর্ণ। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্রে এই পৌরুষভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মধুসূদনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। আবার মধুসূদন এক দিকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার ও ভাবের সঙ্গমস্থলে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত সাহিত্যের বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের হোমার, ভার্জ্জিল, টাসো, দান্তে, মিল্‌টন ও বায়রণ প্রভৃতি পৌরুষ-শক্তিশালী কবিগণের পদতলে বসিয়া মধুসূদন শিক্ষাগ্রহণ করেন। ইহাঁদের ছায়ায় মধুসূদনের প্রতিভা ঘনতা, পূর্ণতা ও প্রকাণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মধুসূদনের রচনায় যে একটা স্বাভাবিক ললিতগতি আছে, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবির উপযুক্ত, তাহাতে তাঁহার বক্তব্যগুলি অক্লেশে বিকশিত হয়। বাঙ্গালার কোনও কবি এ পর্য্যন্ত সেই স্বাভাবিকতার সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। এই স্বাভাবিকতার গুণেই মধুসূদন দেশের আপামর সাধারণ সকলের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সমস্বভাবাপন্ন কবিগণের সহিত তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, অল্প কথায় রসোদ্রেক করিবার নৈপুণ্য

মধুসূদনের কিরূপ অসাধারণ ছিল। হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র যুদ্ধবর্ণনায় বা শোকপ্রকাশে অতিরিক্ত ভাষা-জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া যে স্থলে এক একটা সর্গ ব্যয়িত করিয়াছেন, মধুসূদন সেই স্থলে দুই কথায় সমস্ত সাঙ্গ করিয়া অনেক সময় অধিক চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপ তুলনাতেই মধুসূদনের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্য বুঝিতে পারা যায়।

বঙ্গভাষায় মধুসূদনের স্থাননির্দ্দেশ করিতে হইলে বলা যায় যে, মধুসূদন দত্ত নামে এক জন 'টিটান' (Titan) বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীসীয় প্রমিথিয়সের মত স্বর্গ হইতে প্রতিভার নব বহ্নিশিখা বাঙ্গালীর জন্য হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে কঠোর দণ্ডগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সমস্ত জীবন দুর্দ্দশার পাষাণশৈলে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া, মস্তক পাতিয়া অবিশ্রাম অশান্তি অভিসম্পাত গ্রহণ করিয়া ও কুক্ষিদেশে ক্ষুধাকুক্কুরীর করাল দংশন সহ্য করিয়াও, সেই মহাপুরুষ হীনতা স্বীকার করেন নাই, সেই অগ্নি পরিহার করেন নাই। তাঁহার তীব্রযন্ত্রণাময় নিরাশানিশ্বাস প্রকাণ্ডযজ্ঞকুণ্ডোত্থিত উত্তপ্ত অগ্নিশিখার মত এখনও বাঙ্গালীর হৃদয় স্পর্শ করিতেছে। তাঁহার হৃদয় মেঘের মত বজ্রাগ্নিপূর্ণ, জলপূর্ণ ও ধ্বনিপূর্ণ ছিল। তিনি সেই অগ্নি, সেই জল ও সেই ধ্বনি বঙ্গসাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই মহামেঘের বর্ষণের পর বঙ্গদেশ শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফল পাকিবার সময় আসিয়াছে।

মধুসূদনের দোষদর্শন করিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে, মানব-মনের উপর যাহাতে চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত হয়, এমন গাম্ভীর্য্য, নৈতিক গুরুত্ব, অথবা অসামান্য উদ্ভাবনীশক্তি মধুসূদনের ছিল না। তাঁহার কাব্যাদিতে মানবের দুঃখ, দয়া, ক্রোধ, প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তিসমূহের প্রোজ্জ্বল প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু ঐ সকল প্রতিকৃতির ভিতর মানবের জন্য অণুমাত্র সান্ত্বনা নাই। শোক-

মধুসূদনের দোষ।

পীড়িত রাবণ, অশোকবনে বন্দিনী সীতা, পতিপ্রার্থিনী প্রমীলা, কলঙ্কিনী তারা, ভুজঙ্গিনী কৈকেয়ী, তেজস্বিনী জনা,—ইহারা অতি উজ্জ্বল মনোহর চিত্র। কিন্তু মানবহৃদয়ের কোন্ নৈতিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য কবি এই সকল চিত্র আঁকিয়াছেন? মধুসূদনের স্বপক্ষে ইহার একমাত্র সাহিত্যসঙ্গত উত্তর, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা। চিত্রকলার ভাবে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই সব চিত্রে সান্ত্বনা কোথায়? এমন যে হ্যামলেট, ম্যাক্‌বেথ, তৃতীয় রিচার্ডের চিত্র, ইহাদের মধ্যেও অপরিসীম সান্ত্বনা ও নির্বৃতি আছে। হঠাৎ গোলার

আওয়াজ হইলে শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হইয়া যায়, হৃদয় স্তম্ভিত হয়, কিন্তু মানবজীবনের কোনও নীতিসূত্র লক্ষিত হয় না।

আবার কাব্যক্ষেত্রে মধুসূদন আদর্শ বলিয়া যাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই 'রসে'র কবি। আদি, হাস্য, করুণ প্রভৃতি রসের অবতারণা করিয়া চিত্ত-বৃত্তির তৃপ্তিসম্পাদনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের আলঙ্কারিকেরা রসোদ্রেকই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলতা, তারল্য ও আবেশই রসের প্রধান ধর্ম্ম। ইহারা বহির্মুখ; ধ্যান, গাম্ভীর্য্য ও শান্তি (Repose) প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তির সহিত রসের আন্তরিক অসামঞ্জস্য আছে; তাই রসের বাড়াবাড়ি করিতে গেলে ভাব ক্ষীণ-প্রভ হইয়া আসে। মধুসূদনে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। অতিমাত্রায় রসের পোষণ করিতে গিয়া তিনি সতর্কতা ও ধ্যানযোগ হারাইয়াছিলেন। মানব-হৃদয়ের কূটতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গভীর ধ্যানযোগের আবশ্যক। সেই ধ্যানযোগের অভাবেই তিনি চরিত্রসৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্রগুলির মধ্যে অসৌষ্ঠব ও অসামঞ্জস্য অমার্জ্জনীয়ভাবে বর্ত্তমান।

পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি, ভারতচন্দ্রই বাঙ্গালায় মধুসূদনের অব্যবহিত শিক্ষাগুরু। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক উভয় কবির কাব্য পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। ভারতচন্দ্রের ছন্দোঝঙ্কার ও ওজোগুণ মধুসূদনে যথেষ্ট; আবার ভারতচন্দ্রের সেই অত্যুদ্ধত আদিরস-রসিকতাও, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায়, বীরঙ্গনায় ও স্থানে স্থানে মেঘনাদেও নির্ভীকভাবে উলঙ্গ হইয়া আছে। মধুসূদন এই রোগের বশবর্ত্তী হইয়া স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রগুলির উপর সময় সময় নিতান্ত অবিচারে কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। অপর দিকে, প্রাচীন গ্রীসীয় আদর্শের অনুকরণে ও সম্ভবতঃ পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যের রচনা-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্দ্ধনের জন্য পদে পদে মানবের মাহাত্ম্য ও পুরুষকারকে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের ভেরীর পর হেমচন্দ্রই বঙ্গরঙ্গভূমে 'শিঙ্গা' বাজাইয়াছেন। নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, এই দুই জন একস্বভাবাপন্ন কবি। সহৃদয় কবি হেমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। মধুসূদনের মাহাত্ম্য নিজে বুঝিয়া

হেমচন্দ্র।

বিদেশীয় প্রাচীন কবিদিগের ভাব-সঙ্কলন ও পথানুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদনের স্বাভাবিকতা অসাধারণ; তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক পাত্রে পতিত হইলে পরের জিনিসও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়। শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ ইহাকেও এক শ্রেণীর মৌলিকতা বলিয়া মনে করেন।

মধুসূদন ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও মরুতের সহযোগে বঙ্গভূমির সাহিত্য-কাননে এক অভিনব বর্ষাচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সহস্র দোষ সত্ত্বেও, একমাত্র স্বাভাবিকতার গুণে, এই চিত্র বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া আছে।

মধুসূদনের মত স্বাভাবিকতা হেমচন্দ্রের নাই; তবে প্রতিভার ইন্দ্রজাল সম্পূর্ণমাত্রায় আছে, এবং তিনি মধুসূদন অপেক্ষা অধিক সাবধান ও সতর্ক।

কিন্তু এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, কবির পক্ষে এই সতর্কতা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতিগত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা, কেবল বহিরঙ্গভাবে অলঙ্কারশাস্ত্রাদি হইতে যে সতর্কতার শিক্ষালাভ হয়, তাহা কবিত্বশক্তির বিকাশের পক্ষে বরং অন্তরায় হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রের সতর্কতায় তাঁহার কবিতা স্থানে স্থানে নির্জীব হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় বীরজনসুলভ কঠোরতায় ও সাধুতায় পরিপূর্ণ। ইহাই বঙ্গীয় কাব্যজগতে হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাঁহার কবিতা পাষাণের মত কঠোর, অকুটিল, অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু নীরস নহে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে এইরূপ আর এক জন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারবি। হেমচন্দ্র এ কালের কবি নহেন। এই বাঙ্গালী কবির হৃদয় প্রাচীন গ্রীক কবির উপাদানে গঠিত। তাঁহার বিষাণ এ কালে বাজিলেও প্রাচীন 'হেলিকন' পর্ব্বতের আমদানি। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাচীন হোমার, টাসো, দান্তে, পিণ্ডার প্রভৃতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল কবির ন্যায় তাঁহাকেও জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কারণে দুঃখ যন্ত্রণার দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে হইয়াছিল। অতীন্দ্রিয় পদার্থে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যচক্ষু শক্তিহীন হইয়াছিল, এবং হোমার ও মিল্টনের ন্যায় তিনিও অন্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় তাঁহার সঙ্গীতধ্বনি অতিমানবঘটনাবলম্বনে, উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নিম্নস্থ জনমানবকে লক্ষ্য করিয়া ঝরিতেছে। তাঁহার সমস্ত চেষ্টায় নৈতিক লক্ষ্য ও মানব-মনের

শুধু সরস্বতীর প্রিয়পুত্র নহেন, প্রিয় সেবক। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়া তিনি আমাদের দীনা বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার সারস্বত-জীবন সর্ব্বত্র মৌলিক-কবিত্বময় না হইলেও, তাহা মহত্ত্বের উজ্জ্বলতায় চিরদিন উদ্ভাসিত থাকিবে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, এই কবিত্রয়ের মধ্যে হেমচন্দ্রের হৃদয় সমধিক উন্নত ও প্রশস্ত। পৃথিবীর উন্নতিস্বপ্নে, সর্ব্বপ্রকার আশায় ও তাহার সাফল্যে হেমচন্দ্রের আন্তরিক সহানুভূতি। মধুসূদন সম্পূর্ণ বিজাতীয়ভাবাপন্ন। বাঙ্গালী জাতির বা বঙ্গসমাজের সহিত তাঁহার কোনও সহানুভূতি ছিল না। তিনি শক্তি ছিল বলিয়াই আস্ফালন করিতেন, গান গাহিতে জানিতেন বলিয়াই গাহিতেন। গৌড়জনের জন্য অক্ষয় মধুভাণ্ডারের সৃষ্টি করিয়া যাইব, অমর হইব, 'স্মৃতিজলে চিরফুল্ল তামরসে'র মত ফুটিয়া থাকিব, এইরূপ উৎকট যশোলিপ্সাতেই তিনি ভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। দেশের সামাজিক মূল 'শিকড়' হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাঁহার প্রতিভাতরু সমাজের অন্তস্তলবাহী প্রকৃত প্রাণরস আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আকাশে আস্থানিক 'শিকড়' বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে স্বদেশপ্রেম, অধীনতা ও দেশাচারের কঠোর পীড়ন হেমচন্দ্রের প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এবং পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত কবির রচনাতেই অল্পাধিকপরিমাণে বিদ্যমান আছে, মধুসূদনে তাহার লেশমাত্রও দেখিতে পাই না। এই অধঃপতিত জাতির হৃদয়োচ্ছ্বাস যখন প্রথম পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন উক্ত অতিপ্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি আদৌ প্রকাশ পায় নাই।

পরবর্ত্তী না হইলেও, বিচারের সুবিধার জন্য, হেমচন্দ্রের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাই আলোচ্য। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙ্গলা গদ্যকে নিখুঁত সংস্কৃতানুযায়ী করিয়া যান। কালীপ্রসন্ন ঘোষও অনেকাংশে তাহাই রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা স্বভাবশীলতা ও স্বাধীনতা গুণে প্রকৃত বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকগণ ও সাময়িক পত্রিকাদি, তাহা সাগ্রহে অবলম্বন করিয়া, তাহার শক্তি সামর্থ্য দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গালা গদ্য সাগ্রহে বঙ্কিমের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সংস্কৃতবহুল রচনায় দেশীয় ভাব ও চিন্তা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। বিদেশীয় ব্যাকরণের কঠোর বন্ধনের মধ্যে দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ভাবগুলি বরং নিপীড়িত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ;
উপন্যাস প্রভৃতি।

অথচ এই সমস্ত ক্ষুদ্র ভাব ও ক্ষুদ্র ঘটনাই বর্ত্তমানে সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি ছাড়িয়া সুখ-দুঃখ-পূর্ণ পাপ-পুণ্যময় প্রকৃত মানব-চরিত্রের অঙ্কনে অবহিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের এই আদর্শ লইয়া উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে যথাসাধ্য প্রচলিত ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। উপন্যাস ছাড়িয়া কেবল দর্শনাত্মক প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে হয় ত বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরাদির অবলম্বিত সংস্কৃত-বহুল রচনা-প্রণালীর অনুসরণ করিতেন, এবং বঙ্গভাষা আজও বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন হইতে বহু দূরে অবস্থান করিত।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। কপাল-কুণ্ডলায় সর্ব্বপ্রথম প্রতিভার সেই সমুদ্রগর্জ্জন দূর হইতে শুনা গিয়াছে; চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া, বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহদ্বারে আসিয়া, তাহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকে পুলকিত করিয়াছে। বাঙ্গালী এই ধ্বনি ইহার পূর্ব্বে কি পরে আর শুনে নাই; ইহা সূর্য্যাস্ত দেশের আমদানি। সুতরাং ইহার দোষগুণ এখনও ভাল করিয়া বুঝিবার সময় আসে নাই।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের স্থায়ী সিংহাসন, তাহা কেহ কোনও কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না। উপাখ্যানের নৈতিক ভিত্তি, ভাষার শক্তি, ত্বরিতগতি ও সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতাগুণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অধিকার-লাভ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইংরাজী বা ফরাসী উপন্যাসের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র বা প্রকাণ্ডতা নাই। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ওজস্বী বৈচিত্র্যময় চরিত্রসমাবেশ নাই। তাঁহার উপন্যাসের আয়তন ক্ষুদ্র। বর্ণিত চরিত্রগুলিও তত প্রকাণ্ড নহে, এবং মানবজীবনের এক একটা সরল ও ব্যাপক ভাবের আশ্রয়ে তাহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবজীবনের বা সমাজের তেমন কোনও সূক্ষ্ম সমস্যা লইয়া আবির্ভূত হয় নাই।

বঙ্গীয় উপন্যাসের আশা।

ইহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে বঙ্গসমাজও দায়ী। আমাদের সমাজে বৃহৎ চরিত্র, বৃহৎ জীবন, বিকাশ পাইতে পারে না। সমাজ শত সহস্র নিয়মের ও

ইহার ভিতর বিপুল ঘটনাভিঘাতে উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীন মানবচরিত্র উঠিবার, বসিবার অবকাশ পায় না। পাশ্চাত্য সমাজের অবাধ স্বাধীনতা, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি এই সমাজে এখনও প্রবেশলাভ করে নাই। পাঠক ও সমালোচকের রুচিও সমাজের অনুশাসনে গঠিত হইয়াছে। আদর্শ, ভিত্তিভূমি, অথবা বিশেষ সম্ভাব্যতা না থাকিলে, কবি কাহার নির্ভর করিয়া সৃষ্টি করিবেন? আকাশে চরিত্রস্থাপন করিতে গেলে, তাহা পর মুহূর্ত্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া যায়। ইয়ুরোপীয় উপন্যাসের বৈচিত্র্য অথবা বিশালতার স্পর্দ্ধা করিবার সময় অথবা ক্ষমতা এখনও বাঙ্গালীর হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি একটা প্রেমের খেলা। দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ ব্যভিচারই তাঁহার প্রায় সমস্ত উপন্যাসের মেরুদণ্ড।

বঙ্গদেশে গার্হস্থ্যজীবন ভিন্ন জীবন নাই, এবং প্রেম ভিন্ন বৃহত্তর বা ব্যাপকতর ভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদের সময় হইতে বাঙ্গালী এই প্রেম লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া আসিতেছে, এবং প্রেমের বিষয়েই বাঙ্গালীর প্রতিভা বিশেষ ফুটিয়াছে। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" এই বাক্য আমরা ভালরূপে বুঝিয়াছি, এবং অন্যকে বুঝাইতেছি! আবার ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রমণী-চরিত্র পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা অধিক বিকশিত হইয়াছে। বঙ্গসমাজে রমণীর ও গৃহিণীর একটা বহুকাল-প্রচলিত আদর্শ আছে। পুরুষ-চরিত্রের তেমন কোনও আদর্শ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রধান গুণ এই যে, তাহারা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-প্রণালীতে তেমন কোনও সংকীর্ণতা নাই। এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে কেহ আর এইরূপ মোহিনী শিল্পপ্রতিভা দেখাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের পর উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বর্ণলতা-প্রণেতার নাম সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। স্বর্ণলতার প্রথমাংশ বাঙ্গালীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস। ইহা বঙ্গীয় পরিবারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

অন্যান্য উপন্যাস-লেখক।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করাতে, তাঁহার প্রকৃত উপন্যাসরচনার ক্ষমতা ভালরূপে বিকশিত হইতে পারে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা উপন্যাস ভিন্ন অন্য দিকেও স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

কারীদের তিনিই অগ্রণী। তিনি শেষ বয়সে উপন্যাসে ও "ধর্ম্মতত্ত্বে" গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, এবং গভীর গবেষণার সাহায্যে নবীনচন্দ্রের সমবর্ত্তী কালে পুরাণাদির অন্ধকারগুহা হইতে কৃষ্ণ-চরিত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার এই কাব্য বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়িফলপ্রসূ হইবে, আশা করা যায়। নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ে, পদ্যে ও গদ্যে, বঙ্গদেশে নবভাবে দার্শনিক ভিত্তিতে কৃষ্ণ-চরিত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্র বহুপরিমাণে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহাকাব্য-কারগণের অনুসরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কাব্যগুলির সমস্ত লোভনীয় উপাদান ও উপকরণ তাঁহারা প্রতিভার ইন্দ্রজালের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাঁদের পর নবীনচন্দ্রের প্রতিভা জাতীয়-ভাব-অবলম্বনে বঙ্গীয় কাব্যজগতে মৌলিক ভাবে বিকশিত হইয়াছে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহাদের আদর্শের বশে নানাবিধ অলৌকিক উপকরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর উপকরণের ভাণ্ডার একরূপ রিক্ত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র এই শ্রেণীর উপকরণের আশ্রয় না লইয়া সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর বাগ্দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গবাসীকে অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনাইয়াছেন।

নবীনচন্দ্র; জাতীয়ভাব ও ঐতিহাসিক কাব্য।

অনেকে অনুমান করেন, বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্র বায়রণের শিষ্য! অবকাশ-রঞ্জিনী, ক্লিওপেট্রা ও পলাশীর যুদ্ধের মূলীভূত ভাবপ্রবাহের অনুধাবন করিলে, নবীনচন্দ্র যে প্রথম বয়সে বায়রণের অনুকরণ করিতেছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয়; তদ্ভিন্ন বায়রণের কাব্যাদিও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বায়রণের কবিতা সর্ব্বত্র জ্বালাময়ী; গভীরতা অপেক্ষা তাহাতে তরঙ্গ অধিক, এবং তিনি রচনাপ্রণালী বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবধান ও অসতর্ক। এই সমস্ত দোষে ও গুণে নবীনচন্দ্রও পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহা অত্যন্ত বায়রণ পাঠের ফল, মনে হয় না। নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি ও সাহিত্যজীবনেও ইহার মূল 'শিকড়' নিহিত আছে। রঙ্গমতীতে নবীনচন্দ্র তাঁহার অন্য সমস্ত কাব্য অপেক্ষা অধিক ধরা দিয়াছেন; উচ্ছৃঙ্খল বন-প্রকৃতির মত কবিপ্রকৃতি মধ্যে মধ্যে সমস্ত শৃঙ্খলা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছে; বর্ষার পার্ব্বত্য নির্ঝরের মত কাব্যকলা, রস, অলঙ্কার প্রভৃতি ভাববশে বিদলিত উন্মূলিত করিয়া যথেচ্ছ ছুটিয়াছে। এই কাব্যে কবির হৃদয়শোণিত সঞ্চারিত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের মৌলিকতা।

নবীনচন্দ্র রঙ্গমতীর প্রত্যেক অঙ্কে যত দূর আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন, ইহার প্রত্যেক অঙ্কে যত দূর হৃদয়বিতরণ করিবার অবসর পাইয়াছেন, আর কোনও কাব্যে তত দূর পারেন নাই। কবি স্বয়ং এই কাব্যের প্রধান নায়ক বলিলে, কথাটি অমূলক হয় না। এই কাব্যে এমন অনেক সুদীর্ঘ জল্পনা ও বর্ণনা আছে, যাহা একমাত্র কবির সম্পর্কেই সার্থক হয়।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভা অনেকপরিমাণে ঐতিহাসিক, পূর্ব্বে বলিয়াছি। কল্পনা ও বিচিত্রভাবপ্রবণতার সহিত এই ঐতিহাসিক প্রতিভা সম্মিলিত হইয়া কবির হৃদয় গঠিত করিয়াছে। সত্যের সহিত কল্পনার সংমিশ্রণে, কায়ার সহিত অদ্ভুত ছায়াবাজির সংমিশ্রণে, বিরাট রক্তমাংসবহুল শরীর ও বিপুল সুখদুঃখভাস্বর চরিত্রের সৃষ্টিই এই কবির বিশেষত্ব। সামান্য কাঠামোর উপর চকিতে বিচিত্র কল্পনাজাল বিস্তার করিতে, এক কটাক্ষে তাহার আদ্যন্ত মধ্য আয়ত্ত করিয়া রেখাপাত করিতে, নবীনচন্দ্রের তূলিকা খুব পটু। তাঁহার কাব্য-পাঠকের মনে ইহা সর্ব্বপ্রথমে আঘাত করে, এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস লিখিয়া নবীনচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের কবি। পূর্ব্ব-পূর্ব্বকাল হইতে ধর্ম্মবিপ্লবে বঙ্গসাহিত্য কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহার কিয়ৎপরিমাণে আভাষ দিয়াছি। নবীন-চন্দ্রের চেষ্টাও এই ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, প্রেমদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমধর্ম্মী। বৈষ্ণব কবিগণ স্বহস্তে রাধাকৃষ্ণ গঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে দেব-বোধে পূজা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রও কল্পনায় অভিনব কৃষ্ণ-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তের ন্যায় পূজা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আধুনিক বাঙ্গালী কবি পিতামহ প্রপিতামহের ভাবধর্ম্মের বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। অপর পক্ষে, এই কাব্য-গুলিতে প্রাচীন মহাকাব্য ও আধুনিক উপন্যাস, এই উভয় প্রকৃতি সম্মিলিত হইয়াছে ; ইহাতে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতের ভক্তিপ্রবণতাও বহুপরি-মাণে না আছে, এমন নহে। প্রভাসের কৃষ্ণ পূর্ণমাত্রায় শ্রীচৈতন্য। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 'সোঽহং' জ্ঞান ছাড়িয়া প্রকৃত ভক্তের ন্যায় এই কাব্যে নৃত্য করিয়া-ছেন। রৈবতকে যে মহিমান্বিত কৃষ্ণ-চরিত্রের আভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি; হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকাল।

প্রকৃতপ্রস্তাবে কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে প্রকাশ পায় নাই; তাহা শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের প্রভাব ও দেশব্যাপী ভক্তিধর্ম্মের বিজয়-ধ্বজার ফল।

বহুপূর্ব্বে মনীষী কেশবচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বর্ত্তমান আদর্শ প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন। তাঁহার পথানুসরণে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" নামক পুস্তকে কৃষ্ণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনার দিগন্তবিসারী চক্ষুর সম্মুখে এই বিষয় প্রকট, মহান্ ও বিভক্তাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে; এবং ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক তথ্য, সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, সৃষ্টি ও আবিষ্কার একাকার হইয়া, এই বিপুলায়তন কাব্যত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে। বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের জাতীয় সংঘর্ষ, ফরাসী বিপ্লব, আবটের নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, চিন্তাদগ্ধ মেরী এণ্টনিয়েট, মানবহিতৈষিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি সকলেই এই মহাকাব্যের উপকরণ যোগাইয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে জাগ্রত হইয়া পূর্ব্বকালের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি আধুনিক পরিচ্ছদ অবলম্বনে এই কাব্যে পরিস্ফুরিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, সাম্য-ভাব, মৈত্রী, দাসত্বপ্রথা, বিবাহপ্রথা, অদৃষ্টবাদ, জনবৃদ্ধি প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের সমস্যাসমূহের বিচার বিতর্ক ও কবির আত্মমতানুযায়ী সিদ্ধান্তে এই কাব্য মুখরিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয়তা নাই, ধর্ম্মই এই সমাজের মূল ভিত্তি ও বন্ধনগ্রন্থি, সুতরাং এই কাব্যকে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই কাব্যে যে সমস্ত সাহিত্যগত দোষ বর্ত্তমান আছে, তাহাও গুণের অনুপাতে অল্প নহে। তাঁহার রচনা-প্রণালীর বাহুল্য, পুনরুক্তি,

নবীনচন্দ্রের দোষ।

অসতর্কতা ও কবির ভাববিহ্বলতা, স্থানে স্থানে সর্গবন্ধে শৈথিল্য, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের বর্ণন ও কবির প্রকাশ্য-ভাবে পাঠককে ধরা দেওয়া ও অনাবশ্যক রসিকতা করিবার প্রয়াস প্রভৃতি দোষ, রসজ্ঞ পাঠকের চক্ষে সুস্পষ্ট।

নবীনচন্দ্র ভাবুক; প্রকৃত কুশলী কবি নহেন। ভাবাবিষ্ট হইলে তাঁহার আত্মসংযম থাকে না। তিনি ভাবের বেগে মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশ পাতাল পরি-ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন; শত বৎসরের সূক্ষ্ম বীজাণুকে মহাবৃক্ষে পরিণত করিতে পারেন,—যদি কোনও মাহেন্দ্রমুহূর্ত্তে উহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কারণ, প্রতিভা আকাশের হাওয়ায় পরিচালিত হয়। তাঁহার হৃদয় যদি কোনও বিষয় লক্ষ্য করিয়া ছুটে, তাহা হইলে অবিরাম ছুটিতে থাকে ; যেন তাহাকে, নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কবির নাই, ইচ্ছাও নাই। এই কারণে তিনি শক্তিশালী কবি হইয়াও কাব্যকুশলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ কবির অনুরূপ বেগ আছে, স্থানের প্রসারও আছে, কিন্তু অনুরূপ গাম্ভীর্য্য ও আত্মসংযম নাই ; তাঁহার কল্পনা চঞ্চলা পক্ষিমাতার মত প্রত্যহ নব নব দেশে নব নব বৃক্ষে নব নব শাখায় উড়িয়া বেড়ায় ; প্রত্যহ নব ডিম্ব প্রসব করিয়া এক চঞ্চুর আঘাতেই তাহাকে ফুটাইয়া রাখিয়া যায়। ধৈর্য্যের সহিত তাহার উপর জাগিয়া থাকিয়া উত্তাপ দিবার অপেক্ষা রাখে না। এই চাঞ্চল্য, এই দ্রুতগতি ও এই প্রচণ্ডশক্তি তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক পত্রে অনুভূত হয়। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস যে বিশাল কল্পনা-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ মৌলিক ও পৃথিবী-পরিব্যাপী, তাহাদের রঙ্গভূমি যেরূপ বিপুল ও অনন্তপ্রসারিণী, তাহাদের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ছায়ালোকসম্পাতে যেরূপ বর্ণসৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা যদি উপযুক্ত ধৈর্য্য ও নৈপুণ্যের সাহায্যে দৃঢ়ীভূত হইত, এমন কি, যদি শুধু কাটিয়া ছাঁটিয়া দোষাশ্রিত অংশগুলি বাদ দেওয়া হইত, তাহা হইলে, ইহা পৃথিবীর উৎকৃষ্ট মহাকাব্য-শ্রেণীতে স্পর্দ্ধার সহিত স্থানগ্রহণ পারিত। স্বদেশে বিদেশে বাঙ্গালী এই কাব্য গৌরবের সহিত দেখাইতে পারিত। ক্রমশঃ।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

ফিরিঙ্গি বণিক্।

নবম পরিচ্ছেদ।

কালিকট।

"Great is the country, rich in every style,
Of goods from China sent by sea to Nyle."—*Lusiad.*

ভারতবর্ষের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যকাহিনী সেকালের ইউরোপীয় কবিকল্পনাকে নিরতিশয় মুখর করিয়া তুলিয়াছিল! কবিকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত

করিবার উপায় নাই। "নষ্টমূলা জনশ্রুতিঃ"; লোকসমাজে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত হয়, তাহার মূলানুসন্ধান করিতে পারিলে, কিছু না কিছু সত্যসংশ্রব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় কবিকল্পনা যে সকল জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এরূপ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূলেও কিছু না কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত ছিল। জনসাধারণ তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্য ব্যস্ত হইত না; তাহারা জনশ্রুতিকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত। কবিকল্পনায় কেবল সেই তথ্যই বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। সেকালের ইউরোপীয় জনসাধারণের নিকট ভারতবর্ষ যে ভাবে প্রতিভাত হইত, "লুসিয়াদে"র কবিতায় তাহারই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সেকালের ইউরোপের তুলনায় ভারতবর্ষ সত্য সত্যই সমধিক সম্পন্ন রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত। তখনও বিশ্ববিজয়িনী বাণিজ্যশক্তি পরিস্ফুট হইয়া, ইউরোপকে পরস্বাপহরণের অধিকারদান করে নাই! তখনও নগরে নগরে শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ইউরোপকে শিল্পকৌশলে পরাক্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। তখনও জলে স্থলে বাহুবিস্তার করিয়া ইউরোপ ছলে বলে কৌশলে এসিয়ার অন্তরাত্মা প্রকম্পিত করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই।

তখন কেবল ইউরোপের জীবন-প্রভাত। সে প্রভাতে ইউরোপের নরনারী কেবল বিস্মিতনয়নে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ভারতবর্ষের মতই শিল্পবাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিবার উপায়-অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

যে দেশ সুদূর মহাচীন সাম্রাজ্যের বহুমূল্য পণ্যভাণ্ডার কুক্ষিগত করিয়া নীলনদের উভয় তটের বিবিধ পণ্যবীথিকা সঞ্জীভূত করিত,- পণ্যবিনিময়ে ইউরোপের সমগ্র জনপদের কষ্টসঞ্চিত ধনভাণ্ডার বহন করিয়া আনিত,-- তাহা যে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা জলে স্থলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষ বহু বিস্ময়ের লীলাভূমি বলিয়া সভ্যসমাজে সুপরিচিত। তাহার পুরাতন সাহিত্য ও শিল্পকলা অদ্যাপি কত অধ্যয়নশীল পাশ্চাত্য অধ্যাপকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে! তাহার অলৌকিক জ্ঞানগৌরব অদ্যাপি থাকিয়া থাকিয়া কত অভিনব তথ্যের মূল প্রস্রবণের সন্ধান প্রদান করিয়া ভারতবর্ষকে

ভারতবর্ষের সমুদ্রসৈকতের পুরাতন জনসমাজ অতিপুরাকালেই সমুদ্র-পথে অগ্রসর হইয়া, নানা দিগ্দেশের পণ্যসংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিল, পুরাতন সাহিত্যে অদ্যাপি তাহার বিবিধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অকুতোভয় নাবিকবর্গের অপরিসীম অধ্যবসায়ে অধিকাংশ সভ্যদেশেই ভারতবাণিজ্যের প্রবল প্রভাব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। অন্য কোনও সভ্যজাতি বাণিজ্য-বিস্তারে ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার সাহস প্রকাশ করে নাই। ইস্লাম অংশলাভের আশায় ভারতবর্ষের অনুগত হইয়াই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিল। সে বাণিজ্যে পরস্বাপহরণপ্রবৃত্তির সংস্রব ছিল না; জাতি-ধর্ম্মের কলহ কোলাহল কাহারও শান্তিভঙ্গ করিত না;—যে পারিত, সে তাহার শক্তিসামর্থ্য লইয়া নিরুদ্বেগে বাণিজ্য ব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিত।

ইউরোপের প্রথম চেষ্টাতে এই আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান ছিল;—ভারত-বাণিজ্যের অভিনব জলপথের আবিষ্কার-সাধনের আশায় পর্ত্তুগাল হইতে সমুদ্রযাত্রা করিবার সময়ে গামার হৃদয়ে হয় ত এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সে সাধু-সংকল্প তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে উপনীত হইবামাত্র, তদ্দেশে ইস্লামের আধিপত্য দর্শন করিয়া, গামার খৃষ্টধর্ম্মানুরাগ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যে জাতির প্রবল বাহুবলে স্থলবাণিজ্যপথ হইতে ইউরোপ চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে, জলবাণিজ্যপথেও তাহাদিগের প্রবল প্রতাপ লক্ষ্য করিয়া, গামা তাহা চূর্ণ করিবার উপায়চিন্তা করিতে করিতেই ভারতবর্ষাভিমুখে পোতচালনা করিয়াছিলেন। কালিকটের বন্দরে উপনীত হইবার অল্পকাল পরেই সে গুপ্ত সংকল্প প্রকাশিত হইয়া পড়িল!

পুরাকালে দাক্ষিণাত্যে কেরল নামক একটি সম্পন্ন রাজ্য বর্ত্তমান ছিল; পুরাতন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেরল রাজ্য চতুঃষষ্টি গ্রামে বিভক্ত হইয়া, সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। এখন যাহার নাম মালাবার উপকূল, তাহা সেই পুরাতন কেরল রাজ্যের চতুর্থাংশ-মাত্র। পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে গিরিপ্রাচীর, মধ্যস্থলে মালাবারের সংকীর্ণভূমি,—কোনও স্থলে নতোন্নত, কোনও স্থলে সম্পূর্ণ সমতল। স্থানে স্থানে পরিসর এত সংকীর্ণ, যেন ঘাটগিরি আসিয়া সমুদ্রসৈকতে মিলিত হইয়া রহিয়াছে।

বিস্তৃত বিবরণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল কালিকট বন্দরের নাম এখনও জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

যে সকল অর্ণবপোত পারস্য, আরব ও মিশর দেশে যাতায়াত করিত, তাহাদের যাত্রাপথে দণ্ডায়মান থাকিয়া, মালাবার-উপকূল কত অতীত ঘটনাই না প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে! যে সকল অর্ণবপোত প্রাচ্য দ্বীপ-সমূহের পণ্যভাণ্ডার মিশরদেশ পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইত, তাহারাও মালাবারের উপকূলভূমির নিকট দিয়াই গমন করিতে বাধ্য হইত। এই সকল কারণে মালাবারের উপকূল বহু বিদেশীয় নরনারীর নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাণিজ্যের বিজয়লক্ষ্মী মালাবার হইতে সর্ব্বপ্রকার কলহকোলাহল চিরনির্ব্বাসিত করিয়া, নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মকে আশ্রয়দান করিয়াছিল। যে সকল য়িহুদীয়, পারসীক বা মিশরীয় ভদ্রসন্তান মালাবারে বসতি করিতেন, তাঁহারা ভারতবাসীর ন্যায় অধিকার লাভ করিয়া, বিদেশাগত হইয়াও, রাজকার্য্যে অসঙ্কোচে নিয়োগ প্রাপ্ত হইতেন। এই সকল কারণে মালাবারের ইতিহাস বাণিজ্যপরায়ণ ইউরোপীয় বন্দরের ইতিহাস হইতে পৃথক্।

ইউরোপে কেবল সমরকাহিনীর আতিশয্য! ইউরোপের শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসেও কেবল হিংসার কথা,—নরহত্যার কথা,—পরস্বাপহরণের কথা,—যেন শোণিতের অক্ষরে দুর্দ্দান্ত দস্যুর কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! সে দেশের ধর্ম্মান্ধ নরনারী ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মসঞ্চয় করিয়াছে, পুণ্যের নামে কত অপবিত্র আচারের অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়াছে, নিরন্তর বিদ্বেষবিষে জর্জ্জরিত হইয়া, মানবের ললাটপটে কত দুরপনেয় কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কথা কোনও ইতিহাসপাঠকের অপরিজ্ঞাত নাই! ভারত-বাণিজ্যের ইতিহাস তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সত্যনিষ্ঠায় ভারতবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা; শান্তি ও প্রীতিতে ভারতবাণিজ্যের প্রসার; নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে ভারতবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি! যাহা গুণ, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার ফলেই ভারতবাণিজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে! ফিরিঙ্গি বণিকই তাহার একমাত্র মূল কারণ। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনায় সেই মূল কারণ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

কেরল রাজ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেবল বাণিজ্যব্যাপার লইয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিত। তাহার দুর্ভেদ্য গিরিপ্রাচীর

উল্লঙ্ঘন করিয়া, ভারতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব সাগরসৈকতে উপনীত হইত না। দিল্লীর উত্থান পতনের সহিত মালাবারের উত্থান পতনের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যাইত না। কালিকটের বন্দরে চিরদিনই ভারতবাণিজ্যের বিজয়বার্ত্তা; সেখানে অন্য কথা,—অন্য চিন্তা লোকচিত্ত আলোড়িত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইত না। আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়াও, কালিকটের বন্দর এইরূপে বৃহৎ বিজয়গৌরবলাভের অধিকারী হইয়াছিল।

যত দূর পর্য্যন্ত কুক্কুট-রব শ্রুত হইতে পারে, তাহাই কালিকটের স্বাভাবিক পৌর-সীমা,—এই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া কালিকট শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। তাহা যে সমুদ্রযাত্রার জন্যই সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, রাজবংশের উপাধি অদ্যাপি তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। রাজার উপাধি "সামুরী"; * —তাহাতে সমুদ্রের উপর আধিপত্য থাকাই সূচিত হয়। ফিরিঙ্গি বণিক্ "সামুরী"র উচ্চারণ-বিকৃতি সাধিত করিয়া, কালিকটরাজকে "জামোরিণ" নামে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন।

ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী কালিকট বন্দরে উপনীত হইবার সময়ে, তদ্দেশে নানা জাতির ও নানা ধর্ম্মের নরনারীর বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন্ পুরাকালে তাহার সূত্রপাত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। খৃষ্টাবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেও মালাবারের উপকূল ভারতবাণিজ্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের রাজদূতগণও মালাবারে বসতি করিতেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কালিকট নগরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক ছিল না। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রিত্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের সংখ্যাও অধিক ছিল না। ক্ষত্রিয়গণ সমর-শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জনের আশায় ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সকলেই বৈশ্যাচার-পরায়ণ হইয়া, বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

য়িহুদীয়গণের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তাঁহারাই ইউরোপের চিরভ্রমণশীল প্রধান বণিক্; অদ্যাপি সকল সভ্য দেশেই য়িহুদীয় বণিকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে তাঁহাদের অর্থবল প্রবল ছিল। খৃষ্টানসমাজ য়িহুদীয়গণকে ঘৃণা করিলেও, ঋণগ্রহণের জন্য য়িহুদীয়গণের

---

* Zamorin, the European form of the Tamil Samuri is still used in

ব্যরস্থ হইতে বাধ্য হইতেন। ইউরোপের বাণিজ্যোন্নতির মূলে য়িহুদীয়গণের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে পারস্যোপসাগরের ভারতবাণিজ্যপথ য়িহুদীয়গণের করতলগত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে য়িহুদীয়গণ দলে দলে ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পারসীকগণও এইরূপে ভারতবর্ষে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া, অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে বিবিধ বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছেন।

পারস্য, আরব, মিশর প্রভৃতি পাশ্চাত্যরাজ্যে যে সকল নবধর্ম্মের অভ্যুদয় হইত, তাহা অন্যত্র প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই, ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে তাহার কথা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। এই কারণে, খৃষ্ট ও মহম্মদের ধর্ম্মমত অল্পদিগের মধ্যেই মালাবারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মালাবারে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার মূল কারণ কি, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদের অভাব নাই। এ বিষয়ে দাক্ষিণাত্যে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাই ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। স্বনামখ্যাত বিশপ হীবর ও স্তর উইলিয়ম হণ্টার তাহার বিবিধ তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই দাক্ষিণাত্যের জনশ্রুতিকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের পুরাতন সংস্রবের মূল রহস্য কালক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

যীশুখৃষ্ট জর্দ্দন-নদের তীরে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষা-গুরু "জন" অবশ্যই খৃষ্টান ছিলেন না। তাঁহার বেশভূষার যেরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে "স্বস্তিকধারী" সন্ন্যাসী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে প্রাচ্য সাধুপুরুষগণ তাঁহাকে সূতিকাগারে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, এ কথা খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তৎকালে এসিয়াখণ্ডের জলে স্থলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অব্যাহত গতির ও স্বধর্ম্মবিস্তারের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিলে, যীশুখৃষ্টের দীক্ষাগুরুকে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধশ্রমণ বলিয়াই স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। এ বিষয়ে যাহা কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। তথাপি মনে হয়,—দ্বিসহস্রবৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ ভিন্ন "স্বস্তিকধারী" সন্ন্যাসী আর কোনও দেশে বর্ত্তমান ছিল না। যাহা হউক, খৃষ্টধর্ম্ম যে এসিয়া হইতেই ভারতবর্ষে প্রথম উপনীত হইয়াছিল, ফিরিঙ্গি বণিকের ইতিহাসে তাহার

খৃষ্টানগণ যাহাকে সমগ্র মানবজাতির মুক্তিমন্ত্র বলিয়া দিগ্‌দিগন্তে ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্ট তাহাকে স্বজাতির নিকট প্রচারিত করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহাকে তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন,—আগে য়িহুদীয়গণকে, তাহার পর অন্যান্য নাগরিকগণকে— নবধর্ম্মের সুসমাচার বিতরণ করিও। য়িহুদীয়গণ ধর্ম্মামৃত হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া বাহ্যাড়ম্বর ও ক্রিয়াকাণ্ড লইয়াই উন্মত্ত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মব্যাখ্যা করাই যীশুখৃষ্টের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি তাহার জন্যই অকালে দেহবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খৃষ্টশিষ্যগণের মধ্যেও এই প্রবৃত্তি প্রবল ছিল।

খৃষ্টশিষ্য টমাস নামক সন্ন্যাসী প্রবাসী য়িহুদীয়গণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। টমাস নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের মালিয়াপুর নামক স্থানে দেহবিসর্জ্জন করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে মালিয়াপুরে মেলা বসিয়া থাকে। তাহা দাক্ষিণাত্যে "সেণ্ট টমাসের মেলা" নামে সুপরিচিত। ফিরিঙ্গি বণিক মালাবারের উপকূলে উপনীত হইবার সময়ে এই সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদিগের আধিপত্য প্রবল ছিল। তাঁহারা রাজকার্য্যে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া সেনাবিভাগে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ভারতবর্ষীয় খৃষ্টানগণ কখনও কখনও মন্ত্রিত্বপদেও আরোহণ করিতেন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের হিন্দু রাজার মন্ত্রী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টানগণ ভারতবর্ষে স্বধর্ম্মের আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন; মুসলমানদিগের পক্ষেও তাহাতে কোনরূপ বাধা উপস্থিত হয় নাই। ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে পৃথক্ হইয়াও, রাজতন্ত্রে ও বাণিজ্যব্যাপারে এই সকল ভারতপ্রবাসী বিধর্ম্মিগণ ভারতবাসী বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন।

যে সকল মুসলমান অতি পুরাকাল হইতে মালাবারে বাস করিতেন, তাঁহারা আরব দেশ হইতে সমাগত, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ধর্ম্মান্ধ ছিলেন না। যাঁহারা মিশর ও পারস্যদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা খৃষ্টবিদ্বেষী হইলেও, হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। মালাবারে হিন্দু মুসলমান তুল্যভাবে বাণিজ্যব্যাপারে প্রভুত্ব লাভ করিতেন। বরং অনেক সময়ে মুসলমান বণিকেরাই সমধিক প্রভুত্বের পরিচয় প্রদান

করিতেন। মালাবারের হিন্দু অধিবাসিগণ নবাগত বণিকদলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, লাভের লোভে, তাঁহাদিগের সহিত চিরপরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ক্রেতার সংখ্যা অধিক হইলেই বিক্রেতার অধিক লাভের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। এই কারণে, মালাবারের হিন্দু অধিবাসিগণ নূতন ক্রেতাকে সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন না। *

ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে মালাবার অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থান অধিক অনুকূল হইত বলিয়া বোধ হয় না। অন্যান্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মালাবারের সমুদ্রোপকূল বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র বন্দরমাত্রই একটি রাজ্যের শেষ সীমা! তাহার রাজা কেবল বাণিজ্যশুল্ক সংগ্রহ করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে ব্যাপৃত! কেহ কখনও তাঁহার শাসনক্ষমতা অস্বীকার করিবে, কেহ কখনও বাহুবলে রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সদর্পে অগ্রসর হইবে, কেহ কখনও হিংসাদ্বেষ প্রজ্বলিত করিয়া মালাবারের শান্তিকুটীর ভস্মসাৎ করিবে,—এরূপ আশঙ্কা কদাচ রাজ-মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় নাই। পুরাকাল হইতে কত বিদেশের বণিক আসিয়া বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছে, কেহ কখনও স্বপ্নেও কালিকট রাজার সহিত কলহ উপস্থিত করে নাই। রাজা এই সকল কারণে রাজ্যরক্ষার্থ বহু-সংখ্যক সৈন্য পালন করিতেন না। সুতরাং পর্ত্তুগালের পক্ষে এরূপ অরক্ষিত ক্ষুদ্ররাজ্যের ক্ষুদ্র নরপতিকে বাহুবলে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা ছিল।

ভাস্কো ডা গামা যখন ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন, তখন ভারতবাণিজ্যের এইরূপ অসহায় অবস্থার সন্ধানলাভ করিয়া নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রাজ্যজয়, বাণিজ্যবিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার একত্র সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রের সন্ধানলাভ করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিক তস্করের ন্যায় ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন। যে দেশে সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মের তুল্য-রূপ সমাদর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা গুণ হইয়াও দোষের আকর হইয়া উঠিল। যাহা ছিল না, ফিরিঙ্গি বণিকের আগমনে তাহাই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তাহা নির্ব্বাপিত করিবার শক্তি না থাকায়, রাজা ও রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল! সেই তালীবনরাজিনীলা ভারতসাগরবেলা যদি প্রতি দিবসের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত, তবে সভ্যসমাজ স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাইত,—

* They welcomed foreign merchants, as the greater part of their revenues consisted of dues on Sea-trade.—Sir W. Hunter.

ফিরিঙ্গি বণিক ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করিয়াই কত অত্যাচার অবিচারে প্রশ্রয় দান করিয়াছিলেন!

ভারতবর্ষের তুলনায় পর্ত্তুগাল নগণ্য ক্ষুদ্র রাজ্য! কিন্তু কালিকটের তুলনায় পর্ত্তুগাল ক্ষুদ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে না। কালিকটের ন্যায় অরক্ষিত ক্ষুদ্র বন্দরকে বাহুবলে পরাভূত করিবার ক্ষমতা ছিল বলিয়াই পর্ত্তুগালের বিশ্ববিখ্যাত নাবিকরাজ ভারতবর্ষে রাজ্যসংস্থাপনের আশা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। গামা ধর্ম্ম-কলহের সহিত বাণিজ্য-কলহ মিশ্রিত করিয়া, কালিকটের বন্দরে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত করিয়া, কালিকট-রাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাহার কথা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

তিব্বতীয় বৌদ্ধ চিত্রফলক।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের হোম্-মেম্বর অনারেবল্ স্যার এ. টি. অরণ্ডেল একখানি চিত্রফলক কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। বিগত তিব্বত যুদ্ধের সময়ে ঐ ফলক তিব্বতদেশের গ্যাংচি প্রদেশের সন্নিহিত কোনও বৌদ্ধবিহার (সম্ভবতঃ ঞেঙিং নামক বিহার হইতে আনীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক সোসাইটীর ফাইলোলজিক্যাল সেক্রেটারী ডাক্তার রস্ উহা পরীক্ষার নিমিত্ত আমার নিকট প্রেরণ করেন। অরণ্ডেল সাহেবের অনুমতি *

---

* অরণ্ডেল সাহেব ২৮শে জুন তারিখে ডাক্তার রসকে যে পত্র লেখেন, তাহা এই —

BRAIG DHU, SIMLA,
28th. June, 1905.

Dear Dr. Ross,

In reply to your letter of the 24th Instant. I am delighted that the scroll should prove to be of such great interest. By all means keep it for the meeting of the Asiatic Society. Please also give my compliments to Pundit Satis Chandra Vidyabhushan and say I shall look forward with pleasure to reading his paper in the Society's Journal.

With kind regards
I am yours sincerely,

লইয়া উহা আমি ৫ই জুলাই তারিখে এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শন * করি।

ফলকখানির বয়ঃক্রম অনুমান ৩০০ তিন শত বৎসর। ইহার অনুপম কারুকার্য্য চীনদেশীয় শিল্পের অনুকরণে সম্পাদিত। ইহার দৈর্ঘ্য তিন হাত চারি ইঞ্চি, এবং বিস্তার কিঞ্চিন্ন্যূন দুই হাত। নানা বর্ণে রঞ্জিত সুবর্ণময় লতা, পত্র, কুসুম, চক্র ইত্যাদির যথাবিধি সমাবেশে ফলকখানির সৌন্দর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার বিচিত্র মূর্ত্তিসমূহ বস্ত্রের † উপর অঙ্কিত ও রঞ্জিত।

ফলকের শিরোদেশে রক্তবর্ণ ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ যোগাসনে সমুপবিষ্ট। তিনি সুখাবতী স্বর্গের অধীশ্বর ও পশ্চিম গগনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার দুই পার্শ্বে সমুজ্জ্বল মার্ত্তণ্ড বিরাজিত। ফলকের মধ্যস্থানে বুদ্ধ শাক্যসিংহের প্রশান্তমূর্ত্তি। তিনি নাসারন্ধ্রের প্রতি চক্ষুনিবিষ্ট করিয়া পদ্মাসনে সমাসীন। চতুঃপার্শ্বে তাঁহার জীবনের লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী অঙ্কিত।

(১) প্রথমতঃ বুদ্ধ শাক্যসিংহের নিকট ব্রহ্মা সহাম্পতির প্রার্থনা। বহু তপস্যার পর শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা অতি দুরূহ ও দুর্ব্বোধ। উহা মনুষ্যলোকে প্রচার করিলে কোনও ফল হইবে না, এই আশঙ্কা করিয়া, তিনি অনেক দিন নীরব ছিলেন। অনন্তর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বুদ্ধের নিকট গয়ায় সমুপস্থিত হন। "হায়! সংসারের ধ্বংস হইল!" এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে তিনি বুদ্ধের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করেন, "ভগবন্! সংসারে এমন অনেক মহাত্মা বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা রাগ দ্বেষ ও মোহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন নহেন, এবং যাঁহারা আপনার ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক"। ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে বুদ্ধদেব জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য স্বীকৃত হন।

---

* ৬ই জুলাই তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে "The Tebetan scrolls" এই নামে মদ্বর্ণিত চিত্রফলকের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। ৭ই জুলাইএর ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে এসিয়াটিক সোসাইটীর কোনও সভ্য উহার কোনও কোনও বিষয়ের প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন। ৯ই জুলাইএর ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে ঐ প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া আমি এক উত্তর প্রকাশিত করি। ১০ই জুলাই তারিখে অপর কোনও ব্যক্তি আর একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন। ১২ই জুলাই তারিখে আমি উক্ত প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া মদ্বর্ণিত বৃত্তান্তের যথার্থ্য সপ্রমাণ করি। তদবধি প্রতিবাদিগণ নীরব।

† চা-খড়ি ও জিউলির আঠা মিশাইয়া বস্ত্রের উপর লেপন করা হইয়াছে। ঐ লিপ্ত বস্ত্রের

(২) দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধদেবের গঙ্গা-সমুত্তরণ। বুদ্ধদেব ভাবিলেন, "কাহার নিকট সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মপ্রচার করিব? কে আমার প্রথম শিষ্য হইবে?" তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন, রুদ্রক রামপুত্র ও আরাড় কালাম, উভয়েই দেহত্যাগ করিয়াছেন। তদনন্তর পঞ্চ ভদ্রবর্গীয় ব্রাহ্মণের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিবার উদ্দেশে বারাণসী যাত্রা করিলেন। পথে গঙ্গা নদী। তাঁহার সঙ্গে তর-পণ্য নাই। নাবিক তর-পণ্য না পাওয়ায় তাঁহাকে পার করিল না। তিনি আকাশপথে উড্ডয়ন করিলেন। রাজা বিম্বিসার এই সংবাদ শুনিয়া নাবিককে ভর্ৎসনা করিয়া সন্ন্যাসিগণের নিকট তর-পণ্য আদায়ের প্রথা একেবারে রহিত করিয়া দিলেন।

(৩) তৃতীয়তঃ আজীবক সম্প্রদায়ের উপক নামক কোনও ব্যক্তির সহিত বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎকার। যখন বুদ্ধদেব বারাণসী যাইতেছিলেন, তখন উপক পথিমধ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কে? আপনি কাহার শিষ্য? আপনার ধর্ম্ম কি?" ইত্যাদি।

(৪) বারাণসীতে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন বা ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

(৫) কপিলবস্তুর রোহিতনদীতীরে বুদ্ধদেবের সহিত শুদ্ধোদনের সাক্ষাৎকার।

(৬) কোশলরাজ প্রসেনজিতের সাক্ষাৎকার।

(৭) রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেণুবন প্রদান করেন।

(৮) শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডদ নামক বণিক জেতবন ক্রয় করিয়া বুদ্ধকে প্রদান করেন।

(৯) অনাথপিণ্ডদ ও তদীয় কন্যাগণ বুদ্ধ দেবের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

(১০) সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ ও অগ্রশ্রাবক-পদ-প্রাপ্তি।

(১১) কশ্যপের অগ্নিহোত্রগৃহে বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতাপ্রকাশ।

(১২) এলাপত্র নাগের বৃত্তান্ত।

(১৩) শীতবনের শ্মশানে বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার। ইত্যাদি।

এইরূপ অসংখ্য চিত্র এই ফলকের উপর অঙ্কিত। প্রত্যেক ঘটনার নিম্নে সেই সেই ঘটনার পরিচায়ক এক একটি inscription লাল অক্ষরে তিব্বতীয়

ভাষায় উৎকীর্ণ আছে। সর্ব্বসমেত ৪৩টি inscription দৃষ্ট হইল। এমন অনেক ঘটনা অঙ্কিত আছে, যাহার নিম্নে কোনও প্রকার inscription নাই।

ফলকখানির পৃষ্ঠদেশে লিখিত আছে যে, ইহা বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে লম্বমান করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে যথাক্রমে এইরূপ আর তিনখানি ফলক লম্বমান ছিল। বস্তুতঃ, বুদ্ধের জীবনের সমগ্র ঘটনা এই ফলকে অঙ্কিত নাই। তিনি প্রচারক-ব্রত অবলম্বন করিবার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের ঘটনামাত্র ইহাতে অঙ্কিত আছে। সম্ভবতঃ, তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ঘটনা অপর তিনখানি ফলকে অঙ্কিত ছিল। বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ তিনখানি ফলক পাই নাই।

এই ফলকচতুষ্টয় অমূল্য পদার্থ। লামাগণ উহাকে "কোন্-ছোগ্" অর্থাৎ "দুর্লভ হইতেও দুর্লভ" বস্তু বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তিব্বতে অনেক পরিব্রাজক গমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ চিত্রফলক কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। গ্যাংচির পথ অতি দুর্গম। ইংরেজ সৈন্য ঐ পথ দিয়া গমন করায় উহার সন্নিহিত বিহারের দ্রব্যসমূহ উহাদের হস্তগত হয়। গ্যাংচির সন্নিহিত বিহারসমূহ অতি প্রাচীন। তিব্বতের প্রাচীন ও দুর্লভ বস্তুসমূহ উহাতেই সঞ্চিত ছিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সহযোগী সাহিত্য।

ধৃতি ও স্মৃতি।

ইন্দ্রিয়ার্থের সান্নিধ্যবশতঃ যে সকল ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহাদের উপরাগ (সেই সেই ক্রিয়ার অনুভূতি) আমাদের চিত্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। যে শক্তি দ্বারা চিত্তে অনুভূত ক্রিয়ার ভাব বা উপরাগ সংসক্ত হয়, চিত্তের সেই শক্তিকে ধৃতি বা ধারণাশক্তি কহে। স্মৃতিশক্তির যেমন ধৃতি বা ধারণা একটি অঙ্গ, সেইরূপ সেই ধৃত বিষয়ের পুনরায় প্রকাশ বা আবিষ্কারও ইহার অন্যতর কার্য্য। ডাক্তার জন্ কেটার "চেম্বার্স্ ম্যাগাজিন" নামক মাসিকপত্রে লিখিয়াছেন, ধৃতি ব্যতিরেকে দৃষ্ট ঘটনার মানস-প্রতিমা-অঙ্কন অসম্ভব; সুতরাং ধৃতিকেই স্মৃতিশক্তির মূল-স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। মস্তিষ্কধৃত বাহ্যার্থের উপরাগকে স্মৃতিপথে আরোপিত করিতে হইলে, প্রথমে এই সমস্ত উপরাগগুলিকে শৃঙ্খলায় গ্রথিত হইতে হয়; নতুবা ভবিষ্যতে

আবশ্যক হইলেই তাহাদিগের প্রতিমা তদ্দণ্ডে সংগঠন করা কঠিন হইয়া পড়ে। কি উপায়ে এই শৃঙ্খলাবন্ধন সম্পাদিত হয়, তাহাই এখন বিবেচ্য।

স্মৃতি বা ধারণা যে প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে দৃষ্ট ঘটনার প্রতিমা অঙ্কন কেমন করিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। কোনও বাক্য বা কোনও চিত্র, বা কোনও ঘটনার উপরাগ মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবামাত্র, মস্তিষ্কের কোষগুলির সন্নিবেশে পরিবর্ত্তন জন্মে। এই পরিবর্ত্তনের সহিত মোমের উপর অঙ্কিত মোহর বা ছাপের তুলনা হইতে পারে। ধাতুর উপাদানগত কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না, কেবল তৎসংস্থিত অণু সকলের সন্নিবেশের রূপান্তর জন্মে। এই বিন্যাস ব্যাপার বালুকা-মুদ্রিত চরণ-চিহ্নের সহিতও তুলিত হইতে পারে। বালুকাকণাগুলি যাহার পর যাহা, তার পর তাহাই থাকে, অথচ পদচিহ্নগুলি ফুটাইয়া তুলে। স্থির জলের উপর পালকের দ্বারা ঘর্ষণ করিলে যেরূপ ব্যাপার ঘটে, উপরাগ মস্তিষ্কের উপাদানগত হইয়া তদ্রূপ ক্রিয়ার উৎপাদন করে। প্রথম দুই এক বার পালকের ঘর্ষণ দূরীভূত হইলে মনে হয়, জলের যেন কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই; কিন্তু পরবর্ত্তী অবঘর্ষণ সকল এইরূপ ক্রিয়াশূন্য নহে; সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার অণু সকলের সমাবেশ আর পূর্ব্বের মত নাই। যদি এই সময় ঘর্ষণ বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে জল স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল অবঘর্ষণে জলের আর সে স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকে না; তাহার স্থায়ী রূপান্তর জন্মে।

মস্তিষ্কের অণু সকলেরও এই গতি। একবার তাহাদিগের পূর্ব্ব শৃঙ্খলার বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহারা আর পূর্ব্ব সমাবেশ প্রাপ্ত হয় না; রূপান্তরিত অবস্থাতেই অবস্থিতি করে। এই ভাব কখনই একবারে তিরোহিত হয় না। বারংবার যে ঘটনা ঘটে, তাহার অঙ্কন বা প্রতিকৃতি অধিকতর দৃঢ় হয়, এইমাত্র প্রভেদ। রূপান্তরের হিসাবে প্রথম প্রতিকৃতি বিনষ্ট হয় না; তাহার পর যতই পরিবর্ত্তনস্রোত তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, ততই মস্তিষ্ক-কোষাণু সকলের সন্নিবেশ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মস্তিষ্কের কোষ সংখ্যায় ৬০ কোটীর ন্যূন ত নহে, বরং অধিক হইবে। একটি কোষ যদি একটি উপরাগ-ধারণের উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে ৬০ কোটি বিভিন্ন ধারণা, এ কি কম কথা? তার পর যদি ৬০ কোটি কোষের এক, দুই, বা ততোধিক ক্রমে permutation করা যায়, তাহা হইলে ধারণার আর কি সংখ্যা থাকে? মনে করুন, এক একটি কোষ যেন এক একটি অক্ষর। লক্ষ শব্দের ভিতর প্রবেশ করিলেও এই অক্ষর আপনার অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই অক্ষত রাখে; শুধু লক্ষ শব্দ কেন, বিভিন্ন ভাষায় ইহা ব্যবহৃত হইলেও যে অক্ষর, সেই অক্ষর; হস্তে লিখিত কিংবা মুদ্রিত, এইমাত্র রূপভেদ; তা ছাড়া সর্ব্বত্রই ইহা আপনার স্বকীয়ত্ব অব্যাহত রাখে। যাহার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহারই রূপান্তর সাধন করে, কিংবা তাহার দ্বারাই রূপান্তরিত হয়। অক্ষর সম্বন্ধে যেমন এই ব্যাপার, কোষ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই।

সকলেই জানেন যে, আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থিত স্নায়ুকোষ এবং স্নায়ুরজ্জুর সম্মিলিত ক্রিয়া; কেবল যে কোষই ইহাতে লিপ্ত থাকে, তাহা নহে

তন্নিঃসৃত প্ররোহ সকল ও গতি-সমুৎপাদক স্নায়ুতন্তু সকল এই অঙ্গসঞ্চালন ক্রিয়ায় যোগদান করে। কিন্তু এই অঙ্গসঞ্চালন স্বতঃ-প্রবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হওয়ায় আমরা অনেক সময়ে অন্যান্য যান্ত্রিক ব্যাপার আর গণনার ভিতর আনি না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, একটি মক্ষিকা তাহার পক্ষসঞ্চালনে সেকেণ্ডে দশ হইতে পনর হাজার বার পক্ষ স্পন্দিত করে; প্রত্যেক স্পন্দনই এক একটি স্নায়বিক কার্য্য। এখন মক্ষিকা যখন উড়িতে থাকে, তখন,—ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয় যে,—এই সময় কত স্নায়ুকোষ কিরূপ তড়িৎগতিতে কি কার্য্যই না করে!

অঙ্গ-সঞ্চালনের দিক হইতে না দেখিয়া যদি আমরা জ্ঞানের উৎপত্তির দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? মনে করুন, আমরা একটি ঘড়ির দিকে চাহিতেছি। ঘড়ির আকার, আয়তন, উপাদান, সময়,—সমস্তই আমাদের চিত্তে উপরাগ উৎপন্ন করিতেছে; কিন্তু এই উপরাগ সকলের উৎপত্তি সুন্দর ভাবে শৃঙ্খলিত। যেটি যখন স্মরণ করিতে চাই, সেইটি তৎক্ষণাৎ যেন কোথা হইতে বাহির হইয়া আসে।

ঘটনাটি এই,—রেটিনা নামক পর্দ্দার বাহ্যার্থের প্রতিবিম্ব পড়িয়া, তাহার সংবাদ, স্নায়ুতন্তু-যোগে মস্তিষ্কের দিকে ধাবমান হইয়া, চতুষ্পার্শ্বের ধাতু সকলকে আলোড়িত করিয়া, মস্তিষ্কের নিকট যখন সমুপস্থিত হয়, তখন তাহার উপর এমন সকল দাগ পড়িতে থাকে, যাহা ঘড়ি-আকৃতি—সময়ের তালিকার সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাপক। দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে যেমন রূপ-দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তদ্রূপ শব্দের উপলব্ধি। এইরূপ প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধে।

স্থূল কথা, বালুকার উপর যেমন পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়, সেইরূপ মস্তিষ্কের কোষাণু সকল বাহ্যার্থের প্রতিবিম্ব বহন করে। এই প্রতিবিম্ব সকল কেবল যে সেখানে অঙ্কিত থাকে, তাহা নহে; এমন ভাবে শৃঙ্খলিত হয় যে, যখন যেটি সম্পন্ন করা যায়, তখনই সেটি মানসপটে প্রতিফলিত হয়। আমাদের মস্তিষ্কে ৬০ কোটি কোষাণু এইরূপ নিরন্তর বাহ্যার্থের প্রতিবিম্ব বহন করিবার জন্য অবিরত নিয়োজিত হইয়া কিরূপ দ্রুতগতিতে এই প্রতিবিম্ব সমুৎপন্ন করে, মক্ষিকার পক্ষ-বিতাড়ন তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে রক্ত-সঞ্চালন যেমন দ্রুতগতিতে হওয়া আবশ্যক, তেমনি ইহার উপাদান সুপুষ্ট হওয়া চাই, অত্যধিক দ্রুতগতি যেমন বিঘ্নাত্মক, অতি ধীর গতিও সেইরূপ অনিষ্টকর। মস্তিষ্ক-কোষের যথোচিত পরিপোষণ স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য্যের একমাত্র হেতু।

কাবুলের আমীর।

"ক্লীয়ার" নামক সাময়িকপত্রে মিষ্টার অ্যাঙ্গস হ্যামিল্টন কাবুলের বর্ত্তমান আমীর হবিবুল্লার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। তিনি বলেন, আমীর হবিবুল্লা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক নহে। ভূতপূর্ব্ব আমীরের মহিষীর ষড়যন্ত্র ও স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের ঈর্ষ্যায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আমীর

প্রতাপে ও নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান আমীর তাঁহার পিতার ন্যায় দৃঢ়চেতা ও গুণশালী নহেন। এ জন্য তিনি তাদৃশ নিপুণতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে পারিতেছেন না। আফিগানিস্থানের অধিপতির রাজ্যগঠন ও রাজ্য-শাসন এই উভয়বিধ শক্তি থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমীর হবিবুল্লা এই উভয় প্রকার শক্তি যথাযথরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তিনি দুর্ব্বলচেতা, পুরোহিতগণের পরামর্শানুসারে ও স্বীয় ভ্রাতা সর্দ্দার নসিরুল্লা খাঁর মন্ত্রণায় পরিচালিত। নসিরুল্লাও লোকান্তরিত আমীরের পত্নী, সর্দ্দার উমার খাঁর জননী, বিবি হালিমা কাবুলের রাজপরিবারে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এই কারণে আমীর হবিবুল্লাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইয়াছে। তিনি স্বীয় জননীর পদোচিত গৌরব ও সম্মানরক্ষার্থ এক দল রক্ষিসৈন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সেনাদল সর্ব্বদা বিবি হালিমার প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে। প্রকারান্তরে, রাজমাতা একরূপ বন্দিনীর ভাবেই রহিয়াছেন।

কিন্তু সর্দ্দার নসিরুল্লার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির হ্রাস করা আমীরের পক্ষে সহজসাধ্য নহে · আমীর স্বীয় প্রতাপশালী ভ্রাতার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন না। ভারত গবর্মেণ্টের প্রেরিত 'ডেন মিশন' (কাবুল মিশন) কাবুল নগরে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সর্দ্দার নসিরুল্লা খাঁ সালামী বা কাবুলের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু মিশন কাবুলে উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি 'ইৎউয়াৎ-উদ্দৌলা' বা রাজ্যের স্তম্ভ এই উপাধি লাভ করেন। নসিরুল্লা রাজ্যের স্তম্ভরূপে পরিণত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি রাজ্যরক্ষাকল্পে কত দূর যত্ন করিবেন, সে বিষয়ে ঘোর সংশয় বিদ্যমান। নসিরুল্লার হৃদয়ে কাবুলের সিংহাসন-লাভের উচ্চাভিলাষ অঙ্কুরিত হইয়াছে। সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হইলেই তিনি যে কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিরূপ কৌশলে ও কাহাদিগের সহায়তার নসিরুল্লা স্বীয় সংকল্প সিদ্ধ করিবেন, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া কিছুই অনুমান করা যায় না। কিন্তু এসিয়ার অন্যান্য রাজ্যের ন্যায়, আফগানিস্থানেও ঘটনাচক্র দ্রুততর বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং এই ঘটনাবলীর প্রভাবে কাহার অধঃপতন ও কাহার উন্নতিলাভ ঘটিবে, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।* রাজপরিবারের ও তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের নানাবিধ চক্রান্তবশতঃ আমীর হবিবুল্লাকে অনেক সময় দারুণ অশান্তিতে কালযাপন করিতে হয়। বিবি হালিমাকে অষ্ট প্রহর প্রহরিপরিবেষ্টিত অন্তঃপুর-কারায় আবদ্ধ রাখিয়াও আমীর বাহাদুরের শান্তি নাই। রাজমাতা শুদ্ধান্তচারিণী ও প্রহরিপরিরক্ষিতা হইলেও, তিনি প্রখরবুদ্ধিশালিনী ও সহায়সম্পন্না। বন্দিনী অবস্থাতেও তিনি সর্ব্বদা রাজপরিবারে প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। আফগানিস্থানের রাজকার্য্যে রমণীদিগের প্রভাব অসামান্য। পারিবারিক প্রত্যেক কার্য্যে রমণীর প্রাধান্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কাবুলের রাজদরবারে রমণীদিগের যেরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহা পুরোহিতদিগের প্রাধান্য অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। পূর্ব্বে রাজকার্য্যে

হবিবুল্লা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতে কাবুলের রাজান্তঃপুরে নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পুরোহিতবর্গের উপদেশে ও পরামর্শে আমীর তিনটি পত্নীর সহিত বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়াছেন। কোরাণে লিখিত আছে যে, কোনও ব্যক্তি চারিটির অধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কোরাণের এই উক্তি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পুরোহিতেরা আমীরকে পত্নীত্যাগের পরামর্শ দেন। কিন্তু রাজান্তঃপুরে দিন দিন উপপত্নীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বেগমদিগের পরিচর্য্যানিরতা রূপযৌবনসম্পন্না ক্রীতকিঙ্করীরা আমীরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া তাঁহার উপপত্নীর পদে উন্নীত হয়। কিন্তু এই সকল অভাগিনীর পরিণাম অনেক সময়েই অতীব শোচনীয় হইয়া থাকে। যে বাঁদী রূপ যৌবন, রমণীজনসুলভ হাবভাব ও নৃত্যগীতনৈপুণ্যে আমীরের চিত্তহরণ করে, তাহাদিগকে অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হয়।

পুরোহিতদিগের কৃপাবাহুল্যে চারিটি পত্নী এখন আমীর বাহাদুরের অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন।—(১) ইনায়েতুল্লার জননী, (২) হায়েতুল্লার মাতা, (৩) উলিয়াজান্‌কা (ইউসুফ্ খাঁ বরকাজির কন্যা: ইনিই পূর্ব্বে আমীরের প্রিয়তমা বেগম ছিলেন, ইহার গর্ভে একটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে), (৪) কবীরজানের মাতা। শেষোক্তা বেগমই উলিয়াজানকা বেগমের স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনিই এখন আমীর বাহাদুরের প্রিয়তমা বেগম। উলিয়া-জান্‌কা বিশেষ গুণবতী। অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকট ইনি হিন্দুস্থানী বেগম নামে পরিচিতা। শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের প্রভাবে ইনি অবরোধমধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে উলিয়া ভারতবর্ষের কোনও বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। এ জন্য সঙ্গীতকলায় ইনি পার-দর্শিতালাভ করিয়াছিলেন। উলিয়া পিয়ানো বাজাইয়া গান করিতে পারেন। তিনি আফগান পতি, আফগান জাতি ও আফগানিস্থানের অনুরাগিণী নহেন। দৈবক্রমে আমীর বাহাদুরের নিকট উলিয়াজান্‌কা বেগমের মনোভাব প্রকাশিত হওয়ায় আমীর তাঁহার প্রতি বিরূপ হন।

যে রমণী সম্প্রতি রাজঅবরোধে প্রধানা বেগমের পদ অধিকার করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে ক্রীতকিঙ্করী ছিলেন। ইউসুফ্ খাঁর কন্যার ন্যায় তিনি গুণবতী নহেন। এই রমণী দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি, অদম্যচিত্তবৃত্তিসম্পন্না, গর্ব্বদৃপ্তা ও প্রভুত্বপ্রয়াসিনী। ইনি স্বহস্তে তিনটি বাঁদীর প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। পরিচারিকাদিগের মধ্যে কেহ কোনও অপরাধ করিলে, এই নিষ্ঠুর বেগম স্বয়ং তাহাদিগকে প্রহার করেন। যে সকল বাঁদী ভবিষ্যতে আমীরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মে, তিনি তাহাদিগের অঙ্গবিকৃতি সাধন করিয়া থাকেন। আমীরের উপর এই বেগমের প্রভাব অসীম। তিনি নৃত্যগীত দ্বারা আমীরের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি হালিমা বিবির ন্যায় মেধাবিনী ও হিন্দুস্থানী বেগমের ন্যায় রমণীজনোচিত কোমলতা গুণে ভূষিতা নহেন। আমীরের এই বেগম-চতুষ্টয় পদমর্য্যাদানুসারে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমীরের প্রথমা পত্নী কবীরজানের মাতা বার্ষিক এক লক্ষ মুদ্রা, দ্বিতীয়া বেগম উলিয়াজান্‌কা আশী হাজার টাকা, তৃতীয়া বেগম হায়েতুল্লার জননী চল্লিশ সহস্র মুদ্রা ও সর্ব্বকনিষ্ঠা পত্নী বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এক সময়ে সর্দ্দার মহম্মদ উমার খাঁর জননী বিবি হালিমা আমীরের দরবারে চীনের রাজমাতা ও কোরিয়ার রাজমহিষীর ন্যায় প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় পুত্রকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অসমসাহসিকতা প্রকাশ করাতেই তিনি এক্ষণে বন্দিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। হালিমা বিবির পুত্র জননীর ন্যায় উৎসাহশীল ও সাহসী নহেন। এই কারণে তিনি মাতার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে নৃপতির প্রথমা বেগমের গর্ভজাত পুত্রই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়া থাকেন। তবে যিনি বলে ও কৌশলে রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন, লোকে তাঁহাকেও রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। রাজ্যের উত্তরাধিকারী তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, পিতার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া, তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির বিষয়ে কোনও প্রতিবন্ধক হয় না।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর হবিবুল্লা খাঁ ভূতপূর্ব্ব আমীর আবদর রহমানের বিবাহিতা গুবরেজ নাম্নী বাঁদীর গর্ভসম্ভূত পুত্র। কিন্তু তিনি উত্তরাধিকারসংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে আফগানিস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আমীরের অন্যতমা পরিণীতা পত্নী বিবি হালিমা, আমীর দোস্তমহম্মদের বংশপ্রসূতা বলিয়া রাজসিংহাসন-প্রাপ্তির দাবী করিয়া থাকেন। ইনি যে রাজবংশসম্ভূতা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যদি এই রমণী কোনও প্রকারে স্বাধীনতালাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে বিবি হালিমা স্বীয় পুত্র সর্দ্দার ওমার খাঁকে যে অবিলম্বে ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিবেন, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। যদি ওমার খাঁ বিদ্রোহাচরণে সাফল্যলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দাবী তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও আমীরের সহোদর সর্দ্দার নসিরুল্লা খাঁর দাবীর অপেক্ষা উপেক্ষণীয় হইবে না। স্বর্গীয় আমীর আবদর রহমানের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমের বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হবিবুল্লার এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নসিরুল্লার জন্ম হয়। মহম্মদ ওমার খাঁ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার সহিত তদীয় অগ্রজ-দ্বয়ের বয়ঃক্রমগত পার্থক্য অনেক অধিক। বর্ত্তমান আমীরের উত্তরাধিকারী ইনায়েতুল্লা ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার সহিত তাঁহার খুল্লতাত বিবি হালিমার পুত্রের বয়সের প্রভেদ ১৮ মাস মাত্র।

ভবিষ্যতে কাবুলের রাজনীতিক্ষেত্রে এই কিশোরবয়স্ক খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে রাজ-সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। উভয়েই কিশোরবয়স্ক। কালসহকারে যদি ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে আমীর হবিবুল্লার চেষ্টা ব্যতীত তদীয় পুত্র ইনায়েতুল্লা কখনও নিষ্কণ্টকে সিংহাসনারোহণে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু আমীর স্বীয় পুত্র ইনায়েতুল্লাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়া রাজদরবারে স্থান-প্রদান ও তৃতীয়া বেগমের গর্ভজাত পুত্র হায়েতুল্লাকে (ইনি ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জননী বদক্সান প্রদেশ হইতে ক্রীতা কিঙ্করী) বদক্সানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় পারি-বারিক সমস্যা জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। এ দিকে বিবি হালিমার পুত্র ওমার খাঁকে কোনও সম্মানের পদে উন্নীত করা হয় নাই। তিনিও জননীর ন্যায় এক প্রকার নজরবন্দী অবস্থায়

কামাতিপাত করিতেছেন। এই সকল ঘটনা হইতে অনুমিত হয় যে, কাবুলের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ঘোরতর গৃহবিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে।

বৌদ্ধলামার শিরস্ত্রাণ

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায়বাহাদুর বৌদ্ধ-গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সাংবৎসরিক অধিবেশনে তিব্বতীয় লামাদিগের 'পাল্‌সা' বা শিরস্ত্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক ও নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। রায় বাহাদুর বলেন ;—

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাত্মা অতিশের (শ্রীজ্ঞানদীপঙ্করের) জনৈক প্রসিদ্ধ শিষ্য তাঁহার জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করেন। মগধের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তৎকালে কিরূপ টুপি পরিধান করিতেন, অতিশের উক্ত জীবনবৃত্তান্তে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশীলা নামক রাজকীয় মঠে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের একটি মহাসভার অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে তিব্বত রাজদূত নাগটাহো লচাড়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি মগধের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত স্থবির রত্নাকরের নিকট সংস্কৃত শিখিবার জন্য তখন মগধে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত তিব্বতীয় রাজদূত এই মহা অধিবেশনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহার এক স্থলে লিখিত আছে, উপাসনাকালে বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলী টুপি বা উষ্ণীষ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য কাহারও মুখে গর্ব্ব বা অহঙ্কারের চিহ্ন প্রকটিত হয় নাই। (অতিশাই নামথর, ২২ পৃষ্ঠা)।

বৌদ্ধমঠে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়, এ কথা সকলেই হয় ত অবগত আছেন। ভগবানের চরণে সংসারের সমস্ত ভোগবিলাস উৎসর্গ করিবার ইহাই প্রথম ও প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেশ মস্তকের স্বাভাবিক ভূষণ। এ জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রথমেই মস্তক মুণ্ডিত করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের অনুশাসন অনুসারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের কোনরূপ শিরস্ত্রাণ-ধারণে অধিকার নাই। তবে কেন উত্তরপ্রদেশস্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসব দিবসে ও উপাসনাকালেও মস্তকাবরণ ধারণ করেন? বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই! সত্য বটে যে, মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ ধর্ম্মের অনুশাসনপালনে কিছু উদার, তাঁহারা হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণের ন্যায় স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার ব্যবহার দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই কখনও টুপি ব্যবহার করেন না। শাস্ত্রানুসারে শিরস্ত্রাণের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ধর্ম্মসংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠানকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মস্তক, বাহু ও পদতল অনাবৃত রাখিতে শাস্ত্রানুসারে বাধ্য। তাসিলাম্পো নামক বৌদ্ধমঠে অবস্থানকালে আমি বহুবার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের উষাকালীন উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলাম। রজনীশেষে প্রায় চারি ঘটিকার সময় বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। তখন শীতাধিক্যবশতঃ তাপমান যন্ত্রের পারদ ২২ ডিগ্রীরও নিম্নে নামিয়া যাইত। কিন্তু তত শীতেও প্রত্যেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্ম্মমন্দিরের বহির্দ্দেশে পাদুকা ত্যাগ

পুর্ব্বক নগ্নপদে পরিভ্রমণ করিতেন। শীতনিবারণের জন্য তাঁহারা পশমনির্ম্মিত আঙ্গরাখা পরিধান করিতেন বটে, কিন্তু সকলেরই বাহু অনাবৃত থাকিত। প্রধান পুরোহিত বেদীর উপর আসন পরিগ্রহ করিবামাত্র সন্ন্যাসীরা কোণাকৃতি সুদীর্ঘ মস্তকাবরণ পরিধান করিতেন। আমি এই অপূর্ব্ব রীতির উৎপত্তি বিষয়ে কারণানুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও সন্ন্যাসীই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই।

আমি প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলাম যে, শীতাধিক্যবশতঃ বুঝি সন্ন্যাসীরা নিষিদ্ধ টুপি ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বিগত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমি পিকিনের বহুবিধ বৌদ্ধমঠ পরিদর্শন করিয়াছিলাম। তথায় প্রাচীনমতাবলম্বী মহাযানপন্থী বহুসংখ্যক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তত্রত্য অন্যান্য বৌদ্ধমঠের সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা তাঁহারা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। হোসাঙ্গ সন্ন্যাসীরা (চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) অনাবৃত-মস্তকে উপাসনা করিয়া থাকেন। তথায় শীত অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু তথাপি কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপাসনাকালে মস্তকাবরণ ব্যবহার করেন না। অতঃপর আমি বৌদ্ধধর্ম্মের অনু-শীলনার্থ শ্যামদেশ ও সিংহলে গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি কোথাও উপাসনাকালে কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে টুপি পরিতে দেখি নাই। তাঁহারা আমায় বলিয়াছিলেন যে, কোনও ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবদিবসে বা উপাসনাকালে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মস্তকাবরণ-ধারণের ব্যবস্থা নাই। এমন কি, মস্তকে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমিত কেশও বৌদ্ধ ধর্ম্মানুশাসনের অনুমোদিত নহে।

আমি তিব্বতীয় ভাষার অভিধান সঙ্কলনকালে বহুতর প্রাচীন হস্তলিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। উক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে অতিশাই-নামথর নামক গ্রন্থে আমি 'পান্‌সা' বা পণ্ডিতের টুপি ধারণ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাত্মা অতিশ তিব্বত-যাত্রাকালে মস্তকে টুপি পরিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে মস্তকাবরণ ধারণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত করেন। "পাগ্‌সাংজঞ্জাঙ্গ" নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে পণ্ডিতদিগের শিরস্ত্রাণ-ধারণের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষ ও তিব্বতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। এই গ্রন্থের এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিটাগাঁও (বর্ত্তমান চট্টগ্রাম) নগরের পণ্ডিতবিহার নামক বৌদ্ধমঠে ঈশ্বরোপাসনা-কালে জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিতের কোন বৃদ্ধা রমণীর সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে বাগ্‌যুদ্ধ হইতেছিল। সেই সময়ে উক্ত পণ্ডিতের মস্তকে একটি কোণাকৃতি দীর্ঘ টুপি ছিল। তিনি তর্কে জয়লাভ করিলেন। সেই অবধি দীর্ঘাকৃতি উষ্ণীষ বা টুপি ধারণের প্রথা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল। টিলোপা পণ্ডিত তখন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মঠের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। অতিশের শিক্ষক নারোপা তাঁহার নিকট ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করেন। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এখনও সম্পূর্ণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। আমি পণ্ডিতবিহার মঠের স্থাননির্দ্দেশ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া-

চট্টগ্রামের দশ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে পাহাড়তলী নামে একটি স্থান আছে। তথায় মহামুনি নামে একটি বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। আমি মন্দিরটি পরিদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু বিহার বা মঠের কোনও নিদর্শন তথায় দেখিতে পাই নাই। মন্দিরমধ্যে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটি বৃহৎ বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ আধুনিক ও শিল্পসুষমা-বর্জ্জিত। বর্ত্তমান চট্টগ্রাম নগরে একটি অতি প্রাচীন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদটি প্রাচীন বিহার মঠের ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমান জেতৃগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া আমার সন্দেহ হইত। কারণ, তৎকালে মুসলমান জেতৃগণ আপন প্রতাপ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিজিতদিগের ধর্ম্ম-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেন। সুতরাং বৌদ্ধদিগের এই ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করিয়া মুসলমান জেতারা মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পবলিক্‌ওয়ার্কস বিভাগের কর্ম্মচারীরা চট্টগ্রামের অদূরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উন্নত ভূমি সমতল করিবার সময় একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত করেন। মূর্ত্তিটি প্রায় চারি ফুট উচ্চ হইবে। সাধারণ বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তির ন্যায় এই মূর্ত্তি ও উপবেশনাবস্থায় নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটি তিনটি স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড হইতে ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ মস্তকের শীর্ষভাগ পাওয়া যায় নাই। মূর্ত্তির মুখমণ্ডল এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। কেবল নাসিকার অগ্রভাগ যেন কিছু বিকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ পাথর-ঘাটার শিলাখণ্ড হইতে কোনও আরাকাণী শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমার মতে, এই বৌদ্ধমূর্ত্তি বিহার মঠ হইতে অপহৃত করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সন্নিহিত পাহাড়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য তাহারা অতি ব্যস্ত-ভাবে পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং এই সুবৃহৎ মূর্ত্তিটিকে সুদূর পর্ব্বতাশ্রয়ে বহন করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। পণ্ডিতের শিরস্ত্রাণ সম্বন্ধে আমি চট্টগ্রামের প্রাচীন বৌদ্ধদিগের নিকট অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমায় বলিয়াছিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রণালী চট্টগ্রামে প্রবেশলাভ করিবার পর হইতে আর কেহ টুপি পরিধান করেন না। তদবধি উক্ত প্রথা চট্টগ্রাম হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বিগত খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়। তখন তিব্বতে থিস্রং ডিউটসান রাজত্ব করিতেন। উক্ত সম্রাট মগধের নালন্দামঠ হইতে বৌদ্ধগুরু শান্তিরক্ষিতকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। শান্তিরক্ষিত তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার কার্য্য ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদির তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেন।

তিব্বতে শান্তিরক্ষিতের নাম বোধিসত্ত্ব। স্বীয় পবিত্র চরিত্র ও সদাচারের জন্য শান্তি-রক্ষিত উক্ত নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের জাহর প্রদেশের রাজপুত্র। জ্ঞানগর্ভ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মগ্রন্থের তিনি এক জন উপদেষ্টা ছিলেন। মাধ্যমিক যোগাচার্য্য আশ্রমের তিনি এক জন শিষ্য। তাঁহারই

লইয়া যান। এই তান্ত্রিকের নাম পদ্মসম্ভব। পদ্মসম্ভব মস্তকে টুপি ব্যবহার করিতেন। এই টুপিই তিব্বতীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবহৃত 'পান্‌সা' বা পদ্ম টুপি। অধুনা প্রত্যেক লামা এইরূপ শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কথিত আছে, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতীয় রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও নিম্নশ্রেণীর নরনারীর নির্ব্বাণপন্থা-অবলম্বন করিবার উপযোগী হইবে বলিয়াই উহা তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম অতি সহজে মানবদিগকে নির্ব্বাণপন্থা দেখাইয়া দেয়। উক্তমতাবলম্বী সন্ন্যাসীরা উপসনাকালে মস্তকে রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ ধারণ করেন, এবং রমণীরা রত্নালঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

উদ্বোধন। বৈশাখ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের "শ্রীশ্রীরামানুজচরিত" ও স্বামী অখণ্ডানন্দের "তিব্বতে তিন বৎসর" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ইতর জন্তুদিগের মানসিক বৃত্তি" উল্লেখযোগ্য সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। লেখকের ভাষায় এখনও জড়তা আছে। "মনোবৃত্তি"ই কি পর্য্যাপ্ত নয়? আবার "মানসিক বৃত্তি" কেন? শ্রীম—র "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি "হিতং মনোহারি চ", তাহা বহুবার বলিয়াছি, আর না বলিলেও চলে।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ। বঙ্গদর্শনের মোট পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মধ্যে সাড়ে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা সম্পাদক রবীন্দ্র বাবু স্বয়ং অধিকার করিয়াছেন। বামন ঠাকুর তিন পদক্ষেপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সম্পাদক ঠাকুর "নৌকাডুবি" ও "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে" একখানি মাসিকের অর্দ্ধেক ব্যাপ্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু "সম্ভাষণে" বলিতেছেন,—"বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ্ আপনার আলোচ্যবিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট নিবেদন এই যে, এই আলোচনা-ব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন্। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের দেশকে ভাল করিয়া [illegible] অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া দেশকে ভাল করিয়া জানার চর্চ্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চ্চার অঙ্গ। [illegible] এমন জিলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সভা[illegible] সংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যপরিষদ্ সার্থকতালাভ সমর্থ[illegible]। * * * বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান [illegible] কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণসংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। [illegible] দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্য[illegible] যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থা[illegible] এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।" * * * ই[illegible] রবীন্দ্রবাবুর এই সাধু প্রস্তাব "ইঁদুরের পরামর্শে" পরিণত না হইলেই আমরা সুখী হ[illegible] এরূপ অনুষ্ঠানে, যিনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে সক্ষম, এমন এক জন "নায়ক" আবশ্য[illegible]

দেশে ছাত্রের অভাব নাই, ছাত্রমণ্ডলেও কাজ করিবার ইচ্ছা বা শক্তির অসদ্ভাব নাই। সেই তরুণ শক্তিকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে শক্তি ও নিপুণতা আবশ্যক, বঙ্গদেশে সচরাচর তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যে নেতৃত্বে যে আদর্শে ছাত্রসম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হইবে,—নিষ্কাম কর্ম্মে ব্রতী হইবে, সে আদর্শ নির্জ্জীব সভায় সম্ভবে না। সে জন্য মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব চাই। পরিষৎ সভা ডাকিতে পারেন, নেতা যোগাইতে পারিবেন কি? রবীন্দ্র বাবু স্বয়ং অগ্রসর হইলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "ভট্টাচার্য্য মহাশয়" একটি সুন্দর আলেখ্য। "সিপাহী বিদ্রোহের কিছু দিন পূর্ব্বে নবদ্বীপের শ্যামাপদ শিরোমণি মহাশয় প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। * * * পূর্ব্বরাত্রি গৌরীপুর গ্রামে কুটুম্ব-গৃহে যাপন করিয়া প্রত্যুষে তিনি আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সঙ্গে এক জন মাত্র ভারবাহী, খড়ি নদীর ধারে পৌঁছিতে বেলা প্রহর উত্তীর্ণ হইল। রাজপুরের ঘাটের উপর ক্ষুদ্র আম্রবাটিকা দেখিয়া তিনি বিশ্রাম ও স্নানাদির জন্য উপবেশন করিলেন। * * * মাধব পেটারি হইতে ডাবা হুঁকা বাহির করিয়া তাহাতে জল পুরিল এবং এক ছিলিম তামাক সাজিয়া প্রভুকে সেবন করিতে দিবার পূর্ব্বে নল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একটি আম্রশাখা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। শিরোমণি ইহা নিবারণ করিলেন। তন্ময় হইয়া তিনি প্রস্ফুটিত মুকুলস্তবকের শোভা এবং তাহাতে প্রমত্ত মধুপকুলের সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতেছিলেন। * * * এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক নদীর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। * * * ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়া সহজেই তাহারা সঙ্কুচিত হইল এবং উত্তপ্ত নদীসৈকত ভাঙ্গিয়া দূরের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিয়া শিরোমণি কিছু ব্যস্ত হইলেন। মাধব দাস প্রভুর নির্দ্দেশমত ছুটিয়া আসিল, এবং বলিয়া গেল, 'মাসকল, ঠাকুর ইচ্ছা করেন এইখানেই তোমরা চান কর, তিনি আড়ালে যাচ্চেন।' তখন শিরোমণি পেটারি ও বস্ত্রাদি সেইখানে রাখিয়া মাধবদাস সঙ্গে মেয়েদের দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া তাহারা পূর্ণকুম্ভকক্ষে ঘাট হইতে উঠিল, কিন্তু চলিয়া না গিয়া ঠাকুরের দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, সম্ভবতঃ মেয়েগুলি তাঁহার দ্রব্যাদি অরক্ষিতাবস্থায় ফেলিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। কাজেই তাঁহাকে সেখানে ফিরিতে হইল। * * * প্রৌঢ়া দুই জন কক্ষের কলস হইতে কিছু কিছু জল মাটীতে ফেলিয়া তাহার উপর পূর্ণকুম্ভ দুইটি রাখিল এবং ঠাকুরকে গলবস্ত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তখন উভয়েই করজোড়ে প্রার্থনা করিল, আজ মধ্যাহ্নে তাঁহাকে তাহাদের গৃহে পদধূলি দিতে হইবে। শিরোমণির পথে বিলম্ব করিবার উপায় ছিল না। তিনি মহিলাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।" ব্রাহ্মণ কথাপ্রসঙ্গে প্রৌঢ়াদ্বয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইলেন, "প্রায়, আধ ক্রোশ হাঁটিয়া প্রত্যহ দুইটি বেলা, পানীয়জলসংগ্রহার্থে এইখানে সকলকে আসিতে হয়। কেন না, গ্রামের প্রাচীন দীর্ঘিকা ফাল্গুন মাসেই শুকাইয়া গিয়াছে, এবং দুই বৎসর হইতে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমীদারদের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাঁহারা কোন প্রতিকার করিতে পারেন না, তাঁহাদের মেয়ে ছেলেরা পর্য্যন্ত প্রত্যুষে এখানে আসিয়া স্নানাদি করিয়া যান।

প্রৌঢ়াদের মুখে জলকষ্টের এই কাহিনী শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ করুণার্দ্র হইলেন। * * * মহিলারা চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য স্নানাহ্নিক শেষ করিলেন, এমন সময় দূরের ঢক্কানিনাদ ক্রমশঃ নিকটতর হইল। তখন গাজনের সন্ন্যাসীরা দলে দলে বেত্র-দণ্ডহস্তে নাচিতে নাচিতে নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিল। * * * সন্ন্যাসীদের তিনি (শিরোমণি) নিকটে ডাকাইলেন। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, রাজপুরের মাঠে, গ্রামের অদূরে অথচ বাহিরে যে পরিষ্কার ভূমিখণ্ড আছে, তথায় একটি দীঘি কাটাইয়া দিলে ৫। ৭ খানি গ্রামের লোকে জল খাইয়া বাঁচিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে সেই ভূমিখণ্ড যাহার লাখেরাজ সম্পত্তি, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসিদলে উপস্থিত ছিল। পঞ্চাশ টাকা মূল্যে সে জমীটুকু ছাড়িয়া দিতে রাজি হইল। হিসাব করিয়া শিরোমণি মহাশয় দেখিলেন, ন্যূনাধিক দেড় সহস্র মুদ্রায় কার্য্যটি সম্পন্ন হইবে।" তাহার পর শিরোমণি মহাশয়, "পেটারি হইতে তুলট কাগজ ও লেখনী বাহির করিলেন, মাধব লাক্ষারসে কালী প্রস্তুত করিয়া দিল।" পাঠক কি মনে করিতেছেন, শিরোমণি মহাশয় এই জলকষ্টের দারুণ কাহিনী "বঙ্গবাসী" পত্রে পাঠাইবার জন্য তদ্দণ্ডে সেই নদীতীরে প্রবন্ধ লিখিতে বসিলেন? তা নয়, সেই দরিদ্র করুণাব্রতার হৃদয়-বাণীর পরামর্শে অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। আজ কাল সে পথে পরোপকার করিবার প্রথা নাই। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার পল্লীতে সে পুণ্য প্রথা বিদ্যমান ছিল। হায় সেকাল! এখন গ্রন্থকারের ভাষায় 'গল্পের শেষ' শুনুন,—"পেটারির ভিতর ক্ষুদ্র কাঠের বাক্সে স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রায় প্রায় দেড় হাজার টাকাই এবার শিরোমণি মহাশয় জমা করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেই অর্থে গৃহিণীর নিকট বহুদিনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা অর্থাৎ সস্ত্রীক তীর্থদর্শন এবং ভবিষ্যতের অন্নসংস্থানের জন্য একটী ভাল জোৎ খরিদ করিবেন। কিন্তু সে কথা আর মুখে ঠাঁই দিলেন না। গণিয়া টাকাগুলি পঞ্চাইতের প্রধান ব্যক্তির হাতে দিলেন, এবং প্রয়োজন হইলে আরও সাহায্য পঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।" * * * "ইহার তিন বৎসর পরে জমীদার মহাশয়েরা নূতন দীর্ঘিকার চারিটি রোহিতমৎস্য ধরাইয়া শিরোমণি মহাশয়কে উপহার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বাহকটিকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া মৎস্যের মূল্যস্বরূপ কয়েকটি মুদ্রা তাহার সঙ্গে ফেরত পাঠাইলেন, এবং বলিয়া দিলেন, উহা পুষ্করিণীর সংস্কার কার্য্যে ব্যয় হইবে। রাজপুর গ্রামে আজও সেই পুষ্করিণী আছে, তাহা 'ভট্টাচার্য্য পুকুর' বলিয়াই খ্যাত।" শ্রীশবাবু নিপুণহস্তে দিব্য তুলিকায় এই পুণ্য অবদানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণে" ও শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "রঘুবংশ" প্রবন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিনয় ও সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। "রঘুবংশের দিলীপের উপাখ্যানের মূল কোথায়," উভয় অধ্যাপকই তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত, কিন্তু কেহই 'সাহস করিয়া' কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং আমরা নাচার। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ত্রিবঙ্কুর" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "প্রাচ্য সত্যনিষ্ঠা"র প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

স্থানাভাবে অন্যান্য মাসিকের সমালোচনা এবার প্রকাশিত হইল না।

জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালা

হংকং।

যে দিন প্রথমে হংকংএ নামি, সেই দিনই এই চিত্রশালাটি দেখিয়াছিলাম। সে চিত্র-গৃহের রাস্তার ধারের দেয়ালটি, আলো যাইবে বলিয়া, কেবল শার্সিতে গঠিত,—রাস্তা হইতেই ভিতরকার ছবিগুলি সব দেখা যায়। কত লোক পথ চলিতে চলিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া ছবি দেখে। আমার সেখান হইতে দেখিয়া আশা মিটিল না। পতঙ্গ যেমন আলো দেখিলে অনন্যগতি হইয়া তাহাতেই আকৃষ্ট হয়, আমিও সেইরূপ হইলাম।

চিত্রকর তখন সমাপ্তপ্রায় একটি ছবিতে নিবিষ্টচিত্তে তুলি বুলাইতে-ছিলেন। আর কতকগুলি চীনেম্যানও চিত্রকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আমি ভিতরে যাইবামাত্রই চিত্রকর উঠিলেন। বোধ হয়, মনে করিলেন, ক্রেতা আসিয়াছে। ক্ষীণদেহ যুবাপুরুষ, ঢলঢলে চিত্র বিচিত্র পোষাক পরা। মাথার চুলগুলি বড় বড় ও সিঁথাকাটা, কতকটা আমারই চুলের মত। সাধারণ জাপানীরা এত বড় চুলও রাখে না; এমন সিঁথিও কাটে না। বোধ হয়, কেবল চিত্রকরেরই এই দস্তুর। তিনি মিষ্ট স্বরে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"Good morning!" চিত্রকরের গলার মিষ্ট স্বর শুনিয়া ও তাঁহার অভিবাদনের হাবভাব দেখিয়া আমি তখনই বুঝিলাম, ইনি আমাকে দয়ার চক্ষে দেখিয়াছেন।

আমি প্রথমেই বলিলাম,—"আমি কিনিতে আসি নাই। সুন্দর সুন্দর চিত্রগুলি বাহির হইতে দেখিয়া আশা মিটিল না বলিয়া নিকটে দেখিতে আসিলাম।" সোজা কথা শুনিয়া তিনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ করেছেন শুভাগমন করেছেন!" ("quite well come!") জাহাজে ছাড়া শিক্ষিত জাপানীর সঙ্গে কথোপকথন এই আমার প্রথম। আমার প্রত্যেক প্রশ্নের তিনি সযত্নে উত্তর দিতে লাগিলেন। বর্ম্মা ও চীনদেশে অনেক ইংরাজী-জানা লোকের সঙ্গে কথা কহিয়াছি; এমন সরল সুস্পষ্ট উত্তর কোথাও শুনি নাই। ঠিক যেন আমার মনের কথা বুঝিয়া লয়েন, এবং তাহার যথাযথ উত্তর দেন। সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আছে বলিয়া তাঁহার সেই উত্তরগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হইল।

যে দিকটি প্রথমে দেখিলাম, সে দিকটিতে সবই চীনা ও জাপানী চিত্র। জাপান দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ও জাপানী গার্হস্থ্যজীবনের আলেখ্য। সে সব চিত্র দেখিলে অনেকাংশে জাপান দেখার কাজ হয়। আমার এই কয়খানি ছবি দেখিয়া ও চিত্রকরের মুখে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া কত যে শিক্ষা হইল, তাহা বলিবার নয়। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে যেমন তাহার লোভ বাড়িয়া যায়, আমারও সেইরূপ হইল। যে কয় দিন হংকংএ ছিলাম, শেষদিন ছাড়া প্রত্যহই সেই চিত্রশালায় যাইতাম। প্রত্যহই তিনি চিত্র দেখাইতেন, এবং কতকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আমি সাহেব নহি, হিন্দু, এ কথা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়তা আরও বাড়িয়া গেল। শিক্ষিত জাপানীরা ভারতবাসীকে এমনই স্নেহ ও সম্মান করেন। ভারতবর্ষ তাঁহাদের মনে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়।

দরজার সম্মুখের ছবিখানিতে দেখিলাম, একটি বৌদ্ধমন্দিরের প্রাঙ্গনে অনেকগুলি হরিণশিশু নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। শুনিলাম, নিরামিষভোজী প্রাণিহিংসাবিরহিত জাপান দেশে এরূপ যথার্থই দেখা যায়। কল্পনা-লিখিত নহে। সেইখানেই আবার ঘুঘুর মত একরকম পাখী মাটী থেকে শস্য খুঁটিয়া খাইতেছে। একটি জাপানী রমণী পুণ্যকর্ম্ম-বিবেচনায় হরিণ ও পাখীকে নিজের হাতে খাওয়াইতেছেন। পাখীগুলি তাঁহার হাত হইতে খুঁটিয়া খাইতেছে। পরস্পরের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস, কাহারও মনে সন্দেহ বা ভয়ের লেশমাত্র নাই। হরিণগুলির সিং নাই। বোধ হয়, অহিংসার দেশে থাকিয়া যন্ত্রগুলি অনাবশ্যক বলিয়া আর জন্মায় না।

তাহাদের পাশেই "ক্রিসেন থিমম্" (crysanthemum) ফুলের প্রদর্শনীর চিত্র। এই ফুল জাপানের বড়ই প্রিয় ফুল। নানা রঙ্গের সতেজ বড় বড় পাপড়িযুক্ত গাঁদা, সূর্য্যমুখীজাতীয় ফুল। প্রতি বৎসর এই ফুল ফুটিবার সময় দেশ জুড়িয়া উৎসব হয়। ভিন্ন-ভিন্ন-আভাযুক্ত ফুলগুলি পাশাপাশি সাজাইবারই বা কি পারিপাট্য! ছবিখানির দিকে চাহিলে নয়ন জুড়ায়।

তাহার পাশেই চেরীব্লসম (cherry blossom) নামক জাপানী আর এক প্রকার সুগন্ধি ছোট ফুল ফুটিবার বাৎসরিক বসন্ত-উৎসবের নৃত্যের ছবি। রমণীগণ ফুলসাজে সাজিয়া, খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া, গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের বালা পরিয়া, সারিবন্দী হইয়া নৃত্য করিতেছে। সকলেরই মুখে হাসি ও মনে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। কোনও মাদকদ্রব্য না খাইয়াই যেন ফুলের গন্ধে আর

মনের আনন্দে মাতোয়ারা। শুনিলাম, জাপানে ফুলের এতই আদর যে, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর প্রাঙ্গনে ফুলের বাগান আছে। তাহার কত যত্ন, কত পরিচর্য্যা। প্রত্যেক শুভ কার্য্যেই ফুলের আবশ্যক। কাহারও বাড়ী ফুল ফুটিলে পাড়া শুদ্ধ লোক তাহা দেখিতে আইসে।

তাহার পাশেই কতকগুলি বীভৎস রসের ছবি। সেইগুলি দেখিয়া কতকগুলি জাপানী প্রথার পরিচয় পাইলাম, এই যা। নয় ত আমার সে সব ছবি দেখিতে একটুও ভাল লাগিল না। খুন খারাপী, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি আসুরিক লীলা কি ফুলের পাশে রাখা উচিত হইয়াছে? শুনিলাম, জাপানে নাকি এই বীভৎস রসের আদর আছে। যাত্রা বা অভিনয়ের আসরে হত্যাকাণ্ড সচরাচর সকলের সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখা যায়। দর্শকবৃন্দ তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। যে ছবিগুলির কথা বলিতেছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই,—

এক জন জাপানী "সামুরাই" "হারীকুরী" অর্থাৎ ছোরা দিয়া আপনার পেট চিরিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। অপমানিত বা অপদস্থ হইলে আত্মসম্মানরক্ষার জন্য এরূপ আত্মহত্যা করা বড়ই গৌরবের বিষয়। উপবিষ্ট অবস্থায় ছোট ছোরা দিয়া নিজের পেটে একটি সোজা আঘাত করিয়াছে। তাহা হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছে। দুর্ব্বলতাবশতঃ ঘাড়টি নত হইয়া পড়িতেছে। সেই ছোরা তাহার পর যদি আপনার গলাতেও দিতে পারা যায়, বা খাপের মধ্যে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে গৌরবের আর সীমা থাকে না। তবে প্রথমে নিজেকে নিজে আহত করিলে পর চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুবর্গ তরবারির দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া মৃত্যুর সাহায্য করে। নহিলে সে আস্তে আস্তে মৃত্যু আরও কষ্টকর হইত।

তাহার পরই কতকগুলি চীন-জাপান ও রুস-জাপানের জলযুদ্ধের ও স্থলযুদ্ধের ছবি। দুর্দ্ধর্ষ জাপানী সেনার পশ্চাৎধাবনে ঢল ঢলে পোষাক পরা চীন সেনারা ঊর্দ্ধশ্বাসে টিকি উড়াইয়া পালাইতেছে! দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পালাইবার রকম দেখিলে এ কখনও মনে হয় না যে, তাহারা যথার্থই লড়াই কি তাহা জানিয়া লড়াই করিবে বলিয়াই সৈন্য-দলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। জাপানী আঁকিয়াছে কি না, তাই হয় ত চীনেকে আরও হেয় করিয়া আঁকিয়াছে। এক একটি অগ্নিময় "বম্বশেল" সৈন্যদলের মধ্যে পড়িয়া শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য নরহত্যা করিতেছে। এ সব ছবি যেন চোখে বিঁধিতে লাগিল।

এই সকল অশান্তিপূর্ণ বীভৎসরসাত্মক যুদ্ধ বিগ্রহের ছবিগুলির পাশেই

উড়িতে সুষুপ্ত পৃথিবীর উপর বিশ্বের শুভকামনাপূর্ণ শান্তিসঙ্গীতধারা বর্ষণ করিতেছেন। যুদ্ধের ছবির পাশে সে ছবিখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তিনি যুদ্ধের শান্তি গানই গাহিতেছিলেন,—

"নির্ব্বাণ হোক বৈরানল, বীরকুলের হোক কুশল;
স্থির থাকুক ভূমণ্ডল, সুখে থাকুক প্রজাগণ!"

সেখান হইতে চোখ ফিরাইয়া তাহার পার্শ্বে দেখিলাম, জাপান-রাজ মিকাডো ও তাঁহার মহিষীর ইউরোপীয় পোষাক পরা প্রতিকৃতি। সুন্দরী মিকাডো-মহিষীকে এই পোষাকে বড়ই কদর্য্য দেখাইতেছে। ঠিক যেন আয়ার মত। শুনিলাম, ইনি এইরূপ বিদেশীয় সাজ সজ্জা পরিতে বড়ই ভালবাসেন। দেশের বিস্তর লোকেরই এখন সকল বিষয়ে ইউরোপের অনুকরণে অনুরাগ। সেই জাপানী চিত্রকরের মুখে এই সম্বন্ধে আর একটি অতি বিস্ময়কর সংবাদ শুনিলাম যে, এই-রূপ সজ্জায় স্ত্রী স্বামীর অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পান, কিন্তু দেশীয় পোষাক পরা থাকিলে সামাজিক নিমন্ত্রণে স্বামীর পিছনে পিছনে চলিতে হয়।

এই ছবির পাশেই দেখিলাম, একটি বয়স্ক শিশু তাহার মাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া খেলার সাথীদের ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া ছুটিয়া মার স্তন্যপান করিতে আসিতেছে। মার মুখে সন্তানবৎসল্যের ভাব ও ছেলের মুখে মাতৃস্নেহের অভিব্যক্তি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। চারি চোখে এক হইতেই ছু' জনেরই মুখে হাসি। এক জন কোলে লইতে ও অপর জন কোলে উঠিতে সাগ্রহে হাত বাড়া-ইয়াছে! অত বড় ছেলে এখনও মাই খায় কেন, এ কথা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম যে, জাপানে ছেলেরা অনেকে ৪।৫ বৎসর অবধি মাই খায়। গরু বা অন্য পশুর দুগ্ধ ব্যবহার করিবার প্রথা নাই, তাই এরূপ করিতে হয়। এরূপ অপর কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই।

তাহার নিকটেই একটি জাপানী বিবাহের ছবি। বর-বধূ বিবাহ-আসরে পাশাপাশি বসিয়া মাঙ্গলিক মন্তপান করিতেছেন। শুনিলাম, চীনদেশের মত কনেকে বরের বাড়ী আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বা বর্ম্মার বা ম্যালের মত বরকে কনের বাড়ী যাইতে হয় না। চিত্রকর আমাকে কতকটা বিস্মিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার দেশে কি হয়?" আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "কে সম্পর্কে বড়?—কি হওয়া উচিত?" আমি উভয়েরই সম্মানরক্ষা করিয়া বলিলাম, "দু জনেরই চার্চ্চে গিয়া বিবাহিত হওয়া উচিত।

থাকিলেও সকল দেশেই স্ত্রীজাতির উপর একটু অবজ্ঞার ভাব লোকের অন্তরে অন্তরে থাকে। সহজে যায় না।

তার পাশেই বুদ্ধদেবের সৌম্যমূর্ত্তি। ঠিক রেঙ্গুনের মূর্ত্তিগুলির অবিকল নকল। এ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ম্মার ফুঙ্গীগণই যেন "পোপ" বা শিক্ষা-গুরু। চীনেও তাহাই দেখিয়াছি, এই জাপানী ছবিতেও তাহাই দেখিলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কষ্ট ভাবিয়া যেন ধ্যানস্তিমিত নেত্রে জল আসিতেছে। সে আত্মা কত বড় মহান ছিল!—অমন জীবনের আর ইতিহাসে তুলনা নাই। সন্তান-আশায় নিরাশ এমন পিতার বৃদ্ধবয়সের পুত্র—ও অকালে অতিসহসা প্রসূত হওয়াতে (Precipitate labor) মাতার মৃত্যু ঘটায় আজন্ম মাতৃহীন, তাঁহার মনে যে দয়া দৌর্ব্বল্য এত বেশী থাকিবে, তার আর বিচিত্র কি! আজন্মচিন্তাশীল স্বভাবের উপর আবার কেমন ঘটনাচক্র ঘটিল। যে পথে যান, সেই পথেই বাধা! এক দ্বারে বার্দ্ধক্য, অপরে জরা ও অপর দ্বারে মৃত্যু দেখা দিল, শেষে নিষ্কাম যোগীর শান্তমূর্ত্তি চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গন্তব্য পথ দেখাইল। সে গতি ত আর রুদ্ধ হইবার নয়। অন্তরের একান্ত আগ্রহে একে একে কত পথই খুঁজিলেন। শাস্ত্রের উপদেশ মুক্তিপথের সংবাদ দিতে পারিল না। কঠোর তপস্যাতেও শান্তি আসিল না। ধীর যুক্তিপূর্ণ চিন্তায় সে সমস্যা পূর্ণ হইল। মহান জীবনের এই ইতিহাসগুলি সব সেই ধ্যানমগ্ন কাঁদ-কাঁদ মুখখানিতে লেখা দেখিলাম।

তাহার পাশেই দেখি, বিজ্ঞানগুরু হারবার্ট স্পেন্‌সরের সৌম্যমূর্ত্তি অঙ্কিত। চুলগুলি সব পাকা, বৃদ্ধ বয়সেও চক্ষুর জ্যোতি কিছুমাত্র নিভে নাই। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, যেন জ্ঞানজগতের কি তত্ত্ব-উদ্ভাবনে রত। ইনি সমস্ত মানবের বন্ধু। বিশেষ জাপানের পরম বন্ধু ছিলেন। যেমন হইয়া থাকে, নাস্তিক বিশ্বাসের মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বপ্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল। দেহের জ্যোতি যেন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তার পাশেই টেনিসনের লিখিত কৃষক-তনয়া "ডোরা"র প্রতিকৃতি। শস্যক্ষেত্রে বালিকা পিতৃহীন অসহায় একটি শিশু লইয়া যত্ন করিতেছেন। শিশুর পিতাকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, প্রতিদান পান নাই আর সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে —

"—And the day went,
And the sun fell,

" Wherever than wilt go &c.,
&c. God."
"—Awako arise my dearest love,
Heaven's last best gift,
My ever new delight,
Arise—Awake ! "

তার পাশেই "রুথের ছবি"। বিদায়কালে মরুভূমির মধ্যে শাশুড়ীকে মিনতি করিতেছেন,—"আমাকে ছেড়ে যেও না !" স্বামী পুত্র সব হারাইয়া শ্বশ্রূ বলিতেছেন, "সব বিসর্জ্জন দিয়ে আমি আমার দেশে যাচ্চি, তুমি তোমার বাড়ী ফিরে যাও।" রুথ মরুভূমির পথে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিতেছেন,—**Wherever thou wilt go, I will go, thy country is my country, thy people, my people and thy God my God.**

তাহার পার্শ্বেই কবিগুরু মিল্টনের প্যারাডাইস্ লস্টের একখানি ছবি। অতি প্রত্যুষে অ্যাডাম সুষুপ্তা ইভকে জাগাইতেছেন। অরুণের লাল আভা তাঁহার মুখে পড়িয়াছে। দুঃস্বপ্নের অশান্তিরেখা মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অ্যাডাম অতি আদরে গা ঠেলিয়া বলিতেছেন, "Awake arise my dearest love Heaven's last best gift my ever new delight—arise awake."

অপর প্রাচীরে আর কতকগুলি অতি সুন্দর ছবি। তার মধ্যে প্রথমেই Birth of Hellenএর ছবিখানি কিছু অশ্লীল। তবে কবিতার চক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সকল নিয়ম সকল সৌন্দর্য্যই পবিত্রতা মাখান বলিয়াই, বোধ হয়, হংকংএর রুচি-পুলিশ আপত্তি করে নাই। নদীর ধারে উত্তেজিত হংসরাজ গ্রীবা বাড়াইয়া সাগ্রহে চঞ্চুপুটে আবেশ-আসন্ন "লীডা"র অধরোষ্ঠ ধরিয়াছেন। তাহার ডানাগুলি মেলান ও পক্ষিশরীরে পক্ষরাজি কণ্টকিত।

তাহার পার্শ্বে ই "ওয়াটার বেবী।" জলদেবীর প্রথম শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদিতেছে। মা যেন আড়ষ্ট, ছেলে নিতে জানেন না। তার ঘাড় ঝুঁকে পড়েচে। চুলগুলি ভিজিয়া গিয়াছে। ছোট ছেলের দুঃখকষ্টহীন কান্নার রেখাগুলি মুখে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। আর তাঁহার নিজের শরীর গোলমালে প্রায় বিবস্ত্র। ছেলেটিকে সম্মুখে রাখিয়া বিমূঢ়ের মত এক পা জলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বিস্ময় ও নূতন প্রীতিমাখান মুখের ভাব। ছেলে হওয়া যে কি, যেন জানিতেন না।

"স্নানাগারে জাপানী রমণী"র ছবিতে দেখিলাম রক্তের বোতাম খোলা

ফ্রক পরিয়া এক জন রমণী স্নানাগারে যাইতেছেন। শুনিলাম, জলে নাবিবার সময় সাধারণ স্নানাগারে সকলের সামনে বিবস্ত্রা হইয়া নাবিতে হয়—জাপানে এইরূপ প্রথা। মুখে যেন কুট হাসি, যে কেহ তাঁহার দিকে তাকায়, সেই মনে করে, যেন তাহার দিকে অনুরাগপূর্ণ চাহনি চাহিয়া হাসিতেছেন। আর নীচের ঠোঁটের মধ্যভাগ লাল রঙ্গে চিত্র করা। এ প্রথাটি চীনেও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে পায়ে আল্‌তা পরে। ইউরোপে গালে রক্তিম আভা লাগায়। কিন্তু ঠোঁটে এমন মধুর চিত্র আর কোথাও দেখি নাই।

পাশেই "ফুজীয়ামা"র গগনস্পর্শী চূড়া মেঘ-লোক ভেদ করিয়া উঠিতেছে। তাহার শিখরদেশ চিরকাল তুষারে আচ্ছন্ন। তাহারই মধ্য হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্নিউৎপাত মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। অহরহ ভূমিকম্প হয়। গম্ভীর সৌন্দর্য্যের সহিত ভীষণতার মিশ্রণ। পর্ব্বতটি সহরের অনতিদূরে অবস্থিত, অহরহ দেখা যায়। আমাদের হিমালয়ের মত এইটি জাপানীদের দেবতার স্থান। জাপানের পবিত্র ধাম বলিয়া গণ্য।

তাহার পাশেই একটি Lake side villa, অর্থাৎ হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী আবাস-গৃহ। ছোট একতালা গৃহটির ঢালু ছাদ চীনে ফ্যাশানের মত,—ধার ও কোণ উঁচু করা। চারি পার্শ্বে বাগান ও ফুলের গাছ। স্বচ্ছ জলে কুটীরটির ছায়া পড়িয়াছে। দূরের পাহাড় ও পার্শ্বের গাছও সেখানে প্রতিভাত হইতেছে। দুই একখানি পাল্‌-তোলা নৌকা জলে ভাসিতেছে। সবগুলিই দুই একটি রেখায় আঁকা। তাহাতেই কত সজীবতা, কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে! জাপানী চিত্রের এইরূপ সরলতা, Simplecityই পরম গুণ। ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নির্জ্জন সেই কুটীরটি দেখিলে মনে হয়, যেন যাবতীয় পার্থিব সুখের আলয় ও শান্তির ধর্ম্ম-মন্দির।

মঙ্গোলিয়ান দেশের দোকানে এত ককেশিয়ান দেশের ছবি রাখা হয় কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে চিত্রকর বলিলেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকাতেই এই সকল ছবির ক্রেতা অধিক। তাঁহার মুখে শুনিলাম, তিনি ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশে গিয়াছেন। ইটালীতে চিত্রবিদ্যা দেখিবার জন্য অনেক দিন ছিলেন। অনেকগুলি চিত্র ইটালীয় আদর্শে আঁকা। "Birth of Hellen", "Water baby" ও "Birth of a Pearl" সেখানকার আঁকা। আমি তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর কতকগুলি ছবির

এই জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালার চিত্র দেখিয়া ও তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া আমি জাপান সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিলাম। সে শিক্ষার উপকারিতা এই যে, বর্ম্মা, ম্যালে, চীনদেশের সঙ্গে তুলনায় তাহা কিরূপ দাঁড়ায়, এই বুঝা। দেখিলাম, অনেকাংশেই প্রথা একরূপ; যেন সকলগুলিই মঙ্গোলিয়ান জাতি বলিয়া এমন মিল হইয়াছে। যে যে বিষয়ে মিল ও যে যে বিষয়ে অমিল, সে কথা পরে বলিব।

Birth of a Pearl,—"মুক্তার জন্ম"। স্থির সমুদ্রের নীল জলের উপর ভাসমান একটি ঝিনুকের ডানা খুলিয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মধুরমূর্ত্তি রমণী বলিতেছেন,—"এই যে আমি এসেছি।" বালারুণের নৈসর্গিক আভা-বিশিষ্ট তাঁর মুখের দিকে চাহিলে মনে হয় যেন, তাঁর সজীব চোখের তারা দুটি নড়িতেছে—চোখে পলক পড়িতেছে। যেন "সাধনার ধনকে" কে অন্তরের সহিত যুগযুগান্তর ধরিয়া ডাকিতেছিল; এত দিনে তিনি দেখা দিয়া জুড়াইলেন।

শ্রীইন্দুমাধব।

শিবাজী-প্রসঙ্গ।

জন্মকাল।

১৫৪৯ শকাব্দের বৈশাখী শুক্লা প্রতিপৎ বৃহস্পতিবার রাত্রিশেষে, (ইংরাজী মতে শুক্রবার, ৬ই এপ্রিল, ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) আনুমানিক ৫১ দণ্ড ২৫ পল সময়ে, অশ্বিনী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণে, কুম্ভ লগ্নে শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁহার মেষরাশি ও দেবগণ ছিল।

মৃত্যুকাল।

মঙ্গলগ্রহ জন্মস্থান-গত ও শনি অষ্টমস্থানস্থিত হওয়ায়, ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শিবাজীর মৃত্যুযোগ উপস্থিত হয়। কেরলজাতক নামক জ্যোতিগ্রন্থে লিখিত আছে,—

লগ্নে ভৌমে ইষ্টমে মন্দে সূর্য্যা বা ব্যয়মৃত্যুগে।
ত্রিপঞ্চাশন্মিতে বর্ষে মৃত্যুরস্ত ন সংশয়ঃ॥

শিবাজীর জীবনে এই জ্যোতিষ-বচনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ১৬০২ শকাব্দের (১৬৮০ খৃঃ) চৈত্রের শুক্লা পূর্ণিমা (উত্তরায়ণ) রবিবার, (৫ই এপ্রিল)

দিবা দ্বিপ্রহরে, ৫২ বৎসর ১০ মাস ২ দিন বয়সে, শিবাজী ইহলোক ত্যাগ করেন। মহাবীর নেপোলিয়ানও ৫৩ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যু-রহস্য।

শিবাজীর সমসাময়িক জীবনীলেখক কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ বলেন, জ্বররোগে শিবাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তীর্থজলে স্নান এবং ভস্ম ও রুদ্রাক্ষধারণ-পূর্ব্বক যোগ অবলম্বন করেন। যোগ-যুক্ত অবস্থায় তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়। রামদাস স্বামীর নিকট শিবাজী যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ একাধিক বখরে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিবাজীর মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পর নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহারা বিস্তারিতভাবে সে সকলের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বর্ণনা অতি-রঞ্জিত হইলেও যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা ফ্রায়ার নামক পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর বর্ণনা-পাঠে বুঝিতে পারা যায়। ফ্রায়ারের বর্ণনায় প্রকাশ, শিবাজীর মৃত্যুবর্ষে ধূমকেতুর উদয়, দ্বাদশঘটিকাব্যাপিনী রক্তবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবনে ১৬ সহস্র মহাপ্রাণীর বিনাশ, ভীষণ দুর্ভিক্ষপাত প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটে। মিঃ কার্কেরিয়া নামক জনৈক পার্শী পণ্ডিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহাবীর সিজারের মৃত্যুকালে যে ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই শিবাজীর মরণকালে সমুদিত হয়। ঐ ধূমকেতু পাশ্চাত্যসমাজে "নিউটনস্ কমেট" নামে পরিচিত। ফ্রায়ার যুগল চন্দ্রের উদয়-কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বখর-লেখকেরা বলেন, শিবাজীর মৃত্যুকালে ধূমকেতু, ভূমিকম্প, রাত্রিকালে যুগল ইন্দ্রধনুর উদয়, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত সংঘটিত হইয়াছিল।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শিবাজীর মৃত্যু সংঘটিত হইলেও, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনেকে তাঁহার ইহলোক-ত্যাগের সংবাদে আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুরাটের ইংরাজ বণিকেরা ঐ বর্ষের ৭ই মে তারিখের পত্রে বোম্বাই নগরীস্থিত সহযোগীদিগকে এ বিষয়ে যে নিশ্চয়াত্মক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ এইরূপ,—

Sevagee's death is confirmed from all places; yet some are still under a doubt of the truth, *such reports having been used to run of him before some considerable attempt:* therefore not be too confident until better assured.

অর্থাৎ, "শিবাজীর মৃত্যুবার্ত্তার যাথার্থ্য চারি দিক্ হইতেই সমর্থিত হইতেছে; তথাপি কেহ কেহ এখনও উহাতে সন্দেহপ্রকাশ করিতেছেন। কারণ, ইতি-

পূর্ব্বে শিবাজী যখনই কোনও গুরুতর কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই পূর্ব্বাহ্নে এই প্রকার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অতএব, এতদপেক্ষা নিশ্চিত সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনারা শিবাজীর মৃত্যুসংবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিবেন না।" ১৮ই মে তারিখে সুরাটের ইংরাজেরা এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া বোম্বায়ে পত্র লেখেন। অতঃপর বোম্বায়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বঙ্গদেশীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করেন। তদুত্তরে বঙ্গদেশের ইংরাজেরা ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে, "শিবাজী এতবার মরিয়াছেন যে, এখন কেহ কেহ তাঁহাকে অমর বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। যত দিন শিবাজীর আরব্ধ কার্য্যকলাপের সম্পূর্ণ বিরাম না হইবে, ততদিন শিবাজীর মৃত্যুসংবাদ সহজে কেহই বিশ্বাস করিবে না। কারণ, অনেকেরই ধারণা, শিবাজী যেরূপ ক্ষিপ্রতা ও সফলতার সহিত কার্য্যসাধন করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ সেরূপ ভাবে কার্য্যসাধন করিতে পারিবে, ইহা সম্ভবপর নহে।" তাঁহাদিগের এতদ্বিষয়ক মূল পত্রাংশ এই,—

Sevagi *has died so often* that some begin to think him immortal. 'Tis certain, little belief can be given to any report of his death, until experience tell the waiving of his hitherto prosperous affairs; since when he dies *indeed*, it is thought he has none to leave behind that is capacitated to carry on things at the rate and fortune he has all along done.

শিবাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ সন্দেহ যে কেবল ইংরাজ প্রভৃতি বৈদেশিক ও দূরদেশবাসীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; শিবাজীর অতিনিকটসম্পর্কীয় লোকেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার দেহত্যাগের প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহার অন্যতমা পত্নী পুতলা (পুত্তলিকা শব্দের অপভ্রংশ) বাঈ পিত্রালয়ে অবস্থিতি হেতু বহু বিলম্বে স্বামীর পরলোকগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি সন্তানহীনা ছিলেন বলিয়া পতির অনুমৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুমরণের সময় "আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী" বলিয়া বখরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুতলা বাঈর এত বিলম্বে অনুমৃতা হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ, শিবাজীর মৃত্যুসংবাদলাভে অতিরিক্ত বিলম্ব।

বলা বাহুল্য, কপটাচার ও প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই শিবাজীকে বহুবার স্বীয় মৃত্যুসংবাদের প্রচার করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশে এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, শত্রুর নেত্রে ধুলিনিক্ষেপের জন্য তিনি আপনার ন্যায় ৫।৬ জন লোককে শিবাজী সাজাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে স্থাপন করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ গ্রন্থে শিবাজী।

১৫৭৫ শকাব্দে (১৬৫৩ খৃঃ) রচিত একখানি জ্যোতিষগ্রন্থে শিবাজী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

প্রকুরু তৎকরণং গ্রহসিদ্ধয়ে সুগমদৃগ্‌গণিতৈক্যবিধায়ি যৎ।
ইতি নৃপেন্দ্র শিবাভিধ-নোদিতঃ প্রকুরুতে কৃতি কৃষ্ণবিধিজ্ঞরাট্‌।

গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"নৃপেন্দ্র শিবাজী গ্রহসিদ্ধির জন্য দৃক্‌গণিতৈক্য-বিধায়ী সুগম জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিতে বলায়, আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনা করিতেছি।" এই জ্যোতিষগ্রন্থের নাম "করণকৌস্তুভ।" গ্রন্থকার কৃষ্ণজ্যোতিষী কোঙ্কণ ঘাটমাথার অন্তর্গত "মাওয়ল" প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। মাওয়লের লোকদিগকে "মাওলী" বলে। মাওলী সেনার সাহায্যে শিবাজী এক দিকে যেমন নবহিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অন্য দিকে মাওলী পণ্ডিতের সাহায্যে দৃক্-প্রত্যয়মূলক অভিনব জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করাইয়া গ্রহসিদ্ধির সুগম পন্থা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে শিবাজীর বয়স ২৬ বৎসর মাত্র ছিল। সেকালের মহারাষ্ট্র জমীদার ও জায়গীরদারদিগের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রের ন্যায় নীরস বিষয়ে দৃক্‌প্রত্যয়-সিদ্ধ নূতন গ্রন্থ রচনা করাইবার কল্পনা কাহারও মস্তকে উদিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই অল্প বয়সে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও এই বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সামান্য মনস্বিতার পরিচায়ক নহে। শিবাজীর পিতা রাজা শাহজীর আশ্রয়েও অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। "দেব-পূজা-সাগর" প্রভৃতির ন্যায় সাধারণ গ্রন্থের রচনায় তাঁহাদিগের শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজী সেই গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অধীন পণ্ডিতদিগকে নূতন বিষয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর আদেশে "রাজব্যবহারকোষ" নামক নূতন কোষগ্রন্থ রচিত হয়। এই কোষে তদানীন্তন মুসলমান রাজসভাসমূহে ব্যবহৃত আরবী ও পারসী শব্দনিচয়ের সংস্কৃত প্রতিশব্দসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

শিবাজীর রাজমুদ্রা।

শিবাজীর রাজমুদ্রার উপর নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল,—

প্রতিপচ্চন্দ্ররেখেব বর্দ্ধিষ্ণুর্বিশ্ববন্দিতা।
শাহসূনোরিয়ং মুদ্রা শিবরাজস্য রাজতে।

এই মুদ্রা সম্ভবতঃ ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর রাজা উপাধি গ্রহণকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যথারীতি রাজ্যাভিষেক ও "ছত্রপতি" উপাধিগ্রহণ সময়ে এই শ্লোকটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পরবর্ত্তী রাজমুদ্রায় উৎকীর্ণ শ্লোকের শেষার্দ্ধের পাঠ এইরূপ,—

শাহাসূতস্যমুদ্রেয়ং শিবরাজস্য রাজতে ॥

রাজমুদ্রাকে মহারাষ্ট্রী ভাষায় "শিক্কা" বলে। সরকারী কাগজপত্রের শীর্ষদেশে এই শিক্কা নামক বৃহৎ রাজমুদ্রা অঙ্কিত করা হইত। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার ক্ষুদ্র রাজমুদ্রা ছিল, তাহাকে "মোর্ত্তব" বলা হইত। এই ক্ষুদ্র মুদ্রা লেখ্য বিষয়ের শেষ ভাগে অঙ্কিত করিবার রীতি ছিল। সে যাহা হউক, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শিবাজীর রাজমুদ্রা কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজা উপাধি-গ্রহণের পূর্ব্বেও যে রাজমুদ্রার ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। তাঁহার পেশওয়া বা মন্ত্রী শ্যামরাজ নীলকণ্ঠের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ আছে,—

শ্রীশিবনৃপতি হর্ষ নিধান।

সামরাজ মতিমৎ প্রধান: ॥

এই মুদ্রাটি পিত্তলনির্ম্মিত। ইহার উপরিভাগ রৌপ্যময়। সমস্ত মুদ্রাটির ওজন ২৷৷০ তোলা। উহার নিম্নভাগ (মুখভাগ) ডিম্বাকৃতি বা বৃত্তাভাসবৎ। শ্যামরাজের মোর্ত্তবটিরও আকার প্রকার তাঁহার বৃহৎ মুদ্রার অনুরূপ। তবে উহার আকার ক্ষুদ্র ও ওজন ১ তোলার অধিক নহে। শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে পেশওয়ে পদে নিযুক্ত ও ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত হন। শ্যামরাজের মুদ্রা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, শিবাজী আপনাকে প্রকাশ্যভাবে "রাজা" বলিয়া ঘোষণা করিবার পূর্ব্বেও নিশ্চিত কোনও প্রকার রাজমুদ্রা ব্যবহার করিতেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণজ্যোতিষী তাঁহাকে "নৃপেন্দ্র" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সাধুপ্রবর তুকারাম তাঁহাকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেও তাঁহাকে রাজা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পাঠক অবগত আছেন যে, শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুরের দরবার হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিবাজীর গুপ্তচর।

হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়া শিবাজী চর-বিভাগের যেরূপ গঠন ও পরিপুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ভারতবর্ষের বিগত সহস্র বৎসরের

মধ্যে কোনও প্রদেশের হিন্দুশাসনের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চর-বিভাগের অপকর্ষই যে পাঠানদিগের হস্তে ভারতীয় রাজন্যবর্গের পরাজয় ঘটিবার একটি প্রধান কারণ, তাহা শিবাজীই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি পররাষ্ট্রের অন্তর্গূঢ় কার্য্য-কলাপ, গতিবিধি, ও উদ্দেশ্য মন্ত্রণাদির প্রতি সূক্ষ্ম ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত কর্ত্তব্য অবধারণ ও স্বরাষ্ট্রের রাজকার্য্যসমূহ পরিচালন করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। শিবাজীর নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক গুপ্তচরেরা নিবিড় তন্তুজালের ন্যায় সমগ্র দক্ষিণাপথকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। অব্যবস্থিতচিত্ত সাম্ভাজীর রাজত্ব-কালে শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত চর-বিভাগ অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়াছিল বলিয়াই আওরঙ্গজেবের হস্তে মহারাষ্ট্ররাজ্যের ভূয়সী দুর্দ্দশা সংঘটিত হয়। পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের সময় হইতে নানা-ফড়নবীসের সময় পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র রাজপুরুষেরা চর-বিভাগের সুব্যবস্থা ও পুষ্টি-সাধন বিষয়ে যথাসাধ্য শিবাজীর অনুকরণ করিয়া বহু বিঘ্ন-বিপত্তির হস্ত হইতে মহারাষ্ট্র দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চর-বিভাগের সুব্যবস্থাগুণে শিবাজীও বহু বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার চর-বিভাগে সুদক্ষ কর্ম্মচারী না থাকিলে আফজল খাঁর অভিযানেই শিবা-জীকে ঘোরতর বিপন্ন হইতে হইত। আফজল খাঁ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ করিবামাত্র শিবাজীর গুপ্তচরেরা তাঁহার শিবির হইতে গূঢ় সংবাদ সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বিশ্বাস রাও নানাজী নামক জনৈক কায়স্থ সর্দ্দার ফকীরের বেশে প্রত্যহ আফজলের শিবিরে গমন করিতেন। তিনিই কৌশল-পূর্ব্বক আফজলের মনের ভাব অবগত হইয়া শিবাজীকে জ্ঞাপন করেন। আফ-জল শিবাজীকে বাক্য-কৌশলে মুগ্ধ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক ধৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস রাওয়ের মুখেই শিবাজী প্রথম অবগত হন। এই কারণে তিনি পূর্ব্বাহ্ণে সতর্ক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লুণ্ঠনাদি কার্য্যে শিবাজী তাঁহার গুপ্তচরগণের নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিতেন। কোনও স্থান লুণ্ঠন করিবার পূর্ব্বে শিবাজীর গুপ্তচরেরা সেখান-কার ধনবান্ ও দুর্ব্বৃত্তদিগের তালিকা সংগ্রহ করিয়া আনিত। তাহার পর আর এক দল গিয়া সেই তালিকা ঠিক কি না, তাহা জানিয়া আসিত। কখনও কখনও স্বয়ং শিবাজীও গুপ্তবেশে গমনপূর্ব্বক লুণ্ঠনযোগ্য নগরের অধি-

ধনবানের উপর অথবা অল্পবিত্ত ব্যক্তির উপর অত্যাচার না হয়, তাহার জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিবার উদ্দেশেই শিবাজী এরূপ তালিকা-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। সুরট-লুণ্ঠনকালে তত্রত্য এক জন অতি ধনশালী ইহুদী ব্যবসায়ী দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতেন জানিয়া শিবাজী তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেন নাই। সেখানকার ফরাসী ধর্ম্মযাজকেরা যাহাতে কোনরূপে উৎপীড়িত না হন, তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কয়েক জন দুষ্টপ্রকৃতি ইংরাজ ভিন্ন আর সকল ইংরাজই তাঁহার আক্রমণে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কৃষিজীবী, রমণী, বালক, বৃদ্ধ, সাধু সন্ন্যাসী ও ফকীরদিগের উপর যাহাতে কোনও অত্যাচার না হয়, তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শিবাজীর এই নিয়মের বিষয় অবগত হইয়া, সুরটবাসীদিগের মধ্যে অনেকে স্ত্রীবেশধারণ পূর্ব্বক মহারাষ্ট্র সৈনিকদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, শিবাজীর গুপ্তচর বিভাগের সুব্যবস্থা-গুণে তাঁহার লুণ্ঠনাদি ব্যাপারে সাধুসজ্জনগণ অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভ করিতেন।

যুদ্ধকালে সৈন্যগণ পরাজিত শত্রুপক্ষকে লুণ্ঠন করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিত, তাহার সমস্তই রাজকোষে জমা করিবার নিয়ম শিবাজী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় সৈনিকগণের লুণ্ঠনবৃত্তি দমিত থাকিত। সৈনিকেরা লুণ্ঠিত দ্রব্যের একাংশ আত্মসাৎ করিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহাদের লুণ্ঠন বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে ভাবিয়া, তিনি সৈনিকদিগের কার্য্যকলাপ-পরিদর্শনের জন্য বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে সৈনিকদিগের লুণ্ঠনপ্রিয়তা কখনও নিয়মের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। পেশওয়েগণের আমলে এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যত্ন-প্রকাশ না করায় মহারাষ্ট্র সেনার উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্গসাহিত্যে যে সকল কাব্যাদি উপকরণ

সাহিত্যের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা আজন্মবন্দিনী বঙ্গভাষার

কবিত্ব। চরণশৃঙ্খল উন্মোচিত করিয়াছেন, এবং মাতৃভাষার মালিন্য দূর করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত মহত্ত্ব ও স্বাধীনতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ কাব্যাদি ব্যতীত বঙ্গভাষায় আর এক শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছে ; তাহাই এক ভাবে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ্। তাহারও আলোচনা আবশ্যক।

ইংরাজী প্রভাবে বঙ্গসমাজে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতার আবির্ভাব হইয়াছে। এই স্বাধীনতা সাহিত্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে আধুনিক ইউরোপে 'গীতিকাব্য' নামক একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের

গীতি কবিতা সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মানবের সুখ, দুঃখ, ভয় ও বিস্ময়, প্রতি দিনের অগণিত আশা ও নিরাশা, ইহাতে স্থান পাইয়াছে, এবং মানব-হৃদয়ের অপরিমিত সহানুভূতি পাইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রাচীন মহাকাব্য-রচনার সহিত ইহার প্রভূত বৈসাদৃশ্য আছে। আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি মহাকাব্যের লক্ষ্য। মহাকাব্যের কবি স্বয়ং উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিম্নস্থ শ্রোতৃবর্গকে লক্ষ্য করিতেছেন ; আধুনিক কবিতায় এক অব্যক্ত গভীরবেদনাময় সঙ্গীত মানব-হৃদয় হইতে অনন্ত আকাশের দিকে উত্থিত হইতেছে। আধুনিক কবিতায় সহানুভূতিই মূল কেন্দ্র, এবং প্রকৃত জীবনই প্রায়শঃ কবিতার ভিত্তি। স্থৈর্য্য ও বিশ্বাসই প্রাচীন-সাহিত্যের মূল ধর্ম্ম, সুতরাং তাহার লক্ষ্য ঠিক আছে। আধুনিক সাহিত্য গভীর সংশয়ে, আশায়, হতাশায় ওতপ্রোত হইয়া উন্মত্তবৎ কোনও অজ্ঞাত লক্ষ্যের উদ্দেশে প্রধাবিত। প্রাচীনের আদর্শ অতীতে, আধুনিকের আদর্শ ভবিষ্যতে ; সে বর্ত্তমান ও অতীতের উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভবিষ্যতের ছায়া-রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পদার্থ অপেক্ষা তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব ধরিবার জন্য আধুনিক সাহিত্য লালায়িত হইয়াছে। এই লালসা, আবেগ ও উদ্বেগ যে জাতীয় কবিতায় বিকশিত হইতেছে, তাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র, মানবদেহের ন্যায় ক্ষুদ্র ; কিন্তু তাহার ভাব ও আকাঙ্ক্ষা দেহস্থ মনের ন্যায় বৃহৎ ও অনন্তপ্রসারী। এই সকল কবিতা অনেক সময় দুই কথায় মানব-হৃদয়কে স্বর্গতটে উন্নীত করে। শরীর ক্ষুদ্র হইলেও, কবির শক্তি ও নৈপুণ্যের গুণে ভাবময় অনন্তের ধারণায় ও আভাষে এই সকল কবিতা সময় সময় প্রাচীন মহাকাব্যের ন্যায় আকার হইয়াছে। প্রাচীন মহাকাব্য প্রকাণ্ড পর্ব্বত ; তাহাতে প্রস্তর,

কঙ্কর ও বালুকারাশির মধ্যে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল রত্ন নিহিত আছে, স্বীকার্য্য; কিন্তু তাহাতে কবির শ্রান্তি, দৈন্য ও অসমর্থতা প্রকাশ না পাইয়া যায় না। অপর পক্ষে, আধুনিক উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র কবিতা, প্রত্যেকে এক একটি নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, নিটোল হীরকখণ্ড, চিরদিন ব্যবহার করিবার যোগ্য। ইংরাজী সাহিত্য এই কবিতার গৌরব বুঝিয়াছে, তাই তাহারা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্ প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ কবির আসন দিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিগণ বহুপূর্ব্বে স্বাধীনভাবে যে সকল ক্ষুদ্র কবিতায় ভাবপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে ভাবের বৃহত্ত্ব ও অসীমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৈষ্ণব কবিতা অমর, বঙ্গসাহিত্যে তাহার প্রভাব বিলুপ্ত হইবার নহে। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সহিত এই কবিতার অপূর্ব্ব স্নেহবন্ধন আছে। অনেক কাল ধরিয়া বাঙ্গালার কবিমণ্ডলীর ভিতর দিয়া এই জাতীয় কবিতা পরিস্ফুট হইবার চেষ্টা করিতেছে, বাঙ্গালার জলাজঙ্গলের আর্দ্র বাতাসের মত এই কবিতা আর্দ্র, স্নিগ্ধকারী, কখনও কখনও ম্যালেরিয়া-দুষ্টও বটে। ইহা প্রেমের কবিতা। বঙ্গ-কবি শতমুখে প্রেমের বিবৃতি করিয়াছেন, তবু তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এই স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া ইতিপূর্ব্বে রামনিধি গুপ্ত বঙ্গসাহিত্যে কয়েকটি অতি মনোহর প্রণয়সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছেন। নিধুবাবুর গান বিশুদ্ধ, গভীর ও দাম্পত্য-প্রেম-মূলক, তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রণয়-সঙ্গীতের যুগান্তর সূচিত করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম দাম্পত্য প্রেম নহে। বৈষ্ণব কবিগণই একরূপ নামকরণ করিয়াছেন, তাহা 'পিরীতি'। পিরীতিতে শান্তি নাই; মিলন ও বিরহ, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের আন্দোলনে হৃদয় উত্তপ্ত হয়। তাহাতে কবিতার রঙ্গভূমি যথেষ্ট প্রসারিত হয়, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে, পরিণয়হীন প্রেমের প্রাচুর্য্যে পুনরায় প্রাচীন গীতিকবিতার স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইয়াছে; হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান কালে যে কোনও লেখক কলম ধরিতেছেন, তাঁহার নিকট হইতেই এই শ্রেণীর কবিতা পাওয়া যাইতেছে। এই সকল গীতিকবিতার অধিকাংশই আলোচনার যোগ্য নহে। ইহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবের প্রগাঢ়তা বা ঐকান্তিকতায় প্রাচীন চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির কবিতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। পরিণত ভাষার নব নব

বঙ্গে গীতিকবিতা ও তাহার বিশেষত্ব।

এ দেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আনীত নবগীতি-কবিতার আদি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলাল আধুনিক গীতি-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। ইনি প্রকৃতিকে এক নব ভাবে দেখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কবিতার মূলতত্ত্ব সৌন্দর্য্য-পিপাসা। ইংরাজ কবি কীট্‌সের ন্যায় তাঁহার হৃদয় এই পিপাসায় জগতের দিকে উন্মুক্ত ছিল। "সারদামঙ্গল" ও "বঙ্গসুন্দরী"তে ইনি স্থানে স্থানে এমন মহনীয় কমনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। তিনি সৌন্দর্য্য-পিপাসু কবি, এবং জীবনে সেই সৌন্দর্য্য অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন; সেই জন্য তিনি সর্ব্বজনসমাদৃত কবি হইতে পারেন নাই।

নবগীতিকাব্যে বিহারীলাল।

বিহারীলালের অপূর্ণতা তাঁহার শিষ্য রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গুরুকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু গুরুকে বিস্মৃত হন নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। এখনও তাঁহার সমালোচনার সময় আসে নাই। সে সময় বহু দূরবর্ত্তী থাকুক—বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভায় কৃতার্থ, সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হউক।

রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে যে সকল মৌলিক উপকরণ ও স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোনও কবি কিংবা লেখক পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা নিত্য নব নব পথে খেলিতেছে। তিনি বঙ্গসাহিত্যকে এমন শব্দসম্পদ, ভাবের উপাদান, রচনার কারুকার্য্য, চরণের গাম্ভীর্য্য, অলঙ্কারের পারিপাট্য ও ছন্দের শত সহস্র প্রকার বৈচিত্র্যে ভূষিত করিয়া যাইতেছেন যে, বঙ্গভাষা স্পর্দ্ধা করিয়া পৃথিবীর অন্য সাহিত্যকে আপন কুটীরে নিমন্ত্রণ করিতে পারে। তাঁহার "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ", "পুরীতে সমুদ্রদর্শনে", "মানসসুন্দরী", "বসুন্ধরা", "পুরস্কার" ও আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা ও অনেকগুলি সনেট আমরা জগতের সাহিত্য-প্রদর্শনীতে নির্ভয়ে পাঠাইতে পারি। ইহা বঙ্গভাষার অল্প গৌরবের কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথের এই উন্নতির মূল কারণ স্বাধীনতা। তিনি শৈশব হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার, এমন কি, সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় শক্তির অনুসরণ করিতেছেন; সমস্ত শক্তিশালী মানবের চরিত্রে প্রকৃতি এক অপূর্ব্ব দাম্ভিক উগ্রতা মিশ্রিত করিয়া দেন। ইহার বলে তাঁহারা সমস্ত প্রশংসা অপ্রশংসা তুচ্ছ করিয়া অবিশ্রান্তপ্রবাহে আপন উদ্দেশ্যের দিকে ছুটিয়া যাইতে

রবীন্দ্রনাথের উন্নতির মূল কারণ।

পারেন, আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারেন। এই স্বাধীনতায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও অপ্রকৃতি উভয়ই চরিতার্থ হইয়াছে; আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব্ব অভিনেতার অভিনয় দেখিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ছন্দের বন্ধন ও ভাষার সৌকুমার্য্যের প্রতি তাচ্ছীল্য করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল ভাব-প্রকাশ। যে রূপেই হউক, ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলেই কবিতা হইল, ইহাই তাঁহার আদিম আদর্শ ছিল। এই আদর্শের বশীভূত হইয়া তিনি প্রকৃত কবিতাও লিখিয়াছিলেন, অনেক তুচ্ছ জিনিসও লিখিয়াছিলেন। কারণ, তখন তিনি ভাবকে আপনার আয়ত্ত করিতেছিলেন। যখন কবি কোনও একটা সুন্দর ভাবকে বশীভূত করেন, তখন সেই ভাব যে ছন্দে ও যে ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহা কবিতা; কিন্তু ভাবকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করিয়া, অথবা ভাবের আভাষমাত্র ধরিয়া, উৎকৃষ্ট ভাষায় অনবদ্য ছন্দোবন্ধে গ্রথিত রাশি রাশি পুঁথিও কবিতা নহে। তাহা দুর্ব্বলতার, ভাবোন্মাদের পরিচায়ক। এই কবির কিশোর বয়সের প্রায় সমস্ত কবিতাই শেষোক্ত শ্রেণীর। তিনি পরিণত বয়সে এই দোষ পরিহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ক্রমে ভাবের উপর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন ভাষা তাঁহার হস্তে আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহার বহুকালের একাগ্র সাহিত্য-সাধনা সফল হইয়াছে।

এই কথাগুলি এত বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই যে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার প্রকৃত পথের নির্দ্ধারণ বিষয়ে, ইহা হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের শত সহস্র অনুকরণশীল ভক্ত শিষ্য বঙ্গসাহিত্যে তুমুল কাব্য-কলরব উত্থাপিত করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও স্বাধীনতা নাই। প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের পূর্ব্বোক্ত ভাব-বিকারে গ্রস্ত। একমাত্র স্বাধীনতার প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ ত্রাণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু অনুকরণকারীদের কাহারও হস্তে উক্ত বহুমূল্য ঔষধ দেখা যাইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথ এখন পূর্ব্বাবস্থা হইতে প্রকৃত কবিত্বে উন্নীত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের উপাসক। তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রেমের কবিতা। সেই প্রেম প্রথমে ভাব-প্রবণ ও অগভীর ছিল। এই সময়ে প্রবীণ বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রভাবে, তাঁহার ভাব ও ভাষা উভয়ই অতি আশ্চর্য্য মূর্ত্তিতে

ভানুসিংহের পদাবলী ... ।রস্ফুরিত হইয়াছে।
ও চণ্ডীদাসের শক্তি বর্ত্তমান কালে উপনীত
হইয়াছে। "রাধিকা" বঙ্গসাহিত্যে সমস্ত প্রকার
প্রতিমূর্ত্তি। সাধরণ প্রেমিকার পক্ষে যে ভাববি
মনে হয়, রাধিকার পক্ষে তাহা পূর্ণমাত্রায় স্বাভা
প্রস্তাবে দোষ ছিল, তাহা বিষয়-নির্ব্বাচন-মাহাত্ম্যে
সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকৃত শক্তি অপেক্ষ
হয়, ভানুসিংহের পদাবলী তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এই প্রেম বারে বারে নানারূপ প্রেম-সঙ্গীতে
ক্ষুদ্র কবিতায় ঘনতা ও অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং
কবির সমস্ত পূর্ব্বভাবের সন্নিবেশ

প্রেমকাব্য।

ধ্যান ধারণার রাজ্যে নিগূঢ় অন্ত
বঙ্গসাহিত্যকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা দিয়াছে।
সোনার তরীতে ভাসাইয়া চিত্রার ভিতর দিয়া এমন এক
করিয়াছে, যাহাকে 'যোগ' বলিলেও বলা যায়। তিনি মা
ভিতর দিয়া জগৎলক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তাঁ
সুন্দরী", "চিত্রা", "উর্ব্বশী", 'অন্তর্য্যামী' প্রভৃতি কবিত
ভাবোন্মত্ততা হইতে যোগে উন্নতি, জগতে অল্প কবির ভাগে
এইরূপে বৈষ্ণবকবিদের প্রেম, কবির মৌলিক প্রতিভায় ও ইয়ুরে
ক্রমে পরিণত হইয়া, বঙ্গসাহিত্যে সমুন্নত প্রেম-কবিতার সৃষ্টি ব

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে বহুরূপী ; তিনি কত রূপে ক
দিয়াছেন, এবং দিতেছেন ; এখনও তাহার বিরাম নাই। অ
দোষ দুর্ব্বলতার আলোচনা বর্ত্তমানে সম্ভব নহে, সহজও নহে।

রবীন্দ্রনাথ কায়া অপেক্ষা ছায়ারই অধিক পক্ষপাতী।
শরীরী জীব অপেক্ষা তিনি ভাবময়ী প্রকৃতির অঙ্কনে অধি
এই এক কথাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সম

রবীন্দ্রনাথের দোষ।*

বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ডে এই
শেলী। শেলী আকাশে উড়িতেন, অতি উর্দ্ধে উঠিয়া এই

* রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কথা,
নৈবেদ্য ও নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্ব্বকার রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করিয়া

...ার দিকে চাহিয়া চা...য়া সেই সৌন্দর্য্যের
...পেক্ষা ছায়ার কোনও কোনও বিষয়ে মাহাত্ম্য
... কবি সেখানে অপ্রতিহতপ্রভাবে আপনার
... করিয়া, পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারেন।
...একটা সম্পূর্ণ অলীক কথা বলিলেও, মর্ত্তবাসীর
...য়ে দ্বিধা বাক্য প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য নাই।
...র সৌভরাজের ন্যায় অদৃশ্য দুর্গে অবস্থান করিয়া
...ীত হইতে পারেন। এ দিকে মর্ত্তবাসীও তাঁহাদের
...ীয় বাষ্পের মত উড়াইয়া দিতে পারেন। এইরূপ
...হ নাই। শুধু আকাশপথে উড্ডীন হইয়া শ্যেনের
... চলে না। এই পাষাণকঠোর ধরণীর উপর দিয়াও
...দে ছুটিতে হইবে; এবং অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরের ন্যায়
...রিয়া অন্তঃপ্রবাহিনী ভোগবতীর পাবনী ধারা মর্ত্ত্যমানবের
... করিতে হইবে। অন্যথা, তিনি একশ্রেণীর পাঠকের হৃদয়চারী
...পারেন, "কবির কবি" হইতে পারেন, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির
...ারেন না।

...রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভাবকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিতেছে।
...তাগুলি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছন্দের নৃত্যে, ভাষার ঝঙ্কারে,
...াবেগে, ভাবের সুচিক্কণ সুররশ্মি ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে
... অনুভব করা দায় হইয়াছে। ভাষা ও ছন্দোবন্ধের উপর অতি-
... জন্মিলে, সচরাচর অনেক কবির যে দোষ ঘটিয়া থাকে, রবীন্দ্র-
...ও তাহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাঁহার অনেক কবিতা বাহুল্য-
...ত ও অতিভূষিত। তিনি মহৈশ্বর্য্যশালী চিত্রকর; তাঁহার বর্ণনার
...রিমেয়; কিন্তু তিনি সুদক্ষ চিত্রকর নহেন। আঁকিতে আঁকিতে
...শ এমন আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, স্থানে স্থানে বুঝি তূলিকা
... করিয়া সমস্ত ভাণ্ডটি রিক্ত করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। শুধু
...হয় না, মিতব্যয়িতা, সংযম ও নিপুণতাও আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের
...নক স্থলে গ্রামের সরলতা অপেক্ষা নগরের ভদ্রতাই অধিক।
...ীবনের অধিকাংশ কাল নগরে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, সুতরাং
...তির হৃদয়রাজ্যে তাঁহার স্বচ্ছন্দগতি হয় নাই। রাজধানীতেও

তিনি প্রথম প্রথম বিশুদ্ধ কাঞ্চন লাভ করিতে পারেন নাই, "মলম্বা অম্বরযুক্ত" তাহারই পাইয়াছিলেন। এখন তিনি অল্পে অল্পে স্বভাবের রাজ্য অধিকার করিতেছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতে ও "চৈতালি"র কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও তাঁহার রাজার সাজ। রাজবেশে প্রকৃতির মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। ভীরুস্বভাবা পল্লীবালিকা রাজৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভয়ে সম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, — অপরিচিতের নিকট সহজে ধরা দিতে চাহে না।

পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির সমবায়ে রবীন্দ্রনাথ এ দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট অধৃষ্য ও দুর্জ্জেয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার শত শত কবিতা পড়িয়াও অনেক সময় একবিন্দু অশ্রুবর্ষণের অবকাশ ঘটে না। তাহার রাজবেশের পারিপাট্যে নয়ন ঝলসিয়া যায়, তাঁহার সহিত সহানুভূতি স্ফূর্ত্ত হইবার অবকাশ ঘটে না। তাঁহার কবিতার সুখ দুঃখ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ লোক ভিন্ন অন্যের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি হইতে সহস্র হস্ত দূরে অবস্থান করিতেছে।

এই সুযোগে একবার বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করা যাউক। সূর্য্যের চারি দিকে অনেক গ্রহ উপগ্রহ থাকে। তেমনই প্রকৃত কবির চারি দিকে অনেক 'উপ-কবি'র আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের এখন বহুপরিমাণে সেই অবস্থা। এখন অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের আলোকে আলোকিত ও তাঁহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই; স্থানে স্থানে স্বাতন্ত্র্যের আভাষ পাওয়া গেলেও তাহা রবীন্দ্রনাথের অসতর্ক অনুকরণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের দ্বারা অপরিচিতের নিকট রবীন্দ্রনাথেরও সম্মানের লাঘব হইতেছে।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য।

একালের সাহিত্যিকগণের যেন নিজের কথা বলিবার প্রয়াস নাই। তাই তাঁহাদের ভাষা স্থানে স্থানে নিতান্ত কপট ও গর্ব্বিত। তাঁহাদের ছন্দ বাঙ্গালী বড়মানুষের ছেলের ন্যায় আপন শরীরের ভার বহন করিয়াও চলিতে পারে না। উহার পেশীসমূহে অণুমাত্র স্বাস্থ্য বা কর্ম্মনিষ্ঠার আভাব নাই। অনুকরণ, ভাবোন্মত্ততা, অসহিষ্ণুতা ও অতিরিক্ত যশোলিপ্সাই এই সমস্ত দোষের মূল কারণ। যে পর্য্যন্ত না তাহা দূর হয়, সে পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিপথে অনতিক্রম্য অন্তরায় অন্তর্হিত হইবার আশা নাই।

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণের মধ্যে কাব্যক্ষেত্রে "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রীর কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা রমণীজনসুলভ অনুচ্চ কমনীয় সুরে বাঙ্গালীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। এই কবি ও স্বর্ণকুমারী বঙ্গসাহিত্যে রমণীপ্রভাব স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অক্ষয়-কুমার বড়ালের দুই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কয়েকটি তরল আমোদপূর্ণ গার্হস্থ্য কবিতা সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভের যোগ্য হইয়াছে। প্রভাতকুমারের প্রথম কয়েকটি কবিতা, মনে এক নব আশ্বাস জাগাইয়াছিল ; কিন্তু তিনি এখন গল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অপরাপর কবিতা-লেখকগণ :

এতদ্ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি এক নূতন জাতীয় খাঁটী দেশী কবিতা জন্মলাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র দাস এই জাতীয় কবিতার স্রষ্টা। "স্বরস্বতী-পূজা"য় আমরা তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। রসের প্রাবল্য ও ভাবুকতাই এই জাতীয় কবিতার প্রধান লক্ষণ। প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের শেষেই বাক্যবিশেষের পুনরুক্তি আছে, এবং ছন্দের গতির মধ্যে এক প্রকার পুরাতন "এক-টানা"র ভাব বর্ত্তমান। মানকুমারী প্রভৃতি ইহার অনুকরণে কবিতা লিখিতেছেন। এই সকল লেখক যে ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া কবিতা লিখিতে বসেন, কবিতার গতিতে তাহার কোনও উন্নতি, বিবর্ত্তন, বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। নিরন্তর চক্রভ্রমীর ন্যায় একই ভাব বিভিন্ন শব্দ-সহকারে বারংবার আবর্ত্তিত হইতে থাকে। চক্রের ঘর্ঘরে, উৎপতনে, নিপতনে বিস্তর কোলাহল উপস্থিত হয়। মনে হয়, প্রভূত পরিশ্রম ও আকুলতার ব্যয় হইতেছে, তথাপি উপযুক্তপরিমাণে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহতই থাকিয়া যাইতেছে।

এইরূপ কবিতার অবলম্বিত ছন্দ অতি প্রাচীন, বহু কষ্টে যাহা পাওয়া যাইত, প্রাচীনেরা তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতেন। যখন মানব শব্দ-শক্তিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তখন এই ব্যাবৃতি-বহুল বাক্য-বিন্যাসের বিশেষ প্রচলন ছিল। আবার এই সব কবিতার কোনও সাহিত্য-সঙ্গত উচ্চ আদর্শ নাই। একমাত্র নিজ হৃদয়কে আদর্শ ধরিয়া, নিজের সুখ দুঃখ বিপদ আপদ প্রভৃতিকে মূল উদ্দীপনা-স্বরূপ রাখিয়া কবিতা লিখিতে বসিলে, সে কবিতা কদাচিৎ সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই জন্য এই সকল কবিতা প্রায় অসম্পূর্ণ ও অসংযত।

যেমন কাব্যে সূক্ষ্ম শিল্প-গীতিকবিতা, তেমনই উপন্যাসের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম

শিল্প ক্ষুদ্র গল্প। এই ক্ষুদ্র গল্পও ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের সৃষ্টি। ইহার মধ্যেও গীতিকবিতার ন্যায় ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ভাবের অসীমতা ফুটিয়া উঠে; মানব-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার ভিতর সমস্ত জীবনের দায়িত্ব, নির্ভর ও বীজস্বরূপ কারণ দেখা যায়। এক কথায়, ইহার আদর্শ লক্ষ্য ও বিষয়ও পূর্ব্বকথিত গীতিকবিতার ন্যায় অসীমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ গল্প মানবের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের উন্নতির সহিত দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

ক্ষুদ্র গল্প।

এই ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ক্ষুদ্রের ভিতর মহত্ত্ব-দর্শনে বিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে ও মানবচরিত্রের অধ্যয়নের ফলে তাঁহার অনেক গল্প সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এই সমস্ত গল্পে বঙ্গভাষার বর্ত্তমান শক্তি ও গতি বুঝিতে পারা যায়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মাসিকপত্রে এই জাতীয় ক্ষুদ্র গল্প লিখিতেছেন। তাঁহাদের রচনাতেও স্থানে স্থানে প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণ লক্ষিত হয়; সুতরাং আশা হইতেছে, বাঙ্গলা ভাষাও কালে গীতিকবিতার ন্যায় এইরূপ গল্প সাহিত্যের অধিকারী হইতে পারে।

ক্ষুদ্র গল্পের পর বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গীতের দিকেই সর্ব্বাগ্রে মন আকৃষ্ট হয়। বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গীত-সম্পদ্‌ও নিতান্ত অল্প নহে। প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণের সঙ্গীতকবিতা ও রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর সঙ্গীতের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কালে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রেমসঙ্গীত দিয়াছেন। এই সমস্ত সঙ্গীত ইয়ুরোপীয় গীতিকবিতার আদর্শে রচিত। সুতরাং রসোদ্রেক অপেক্ষা ভাবোদ্রেকেই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ভাবের উদ্দীপক ও বিরাট পুরুষের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক; তাই সঙ্গীত-সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু, ব্রহ্মের প্রাচীন যোগমূলক ধারণায় ও আন্তরিকতায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত চিরঞ্জীব প্রভৃতি সাধু সাধকগণের সঙ্গীতকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। রাজকৃষ্ণ রায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি রঙ্গালয়ের নেতৃগণের নিকট হইতেও আমরা কয়েকটি

সঙ্গীত।

প্রেম-সঙ্গীত পাইয়াছি। এই সমস্ত গান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব, মিশ্রস্থর, মৌলিকতা ও ভাবের ছায়াত্মক অবভাষে বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গানে বঙ্গীয় সঙ্গীত-সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ হাস্যরসে ভাষার চপলগতি ও আকস্মিক বিস্ফুরণ, উভয়ই আবশ্যক। হাস্যরস-প্রকাশের উপযোগী হইলেই, ভাষা কত দূর উন্নত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ও মনসার ভাসানে কবিগণ হাস্যরস উদ্রিক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পর, কবিওয়ালাগণ, বিষেশতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নানা অস্বাভাবিক উপাদানের সাহায্যে হাস্যরস-স্বষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গীয়সাহিত্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথমতঃ দীনবন্ধুর উচ্চহাস্য উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। তাহার পরে সেই হাস্য বহুপরিমাণে মধুর ও মসৃণ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রে ও রবীন্দ্রনাথে ভদ্রসমাজের উপযোগী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় সর্ব্ব-প্রথম প্রকৃত হাস্যরসের কবিতা রবীন্দ্রনাথ "মানসী"তে লিখিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিভাবলে তাহাকে সঙ্গীতে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত।

বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভাই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে। শুধু হাসির গানে বা রস-রচনায় নহে; অন্যত্রও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্প্রতি "পাষাণী" নামে যে নাটক লিখিয়াছেন, সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে, তাহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক বলিতে পারা যায়। 'পাষাণী'র চরিত্র-স্বষ্টি, ঘটনার সন্নিবেশ, ভাষার প্রয়োগ ও নাটকীয় সমাধান বিবেচনা করিলে, এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। বঙ্গসাহিত্যে কোনও নাটকে ইতিপূর্ব্বে একাধারে এই সমস্ত গুণ দৃষ্ট হয় নাই।

নাট্যকাব্য।

বঙ্গসাহিত্যে পূর্ব্বে নাটক রচিত হয় নাই, এমন নহে। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, মতি রায় প্রমুখ যাত্রাওয়ালাগণ ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি রঙ্গাধ্যক্ষগণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি অনেকেই নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহাদের নাটক কোনও কোনও অংশে সুখপাঠ্য হইতে পারে; কিন্তু সংস্কৃত, গ্রীক, বা ইউরোপীয় নাটকাদির সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। প্রকৃত নাট্যকাব্যের আদর্শ, গতি, বা পরিণতি, এই সমস্ত নাটকে নাই। সর্ব্ববিধ রচনা অপেক্ষা নাটক-রচনা কঠিন।

নাটকে কবিত্বশক্তি, সকল জাতীয় মানবের সহিত অপরিসীম সহানুভূতি, লোক-চরিত্র-জ্ঞান, হৃদয়ের উদারতা, ভাবের তন্ময়তা, ভাব-প্রকাশের শক্তি ও সংযম, ঘটনা-সৃষ্টির সামর্থ্য, ঘটনা-সন্নিবেশে নৈপুণ্য ও সমগ্র নাটকের উৎকৃষ্ট সমাধানে চমৎকারিত্ববিধায়িনী প্রতিভার আবশ্যক। এইরূপ বহুমুখী প্রতিভার অভাবে আমাদের সাহিত্যে নাটক পুষ্টিলাভ করে নাই।

ইয়ুরোপের অনেক বড় বড় কবি এই নাটক লিখিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি আমাদের দুর্গাপ্রতিমার মত। সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাকচিক্য,—সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ। এত জাঁক জমক, এত বর্ণনার পারিপাট্য সাহিত্যে অল্প নাটকেই আছে। কিন্তু সেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম পদার্থের অভাবে সমস্ত বিফল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র-গুলির সহিত আমাদের অণুমাত্র সহানুভূতি হয় না; মনে হয়, একটাও যেন প্রকৃতিস্থ নহে। সকলেই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত, আলঙ্কারিক বাক্যবিন্যাসের জন্য একান্ত ব্যাকুল। বাঙ্গালায় অন্য সমস্ত নাটক কবিত্ব বিষয়ে রবীন্দ্র-নাথের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। পরন্তু তাহাদের মধ্যেও উক্ত সমস্ত দোষ অল্পাধিকপরিমাণে বর্ত্তমান।

আমাদের রঙ্গালয়গুলি নৃত্য গীত ও আমোদ বিলাসের গৃহ। সেখানে অভিনয়ার্থ প্রস্তুত নাটকগুলিও সেইরূপ বিকৃত রুচির পরিচায়ক। তাহাদের—মধ্যে ভাষার সৌন্দর্য্য, গঠনের কারুকার্য্য, বা জীবিত চরিত্রের সমাবেশ, কিছুই নাই। দেশের লোক পুতুলের নাচ দেখিয়া তৃপ্ত হয়। জীবিত মনুষ্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না। তাহারা ভাব অপেক্ষা সুর বেশী ভালবাসে। সহজ, কোমল, স্বভাবানুগত দেহলীলার পরিবর্ত্তে, কষ্টশিক্ষিত অঙ্গবিভ্রম ভালবাসে। হৃদয়ে অনুভব না করিয়া 'বাহবা' দিবার জন্য লালায়িত হয়। তাই আমাদের নাটক অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিও ভাল আদর্শ পায় নাই। বিশুদ্ধ হাস্যরসে সামাজিকের মন তুষ্ট হয় না। তাই অমিশ্র ঠাট্টা, পরের কুৎসা, অথবা কোনও নবপ্রচলিত রীতি-নীতির অবলম্বনে বিপ-রীত 'ভাঁড়ামি' সৃষ্টি হয়, এবং তাহাই দর্শকগণকে অধিক আমোদ দিয়া থাকে। বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া হাস্যোদ্রেক করাই রঙ্গালয়ের নাট্যকোবিদগণের 'আর্ট' বা কলাকৌশল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হাসরসাত্মক নাটক।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই শ্রেণীর নাটকেও প্রকৃত হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

সাময়িক পত্রিকা।

সাময়িক পত্রিকাগুলি দেশে ইতিহাস-আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছে, ও বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালীকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু সাময়িক পত্রের দ্বারা কবিতার প্রভূত অপকার হইতেছে। কবিগণ আপাতরম্য-যশো-লোলুপ হইয়া আপন হৃদয়ের গূঢ়-তপোবন ছাড়িয়া, বাজারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা-পাঠে মনে হয়, কবিতা-সুন্দরী যেন নিতান্ত তাড়াতাড়ি অসংযত ও অসংলগ্ন বেশে গৃহের বাহির হইয়া আসিয়াছেন। পাঠকগণ তাহা দেখিয়া তুষ্ট হন না, এবং কবিরও গৌরব নষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে, এই সকল সাময়িকপত্রে প্রকৃত সমালোচনার একান্ত অভাব ঘটিতেছে। সমালোচনা সাহিত্যের গতিনির্দ্দেশ করিতে পারে না, এবং কোনও কবিকে সৃষ্টিকার্য্য শিক্ষা দিতে পারে না, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সমালোচনা সাহিত্যকে দূষিত পথ হইতে নিবর্ত্তিত করে। সমালোচনার

সমালোচনা।

দ্বারা সাহিত্য প্রভূত উপকার লাভ করে। দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা-সংবলিত একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র, সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, এবং সময় সময় 'সাহিত্য' যে ভাবে সমালোচনা করিয়া থাকেন, সেই আদর্শের সমালোচনা এখন আর হইতেছে না। এখন মাসিকপত্রের সমালোচনার কোনও মূল্য নাই। আমাদের দেশের সমালোচকগণের কথা বিশ্বাস করিতে গেলে মনে হয়, এই দেশ সেক্ষপীর ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিল ও বেকন, পিট ও শেরিডানে 'কাণায় কাণায়' পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদের ভাষা ভয়ানক অতিশয়োক্তিপূর্ণ। তাঁহাদের প্রশংসা বা নিন্দা সীমাহীন ও সর্ব্বগ্রাসী। আবার এদেশের কোনও কোনও প্রবীণ সমালোচকও গ্রন্থের সাহিত্যগত দোষ গুণের বিচার না করিয়া, অমুক কাব্য 'হিন্দু কাব্য' কি না, অমুক রচনা 'মনুসঙ্গত' কি না, ইত্যাদি বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং সেই ভাবে সমালোচনা করেন। বলা বাহুল্য, উক্তরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের আদর্শ জীবন্ত সমাহিত হয়।

বাঙ্গালা উদ্যানে, ক্ষুদ্র গল্প, জীবনবৃত্ত, সমালোচনা, ধর্ম্মপুস্তক, ঐতিহাসিক,

সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে যে ভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে মন পুলকিত হয়। বাঙ্গালা গদ্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নিভৃতচিন্তা' প্রভৃতিতে পদ্মা নদীর গম্ভীর নাদ শ্রুত হয়। রবীন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক সভায় ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশের সংমিশ্রণে যে ভাষা বহিয়াছে, তাহা বঙ্গভাষার রত্নৈশ্বর্য্যস্বরূপ সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত থাকিবে। সত্য বটে, বাঙ্গলায়, ধর্ম্ম সমাজ, বা দর্শন সম্বন্ধে কোনও মৌলিক গ্রন্থ এখনও বাহির হয় নাই। তাহার কারণ, আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজের মূল সংস্কৃত-সাহিত্যেই নিহিত। তাহারই অনুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকা, টিপ্পনী করিয়া সম্প্রতি বুঝিতে হইতেছে। কালে আপনার জিনিস সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে, বাঙ্গালী তাহার সাহায্যে জগতের সমাজতত্ত্ব ও দার্শনিক কূটতত্ত্বের মীমাংসায় অগ্রসর হইতে পারিবে, এরূপ আশা অসঙ্গত নহে।

বাঙ্গালার গদ্য।

জাতীয় স্বাধীনতা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জননী। পরাধীন দেশের সাহিত্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করা দূরে থাকুক, তাহা পদে পদে উপেক্ষিত, বিধ্বস্ত ও হীনতাগ্রস্থ হয়। আমাদের সাহিত্যের আশা, উদ্যম ও পরিপুষ্টির সহিত রাজার অণুমাত্র সহানুভূতি নাই। রাজার সহানুভূতি ব্যতিরেকে সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন এদেশের অন্য কোনও সাহিত্যসেবক সাহিত্যের জন্য সমগ্রভাবে প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তরায়।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের ভূমিতে 'বড়লোকে'র অভ্যুদয় বড় বিরল। আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি অতি ক্ষুদ্র; সমাজ সংকীর্ণ, এবং সহস্র বৎসরের আবর্জ্জনায় ও জঞ্জালে পরিপূর্ণ। এ সমাজ ব্যক্তিবিশেষের উন্নত জীবনের উপযোগী নহে। আমাদের সমাজ কেবল সাধারণের জীবনধারণেরই উপযোগী। বাঙ্গালীর দারিদ্র্য, বাঙ্গালীর সমাজ-জীবন, বাঙ্গালীর একান্নভুক্ত পরিবার নিশিদিন তাহাকে নিপীড়িত নিষ্পিষ্ট করে, এবং তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে উদরের সংবাদ জাগাইয়া রাখে। বঙ্গদেশের অনেক প্রতিভা এইরূপে সমাজের ও পরিবারের অতি প্রাচীন দেবমন্দিরের সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হইতেছে। তাই সাত কোটী নর নারীর মধ্যে প্রতিভার এত 'আকাল' ও এমন দুর্ভিক্ষ।

আবার আমরা শিক্ষার জন্য যাহাদিগকে বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাই,

বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। সংসারে ডিপ্লোমার বিজয়নিশান উড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে, আমাদিগের শরীর মন কলেজগৃহের উত্তপ্ত বদ্ধ বাতাসে নিঃশেষ হইয়া যায়, এবং কেবল কঙ্কাল কয়টি লইয়া আমরা মধ্যজীবনে জগতের মাধ্যাহ্নিক কোলাহলে আসিয়া দাঁড়াই। বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে আশ্বস্ত করে নাই। বহু বৎসর হইল, এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে সেই বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গীয় সাহিত্যে কেবল একখানি ছিন্ন 'ক্যালেণ্ডার' পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহাতে ধূলিরাশির মত অসংখ্য সংজ্ঞাহীন নাম পড়িয়া আছে।

তথাপি এই দুঃখদৈন্যের মধ্যে বঙ্গভাষা যাহা সৃষ্টি, উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাও অল্প আশাপ্রদ নয়। বাঙ্গালীর শক্তি কোথায়, বাঙ্গালী জগতের মধ্যে কোথায় দাঁড়াইবে, কি উপায়ে আপন পদবী খুঁজিয়া লইবে, সাহিত্যের এই নগণ্য বিকাশ হইতে অন্ততঃ তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালীর শক্তি সাহিত্যে। বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্তর দিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা কার্য্যে দেখাইয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আকস্মিক প্রতিভার প্রণোদনে "বাল্মীকির জয়ে" তাহার উত্তর অনুপম ভাবে বাঙ্গালীকে দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য কলগানে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে :—

বঙ্গসাহিত্যের আশা ও শক্তি।

"কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু স্বর
বাজে অবিরল তরল মধুর
সদা শিঞ্জিত মাণিক নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে।"

বঙ্গসাহিত্যের স্বরূপ নির্দ্দেশের পক্ষে এই উক্তিই পর্য্যাপ্ত। অধিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। এখন বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে কোন পথ অবলম্বনীয়, তাহা অতীত ও বর্ত্তমানকালের সাহিত্যিকগণের গ্রন্থাদির আলোচনায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্থানে স্থানে যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধে বঙ্গসাহিত্যের গ্রন্থাদি জগতের সাহিত্য ও তাহার আদর্শের হিসাবে সমালোচিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেক গ্রন্থ বহুমূল্য; অনেক গ্রন্থকার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার প্রকাশ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধিতে যাহা

সাহিত্যের সার্ব্বভৌমিক আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাহার আলোকেই এই আলোচনা করিয়াছি।

বঙ্গসাহিত্য এখনও সমুদ্র খুঁজিয়া পায় নাই। সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে মাত্র। মধুসূদন, হেমচন্দ্র. বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে সমুদ্রের কল্লোল ও আশ্বাস আনিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের তুষারগিরির সহিত অভিন্ন ধারাপ্রবাহ স্থির রাখিয়া, দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, সম্প্রতি বাঙ্গালার সজল সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়া, নানা বক্র পথে, জগতের সাহিত্যসমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহা ভাগীরথীর ন্যায় শতমুখে সমুদ্রে পতিত হইবে—যাহার আপূর্য্যমান অচল-প্রতিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যে জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্য-নদী-প্রবাহ আসিয়া মিলিয়াছে, যাহার সঙ্গে তাহাদের দিবানিশি আদানপ্রদান চলিতেছে।

পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধূঃ।

বঙ্গসাহিত্য সমুদ্রের নিকট যে উপহার লইয়া যাইতেছে, তাহা নিতান্ত উপেক্ষ-ণীয় নহে। বঙ্গসাহিত্যের মহিমায় দৃপ্ত প্রবন্ধলেখকের বিশ্বাস, বেদ ও উপনিষদের যে নিগূঢ় পাবনী ভাবধারা বাঙ্গালীর হৃদয়ে ওতপ্রোতভাবে এ যাবৎ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালী এখনও তাহা জগৎসমক্ষে উদ্‌ঘা-টিত করিতে পারে নাই; তাহা করিতে পারিলে বঙ্গসাহিত্য জগতের প্রলুব্ধ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। কবি Wordsworth তাহার কণিকামাত্র আবিষ্কার করিয়া ইংলণ্ডের বিক্ষিপ্ত সমাজে অচিন্তনীয় সংযত শান্তি বিতরণ করিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যেও সেই শক্তির কবি, সেই ধ্যানের কবি, সেই যোগের কবির অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী,—তাঁহার প্রাণে দিগন্তব্যাপিনী প্রসারতার সহিত অতল গাম্ভীর্য্য ও সর্ব্বাভিভাবী বেগ থাকিবে; আমরা তাহারই আশা করিয়া আছি। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার শুভাগমনের নান্দীপাঠ হইয়া গিয়াছে।

জগতের সমস্ত সাহিত্য-নদী নানা দিগ্দেশ হইতে ভাবের উপহার আনিয়া মানবজাতির হৃদয়সিন্ধুমধ্যে এক গুপ্ত মহাদেশের সৃষ্টি করিতেছে। মানব এখনও তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে নাই, এখনও আপনাকে জাগ্রত করিতে পারে নাই। অমর কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—

——মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজিত হতেছে পলে পলে,

আপনি সে নাহি জানে। শুধু অন্ধ অনুভব তারি
আকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়াছে সঞ্চারি'
আকার-প্রকার-হীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা,
প্রমাণের অগোচর প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্কভারে পরিহাসে মর্ম্ম তারে সত্য বলি মা'নে;

* * * *

জননী যেমন জানে জঠরের আপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পু'রে।

যখন এই দেশ মানবের সমক্ষে আবিষ্কৃত হইবে, তখন সম্মিলিত মানব-হৃদয়ের সমস্ত কবিতা, এক অখণ্ড মহাকাব্যে পরিণত হইয়া, পবিত্র প্রার্থনার মত, আকাশের দিকে উত্থিত হইবে। বঙ্গসাহিত্য মানবের এই মহনীয় আশায় উদ্বোধিত হউক।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

দেহতত্ত্ব।

খাদ্যপরিপাক।

দেহ একটা প্রকাণ্ড রাজ্য। ইহার প্রণালীও প্রকাণ্ড। যাহাকে আমরা দেহ বলিয়া থাকি, সেটা একটা কল। কলটা চালাইতে হইলে প্রথমতঃ উপাদান চাই। সেই উপাদানের নাম খাদ্য।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, খাদ্য নামক উপাদানের মৌলিক ভাগ জগতে প্রচুরপরিমাণে বর্ত্তমান। অথচ পয়সা নহিলে খাদ্য পাওয়া যায় না। ইহার উত্তর, মূল্যবান দেহ সংগ্রহ করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম আবশ্যক, এবং পরিশ্রমের মূল্য আছে। অনেক খাদ্য সহজে প্রাপ্য। যেমন ঘাস ও ফল মূল। কিন্তু ঘাস ও ফল মূল খাইলে যে দেহ হয়, তদ্দ্বারা বক্তৃতা, অভিনয় প্রভৃতি মনোহর কর্ম্মাদি সম্পন্ন করা যায় না। কেশকলাপ ঘোড়া ও গাভীর ন্যায় স্থূল ও কদর্য্য হইয়া পড়ে। জিহ্বা মোটা হয়। এই জন্য ঘাস ছাড়িয়া আমরা অন্ন ব্যবহার করিয়া থাকি।

এ সব কথা বলা বাহুল্য। কেবল কেশবিন্যাস করিতেই আমাদিগের মাসে দশ বার টাকা ব্যয় হইয়া যায়। দেহটাকে যেমন ভাবে রক্ষা করিলে আমরা আপাততঃ সুখী হই, তাহার মূল্য আছে। সেই মূল্যের পরিবর্ত্তে প্রাণের অনেকটা ব্যয় করিতে হয়। ইহার কোনও চারা নাই। "সখের প্রাণ"—সেকালের কথা।

তবে আমরা দেখিতে পাই যে, খাদ্য যতই মনের মতন হউক না কেন, শরীরের ব্যবহারে লাগিতে গেলে তাহারা পুনরায় মৌলিক উপাদানে পরিণত হয়। একটা গোটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করা গোটা মনুষ্যের পক্ষে অতীব সুখকর, কিন্তু দেহের মধ্যে গোটা সন্দেশ দ্বারা কোনও কাজ হয় না। সন্দেশটা আবার মৌলিক অংশে পরিণত হইয়া দেহের নানা স্থানে নানা রূপে বণ্টিত হয়। দেহের কোনও অংশ তাহার মিষ্টভাগ গ্রহণ করে। কোনও অংশ তাহার অম্লজানটুকু লয়। কোনও অংশ তাহার যবক্ষারজানেই সন্তুষ্ট। ইহার নাম পরিপাক, এবং রক্তসঞ্চালন-প্রণালী।

অর্থাৎ, বৃহৎ মনুষ্যের শরীরে অগণন ক্ষুদ্র মনুষ্য আছে। এই সকল ক্ষুদ্র মনুষ্য একত্র হইয়া বৃহৎ মনুষ্য। ক্ষুদ্র মনুষ্যের তাড়নায় বৃহৎ মনুষ্যের ক্ষুধা পায়। বৃহৎ মনুষ্য একটা জটিল বস্তু খায়, এবং তাহাতে সে সুখী হয়। সেই জটিল বস্তু পাকস্থলীতে পৌছিয়া ক্ষুদ্র মনুষ্যগণের ব্যবহারে লাগে।

যেটুকু কেহ লয় না, তাহার নাম মল। তবে মলমাত্রই যে অসার, তাহার কোনও অর্থ নাই। আমরা অনেক বক্তৃতা শুনিয়া তাহার সার ভাগ গ্রহণ করি না। সেটুকু আমরা ফেলিয়া দিই। ছেলেবেলায় অনেক উপন্যাসের কেবল "প্লট"টুকু লইয়া আমরা ব্যস্ত হইতাম। যৌবনাবস্থায় নায়কের সহিত নায়িকার কি হইতেছে, তাহাই দেখিতাম। নায়িকার সুন্দর মুখ হইলে আনন্দিত হইতাম, এবং কদর্য্য মুখ হইলে চটিয়া যাইতাম। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিলে উপন্যাসের ধর্ম্মভাবটুকু আমরা লইয়া থাকি। অতএব, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, যাহা আমরা ফেলিয়া দিই, কিংবা গ্রহণ করি না, সেটা যদিও মল বলিয়া তখন গণ্য, কিন্তু তাই বলিয়া অসার নহে। শুক্র, অ্যালবুমেন প্রভৃতি অনেক সার ভাগ আমাদের শরীর হইতে মলমূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। থাকিলে তাহারা অনেক উপকারে লাগিতে পারিত।

পরিপাক করাটা বৃহৎ মনুষ্যের অর্থাৎ লোকটার সাধ্যাতীত। শ্রীধর

ভট্টাচার্য্যের লুকাইয়া কাবাব (খাসীর, মুর্গীর নহে) খাইয়া পরিপাক করিতে তিন শত বাহান্ন টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার পাকস্থলীর যন্ত্র কাবাব পরিপাক করিবার উপযোগী ছিল না, অথচ লোভে পড়িয়া কাবাব খাইয়া ভট্টাচার্য্যের বিলক্ষণ বিপদ হইল। গরুকে মাংস খাওয়াইলে যেমন হয়, ভট্টাচার্য্য তেমনই হইলেন। গৃহিণী ও পুত্রকলত্রের ত্রাস হইল। অবশেষে অক্ষয় ডাক্তার আসিয়া অনেক চেষ্টায় ভট্টাচার্য্যকে শয্যা হইতে তুলিয়া যমলোক হইতে মানবলোকের হস্তে দিতে পারিয়াছিলেন।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও দেহ ক্ষুধাগ্রস্ত হইলে আমাদিগকে খাইতে বলে, কিন্তু আমরা কি খাইব, তাহা বলে না। পিপাসা হইলে জল হইতে আরম্ভ করিয়া সোডা ও চা খাওয়া যায়। ক্ষুধা লাগিলে দুগ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁঠার মুণ্ডটা পর্য্যন্ত খাওয়া যায়। ক্ষুধাটা স্বভাবের। ক্ষুধানিবারণের উপাদানটা বৃহৎ মনুষ্যের হস্তে। যদি বৃহৎ মনুষ্য দেহস্থ ক্ষুদ্র মনুষ্যগণকে তাহাদিগের উপযোগী খাদ্যমাত্র দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, তবে জানিলাম যে, পরিপাক ঠিক হইয়াছে। যদি এমন বস্তু পাকস্থলীতে যায় যে, তাহা দেখিয়া ক্ষুদ্র মনুষ্যগণ ভীত হয়, বা সন্তপ্ত হয়, তাহা হইলে একটা বিলক্ষণ বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। এমন কি, উদরস্থ ক্ষুদ্র মনুষ্যগণের স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করে। ঘরে ঘরে কলসী কাঁখে করিয়া সেই বস্তুটাকে ধুইয়া ফেলিতে চাহে। অনেকে চটিয়া যায়, এবং একটা দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। এ সব আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারি। যেমন জ্বরভাব ইত্যাদি।

অথচ পরিপাক কার্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইহা জানিতে হইবে যে, উভয় পক্ষ হইতে, অর্থাৎ বৃহৎ মনুষ্যের পক্ষ হইতে, এবং ক্ষুদ্র মনুষ্যের পক্ষ হইতে এই কর্ম্মে কোন্ কোন্ অংশ সাধিত হয়। আমি সখ করিয়া একটা জিনিস খাইলে উদর যদি না গ্রহণ করে, তবে তাহার উপায় কি? উদর কোন্‌টা কোন্ সময়ে পরিপাক করিতে চাহে, তাহার কোনও সঙ্কেত আছে কি না? এবং যদি কার্য্যগতিকে পরিপাক না হইয়া পদার্থটা থাকিয়া যায়, তবে সরলভাবে বাহির করিবার কিংবা অন্য কোনও কাজে লাগাইবার উপায় আছে কি না?

এ সব বিষয় আমরা কিছু কিছু জানি, এবং সচরাচর পরীক্ষা করিয়া থাকি। অগস্ত্য মুনি এক গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। ইহা সকলে বিশ্বাস

করিত না। কিন্তু এখন এটা সকলে বিশ্বাস করে; কারণ, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, মহর্ষির উদর ও সমুদ্রের আয়তন সমান ছিল; কাজেই তিনি এ কর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিপাককার্য্য বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য দেহতত্ত্বের (Physiology) গোটা কতক কথা সরল ভাষায় বলিলে হানি নাই। জীবের শরীরে দুইটা ভাগ আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণভাগটা তাহার আয়ত্তাধীন নহে। ইহার মধ্যে পরিপাকক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাপার সম্পন্ন হয়। যে শক্তি দ্বারা প্রত্যেক ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহার মূল কোথায়, আমরা জানি না। অথচ দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যেকের একটি করিয়া স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। পরিপাকের শক্তি Solar Plexus নামক স্নায়ুচক্রের মধ্যে নিহিত। রক্তসঞ্চালনের শক্তিকেন্দ্র Medulla নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা মস্তিকের নিম্নভাগে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের শক্তিকেন্দ্রও তাহারই সন্নিকটে। শাস্ত্রমতে এই সকল কেন্দ্র-স্থলে এক একটি করিয়া দেবতা বিরাজমান। দেবতাই হউন, বা শক্তিই হউন, ইহাঁদিগের চাল চলন ও কর্ম্মকলাপ রহস্যময়। জড়প্রকৃতি ইহাঁদিগের সাহায্যে এই দেহভার নির্ম্মাণ, রক্ষা ও ভরণপোষণ করে। আমরা যে মনে করি, আমরাই শরীরটাকে রক্ষা করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা নহে।

প্রথমতঃ, অন্ন উদরে উপনীত হইলে, উদরস্থ অগ্নিদেব সেটাকে পরিপাক করেন। উদরস্থ বায়ু কিংবা শক্তি সেই অগ্নিটাকে প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। অতঃপর খাদ্য রক্তে পরিণত হইয়া রক্তবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং হৃদয়ের অভিমুখে যায়। সেখানে গিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস-যন্ত্রের সাহায্যে তাহা সংস্কৃত হয়। সংস্কৃত রক্ত আবার হৃদয়-যন্ত্রের শক্তি দ্বারা বামভাগের রক্তবাহী নাড়ী (artery) অবলম্বন করিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে প্রবাহিত হয়। শরীরস্থ প্রত্যেক পরমাণু সেই রক্ত পান করিয়া ক্ষুধানিবারণ করে, এবং পুষ্ট হয়। এই ভরণপোষণ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিবার ভার দেবতা-গণের হস্তে।

দক্ষিণভাগটার ব্যাপার আমাদিগের আয়ত্তাধীন না হইলেও, আমাদিগের সহিত যে তাহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ

থাকিলেও নিম্নদেহস্থ সংবাদ তাহার নিকট অহরহঃ পৌছিয়া থাকে। অর্থাৎ, স্নায়ুমণ্ডলী তাহাকে শরীরের নানাবিধ অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে জানাইয়া দেয়। মস্তিষ্কে দ্বাদশ জোড়া স্নায়ু আছে, তাহারা নিম্নদেহস্থ বত্রিশ নাড়ীর সহিত জড়িত। ইহারই মধ্যে উনপঞ্চাশ কিংবা ততোধিক পবন প্রবাহমান। ইহারা যে সর্ব্বদাই ঘোরতর গোলযোগ করিতেছে, তাহার আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

গোলযোগের বিশেষ কারণানুসন্ধান করিয়া শাস্ত্রকারগণ জানিতে পারি-যে, (Cranial nerve মস্তিষ্কের) স্নায়ু নিম্নস্থ (spinal nerve) মেরুদণ্ডের স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া জীবকে একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থে পরিণত করিয়াছে। মেরুদণ্ডস্থ রাজ্যকে যদি জড়প্রভৃতি বলা যায়, এবং মস্তিষ্কদেশকে যদি মানবপ্রকৃতি বলা যায়, তবে জড়প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-নির্ণয় সহজেই হইতে পারে। অথচ এটা একটা জটিল বিষয়।

মানবের দুরবস্থার কারণ এই যে, তাহাকে চতুর্দ্দিকে নজর রাখিতে হয়। আমরা যদি অহরহঃ বাটীর মধ্যে দৃষ্টি রাখিতাম, তবে হয় ত গৃহিণী ও পুত্রকলত্র কষ্টদায়ক হইত না। কিন্তু আমাদিগের মানবত্বের স্ফুরণার্থ অন্য দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হয়, এবং আমাদিগের স্বাধীন মতামত আছে; সে মতামত বাটীর মধ্যের মতামতের সহিত এক নহে।

অর্থাৎ, আমাদিগের পাঁচটা ইন্দ্রিয়-দ্বার আছে, তাহাই আমাদিগের কর্ম্মস্থল। সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মস্থলে ব্যাপৃত থাকায় বাটীর মধ্যের খবর আমাদিগের পক্ষে জাপানের যুদ্ধসংবাদের ন্যায় হইয়া পড়ে। যদিও আমরা সংবাদটা জানিবার জন্য ব্যস্ত, অথচ কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না।

এই যে জটিল সম্বন্ধ, ইহাই আমাদিগের আয়ুর ভিত্তি। গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রকলত্র ক্ষুদ্র মনুষ্যগণকে নিম্নদেহে দেবতাগণের কৃপায় স্বাধীন হইয়াও অনেকটা আমাদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। খাদ্য আমরা যোগাইয়া না দিলে, অবশ্য পাকস্থলীতে, অন্য কোনও প্রকারে পৌছিতে পারে না। এবং যেরূপ খাদ্য আমরা মনোনীত করি, তাহাই পাকস্থলীর দেবতাগণ পরিপাক করিতে বাধ্য। আমরা ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে বিষ আনিয়া দেহটাকে মুহূর্ত্তেই নষ্ট করিতে পারি। আবার গৃহিণীর অসাবধানতাবশতঃ বহিঃপ্রকৃতি হইতে নানাবিধ কীটাণু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জরাজীর্ণ

দেহটাকে অধিকতর জর্জ্জরিত করিতে পারে। কিন্তু চারি দিক ঠিক রাখা আমাদিগের আয়াসসাধ্য নহে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, বাটীর মধ্যের কর্ম্ম গৃহিণীর হস্তে দিয়া কর্ত্তা ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিতে পারেন। কিন্তু কর্ত্তা ধর্ম্মসঞ্চয় না করিয়া যদি অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, তবে কাযেই সেটা গৃহিণীর মনোমত হয় না। ইহার মূলে একটি সামান্য সত্য দেখা যায়। কর্ত্তার অধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে শক্তির হ্রাস হয়, এবং কাজেই গৃহের মূলধন পর্য্যন্ত টানিতে হয়। গৃহিণীর কাপড় চোপড় ও গহনাটা পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়া আমরা যদি গুলি খাই, তবে অবশ্যই ইহা রক্ষণ-শীলা প্রকৃতির পক্ষে কষ্টকর হয়। যদি আমরা শক্তির অপব্যয় করি, তবে দেবতাগণের পক্ষেও আমাদিগের শরীররক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। যেমন মানবসমাজের নিয়ম, তেমনই দেহরাজ্যের নিয়ম। রাজার সংস্কার বেতর হইলে রাজ্যটা পড়িয়া যায়। রাণী নিজের পক্ষ দেখিতে থাকেন, এবং প্রজাগণও নিজের উপায় দেখে। যাহাতে উভয় পক্ষ নির্ব্বিবাদে দিন-যাপন করিতে পারে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। উভয় উভয়কে ধারণা করিয়া একই আদর্শে কর্ম্ম করিতে থাকিবে, ইহাই ধর্ম্মের মূল।

পরিপাক করাটা দেহধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ। ধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইলে প্রথমতঃ এমন পদার্থ পাকস্থলীতে প্রদান করা উচিত, যাহা গৃহিণী ও দেবতা-গণের প্রিয়, এবং সহজেই পাচ্য। বৃদ্ধবয়সে সখ করিয়া অভিনব একটা খাদ্য উদরে প্রবিষ্ট করাইলে অবশ্য তাহার ফল সবল হয় না।

কোন্ সময় উদর কোন্‌টা গ্রহণ করিতে চাহে, সেটা একটু বিরলে বসিয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। মনোজগতের খাদ্য (চিন্তা) আমাদিগের সর্ব্ব-সময়ে এক নহে। অনেক কথা সব সময়ে এক নহে। অনেক কথা সব সময় ভাল লাগে না। অনেক গানও অনেক সময় বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। উদরও সেই নিয়মের অধীন। মনও যেমন চঞ্চল, উদরও তাহাই। আমা-দিগের অভ্যাস ও সংস্কার শরীরটাকে নিজের মত করিয়া তুলিতে চাহে। কিন্তু উভয়েই বেতরভাবে উভয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, উভয়ে সখ্যতাভ্রষ্ট হইলে, উভয়ে উভয়ের সহায়তা না করিলে, ফলে উভয়েই নষ্ট হয়।

কার্য্যগতিকে একটা সঙ্গীন পদার্থ উদরে গেলে সকলেই ব্যস্ত হইতে পারেন। মদ খাইলে আমাদিগেরও নেশা হয়, এবং শরীরের যে হয় না, এমন কথাও বলা যায় না। তবে শরীরের পক্ষে অসহ্য হইলে, সে আমাদিগের

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, উদ্গার করিয়া ফেলে। অবশ্য জগতে এমন পদার্থ নাই যে, শরীরকে ক্রমে ক্রমে তাহার পরিপাকোপযোগী না করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের মতামত যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, শরীরের গ্রহণ করিবার শক্তির তত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয় না। শরীর কিছু অলস, এবং নারীভাবগ্রস্ত। ধাঁ করিয়া অন্ত কাঁচকলা ও কল্য মদ খাইলে, শরীর সহিতে পারিবে না।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ একটা আদর্শ সম্মুখে রাখা উচিত। আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ও তদুপযোগী কর্ম্মের সঙ্কল্প মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিলে দেহটা জানিতে পারে যে, কর্ত্তার বাস্তবিক ইচ্ছা কি। আমি কৃষ্ণ হই, বিষ্ণু হই, কিংবা জাম্বুবান হই, প্রথমতঃ একটা ঠিক করা উচিত, এবং অন্ততঃ কিছু দিন তাহারই মত কর্ম্ম করা উচিত। কিন্তু এক দিনে কৃষ্ণ বিষ্ণু ও জাম্বুবান হইলে দেহের সাধ্য নাই যে, তাহার অনুগামী হয়। কাজেই ঘোরতর একটা বিপ্লব বাধে, এবং দেহের ক্ষয় হইতে থাকে।

ফিরিঙ্গি বণিক্।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরিচয়।

When Vasco da Gama Landed in 1498, the old order of things alike in Northern and in Southern India was passing away; the new order had not yet emerged.—*Sir W. Hunter.*

এক সময়ে সমগ্র কেরল রাজ্যই হিন্দু নরপতির অধীন ছিল। সে পুরাতন হিন্দুরাজ্য কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে দাক্ষিণাত্যে অদ্যাপি যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা নিরতিশয় কৌতুকাবহ। লোকে বলে,—খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে কেরল রাজ্য যে হিন্দু নরপতির অধীন ছিল, তিনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরিণতবয়সে বিষয়ানুরাগ শিথিল হইলে, তিনি মদিনা যাত্রা করেন; আরব দেশেই তাঁহার অন্তকাল উপস্থিত হয়। তাঁহার রাজ্য এই সূত্রে বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অধিকাংশ স্থান বিজয়নগরের হিন্দু-

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; কোন কোন স্থান কালে মুসলমানের অধীন হইয়া, বাহ্মণী-রাজ্য গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবেও মালাবারের সমুদ্রোপকূল স্বতন্ত্র থাকিয়া, হিন্দু রাজন্যবর্গেরই অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই সকল বাণিজ্য-বন্দর-বহু রাজার অধীন হইলেও, কাহারও সহিত কাহারও বাণিজ্য-কলহ উপস্থিত হইত না; সকলেই আপন আপন ক্ষুদ্র বন্দরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, যথাসাধ্য বাণিজ্যশুল্ক সংগ্রহ করিতেন। কালিকটের হিন্দু রাজা বাহুবলে পরাক্রান্ত না হইলেও, বাণিজ্যগৌরবে জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সমগ্র সভ্যদেশেই সুপরিচিত ছিল। ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিবার সময়ে, পর্ত্তুগাল-রাজের নিকট হইতে কালিকটের সামুরীর নামে পত্র লইয়া পোতারোহণ করিয়াছিলেন।

গামা যখন কালিকটের বাণিজ্য-বন্দরে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন ভারতবর্ষ একরূপ অরাজক অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। তখনও মোগল-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখনও দিল্লীর শাসনক্ষমতা দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ববিস্তারে অগ্রসর হয় নাই। তখন পাঠান-শাসন ক্রমে ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছিল। কালিকটের সামুরীর সহিত পাঠান-সম্রাটের সংস্রব ছিল না। তিনি স্বতন্ত্রভাবেই রাজ্যশাসন করিতেন। ফিরিঙ্গি-বণিকের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া কালিকট-রাজ ভাস্কো ডা গামাকে সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ভাস্কো ডা গামা যে দিন ভারতবর্ষের পুণ্যতটে প্রথম পদবিন্যাস করেন, সেদিন তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। এত কাল যাহা কেবল কবিকল্পনায় অনুরঞ্জিত হইয়া পর্ত্তুগালের জনসাধারণের নিকট বিস্ময়বিজড়িত স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইত, সে রাজ্যে প্রথম পদন্যাস করিবার সময়ে পর্ত্তুগালের রাজপ্রতিনিধি সমুচিত সমারোহের ত্রুটি করিলেন না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে আপাদমস্তক সুশোভিত করিয়া, ভাস্কো ডা গামা বহুমূল্য-উপঢৌকন-হস্তে রাজসন্দর্শনে বহির্গত হইলেন। রাজপথের নাগরিকগণ কালিকটের বাণিজ্য-বন্দরে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব দৃশ্য দর্শন করিল। গামার দৃঢ়োন্নত বীর-কলেবর জনস্রোতের মধ্যে আলোকস্তম্ভের ন্যায় প্রতিভাত হইল। জনসাধারণ ফিরিঙ্গি-বণিকের যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ত্রুটি করিল না।

সামুরী গামাকে দর্শন করিবামাত্র সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কালিকট-রাজ ফিরিঙ্গি বণিকের উৎসাহবর্দ্ধন করিবামাত্র, তাঁহার সরল ব্যবহারে পরম পরিতৃপ্তিলাভ করিয়া ফিরিঙ্গি বণিক পণ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা পণ্যবিক্রয়ে অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহারাও নূতন ক্রেতার দর্শনলাভ করিয়া নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু আরব দেশের যে সকল বিচক্ষণ বণিক্ রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ফিরিঙ্গি বণিককে সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। নূতন জল-বাণিজ্যপথের আবিষ্কার-কাহিনী তাঁহাদের হৃদয়ে এক অপরিজ্ঞাত আশঙ্কা উদ্রিক্ত করিয়া দিল। তাঁহাদের মনে হইল,—কলহপ্রিয় খৃষ্টানগণ ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়া আরবসাগরে সমর-কোলাহল উত্থাপিত করিবার জন্যই এত ক্লেশে এরূপ দূরদেশে উপনীত হইয়াছেন। বাণিজ্য কেবল কথার কথা,—ব্যপদেশমাত্র! ফিরিঙ্গি-বণিকের বাণিজ্যতরণীতে আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা যে সকল যুদ্ধো-পযোগী অস্ত্র শস্ত্রের সন্ধানলাভ করিলেন, তাহাতে সেই আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

সেকালে যে সকল জলপথে বা স্থলপথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য নানা দিগ্দেশে প্রেরিত হইত, সেই সকল বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ শুল্করক্ষার জন্যই বাণিজ্য রক্ষা করিতেন। কোন দেশে সমরকলহ বিদ্যমান থাকিলেও, উভয় পক্ষই বাণিজ্যরক্ষার্থ চেষ্টা করিতেন। দস্যু ভিন্ন অন্য কেহ বাণিজ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিত না। এই সকল কারণে, মধ্য-এসিয়ার বিবিধ বিপ্লবের মধ্যেও ভারতবাণিজ্য অব্যাহতগতিতে প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য সাম্রাজ্যে প্রবাহিত হইত। বণিগ্‌বর্গের পক্ষে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনাগমন করিবার প্রয়োজন হইত না। এরূপ অবস্থায় ফিরিঙ্গি বণিকের সামরিক বেশ নিরীহ বণিগ্‌বর্গের হৃদয়ে সহজেই আতঙ্ক উপস্থিত করিতে লাগিল। সে কথা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বণিক্ ভিন্ন অন্য কেহ কালিকটে উপনীত হইত না। কালিকট-রাজ ফিরিঙ্গি বণিককে বণিক্ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাহাতে নিরুদ্বেগে আস্থাস্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা ফিরিঙ্গি-বণিকের প্রকৃত স্বভাব অবগত ছিলেন। তাঁহারা যে ভূমধ্যসাগরে ধর্ম্মকলহের সহিত বাণিজ্যকলহ সংযুক্ত করিয়া মুসলমানের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সে কথা ভারতবাসী মুসলমানদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না। সরলস্বভাব কালিকট-রাজ তাঁহাদের এই সকল আশঙ্কাকে অমূলক বলিয়াই

বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ রাজার চিত্তবিকার উপস্থিত করিতে অসমর্থ হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত করিবার আশায়, এক অভিনব কৌশলের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলেন।

মুসলমানগণের উপদেশে কালিকটের পণ্যবিক্রেতৃগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য পণ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিল; অনভিজ্ঞ ফিরিঙ্গি বণিক্ তাহাই সহাস্যবদনে ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুসলমানগণ রাজাকে বুঝাইলেন,—নবাগত ফিরিঙ্গি বণিক্ বাণিজ্য-ব্যপদেশে দস্যুবৃত্তি করিতে আসিয়াছে; বণিক্ হইলে, অকর্ম্মণ্য পণ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিত না! ইহাতে কালিকটের প্রজাবর্গের লাভ হইতেছে বলিয়া, কালিকট-রাজ মুসলমানগণের প্ররোচনায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু মুসলমানগণ কলহের সূত্রপাত করিলেন। এই কলহে উভয়পক্ষেই রক্তপাতের আয়োজন হইয়াছিল; রাজা কলহনিবারণ না করিলে, প্রথম সন্দর্শনেই অনর্থ উৎপন্ন হইত। মুসলমানগণ আপাততঃ নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেও, মনে মনে বুঝিতে পারিলেন,—ফিরিঙ্গি বণিককে নির্ব্বাসিত করিতে না পারিলে, ভারতবাণিজ্যে মুসলমানের আধিপত্য বিলুপ্ত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। ফিরিঙ্গি বণিকও মনে মনে বুঝিলেন,—মুসলমানকে পরাভূত করিতে না পারিলে, ভারত-বাণিজ্যে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না। যেখানে হিংসাদ্বেষ অপরিচিত ছিল, সেখানে হিংসাদ্বেষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; যেখানে বাণিজ্যে বাহুবলের সংস্রব অপরিজ্ঞাত ছিল, সেখানে বাহুবলই প্রবল হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। তাহার জন্য রাজা প্রজা কেহই প্রস্তুত ছিলেন না; কেবল ফিরিঙ্গি বণিক্ তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন!

অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী পণ্যভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে কালিকট-রাজের নিকট উপঢৌকনদ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন; মৌখিক শিষ্টাচারের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না; পর্ত্তুগালরাজের নামে কালিকট-রাজ স্বর্ণপত্রে যে প্রীতিসম্ভাষণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন, ভাস্কো ডা গামা তাহা সর্ব্বসমক্ষে মস্তকে ধারণ করিয়া পোতারোহণ করিলেন। তথাপি এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব আশঙ্কা ভিন্ন অন্য কোনও কথা ভারতবর্ষে পরিজ্ঞাত হইল না। কোথায় পর্ত্তুগাল, কোথায় বা তাহার রাজধানী,—লোকে তাহার কোন কথাই বুঝিতে পারিল না। সমুদ্র-

গর্ভ হইতে অকস্মাৎ ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী দৃষ্টিপথে সমুদিত হইয়াছিল; তাহা আবার অকস্মাৎ সমুদ্রগর্ভেই বিলীন হইয়া গেল!

অনুসন্ধানবিমুখ ভারতবাসিগণ নানা অলীক কল্পনার অবতারণা করিয়াই নিরস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অল্পকালের অসম্পূর্ণ পরিচয়লাভেই ফিরিঙ্গি বণিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। এ দেশে যে সকল সেণ্ট-টমাস-সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান প্রজার বসতি ছিল, তাহারা হিন্দু রাজার উদার শাসননীতির কল্যাণে বিধর্ম্মী হইয়াও প্রভূত প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। তথাপি সে কথা বিস্মৃত হইয়া, ভারতপ্রবাসী খৃষ্টানগণ প্রথম সন্দর্শনেই ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষভুক্ত হইয়াছিল। গামা তাহাদের নিকট ভারত-বাণিজ্যের বিবিধ তথ্য লাভ করিয়া, বাণিজ্যবিস্তারের উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষে সেণ্ট-টমাস-সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টানদিগের বসতি না থাকিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে গৃহচ্ছিদ্রের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা উপস্থিত হইত না!

মালাবারের বিবিধ বন্দরে বিবিধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; সকল রাজ্যই ক্ষুদ্র রাজ্য; সকল রাজ্যই স্বতন্ত্র রাজ্য; সকল রাজ্যই বাণিজ্যলিপ্ত। উপকূল প্রদেশের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যের মধ্যে কলহ উত্থাপিত করিয়া, এক রাজাকে আশ্রয় করিয়া অন্য রাজাকে পরাভূত করিবার সম্ভাবনা ছিল। প্রথম সন্দর্শনেই ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষের এই গৃহচ্ছিদ্রের সন্ধানলাভ করিলেন!

অধ্যবসায়ে ও অকুতোভয়তায় বিশ্ববিজয় সাধিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস কেবল অধ্যবসায়ের ও অকুতোভয়তার ইতিহাস। ফিরিঙ্গি বণিকের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় কেবল তাহার কথাই পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া রহিয়াছে। অধ্যবসায় ও অকুতোভয়তা ভিন্ন রাজকুমার হেন্‌রীর অন্য সম্বল অধিক ছিল না। তিনি সেই সম্বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অভিনব জলপথের আবিষ্কারসাধনের জন্য যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত করিয়া ইহলোক হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে উন্মত্ত হইয়াই তাঁহার স্বদেশের নাবিকরাজ ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। এই অভিনব জলপথের আবিষ্কারসাধন সুসম্পন্ন হইবামাত্র, প্রাচ্যসাগরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া ভারতবাণিজ্যে প্রভুত্বলাভের আশায়, অভিনব অধ্যবসায় ও অকুতোভয়তা উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। ভাস্কো ডা গামা তাহার জন্যই মালা-

বারের উপকূলের অন্যান্য বন্দরের সন্ধানলাভ না করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না।

ভাস্কো ডা গামার বাণিজ্যতরণী কলিকট হইতে পশ্চিমাভিমুখে আফ্রিকার দিকে চালিত হইল না; তাহা দক্ষিণাবর্ত্তে পরিচালিত হইয়া, মালাবার উপকূলের অন্যান্য ক্ষুদ্র বন্দরের নিকট দিয়া কোচীন বন্দরে উপনীত হইল। এই বন্দরেও ফিরিঙ্গি-বণিক্ যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন। কোচীনরাজ শক্তিসামর্থ্যে কালিকট-রাজের সমকক্ষ না হইলেও, বাণিজ্য-গৌরবে আপনাকে কালিকট-রাজের সমকক্ষ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। তিনি অজ্ঞাতকুলশীল ফিরিঙ্গি বণিকের সৌভাগ্যবর্দ্ধনের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া পর্ত্তুগালরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, পর্ত্তুগালের বাণিজ্যোন্নতিসাধন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই বন্দর হইতেও বিবিধ পণ্যদ্রব্য ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণীতে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। অধিক বাণিজ্যশুল্ক লাভ করিবার লোভে মালাবারের বাণিজ্যবন্দরের রাজন্যবর্গ এইরূপে ফিরিঙ্গি বণিকের উৎসাহবর্দ্ধন না করিলে, প্রথম বাণিজ্যযাত্রাতেই ফিরিঙ্গি বণিক্ আশাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না। আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইবার পক্ষে বাধা বিঘ্নের অবধি ছিল না; তরঙ্গসংকুল অকূল সাগরে ক্ষুদ্র তরণী জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা ছিল; অপরিজ্ঞাত প্রাচ্য-সাগরে উদ্ধতস্বভাব মুসলমানগণের অত্যাচারে ফিরিঙ্গিগণের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবার আশঙ্কা ছিল; সুদূর সমুদ্রপথে সুদীর্ঘকাল পোতচালনা করিতে গিয়া পরিশ্রান্ত নাবিকগণের পক্ষে ব্যাধিযুক্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল; এরূপ বাণিজ্যযাত্রায় লাভ না হইলে, ব্যয়বাহুল্যে পর্ত্তু-গালের পক্ষে ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত হইবারও অসম্ভাবনা ছিল না। এরূপ অবস্থায় প্রথম বাণিজ্যযাত্রায় পণ্যসংগ্রহে অসমর্থ হইলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে পুনরায় ভারতযাত্রার আয়োজন করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। অশিক্ষিত কুসংস্কারান্ধ জনসমাজ ব্যর্থ বাণিজ্যযাত্রার নানা কাল্পনিক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের অধ্যবসায় অবসন্ন করিয়া দিত; ক্ষতিলাভ-গণনা-নিপুণ ধনকুবেরগণ অল্প দিনের মধ্যেই ভারতবাণিজ্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেন। প্রথম বাণিজ্যযাত্রা সফল হইল বলিয়াই, পর্ত্তুগালের পক্ষে বাণিজ্য-বিস্তারের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল।

প্রথম পরিচয়ে ফিরিঙ্গি বণিক্ লাভের লোভে অন্ধ হইলেও, প্রকাশ্যভাবে

বাহুবলের প্রয়োগ করিতে সাহসী হন-নাই। মুসলমান বণিগ্বর্গের বিদ্বেষ যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, বহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন ততই প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে বাহুবলে বিজয়লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ভারতবর্ষ হইতে আফ্রিকার উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র সাগরপথে মুসলমানের আধিপত্য; সে আধিপত্য চূর্ণ করিবার শক্তি না থাকায়, ভাস্কো ডা গামা যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিরন্তর প্রবল ঝঞ্ঝায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী নানারূপে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। পরিশ্রান্ত নাবিকবর্গ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, গামার বীর-হৃদয়ও বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সহোদর মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন! চারি মাস পোতচালনা করিবার পর, গামার তরণীসমূহ যখন আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী হইল, তখন অন্নজলের অভাবে উপকূলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। উপকূল সকল মুসলমানের অধিকারভুক্ত; তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। অবশেষে অনেক ইতস্ততঃ করিয়া গামা মেলিন্দা নামক বন্দরে উপনীত হইলেন। সেখানে প্রচুর অন্নজল সংগ্রহ করিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিবার আশায়, দক্ষিণাভিমুখে পোত-চালনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে দীর্ঘকালব্যাপী সমুদ্রভ্রমণের পর ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট তারিখে ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যতরণী পর্ত্তুগালে উপনীত হইল। যাহারা যাত্রাকালে দুই হাত তুলিয়া পর্ত্তুগালরাজকে অকথ্যভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছিল, তাহারা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,—গামার বিজয়তরণী সগর্ব্বে টেগস-নদের জলস্রোত অতিক্রম করিয়া বন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে! দেশের লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল; পণ্যবিক্রয়ের কোলাহলে পর্ত্তুগালের বন্দর মুখরিত হইয়া উঠিল; ভারত-বাণিজ্য পর্ত্তুগালের করতলগত হইয়াছে বলিয়া রাজা প্রজা সকলেই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। ভারত যাত্রার জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইয়া-ছিল, পণ্যবিক্রয়ে তাহার ষাটগুণ লাভ হইল! এত লাভের কথা কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে সাহস করে নাই। সমগ্র ইউরোপ যেন সাহসা পুলকিত হইয়া উঠিল; ভারতবর্ষ যে রত্নপ্রসবিনী, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। ভাস্কো ডা গামা বিবিধ রাজপ্রসাদ ও সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিলেন। রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া পুনরায় ভারত-যাত্রার আয়োজন

করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। পোপের শাসনপত্রে ভারত-যাত্রার নবাবিষ্কৃত জলপথে কেবল পর্ত্তুগালেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন পর্ত্তুগাল হইতে পণ্যক্রয়ের জন্য নানা দেশের বণিগ্বর্গ পর্ত্তুগালে উপনীত হইয়া, পর্ত্তুগালকে ইউরোপীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করিল। ভারতবর্ষ কোথায়, ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ,—সে কথা আর কাহারও অপরিজ্ঞাত রহিল না। সমগ্র ইউরোপে কেবল ভারতবর্ষের কথাই আলোচিত হইতে লাগিল। স্পর্শমণির স্পর্শলাভে লৌহখণ্ড সুবর্ণখণ্ডে পরিণত হয়,—ভারতবর্ষকে স্পর্শ করিয়া, পর্ত্তুগালের ক্ষুদ্র রাজ্য ইউরোপীয় সমাজে বৃহৎ বলিয়াই প্রতিভাত হইল! বাণিজ্যলুব্ধ নাগরিকগণ অভিনব রত্নখনির সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন; ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানগণ মুসলমান-দলনের অভিনব যুদ্ধক্ষেত্র সম্মুখে বর্ত্তমান দেখিয়া, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তরবারি শাণিত করিতে লাগিলেন!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

The eyes of the Malabar Princes were at length opened. Up to this time they had seen in their visitors only men urged by the desire of wealth, and anxious to gratify it in trading with India. Experience tore away the veil, and exposed the secret machinery of Portuguese policy.—*Portuguese Conquests in India.* *

উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া, ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে গমনাগমন করিবার অভিনব জলপথ আবিষ্কৃত হইবামাত্র, পর্ত্তুগালের অধীশ্বর "ইথিওপিয়া, আরেবিয়া, পারসিয়া ও ইণ্ডিয়ার বিজয়বিধাতা" এই অভিনব উপাধি গ্রহণ করিলেন! পোপ এই উপাধি প্রদান করায়, পর্ত্তুগাল-রাজের ভারত-বিজয়ের অদ্বিতীয় অধিকার সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইল। পর্ত্তুগালের অধীশ্বর এইরূপে অধিকারলাভ করিয়া, ভারত-বিজয়ের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ অর্ণবপোত সজ্জীভূত হইল; তাহাতে গোলা, বারুদ ও কামান উত্তোলিত হইল; যাহারা সুবিখ্যাত নাবিক,—সুশিক্ষিত সৈনিক, তাহারাই ভারত-যাত্রার জন্য নির্ব্বাচিত হইল।

* Lord of the conquest, Navigation and commerce of Ethiopia, Arabia, Persia and India.—*Danvere's Portuguese in India. Vol 1. 64.*

খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের জন্য সপ্তদশ ধর্ম্মপ্রচারক সজ্জীভূত হইলেন। পিড্র আল্‌ভারেজ কেব্‌রাল এই নৌবাহিনীর অধিপতি হইয়া ভারত-যাত্রায় বহির্গত হইলেন। ৮ই মার্চ্চ ১২০০ আরোহী লইয়া ত্রয়োদশ অর্ণবপোত যখন বিজয়-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন পর্ত্তুগালের অধীশ্বর স্বহস্তে নৌসেনাপতির হস্তে এক মন্ত্রপূত বিজয়পতাকা সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—"ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে সুসমাচার প্রচার করিবেন, তাহা গ্রহণ না করিলে, বিধর্ম্মিগণকে নিহত করিতে হইবে!" * খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের এরূপ অমোঘ উপায় যাঁহাদের ইতিহাস চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা কিরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

স্যার উইলিয়ম হণ্টার ভারতবর্ষের ইতিহাস-সংকলন করিবার সময়ে পর্ত্তুগাল-রাজের এই নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞার উল্লেখ করেন নাই। পর্ত্তুগালের ইতিহাস-লেখকগণ সগর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণও ইহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই!

আফ্রিকার পশ্চিমতটের নিকট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে পোতচালনা করিবার সময়ে, ঝটিকাবেগে পোত সকল পথভ্রষ্ট হইয়া, অন্য পথে ধাবিত হইতে লাগিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনাই পর্ত্তুগালের পক্ষে এক নূতন সৌভাগ্যলাভের কারণ হইয়া উঠিল। এপ্রিল মাসের শেষে নৌ-সেনাপতি দেখিলেন,—সম্মুখে এক নিবিড় বন;—তাহা ভারতবর্ষের তালবন নহে,—এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন রাজ্যের সমুদ্রসীমা! পর্ত্তুগাল এইরূপে যে রাজ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইল, তাহা এক্ষণে ব্রেজিল দেশ নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। একদিনে এই নূতন রাজ্য পর্ত্তুগালের অধিকারভুক্ত হইল,—কেবল বায়ুপ্রবাহের উচ্ছৃঙ্খল গতি এইরূপে অকস্মাৎ পর্ত্তুগালের সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিল! †

---

* On the 8th of March, the king, having heard Mass, in the Convent of Belem, placed a consecrated banner in the hands of Cabral, who accompanied by eight Fanciscan Missionaries was instructed to destroy all infidels, refusing to li ten to the christianity which the Friars preached.—*Portuguese Discoveries, P. 23-24.*

† Thus the immense Empire of Brazil, the brightest jewel in the Portuguese Crown, was won in a single day, Providence requiring

বিজয়-যাত্রার প্রথম উপক্রমে নবরাজ্যে পর্ত্তুগালের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নৌ-সেনাপতি পুনরায় উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভাস্কো ডা গামা যে পথে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নাবিকগণের অপরিচিত ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই পোতসমূহ তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। চারিখানি অর্ণবপোত পথভ্রষ্ট হইয়া অকূল সাগরে আত্মসমর্পণ করিল; অবশিষ্ট অর্ণবপোত সেপ্টেম্বর মাসে কালিকটে উপনীত হইল।

এবার ফিরিঙ্গি বণিক্ বীরবিক্রমে অগ্রসর হইয়াছেন; এবার কালিকটের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কামান সকল ভীমগর্জ্জনে নাগরিকগণের ভীতি-উৎপাদন করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের আগমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া দিল। ইহারা যে দুর্দ্দান্ত জলদস্যুমাত্র, মুসলমানগণ রাজাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞায় কালিকটের বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের একটি কুঠী সংস্থাপিত হইল। মুসলমানগণের উপদেশে পণ্যবিক্রেতৃগণ সাবধান হইল; তাহারা পুরাতন ক্রেতৃগণকেই পণ্যবিক্রয় করিতে লাগিল। কেব্রাল ইহাতে অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া, একখানি মুসলমানের বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠন করিলেন। মুসলমানগণ রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে ত্রুটি করিলেন না; ফিরিঙ্গি বণিক যে সত্য সত্যই জলদস্যুমাত্র, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজা তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি মুসলমানগণকে বলিলেন,—"তোমরাও যাহা করিতে পার, কর।" মুসলমানগণ এইরূপে স্বাধীনতালাভ করিয়া, নাগরিকবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী আক্রমণ করিয়া, কুঠীয়ালগণকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিলেন। তখন আর শান্তিসংস্থাপনের সম্ভাবনা রহিল না। ফিরিঙ্গি বণিক্ অর্ণবপোত হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া, নগর আক্রমণ করিলেন; মুসলমানের বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; জলে স্থলে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

নাগরিকগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন না। ফিরিঙ্গি বণিক্ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। বাহুবলের পরিচয়প্রদান করিবার উপযুক্ত অবকাশ উপস্থিত হইবামাত্র যুদ্ধ আরব্ধ হইল। মুসলমানগণের দশখানি পণ্যপূর্ণ বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠিত হইল। ফিরিঙ্গি বণিক্ সেই সকল অর্ণবপোতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। অসহায় নাগরিকগণ তীরে দাঁড়াইয়া এই সর্ব্বনাশ দর্শন করিতে লাগিল;

তখন তীরের দিকেও প্রচণ্ডবিক্রমে গোলাবর্ষণের সূত্রপাত হইল। কত লোক প্রাণত্যাগ করিল; কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল; কত লোক নগর-ত্যাগ করিল; নগরের একাংশ ভস্মীভূত হইয়া গেল! তখন ফিরিঙ্গি বণিক্ কালবিলম্ব না করিয়া, পলায়ন করিলেন; তাঁহাদের তরণীসমূহ কালিকট ছাড়িয়া কোচীন বন্দরে উপনীত হইল। কালিকট-রাজ এত দূর ভাবিয়া দেখেন নাই। এখন বন্দর-রক্ষার জন্য তাঁহাকেও আয়োজন করিতে হইল। জলদস্যু-দমন করিতে না পারিলে, বাণিজ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইবে; তাহা বুঝিতে পারিয়াই কালিকট-রাজ রণতরণী সজ্জীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, কোচীনরাজ সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কোচীন বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী সংস্থাপিত হইল; তাহাতে কুঠীয়ালগণ বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কোচীন-রাজকে কালিকটের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া দিবেন বলিয়া কেব্রাল স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিল, কালিকট-রাজের রণতরণী কোচীন আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছে! ফিরিঙ্গি বণিক্ এই সংবাদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কুঠীয়ালগণকে কোচীনে রাখিয়া, কোচীনের জনৈক ব্রাহ্মণকে অর্ণবপোতে তুলিয়া লইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন! * নানা ক্লেশে ছয়-খানিমাত্র অর্ণবপোত পর্ত্তুগালে উপনীত হইল।

ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে শান্তভাবে বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিবার অসুবিধা ছিল না। ফিরিঙ্গি বণিক্ সে পথে অগ্রসর না হইয়া যে পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহা পর্ত্তুগালের জনসাধারণের নিকট নিরতিশয় আপৎসংকুল বলিয়াই প্রতিভাত হইল। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিলেন,—ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইবে। কিন্তু পর্ত্তুগালের অধীশ্বর তাহাতে ভীত বা বিচলিত হইলেন না;—তিনি বাহুবলকেই প্রকৃত বল বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সুতরাং পুনরায় বাহুবলে কালিকট ধ্বংস করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। জলে স্থলে সমরঘোষণা না করিলে,

* The Admiral, "judging discretion the better part of valour", and avoiding the conflict, sailed for Lisbon, and left the Raja of Cochin to his fate.—*Portuguese Discoveries P. 25-26.*

ভারতবাণিজ্যে পর্ত্তুগালের অধিকার সংস্থাপিত হইবে না। এই বিশ্বাসে পর্ত্তুগালের অধীশ্বর বাহুবল-প্রয়োগের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে কালিকট-রাজের রণতরণীসমূহ কোচীন বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পলায়নবার্ত্তা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন কালিকট-রাজের নৌ-সেনাপতি কোচীন-রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ফিরিঙ্গি কুঠীয়ালগণকে ধৃত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কোচীন-রাজ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন কোচীন ও কালিকটের বাণিজ্য-কলহ সমর-কলহে পরিণত হইল। মালাবারের উপকূলে এইরূপে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহাতেই বাণিজ্যলক্ষ্মী ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইল। জলে স্থলে হিংসাদ্বেষ ও পরস্বাপহরণ প্রবল হইতে লাগিল। এই সময়ে পর্ত্তুগাল হইতে যে সকল বাণিজ্যতরণী সমাগত হইয়াছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোচীন-রাজ যত্ন করিতে লাগিলেন; কালিকট-রাজ তাহাদের ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। পর্ত্তুগালের বাণিজ্যতরণী কোনরূপে পর্ত্তুগালে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র পর্ত্তুগালরাজ কালিকট-ধ্বংস করিয়া অন্যান্য বন্দরের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন।

১৫০২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভাস্কো ডা গামা সসৈন্যে ভারতযাত্রা করিলেন। এবার কেবল ভারতবর্ষে যাতায়াতের অভিনব জলপথের আবিষ্কারকামনা তাঁহাকে ভারত-যাত্রায় উৎসাহযুক্ত করে নাই। এবার বৈরনির্য্যাতনের প্রবল উত্তেজনায় পার্ত্তুগীজ সেনাপতির ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল। গামা ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, কালিকট আক্রমণ করিয়া, নগর-প্রাচীরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন; বন্দরের মুসলমান বণিগ্বর্গের বাণিজ্য-তরণী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন, মালাবারের অন্যান্য বন্দরে উপনীত হইয়া, কুঠী সংস্থাপিত করিয়া, একটি কুঠীতে গোপনে গোলা, বারুদ ও কামান ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন; এবং তীররক্ষার্থ রণতরণী সংস্থাপিত করিয়া, কালিকটের রণতরণীসমূহ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাস্কো ডা গামা যেন দুর্দ্দান্ত জলদৈত্যের মত সর্ব্বত্র ধাবিত হইতে লাগিলেন। কালিকটের রণতরণী পরাভূত হইল। কালিকট-রাজের নৌসেনা গামার নিকট বন্দি-বেশে আনীত হইল। গামা ৮০০ বন্দীর নাসা কর্ণ ও হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া, তাহা উপঢৌকনস্বরূপ কালিকট-রাজকে প্রেরণ করিলেন।

হতভাগ্য বন্দিগণ ইহাতেও মুক্তিলাভ করিল না। কাষ্ঠফলকের আঘাতে তাহাদের দন্তপঙ্‌ক্তি উৎপাটিত হইতে লাগিল! এক জন ব্রাহ্মণদূত উপনীত হইবামাত্র, গামা তাঁহার কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া, তাহার স্থলে কুক্কুরের কর্ণ সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণদূতকে কালিকট-রাজের নিকট প্রেরণ করিলেন! এই সকল পাশব অত্যাচারের প্রতিবাদ করায়, গামার প্রধান পোতাধ্যক্ষ জনৈক মুসলমান বণিকের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া, তাঁহার মুখে শূকরের মাংস বাঁধিয়া দিলেন! ইতিহাসে এরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী অধিক লিপিবদ্ধ হয় নাই! এইরূপে দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন করিয়া, ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। ফিরিঙ্গি বণিকের নামে কালিকটের নাগরিকগণ শিহরিয়া উঠিল। কালিকট-রাজ বুঝিতে পারিলেন,—কোচীন-রাজের সহায়তা লাভ করিয়াই গামা এত দূর স্পর্দ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কোচীন বন্দর আক্রান্ত হইল;—কালিকট ও কোচীনের মধ্যে চিরশত্রুতা প্রতিষ্ঠিত হইল!

ভাস্কো ডা গামার স্বদেশীয় লেখকবর্গ তাঁহার এই সকল পাশব অত্যাচারের পক্ষসমর্থন করিয়াই ইতিহাসের রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উত্তরকালের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ ইহার পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ইহাকে কালধর্ম্ম বলিয়াই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। *

কালিকট-রাজের অপরাধ ছিল না; মুসলমান বণিকবর্গেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। কালিকট-রাজ ফিরিঙ্গি বণিকের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া মিত্রতারক্ষার্থ আপন প্রজাবর্গের প্রকৃত অভিযোগেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমান বণিকবর্গ প্রথমে ফিরিঙ্গি বণিককে আক্রমণ করেন নাই, তাঁহাদের বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠিত হইবার পর, তাঁহারা রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজা সে অভিযোগে কর্ণপাত না করায়, তাঁহারা ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী আক্রমণ করায় কুঠীয়ালগণ নিহত হন। বিচার

---

* It is unnecessary to multiply these frightful recitals, but it was requisite to give some idea of the arrogance and cruelty of the Portuguese conquerors. Of course, every attempt is made by their fellow countrymen to justify or palliate such atrocities as we have described. But though the bad faith of the Hindu monarchs and the perfidious insinuations of the Moors may explain the conduct of the Admiral, the spirit of his age can alone excuse it.—*Portuguese Discoveries. P. 32.*

করিয়া দেখিলে, ইহার জন্য কালিকট-আক্রমণের পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কিন্তু যে যুগে এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, সে যুগে ইউরোপের বিচারবুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই ;—তখনও বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসা করিয়া দিত,—তখনও পাশব অত্যাচারই বাহুবলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিচিত ছিল।

দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে উপনীত হইবামাত্র গামা কালিকট-রাজকে বলিয়া পাঠাইলেন,—মুসলমানগণকে চিরনির্ব্বাসিত না করিলে, কালিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। হিন্দুনরপতি মুসলমান প্রজাবর্গের বাণিজ্যরক্ষার্থ সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত না হইলে, কালিকট ধ্বংস হইত না। কিন্তু কালিকট-রাজ রাজধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া নগররক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতেই অনর্থ উৎপন্ন হইল। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,—যাহা চরিত্রগুণ, তাহার জন্যই কালিকটের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র।

হে কবি, হে পূজ্য কবি, চির-দুঃখিনীর
ভক্তিমান কীর্ত্তিমান কৃতজ্ঞ সন্তান!
অন্ধ আঁখি আজীবন ঢালি' অশ্রুনীর
ক্রীতদাসী জননীর হেরি' অসম্মান।
অক্ষরে অক্ষরে তব হৃদয়-রুধির
কি গৌরবে মহাযজ্ঞে করিছে আহ্বান!
নিরাশা নির্ভীক আজ—বিশ্বাস গভীর,
অন্ধ বর্ত্তমান হেরে ভবিষ্য মহান!

হে দরিদ্র, একদিন ক্ষোভে শোকে দুখে,
আলোড়িলে জীবনের উদ্দেশ্য অতল!
হে জয়ন্ত, তব যশো-মুকুট-ময়ূখে
জটিল কর্ত্তব্য আজ সরল উজ্জ্বল!
স্বর্ণ-সিংহাসনে নৃপ দুদিন জীবনে,
মরণে প্রতিষ্ঠ তুমি চির হৃদাসনে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রাচীন মিশরের ক্ষত্রিয়।

একদিন আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া অনার্য্যদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সেই সমরক্রীড়ায় বেদ-কথিত 'দস্যু'গণ পরাজিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ অপ্রতিহতবিক্রমে দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম অধিকার করিয়া দোয়াবখণ্ডে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা অধিক বলশালী ছিলেন, তাঁহারা ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া কালক্রমে অযোধ্যায়, কোশলে, উত্তর-বিহারে, বিদেহে ও বারাণসীতে কাশী-বংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন ভারতের সর্ব্বত্র আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্য আচার-ব্যবহার, আর্য্য রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত ও অনার্য্যদিগের উপর আর্য্যদিগের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল।

বিজিত বিধ্বস্ত অনার্য্যগণ তখন আর্য্যদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল ধারণ করিয়া ভিক্ষাপাত্রকরে আর্য্যদিগের কৃপাপ্রার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিল; আর দাসত্ব-শৃঙ্খল হেয় জ্ঞান করিয়া যাহারা প্রান্তরে, কান্তারে, শৈলে, সাগরে আশ্রয়গ্রহণ করিল, তাহারা প্রতিষ্ঠিত আর্য্যজাতির উপর অত্যাচার করিয়া, তাঁহাদিগের ধনরত্ন, গো, বৎস লুণ্ঠিত করিয়া 'দস্যু'-আখ্যায় পরিচিত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে এ কাহিনী চির-পুরাতন ও সদা সত্য। স্যাক্সন-দিগের শুভাগমনে ব্রিটনের যে অবস্থা হইয়াছিল, ব্রিটনের শুভাগমনে এক কালে আমেরিকাবাসীদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, লেসি-ডিমোনিয়নদিগের অনুগ্রহে স্পার্টার আদিম অধিবাসিবৃন্দের যে দশা হইয়াছিল,—আর্য্য-অনার্য্য-বিপ্লবে অনার্য্যদিগের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

যুদ্ধকলহ চিরদিন থাকে না; চিরদিন ছিল না। আর্য্য ও অনার্য্যের তপ্ত শোণিতে একদিন যে সকল ভূমি সিক্ত হইয়াছিল, কালক্রমে সে সমুদয় শুষ্ক হইল। বিজেতা আর্য্যগণ শান্তির স্নিগ্ধ শুভ্র আলোকে মঞ্জুকুঞ্জবনবেষ্টিত গৃহাদির নির্ম্মাণ করিয়া, উর্ব্বরা ভূমিতে শস্যের উৎপাদন করিয়া, গৃহধর্ম্মপালনে মনো-নিবেশ করিলেন। 'দস্যু'দিগের উপদ্রব তখনও তিরোহিত হয় নাই। কানন সংস্কৃত হইয়া গ্রামে পরিণত হইল, গ্রাম সমৃদ্ধিশালী নগরে উন্নত হইয়া আর্য্যগৌরবের ঘোষণা করিতে লাগিল,—দেশে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির সূচনা হইল; কিন্তু পলায়িত অনার্য্য-দস্যুদিগের অত্যাচার উপদ্রব তখনও কমিল

না। আর্য্যগণ আত্মরক্ষার উপায়-অবলম্বনে অবহিত হইলেন। তখনও আর্য্যসমাজের সকলেই যোদ্ধা।

তখন কতকগুলি সবলকায় সাহসী বীরপুরুষ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আর্য্য জাতির গ্রাম ও জনপদ, ধন ও রত্নের রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করিলেন। যখন আর্য্যগণ পঞ্চনদে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখনও রাজপদের তেমন সম্মান হয় নাই; তখন সকলেই বীর, সকলেই যোদ্ধা, সকলেই অস্ত্রধারণক্ষম। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, সমরাঙ্গণে যাঁহাদের দুন্দুভি-নিনাদে সমগ্র আর্য্য-বাহিনী পরিচালিত হইত, তিনি জেতার স্বাভাবিক সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এইরূপে, 'দস্যু'র অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যই এক সময়ে যাঁহারা অস্ত্রে শস্ত্রে কৃপাণে কার্ম্মুকে সর্ব্বদা সজ্জিত হইয়া সামাজিক শান্তি-সংস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহারাই কালক্রমে ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন; 'ক্ষত' হইতে আর্য্যকুলকে ত্রাণ করিতেন বলিয়া, তাঁহারা ক্ষত্রিয়-নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

দেখিতে পাওয়া যায়, মিশর-রক্ষার্থই মিশরের ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধৃজাতির উত্থান হইয়াছিল। পুরোহিতগণ ভারতের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, সুতরাং স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের রক্ষার্থ বেতনভোগী সেবকের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু মিশরীয়গণ বুঝিয়াছিলেন, সন্তান যেমন জননীর বেদনা দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, অর্থ-লুব্ধ বৈদেশিক-তনয় তেমন হইবে না;—তাই মিশরের ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু সর্ব্বদা যাহারা রণক্ষেত্রে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় আত্মবলিদানে প্রস্তুত, তাহাদিগের ভরণপোষণের ভার স্বদেশের উপর, তাহাদিগের অধিকার অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকার অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিল। তাহারা ঋণের দায়ে কখনই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত না। মিশরাধিপতি সেসষ্ট্রিস্ (Sesostris) অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে, মিশরের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি ক্ষত্রিয়সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যাহাদিগের কিছুই নাই, তাহারা তস্করের ভয়ে ভীত নহে; যাহার ধন আছে, তাহারই হারাইবার শঙ্কা অধিক। সুতরাং ভূম্যধিকারী হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের অন্তরে মিশরের প্রতি মায়া ও স্নেহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল,—পাছে হারাইতে হয়, এই ভয়ে তাহারা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত; মিশরের অরাতিকুল তাহা দেখিয়া নিরুৎসাহ হইত।

মিশরের সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ধর্ম্মে কর্ম্মে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার বিধান ছিল। মানবের চিত্ত বৃত্তিবিশেষ যদি বংশানুক্রমে উন্নতিমার্গে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে কালে সেই বিষয়ে তাহার বংশধরগণের শ্রেষ্ঠত্ব জন্মে, এই দার্শনিক তত্ত্ব মিশরীয়গণ অনেক দিন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন জাতিনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়েই লিপ্ত থাকিতেন। পুরোহিত-তনয় পুরোহিত হইত, ক্ষত্রিয়-সন্তান ক্ষত্রিয় হইত,—সে অস্ত্রধারণ করিয়া অক্লেশে সমরাঙ্গণে সুখ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সৌভাগ্যবান্ বলিয়া সুপরিচিত হইত, কিন্তু অন্য কর্ম্ম করিত না। তবে ভারতেও যেমন, মিশরেও তেমনই কখনও কখনও গুণ-কর্ম্মানুসারে নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইত; সে কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। মনুর বাক্য,—

> শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
> ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈব চ॥—১০।৬৫।

অথবা মহাভারতের,—

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥—শান্তিপর্ব্ব।

ভারতে যেমন, মিশরেও তেমনই প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

ক্ষত্রিয়ের শিক্ষার জন্য মিশরে রণ-বিদ্যালয় ছিল কি না, তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু ক্ষত্রিয়সন্তান পিতার অসি সগৌরবে ধারণ করিয়া স্বদেশের জন্য প্রাণপাত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। ইহা পূর্ব্বশিক্ষার ফল, সন্দেহ নাই; শৈশব হইতে শিক্ষা না পাইলে এরূপ ইচ্ছা বলবতী হয় না; অনেক সময় হৃদয়ের সাহসও কমিয়া যায়। তাই মনে হয়, মিশরে নিশ্চয়ই রণ-বিদ্যালয় ছিল। সেই সকল 'আখড়া'য় ক্ষত্রিয়সন্তানগণ অসি-চালন, সায়ক-নিক্ষেপ, লোষ্ট্র-চালন, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানা বিদ্যা শিক্ষা করিত।

রাজকীয় বিধি এইরূপ ছিল যে, প্রত্যেককেই সর্ব্বদা যুদ্ধাভিযানার্থ আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত, এবং প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ই নিজ ব্যয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার উপযোগী যাবতীয় অস্ত্রাদিও রাখিত। মুহূর্ত্তমাত্রে তাহারা যাহাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে, অথবা অভিযানে যাত্রা করিতে পারে, প্রত্যেক সৈনিকই সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিত। এই সকল কারণে ক্ষত্রিয় অলস হইবার অবসর প্রাপ্ত হইত না। তাহারা সর্ব্বদাই কর্ম্ম-লিপ্ত থাকিত।

সে কালে সমগ্র মিশরে Calasiriss এবং Hermotybies এই দুই ভাগে বিভক্ত ৪১০০০০ জন যোদ্ধৃপুরুষ ছিল। ইহাদিগের মধ্যে প্রতি বৎসর ১০০০ জন মিশরাধিপের শরীর-রক্ষক-স্বরূপ কার্য্য করিত।

প্রত্যেক সৈনিক ১২০০০০ হস্ত পরিমিত ভূমি জায়গীরস্বরূপ ভোগ দখল করিত; তাহারা যখন প্রকৃত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত, তখন প্রত্যেকে পাঁচ মিনি* রুটী, দুই মিনি পরিমিত গোমাংস ও দুই পাঁইট সুরা রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হইত। শান্তির সময়ে সৈনিকগণ স্ব স্ব জায়গীরে বসবাস করিত। সমৃদ্ধিশালী নগরের নানা প্রলোভনে ও কর্ম্ম-হীনতায় মানুষ অলস ও অমিতাচারী হয়, তাহাদের শারীরিক ও নৈতিক অবনতির পথ উন্মুক্ত হয়, তাই ক্ষত্রিয়গণ নগরে বাস করিতে পাইত না। কুচ কাওয়াজ, মল্লযুদ্ধ, সখের যুদ্ধ, যষ্টিক্রীড়া, লম্ফ ঝম্ফ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়ামে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া মিশরের ক্ষত্রিয় সৈনিকগণ মহানন্দে গ্রাম্যজীবন অতিবাহিত করিত।

মিশরে সেকালে উনিশ প্রকার পতাকা ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক সৈনিক-দলের পতাকা ভিন্নপ্রকার ছিল; স্ব স্ব পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন করিত,—এক জন যোদ্ধা জীবিত থাকিতে মিশরের পতাকা শত্রুহস্তে নিপতিত হইত না। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপনাদের বিজয়কেতনরক্ষার্থ সৈনিকগণ অসংখ্য অসমসাহসিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইত! একবার একটি যুদ্ধে মিশরের সেনাদল ক্রমেই বিদ্ধস্ত হইতে লাগিল; সেনাপতি কৌশলে স্বীয় জাতীয়পতাকা শত্রুব্যূহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; সৈনিকগণ যখন দেখিল, বিজয়লক্ষ্মী শত্রুকরতলগত, তখন তাহারা অমিতবিক্রমে অরিকুল ধ্বংস করিবার মানসে প্রমত্ত ভৈরবের মত ছুটিতে লাগিল, এবং অচিরে মিশরের জয়লাভ ঘটিল।

তখনকার যুগে নরহত্যার উপকরণ এখনকার মত এত অধিক ছিল না, এমন ভীষণও ছিল না! মিশরীয়গণ অসি, ধনুর্ব্বাণ, ভল্ল, ছুরি, ছোরা, কুঠার, যষ্টি প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। ধাতুনির্ম্মিত বর্ম্মে দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ আবৃত করিয়া, ধাতুনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণে মস্তকরক্ষা করিয়া, অসি-চর্ম্ম-হস্তে মিশরের ক্ষত্রিয় বীরগণ যখন সমরপ্রাঙ্গণে স্ব স্ব বিজয়পতাকামূলে সমবেত হইত, তখন মনে হইত, অসীম বীর্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি যেন মিশরের রাজসিংহাসনতলে

আত্মবলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তীক্ষ্ণ বল্লমহস্তে পদাতিকগণ, অসি-করে অশ্বসাদিগণ ও বাণপূর্ণ তূণ ও সুদৃঢ় কার্ম্মুকে সুশোভিত হইয়া নেতৃবর্গ দারুবিনির্ম্মিত দৃঢ় রথে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইত।

ভারতের ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মিশরের ক্ষত্রিয়কুলও ক্ষমাগুণে ভূষিত ছিল। তাহারা অযথা শোণিতপাত করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইত। অধুনা আমরা সভ্যতার পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, নরহত্যার স্রোত ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন জাপান হত্যাকাণ্ডের অভিনয়ে অপটু ছিল, তখন ইতিহাস তাহাকে 'অসভ্য' বলিয়াছে; কিন্তু আজ সেই জাপান সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে সুপ্রতিষ্ঠিত! মানুষ যত দিন অসভ্য থাকে, বর্ব্বর থাকে, তত দিনই অকারণে সকারণে শোণিতপাত করিয়া তৃপ্ত হয়; তত দিনই প্রতিশোধ অর্থে চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, কর্ণের পরিবর্ত্তে কর্ণ, শোণিতের পরিবর্ত্তে শোণিত লইতে চায়, ইহাই ইউরোপীয় অভিমত; কিন্তু সেই অসভ্যতা বর্ব্বরতার যুগেও, সেই মহাতিমিরের মধ্যেও, আমাদিগের ভারতেও যেমন, প্রাচীন মিশরেও তেমনই, দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে, ও সমরক্ষেত্রে আদৃত হইয়াছে। শত্রু বিপর্য্যস্ত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে বিজয়ী ক্ষত্রিয় তাহার সহিত আর যুদ্ধ করে নাই; শরণাগত হইলে শুশ্রূষা করিয়া তাহার রক্ষা করিয়াছে,—প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্রত্যাগ করিলে বিজয়ী বীর নিরস্ত্রের দেহে আর কখনই অস্ত্রাঘাত করে নাই! মিশরের ন্যায় ভারতেও ক্ষত্রিয় বহুকাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের আচার রক্ষা করিয়াছে।

শত্রুপক্ষের কত জন হত হইয়াছে, যুদ্ধান্তে তাহার সংখ্যা-নির্ণয় সর্ব্বদাই জেতার প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে;—তাই প্রত্যেক যুদ্ধের পর মিশরীয় সৈনিকগণ নিহত অরাতির হস্তচ্ছেদ করিয়া লইয়া আসিত; • রাজা স্বয়ং সেই সকল ছিন্ন হস্ত গণনা করিয়া দেখিতেন। যাহাতে সংখ্যা-নির্ণয় নির্ভুল হয়, সেই জন্যই এই উপায় অবলম্বিত হইত,—শত্রুর অপমানের জন্য এই বিধান কল্পিত হয় নাই। যুদ্ধান্তে মৃত শত্রুর অঙ্গচ্ছেদ, আবশ্যকবোধে মিশরবাসিগণ অন্যায় বলিয়া মনে করিত না। কিন্তু যে সেনাপতি যত অধিক বন্দী সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাঁহার প্রশংসা তত অধিক হইত। মিশরে ধর্ম্মভাব এত প্রবল ছিল যে, রণক্ষেত্রেও সেনাপতির পটবাসের নিকট শুদ্ধভাবে দেব দেবীর মূর্ত্তি রক্ষিত হইত,—ক্ষত্রিয়গণ ভক্তিভরে দেবতার চরণকমলে প্রণত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইত।

যুদ্ধ শেষ হইলে, সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে, পরস্ব-লুণ্ঠন ও নাগরিকদিগের উপর উপদ্রব চিরপ্রচলিত। মিশরেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত না;—রীতিমত লুণ্ঠন চলিত। কিন্তু অত্যাচার উপদ্রবের মাত্রা অনেক অল্প ছিল। বিজয়োন্মত্ত সৈনিকগণ দলে দলে অরাতিগণকে বন্দী করিত, এবং কথনও কথনও অযথা যন্ত্রণাও যে না দিত, এমন নহে। কিন্তু সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের তুলনায় এরূপ অত্যাচারের সংখ্যা সেই অসভ্যতা ও অন্ধকার যুগেও মিশরে অনেক অল্প ছিল। তাই এক জন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—

"But when we remember how frequently instances of harsh treatment have occurred, even among *Civilized Europeans*, at an epoch which deemed itself much more enlightened than the 14th Century before our era, we are disposed to excuse the *Occasional insolence of an Egyptian soldier*.

সমরে বিজয়লাভ করিয়া যখন মিশরের ক্ষত্রিয়বাহিনী মহোল্লাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তথন সমগ্র মিশর যেন আনন্দে সজীব হইয়া বীরের যথোচিত সম্মানবিধানে অগ্রসর হইত। বহুমূল্য উপঢৌকন সমভিব্যাহারে নাগরিকগণ বিজয়ী নৃপতির অভিনন্দন করিত; পুরোহিতগণ সমবেত হইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেন,—এবং নৃপতির গুণবর্ণনায় ব্যাপৃত হইতেন। বিজয়ী নরপতি রাজধানীতে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান দেবমন্দিরে যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা করিতেন; লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ও বন্দিগণ তাঁহার সম্মুখে আনীত হইত;—তিনি ভক্তিভরে দেবতার পাদমূলে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মন্দিরদ্বারে প্রণত হইতেন। ক্ষত্রিয়গণও সমবেত হইয়া সমরে বিজয়লাভের জন্য ও অক্ষত-সুস্থদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে বলিয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবপূজায় যোগদান করিত। পুরোহিতগণ প্রফুল্লহৃদয়ে সকলকে দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া, উল্লসিত সৈন্যগণমধ্যে দেবপ্রসাদ-বণ্টনে নিযুক্ত হইতেন। বন্দীকৃত অরাতিকুল মিশরে আসিয়া কৃতদাসস্বরূপ রাজসেবায় জীবনপাত করিত। তাহারা মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ, পরিখা-খনন, প্রাচীর-গঠন প্রভৃতি নানাবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিত।

অপরাধীকে সংশোধন করিবার জন্যই মিশরের বিচারকগণ অপরাধের দণ্ডবিধান করিতেন, অপরাধীকে যন্ত্রণা দিবার জন্য নহে। কোনও যোদ্ধৃপুরুষ অপরাধী হইয়া বিচারার্থ আনীত হইলে, দণ্ডস্বরূপ তাহাকে অপমানসূচক একটি বিশেষ পরিচ্ছদ সর্ব্বদা পরিধান করিয়া থাকিতে হইত—উহাই দণ্ডস্বরূপ গণ্য হইত। সেই হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অপরাধী সৈনিক

যখন তাহার সঙ্গিগণের নিকট গমন করিতে বাধা হইত, তখন অপমানে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাহার চিত্ত দগ্ধ হইত। সেই পরিচ্ছদ ধারণ করিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল ছিল না। অপরাধী যত দিন তাহার সদ্ব্যবহারে, কর্ত্তব্যপালনে ও আত্মানুশোচনায় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে তুষ্ট করিতে না পারিত, তত দিন শাস্তি ভোগ করিত। কিন্তু স্বদেশদ্রোহী ক্ষত্রিয়ের দণ্ড ভয়াবহ ছিল। রাজার বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইত না! যে কলুষিত জিহ্বা অক্লেশে স্বদেশের গুপ্তমন্ত্রণা শত্রুশিবিরে ব্যক্ত করিয়াছে, কঠোর রাজবিচারে সেই হীন জিহ্বা কর্ত্তিত হইত; জিহ্বাবিহীন হতভাগ্য তখন প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিত।

ভারতে রাজন্যজাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন,—

পঞ্চনদে প্রাদুর্ভাবের সময় রাজপদের তত সম্মান হয় নাই। সকলেই যোদ্ধা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, যাঁহার অধিনেতৃত্বে দেশ প্রদেশ করায়ত্ত হইত, তিনি নেতার স্বাভাবিক সম্মান পাইতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু গাঙ্গাপ্রদেশে প্রাধান্যলাভসময়ে আর্য্যদের এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। সাধারণ লোকেরা রাজাদের আড়ম্বর এবং স্ব স্ব অবস্থা হইতে তাঁহাদের ভোগবিলাসাদি বিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে এক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। এক দিকে সাধারণ লোকের অবনতি—অপর দিকে রাজাদের আড়ম্বরপ্রিয়তা, তাহার উপর পুরোহিতদিগের কল্পনা—এই তিনে মিলিয়া ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল।

গঙ্গাবারিবিধৌত শ্যামল সুন্দর গাঙ্গ্যপ্রদেশ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে করিতে অকুতোভয় আর্য্যগণের সাহস কমিয়া গিয়াছিল, শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে কৃপাণপাণির শৌর্য্যের, বীর্য্যের, তেজস্বিতার লক্ষণগুলি তাঁহাদিগের চরিত্র হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই রামায়ণ-পাঠে সামাজিকতার, সদ্বিচারের, মার্জ্জিত রুচির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারত-বর্ণিত সেই অসীম বীরত্বের প্রাণোন্মাদকারী দৃষ্টান্ত আর তেমন দেখা যায় না; তাই তখনকার যুগে কাশী ও বিদেহ মহা মহা পণ্ডিতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু সে যুগের ইতিহাসে বীরত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়।

পঞ্চনদের সেই সকল বিজয়ী আর্য্যগণ যে সকল সরল ঋক্ উচ্চারণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে, সরলহৃদয়ে, ভক্তিভরে দেবতাদিগের আবাহনগীত গাহিয়া পুলকিত হইতেন, গাঙ্গ্যপ্রদেশের শান্ত সুপ্ত কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় হিন্দুদিগের হৃদয়ে সে সমুদয়ের স্থান ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড-

প্রিয় হইয়া উঠিলেন; ধীরে ধীরে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, সংখ্যায় ও প্রতাপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, বংশানুক্রমিক পৌরোহিত্যের সৃষ্টি করিলেন!

মিশরেও কতকটা তাহাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু সাম্রাজ্যের সমগ্র-শক্তি যাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, কালক্রমে তাহাদিগেরই প্রাধান্য ঘটিল; ধর্ম্মভাব প্রবল থাকায় ব্রাহ্মণভক্তি তখনও পূর্ব্ববৎ ছিল, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ সিংহাসনারোহণ করিতে লাগিলেন—তাঁহাদিগকে বাধা দিবার আর কেহ রহিল না।

ভারতের ন্যায় মিশরেও কেবল যোদ্ধৃপুরুষ লইয়া দ্বিতীয় বর্ণের সৃষ্টি হয় নাই। যোদ্ধা, কৃষিব্যবসায়ী, মৃগয়াজীবী, নাবিক প্রভৃতিও এই দ্বিতীয় বর্ণের (ক্ষত্রিয়ের) অন্তর্গত ছিল। কৃষিজীবীরা ভূম্যধিকারী ছিল না;—তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অর্থশালী ছিল, তাহারা দেশের জমীদারদিগের নিকট হইতে ইজারা-স্বরূপ জমী লইয়া শস্য উৎপাদন করিত। তাহারা ভূম্যধিকারী ছিল না বটে, কিন্তু জমীদারের জমীতে আপন ইচ্ছামত যে কোনও প্রকার ফসল উৎপন্ন করিতে পারিত; জমীর অবস্থা, সারের অবস্থা, ফসলের অবস্থা, বীজের শক্তি প্রভৃতির পরীক্ষায় তাহারা এত দূর উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল যে; তৎকালে পৃথিবীমধ্যে তাহাদিগের সমকক্ষ আর কেহ ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মৃগয়াজীবিগণ ধনাঢ্যের আশ্রয়ে বাস করিত, এবং তাঁহাদিগের মৃগয়াকার্য্যের সহায়তা করিত; মৃগয়াকালে শিক্ষিত সারমেয় লইয়া তাহারাই অগ্রে অগ্রসর হইয়া শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিত। কেহ কেহ বা নানাবিধ বনবিহঙ্গম ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। কখনও কখনও অষ্ট্রিচ পক্ষী ধরিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করিত। নাবিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কতক বা সখের তরণী বাহিয়া ধনীদিগকে সন্তুষ্ট করিত, আর কতক দেশ হইতে দেশান্তরে পণ্যদ্রব্যাদি বহন করিয়া বেড়াইত। মিশরে যখন নৌ-বাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন দ্বিতীয় বর্ণের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নাবিকদিগের সম্মান অল্প ছিল না।

মিশরে যখন ক্ষত্রিয়বর্ণ সৌভাগ্যসম্পদে গৌরবান্বিত, তখন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যের পদ তাহারাই গ্রহণ করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণও একেবারে বঞ্চিত হইতেন না। এরূপ অবস্থা চিরদিন ছিল না। শাসনসংযমের ছায়াতলে ঈর্ষ্যা, বিবাদ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইতে

লাগিল; আত্মোৎসর্গ স্বার্থপরতাকে নিজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নীল নদীর নীরে নির্ব্বাণ লাভ করিল; স্বদেশহিতৈষণা ভীষণ স্বদেশদ্রোহের আবির্ভাবে ভীত চকিত হইয়া শৈলসমাকুল বনশ্রেণীমধ্যে লুক্কায়িত হইল; সিংহাসনপ্রার্থী ব্যক্তিবিশেষের লোভ ও স্বার্থের মন্দিরে সমাজের কল্যাণ আত্মবলিদান করিল। তখন শাসনদণ্ড আর পরহিতের জন্য উদ্যত রহিল না, পরপীড়ায় নিযুক্ত হইল; অর্থলুব্ধ বৈদেশিক যোদ্ধৃপুরুষগণ অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় মিশরের ক্ষত্রিয়কুলের সহিত যোগদান করিয়া অধিবাসীদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিল; ব্রাহ্মণে ভক্তি, তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় ও ধর্ম্মজ্ঞানে অসীম নির্ভর, তাঁহার উপদেশ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ শিরে গ্রহণ ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল; তখন কেবল রহিল বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ কতকগুলি ক্রিয়া-পদ্ধতি। যে ব্রাহ্মণ একদিন গুরুর উচ্চাসনে আসীন হইয়া দেশের কল্যাণকামনায় প্রাণমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার অঙ্গুলি-সঞ্চালনে এক দিন মিশরের সিংহাসন পরিচালিত হইত, ব্রাহ্মণের সেই অসাধারণ শক্তির চিতাভস্মের উপর শক্তিহীন তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের অস্নেহ প্রদীপ যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া জ্বলিতে লাগিল!

কেন এমন হইল? যে অখণ্ড ব্রাহ্মণ-প্রতাপ একদিন আসমুদ্র হিমাচল শাসন করিয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পরহিতব্রতে ব্যাপৃত থাকিয়া পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তকে স্বর্গাদপি গরীয়সী করিয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ-শক্তির সম্মুখে একদিন রাজসিংহাসন অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিত, যে ব্রাহ্মণ একদিন সংযমে, বিনয়ে, শিক্ষায়, জ্ঞানে সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, যাঁহার সৌম্য শান্তমূর্ত্তি এক দিন জীবন্ত দেবতাসদৃশ ভারতভূমে বিচরণ করিয়াছিল, তাঁহার এ দশা কেন হইল? যে পুরোহিত-সম্প্রদায় একদা মিশরের শিক্ষাগুরু ছিলেন, যাঁহার আশীর্ব্বচন লাভ করিয়া মিশরবাসী একদিন মৃত্যুকেও ভয় করিত না, যাঁহার আজ্ঞা একদিন ধর্ম্মগ্রন্থের ঈশ্বরাদেশস্বরূপ গণনীয় ছিল,—সেই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, সর্ব্বগুণে বিভূষিত, নির্লোভ, সাধু, সংযমী পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কেন এ দশা ঘটিল?

কুক্ষণে ভারতে গুরুদেব শিষ্যের উপর আস্থাশূন্য হইলেন, কুক্ষণে হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি আসিয়া গুরুর হৃদয় অধিকার করিল;—তিনি মনে করিলেন, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত বিধান আপনার মুষ্টিমধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবেন, অন্ধ শিষ্য-সম্প্রদায় নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া

তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত হইবে। ক্রমে ক্রমে তিনি শিষ্যের প্রতিভায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, অথচ প্রতিভার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন। গুণকর্ম্ম প্রভৃতি যে জাতিবিভাগের ভিত্তি, তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন। উদারতা যে ধর্ম্মের মূল, তাহা ভুলিয়া গিয়া তিনি ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিলেন; তিনি সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইতে লাগিলেন, যদি তাঁহার পুণ্যসিংহাসন সেবক কর্ত্তৃক অপহৃত হয়; তাই প্রতিভাবান্ ব্রাহ্মণেতর বর্ণ তাঁহার সন্দেহ-ভাজন হইল। এইরূপে সহস্র চেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠাকে সবলে টানিয়া রাখিতে চাহিয়া প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে চিরদিনের মত পতিত হইলেন। সে পতন কি ভয়ানক! আকাশের সূর্য্য যেন ভূমিতলে খসিয়া পড়িল! তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভাসিয়া গেল, সংযম লুপ্ত ও সংসার উৎপাতে পূর্ণ হইল! আর মিশরে, শিষ্য গুরুর শিরে আঘাত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিতে উদ্যত হইল! বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া যে দিন উন্মত্ত শিষ্য, সেবকের ধর্ম্ম ভুলিয়া, গুরুর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে চাহিল, সেই দিনই মিশরের জ্ঞান-গরিমায়-বিমণ্ডিত পৌরোহিত্য পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল; আর সেই ভস্মরাশির উপর শক্তিশালী, গর্ব্বিত, শিষ্য নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল! কিন্তু হায়! সে প্রাসাদ কত দিন অটুট ছিল? *

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

---

* স্নেহাস্পদ শ্রীমান রামকমল চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:— জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্যে" "প্রাচীন মিশরের পুরোহিত" নামক প্রবন্ধে দেখিলাম "পুরোহিতগণ Papyrus বৃক্ষের (পেঁপে গাছ) বল্কলে পাদুকা ব্যবহার করিতেন।" প্যাপিরস্ "পেঁপেগাছ" নহে। ইজিপ্টে Papyrus Egypticus নামে এক রকম Reed জলে হয়, এখানে Royal Botanical Gardenএ পুকুরে দেখিতে পাইবেন। পেঁপেগাছকে Carica Papaya (Pepiya) বলে পেঁপেগাছের কেন প্যাপ্যায়া নাম হইল, তাহা লিখিতে গেলে চিঠি বাড়িয়া যায়। বোধ হয়, লেখক Papaya থেকে Papyrusকে পেঁপেগাছ করিয়াছেন। John Hunter Balfourএর Elements of Botany 1869. P. 5. তে পড়িয়াছিলাম, Papyrus antiquorum, the bulrush of scripture. It grows in the Nile, and is used for making light boats." In Lucan's Pharsalia IV. 136, we meet with the Following—"Conseritur bibula Memphitis cymba Papyro." We may conclude that the ark in which the infant moses was laid in the Nile-an ark of bulrushes, daubed with slime and with pitch-was a small boat constructed with Papyrus. In Abyssinia, according to Bruce, boats are made of this Plant." * *

সহযোগী সাহিত্য।

জীবোৎপত্তি বিষয়ে নূতন মত।

কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস রসায়নাগারের অধ্যক্ষ অধ্যাপক জে-বটলার বার্ক-উত্তাপাতিশয্যে মাংসরস হইতে জীবাণু সকলের বিনাশসাধন সম্পন্ন করিয়া, তাহার উপর নবাবিষ্কৃত র‍্যাডিয়ম্ রশ্মি প্রক্ষেপ দ্বারা যে অপূর্ব্ব ভূতোৎপত্তির সমাধান করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞান-জগতে জীবোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে তুমুল তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছে। অধ্যাপক "বটলার" ডেলি ক্রণিকল্ নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রচারিত করিয়াছেন; তাহা পাঠে আমরা জানিতে পারি, তিনি যে ভূত-কণার আবিষ্কারক, তাহা ঠিক ক্রিষ্টালও (Crystal) নহে, এবং তাহাকে ব্যাক্‌টিরিয়াও (Bacteria) বলা যায় না। অধ্যাপক বার্কের মতে, এই কণা সকল এমন একটি পদার্থ, যাহা খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যবর্ত্তী স্তরে অবস্থিত। ফল কথা, তাঁহার বিবেচনায়, এই নবাবিষ্কৃত পদার্থ জীব ও জড়ের সীমান্ত প্রদেশে সন্নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

জীবের স্বতঃ-প্রবৃত্তি বলিয়া যে কথা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, পণ্ডিত বটলার বার্ক বলেন, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, জড় হইতে, অর্থাৎ জড়কে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া, জীবের প্রকাশ।

অধ্যাপক বটলার বার্ক আরও বলেন, তিনি যে ভূত-কণা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহার স্থাননির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে জানা উচিত, জীব ও জড় বলিতে আমরা কি বুঝি। রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ 'অ্যাটম'কে atom এই নিত্যপরিবর্ত্তনপরায়ণ জগতের আদ্যভূমি বলিয়া এত দিন স্থির করিয়া আসিতেছিলেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও পণ্ডিত ম্যাক্সওয়েল বলিয়া গিয়াছেন, এই প্রবৃত্তিপরায়ণ জগতে একমাত্র 'অ্যাটম' সকল খাঁটিবস্তু, বিধাতার টাঁকশাল হইতে যেমন বাহির হইয়াছে, তাহারা এ পর্য্যন্ত ঠিক সেই ভাবেই আছে, পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে। ইহাদিগের উপর কালের বিক্রম পরাহত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কথা আজকাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর স্বীকার করিতেছেন না। আট বৎসর হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছেন, 'অ্যাটম' হইতেও ক্ষুদ্রতর পদার্থ এ জগতে বিদ্যমান আছে। এই পরম সূক্ষ্ম পদার্থ সকল শক্তির দিক হইতে ইলেক্‌ট্রন্স (Electrons), এবং ঘটাবয়বের দিক হইতে 'আইয়নস্' (ions) এই নামে অভিহিত হইতেছে। সার্ অলিভার লজ বলেন, একটি জলজানের 'অ্যাটম' ৭০০ ইলেক্‌ট্রন্সের সমষ্টি। যদিও প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিদ্‌গণ রসায়নবিজ্ঞানের এই দীর্ঘকাল-সমাদৃত মতকে পরিগ্রহণীয় মনে করিতেছেন না, তথাপি ইহারা পরস্পর আর বিদ্বেষভাবাপন্ন নহেন। বরং মিলিত হইয়া বন্ধু ভাবে এক তত্ত্ব বস্তুর নির্ণয়ে আজ উভয়ে ব্যাপৃত।

যেমন ইহাঁদের মিলন সহজসাধ্য হইয়াছে, তেমনি জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের সহিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মিলন কি কখন সম্ভবপর হইবে না? [illegible]

মিলনের একমাত্র বিঘ্ন,—পরস্পরকে বুঝিতে না পারা। রসায়নবিদ পাস্তর, টিন্‌ড্যাল্‌ ও মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি—আমরা সকলেই কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সেবক নহি? কিন্তু আমরা কেন জীবতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত? জীবতত্ত্বের মধ্যে এমন সকল গম্ভীর রহস্য আছে, যাহা প্রত্যেক প্রাকৃতবিজ্ঞানবিদের পরিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমি যে ভূত-তত্ত্বের কথা বলিতেছি, আমার মনে হয়, তাহা জীবাণুও নহে, ক্রিষ্টালও নহে, তাহা ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত-প্রদেশস্থিত কোনও পদার্থ। বরং জীবাণুর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্যই অধিক। ক্রিষ্ট্যালের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মৎনির্ণীত রশ্মিকণা এতদুভয় বস্তু হইতে বহু পরিমাণে পৃথক্‌।

যত দিন পর্য্যন্ত না উচ্চশক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মিলিতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল রশ্মিকণার প্রকৃত পরিচয় সুকঠিন; তবে এরূপ অনুমান করিতে আর বাধা নাই যে, ইহা জীবাণু ও ক্রিষ্ট্যাল্‌ হইতে বিভিন্ন পদার্থ হইলেও, কতক কতক বিষয়ে উভয়েরই সদৃশ। আর ইহাও বলা অযৌক্তিক নহে যে, যদি জড় হইতে জীবের আবির্ভাব বাস্তবিক সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, এইরূপ প্রণালীতেই জড় হইতে কোনও অবিজ্ঞাত শক্তির জীব-রূপে প্রকাশ ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার অধিক আর বলা যায় না। বাষ্প ও জলের মধ্যবর্ত্তী একটি অবস্থা যেমন বিকল্পিত হয়, সেইরূপ, জীব ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা এই রশ্মিজাতকণা (Radiobes) জড় ও জীবের মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত সংগঠন করিয়া দণ্ডায়মান। র‍্যাডিয়ম আমার মতে, বিশিষ্ট অবিশিষ্ট দেহসম্পন্ন জড় ও জীবের মধ্যবর্ত্তী কোন পদার্থ। আমি স্পষ্টভাবে না হউক, সঙ্কেতে এইরূপ জানাইতেছি যে, যাহাকে আমরা প্রাণ বলি, তাহার মূল তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে হইলে এই রশ্মি-বিকীরণ ও তাহা হইতে উৎপন্ন কণা সমূহকে সেই অনুসন্ধানের ভূমি বলিয়া পরিগ্রহ করিতেই হইবে। আমাদের বাসভূমি এই বসুন্ধরা যখন দহ্যমান অবস্থায় অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে এই রশ্মিজাত কণা ব্যতিরিক্ত অন্য এমন কোনও আধারের কল্পনা করিতে পারা যায় না, যাহাতে প্রাণপ্রবাহ পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। যে জীব-প্রবাহ আমরা এখন দেখিতেছি, এই জীব-প্রবাহ তদনীন্তন সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যখন ইহা হইতে তেজোবিকীরণ আরম্ভ হইয়াছিল, তখনই সম্ভবতঃ জীব-প্রবাহ ইহাতে আবির্ভূত হয়।

এখন যদি আমরা এই কথা বলি যে, পরীক্ষিত কাচ-কূপীর অভ্যন্তরস্থিত মাংস-রস উত্তাপাতিশয্যে জীবাণুবিহীন করিলে, আর তাহাতে কোনরূপেই জীবাণুর আবির্ভাব হইতে পারে না, তাহা হইলে, ইহা বলাও অযৌক্তিক নহে যে, এই জগৎরূপী বৃহৎ কাচ-কূপী উত্তাপাতিশয্যে একবার জীবশূন্য হইলে, আর তাহাতে জীবপ্রবাহ সমুৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু যখন আমরা বুঝিতেছি, এই জগতে এক সময় নিকৃষ্টতর জীবরূপে জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন আমাদের পরীক্ষিত কাচ-কূপীতে যে জীবাণুর জন্ম হইতে পারে, আমরা এরূপ আশা করিব না কেন? কিন্তু যদি কোনও কারণে এই জীবোৎপত্তি না ঘটে, তাহা হইলে আমরা মনে করিব,

পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের পরীক্ষা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই, এই কথা বলিতে গিয়া, রশ্মি-বিকীরণ যে জীবোদ্ভবে অসমর্থ, এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক।

রশ্মি-বিকীরণ কোন স্থান ও সময়বিশেষে ঘটে এবং ঘটে না ইহা ঠিক নহে। অন্ততঃ ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই যে, যে সময়ে এ জগতে জীব-প্রবাহ ছিল না, সেই উত্তাপের আতিশয্যসময়ে যে এই তেজোবিকীরণ স্থগিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। অধ্যাপক হক্সলির পর হইতেই জড় পদার্থের এই তেজের বিকীরণশক্তি, এই জন্ম, বৃদ্ধি, অপক্ষয়াদি ভাব সকল, জীবের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, বিনাশের মত, সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

আমি যাহাকে রশ্মিজ কণা (Radiobes) বলিতেছি, তাহাতেও এই প্রবৃত্তি-শক্তি ত আছেই, তাহা ছাড়া জীবকোষের উৎপত্তিক্রমে যেমন স্বতঃবিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, ইহা-দিগের ভিতরও সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান দেখা যায়।

জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যে ব্যাপার স্থির করিতে না পারিয়া হতাশ ভাবে তাহার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের সাহায্যে আবার বিশ্লেষিত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে যতই কেন তর্ক বিতর্ক বা বিরুদ্ধ মত থাকুক না, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর যেমন মনে করিতেন, এক দিন এমন সময় আসিবে, জীব ও জাতির অভিন্নতা যখন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইবে, আমরা এখন দেখিতেছি, সেই সময় সমাগত প্রায়। অধ্যাপক হক্‌স্লি যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই মহাজনবাক্য, যাহা পুনঃপুনঃ সাহিত্যক্ষেত্রে উদ্ধৃত ও উচ্চারিত হইয়াছে, এখন আমরা দেখিতেছি, তাহা আর স্বকপোলকল্পিত নহে।

অধ্যাপক হক্‌স্লি বলিয়াছেন, যদিও এখন রসায়ন শাস্ত্র, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের কেবলমাত্র প্রারম্ভ, কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যখন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইবে, জড় হইতে জীব-প্রবাহ কিরূপে আরম্ভ হয়। অধ্যাপক হক্‌স্লির এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন কতকপরিমাণে আমরা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

অতীত কালের যবনিকার অন্তরালে কি প্রণালীতে জীব-প্রবাহ উঠিয়াছিল, যখন আমরা তাহার কোনও নিদর্শন পাইতেছি না, তখন কোন একটি বিশেষ প্রণালীর অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে, একটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা অন্যায় নহে। এই জন্য না হয় বলিলাম, এমোনিয়ম কার্ব্বনেট, অক্‌জেলেট, টারণারেট এলকালাইল, ফস্‌ফেট ও জল হইতে, আলোকের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে শৈবালের উৎপত্তির মত, হয় ত ইহা নিকৃষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল। না হয় স্বীকার করিলাম, সে সময় র‍্যাডিয়ম ছিল ; কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, মাংস-রস-এরূপ কাচ কিম্বা কুপীর মত কোনও আধার ছিল কি ? ইহার উত্তরে না হয় বলিলাম, যখন জীব-কোষ এখনও আছে মূলে জীবকোষের উপাদান সমান নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও প্রশ্ন হইতেছে, আমরা যে মাংস-রস হইতে ভূতোৎপত্তির পরীক্ষা করিতেছি, তাহার মধ্যে সেই সমস্ত উপাদানের প্রত্যেকটি বর্ত্তমান আছে কি ? এইরূপ বহু বহু প্রশ্নের সমাধান করা দুরূহ। তবে স্থূলতঃ এই কথা বলা যায় যে, রশ্মিবিকীরণ জীব ও জড় উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান, এই রশ্মি বা তেজোবিকীরণ রাসায়নিক ব্যাপার নহে, প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের ভিতরকারও কোন

শক্তির নামকরণ করেন Vital force প্রাণ বলিতে আমরা বুঝি বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের বিচ্ছেদহীন সামঞ্জস্য। এই শরীর যেমন অবিরত শীর্ণ হইতেছে, তেমনি সংহত হইতেছে। ইহা এক অনিত্য বিকার বা পরিণামপরায়ণ সংহনন। একবার গড়িতেছে, একবার ভাঙ্গিতেছে। সার্ অলিভার লজও এই কথায় অধিক শ্রদ্ধা স্থাপন করেন। এই কারণবশতঃ অবিকারী অপরিণামী ক্রিষ্টাল হইতে জীবকোষ বিভিন্ন। যাঁহারা ক্রিষ্টালকে জীবশ্রেণীতে গণ্য করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন প্রশ্ন হইতেছে, জলে দ্রব হইলে ইহাদের তেজ বা শক্তি বিনষ্ট হয় কি না?

জলের সহিত ইহাদের যেরূপ সম্বন্ধ, সে হিসাবেও ইহারা স্বতন্ত্র পদার্থ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বেলী দেখাইয়াছিলেন যে, কার্ব্বনেট্ অব্ লাইম্ ক্রিষ্ট্যাল জলে অদ্রবণীয়, সুতরাং র্যাডিয়ম নিক্ষিপ্ত কণা সকল জলে দ্রবণীয় বিধায় কখন উক্ত ক্রিষ্টাল নহে। কার্ব্বনেট অব লাইম্ ক্রিষ্ট্যাল না হউক, ইহা হয় ত আর কোনরূপ ক্রিষ্ট্যাল, এ কথা বলিলে তাহার উত্তর কি? উত্তর এই যে, এরূপ বস্তুর কথা আমি ত জানি না এবং এ সম্বন্ধে যাঁহাদের কথা প্রামাণ্য, তাঁহাদের নিকট হইতে এরূপ কোনও অস্তিত্বের বিষয় এ পর্য্যন্ত শুনি নাই।

জলে দ্রবণীয়তা যে প্রথমস্তরের জীবের ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহা কে বলিল? এই দেখুন ক্রিষ্ট্যালের পেপ্‌টন্ জলে দ্রবণীয়, এবং উত্তাপে জমিয়া যায় না। সুতরাং ইহা এই ধর্ম্ম প্রযুক্ত অন্যান্য albuminus বা proteid পদার্থ, যাহা পেপ্‌সিন বা অন্য কোনরূপ কিম্ব সংযোগে peptonএ পরিণত হইতে পারে, তাহা হইতে বিভিন্ন র্যাডিয়ম অদ্রবণীয় বলিয়া protend কে জলের সাহায্যে দ্রবণীয় pepton রূপে পরিণত করিতে সমর্থ।

সেস্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে কণা সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সূক্ষ্মতা হিসাবে তাহারা আমার এই কণা সকলের সদৃশ, এই পর্য্যন্ত। অন্য কোনও বিষয়ে ইহাদের পরস্পরের মিল নাই।

এখন ষ্টারালাইজেসনের সম্বন্ধে আপত্তি। প্রথম কথা টিউব সম্বন্ধে। টিউব রীতিমত Sterilized করা হয় নাই। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, হইয়াছে কি না হইয়াছে, তাহা ফলেই সপ্রমাণিত হইবে।

দ্বিতীয় কথা, না হয় মনে করিলাম, টিউব Stirilized হইয়াছে, কিন্তু মাংসরস ভাল করিয়া Stirilied হয় নাই। যদি না হইবে, তাহা হইলে ব্যাক্‌টিরিয়ার আবির্ভাব অবশ্যই হইত। যদি বলা যায় যে, ইহা এক প্রকার নূতন ব্যাক্‌টিরিয়া যাহা র্যাডিয়মের উত্তাপেও বিনষ্ট হয় না, তাহা হইলে, আমার উপপত্তিতে কোনও ক্ষতি হইতেছে না। আমি বলিতেছি, ইহারা বাক্‌টিরিয়া নহে। আর অন্য কোনরূপ বাক্‌টিরিয়া যে আছে, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। জড় হইতে জীবোৎপত্তি যিনি বুঝিলেও বুঝিবেন না, তাঁহাকে বুঝান আমার পক্ষে অসম্ভব। যিনি বলিবেন, উত্তাপ যতই কেন তীব্র হউক না, কোনও বস্তুই একেবারে জীবাণু-পরিশূন্য হয় না, জীবাণু অদাহ্য পদার্থ, এ প্রকার তর্ক দার্শনিকদিগেরই উপযুক্ত, কিন্তু ইহাতেও আমার কথা অপ্রমাণিত হইতেছে না। আমি স্বতঃ প্রবৃত্তি অর্থে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে, জড় হইতে অপ্রকাশিত জীব-প্রবাহের প্রকাশ এইরূপ অর্থই মনে আসে। জীবের উৎপত্তি কিংবা প্রাণের আবির্ভাব কেমন করিয়া হয়, তাহা বলা আমার অভিপ্রেত নহে, জড় হইতে কেমন করিয়া

জীবলক্ষণাক্রান্ত পদার্থের প্রকাশ হয়, ইহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। সেই জন্য আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, যখন আমরা কোনও বিষয় বর্ণনা করিব, তখন প্রথমতঃ, ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা আগে নির্ণয় করা চাই, নতুবা ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। এক "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুম্" দেখিয়া প্রবাসী যক্ষের বিরহ উথলিয়া উঠিয়াছিল, আর সন ১৩১২ সালের এই আষাঢ়ে এক জন প্রচ্ছন্ন কবির যশোহর-বিরহ উথলিয়া উঠিয়াছে। সেই বিরহের কাব্য "যশোহর" এবারকার ভারতীর মুকুটে পরিণত হইয়াছে। কবিরা নিরঙ্কুশ, সুতরাং ভারতীর কবি ব্যাকরণের দাস হইতে পারেন না; নিজেই সমাস ও সন্ধির নূতন নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া লিখিয়াছেন,—"তাহারই মহিমাস্মৃতি যশোপ্রভোজ্জ্বল।" কি উৎকট শব্দচয়ন! অবশ্য ঈষৎ-পরিবর্ত্তিত মেঘদূত হইতে নজীর তুলিয়া অনায়াসে কবির পক্ষসমর্থন করা যায়,—"শোকার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনা-চেতনেষু।" মারাঠী সাধু তুকারাম একটি 'অভঙ্গে' আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই 'অভঙ্গ'টির অনুবাদ ও তুকারামের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনুবাদের অমিত্রাক্ষর ম্যালেরিয়া রোগীর মত দুর্ব্বল। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্যের "পাণিনি-তত্ত্ব" প্রবন্ধে পাণিনি ব্যাকরণের পরিচয় আছে, কিন্তু প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য,—পাণিনির সময়ে লিপিপ্রণালী ছিল কি না, অবান্তর প্রসঙ্গের অরণ্যে তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলাম না। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল "ভারতের কলকারখানা" প্রবন্ধে বাঙ্গলা ভাষা লইয়া অনেক কারখানা করিয়াছেন; যথা,—"সুয়েজ খাল উন্মুক্তের পর হইতে" ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্তের "শিগো-ষুহে" একটি সঙ্কলিত প্রবন্ধ। ভারতীর কুঞ্জে "শিগো-ষুহের" বাসা কেন? এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "মহানাটকে"র অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অটল অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, কিন্তু অনবরত পরিশ্রমে বোধ করি তাঁহার লেখনী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই অনুবাদের ভাষা এত দুর্ব্বল ও ছন্দোবন্ধ এমন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 'কৈলাসে'র পরিবর্ত্তে 'কইলাসে', সৌরভের পরিবর্ত্তে 'সউরভ' প্রভৃতি অত্যন্ত অশোভন মনে হয়। সে কালে পাদপূরণের জন্য চ বৈ তু হি চারি ভাই ছিল, এ অনুবাদে একলা 'গো' চারি জনের খাটুনি খাটিতেছে। "আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে" শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের "পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস" উল্লেখযোগ্য। "খেয়াল-খাতা"য় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "কৃষক ও পলিটিসিয়ান" পড়িয়া আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যতীন্দ্রবাবুর ন্যায় চিন্তাশীল সুলেখক ব্যক্তি এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হইলেন কেন? মৈমনসিং মুক্তাগাছা হইতে আমাদের এক জন সদাশয় সুশিক্ষিত জমীদার বন্ধু "বঙ্গ সমাজে লোকের অনুরোধ" এ সম্বন্ধে আমাদিগকে

পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"আষাঢ় মাসের ভারতীর খেয়াল-খাতায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় 'কৃষক ও পলিটিসিয়ান' শীর্ষক একটি অদ্ভুত চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। খেয়ালীর চিত্র যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা হয় ত ঠিকই হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে নিরপরাধ সম্ভ্রান্ত লোককে অযথা হাস্যাস্পদ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া কেহ কেহ অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ যতীন্দ্রমোহন বাবু গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া থাকেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিলেও তত দোষের হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন না। গায়ে পড়িয়া জোর করিয়া কতকগুলি তথাকথিত রসিকতার চর্ব্বিতচর্ব্বণ না করিলেও খেয়ালী লোকের খেয়ালের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই; এবং ভারতীর প্রবীণা সম্পাদিকাও স্থান পূর্ণ করিবার জন্ত আবর্জ্জনার অভাবে পড়িতেন না। পৃথিবীর সমস্ত কাজই সকলের অনুমোদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। সমালোচনাও সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। কিন্তু মাসিক বা স্থায়ী সাহিত্যে দায়িত্বহীন অর্ব্বাচীনতার স্থান হওয়া সঙ্গত বোধ হয় না।" ইহার উপর আর টীকা অনাবশ্যক।

বঙ্গদর্শন। আষাঢ়। এই সংখ্যায় "নৌকাডুবি" সমাপ্ত হইল। অধ্যাপকের "ইৎ-সিং" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপ" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর "আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র" নামক সুলিখিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ত্রিবন্ধুর' সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "নবজীবনের আদর্শ" হালের 'ফেশ্যান' অনুসারে বেওয়ারিশ বেদান্তের উত্তুঙ্গ শিখরে প্রতিষ্ঠিত, অত্যন্ত উচ্চ, গুরু গম্ভীর গবেষণায় পূর্ণ, সাধারণ পাঠক পরিপাক করিতে পারিবে না। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর "উপাধি-ব্যাধি" প্রবন্ধে নানা রসের অবতারণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঠাকুরজীর নিজের আত্মসম্মানজ্ঞানের আলোকে ও তাঁহার পরিচিত বড়লোকদিগের আত্মসম্মানপরাঙ্মুখতার ছায়ায় "উপাধি ব্যাধি"র চিত্রগুলি পরম রমণীয় হইয়াছে। "শেষ খেয়া" কবিতাটির—

ঘরেই যারা যাবার তারা গিয়েছে চলে ঘর পানে,
পারেতে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নয় পারেও নয় যে জন আছে মাঝখানে,
সন্ধ্যা বেলায় কে ডেকে নেয় তারে।

ঠিক হেঁয়ালীর মত মনে হয়।

প্রবাসী। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী "স্বদেশী ধূয়া" প্রবন্ধে বাঙ্গালীকে সভা করিয়া স্বাবলম্বন শিখিতে বলিতেছেন। উত্তম। ইহার পর তেল মাখিবার, স্নান করিবার, ভাত খাইবার, হাঁই তুলিবার, নিদ্রা দিবার জন্যও ভিন্ন ভিন্ন সভার প্রতিষ্ঠা না করিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "উভয়বাহুদক্ষতা" ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণতা" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। রচনাদ্বয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব নাই। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "খোলফায় রাশেদীন" উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের "চীন দেশের নাট্যাভিনয় সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "মুক্তি" নামক গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "প্রবাসী বাঙ্গালী" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে এবার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকসমাজকে উপকৃত ও আনন্দিত করিয়াছেন।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রামের প্রভাব।

বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে লোকের অত্যন্ত বিরূপ ধারণা ছিল। বটতলার প্রকাশকগণের প্রকাশিত কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি কয়েকখানি পুঁথি ব্যতীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর কোনও গ্রন্থ আছে, তাহা সাধারণের স্বপ্নের অগোচর ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালারও একটা সাহিত্য ছিল, এরূপ কল্পনাও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। আধুনিক সাহিত্যের মত প্রাচীন সাহিত্যেও যে সহস্র সহস্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা দূরে থাকুক, অনেকে বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগকেই বঙ্গভাষার জন্মদাতা বলিয়া মনে করিতেন। এখন আর সে দিন নাই। এখন আমাদের মাতৃভাষা প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত,—মেঘমুক্ত তপনের ন্যায় কিরণমালায় বঙ্গীয় সাহিত্য-গগন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে!

বর্ত্তমান কালে বহুতর মনস্বী ও পণ্ডিত বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়া এক দিকে ইহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব-বর্দ্ধনে একান্ত যত্নপর; অপর দিকে বিলুপ্ত-প্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়া ভাষার অঙ্গ-বৈকল্য-দূরীকরণে বদ্ধ-পরিকর! ইতিপূর্ব্বে অবহেলা ও অনাদরে আমরা প্রাচীন সাহিত্যের বহুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রাচীন সাহিত্যে লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন প্রায় সকল জেলাতেই প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা হইতেছে। অনেক জেলায় সাহিত্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সকল সভায় বর্ত্তমান সাহিত্যের সহিত প্রাচীন সাহিত্যেরও অনুশীলন হইতেছে। দুঃখের বিষয়, কেবল দুর্ভাগ্য চট্টগ্রামই এই বিষয়ে আজও নিশ্চেষ্ট।

প্রাচীন সাহিত্যে এত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল যে, আরও দুই যুগ অব্যাহতভাবে অনুসন্ধান কার্য্য চলিলেও, সমস্ত গ্রন্থের উদ্ধার হইবে কি না, বলা যায় না। কত গ্রন্থ এখনও গৃহস্থের নিভৃত নিকেতনে কাষ্ঠচাপে আবদ্ধ থাকিয়া কীটকুলের ও হুতাশনের আহার ও আহুতি যোগাইতেছে, তাহা কে বলিবে? চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন তুলোট কাগজে

লিখিত অসংখ্য পুঁথি বিরাজ করিতেছে, কে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেশের গৌরববর্দ্ধনে প্রয়াসী হইবেন? চট্টলে অধুনা শিক্ষিত লোকের অসদ্ভাব না থাকিলেও, মাতৃভাষার সেবায় কাহারও অনুরাগ নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিতগণ অর্থের মায়ায় এত বিমুগ্ধ যে, তাঁহারা যেন মনে করেন,—অর্থ ভিন্ন এ জগতে অপর কোনও কাম্য বস্তু নাই! আমাদের একমাত্র সাপ্তাহিক "জ্যোতিঃ" পত্রিকাখানিও লেখকের অভাবে সুচারুরূপে চলে না; সম্পাদক মহাশয়ের অসুখ হইলে প্রবন্ধাভাবে পত্রিকার প্রকাশ স্থগিত হয়। ইহা কি দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও কলঙ্কের কথা নহে? অধুনা লোকান্তরিত প্রতিভাশালী নবীন যুবক নলিনীকান্ত সেনের অকাল-বিয়োগে তাঁহার সাধের "আলো"খানি প্রবল দৈব বাত্যায় নিভিয়া গেল। এত দিনেও তাহার পুনরুজ্জীবনে কেহই অগ্রসর হইলেন না।

প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে আমরা অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছি। বর্ত্তমান কালে চট্টগ্রামে বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোক থাকিলেও, সাহিত্য-জগতে আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছা কিরূপ, জানি না; কিন্তু অবস্থা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত নিরাশ হইতে হয়।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে আমাদের চট্টগ্রামের প্রভাব কত দূর, তাহার বিচারের আজও সময় হয় নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, আমাদের একমাত্র নবীনচন্দ্রের উজ্জ্বল মধুর স্নিগ্ধ আলোকেই সমগ্র পূর্ব্ব গগন সমুদ্ভাসিত। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট নহে। প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রামের প্রভাব কিরূপ, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে, এমন কি, ঘরে ঘরে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভূত উপকরণ বিদ্যমান থাকিলেও, তাহার প্রতি দুর্ভাগ্য দেশের কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। কেবল স্বর্গীয় নলিনী বাবুর দৃষ্টিই সে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে নিষ্ঠুর কাল আমাদের আশালতার মূলোৎপাটন করিল। চট্টগ্রামে এত সাহিত্যোপকরণ আছে যে, এক জন কেন, বহু জনের চেষ্টাতেও সে সকল সংগৃহীত হইতে অনেক দিন লাগিবে। এই সকল উপকরণ হস্তগত না হইলে, প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রামের প্রভাব কিরূপ, তাহা নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, আমরা তাহারই কতকটা আভাষ দিবার চেষ্টা করিব।

পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, আমি,—ক্ষুদ্রশক্তি দরিদ্র সাহিত্য-সেবক,—কেবল স্বীয় চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত পাঁচ শতের অধিক বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুঁথি, সন্দর্ভপুস্তক ও প্রায় ১৫০ জন কবির পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। ইহার মধ্যে অবশ্য অনেকগুলি বিদেশীয় কবি আছেন ; কিন্তু অবশিষ্ট সকলে চট্টগ্রাম-বাসী না হউন, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

প্রাচীন সাহিত্যে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরম মনোজ্ঞ। কিন্তু চট্টলে বৈষ্ণবধর্ম্ম ততটা অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে নাই বলিয়া, চট্টগ্রামে বৈষ্ণব কবির সংখ্যা অল্প। অন্য জেলার সহিত তুলনায় এ কথা বলা যাইতেছে। নতুবা যত জন বৈষ্ণব কবি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছেন, তাহাই চট্টগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থই চট্টগ্রামে অধিক।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন কবিগণ ধর্ম্ম-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। বোধ হয়, তাঁহাদের সে সাহসও ছিল না। এই কারণেই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রায় সমস্ত প্রতিপাদ্যই ধর্ম্ম। প্রাচীন সাহিত্যে এক একবার এক এক জন দেবতার প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, মনসা ও চণ্ডীর প্রভাবই যে, প্রাচীন সাহিত্যে অধিক, তাহা দীনেশ বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতাগণের প্রভাব অল্প বটে, কিন্তু তাঁহাদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থও বাঙ্গালায় বিরল নহে। আমরা এ দেশে অনেকগুলি দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থ বা কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা হইতে জানা যায়, চট্টগ্রাম এক সময়ে ধর্ম্মের আগাছায় আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা মানব-মনে যে সংস্কার-বীজ উপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন এরূপ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে যে, তাহার উচ্ছেদসাধন অসম্ভব। কুসংস্কার কি ভক্তির বশে জানি না, হিন্দুগণ মুসলমানের পীরের, মুসলমানগণ হিন্দুর দেবতার, পূজা করিতে কুণ্ঠিত বা বিরত হন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজও চট্টগ্রামে মুসলমানের মধ্যে কেহ কেহ কাত্যায়নীর ব্রত পালন করে ; অনেক হিন্দুও সত্যপীর, মাণিক-পীর ইত্যাদির সিন্নি দিয়া থাকে। অতি অল্প দিন হইল, মুসলমান-সমাজ হইতে 'মনসা-পূজা' লোপ পাইয়াছে, এবং হিন্দুসমাজ হইতেও 'গাজী-কালু'র সম্মাননা উঠিয়া যাইতেছে। সেকালে শিক্ষার প্রসার এত অধিক

ছিল না। দুঃখের বিষয়, শিক্ষাবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই অধুনা এই দুই জাতির মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে।

প্রাচীন কাল হইতেই চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক লীলাক্ষেত্র। এ দেশে কতবার কত রাজবিপ্লব ঘটিয়াছে। মগে মুসলমানে, ইংরেজ পর্টুগীজে, চট্টগ্রামে আত্ম-প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টায়, কতবারই সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিরন্তর এইরূপে সংঘর্ষে পীড়িত হইয়াও চট্টগ্রামবাসিগণ ভুবনদুর্লভ কাব্যামোদের উপভোগে কখনও বঞ্চিত হয়েন নাই। সাহিত্যামোদ-উপভোগে তাঁহাদের প্রবৃত্তি প্রবল ছিল বলিয়াই, প্রাচীন কালে চট্টগ্রামে বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। এখানে প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধান এখনও রীতিমত হয় নাই। রীতিমত ও ভালরূপ সন্ধান হইলে আরও কত কবি অজ্ঞাতবাস হইতে লোকলোচনের গোচরীভূত হইবেন, কে জানে? যে সকল কবিকে আমরা খাঁটি চট্টগ্রামবাসী বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই তালিকায় দৃষ্ট হইবে, আমরা অকারণে চট্টগ্রামকে সাহিত্য-জগতে অগ্রগণ্য বলি নাই। স্থানের সংকীর্ণতা হেতু এখানে কোনও কবির বা কাব্যের বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না।

১। কবি শঙ্কর দাস।

ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'জাগরণ'। ইনি পটীয়া থানার অন্তর্গত 'ছনহরা' গ্রামের বিশ্বাস-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড,—প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 'জাগরণ' আজও অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে স্থানীয় 'জ্যোতিঃ' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা হইয়াছিল। সাহিত্য-রাজ্যে এই গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চ বলিয়া মনে হয়।

২। কবি মুক্তারাম সেন।

ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'সারদা-মঙ্গল'। ইহা একখানি চণ্ডী-কাব্য। ১৩৬৯ শকাব্দায় সারদা-মঙ্গল রচিত, একটি শ্লোকে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। তাহা সত্য হইলে, ইহাকে বাঙ্গালার আদি চণ্ডীকাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর; কিন্তু কবিকঙ্কণ ইত্যাদির কাব্য অপেক্ষা

আছে। আনোয়ারার প্রসিদ্ধ সেন-বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা আজও শূন্য পড়িয়া আছে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজলাল সেনও এক জন কবি ছিলেন। 'সারদামঙ্গল' আকারে তেমন বৃহৎ নহে।

৩। কবি ভক্তরাম দাস।

রচিত গ্রন্থের নাম 'গোকুল-মঙ্গল'। ইহা ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ, বা তদবলম্বনে লিখিত। প্রথম ও শেষ পাওয়া না গেলেও, ইহার বৃহত্ত্ব দেখিলে ভয় পাইতে হয়। কবির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তিনি যে চট্টগ্রাম-বাসী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া ইহাকে ২০০।২৫০ বৎসরের প্রাচীন মনে করা যায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্যে' একবার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

৪। কবি ব্রজলাল সেন।

ইনি 'চণ্ডী-মণ্ডল' নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কাব্যখানি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় নাই। ইনি পূর্ব্বোক্ত কবি মুক্তারাম সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অদ্যাপি তাঁহার বংশ বর্ত্তমান। কাব্যখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর।

৫। কবি ফকীর চাঁদ।

'সত্যপীরের পাঁচালী' নামক গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। ইহাতে সত্যপীরের (হিন্দুর মতে 'সত্যনারায়ণে'র) মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। পটীয়া থানার অন্তঃপাতী 'সুচিয়া' গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রাবয়ব।

৬। কবি দ্বিজ রতিদেব।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'মৃগ-লুব্ধ'। তাহাতে এক মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) প্রসঙ্গচ্ছলে শিব-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। নানা কারণে ইহা প্রাচীন সাহিত্যে একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রায় ৬০০ বৎসর হইল, ইহা বিরচিত হইয়াছে। কবির নিবাস,—পটীয়া থানার পার্শ্ববর্ত্তী 'সুচক্রদণ্ডী' গ্রামে।

তাঁহার বিবরণ-সংগ্রহ এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ, তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভট্টাচার্য্য-বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

৭। কবি বলরাম দেব।

ইনি 'স্বপ্নাধ্যায়' রচনা করিয়াছেন। ইহাতে স্বপ্ন-দর্শনের ফলাফল বর্ণিত আছে। কবির জন্মস্থান 'নবগ্রাম', এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার পিতার নাম কমলাপতি। অধুনা নবগ্রাম নাম বিলুপ্ত হইয়া 'খিলপাড়া' হইয়াছে। এই 'খিলপাড়া' গ্রাম আনোয়ারার অতি নিকটবর্ত্তী। কবির বংশ আজও বর্ত্তমান। কবির বাড়ী আজও 'কমলাপতির বাড়ী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৮। কবি তারিণী দেবী।

এই মহিলা-কবির নিবাস কোথায়, তাহা ঠিক জানা না গেলেও, তাঁহাকে চট্টগ্রামবাসিনী বলিয়া বোধ হয়। চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়ের বাড়ীতে ইহাঁর রচিত একটি মাত্র শক্তিসঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। গীতটি উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের পিতৃদেবের স্বহস্ত-লিখিত। প্রাচীন সাহিত্যে আরও কয়েক জন মহিলা-কবি আছেন। তাঁহার 'সুবচনী-ব্রত' নামক একখানি গ্রন্থও আমারা দেখিয়াছি। নিম্নে ঐ গীতটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিব দুর্গা নাম লও না কেন মন রে আমার! ধু।
অন্তিম কালে তরাইবে ভবনদী পার।
দুর্গার নামটী মকরন্দ, শ্রবণে বহে আনন্দ,
নিরানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যার।
দুর্গার নামটি সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
কাল ভয় কাল চিন্তে নাহিক তোমার।
তারিণী ব্রহ্মাণী বোলে, দুর্গা নামটি লইলে,
শমন ভবনে গেলে দোহাই দিবে কার।

৯। কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণ।

ইহাঁর রচিত 'মনসামঙ্গল' ও 'সূর্য্যব্রত পাঁচালী' নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। 'মনসামঙ্গল'খানি সুন্দর। কবি বাঁশখালী থানার অন্তর্গত

'বাণী-গ্রামে' জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্য। ১৬১১ শকাব্দায় 'সূর্য্যব্রত পাঁচালী' ও ১৬২৫ শকাব্দয় 'মনসামঙ্গল' বিরচিত হয়। ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্যে' মনসামঙ্গলের পরিচয় দিয়াছি।

নূতন ঝি।

১

আষাঢ়ের রাত্রি। নিবিড় অন্ধকার। আকাশে বিদ্যুৎ হানিতেছিল। গুরু-গুরু মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু জোরে নহে; গাছের পাতা চোঁয়াইয়া বৃষ্টির জল আস্তে আস্তে পড়িতেছিল; টপ্ টপ্ শব্দ শোনা যাইতেছিল। শিশিরকুমার পালঙ্কে শুইয়া গল্প শুনিতেছিল। নূতন ঝি তাহার পাশে শুইয়া পাখা নাড়িতেছিল; গল্প বলিতেছিল। হঠাৎ শিশির জিজ্ঞাসা করিল,—"ঝি! তোমার নাম কি?" ঝি বলিল, "আমায় অমা বলে ডেকো।" গল্প শুনিতে শুনিতে শিশির ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার বয়স ৭ বৎসর।

২

ঝি নূতন হইলে কি হয়, আচরণে সে ইহারই মধ্যে ছেলে-মেয়ে-মানুষ-করা, সুখ দুঃখের ভাগিনী, জীবনে মরণে নিত্যসহচরী বহু পুরাতন ঝির স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহার ব্যবহারে ছেলে বুড়া সবাই সমান বশ হইয়া পড়িয়াছে। ছেলে মেয়েরা মায়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। শরৎ বাবুর অলস অকর্ম্মণ্য স্ত্রীও বাঁচিয়াছেন, তাঁহাকে আর কিছুই দেখিতে হয় না, কিছুই করিতে হয় না। তিনি এখন মনের সাধ মিটাইয়া নানা অযথা প্রসঙ্গের আলোচনা ও অলস গল্পে প্রতিবেশিনীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার বিলক্ষণ অবসর পাইয়াছেন।

ঝি আবার এ দিকে নিতান্ত সাধারণ ইতরশ্রেণীর ঝির মত নয়। ঝি

ঝি হিসাব রাখে, ধোবার বাড়ীর কাপড় লেখে, পাড়ার অনেক স্ত্রীলোকের চিঠি লিখিয়া দেয়। ঝি শিশিরকুমারকে বোধোদয়ের পড়া মুখস্থ করায়, এবং পাটীগণিতের অঙ্ক কসায়।

ঝি উলের কাজ জানে, রেশমের ফুল তোলে, জরীর জুতা বুনিতে পারে। শরৎ বাবুর স্ত্রী হারমোনিয়ম টিপিবার সময় যখন বেসুরো হইয়া পড়েন, তখন ঝি বেশ বুঝিতে পারে।

বলিতে ভুলিয়াছি, ঝি কায়েতের মেয়ে, সধবা। মাথায় সিঁদুর পরে, পাড়ওয়ালা কাপড় পরে; হাতে শাঁখা ও দু'গাছা সোনার পাতলা বালা আছে। ঝি দেখিতে কুশ্রী। মুখে বিশ্রী বসন্তের দাগ। একটা চোখ একটু কাণা। ঝির রং ফরসা, বয়স চব্বিশ, পঁচিশ। ঝি ভয়ঙ্কর গম্ভীর এবং একটু রাগীও, কিন্তু অত্যন্ত কাজের লোক; সুতরাং শরৎ বাবুর স্ত্রী সরযূ তাহাকে ভয় করেন। ঝি তাঁহার অপেক্ষা বয়সেও বড়।

৩

একটি একটি করিয়া সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কন্যার বিবাহ দিবার জন্য শরৎ বাবু মক্কেলদিগকে থামাইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। শরৎ বাবু কানপুরে ওকালতী করেন।

বিবাহের আর বড় বিলম্ব নাই। পাকা-পত্র হইয়া গিয়াছে। পরশু দিন গায়ে হলুদ। এমন সময় এক বিপদ উপস্থিত হইল। হঠাৎ দেখা গেল, ঝির অত্যন্ত ব্যারাম। এত দিন জানা যায় নাই যে, তাহার পাকস্থলীতে cancer হইয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া বুঝিলেন, সুবিধার নয়। পাড়ার লোক পরামর্শ দিল, হাঁসপাতালে দাও। শিশির তাহাদের গালি দিল। সরযূ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিবে?" শরৎ বাবু কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। ঝি বলিল, "আমার পয়সা আছে, আমায় গঙ্গায় দিও।" আরও এক দিন কাটিল।

৪

সাত বৎসর পূর্ব্বে ঝি কাছে শুইয়া যেমন এক রাত্রে শিশির গল্প শুনিয়াছিল, আজও আষাঢ়ের তেমনই এক রাত্রি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঝিকে ... টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। পৃথিবী

ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জীবিত ও মরণোন্মুখ,—উভয়েই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া মরণের আগমনপথে আলো দেখাইতেছিল। মৃত্যু আসিতে বিলম্ব করিতেছিল। মুক্ত বায়ু মুমূর্ষুর পক্ষে সঞ্জীবনীর কাজ করিল। সে যেন কিছু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। নিবিবার আগে প্রদীপ একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ঝি ডাকিল, "বাবা শিশির! তোর একে একবার ডেকে দে ত।" অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া শিশির ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, শুনিতে পাইল না। কথাটা শরৎ বাবুর কানে গেল, তিনি নিকটে আসিলেন; বলিলেন, "ঝি ডাকচো?" "ঝি উত্তর করিল, "হাঁ; আলোটা উস্কে দাও, মুখে একটু গঙ্গাজল দাও, কাছে ব'স।" শরৎ বাবু দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া নিকটে বসিলেন, ঝির মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। ঝি বলিতে লাগিল,—"আমি মরিলে মাথায় সিঁদুর দিও; নখে আলতা ছোঁয়াইও। স্বামীর কাজ ক'রো। সেই ছাদে জ্যোৎস্না-রাত্রে কি বলেছিলে,—মনে পড়ে? আমার মুখের দিকে চাও। ফুলশয্যার রাত্রে—" শরৎ বাবু ভাবিলেন, প্রলাপের লক্ষণ দেখা দিতেছে। বলিলেন, "ঝি! কি বকছো? কলিকাতায় তোমার কেউ আছে? কাউকে খবর দেব?" ঝি বলিল "এ্যাঁ, আমার স্বামী আছে, পুত্র আছে,—তুমি—শিশির—সেই।" ঝি চুপ করিল। শরৎ বাবুর মুখের দিকে চাহিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, তাহার অন্ধ-চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। শরৎ বাবু উঠিতে যাইতেছিলেন, ঝি তাঁহার হাঁটু ধরিল; বলিল, "ব'স, আমি—মা শীতলা—হাত দেখ—শিশিরের মা—ঝি সরযূর—ভুল করো না।—চিনতে পারলে না।"

শরৎ বাবু হঠাৎ যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের হাতের মধ্যে ঝির হাত তুলিয়া লইলেন। এমন সময় ঘরে যেন কাহার ছায়া পড়িল। তিনি ঝির হাত ত্রস্তে নামাইয়া রাখিলেন। কেন?

শিশির আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঝির মুখের কাছে গিয়া বলিল, "অ-মা, একটু দুধ খাবে? ঝি উত্তর করিল, "না,—আমি—খোকা নাকি? তুই—তোর খাব—হাতে কেন?" প্রলাপ শুনিয়া শিশির মুমূর্ষুর শিয়রে বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষে অশ্রুর প্রস্রবণ। শরৎ বাবু বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আবার যখন শিশির ডাকিল, "অ-মা, অ-মা, একটু জল খাবে?" তখন ঝিয়ের চেতনা লুপ্ত হইয়াছে। শিশির ভাবিল, একটু ঘুমাইয়াছে।

৫

মৃত্যু বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল। যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এ সকল কার্য্যে পটু প্রাচীনেরা লক্ষণ দেখিয়া বলিল, "আজ কিছু হচ্ছে না রে বাপু! কাল নাগাৎ সন্ধ্যা, কি হয় বলা যায় না।"

রাত্রি ১১টার পর শিশিরকে সঙ্গে লইয়া শরৎবাবু বাড়ী ফিরিলেন। দরওয়ানকে বলিয়া গেলেন, "রাত্রে যদি কিছু হয়, তবে খবর দিস।" ঘাটের অনতিদূরেই তাঁহার বাসা।

গৃহে ফিরিলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি গো! সব চুকে গেল এরি মধ্যে'?" "উঁ হুঁ। আমি আজ বৈঠকখানায় শুইগে" বলিয়া শরৎ বাবু বাহিরে চলিলেন। "আমিও একটু সামনের বারাণ্ডাটায় বসিগে, আজ বড় গরম। শিশির! ঝিয়ের বাক্স খুলে দেখ্‌ত কি আছে না আছে" বলিয়া তিনিও শরৎ বাবুর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। ঝিয়ের আর কতই আছে! যাত্রা-কালে ঝি শিশিরের হাতে চাবি দিয়া গিয়াছিল।

শিশির ঝির বাক্স খুলিল। ঝির ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। শিশির দেখিল, বাক্সের মধ্যে থান কয়েক দেশী ও বিলাতী ধোপার বাড়ীর কাপড়, একটা সুতার কাটিম, ঝিনুকের ও সিংএর কতকগুলা বিভিন্ন মাপের বোতাম, একখানা কাঁচী, রেশম ও পশমের দুটো বাণ্ডিল, একটা ভাঙ্গা সিঁদুরের কৌটা, এক শিশি কর্পূরের আরক—তার তলাটা জমিয়া গিয়াছে, এবং আরও দুটা শিশিতে কি ঔষধ। একটা ভারী খেরোর থলি ও সেই থলি চাপা একখানা ছোট নীল রঙ্গের খাতা। কত টাকা, গণিবার জন্য শিশির থলির ভিতরে যাহা ছিল, তাহা ঢালিয়া ফেলিল। থলির ভিতর হইতে পড়িল একখানা মোটা কাগজ, টাকা, থান ৩।৪ অলঙ্কার ও একটা আংটী। শিশির টাকা গণিল; তার পর মোটা কাগজখানা কি দেখিল। দেখিল, সেখানা পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। তাহাতে কতকগুলা নাম। শিশির সেই নামের মধ্যে তাহার নিজের নাম, তাহার পিতার নাম, সুবাসিনী দাসী ও আরও দুটা অপরিচিত নাম দেখিতে পাইল। সে কিছু বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল, ঝির মুখেই শুনিয়াছিল,—তাহার নামে কোম্পানীর কাগজ আছে। কিন্তু সে কাগজ ঝির বাক্সর মধ্যে কেন? ভাবিল, ছিঃ! আমার ঝি চোর। ঝি আসিবার পর তাহাদের

কোনও গহনা কখন চুরি যায় নাই; শিশির ভাবিল গহনা ঝিরই। ঝিকে চোর ভাবিতে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল।

শিশির টাকা কড়ি থলির মধ্যে তুলিয়া রাখিল। বালকসুলভ চপলতা-বশে আংটিটা একবার আঙ্গুলে পরিয়া দেখিল। পরক্ষণেই আবার খুলিয়া ফেলিল। খুলিবার সময় আংটীর উপরকার হরতনের টেকা যে বেড়টার উপর ছিল, সেটা দুখানা ছাপার মত ভাগ হইয়া দু পাশে সরিয়া গেল। শিশির দেখিল, তাহার মধ্যে কাহার চেহারা। আলোর কাছে গিয়া দেখিল, তাহার পিতার প্রথম যৌবনের! ছবির ফ্রেমের উপরে খোদা—"শরৎ", নীচে "সুবাসিনী"! শিশির হাতের মধ্যে আংটী মুঠা করিয়া ধরিল; ভাবিল, সুবাসিনী কে? তার মার নাম সরযূ!

শিশির অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। সে বিনা উদ্দেশ্যে নীল খাতাখানা খুলিয়া ফেলিল। প্রথম যে পাতাখানা নজরে পড়িল, দেখিল, তাহাতে ঝির হাতের অক্ষরে তাহার নাম-সংযোগে কি সব লেখা! বিস্ময়ের আধিক্য শিশিরের কিশোর মস্তিষ্ক বিহ্বল করিয়া তুলিল। সে আবিষ্টের মত উঠিয়া পড়িল। কোম্পানীর কাগজ, খাতাখানা ও আংটীটা পকেটে ফেলিল। বাক্স চাবি শুদ্ধ লইয়া গিয়া তাহার মার ঘরে গেল। সরযূ তখন নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। শিশির বলিল, "এই নাও। কিছু কম আড়াই-শ টাকা আছে, আর খান ৩।৪ গয়না আছে। আমি শুইগে।" শিশির নিজের শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। সরযূ ঝির বাক্স লইয়া পড়িলেন।

শিশির ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বাতী জ্বালিল। তখনও তার শরীর ঝিম ঝিম করিতেছে। পকেট হইতে খাতা বাহির করিয়া শিশির গোড়া হইতে পড়িতে লাগিল।—

"এখানে ত আছি বেশ। নিজের ঘরের নিজে গিন্নির মত। সরযূ ঘুণাক্ষরেও জানে না, সুতরাং তারও কোনও বালাই নাই। সে আমায় ঝির মতন দেখে না; যত্ন করে, আবার সমীহ করিয়াও চলে। বাবুও বোধ হয় আমায় সেই জন্যে নিতান্ত ঝির মতন ভাবেন না। ঝির মতন ত ভাবেন না, কিন্তু যা ভাবা উচিত, তা ভাবেন কি? হা আমার কপাল! তাই যদি ভাবিবেন, তবে আমি আজ নিজের ঝি নিজে হইব কেন?

পয়সার খাতিরে যাহারা তীর্থের সঙ্গী হইয়াছিল, তাহারা একে একে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। সন্ন্যাসিনী হইয়া তীর্থে তীর্থে ফিরিতেছিলাম। আমার ত সকলই গিয়াছিল তবে আবার মায়ায় পড়িলাম কেন? যে নিষ্ঠুর আমার বুক-ভরা ধন কাড়িয়া রাখিয়া আমায় অন্যায় শাস্তি দিয়াছিল, মন বাঁধিবার মুখে অতকাল পরে প্রারব্ধের কোন বিধানে সে আবার আমার চক্ষে পড়িল?

"ভুলে যাওয়া স্বপ্ন সকল দেখিলে মনের অবস্থা কি হয়? বাবুকে এলাহাবাদ ষ্টেশনে হঠাৎ দেখিয়া আমার তাই হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই আত্মসংযম করিয়াছিলাম, ঘোমটা টানিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল, বসন্তের পর আমি নিজেকেই নিজে চিনিতে পারি না। কথা কহিবার লোভ দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল, কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল, তবু কথা কহিলাম, দেখিলাম, বাবু চিনিতে পারিলেন না, পারিলে আমার পক্ষে ভাল ছিল। এখানে আসা হইত না, যে পথ ধরিয়াছিলাম সেই পথে চলিতে চলিতেই পঞ্চভূতে দেহ মিলাইতাম। এ দারুণ সংশয় সঙ্কটে পড়িতাম না। কিন্তু, আমার ভোগের অবসান হয় নাই, অদৃষ্ট পরিহাস করিতে ছাড়িবে কেন? সে আমাকে দিয়া বলাইল,—

'বাবু, আপনি বাঙ্গালী, কোথা যাবেন গা? আমায় একখানা টীকিট করিয়া দিবেন?'

'কেন? আমি কাণপুরে যাব। তুমি কোথায় যাবে? দাও—পয়সা দাও।'

'আমিও ঐখানেই যাব' বলিয়া টাকা দিলাম। তিনি টিকিট কিনিয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িতে তখনও বিলম্ব ছিল। অদৃষ্ট আবার বলিল, 'বল্ হ্যাঁগা বাবু, আপনার ঝির দরকার আছে?' আমি তাহাই করিলাম, এবং ঘোমটা আরও একটু টানিয়া দিলাম। বুঝি মনে হইয়াছিল, তিনি চিনিতে পারিলেন না।

'হ্যাঁ, বাঙ্গালী ঝি আমার এক জন চাই বটে, তা তুমি কি তিন টাকায় থাক্‌বে? তোমার দেশ কোথা? তুমি ত দেখছি সধবা, ছ মাস অন্তর দেশে যেতে চাইবে ত? কত দিন হ'ল তোমার বসন্ত হ'য়েছিল?'

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে অদৃষ্ট সবেমাত্র আমাকে দিয়া বলাইয়াছে, 'আমার স্বামী নিরুদ্দেশ, দেশে'—এমন সময় বাঁশী দিল। বাবুর গাড়ীতেই উঠিতে যাইতেছিলাম, পরে সামলাইয়া লইয়া মেয়ে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তার পর সেই হইতেই আমি ঝি।

"কিন্তু যার জন্য এত করিলাম, সে কই? এই শিশিরই কি আমার সেই ছ' মাসের খোকা? জানিবার কোনও উপায় নাই। এ বিদেশে এদের ঘরের কথা কেউ জানে না; কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? সরযূকে? না। সে জানে, তার এক সতীন ছিল, কিন্তু তাহার বিবাহের পূর্ব্বেই তার সেই সতীন কলেরায় মারা গিয়াছিল। বাবুর মুখেই সে এ কথা শুনিয়াছে। আমার কলেরা হইয়াছিল বটে, বাবু তাহা জানিতেন। সেই সময়েই ওকালতী করিতে তিনি বিদেশে যান। আমি যে মরি নাই, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই, তার পর আমাদের আরও কত কি হইয়া গিয়াছে তাহাও জানেন না। তিনিও সেই অবধিই বিদেশে। আমিই যে তাহার সেই সতীন, সরযূর সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। থাকিলে সে আমায় এমন সর্ব্বে-সর্ব্বা করিয়া রাখিত না। কিন্তু তাহার সতীনের ছেলে ছিল কি না, তাহা আমাকে জানিতে দেয় নাই। আমিও জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাই না। যদি বলে, 'না, ছিল না', তবে আমার দশা কি হইবে! শিশিরের বিষম মায়ায় পড়িয়া নিজের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহার উপায় কি হইবে?

"সরযূর ব্যবহারেও ত কিছু বোঝা যায় না। সে সময়ে সময়ে শিশিরের প্রতি দুর্ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাহার মেয়েদের প্রতিও ত সেইরূপ করে। ওটা কি ওর মেজাজের দোষ? স্বামীর ব্যবহারে ত একেবারেই কিছু বুঝিবার যো নাই। বরং শিশিরের প্রতি তাঁহার যেন একটু বেশী টান দেখিতে পাই। সে হয় ত প্রথম সন্তান, এবং পুত্র বলিয়া। অথবা তার মা নাই বলিয়া? তাই বা কে বলিবে?

"শিশিরের, আমার, সরযূর ও তাহার বড় মেয়ের বয়স ধরিয়া হিসাব করিয়াও দেখিয়াছি। তাহাতেও ঠিক পাই না। সামান্য এ দিক ও দিক হয় বটে, কিন্তু খোকা তেমন আমার কিছু অধিক বয়সে হইয়াছিল।

"তবে একটা বিশেষ সন্দেহ আছে। সরযূ যখন তখন তার মেয়েদের 'তুই তোকারি' করে, কিন্তু রাগের অবস্থায় বা সহজে ভুলিয়াও ত শিশিরকে কখনও 'তুই' বলে না; নিজের পেটের সন্তানের প্রতি এ ব্যবহার কি স্বাভাবিক? কিছুতেই নয়। আরও এক কথা, আমার প্রতি শিশিরের সে মায়া পড়িয়াছে, বুঝিতে পারি, সে রক্তের টান ছাড়া সম্ভব নয়। তাকে অ-মা (ও মা) বলিতে শিখাইয়াছি। সে তা ছাড়া কখনও আমায় ঝি বলে না। তাই ভাবি, হয় ত শিশির আমারই সেই খোকা।

"সময়ে সময়ে ভাবিয়াছি,—স্বামীকে সকল কথা খুলিয়া বলি। চীনের কালি দিয়া ছুঁচের কলমে আমার বাঁ হাতে তাঁহার নাম লিখিয়াছিলেন, সেইটা দেখাই; তা হলেও ত চিনিতে পারিবেন। "ও কিছু নয়, উল্কির দাগ" বলিয়া শিশিরকে কতদিন ভুলাইয়াছি। বসন্তের দাগে একটু ঢাকা পড়িয়াছে বটে, তবু এখনও বেশ বুঝা যায়। তাঁর ডান হাতে আমার যে নাম লেখা ছিল, সেটাও একবার দেখিতে সাধ যায়।

"কিন্তু নানা কারণে তাতে কাজ নাই। সরযূ এখন সুন্দরী একছত্র রাণী। বাবু তার অতি নিরীহ নির্ব্বিরোধী ভক্ত প্রজা। রাজত্ব বেশ চলিতেছে। আমি ঝি সহায়সম্পদহীন। বাবা মরিয়াছেন, তাঁহার যে ঐশ্বর্য্যে তাঁহার একমাত্র মাতৃহীনা হৃতসর্ব্বস্ব কন্যার জীবন্ত স্বামীর অভাব পূর্ণ হইতে পারে ভাবিয়া বড় জোর করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'ভয় দেখাবার দরকার নাই, বিয়ে করতে বলগে,' সে ঐশ্বর্য্যও গিয়াছে, থাকিলে কি হইত, বলা যায় না। হয় ত সরযূসুন্দরীর মত এক ঝি পাইতাম। পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ পাইয়াছিলাম মাত্র। তাতে আর এদের এ কায়মী রাজত্বে তুফান তুলিতে ভরসা করা যায় না। সে পাঁচ হাজার টাকাই বা আর আমার আছে কই? সে ত শিশিরকে দিয়াছি। যার পরামর্শমত তাকে সাক্ষী করিয়া বাবুর মা—"

বাহিরে যেন কার পদশব্দ শোনা গেল। শিশির চট্ করিয়া খাতা বন্ধ করিল। আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে অবস্থায় বেশী ক্ষণ থাকিতে পারিল না। উঠিয়া খাতা, আংটী ও কোম্পানীর কাগজ তাহার ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল। তার পর নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় ২টা।

বহুদিন পূর্ব্বে কোনও এক ঘটনা উপলক্ষে শিশির একবার সন্দেহ করিয়াছিল, সে হয় ত সরযূর গর্ভজাত নয়। আজ তাহার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্ধকার জনহীন পথে চলিতে চলিতে ভাবপ্রসঙ্গে বিদ্যুৎবেগে সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল। বাহিরের মেঘের মত তাহার মনের অন্ধকারও যেন আকাশের বিদ্যুতে চিরিয়া তফাৎ হইয়া গেল। সে সেই নিমেষের আলোকে স্পষ্ট দেখিল,—সরযূ তাহার বিমাতা।

শিশির ঘাটে গিয়া মুমূর্ষুর ঘরের স্তিমিত আলোকে দেখিল, সে ঘুমাই-

পাইল না। আলো নিকটে আনিয়া সে তখন অ-মার বাম হাত তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, আস্ত পানের আকারের একটি রেখার মধ্যে দুটা অক্ষর 'শ' ও 'ৎ'। বসন্তের দাগে মাঝের অক্ষর যে ঢাকা পড়িয়াছে, সে তাহা বুঝিল। সে লুপ্ত অক্ষরটা কি, তাহাও তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে ব্যাকুলভাবে কাতর-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে আবার ডাকিল, "মা! মা! দেখ, এই দেখ, তোমার সেই খোকা, চাও, দেখ মা!" অ-মার তখন নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে।

৬

প্রাতে আসিয়া শরৎ বাবু দেখিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে! মুখাগ্নি করিয়া শিশির একদৃষ্টে চিতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কাচের মত স্বচ্ছ চক্ষু শুষ্ক, বারিহীন। নিজের চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক বালকের এই নিশ্চল মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

৭

ইহার তিন দিন পরে সরযূ শিশিরকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাছা ছাড়্; জুতা জামা পর্। দু' এক দিনের মধ্যেই বুড়ার বিয়ের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইতে হইবে। হবিষ্য করাই বা কেন?" শিশির পিছন ফিরিয়া বলিল; "আমার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। আমার এক মাস অশৌচ।" "আর অত বাড়াবাড়ি জ্যাঠাপনাতে কাজ নাই, যা বলা যাচ্চে, কর!" বলিয়া সরযূ পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া মাথার কাপড় সরাইয়া দিলেন। শরৎ বাবু সেখানে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন, তিনি কলম হাতে শিশিরের দিকে চাহিলেন। কোনও কথা না কহিয়া শিশির সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া সেই নীল খাতা, আংটী ও কোম্পানীর কাগজ শরৎ বাবুর সামনে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শ্লেষপূর্ণস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সরযূ বলিলেন, "কি গো! আমি ঝি কি না, তাই বুঝি কথাটা গ্রাহ্য হ'ল না।" ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শিশির বলিল, "অমন করো না, থাম। বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, অ-মা আমার কে।"

তাহার কণ্ঠে বজ্র; চক্ষে আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখ মেঘ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

মৃত্যু।

মৃত্যু একটি পরিষ্কার পথ। কারণ, ১। এটা নিঃসন্দেহ। ২। জন্মের ন্যায় ইহা গর্ত্ত অবলম্বন করে না। ৩। ইহাতে কাহারও মুখ চাহিতে হয় না। তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট।

জন্মকে আমরা ঘৃণা করি, মৃত্যুকে ভালবাসি। ভেদ-জ্ঞানই ঘৃণা। সংসার জন্মসঙ্কুল। সংসারকে আমরা ঘৃণা করি। কতকগুলা আলাই, বালাই, জঞ্জালের সংখ্যা কমিয়া গেলেই শান্তি। আবার যাহাকে ভাল-বাসি, সে মরিয়া গেলেই আমরা মরিতে চাহি। ইহাও ভগবানের অপূর্ব্ব চালাকী। তিন হইতে দুই হয়, দুই হইতে এক হয়। সুতরাং মৃত্যু সর্ব্বতো-ভাবে ভাল।

রামের ইচ্ছা, শ্যামের মৃত্যু হয়; শ্যামের ইচ্ছা, রামের মৃত্যু হয়। দেখা যাউক, কে আগে মরে। রাম শ্যামকে ভয় করে, এবং শ্যাম রামকে ভয় করে। ইহা প্রথম চালাকী। যদি রাম শ্যামের অবলম্বন হয়, কিংবা রাম শ্যামকে ভালবাসে, তাহা হইলেও পরস্পরের মৃত্যুতে ভয় আছে। ইহা চালাকী নং ২। প্রকৃতির কি চমৎকার কৌশল!

মৃত্যুভয় কি পূর্ব্বজন্মের প্রমাণ? আত্মার আবার ভয় কি? বাবা! কোন ভয় নাই, দুর্গা নাম করিয়া সরিয়া পড়। উত্তর,—"বাবা! আমার ভয় নাই, কিন্তু তোমাদের জন্যই ভয়!"

আহা! কি গুরুবাক্য! আমরা তাহার অর্থ বুঝি না!

কাজেই আত্মার একটু গুরুত্ব আছে। গুরুপাক দ্রব্য সহজেই উদ্গিরিত হয়! বোধ হয় (শাস্ত্রেও বচন আছে) দেবতারা মৃত্যুকালে জীবগুলাকে খান, কিন্তু গুরুপাক সহজে হজম হয় না। পিণ্ড দেওয়া সহজ, কিন্তু হজম করা শক্ত।

মৃত্যু দুই প্রকার। সাধারণ মৃত্যু এবং অপমৃত্যু। জলে ডুবিলে, আগুনে পুড়িলে, বাঘে খাইলে অপমৃত্যু হয়। দেবতারা টানিলে সাধারণ মৃত্যু। আত্মহত্যা অপমৃত্যু। কিন্তু শুনিয়াছি, ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া বাহির হইলে সে মৃত্যু অসাধারণ।

যদিও ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া বাহির হওয়ার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু বিচার

করা উচিত। কথাটা বেশ মনে লাগে। ব্রহ্মরন্ধ্র হুঁকার ছিদ্রের মত। জাতিবিচার না থাকিলেও, কেহ শীঘ্র অপরের হুঁকার ছিদ্রে মুখ দিতে সাহস করে না। কি জানি যদি কোন ব্যামোহ থাকে, কিংবা পোকাটা, মাকড়টা ভিতরে থাকে। জীব অদ্ভুত পদার্থ কি না।

কিন্তু শুনা গিয়াছে, এ পথেও বাধা আছে। নসীরামের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া পলায়নতৎপরতার লক্ষণ নসীর মা টের পাইয়াছিল। কাজেই মৃত্যুকালে নসীর মা নসীর ব্রহ্মরন্ধ্রে চুম্বন করিয়া বলিল, "বাবা নসী, এ পথ দিয়া আসিও না।" মায়ার কি গুণ! স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! আপনারা জানেন, হুক্কা-রন্ধ্রে মুখ দিয়া বায়ুর চাপ দিলে জল মস্তক দিয়া বহির্গত হয়, এবং অগ্নিও নিভিয়া যায়। (সাবধানে দিলে গুড়্ গুড়্ করিয়া ডাকে, কিন্তু তাহা আকর্ষণে)। নসীর মা কিঞ্চিৎ চাপ দেওয়াতে নসীর অস্তিত্ব অগ্নিতত্ত্বে সম্মিলিত হইয়া একটা জগা-খিচুড়ীর ন্যায় হইয়া গেল। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে, মায়া একটা ব্রহ্মরন্ধ্রের বাধা। কিন্তু বোধ হয় উহাই মুক্তির পথ।

মৃত্যুতে যদি মুক্তি না হয়! ইহাই ভয়ের কারণ। সুতরাং নিশ্চিত জানিতে না পারিলে কেহ শীঘ্র মরিতে চাহে না। অনেক বিচক্ষণ পুরুষ এই শরীরেই অনেকবার মরিয়া (অর্থাৎ জীবন্ত অবস্থায়) পরখ করিয়া লন। শুনিতে পাই, ইহার নাম যোগ। ইহা সজ্ঞানে অভ্যাস করিতে হয়, এবং অভ্যাসের গুণে মৃত্যু সহজ হইয়া পড়ে। একবার চেষ্টা করা মন্দ নয়।

কোনও কবি গাহিয়াছিলেন,—

"মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান,
* * * মেঘবরণ জটজূট!"

বোধ হয়, কবি একবার মরিয়া দেখিয়াছিলেন, নচেৎ এমন সুন্দর ভাব আমরা পূর্ব্বে কভু দেখি নাই। কথাটি শাস্ত্রসঙ্গত। চিতানলে জীব ধূম্রের ন্যায় বাষ্পাকারে উপরে উঠে, এবং দেখিতে অনেকটা মেঘের মত। উপনিষদেও ধূম, অর্চ্চির কথা আছে। তবে ব্রজের শ্যামের জটা ছিল কি না, আমরা জানি না। বোধ হয়, মরণকালে (ব্যাধ-শর-বিদ্ধ হইবার পূর্ব্বাহ্নে) যদুবংশধ্বংসকালে তৈল মাখেন নাই। কিংবা হরিহর একাধারে কল্পিত হইয়াছে। যাহাই হউক, কবিতার ভাবটি সুন্দর।

অজ্ঞানে মরিলে অন্ধকার দেখে, সজ্ঞানে আলোক দেখে। এ আলোক জ্ঞানালোক। ইহার কোনও বর্ণ নাই, অথচ আলোক। ইহা তলোয়ার নহে,

অথচ তীক্ষ্ণ। আমরা জড়বাদী, ইহার মর্ম্ম বুঝি না; কিন্তু কথাটা চিরপ্রচলিত। অনেক চিরপ্রচলিত কথার সত্যতা অধুনা সাব্যস্ত হইয়াছে, যেমন "মা ষষ্ঠীর কৃপা", "বাঞ্ছারাম কল্পতরু" প্রভৃতি।

এখন মরণের প্রণালীটা ভাল করিয়া দেখা উচিত। বিজ্ঞান কি বলেন? আয়ু পরিমিত। যদি কোনও শক্তি, পদার্থে সংযোজিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় (যেমন একটা গোলা), তাহা হইলে সেটা চিরকালই চলিতে থাকিবে, যদি না বাধা পায়। একটা ক্ষুদ্র শক্তিকণাও এই হিসাবে অমর (Newton's Second Law of Motion.) অথচ বাধা পায় বলিয়া আয়ু পরিমিত। এই প্রথম বাধার নাম Natural Law (বিধান)। মনুষ্যের মনুষ্যত্বই বাধা। মনুষ্যদেহে এই বাধা সংক্রামিত হইয়া জীবনকে শতবৎসররূপী পরিচ্ছিন্ন গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলে। নচেৎ একটা মনুষ্যে নির্ব্বিবাদে বহুকাল চলিয়া যাইত। কোথায় যাইত, তাহা জানি না, কিন্তু যাইত, সেটা নিশ্চয়। চতুর্দ্দিকের একটা দিকে যাইত। পরস্পরের নাকের মধ্যে, কাণের মধ্যে এবং সুবিধা পাইলে কাপড়টা জুতাটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িত। কিন্তু ইহা কি বাঞ্ছনীয়? এই বিরক্তিজনক গতির পক্ষে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরই যথেষ্ট।

ইহার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের কথা আছে। যদি বরাবর না চলিয়া মাঝে মাঝে থামে? এটুকু ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু এই ইচ্ছা মানুষের বুদ্ধি দিয়া আসে। অনেকে ধীরভাবে চলিয়া বেশী দিন বাঁচে। জীবনে অনেক বাধা আছে। ঝড়টা, বৃষ্টিটা, মারীভয়টা, কোনটা নয়? কাজেই সারমেয়-তাড়িত শৃগালের ন্যায় মনুষ্যজীবন কখনও কখনও এ দিক ও দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া, কখনও ঝোপের মধ্যে কখনও গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণরক্ষা করে। ইহাও চালাকী।

প্রাণটা বুদ্ধিরূপে আত্মরক্ষা করে। বুদ্ধিরূপে ছোট কালটাকে বড় করে। যদি দ্রুত চলিলে পঞ্চাশ বর্ষে আয়ুঃক্ষয় হয়, তবে ধীরে চলিলে শত বর্ষ কাটান যাইতে পারে। আপাততঃ এই ভাবে দেখিলে নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় আইন খাটে না। কিন্তু কথাটা এই, জীবনসংগ্রামে দ্রুতগতিতে বাধার বহুলভাবে উৎপত্তি হয়, এবং ধীরগতিতে কিংবা কৌশলযুক্ত গতিতে বাধা কম হয়। সুতরাং বাধাটাই আসল। বাকি যেমন তেমনই।

মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের এত মূল্য। মৃত্যু না থাকিলে জীবনের কদর কেহ বুঝিত না। মৃত্যুই জীবনের ভূষণ। মৃত্যুই জীবনের মূল্য। সারা জীবন খাটিয়া যাহা পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহাই মৃত্যু! মরিতে হইবে বলিয়াই

আমরা খাটি। মরিয়াই আমরা জগতের হিতে আসি। তুমি আমার জন্যে মর, তাই তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসা মৃত্যুর সহচরী। তুমি মরিলে আরও ভালবাসিব। জগৎও ভালবাসিবে। মৃত্যু মহা-সুনিদ্রা।

বেদান্তবাগীশ বলেন, জীবই ব্রহ্ম। জ্ঞান মরিয়া গেলেই, শুষ্ক হইলেই, একটা অশ্বণ্ড অদ্বৈতবাদরূপে দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু একটু পেটে ব্যথা ধরিলেই অদ্বৈতবাদী অস্থির। উদাহরণ, যেমন তৈল-শলিতা-যুক্ত দীপশিখা।

উদাহরণটি অনেক কালের। অগ্নি দীপাকারে জ্বালাইতে হইলে তৈল ও শলিতা চাহি। অগ্নি অমর। কিন্তু তৈলের মাত্রা পরিচ্ছিন্ন। শলিতাটা কাঠাম, কিংবা স্থূলদেহ। অথচ অগ্নি সাক্ষিগোপাল। অগ্নি নহিলে শলিতা জ্বলিবে না। কিন্তু তৈলসংযুক্ত না হইলে অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না। কোনটা সৎ, কোন্‌টা অসৎ? সাক্ষিগোপাল প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াও সৎ। তৈল বেচারা অসৎ। শলিতার ত কথাই নাই। অথচ তৈল নহিলে চলে না। বংশে অনেক বাতি দিতে গেলে অনেক তৈল চাহি, অনেক শলিতা চাহি। তৈল অন্ন। অন্ন সঙ্কীর্ণ।

তৈলটা কিংবা অন্নটাকে বহুলভাবে রক্ষা করিতে হইলে, দেবতাগণকে ঠকাইতে হয়। পঞ্চপ্রাণ এক একটা দেবতা। প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ও ব্যাণ। অন্ন গিলিতে বসিয়া প্রথমতঃ পাঁচটি ভাত শ্রীমানদিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে হয়। নচেৎ সর্ব্বনাশ! কিন্তু ইহাতে একটা সুবিধা আছে। দেবতাগণ মনুষ্যের ন্যায় শীঘ্র খাইতে পারেন না। দেবতা-গণের অহোরাত্র আমাদিগের সংবৎসর, কিন্তু খাইবার বেলা দেবতাদিগের সংবৎসর আমাদিগের একদিন। একটি দেবতা শত বর্ষে একটা মানুষ খান, সুতরাং পাঁচটা ভাত খাইতে অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা লাগা সম্ভব। কাজেই তাঁহাদিগের উৎসর্গীকৃত অন্ন-আক্রমণের পূর্ব্বেই আমরা একথাল ভাত সাপটে খাইয়া ফেলিতে পারি।

পুনর্জ্জন্মের কথা আমরা জানি না, কিন্তু ইহা সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জ্ঞান নামক প্রাণের একটা সূক্ষ্ম রূপ না কি বাঁচিয়া থাকে। তাহা মনের মধ্যে বহুকাল নানাবিধ লোকে ঘুরিয়া বেড়ায়। মনের বৈধব্যদশা হইলে, অর্থাৎ মনের মানুষটা মরিয়া গেলে, মন প্রথমতঃ পিত্রালয়ে কিংবা চন্দ্রলোকে যায়। যদি সতী হয়, তবে শুক্ল বসন (পক্ষ) পরিধান করিয়া যায়; যদি অসতী হয়, তবে কৃষ্ণ পক্ষ পরিধান করিয়া যায়। আমরা যেমন নরলোকে

গোযানে যাই, চন্দ্রলোকে দেবযানে যাইতে হয়। অসতী হইলে দেবতারা স্পর্শ করেন না। পিতৃযানে যাইতে হয়। পথিমধ্যে মশকের দৌরাত্ম্য হইলে ধূম প্রভৃতির সাহায্য লইতে হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, বাস্তবিক মনোদেবী বিধবা হন না, কারণ, আত্মা (তাঁহার স্বামী) অমর। কিন্তু আত্মা আপাততঃ অদৃশ্য হওয়াতে তাহার সন্ধান করিতে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে হয়। পরে পুনর্ব্বার জন্মিলে হুবহু পূর্ব্বজন্মের জীবটাই আসে, কিন্তু কচি খোকার বেশে।

দেবতারা জীবদ্দশা হইতেই মানুষ খাইতে আরম্ভ করেন। সাপে ব্যাং ধরিলে ব্যাং সহজে মরিতে চাহে না। শুনিয়াছি, যোগিপুরুষগণ ভেকের মত। দেবগণ দ্বারা আক্রান্ত হইলেই মহামুদ্রা প্রভৃতি কসিয়া থাকেন। এমন কি, অনেকে তপস্যা করিয়া অমর হন।

মৃত্যুর কথা তুলিলেই অমরত্বের কথা উঠে। আত্মা অমর। তবে তপস্যার দরকার কি? আমার বোধ হয়, বারংবার না মরিতে হইলে, তাহাকেই অমরত্ব কহে। প্রমাণ, হনুমান অমর কিন্তু ইহলোকে নাই;—সেই প্রকার, বিভীষণ প্রভৃতি। কাজেই অমর শব্দের অর্থ মুক্তি।

মুক্তির দুইটি পথ আছে। ১। সাধনা দ্বারা; যেমন, ব্রহ্মরন্ধ্র প্রভৃতি দিয়া। ২। জগতের হিতসাধন করিয়া, এবং আত্মোৎসর্গ করিয়া। শেষোক্ত পথ প্রশস্ত। প্রথম পথ সঙ্কীর্ণ। তাহার মধ্যে মোটা বুদ্ধি ঢুকিতে পারে না। এটা Private entree; যে জগতের জন্য প্রাণ না দিয়াছে, তাহার মুক্তির অর্থ কি? উত্তর, ঈশ্বরের চরণে লুকাইয়া প্রাণ দিলেও, সেটা ভগবান জগতের হিতার্থ ব্যয় করেন। সুতরাং যোগিগণের মতে গুপ্ত পথ দিয়া আত্মমুক্তিটাই ভাল পথ। ফল একই।

তবে মৃত্যুর পরে বাস্তবিক কি হয়, আমরা জানি না; এই জন্য জগতের হিতার্থ প্রাণ দিয়া জীবদ্দশায় মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া ভাল।

যাঁহাদের মরণের সম্বন্ধে বিশেষ চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা থিয়সফি সাহিত্য পাঠ করুন। অনেক বহি বাহির হইয়াছে। নির্জীব বাঙ্গালীর দেহেতে প্রাণ বড় নাই। যাহা আছে, তাহা মাথায়। সুতরাং মাথা দিয়া প্রাণ দিতে হয়। বহি পড়া ইহার একটা সোজা উপায়।

শেষ কথা, মৃত্যু ভয়াবহ নহে। ইহা অতি সুন্দর ও সোজা পথ। জীবন ব্যয় করার নামই মৃত্যু। যখন ব্যয় করিয়া আসিয়াছি, এবং নূতন

পুঁজি নাই, তখন ফল অবশ্যম্ভাবী। মহাজন সকলেই ঐ পথে গিয়াছেন। মৃত্যুর লক্ষণও পবিত্র। মরিবার পূর্ব্বে দেহ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে, ক্ষুধা কম লাগে, তীব্র বাসনাগুলিও কমিয়া আসে। দ্বন্দ্ব, তৃষ্ণা, আশা প্রভৃতি কমিয়া গেলে শান্তির সূচনা হয়। এই সময় কল্পনা ভাল লাগে। "ঐ দেখা যায় আনন্দধাম ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়"। সকলে মিলিয়া দেখ!

আর শুনা গিয়াছে, মৃত্যুকালে যাহাতে তন্ময় হইয়া মরে, মৃত সেই আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিন্দুতে তন্ময় হওয়াই ভাল। যত সূক্ষ্ম লক্ষ্য, ততই সূক্ষ্ম আকার। ইহার সুবিধা এই যে. বিন্দুভাবে যথা তথা যাওয়া যায়, এবং যদি কেহ জগতে ভালবাসিয়া থাকে, তবে বিন্দুভাবে তাহার অশ্রুবারি অবলম্বন করিলে বড় সুখ হয়। বিন্দু কিংবা কণাই মধুর। হাসিকণা মধুর, অশ্রুকণা মধুর। যদি হাসিয়া থাক, তবে জানিও, বহুকালের ভালবাসার ধনগুলি আমার মুখ দিয়া হাসিতেছে। যদি কাঁদিয়া থাক, তবে জানিবে, জগতের দুঃখশোকাতুর যাহাদের জন্য কাঁদিয়াছিলে, তাহারাই তোমার অশ্রু দিয়া কাঁদিতেছে। তুমিই ঈশ্বর। জীবই ঈশ্বর। তাঁহার হাসি কান্নার স্থান আমাদিগের দেহে। অতএব তোমরা সকলেই পবিত্র। এ দেহমন্দির অপবিত্র করিও না। মৃত্যু দ্বারা সংস্কার করিও।

গান।

ছায়ানট্‌; একতালা।

কেন এত সুন্দর শশধর, ও সে তার মুখ-অনুকারী।
কেন এত সুবর্ণ শতদল, ও সে তাহারি বর্ণহারী।
কেন এত সুললিত পিক-সঙ্গীত—
তারি কলবাণী করে ঝঙ্কৃত;
এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয়, পরশ বাহিয়া তারি'।
আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত শুধুই তাহারি রূপের আলো;
তার পদযুগ ধ'রে হৃদে ব'লে ধরারে বেসেছি ভালো।
জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি,
নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি,
তাহার আঁখির কিরণের তলে সকলই ভুলিতে পারি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মালদহের চারি পীর।

গৌড় নগরে প্রথমে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ হয়। মালদহ জেলায় গৌড় নগর অবস্থিত, এ জন্য মালদহ জেলায় কতিপয় মুসলমান সাধুর সমাগম হইয়াছিল। সেই সকল সাধুপুরুষের মধ্যে শাহ জালালউদ্দিন তব্‌রেজী, আখি সেরাজউদ্দিন, ওসমান, আলাউল্‌হক্‌ ও নুর কুতব আলম, সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এ জেলার আপামর সাধারণ ইঁহাদের নাম জানে, এবং হিন্দু মুসলমান ইঁহাদিগকে ভক্তি করে।

(১) শাহ্ জালালউদ্দিন তব্‌রেজী।

শাহ জালালউদ্দিন সর্ব্বপ্রথমে এ দেশে আগমন করেন। শেখশুভোদয়া নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; উহা হলায়ুধ মিশ্রের রচিত বলিয়া কথিত হয়। গ্রন্থখানি অশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। রাজমন্ত্রী মহাপণ্ডিত হলায়ুধ যে অশুদ্ধ সংস্কৃতে একখানি গ্রন্থ লিখিবেন, ইহা সম্ভব নয়। মোগল-রাজত্ব-কালে যখন নিস্কর ভূমির অনুসন্ধান হইতেছিল, তখন এই গ্রন্থ রচিত হয়। মোগল কর্ম্মচারিগণকে দেখান হইয়াছিল যে, শাহ জালালউদ্দিনকে পাঠান রাজগণ ভূমিদান করেন নাই, পাঠানের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন ভূমিদান করিয়াছেন। শাহ জালালউদ্দিনের সম্পত্তির রক্ষকগণ জানিতেন যে, মোগলেরা পাঠানদের প্রচণ্ড শত্রু। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, শাহ জালাল-উদ্দিন, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় গৌড়ে আগমন করেন। লক্ষ্মণ সেন উক্ত শেখকে অর্থাৎ শাহ জালালউদ্দিনকে উপাসনামন্দির-প্রতিষ্ঠার্থ বাইশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি দান করেন। লিখিত আছে, ১১২৪ সংবতে (১০৬৮ খৃঃ) শাহ জালালউদ্দিন গৌড়ে আগমন করিয়া রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় বার বৎসর অবস্থান করেন। রাজা, শেখের ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া ও শেখের সদ্‌বিবেচনায় পরিতুষ্ট হইয়া, শেখকে এ দেশে রাখিবার চেষ্টা করেন। শেখের প্রতি রাজার অধিক প্রীতি দর্শন করিয়া অমাত্যগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। শেখশুভোদয়ায় শাহ জালালউদ্দিনের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার এ দেশে আগমনের যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইতিহাসের সঙ্গে তাহা মিলিতেছে না। শাহ জালালউদ্দিন মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেই এ দেশে আগমন করেন।

হজরৎ মোকদম শাহ জালালউদ্দিন, পারস্যের অন্তর্গত তব্‌রেজ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। শাহ জালালউদ্দিন জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের জন্য একাধিক গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আবুসইদ্‌ তাঁহার প্রথম গুরু। আবুসইদের পরলোকগমনের পর তিনি শেখ শাহাবুদ্দিনের শিষ্য হন। শাহাবুদ্দিন প্রতিবৎসর মক্কায় যাইতেন; শাহ জালালউদ্দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। গুরু অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, গুরুকে টাটকা গরম খাদ্য খাওয়াইবার জন্য সর্ব্বদা মাথার উপর চুলা জালাইয়া গুরুর সঙ্গে ফিরিতেন। গুরুর মৃত্যুর পর শাহ জালালউদ্দিন দিল্লীতে আগমন করেন। সেখানে তাঁহার শত্রু জুটিল। শত্রুরা তিনি স্ত্রীসংসর্গী বলিয়া কাজীর নিকট অভিযোগ করে; কিন্তু বিচারে তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন। যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে জালালউদ্দিনের অপবাদ, সে উপস্থিত হইয়া শত্রুগণের চক্রান্তের কথা কাজীর নিকট প্রকাশ করেন। শাহ জালাল, দিল্লী ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গলায় আগমন করেন। বাঙ্গলায় তিনি বিস্তর সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন; এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় বাইশ হাজার টাকা, এ জন্য ইহা বাইশ-হাজারী নামে প্রসিদ্ধ। শাহ জালাল এই সম্পত্তি দীনদুঃখী ও ফকীরদের সেবার্থ উৎসৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুয়া নগরে মোকদম শাহ জালালউদ্দিনের দরগা আছে; মুসলমানদের চক্ষে পাণ্ডুয়া পবিত্র স্থান। এখানে শাহ জালালের দরগা ও নূর কুতব আলমের সমাধিস্থান রহিয়াছে। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়াকে হজরৎ পাণ্ডুয়া বলিয়া থাকে। মালদ্বীপে ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে শাহ জালালের মৃত্যু হয়। কিন্তু এই মৃত্যু-তারিখ নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হয় নাই; এ দেশে শাহ জালালের মৃত্যু হয় নাই। শাহ জালালের দরগা দেখিলে বোধ হয়, উহা কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাদ যে, শাহ জালাল বিস্তর হিন্দু দেবালয়ের ধ্বংস করেন।

(২) আখি সেরাজ্‌উদ্দিন ওস্‌মান।

এই সাধু পুরুষের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গৌড়ের উত্তরস্থ উপনগর সাদুল্লাপুরে ইঁহার সমাধিস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। আখি সেরাজুদ্দিন, দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন। নিজামুদ্দিন, আখি সেরাজকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আখি সেরাজ অধিক বয়সে গুরুর নিকট অধিগতবিদ্য হন। গুরুর মৃত্যু হইলে ইনি গৌড়ে আগমন করেন। গৌড়ের পাঠান

ইঁহার সমাধিমন্দির সামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহের নির্ম্মিত। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, এই সমাধিস্থানের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। আখি সেরাজুদ্দিন পীরান্পীর অর্থাৎ পীরের পীর নামে এ দেশে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

(৩) আলাউল্ হক্।

এই সাধু পুরুষ, নূর কুতব আলমের পিতা। কোন কোন ইংরেজী গ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি আখি সেরাজের পুত্র। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইঁহার পিতার নাম আসাদ্লোহোরি। আলাউল্ হক্, খলিফা খালেদ-বিন্‌ওয়ালিদের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ এ দেশে আগমন করেন। ইঁহার আত্মীয় স্বজন রাজসরকারে বড় বড় কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। আলাউল্ হকের নিজের অবস্থাও ভাল ছিল। গৌড়, পাণ্ডুয়া ও সুবর্ণগ্রামে ইঁহার প্রচুর সম্পত্তি ছিল। ইনি বংশমর্য্যাদা, ধন ও বিদ্যার গৌরবে অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়া উঠেন। আখি সেরাজ যে সময়ে বাঙ্গলায় আগমন করেন, তখন তাঁহার গুরু নিজাম্উদ্দিন আউলিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন সময়ে আলাউল্ হক্ তোমার শিষ্য হইবে। অহঙ্কারের জন্য নিজাম্উদ্দিনের অভিশাপে আলাউল্হক বোবা হন! আখি সেরাজের শিষ্য হইলে তাঁহার মূকত্ব দূর হয়। আখি সেরাজ অশ্বপৃষ্ঠে বহুদূর ভ্রমণ করিতেন; অলাউল্হক্ নগ্নপদে তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেন ও গুরুর জন্য সর্ব্বদা উষ্ণখাদ্য মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিতেন। আখি সেরাজ এই অবস্থায় শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া শিষ্যের আত্মীয় স্বজনের নিকট গমন করিতেন। শিষ্যের অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা করাই বোধ হয় আখি সেরাজের উদ্দেশ্য ছিল। সর্ব্বদা উষ্ণখাদ্য মস্তকে ধারণ করার জন্য শিষ্যের মস্তকে টাক পড়িয়াছিল।

আলাউল্হক্ অত্যন্ত দাতা ছিলেন। এতদূর উদার ছিলেন যে, কোন লোককে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি আট হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের দুইটি বাগান ছাড়িয়া দেন; ঐ বাগানে উক্ত লোকটির কোন স্বত্ব ছিল না। তাঁহার দান দেখিয়া সুলতান সেকেন্দর শাহের ঈর্ষ্যার উদয় হয়। সেকেন্দর আলাউল্হক্‌কে সোনারগাঁয় পাঠাইলেন। সোনারগাঁয় তখন সেকেন্দরের পুত্র গিয়াস্উদ্দিন রাজত্ব করিতেছিলেন; পিতাপুত্রের সদ্ভাব ছিল না। আলাউল্হক্ গিয়াস্উদ্দিনের নিকট আশ্রয় পাইলেন। এখানে গিয়া দ্বিগুণ

পরিমাণে দান করিতে লাগিলেন। স্থলতান্ সেকেন্দরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াস্‌উদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিলে, আলাউল্ হক্ তাঁহার সঙ্গে পাণ্ডুয়ায় আগমন করিলেন। তথায় ৮০০ হিজিরিতে পরলোক গমন করেন। পাণ্ডুয়ায় ইঁহার কবর রহিয়াছে। পিতাপুত্রের কবর দূরবর্ত্তী নয়।

(৪) নূর কুতব আলম।

নূর কুতব আলম, আলাউল্‌হকের পুত্র। ইনি রাজকুমার আজম শাহের (ইনি পরে সুলতান্ গিয়াস্‌উদ্দিন নামে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন) সঙ্গে বীরভূম জেলার নাগর নগরে হামিউদ্দিনের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। রাজা গণেশের সময় ইনি পাণ্ডুয়ায় ছিলেন। রাজা গণেশের সঙ্গে ইঁহার সম্প্রীতি ছিল কি না, জানা যায় না। রাজা গণেশের স্থায় এক জন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ, এমন এক জন ক্ষমতাপন্ন সর্ব্বজন-মান্য সাধুপুরুষকে যে অসন্তুষ্ট করিবেন, ইহা বোধ হয় না। জনরব যে, রাজা গণেশ প্রথমতঃ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিতেন; এমন কি, কুতব আলমের পুত্র আনোয়ারউদ্দিনকে ধনলোভে সুবর্ণগ্রামে লইয়া গিয়া উৎপীড়িত করেন। সুবর্ণগ্রামে আলাউল্-হকের পূর্ব্বপুরুষদের প্রচুর সম্পত্তি আছে বলিয়া লোকসাধারণের বিশ্বাস ছিল। আনোয়ারউদ্দিনকে ধনলোভে বধ করা হইল বটে, কিন্তু সম্পত্তি পাওয়া গেল না। কুতব আলম, গণেশের দৌরাত্ম্যদমনের জন্য জৌনপুরের সুলতান্‌কে বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য অনুরোধ করেন। জৌনপুরের সুলতান, বাঙ্গালার সীমান্তে উপস্থিত হইলে, গণেশ, কুতব আলমের শরণাগত হন। জৌনপুরাধিপতি কুতবের আদেশে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। অন্যরূপ জনরব যে, রাজা গণেশ মুসলমানদিগের অপ্রিয় ছিলেন না; এমন কি, মুসলমানেরা মৃত্যুর পর ইঁহাকে সমাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

গণেশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যদু সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন নাম ধারণ করেন। মুসলমান না হইলে হয় ত তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন না। রাজ্য লোভে মুসলমান হইয়াছিলেন, কি কুতব আলমের ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। ইনি মুসলমান হইয়া পিতার নির্ম্মিত সমুদয় দেবমন্দির চূর্ণ করেন, এবং মুসলমানধর্ম্ম-প্রচারের জন্য পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় অত্যন্ত অত্যাচার করেন। বাঙ্গালার কোনও মুসলমান রাজা ধর্ম্মপ্রচারের

জন্য এত অত্যাচার করেন নাই। ৮৫১ হিজিরিতে কুতবের পরলোক হয়। কুতব আলমের সমাধিমন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ছয় হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সম্পত্তির নাম ষষ্‌হাজারি।

শাহ জালালের দরগার নাম বড় দরগা। কুতব আলমের দরগার নাম ছোট দরগা। যে দরজা দিয়া বড় দরগার দিকে যাইতে হয়, তাহার নাম সলামি দরজা। প্রবাদ যে, শাহ জালাল এখানে আসিয়া প্রথমে উপবেশন করেন। যে দরজা দিয়া ছোট দরগার দিকে যাইতে হয়, তাহার নাম বেহেস্ত দরজা। পাঠান রাজগণ শাহ জালাল ও কুতব আলমের অত্যন্ত সম্মান করিতেন। হুসেন শাহ একদালা দুর্গ হইতে প্রতিবৎসর হাঁটিয়া পাণ্ডুয়ায় আসিয়া এই দুই দরগায় সম্মানপ্রদর্শন করিতেন। প্রতিবৎসর রজব মাসের ২২শে তারিখে পাণ্ডুয়ায় শাহ জালালের উৎসব হইয়া থাকে। নানাস্থান হইতে মুসলমান ফকীর ও গৃহস্থ এই মেলায় আসিয়া থাকে।

এ অঞ্চলে শাহ জালালের বড় নাম ও মান। হজরৎ শাহজালাল মোকদমপীর নামেও পরিচিত। প্রবাদ যে, শাহ জালাল হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে ভালবাসিতেন। লোকে বলে, তিনি মহানন্দার গর্ভ হইতে বহুবর্ষ ধরিয়া ধ্যানমগ্ন এক হিন্দু যোগীকে উত্তোলন করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের সাধারণ-লোকে বলে যে, হজরৎ মোকদমপীর বাঘে চড়িয়া এক হিন্দু সাধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন; সন্ন্যাসী প্রাচীরে চড়িয়া প্রত্যুদ্‌গমন করিতে যাইতেন; নদীর মাঝখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত। শাহপুর, মোকদমপুর ও কুতবপুর নামের বহু গ্রাম এ জেলায় বিদ্যমান আছে। সে সব গ্রামের সঙ্গে ইঁহাদের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য।

শাহ জালালের সময় হইতে মোকদম সন নামে একটি অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এই সনের উল্লেখ দেখিয়াছি।

কুতব আলমের বংশীয় মোকদমশাহ নামক ব্যক্তি পাণ্ডুয়ার সোনামস্‌জিদের নির্ম্মাতা। এই সোনামস্‌জিদের অপর নাম কুতুবসানি মস্‌জিদ্। ইহা ছোট দরগার সংলগ্ন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

——::•::——

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

দয়াশীলা নর্ত্তকী—বালামণি।

মাদুরা নগরে একটি নর্ত্তকী আছে,—সে যেমন রূপলাবণ্যের জন্য—সেই-রূপ বদান্যতার জন্যও প্রখ্যাত। এই শ্রেণীর রমণীদিগের চিরপ্রথা-অনুসারে, বালামণি প্রথমে এক জন নবাবের রক্ষিতা ছিল। নবাব, মৃত্যুকালে, তাঁহার সমস্ত হীরা জহরৎ তাহাকে দিয়া যান। তাই পুত্তলীর ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ মণিরত্নে বিভূষিত। এখন সে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী ও স্বাধীনা। কিন্তু তাহার ধন ঐশ্বর্য্য শিল্পকলার অনুশীলনে ও দানধর্ম্মেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। বালামণি একটা নাট্যশালা স্থাপন করিয়াছে;—আমাদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ভারতে যে সব নাটক রচিত হয়, সেই নাটকগুলি, নিজ মনোহর অভিনয়ের দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমি আজ রাত্রে, সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে, তালীবনের মধ্য দিয়া, সেই দয়াশীলা নর্ত্তকী বালামণির নাট্যালয় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাল তরুর শাখাগুলি, সুদীর্ঘ ভঙ্গুর বেতসের ন্যায় অবনত হইয়া আছে, এবং সেই শাখা-প্রান্তবর্ত্তী কৃষ্ণকায় পত্রপুঞ্জ, মৃদুল অনিলে সঞ্চালিত হইয়া, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে।

আমি যখন আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলাম, তখন বালামণি রঙ্গপীঠে অধিষ্ঠিতা;—চিত্রিত পুষ্পোদ্যানের পশ্চাদ্ভাগে, পরী-প্রাসাদের ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণময় চূড়াগৃহের মধ্যে বন্দিভাবে অবস্থিত হইয়া, গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়া, বীণা বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতেছিল। বালামণি এক জন রাজকুমারী, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের কোনও রাজার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং সেই রাজা তাহার উদ্দেশে এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রথম আরম্ভ হইতেই, তাহার বীণা-বাদনে, তাহার কণ্ঠস্বরে, শ্রোতৃবর্গের চিত্ত বিমোহিত। পুরাতন উৎকীর্ণ চিত্রাদি হইতে তাহার সাজসজ্জা অনুকৃত হইয়াছে। তাহার পার্শ্বমুখের ছায়া-ছবিটি অপূর্ব্ব সুন্দর। এই গায়িকার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিতে, তাহার ভূষণ-সমাচ্ছন্ন অঙ্গের হীরক মাণিক্যগুলি ঝিক্‌ মিক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

অন্য নাট্য সজ্জাগুলিতে, এমন একটি অবোধ শিশুসুলভ সারল্য প্রকটিত

যে, দেখিলে একটু আমোদ বোধ হয়; এবং সেই সঙ্গে, বিদেশভূমির ভাব, দূরত্বের ভাব, মানস-পটে অঙ্কিত হয়। নাট্যশালাটি অতীব বিশাল; উহাতে সহস্রাধিক লোক ধরিতে পারে; কিন্তু উহার গঠনে কোন প্রকার মার্জ্জিত-রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না;—মন্দিরের ধারে, ধর্ম্ম-মহোৎসবের সময়ে যেরূপ গৃহ এখানে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ কাঠ দর্ম্মা বাঁশ দিয়া হাল্‌কা ধরণে নির্ম্মিত। রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে, পুরাতন রাজবংশীয় রাজকুমারীদিগের বসিবার কক্ষ। কিন্তু, আজ তাঁহারা আসিবেন না, আজ তাঁহাদের "আসিবার দিন" নহে। আর সর্ব্বত্রই, নাট্যশালার সমস্ত আসনগুলিই প্রেক্ষকবর-মণ্ডলীর দ্বারা অলঙ্কৃত। ঘরের ভিতরটা খুব গরম, এবং ফুলের গন্ধে আমোদিত।

সেই লুপ্ত ভাষা—যে ভাষা হিন্দু ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মাতৃস্থানীয়া,—সেই সংস্কৃত ভাষায় বালামণি গান গাহিতেছে, এবং সেই ঘোর পুরাকালে নাটকটি যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে সমস্তটা অভিনীত হইবে; শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে, আমি ছাড়া আর সকলেরই এতটুকু পাণ্ডিত্য আছে যে, উহা শুনিয়া বুঝিতে পারে।

আখ্যানবস্তুটি মোটামুটি এইরূপ; আজ রাত্রে, বালামণি যাহার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সেই রাজকুমারীকে, সাত জন রাজকুমার—সকলেই সহোদর ভ্রাতা—এক সঙ্গে ভালবাসে। পাছে কোন ভ্রাতার মনে কষ্ট হয়, এই জন্য তাহারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কেহই উহাকে বিবাহ করিবে না; এমন কি, তাহাদের পিতা, যে ভ্রাতার জন্য এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, সেও উহাকে বিবাহ করিবে না, এইরূপ শপথ করিয়াছে। প্রথম প্রথম, তাহারা সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছিল, রাজকুমারীর বন্ধুত্বে ও তাহার স্মিত-হাস্যেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু একদিন যখন তাহারা মৃগয়ার্থ কোন বনে গমন করে, কতকগুলা দুরাত্মা দৈত্য, শুদ্ধসত্ত্ব শুভ্রকেশ মুনির রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে ছলিতে আসিল। তাহাদের প্রত্যেকের মনে কামজ লালসা উদ্বোধিত করিয়া দিয়া, এবং নানা প্রকার মিথ্যা কথা রটনা করিয়া, পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উত্তেজিত করিয়া দিল। তখনই বিদ্বেষবুদ্ধিও দুর্ভাগ্য প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু কোনও দুষ্কর্ম্ম আচরিত হইবার পূর্ব্বেই, দেবযোনিরা এ দিকে, অনেক যুঝাযুঝির পর, তাহাদের আত্মাকে আবার অধিকার করিল। তখন আবার রাজকুমারগণ

স্বকীয় চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিল, এবং সেই রাজকুমারীর সহিত ভগিনী-সম্বন্ধ পাতাইয়া, কোনপ্রকারে কালযাপন করিতে লাগিল। পরে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, যখন তাহাদের সমস্ত বাসনা নির্ব্বাপিত হইল, তখন তাহারা কর্ত্তব্য-পালনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল; এবং তাহাদের গৃহ আবার সুখশান্তিতে পূর্ণ হইল। প্রত্যেক অঙ্কের শেষে, কিছু কালের জন্য যে সময়ে বিরাম হয়, সেই বিরামকালে, আমি বালামণির নেপথ্য-কক্ষে গমন করিলাম, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এ সংবাদ পূর্ব্বেই তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। আমি তাহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিলাম, এবং বলিলাম, তাহার গৃহীত রাজকুমারীর ভূমিকাটি বিশুদ্ধরূপে অভিনীত হইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র কক্ষটি নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের—মেজে সপ্ দিয়া মোড়া। তাহার ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হীরক-অলঙ্কার ও অঙ্গভূষণাদি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়,—মনে হয়, চাষার কুটীরে কোনও ঔপন্যাসিক দৈত্য আসিয়া এই সকল বিচিত্র উপহার বুঝি বর্ষণ করিয়াছে। কক্ষদ্বারে আসিবা-মাত্রই, তাহার ভৃত্যেরা, চিরপ্রথানুসারে, জরি-বিজড়িত একটি স্থূল ফুলের মালা সহজ-শোভন শিষ্টতা-সহকারে, আমার গলায় পরাইয়া দিল। বালামণি বিশ্রব্ধভাবে আমার নিকট প্রকাশ করিল,—পুরাতন উৎকৃষ্ট নাটকগুলি যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। আমি যখন বলিলাম, আমার ফরাসী বন্ধুবর্গের নিকট আমি তাহার কথা বলিব, তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

তাহার পরদিন, কোন একটা সাধারণ স্থানে, তাহার সহিত পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হইল;—মান্দ্রাজ-রেলপথের ষ্টেশনে;—দুঃখের বিষয়, এই রেল-পথ মাদুরা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বালামণির সঙ্গে দুই জন ভৃত্য। মফস্বলের ভূসম্পত্তি পরিদর্শন করিতে যাইবে, তাই ট্রেণ ধরিতে এখানে আসিয়াছে। এখানকার দীন-বসনা জনতার মধ্যে বালামণিকে পথহারা পরীর মত দেখাইতেছিল। দূর হইতে মনে হইতেছিল, যেন একটি তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তাহার কাণে হীরক, তাহার কণ্ঠে হীরক, তাহার বক্ষে হীরক। কর-প্রকোষ্ঠ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত—তাহার সমস্ত নগ্নবাহুতে হীরক-অলঙ্কার। তাহার চারু ক্ষুদ্র নাসিকা হইতে একটি নথ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে;—তাহাতে যে হীরকগুলি রহিয়াছে, তাহা আরও দুর্লভ ও উজ্জ্বল। তাহার জরির-পাড়-ওয়ালা হল্‌দে শাড়ী ও তাহার রেশ্‌মি কাঁচুলি—এই উভয়ের মাঝখানে,

গাত্রের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে—আর এই গাত্র সুন্দর ধাতু-স্তম্ভের ন্যায় সুচিক্কণ—সেই সঙ্গে স্তনযুগলের অকলুষিত তলদেশও অল্প অল্প দেখা যাইতেছে; আর একটু ঊর্দ্ধে, আঁটা সাঁটা পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া, সলজ্জ স্তনযুগলেরও একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে। (সায়ংকালে আমাদের রমণীরা বক্ষের ঊর্দ্ধভাগটি খুলিয়া রাখে; কিন্তু নিম্নভাগটি খুলিয়া রাখায় যে কি অসুবিধা, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না;—উহাতে বেশী কৌশল খাটাইবার আবশ্যক হয় না—এইমাত্র) তা ছাড়া, এই নর্ত্তকীর সাজসজ্জায় বেশ একটু সংযম ও গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হইল। বারাঙ্গনাদিগকে যে ধরণে নমস্কার করিতে হয়, সেই ধরণে আমি উহাকে নমস্কার করিলাম। রত্ন-ভারাক্রান্ত করযুগলে ললাট স্পর্শ করিয়া ভারতীয় ধরণে সে আমাকে প্রতিনমস্কার করিল। তাহার পর, পরিজন-সমভিব্যাহারে গাড়ীতে উঠিল * * * কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে কক্ষটি রক্ষিত, সেই কক্ষে গিয়া বসিল।

ষ্টেশনের সমস্ত কদর্য্য সাজসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, যখন আমি দেবী-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখনও আমার নেত্রমুকুরে বালামণির ছবিটি প্রতিবিম্বিত। আরও কত সৎকার্য্য সে করিয়াছে, তাহার বিবরণ আজ অনেকের মুখে শুনিলাম। তাহার একটি সৎকার্য্যের উল্লেখ করি;—গতমাসে, কতকগুলি য়ুরোপীয় মহিলা, হিন্দুবালিকা-অনাথাশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়া, একটা গৃহের নিকটে আসিয়া যখন দ্বারে আঘাত করিলেন, তখন বালামণি, স্মিতমুখে, একহাজার টাকার নোট তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিল। বালামণি জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকে, তাহার গৃহের পথটি দরিদ্রমাত্রেরই সুপরিচিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তন্ত্র।

উৎপত্তিকাল প্রস্তাবনা।

তান্ত্রিক বিধি প্রথমতঃ কোন্ সময়ে এবং কি অবস্থার অনুকূলতায় প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা সহজ নহে। তন্ত্র নামে এখন যে

গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়, অথবা ইতিপূর্ব্বে যে ২৮ খানি তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, যদি কেবল সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই একটি সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে মীমাংসাটা সহজ হইতে পারে বটে। প্রচলিত তন্ত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বর্গীয় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, "তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হয়। এ বিষয়ে সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই।" তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, "তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় প্রকৃতি এরূপ যে, পরকীয় অধিকারের প্রভাব দেশের উপর পতিত না হইলে সেরূপ হইতে পারিত না।"

নীলতন্ত্রে অনেক খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ আছে; উড্ডীশ, ক্রিয়োড্ডীশ ও ফেৎকারিণীতেও অনেক বাঙ্গলা ছড়া মন্ত্ররূপে রহিয়াছে; রাধাতন্ত্রের "ঢলঢলেতি লোচনায়" বঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ পাই; বৃহন্নীল তন্ত্রে "কালীঘট্টং গুপ্ততীর্থং" আছেন; কামধেনু তন্ত্রে বাঙ্গালা ক-কারের বর্ণনা আছে; কুমারী তন্ত্র ও রুদ্রযামলে বৈদ্য বলিয়া স্বতন্ত্র জাতির নাম আছে; এবং প্রায় সকল-গুলিতেই বর্ণানুক্রমে স্তোত্র-রচনায় অন্তঃস্থ ও বর্গীয় ব-এর প্রভেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। এই অতিস্থূল আলোচনাতেও প্রচলিত তন্ত্রগুলি যে অর্ব্বাচীন, এবং বঙ্গদেশে প্রকটিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রচলিত তন্ত্রগুলি ব্যতীত আরও তন্ত্রগ্রন্থ ছিল কি না, এবং এখনও অনেক অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে কি না, তাহা যখন জানা নাই, তখন উল্লিখিত গ্রন্থগুলি দেখিয়া ভূদেব বাবুর মত সাবধানে বলা যাইতে পারে যে, তন্ত্র শাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হয়। প্রকটিত হয়, কথা দ্বারা, উৎপত্তিস্থান বা সময়ের সিদ্ধান্ত হয় না।

ভূদেব বাবুর বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তির স্থান সম্বন্ধে একটি প্রবাদবচন উদ্ধৃত আছে। তাহা এই :—

> গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা, মৈথিলী প্রবলীকৃতা।
> কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা।

এই প্রবাদটির বয়স কত, না জানিলে, স্থাননির্ণয় সহজ হইবে না। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে গৌড় বলিয়া কোন স্থান বা দেশের নাম পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে যে গৌড় বলিলে বঙ্গদেশ বুঝাইত না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গৌড় তখন মিথিলার উত্তর-পশ্চিমে ছিল; সম্ভবতঃ

অযোধ্যা প্রদেশের 'গণ্ডা' গৌড় নামের চিহ্ন। মৎস্যপুরাণে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, ঈক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এবং সেই শ্রাবস্ত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ"। তাহা হইলেই নেপালের অংশ লইয়া কোশল পর্য্যন্ত গৌড়দেশ ছিল। অন্য প্রমাণের এখানে প্রয়োজন নাই। নেপালে তান্ত্রিক ধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার আছে; বঙ্গ অপেক্ষাও অধিক। প্রবাদটি প্রাচীন হইলে উৎপত্তিস্থান বঙ্গ হয় না।

ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে দক্ষিণাপথের অংশবিশেষ মহারাষ্ট্র নাম পায় নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহাশয়ের গ্রন্থ পড়িতে পারেন। মরু প্রদেশের দক্ষিণে ও মালবের পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রাদি দেশ, ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে "লাট" নাম পাইয়াছিল। ঐ দেশের গুর্জ্জর নাম আরও পরবর্ত্তী। গুর্জ্জরদেশে যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের বামাচার অনুষ্ঠান খুব প্রবল হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক কথা। "গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা" পড়িয়া মনে হয় যে, প্রবাদ শ্লোকটির রচয়িতা এক জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি; এবং সম্ভবতঃ গৌড় শব্দ বঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত নহে।

প্রচলিত তন্ত্রগ্রন্থগুলির রচনাকাল হইতে এই বিশেষ সাধনবিধির উৎপত্তির সময় জানা যাইতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্য ও অন্যান্য প্রাচীন আচারাদির চিহ্ন হইতে দেখিতে হইবে যে, তান্ত্রিক সাধনার যেগুলি বিশেষত্ব, সেগুলি কত দিন হইতে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের বিশেষত্বগুলি এই:—(১) মাতৃরূপে শক্তিরূপিণী দেবীর স্বতন্ত্র পূজা; এবং পরে দেবতার উপর শক্তির প্রাধান্যস্থাপন। (২) তান্ত্রিক সাধনার দীক্ষায় সর্ব্বজাতির অধিকার। (৩) মন্ত্রবলে মারণ উচাটন বশীকরণাদি। (৪) পতঞ্জলির যোগ হইতে ভিন্ন নূতন এক যোগসাধনারবিধি; উহাতে ঈড়া পিঙ্গলাদি নাড়ী আছে, কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন; শরীরের নানা স্থানে পদ্মের কল্পনা আছে; ইত্যাদি। (৫) কুমারীপূজা, (৬) ভৈরবীচক্র। (৭) শ্মশানে পূজা ও শব-সাধনা। (৮) ভৈরবীচক্রে জাতিভেদ পরিত্যাগ। (৯) সংসর্গবিশেষকে মোক্ষসাধনার অঙ্গীভূত করা। (১০) সাধনাপ্রণালীগুলি গুহ্যাতিগুহ্য করিয়া গুপ্ত সাধনা। এই বিশেষত্বগুলির উৎপত্তির সময় ও কারণনির্দ্দেশের পর দেখিতে হইবে যে, ঐগুলি এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া নূতন তন্ত্রশাস্ত্র কখন প্রবর্ত্তিত হইল?

১০ দেবী বা দেবশক্তির পূজা।

বেদে উষা আছেন, পৃথিবী আছেন; ইঁহারা স্বতন্ত্রভাবে পূজিতা হইতেন; কিন্তু ইঁহারা কেহ তন্ত্রের শক্তিরূপিণী দেবী নহেন। ঋগ্বেদে কোন কোন দেবতার পত্নীর কথাও আছে, কিন্তু ঐ পত্নীরা স্বতন্ত্ররূপে দেবী বলিয়া গণিত হয়েন নাই; পূজাও পান নাই। ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিলাম।

বেদে যে দেবপত্নীদিগের কচিৎ উল্লেখমাত্র আছে, শতপথ ব্রাহ্মণের (বিলাতের প্রাচ্যধর্ম্মগ্রন্থাবলী সংস্করণে) সময়ে তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র পূজা-বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এখানে তাঁহারা কেহ জগন্মাতা নহেন, অথবা শক্তি বলিয়া পূজিতা নহেন।

বেদত্রয়ে যাহা নাই, অথবা বেদের ব্রাহ্মণভাগে যাহা নাই, তাহাই যে এ দেশে ছিল না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। বেদাদি ছিল প্রাচীন আর্য্যদিগের গ্রন্থ; এবং আর্য্যেরা এতদ্দেশবাসী অনার্য্যজাতির মধ্যে সংখ্যায় অল্প ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে অনার্য্যেরা বহুপরিমাণে আর্য্যসমাজে স্থান পাইয়াছিল; এবং আর্য্যেরা এই অনার্য্যদিগের অনেক ধর্ম্মবিশ্বাসও আত্মস্থ করিয়াছিলেন। এ কথার প্রমাণ অন্যান্য প্রবন্ধে অনেকবার দিতে হইয়াছে; এখানে আবার তাহা লইয়া দীর্ঘভূমিকা করিতে গেলে সুবিধা হইবে না। অনার্য্যের যখন কোনও সাহিত্য নাই, তখন এই শক্তিপূজার বীজ তাহাদের মধ্যে ছিল কি না, এবং ঐ ধর্ম্মভাব বেদের মত পুরাতন কি না, তাহা বলা যায় না। আর্য্যেরা ত্রয়ী বলিয়া বেদের বর্ণনা করিয়া অথর্ব্বকে উপেক্ষা করিতেন। উপেক্ষা করুন; কিন্তু ঐ অথর্ব্ববেদ আর্য্যের ভাষায় লিখিত অতি পুরাতন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের অনেক মন্ত্র দেখিয়া অনুমান হয় (বোম্বাই সং; এবং ডাক্তার ম্যাক্‌ডোনেলের বেদবৃত্তান্ত) যে, এ দেশে শক্তিময়ী দেবীপূজা পুরাতনকালে অজ্ঞাত ছিল না। তবে সে কোন্ সমাজের ধর্ম্মের কথা, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে।

প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে এ দেশে বেদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল, বেদ কি, কেহই জানিত না। তাহার পর ঐ লুপ্ত বেদের উদ্ধার হয়, এবং উহার বিভাগ বা ব্যাস হইয়া, সংহিতা রচিত হয়। প্রাচীনতম আর্য্যগ্রন্থেও এই প্রবাদ আছে; ইহার সত্যতায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না।

এরূপ স্থলে অতিপ্রাচীন বেদের কালনির্ণয় করা, অথবা উহার মন্ত্রগুলি হইতে সঠিক প্রাচীন ইতিহাস বাহির করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বৈদিক যুগের পর, পৌরাণিক যুগের সর্ব্বাধিক পূজ্য (প্রথম গ্রন্থ বলিলেও ক্ষতি হয় না) মহাভারতসংহিতার আলোচনা করিব। মহাভারতে প্রায় সকল দেবতাকেই সপত্নীক দেখিতে পাই। এই প্রবন্ধের প্রয়োজনের মত কয়েকটি নামের উল্লেখ করিতেছি। মহেশ্বরের একটি অশরীরিণী মাহেশ্বরী শক্তির পরিবর্ত্তে মহাদেবের পত্নীর নাম পাই পার্ব্বতী, বা উমা ; মহাদেব হইতে স্বতন্ত্ররূপে আদিত্যস্বরূপ রুদ্রের পত্নীর নাম ব্যাকরণনিষ্পন্না রুদ্রাণী। তাহার পর বরুণের পত্নীর নাম গৌরী, এবং সাগরের পত্নীর নাম জাহ্নবী। এই দেবীগুলি যখন দেবপত্নী, তখন ইঁহাদের পূজা থাকা অসম্ভব নহে ; কিন্তু মহাভারতে উঁহাদের নামে স্তবস্তুতির সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ভূতপ্রেতিনী বলিলে যাহা বুঝায়, সেই অর্থে অনেকগুলি মাতৃকার নাম পাওয়া যায়। ঠিক পূজা না হউক, উহাদের শান্ত করিবার বিধি ছিল। পুরাণে মাতৃকার তালিকায় কালী আছেন, এবং মনুসংহিতায় কুলদেবতার (মাতৃকা) পূজায় ভদ্রকালীর পূজা বিহিত আছে।

মহাভারতে সর্ব্বত্রই দেববর্গের নামে পূজা ও স্তুতি, এবং ঐ দেববর্গের মধ্যে বিষ্ণু (তদ্‌ভেদে কৃষ্ণও বটেন) এবং মহেশ্বর প্রধান। দেবীর আরাধনা ও পূজা নাই লিখিয়াছি, কাজেই এ স্থলে আমি ভীষ্মপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত "দুর্গাস্তোত্র" সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাধ্য। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, সকল দেশের মহাভারতে ঐ স্তোত্র পাওয়া যায় না। বঙ্গবাসী যে বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর মহাভারত অনুবাদ করিয়া বহুপরিমাণে বিতরণ করিয়াছেন, উহাতেও দেখিতে পাইবেন যে, ঐ গ্রন্থের বিরাটপর্ব্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দুর্গাস্তোত্র নাই। দুর্গাস্তোত্র না করিয়াই যুধিষ্ঠির বিরাটরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। যে গ্রন্থে ঐ স্তোত্রটি আছে, তাহা হইতে উহার মর্ম্ম অবগত করাইতেছি। দেবী দুর্গার বর্ণনায় সর্ব্বপ্রথমেই আছে যে, ইনি "যশোদাগর্ভসম্ভূতা" ; তাহার পর, "নন্দগোপকুলে জাতা" ইত্যাদি। যুধিষ্ঠির স্তোত্র-সম্বোধনে বলিয়াছেন :— "নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে, কুমারি ব্রহ্মচারিণি,...চতুর্ভুজে, চতুর্বক্ত্রে,...ময়ূর-পিচ্ছবলয়ে" ইত্যাদি। তাহার পর আবার "কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা, শঙ্কর্ষণসমা-ননা"..."কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পালিতং ত্বয়া", "বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।"

প্রথমতঃ দেখুন, ইনি দশভুজা গৌরী নহেন; ইনি চতুর্ভুজা ও কৃষ্ণবর্ণা। অর্থাৎ, ইনি দুর্গা নহেন। ইনি কালীও নহেন; ললনা চতুর্বক্ত্রা; দশমহাবিদ্যার মধ্যে কোথাও চতুর্ব্বক্ত্রা নাই। দ্বিতীয় কথা, ইনি হিমালয়ের দুহিতা নহেন, এবং মহাদেবের পত্নীও নহেন, ইনি ব্রহ্মচারিণী কুমারী। কখনও কুমারী ছিলেন বলিয়া ঐ প্রকার সর্ব্বকাল-বোধক বিশেষণ প্রদত্ত হয় না; ঐটিই এখনও বিশিষ্টভাব। তৃতীয়তঃ দেখুন যে, ইঁহার পরিচয় যশোদার গর্ভে নন্দগোপকুলে জাতা বলিয়া। কৃষ্ণ-জন্মের সময়ে দেবী কাত্যায়নী-রূপে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, ইনি তিনি। ইনি যদি পার্ব্বতী হইতেন, তাহা হইলে গোপকুলের পরিচয়টি প্রথম, প্রধান ও একমাত্র পরিচয়ের স্থল হইতে পারিত না। এই কাত্যায়নী যেন জাতি-বিশেষের একটি স্বতন্ত্র কুলদেবতা। ইঁহার অস্তিত্ব যেন প্রথমতঃ ঐ ভাবেই ছিল, এবং পরে উমার সহিত অভেদত্ব ইনি লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, ইনি বিন্ধ্যবাসিনী দেবী; ইঁহার খাঁটি আবাস হিমালয় প্রভৃতি স্থানে নহে, কেবল বিন্ধ্যপর্ব্বতে।

মহাভারতে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গার স্তোত্র আছে, এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া যদি একবার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যে উঁহার উল্লেখ নাই। কানোজপতি যশোবর্ম্মা যখন গৌড়দেশ (এখানেও গৌড় অর্থে মগধদেশ, বঙ্গ নহে; গৌড়ে মগধপতিকে পরাজয় করিয়া পরে বঙ্গ-জয়ের কথা আছে) জয় করেন, সেই সময়ে তাঁহার সভাকবি গৌড়বহো (গৌড়বধ) কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত। এই প্রাকৃত কাব্যে বিন্ধ্যবাসিনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। রাজা যশোবর্ম্মা যাইতে যাইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন যে, হলুদের পাতা মাত্র পরিহিত অনার্য্য শবরেরা বিন্ধ্যবাসিনী নামক তাহাদের কালীকে নরবলি প্রভৃতি অনার্য্য অনুষ্ঠানে পূজা করিতেছে; আর অনার্য্য রমণীরা সেই ভীষণ বলিদান দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছে। এ ঠাকুরাণীও ময়ূরপিচ্ছবলয়া। (শ্লোক-সংখ্যা—২৮০—২৮৪, ৩১৯, ৩২৯, ৩৩৮)। রাজা বলিলেন যে, ইনি অনার্য্যের কালী হইলেও দেবীত বটেন; অতএব পূজা করা উচিত। তখন তিনি কয়েকটি স্তোত্র পাঠ করিলেন।

স্তোত্রগুলিতেও দেবীর ভীষণতার ও অনার্য্যাশ্রিতা বলিয়া অনেক কথার বিশেষ বর্ণনা আছে। (২৯৭—৩১০)।

ইহা দেখিলে আর সন্দেহ থাকে কি যে, বিরাট পর্ব্বের দুর্গাস্তোত্র অনেক পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত রচনা? যখন ঐ স্তোত্রটি যোজিত হইয়াছিল, তখনও এই দুর্গা জাতিবিশেষের কুলদেবতা, কিন্তু পার্ব্বতী নহেন। দুর্গা-স্তোত্র বাদ দিয়া মহাভারত পড়িয়া দেখিবেন যে, অন্য কুত্রাপি এই দুর্গার নাম গন্ধ নাই; এবং ইনি মহাদেবের পত্নী-স্থানীয়া ত নহেনই, উপরন্তু মাতৃকাবর্গের কোনও মাতৃকা বা প্রেতিনীও নহেন।

বিরাট পর্ব্বের দুর্গাস্তোত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ভীষ্ম পর্ব্বের দুর্গাস্তোত্রে প্রায় তাহার সকল কথাই খাটে। বিরাট পর্ব্বেও যেমন, এখানেও তেমন; এই স্তোত্রটি তুলিয়া দিলে কোনও অধ্যায়ের ভাবের সহিত অন্য অধ্যায়ের ভাবে গোল পড়ে না। বরং এই স্তোত্রটি নিতান্ত খাপ্‌ছাড়া। এখানেও দেবীটি কুমারী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, গোপেন্দ্রাত্মজা ও নন্দকুলোদ্ভবা। পুনশ্চ ইঁহাকে কৌশিকী (কুশিক-কুলোৎপন্না, ইতি নীলকণ্ঠকৃতা টীকা) বলা হইয়াছে; কিন্তু হিমালয়নন্দিনী বলা হয় নাই। এখানে আর একটি বিশেষণ আছে,—কোকমুখা। কোকমুখা শব্দের অর্থ, যাহার মুখ চক্রাকার বৃত্তের মত। "নিত্যং বসসি পাতালে" দ্বারাও পার্ব্বতীর স্বরূপ মনে পড়ে না। কিন্তু এই স্তোত্রটিতে শিবপত্নী বলিয়া একটু উল্লেখ আছে; কেন না, ইঁহাকে মাতাও বলা হইয়াছে। ইহাতে কুমারী কন্যার সহিত বিরোধ হয়। স্তোত্র দুইটি যখন পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, তখন এই দুর্গা গোপকুলের কোনও কাত্যায়নীবিশেষ কি না, তাহার বিচার অনাবশ্যক। স্বরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ইনি মূলতঃ পার্ব্বতী নহেন।

মনুর স্মৃতিতে যখন ভদ্রকালীর পূজার কথা আছে, এবং অপবিত্র গ্রামযাচকেরা গণ বা ভূতাদির পূজা করিয়া নিন্দিত হইত বলিয়া উল্লেখ পাই, তখন সর্ব্বগ্রাহ্যরূপে না হইলেও, এ দেশে মাতৃকাদিপূজা বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মহাদেবের অনুচর অনুচরীরা হইলেন, গণ ও মাতৃকা। মাতৃকা শব্দের মূলে যে অর্থই থাকুক, উহাতে মাতা অর্থের আরোপ করা ও মাতৃকাবর্গকে শিবপত্নী করা অতি সহজ ছিল। শৈব ধর্ম্মের বিশেষ প্রবলতার সময়ে উঁহাদের বিশেষ পূজাআসনে স্থাপিত হইবার কথা। তাহা হইলে চতুর্থ শতাব্দী হইতে দেবী-

পূজার বিশেষ ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বের কোনও প্রাচীন প্রস্তরলিপি প্রভৃতিতে 'কাত্যায়নী' নাম পাওয়া যায় না, এবং ঐ যুগে কোনও আরাধ্যা শক্তির মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

২—তান্ত্রিক দীক্ষায় সর্ব্বজাতির অধিকার।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবলতার পর, অনেক অনার্য্য জাতি হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এবং ঐ জাতীয়েরা তাহাদের বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা লইয়াও আসিতে ভুলে নাই। এ কথা বিশেষভাবে শিবপূজা প্রবন্ধে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলাম।

পুরাণ-কর্ত্তারা স্বীকার করেন যে, শিশুনাগ বংশের রাজত্বের শেষ হইতেই ক্ষত্রিয় রাজত্বের লোপ, এবং শূদ্রের রাজত্বের আরম্ভ। এ হইল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা। তাহার পর হইতে যে ভারতবর্ষ একেবারে শূদ্রপ্রায় হইয়াছিল, এবং সর্ব্বত্রই শূদ্রের রাজত্ব বিশেষ প্রবলতা লাভ করিয়াছিল, এ কথা পুরাণকর্ত্তারাও বলেন, এবং তৎসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান হইতেও যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

মৌর্য্যেরা শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আদি কুল ও কৌলিক প্রথা হিন্দু ও বৌদ্ধ নীতিতে আবৃত। তাহার পর যবন, শক, পহ্লব, চীন প্রভৃতি বিদেশীয় শূদ্রেরা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে সমাজশরীরে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণে অন্ধ্রেরা নীচ অনার্য্য জাতি বলিয়া উল্লিখিত; কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতেই উঁহারা রাজাধিরাজ হইয়া সর্ব্বাশ্রমের প্রতিপালক হিন্দু ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। তাহার পর আবার, আভীর, রট্ট, গর্দ্দভিল, ভোজ প্রভৃতি এ দেশের উন্নতিশীল অনার্য্য বা শূদ্রেরা রাজত্বগৌরবে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত হইয়া উঠিলেন; এবং বিদেশাগত হূনেরা স্বকান্তি ও প্রভুতার বলে কুলীন ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন। পুরাণে এ কথাও পাই যে, কলির দুরাচারে পুলিঙ্গ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিও রাজা হইয়া রাজন্য-সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সর্ব্বজাতির ধর্ম্মদীক্ষায় অধিকার ঘোষিত হইয়াছিল; তাহার পর আবার অনার্য্যেরা স্বীয় স্বীয় জাতীয় বিধি ব্যবস্থা লইয়া সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িল। যে জাতির যে দেবদেবী ছিলেন, তাঁহারা

সহজেই রাজার সহায়তায় সর্ব্বজনপূজিত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দেবতাগুলিকে আপনার প্রাচীন দেববর্গের সহিত অভেদ ঘটাইয়া দিয়া, নিজ হস্তেই পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা সফলও হইয়াছিল; কিন্তু কুলরীতি-অনুসারে দেবপূজায় স্বীয় স্বীয় অধিকার ও রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রথমতঃ যখন অনার্য্য সমাজগত 'গণ' ও 'মাতৃকার' পূজায় ব্রাহ্মণেরা অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন যে তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় হইতে হইয়াছিল, তাহা মনুসংহিতায় পাই। মধ্যপ্রদেশে ও ওড়িষায় এখনও দেখিতে পাই যে, গ্রামদেবতাদিগের পূজার জন্য হিন্দুরা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু গ্রামের অনার্য্য ঝাঁকর ঐ সকল দেবতার পূজারী।

বিন্ধ্যবাসিনী ছিলেন অনার্য্যের দেবী; অনার্য্য শবরেরাই রুধিরাদি দ্বারা নিজে উঁহার পূজা করিত। দেবী যখন আর্য্যপূজ্যা হইয়া কালী-নাম পাইলেন, তখনও প্রাচীন বনিয়াদী উপাসকদিগকে ভুলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণেরা যখন অনার্য্যের দেবদেবীগুলি অধিকার করিয়া লইয়া সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন পূজাদীক্ষার অধিকারটুকু হইতে প্রাচীন অধিকারী-দিগকে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণত্বের গৌরবের দিনে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-লাভ, শূদ্রাদির পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। ব্রাহ্মণেরাও উহাদিগকে ঐ উপায়ে বাধ্য ও বশীভূত করিয়া রাষ্ট্রোন্নয়নে সহায়তা করিয়াছিলেন। ঠিক্ কোন্ দিনে, কোন্ মুহূর্ত্তে এই অবস্থার উদয় হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। মোটামুটি ২য় হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ে এগুলি ঘটিতেছিল।

শ্মশানে দেবীপূজা, শবরদিগের সনাতন ধর্ম্ম। বাণভট্ট, ভবভূতি ও দণ্ডী তাহার সাক্ষী। সপ্তম শতাব্দীতে উহা উচ্চশ্রেণীর আর্য্যদের গ্রাহ্য না হইলেও যে সমাজের স্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহাও কবিদের বর্ণনা হইতে উপলব্ধ হয়। শবরেরা এ কাল পর্য্যন্তও কুলরীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দেশী "হেরিম্বো" যে সময়েই আর্য্যের পুরাণে গণপতিত্ব লাভ করিয়া থাকুন, উঁহার পূজা যে গণদিগের পূজার বিশে[illegible]র পরবর্ত্তী, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ভদ্রকালী এক[illegible]
কিন্তু মাতৃকাগুলির পক্ষে, স্বতন্ত্রভাবে দেবী সাজিয়া পূজা পাইতে ক[illegible]
বিলম্ব হইয়াছিল। যখন বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দেবী

মহাদেবী হইয়া উঠিতেছিলেন, তখনই দেবীপীঠ ও দশমহাবিদ্যার পুরাণ হইয়াছিল। প্রাচীনকালে পুরাণ বলিয়া যাহা আর্য্যসমাজে স্বীকৃত ছিল, তাহা পরিপূর্ণরূপে মহাভারত-সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছিল। এ কথা মহাভারতেই অঙ্গীকৃত। সে পুরাণে এ সকল কথা নাই; অনেক পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্তও নাই। সাহিত্য দেখিয়া বিচার করিতে গেলে, এ পুরাণ অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

দশমহাবিদ্যার ধ্যানের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, অনেক দেবীই নবাগতা, এবং শিবপত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া পূজিতা। কালীর একটি নাম কুল্লা। এই কুল্লা শব্দ প্রাচীন কোষকারের নিকট অজ্ঞাত। প্রাচীন মাতৃকা-নামেও কালীর এই নাম পাওয়া যায় না।* কাহাদের শ্মশানবাসিনী ললৎজিহ্বা কুল্লা কালী হইয়া উঠিলেন, কে জানে! তারার কথা পরে বলিব, এবং সেই সঙ্গে ছিন্নমস্তার কথাও আলোচনা করিব। ত্রিপুর জাতি চেদি ও হৈহয় রাজার শাসিত দেশে বাস করিত। মালব দেশের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং এই মালব দেশের অনার্য্যদিগের মধ্যে বহু মাতৃকার পূজা প্রচলিত থাকিবার কথা ৫ম শতাব্দীর প্রস্তরলিপিতে পাওয়া যায়। মহাকাল, ভৈরব ও ভৈরবীর সহিত মালব দেশের উজ্জয়িনীতে আমাদের প্রথম পরিচয়। তন্ত্রে ভৈরবীর যথার্থ নাম ত্রিপুর-ভৈরবী বলিয়া উল্লিখিত।

দশমহাবিদ্যা হইলেন পার্ব্বতীর রূপান্তর। হরপার্ব্বতী যে নিত্য-সংযুক্ত দেহধারণ করেন, এবং দেবী যে সতী, এ কথা সর্ব্বপুরাণে স্বীকৃত। অতএব পার্ব্বতীর কোনও রূপান্তরেই তাঁহাকে বিধবা বলা যাইতে পারে না। ধূমাবতী কিন্তু বিধবা। বিধবা অর্থ যে বস্ত্ররহিতা, তাহা কিন্তু নয়। কারণ, ধ্যানে আছে যে, তিনি মলিনবস্ত্রপরিহিতা। এই শূর্পহস্তা বৃদ্ধা কুরূপা কলহাস্পদা বিধবা, সম্পূর্ণরূপে অনার্য্যদের ডাইনীর চিত্র। এখনও মধ্যপ্রদেশের সর্ব্বত্র, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোককে গ্রামের লোক ডাইনী বলিয়া মনে করে। ইঁহার ধূম্রপান, কট্ কট্ করিয়া হাড় চর্ব্বণ ও প্রেতমধ্যে বিচরণ, অতি ভয়ঙ্কর। অন্যত্র হইতে আনীতা বলিয়াই ইঁহার কল্যাণে বুড়া শিবের কপালে একটা বিধবাবিবাহ জুটিয়া গেল। যিনি মূলতঃ "দূরাচারা" এবং "দুর্জ্জন

* তারা প্রভৃতির কথা এখন বলিব না। কারণ, নেপালের তান্ত্রিক ধর্ম্মের কথা একেবারে স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে না লিখিলে চলিবে না।

প্রীতিদায়িনী বলিয়া স্বীকৃতা, তিনিও সুযোগবিশেষে আর্য্যপূজ্যা হইয়া গেলেন।

মহাদেবের পত্নীর প্রাচীন নাম পার্ব্বতী ও উমা। অন্য কোনও নাম নাই। মাতৃকা-দলের প্রেতিনী ব্যতীতও তাঁহার কপালে দশমহাবিদ্যা জুটিয়া গেল। কিন্তু দশভুজা দুর্গাকে, মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত স্তোত্রেও পাই না; এই দশমহাবিদ্যার পর্য্যায়েও পাই না। ইহাতেই মনে হয় যে, দেবীগুলি ধীরে ধীরে আর্য্যসমাজে আসিয়াছেন; এবং নীচজাতীয়েরা তাহাদের নিজের দেবতার পূজা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। শূদ্রাদির পূজার অধিকার যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, ঐ অধিকারটি মঙ্গলজনক।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখি। মহাদেব প্রাচীনকালে দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে তাঁহাকে অনেক পত্নী গ্রহণ করিতে হইল। মাতৃকা ও প্রেতিনীগুলি ত পার্ব্বতীর নামান্তর বলিয়া উল্লিখিত হইয়া, শিবনামে কলঙ্ক দিতে পারে নাই; কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দেখিতে পাই যে, গঙ্গা পার্ব্বতীর সপত্নী। মহাভারতাদিতে গঙ্গা সাগরপত্নী; অর্থাৎ, একটু রূপক। সেই জন্যই গঙ্গার পক্ষে শান্তনুর পত্নী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। মহাদেবী পার্ব্বতী, রূপান্তরে হউন, বা রূপকে হউন, কুত্রাপি পরভোগ্যা নহেন; পরমপূজ্য মহাদেবের সঙ্গে সংস্রব থাকিলেও, গঙ্গাই হউন, আর যিনিই হউন, পরভোগ্যা হইতে পারিতেন না।*

পঞ্চম শতাব্দীর মহিমায় মহাদেবকে সাগরপত্নী শ্যালিকাকে লইয়া পরদার-পাপ করিতে হইল। ভবানীপতির চিরদিনের সুখ্যাতি নষ্ট করিয়া এমন নূতন পুরাণেরও সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাঁহাকে বহুপরিমাণে পরকলত্রগামী করা হইয়াছে। দশকুমারচরিতে অপহার বর্ম্মার গল্পে শিব-কলঙ্কের পুরাণ উপন্যস্ত হইয়া লিখিত হইয়াছে,—"ভবানীপতের্মুনিপত্নীসহস্রসন্দূষণম্"। এত গুণেই তাহার পরে ইনি নূতন তন্ত্রের দেবতা হইতে পারিয়াছিলেন।

৩ ও ৪—মন্ত্রবল ও নবযোগ।

মন্ত্রবল ও নবযোগের কথা বলিতে হইলে, যোগের ইতিহাস লিখিতে হয়। বঙ্গদর্শনে ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেছি; এখানে সবিস্তর সকল কথা

---

* গঙ্গাগর্ভে মহাদেবের বীর্য্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, প্রায় ৩য় শতাব্দীতে স্কন্দের নামে যে নূতন পুরাণ হয়, তাহারই সুবিধায়, সপ্তম শতাব্দীতে গঙ্গাকে পার্ব্বতীর সপত্নীরূপে পাই।

না লিখিয়া অতিসংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। এক প্রবন্ধে সকল কথা লিখিতে গেলে পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির বিশেষ সম্ভাবনা। যাঁহারা সকল কথার বিচার করিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অন্য প্রবন্ধগুলি পড়িলে অনুগৃহীত হইব।

অথর্ব্ববেদে মারণ উচাটনাদির মন্ত্র আছে; ঐ বেদ বহুকাল পর্য্যন্ত আর্য্যের অগ্রাহ্য ছিল; উহার প্রভাব ছিল মগধাদি পূর্ব্ব প্রদেশে, এবং হিমালয়সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য আর্য্যবাসভূমিতে। ঐ দেশে আর্য্যেরা বহুপরিমাণে দ্রবিড়জাতি ও চীনজাতির সহিত মিলিত হইয়া সমাজস্থাপন করিয়াছিলেন। চায়না দেশ হইল মহাচীন, কিন্তু হিমালয় প্রদেশের অধিবাসীরা চিরকাল চীন-জাতীয় বলিয়া খ্যাত, এবং এ দেশের বহু পুরাতন অধিবাসী। দ্রবিড়েরা যে মন্ত্রতন্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ, তাহা কাদম্বরী, হর্ষচরিত, মালতীমাধব প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও জানা যায়। এখনও উহারা মন্ত্রতন্ত্র ও লিঙ্গ-উপাসনার জন্য বিখ্যাত। শিশ্নপূজক অনার্য্যেরা বৈদিক ব্রাহ্মণে ঘৃণিত বলিয়া বর্ণিত। চীনদেশীয়েরা যে অদ্ভুত ক্ষমতা, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতির বিশেষ সাধক, তাহা তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও ভুটানের অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার হইতে এখনও জানিতে পারা যায়। উহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ঐগুলি ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল, তাহা নহে। ঐ বিষয়ের সংস্কারে চীনেরা—হিন্দুদিগের অনেক উপরে; ঐগুলি উহাদের জাতিগত। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত উহাদের মিশ্রণে নূতন রকমের বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, অনেক তান্ত্রিক যোগ ও মন্ত্রতন্ত্র দ্রবিড় ও চীনদিগের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। উহা বৌদ্ধ হইয়া যখন ঐগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, এবং অদ্ভুত আশ্চর্য্য ক্ষমতার লোভে যখন এ দেশের লোক উহার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া-ছিল, তখনই উহার জন্য শাস্ত্র রচিত হইয়া উচ্চস্তরের হিন্দুর জিনিস হইয়া গিয়াছে।

প্রথমে মৃচ্ছকটিকে, তাহার পর দশকুমারচরিতে, চৌর্য্যবৃত্তির জন্য তন্ত্র হইয়াছিল, জানিতে পারা যায়। এই বিদ্যার দেবতা স্বয়ং কুমার পার্ব্বতী-পুত্র। মহাভারতের বনপর্ব্বে স্কন্দের যে মহিমার কথা আছে, (অর্থাৎ ২২২ হইতে ২৩১ অধ্যায় পর্য্যন্ত) সম্ভবতঃ উহা পরবর্ত্তী কালের রচনা। সে কথা থাকুক। লোহিত্যায়নী (রক্তসাগরবাসিনী) স্কন্দের ধাত্রী, এবং তাঁহার দেব-

চিহ্ন বা বাহন হইলেন কুক্কুট। (বনপর্ব্ব—২২৯, ২৩৩। ২২২ হইতে ২৩১ অধ্যায় সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য) তাহার পরে উনি ময়ূর পাইলেন, এবং পাকে চক্রে মহাদেবও পার্ব্বতীর পুত্র হইয়া গেলেন। মাতৃকা হইতে স্কন্দ পর্য্যন্ত, মন্ত্রতন্ত্রের সকল দেবতাই যেন বাহির হইতে আসিয়াছেন।

নেপালে তন্ত্রমন্ত্র ও বহু ব্যভিচারময় সাধনা, শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত এমন সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত যে, নেপালীয়েরা উহা হিন্দুর কাছে ধার করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমার বিশ্বাস যে, নেপালের তারা, আমাদের দশ-মহাবিদ্যার এক দেবী। যখন নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তান্ত্রিক ব্যভিচার যুক্ত দেখিতে পাই, তখন হিন্দুর তন্ত্রের প্রভাবে নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হইয়া তথাগত গুহ্যকাদির সৃষ্টি হইয়াছিল, বলিতে পারি না। ঐগুলিই আমাদের ধর্ম্ম বিকৃত করিয়া তান্ত্রিক বামাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়।

প্রাচীন সময়ের গৌড় দেশ এই নেপালের সন্নিহিত ছিল, এবং নেপালের দক্ষিণ অংশ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। এই গৌড়েই যখন তান্ত্রিক আচারের উদ্ভবের প্রবাদ পাই, তখন সকল দিক দেখিয়া, এই মন্ত্র ও অলৌকিক ক্ষমতার শাস্ত্র নেপালাদি দেশে উৎপন্ন, এবং দ্রবিড়ভাবে পরিপুষ্ট বলিয়া অনুমান করা অধিক সঙ্গত।

দক্ষিণাপথে যখন বাসব নামক এক জন শিশ্নপূজাদি সহ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রচার আরম্ভ করেন, তখন চালুক্য রাজারা সাধকদিগের ভীষণ চরিত্রহীনতা ও ঐ শাস্ত্রের গভীর অপবিত্রতা লক্ষ্য করিয়া, সমূলে উহার ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে কিন্তু রাজারাই হারিয়া গেলেন, এবং বাসব-প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠান নানা স্থানে জাগিয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে তত প্রবল হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র খুব প্রবল হইয়াছিল। গুর্জ্জরের তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বা বামাচার, বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত। এই জিনিসটি বঙ্গদেশের বাউল সম্প্রদায়েও আছে। শ্রীপর্ব্বতের (হায়দরাবাদের কোনও পর্ব্বত কি?) কাপালিক ও অঘোরীরাও কিন্তু গুর্জরে প্রবলতা লাভ করিয়াছিল।

এ সকল কথার বিচার করিলে প্রথম তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে যে প্রবাদ-শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সত্যতা উপলব্ধ হইতে পারিবে। এখন বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রবাদ-শ্লোকের গৌড় বঙ্গ দেশ

৫—৯ কুমারীপূজা প্রভৃতি।

মহাভারতে যে দুর্গাস্তব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, চতুর্ভুজা ও চতুর্বক্ত্রা দুর্গা কুমারী ছিলেন। গোপকুলে কুমারীরা কাত্যায়নীর পূজা ছিল, পুরাণে তাহা জানিতে পারা যায়। কুমারীরা কাত্যায়নীর পূজা করিতেন, ইহাও প্রাচীন কথা। এই কুমারী দুর্গা কত দিন কি ভাবে ও কোথায় সবিশেষ পূজা পাইয়াছেন, তাহা জানিতে পারি নাই। ইনিই যে এখন কৃষ্ণত্ব পরিহার করিয়া গৌরী হইয়া উঠিয়াছেন, এবং শিবপত্নী উমা বলিয়া পূজিতা, তাহা সকলই বুঝিতেছি। তন্ত্রের কুমারী-পূজা অর্থে এ দেবীর পূজা নহে, এ পূজা নারী কুমারীর। এই পূজা প্রাচীন পুরাণে নাই, অথচ এখনও বারণসীতে উহা প্রচলিত আছে। কোথা হইতে কবে উৎপত্তি হইল?

শিশ্নপূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্ত-যোনির পূজা ছিল, এবং আছে। ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের সঙ্গে বেদান্তবাদ মিলিত হইয়া যে অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করিব। বলিয়া রাখি যে, শঙ্করদিগ্বিজয় গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, এই শ্রেণীর শৈবদিগকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরাস্ত হইল কৈ?

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ যতই সূক্ষ্ম হউক, বা সত্য হউক, শিশ্নপূজকেরা কিন্তু উহার সোজাসুজি একটা অর্থ বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। শিবোঽহং, অর্থাৎ আমি উপাসক বা সাধকই শিব, এবং মুক্তিপ্রার্থিনী বা সাধনবলে মুক্তা রমণীরা ভবানী। ফল যাহা হইল, তাহা বুঝাইতে হইবে না। তন্ত্রেও দেখিতে পাই যে, পুরুষেরা সাধনার বলে শিব হইবেন, এবং রমণীরা ভবানী হইবেন; অতি গর্হিত সাধনা প্রক্রিয়ার সময়ের মন্ত্রেও, আমি শিব ও আমি ভবানী উচ্চারিত হইত। হুতোমপেঁচার নক্‌সায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুর এই প্রকারের অনুষ্ঠানের ফলে কাঁধে বাড়ি বলরামের গল্প আছে।

রমণীই ভবানীর মূর্ত্তি; অন্যসংস্পর্শশূন্যা কুমারী আরও পবিত্র। হয় ত এইরূপ একটা কিছু হইতে এই পূজার উৎপত্তি। যে রুদ্রযামল ও কুমারীতন্ত্রে কুমারীগণের শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ তন্ত্রগুলি যে আধুনিক, তাহার পরিচয় দিয়াছি। সংসর্গবিশেষ মোক্ষসাধনের অঙ্গীভূত হইবার পর কুমারীপূজার প্রচলন বলিয়া অনুমান হয়।

দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই প্রকার সাধনাঅবলম্বনকারী তান্ত্রিকের পরিচয় হিন্দু সাহিত্যে আছে কি না, বলিতে পারি না। নেপালের সাহিত্যে আছে, তাহা স্বীকার করি। সর্ব্বপ্রথম একটি আস্ত তান্ত্রিকের সহিত সাক্ষাৎলাভ করি, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত সট্টকে। এ সময়ে মদ্যাদিপানের কৌলিকমার্গ নামক বিশেষ পরিভাষাও হইয়া গিয়াছে। তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ মদ্যপান করিয়া পড়িতেছেন ঃ—

মন্তো ন তন্তো ন অকিং পি জাণং
ঝাণং চনো কিংপি গুরুপ্পসাদা।
মজ্জং পিআমো মহিলং রমামো
মোক্খং চ যামো কুলমগ্গলগ্গা॥

অর্থ এই,—"মন্ত্রেরও ধার ধারি না, তন্ত্রেরও ধার ধারি না; ধ্যানেই বা হয় কি? গুরুর প্রসাদে মদ্যপান করি, আর মহিলা ভোগ করি; এতেই কৌলিকমার্গে মোক্ষলাভ হয়।" তার পর আরও দুইটি শ্লোক আছে। তাহাতে আছে, "বিধবা হোক, কুমারী হোক্, কাহারও ধর্ম্মপত্নী হোক্, সকলকেই তন্ত্রধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করি, এবং মদ্য মাংস সেবা করি।" অপিচ,—"হরিদ্রাক্ষমুখাদি দেবতারা বেদপাঠ ও যজ্ঞ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে বলেন, আমরা কিন্তু মুক্তিলাভ করি 'সুরতকেলিসুরারসেহিং।' শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্পূরমঞ্জরীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

বর্ণনার প্রকৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কবি ভৈরবানন্দকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘৃণিত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তখন ইহাদের প্রাদুর্ভাবও হইয়াছিল, এবং সুধীগণ উহাদিগকে পরিহারও করিতেন। উহারা যে মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন করিতে পারিত, তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। খাঁটি তন্ত্রের সৃষ্টি, কাজেই ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে বলিয়া মনে হয়।

কুমারীগ্রহণে জাতিবিচার নাই; সে যৌবনোন্নতা ও অনুরাগিণী হইলেই হইল। ইহাদের মধ্যে ভোজনেও জাতিবিচার নাই। কিন্তু জাতিভেদ-পরিত্যাগ, কেবল "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে"। উহা দ্বারা ভৈরবীপূজায় প্রবৃত্ত সাধকমণ্ডলীকেই বুঝায় বটে, কিন্তু চক্র কথাটায় একটু বিশেষত্ব আছে। মন্ত্রপূত করিয়া একটা গণ্ডী দিয়া লওয়া, বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সাধনায় বিশেষভাবে একটি চক্র করিয়া

বসিলে, চট্ করিয়া আরাধ্য দেব দেবীর আবির্ভাব হয়। উহার জন্য কতক-গুলি মন্ত্রও আছে। এক দিকে গণেশ ও অন্য দিকে অম্বিকাকে কল্পনা করিয়া, কুশ দ্বারা গণ্ডী শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। এই প্রক্রিয়াটা শিবসংহিতা নামক একালের একখানি যোগগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশ ও একবিংশ শ্লোকের মর্ম্মের অনুরূপ। কে আগে, কে পরে, তাহা বলিতে পারিব না; কিন্তু দুইটিই অর্ব্বাচীন।

তন্ত্রে গুপ্তসাধনা কেন ?

সাধনা গুপ্ত করিবার নাকি ভারি একটা অর্থ আছে, শুনিতে পাই। আমার কার্য্য ইতিহাস-সংগ্রহ, সাধনা নহে; কাজেই গভীর অর্থটার ঐতি-হাসিকের মতই সমালোচনা করিব। সাধকেরা যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করেন।

অধিকারিভেদে গুরু সাধনা দান করিয়া থাকেন, কাজেই সকলের কাছে সকল কথা বলা চলে না। বলা চলে না, এবং গুপ্তসাধনা একরকমের কথা নয়। অধ্যাপক গুরুর চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র পড়ে; কেহ বা বর্ণপরিচয় করিতেছে, কেহ বা ব্যাকরণ পড়িতেছে, এবং কেহ বা ন্যায় শাস্ত্রের পাঠ লইতেছে। বর্ণপরিচয়-ওয়ালা ত ন্যায়শাস্ত্র বুঝিতেই পারিবে না; কিন্তু গুরু যদি তাহার সাক্ষাতে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ দেন, তাহা হইলে গৌতম-সূত্র পচিয়া যায় না, কিংবা বর্ণপরিচয়-ওয়ালার শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায় না। এন্‌ট্রান্সের ছাত্রের জ্ঞানের অগোচর স্থানে গুপ্তভাবে বি. এ.র ছাত্রের জন্য বিজ্ঞানমন্দির করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন কালের বেদমন্ত্রাদির অধিকারে দেখিতে পাই যে, শ্রেণীবিশেষই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমানের কল্যাণসাধন করিবেন। অন্য লোকে উহা উচ্চারণ করিলে বেদমন্ত্র অশুদ্ধ হইয়া যায়,—এবং নিষ্ফল হয়। যে জন্য এ ব্যবস্থা ছিল, তাহার ইতিহাস আছে। এই গুপ্তসাধনবিধিতে মন্ত্রের শুদ্ধতা রাখিবার ভাবটা ত আছেই, তাহা ছাড়া আরও কিছু আছে।

যে সাধনায় কোনও ব্যক্তিবিশেষকে অলৌকিক শক্তিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে, স্থির হইয়া বসিয়া নাকের ডগায় দৃষ্টিস্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্জ্জনেও করিতে হয়, গোপনেও করিতে হয়। তাহার পর যে সকল কৌলিক মার্গ আছে, তাহা ত নিতান্ত গুপ্ত না করিলে সাধনাই অসম্ভব।

বৈদিক মন্ত্র, কেবল শূদ্রাদি দ্বারা পঠিত বা শ্রুত হইয়া অপবিত্র হইবার ভয় ছিল; কিন্তু এ সাধনা গুহ্যাতিগুহ্য না করিলে অনেক ভয়ের কথা। পুরাণগুলি সর্ব্ব শ্রেণীর পাঠ্য হইয়া রচিত হইয়াছিল; উহার কোন কথা গোপন করিবার বিধান নাই। পুরাণে তীর্থগমন, ব্রতধারণ ও সকল দেব দেবীর পূজা ও মোক্ষপথের কথা আছে। তবুও উহা গুপ্তশাস্ত্র নহে। কিন্তু গুপ্তশাস্ত্র এই তন্ত্রগুলি।

যে ধর্ম্মে ঈশ্বরদর্শনের অর্থ ঈশ্বরের অস্তিত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাসমাত্র নহে, তাঁহাকে ভূত নামাইয়া দেখার মত দেখিয়া লওয়া; যেখানে আস্তিক্যবুদ্ধি ও ভক্তির ফলে সুচরিত্র হইয়া সংসারধর্ম্ম করা মাত্র নহে, কিন্তু একটা অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া; সেখানে গায়ত্রী-জপ ও মনু-প্রদর্শিত চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা দ্বারা সংসারধর্ম্ম করায় মোক্ষপথলাভ হয় না। অলৌকিক শক্তির জন্য যোগ চাই; শত্রুনাশের জন্য মন্ত্রবল চাই। এ সকল কার্য্য গোপনে না করিলে চলিতেই পারে না।

ভূদেব বাবু বলিয়াছেন যে, তন্ত্রগুলির প্রকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যখন এ দেশে অন্যজাতীয়েরা আসিয়া আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছিল, এ শাস্ত্র সেই সময়ের। পূর্ব্ব হইতেই নানা বিভাগে ইহার বীজ উপ্ত ছিল, তাহা দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ, মুসলমানের অধীন হইবার সময় হইতেই সকল রকমের বীজের অঙ্কুর এক সঙ্গে করিয়া এই গুপ্ত কাননের সৃষ্টি হইয়াছে। যখন হীনবল রাজা সৈন্যদিগের বলে কিছু করিতে পারিলেন না, তখনই কৌলিকমার্গাবলম্বীরা মন্ত্রবলে মারণ উচাটন করিতে পারা যায় বলিয়া, রাজাদিগকে খুসী করিয়াছিলেন; এবং নানা প্রকার সাধনার রসে অনেক ভক্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফল যাহা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সহযোগী সাহিত্য।

তিব্বতে গার্হস্থ্যজীবন।

তিব্বতীয় কন্‌সল জেনারল শ্রীযুক্ত এ. হোমাই, চেংটু নামক স্থানে তিব্বতের পূর্ব্বসীমান্ত-প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া তিব্বতীয় গৃহচিত্রের একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। একদা তিনি লিটাং জেলায় কোন তিব্বতীয় গৃহস্থালয়ে দুই দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গৃহস্থগণের আচার ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। গৃহস্থের পরিবারের মধ্যে একটি খর্ব্বাকৃতি কর্ম্মশীলা বিধবা রমণী; ২৬ ও ৩০ বৎসর বয়স্ক দুইটি পুত্র, এবং ১৪ ও ১৭ বর্ষীয়া দুইটি কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি পূর্ব্বে পুরোহিত ছিলেন। (কারণ তখন পর্য্যন্ত তিনি লামার পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন) তাঁহার স্ত্রী ও চারিটি সন্ততি সকলেই উক্ত পরিবারভুক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না—তিনি অলসভাবেই সময় কাটাইতেন; যত দূর আমি জানি, তদনুসারে তিনি গৃহস্থালীর ভাণ্ডার-গৃহের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং ভাণ্ডার-গৃহ ও উপাসনা-মন্দিরের চাবি সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিত। তিনি পারিবারিক উপাসনা ও ধর্ম্ম কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে চাবি খুলিয়া আমার কর্ম্মচারিগণকে ভাণ্ডার হইতে যবচূর্ণ বা ছাতু (tsamba) প্রদান করিতেন। বোধ হয়, আমাদের অবস্থানবশতঃই তিনি সর্ব্বদা গৃহে থাকিতেন। কারণ, জলশূন্য বোতল লইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সতৃষ্ণ-নয়নে উৎসুক থাকিতেন। কিন্তু অধিকাংশ বোতলের ভঙ্গপ্রবণতা হেতু আমিও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিতাম না। কনিষ্ঠ পুত্রের সে দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না। তিনি কার্য্যার্থ বাহিরে যাইতেন। কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ সর্ব্বদাই গৃহে ও বাহিরে কর্ম্মনিরতা থাকিত। ইহারা সকলেই লম্বিত কেশগুচ্ছ ধারণ করিত। সেই অলকাবলী তাহাদের বদনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক নাসাগ্র পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকিয়া শৈবালানুবিদ্ধ সরসিজের বা পল্লবাবগুণ্ঠিত কুসুমের সুষমা ধারণ করিত। বালিকাগণের চিকুরজাল নানা ভাগে বেণীসম্বদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠদেশে লম্বিত হইত। কিন্তু বর্ষীয়সীদিগের বেণীশ্রেণী কবরীকলাপে বেষ্টিত থাকে, কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় না। একটি কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রগ্রন্থি শিরোভূষণরূপে কবরীর উপরে বিন্যস্ত থাকিয়া পৃষ্ঠদেশে অঞ্চলাগ্রের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে। এবং ঐ অঞ্চলপ্রান্তে শ্বেত, লোহিত ও হরিদ্বর্ণের মালা সকল সংযুক্ত থাকিত। কবরীর বামে ও দক্ষিণে দুইটি এবং পশ্চাদ্ভাগে একটি রজতকঙ্কতিকা বিদ্ধ থাকিয়া পরম শোভা সম্পাদন করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল-খণ্ডে মণ্ডিত রৌপ্যকঙ্কতিকা তাহাদের কবরীকে অপূর্ব্ব শ্রী প্রদান করিত। পশ্চাদ্ভাগের কবরীবন্ধনী (খোঁপার ফিতা) বর্ত্তুলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজতখণ্ডে মণ্ডিত থাকিত। এতদ্ভিন্ন বালিকাগণ শিরোভূষণরূপে কবরীপার্শ্বে দুইটি গোলাকৃতি রৌপ্যফুল ধারণ করিত, এবং সুগ্রথিত প্রবালমালিকা তাহাদের কবরী বেষ্টন করিয়া থাকিত। তাহারা কেশতৈল

রূপে নবনীত ব্যবহার করিত। তাহারা রজতনির্ম্মিত কর্ণভূষা, ও গৃহজাত ধূসর বর্ণের কার্পাসবস্ত্র সর্ব্বদাই পরিধান করিত। তাহাদের গৃহে একটি তাঁত ছিল; বালিকারা তথায় সর্ব্বদাই বস্ত্রবয়নে নিযুক্তা থাকিত।

আমি একটা ভোজনে এই পরিবারবর্গের সহিত যোগদান করিয়াছিলাম এবং আহার প্রস্তুত বিষয়ে সামান্য সাহায্য করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ যবগুলি অল্পকাল পর্য্যন্ত একটি কটাহে ভর্জ্জিত হইল, পরে সেই ভর্জ্জিত যব হস্তচালিত প্রস্তর-ঘরট্টে নিষ্পেষিত হইয়া শক্তুতে পরিণত হইল। এই যবচূর্ণ বা শক্তু একটি চর্ম্মপেটিকায় সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইষ্টকাকৃতি চা-স্তূপ হইতে মুষ্টিমেয় চা প্রথমে একটি সঙ্কীর্ণমুখ তাম্রপাত্রে নিক্ষিপ্ত হয়; পরে তাহাতে শীতল জল প্রদত্ত হয়। ঐ জল ফুটিয়া উঠিলে পুনরায় আরও জল প্রদত্ত হয়। জল পুনরায় ফুটিয়া উঠিলে চাগুলি তাম্রময় দর্ব্বী সহযোগে একটি মন্থনপাত্রে নীত হয়। এই সময়ে অর্দ্ধ পাউণ্ড মাখন তাহাতে প্রদত্ত হয়, পরে অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া উহা মথিত করিতে হয়। আমার প্রতি মন্থন করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল; আমি সহজেই তাহা সম্পাদন করিলাম। সেই মিশ্রিত দ্রব্য তৎপরে হাতার দ্বারা তাম্রময় চা-পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পরে কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটিতে ভোজনকর্ত্তার সম্মুখে প্রদত্ত হয়।

আমরা সকলে ভূ-তলে (মেজের) উপবেশন করিলাম। কারণ, তিব্বতীয় গৃহস্থের গৃহে কোনরূপ কাষ্ঠাধার বা কাষ্ঠাসন নাই। প্রথমতঃ প্রত্যেকেই নবনীত-মিশ্রিত চার এক তৃতীয়াংশ পান করিল; পরে মুষ্টিমেয় যবচূর্ণ লইয়া সেই পানপাত্রে নিক্ষেপ করিল, এবং অঙ্গুলি দ্বারা শক্তুচূর্ণ নবনীতমিশ্রিত চার সহিত মর্দ্দিত হইয়া কর্দ্দমের ন্যায় হইল। ইহাদের কাঁটা চামচ প্রভৃতি কিছুই নাই। তৎপরে সকলেই ঐ পিষ্ট শক্তুচূর্ণ আহার করিতে লাগিল। ইহাই তিব্বতীয়গণের প্রধান খাদ্য। ভোক্তার ইচ্ছানুসারে পানপাত্র সকল পুনঃপুনঃ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। মাসের মধ্যে কয়েক দিন প্রাতঃকালে বা প্রদোষে গোমাংস ও মেষমাংস ভক্ষিত হইয়া থাকে। এই মাংস লবণযোগে অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায় ভক্ষিত হয়। কতকগুলি turnips উদ্ভিজ্জও অসিদ্ধ অবস্থায় ভক্ষিত হয়। অর্দ্ধপক্ব যবশস্য দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাকে (হড়াপোড়া) ইহারা বড় উপাদেয় মনে করে, এবং দগ্ধ যবগুলিকে অতি কৌশলের সহিত মুখে নিক্ষেপ করে।

দুষ্ক্রিয়াশীল অপরাধীদিগের সম্বন্ধে অভিনব মন্তব্য।

'আটলাণ্টিক' মাসিকপত্রে এক জন কারাগারের ধর্ম্মযাজক আপনার বহুদর্শিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা লম্ব্রসো ও তাঁহার অনুবর্ত্তী লেখকগণের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। লম্ব্রসোর মতে, অপরাধী সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে যেন এক স্বতন্ত্র জীব। ধর্ম্মযাজক যে কারাগারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ১৫০ জন অপরাধী ছিল। তিনি বলেন, কারাবাসী বন্দী সকলকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত মনুষ্যসমাজ এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না।

কারাগারের বাহিরে লোকসমাজে যেমন মানুষে মানুষে নানা বিষয়ের পার্থক্য আছে, অপরাধীদের মধ্যেও সেইরূপ মানুষে মানুষে নানাবিধ পার্থক্য রহিয়াছে, একটা কোন নির্দ্দিষ্ট গুণ অপরাধিমাত্রের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যেরূপ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য দৃষ্ট হয়, এই কারাভ্যন্তরেও সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ গুণবিশিষ্ট মনুষ্য দেখা যায়। ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, কারাবাসিগণের দুই তৃতীয়াংশ অপরাধী মাতলামির সময়ে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে।

সমাজে হাজার হাজার লোক হয় ত ইহাদের অপেক্ষা বেশী মাতাল হয়; তবে দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলে না। ইহারা তাহাদের সমান পদবীতে থাকিলেও অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে মাত্র।

অবশিষ্ট তৃতীয়াংশের মধ্যে অনেকেই যে অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, সে অপরাধ সমাজে উচ্চ নীচ উভয় শ্রেণীতেও বিদ্যমান। তবে সকলে ধরা পড়ে না; এই হতভাগ্যেরা ধরা পড়িয়াছে। অনেক অপরাধ সমাজে কোন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে।

এই অপরাধিগণ স্বাভাবিক অবস্থায় মিতাচারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা কোন অংশে বিকৃতভাবাপন্ন নহে।

অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জনকতকমাত্র দুষ্ক্রিয়াব্যবসায়ী অপরাধীর শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। ডাকাতি ও প্রবঞ্চনাদি কার্য্যই ইহাদের স্বাভাবিক ব্যবসায়। আর জনকতক চরিত্রের দৌর্ব্বল্য অথবা রিপুর উত্তেজনতায় স্বকৃত পাপে লিপ্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত ধর্ম্মযাজক বলেন যে, এই কারাবাসিগণ ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য বড়ই উৎসুক। বোধ হয়, পৃথিবীর কোনও উপাসনা-মন্দিরে, কোনও উচ্চ সমাজে ইহাদের ন্যায় মনোযোগী শ্রোতা নাই। তিনি আরও বলেন, ইহাদিগের হৃদয় যেরূপ সহজে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় বিচলিত ও বশীভূত হইয়া থাকে, কোনও সমাজের ব্যক্তিগণের চিত্ত সেরূপ ভাবে ভাববিগলিত হয় না। এই ধর্ম্মযাজক উক্ত কারাবাসিগণের জন্য আন্তরিক স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, মনুষ্যসমাজে যেমন সহজ মানুষের সহিত বাতুলের কোনও জাতিগত পার্থক্য নাই, কোনও আকস্মিক কারণে সহজ মানুষের মস্তিষ্কের বিকার ঘটিলেই সে বাতুল হয়, সেইরূপ যাহারা দোষ করিয়া ধরা পড়িয়াছে এবং যাহারা ধরা পড়ে নাই, তাহাদের মধ্যেও কোনও জাতিগত ভেদ দেখা যায় না।

ফিরিঙ্গি বণিক্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মরক্ষা।

The Zamorin made every effort to rouse the apathetic sovereigns to take part in the common cause.—*Portuguese Conquest in India.*

কালিকট-রাজ আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তথাপি তাঁহার আয়োজন ব্যর্থ করিয়া ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের লোক এরূপ নিষ্ঠুরতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এখন ভাস্কো ডা গামার নাম ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছে; তাঁহার চরিত্রদোষ বিস্মৃত হইয়া ইতিহাসলেখকগণ তাঁহার চরিত্রগুণেরই উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু সেকালের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—গামা বীর হইলেও দস্যু, ধর্ম্মোন্মত্ত হইলেও রাক্ষসের ন্যায় নিষ্ঠুর!

ফিরিঙ্গি বণিকের সহিত মালাবার-প্রবাসী যে সকল মুসলমান বণিকের কলহ ঘটিয়াছিল, তাঁহারা রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন না। সে কলহ কেবল ব্যক্তিগত বাণিজ্য-কলহ; তাহা জাতিগত ধর্ম্ম-কলহ নহে। গামা তাহাকে সে ভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাহাকে মুসলমান ও খৃষ্টানের—এসিয়া ও ইউরোপের—কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের—জাতিগত কলহ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখনই তাহার প্রমাণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

মিশরের সুলতানের নিরীহ প্রজাবর্গ মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া একখানি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলের নিকটে আসিয়া, গামার অর্ণবপোতের সহিত এই সকল তীর্থযাত্রীর অর্ণবপোতের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তীর্থযাত্রী বলিয়া কেহ নিষ্কৃতিলাভ করিল না! যাহার নিকট যাহা ছিল, হাজিগণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কেবল প্রাণভিক্ষা করিল। কিন্তু তাহারা যে সকলেই মুসলমান! গামা মুসলমান তীর্থযাত্রীর কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের অর্ণবপোত লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পোতে অগ্নি

সংযুক্ত হইবামাত্র তীর্থযাত্রিগণ সাগরজলে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। গামা পুনরায় অগ্নিসংযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এক জন দর্শক লিখিয়া গিয়াছেন,—"মুসলমান তীর্থযাত্রিবর্গের অর্ণবপোতে যে সকল রমণী ছিলেন, তাঁহারা শিশু সন্তানগণকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া গামার দিকে কাতরনয়নে চাহিয়া বালক বালিকার প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন;—গামা অবিচলিতচিত্তে স্ত্রীহত্যায় শিশুহত্যায় নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন!" তাঁহার কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। পৃথিবীর ইতিহাস অনেক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করিয়া ফিরিঙ্গিগণ অনেক সত্য মিথ্যা হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ হত্যাকাণ্ডের কথা মানবসমাজের ইতিহাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

কালিকটে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কালিকট-রাজের সম্ভ্রান্ত রাজদূতগণ ভাস্কো ডা গামার অর্ণবপোতে উপনীত হইয়া, সন্ধিসংস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন; গামা তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"সমস্ত মুসলমান প্রজাকে কালিকট হইতে চিরনির্ব্বাসিত না করিলে সন্ধি হইবে না।" কালি-কট-রাজের পক্ষে বাহুবলে কালিকট রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি তিনি এরূপ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে জানিয়া শুনিয়াই আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইল। তিনি আত্মরক্ষার্থ রাজন্যগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহাতে কেহ কর্ণপাত না করায়, কালিকট-রাজ একাকী সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। যাহা চরিত্রগুণ, তাহার জন্যই কালিকটের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল!

কোচীন-রাজ ফিরিঙ্গি বণিকের পৃষ্ঠপোষক না হইলে, গামা একাকী এত দূর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। লাভের লোভে অন্ধ হইয়া কোচীন-রাজ স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইলেন। তাহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান কথা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সকল রাজনৈতিক সন্ধিকালের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সকল কালেই স্বদেশদ্রোহীর অত্যাচারেই ভারতবর্ষ পরাভূত হইয়াছে! কাপুরুষ না হইলে কেহ স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হয় না। কোচীন-রাজ কাপুরুষের মতই আচরণ করিতে লাগিলেন। গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র, কোচীন-রাজ নগর ত্যাগ করিয়া বিপিন নামক

কোচীন বন্দরে আশ্রয়লাভ না করিলে,—কোচীন-রাজের প্রশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে,—ফিরিঙ্গি বণিক্ সহসা সমরঘোষণা করিতে সাহসী হইতেন না। সে কথা উভয় পক্ষে কাহারও অজ্ঞাত রহিল না। কালিকট-রাজ বাধ্য হইয়া কোচীন বন্দর ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন; পর্ত্তুগাল-রাজও বাধ্য হইয়া কোচীন বন্দর রক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। যাহা কালিকট ও পর্ত্তুগালের কলহ, তাহা এইরূপে কালিকট ও কোচীনের কলহে পরিণত হইল;—যাহা হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের কলহ, তাহা কেবল হিন্দু মুসলমানের গৃহকলহে পরিণত হইল;—যাহা শ্বেতকৃষ্ণের চিরশত্রুতা, তাহা এইরূপে গৃহ-শত্রুতায় পর্য্যবসিত হইল! এক ভারতবাসী অন্য ভারতবাসীর কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া উভয়ে গতাসু হইবামাত্র, ফিরিঙ্গি আসিয়া শূন্য সিংহাসন অধিকার করিল!

১৫০৩ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকার্ক নামক স্বনামখ্যাত পর্ত্তুগীজ সেনাপতি মালাবারে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—কোচীন বন্দর অবরুদ্ধ; কোচীন-রাজ পলায়িত; কোচীনের ফিরিঙ্গি কুঠিয়ালগণ জীবন্মৃত। আল্‌বুকার্ক উপনীত না হইলে, কোচীন বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আল্‌বুকার্ক আসিয়া কোচীন-রাজের লজ্জা রক্ষা করিলেন। আবার কোচীন বন্দর আপন্মুক্ত হইল; আবার কোচীন-রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ কোচীন-রাজ ফিরিঙ্গি বণিককে কোচীনে দুর্গনির্ম্মাণ করিবার অধিকার দান করিলেন। কোচীনের ন্যায় কুইলন বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী সংস্থাপিত হইল, এবং বন্দর-রক্ষার্থ ফিরিঙ্গি বণিকের রণতরণী মালাবারের নানা স্থানে গতায়াত করিতে লাগিল। পরাভূত কালিকট-রাজ বাধা প্রদান করিতে পারিলেন না; বরং বাধ্য হইয়া সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হইলেন।

পাকিও নামক সেনাপতিকে ভারতবর্ষে রাখিয়া, (১৫০৪) আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগাল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতে, কালিকট-রাজ আবার কোচীন বন্দর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফিরিঙ্গি বণিকের সেনাবল অধিক ছিল না; পাকিও অনন্যোপায় হইয়া নায়ার-বংশীয় সিপাহীগণকে পল্টন-ভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সূত্রে ফিরিঙ্গির বাহুবলের সহিত ভারতবাসীর বাহুবল সংযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষের পরাজয়সাধনে অগ্রসর হইল। ভারতবর্ষের যে জাতি স্বদেশের বিরুদ্ধে খড়্গধারণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে

নায়ারদিগের সঙ্গে সেণ্ট টমাস সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান ও কোন কোন মুসলমানও ফিরিঙ্গির পণ্টন-ভুক্ত হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা সমরশিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া, জলে স্থলে কালিকট-রাজকে পরাভূত করিয়া কোচীন বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়া দিল!

ভাস্কো ডা গামা ভারতবাণিজ্যের অভিনব জলপথের আবিষ্কার সাধন করিতে না করিতে, চকিতের ন্যায় ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। যাহারা প্রথমে বণিকের বেশে ক্ষুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে সমুদ্র ও সমুদ্রপোত ভিন্ন অন্য কোনও আশ্রয়স্থল বর্ত্তমান ছিল না। অল্প দিনের মধ্যে তাহারা কুঠী সংস্থাপিত করিল; অল্প দিনের মধ্যে তাহারা দুর্গনির্ম্মাণ করিল; অল্প দিনের মধ্যে তাহারা সেনাদল সংগ্রহ করিয়া বাহুবলে ভারতবাণিজ্যে আধিপত্যবিস্তার করিয়া মালাবারের রাজন্যবর্গের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিল। ইতিহাসে এরূপ আকস্মিক বিজয়-কাহিনী অধিক নাই!

মুসলমানগণ আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভারতবর্ষে আশ্রয়লাভ করিয়া বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করিতেন,—কখনও বাহুবলের পরীক্ষা প্রদান করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। সহসা সেই প্রয়োজন উপস্থিত হইবামাত্র মুসলমানগণ পদে পদে পরাভূত হইলেন। লোহিতসাগরমুখে ফিরিঙ্গি বণিকের রণতরী সজ্জীভূত থাকিয়া, আরব বা মিশর হইতে মুসলমানদিগের সহায়তা-সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। অগত্যা মুসলমানগণ ধনরত্ন সংগৃহীত করিয়া পোতারোহণে পারস্যোপসাগর-পথে পলায়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

আয়োজন সমাপ্ত হইলে মুসলমানদিগের অর্ণবপোত কালিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। এই সময়ে সোয়ারেজ নামক ফিরিঙ্গি সেনাপতি ত্রয়োদশ অর্ণবপোত লইয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। তিনি মুসলমানদিগের পলায়নপথে রণতরণী সংস্থাপিত করিয়া, তাহাদের ধনরত্নপূর্ণ সপ্তদশ অর্ণবপোত অধিকার করিবামাত্র, দ্বিসহস্র মুসলমান নিহত করিয়া মুসলমান-বিজয় সম্পন্ন করিলেন। যাহারা এইরূপে প্রাণবিসর্জ্জন করিল, তাহারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবারও অবসর প্রাপ্ত হইল না।

কালিকট-রাজের আত্মরক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বাণিজ্যবলই কালিকট-রাজের একমাত্র বল; সে বল প্রবল পীড়নে চূর্ণ হইয়া গেল।

মুসলমান বণিকের পলায়ন কালিকট-রাজের পক্ষে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য স্বীকার না করিবার গত্যন্তর রহিল না।

ফিরিঙ্গি বণিকের বাহুবলের কথাই ইতিহাসে লিখিত হইয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। তাহাতে সকল কথার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদের বাহুবল অপেক্ষা কুটিল কৌশলই যে বাণিজ্যবিস্তারের প্রধান সহায়, তাহা জানিতে না পারিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের বিজয়কাহিনী আরব্যোপন্যাসের অলীক কাহিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে।

কি গুণে ফিরিঙ্গি বণিক সাত বৎসরের মধ্যে বহু শতাব্দীর মুসলমান-বাণিজ্যের প্রবল প্রতাপ পরাভূত করিয়া ভারতসাগরে প্রভুত্ববিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র মনে হয়,—হৃদয়বলই ফিরিঙ্গি বণিকের অভ্যুদয়লাভের মূল কারণ। অধ্যবসায় ও অকুতোভয়তা জয়যুক্ত হইল; তাহার সহিত নিষ্ঠুরতা মিলিত না হইলে, ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না। স্বার্থপরতা ও গৃহকলহ পরাভূত হইয়া গেল; তাহার সহিত স্বদেশদ্রোহ মিলিত না হইলে, ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না।

তথাপি এই স্বদেশদ্রোহের কলঙ্ককাহিনীর সম্যক আলোচনা না করিলে ফিরিঙ্গি বণিকের অসাধারণ অভ্যুদয়লাভের প্রকৃত কার্য্যকারণশৃঙ্খলা প্রকাশিত হইতে পারে না। ইউরোপীয় ইতিহাসলেখকেরাও ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ইতিহাসের মর্য্যাদারক্ষা করিয়া লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ফিরিঙ্গি বণিকের কলঙ্কঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু কেহই কোচীন-রাজের স্বদেশদ্রোহের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে ইতিহাসে ফিরিঙ্গি বণিকের নামই কলঙ্কযুক্ত হইয়া রহিয়াছে; ভারতবর্ষের স্বদেশদ্রোহীর নাম কলঙ্কযুক্ত হয় নাই।

কোচীন-রাজ দুর্ব্বল বলিয়া ফিরিঙ্গি বণিকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহাকে দুর্ব্বল বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক কৃপা করিতে পারিতেন। কিন্তু কোচীন-রাজ স্বার্থলুব্ধ হইয়াই ফিরিঙ্গি বণিককে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কালিকটের সিংহাসনে আরোহণ করিবার আশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং সেই জন্যই স্বদেশদ্রোহে

লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসলেখক এরূপ চরিত্রকে কদাচ কৃপা করিতে পারেন না। পাপ চিরদিনই পাপ! স্বদেশদ্রোহ মহাপাপ!

ফিরিঙ্গি বণিক প্রথম সন্দর্শনেই কোচীন-রাজের এই পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে বিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কোচীন বন্দরে উপনীত হইয়া ফিরিঙ্গি বণিক্ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাই ইউরোপের পক্ষে এসিয়া-বিজয়-কামনা পোষণ করিবার প্রধান প্রলোভন। ফিরিঙ্গি বণিক্ এ দেশে আসিয়া স্বদেশদ্রোহীর সহায়তা লাভ করিতে না পারিলে, কেবল বাহুবলে ভারত-বাণিজ্যে শক্তিবিস্তার করিতে পারিতেন না।

মালাবারের স্বাধীন বাণিজ্য ফিরিঙ্গি জলদস্যুর অন্যায় উৎপীড়নে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইবামাত্র, সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজে আশঙ্কা উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। যাঁহারা মুসলমান বণিক্‌বর্গের যোগে পারস্যোপসাগরের ও লোহিত সাগরের পুরাতন বাণিজ্যপথে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপের নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাঁহারা সহসা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অশান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কারের জন্য উত্তেজনা অনুভূত হইতে লাগিল। একালের ন্যায় সেকালে অল্পক্ষণের মধ্যে সকল কথা জগদ্ব্যাপ্ত হইবার উপায় ছিল না; সুতরাং সকল কথা জগদ্ব্যাপ্ত হইতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। অবশেষে ভূমধ্যসাগরের ইউরোপীয় বণিক্‌বর্গ যখন মুসলমান বণিক্‌বর্গের সর্ব্বনাশের প্রকৃত কারণ অবগত হইলেন, তখন মুসলমান-বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হইল। পর্ত্তুগাল হইতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভূমধ্যসাগরতীরের পণ্য-বীথিকায় বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা মুসলমান বণিকের নিকট পণ্য-সংগ্রহ করা সমধিক লাভজনক। সুতরাং মুসলমানগণকে অধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হইল না। ভূমধ্যসাগরের ইউরোপীয় বণিক্‌বর্গের মধ্যে তৎকালে ভিনিসীয়গণই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুসলমানের সহিত একবাক্যে ভারত-বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এক দল খৃষ্টান মুসলমান-দলনে অগ্রসর, অন্যদল খৃষ্টান মুসলমান-রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর; এইরূপে ইউরোপের খৃষ্টানগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন।

উভয় দলই তখন পর্য্যন্ত পোপের শাসনক্ষমতা শিরোধার্য্য করিতেন। উভয় দলের কথাই পোপের কর্ণগোচর হইল। পোপ বিচলিত হইয়া

উঠিলেন। পর্ত্তুগালের অধীশ্বর বিচলিত হইলেন না। পোপ সকল সমাচার জানিতেন না বলিয়া বিচলিত হইলেন। পর্ত্তুগালের অধীশ্বর সকল সমাচার জানিতেন বলিয়াই কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

তখনও ইউরোপ হইতে মুসলমানাতঙ্ক সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। আরব দেশের মরুমরীচিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া যে মহাশক্তি বিশ্ববিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল, রোমক সম্রাজ্যের অনেক প্রধান স্থান তাহার করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টানগণ অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও প্যালেষ্টিন ও ইউরোপীয় তুর্কিস্থান হইতে মুসলমানকে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। তখনও মিশর ও আফ্রিকার অন্যান্য সম্পন্ন জনপদ মুসললমানের অধিকারভুক্ত। তখন স্পেন পর্ত্তুগাল মুসলমানের কবল-মুক্ত হইলেও, আতঙ্কশূন্য হয় নাই। এরূপ সময়ে মিশরের মুসলমান সুলতান পোপকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন,—"পর্ত্তুগালকে শাসন না করিলে, সুলতান খৃষ্ট-জন্মস্থানের পবিত্র মন্দির ধূলিসাৎ করিবেন; খৃষ্টানগণকে নিহত করিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইবেন।" ভিনিসীয় খৃষ্টানগণও পোপকে ভয় প্রদর্শন করিতে ক্রটি করিলেন না। পোপ বিচলিত হইবামাত্র পর্ত্তুগালের অধীশ্বর, তাঁহাকে বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিলেন,—ভারত-বাণিজ্য ব্যপদেশ-মাত্র; সত্য-ধর্ম্ম প্রচারিত করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য;—তাহা সুসিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। পোপ আশ্বস্ত হইলেন। পর্ত্তুগালের বাহুবল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ইউরোপ ছাড়িয়া মুসলমান—খৃষ্টানের সমরকোলাহল এসিয়া সমুদ্রোপকূল মুখরিত করিয়া তুলিল।

মুসলমানের পক্ষে আত্মরক্ষার পথ পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানগণ মিশর ও মালাবার এই উভয় স্থান হইতে আক্রমণ করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিক্‌কে সহজে পরাভূত করিতে পারিতেন। কিন্তু এই উভয় স্থান হইতেই মুসলমান-শক্তি পরাভূত হইবার পর মুসলমানের আত্মরক্ষার আয়োজন আরব্ধ হইল। সে আয়োজন যে সর্ব্বথা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, পর্ত্তুগাল-রাজ তাহা জানিতেন বলিয়াই কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গি বণিকের বাহুবল প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইলেন। এসিয়া সময় থাকিতে জাগিল না; যখন জাগিয়া উঠিল, তখন চাহিয়া দেখিল, —এসিয়ার সমুদ্রপথে ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্য-তরণী রণ-তরণীতে পরিণত হইয়াছে;—তাহার প্রবল পীড়নে এসিয়ার জল স্থল কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাহুবল।

If the Portuguese feats of arms in India had been brilliant, the policy which directed and supported them at Lisbon was far-reaching and profound.—*Sir W. Hunter.*

সুলতানের নৌসেনাদল ফিরিঙ্গি বণিকের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে,—এই সংবাদে ভারতপ্রবাসী ফিরিঙ্গি বণিক্ নিতান্ত আতঙ্কযুক্ত হইয়া, পর্ত্তুগালে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কোচীনের কুঠীয়াল লিখিয়া পাঠাইলেন,—"অবিলম্বে পর্ত্তুগাল হইতে রাজ সেনা সমাগত না হইলে, সর্ব্বনাশ হইবে।"

পর্ত্তুগালের অধীশ্বর সৌভাগ্যশালী ইমান্যুয়েল প্রতিভাবলে ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন,—অতঃপর দীর্ঘকাল বাহুবলে বাণিজ্যরক্ষা করিতে হইবে ; তাহার জন্য ভারতবর্ষে এক জন সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ করাই যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার আদেশে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আল্‌মিডা নামক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ পর্ত্তুগালের রাজপ্রতিনিধি হইয়া ভারতযাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত উপযুক্ত সেনাদল প্রেরিত হইল।

প্রাচ্য-গগন ক্রমশঃ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। জলে স্থলে বাহুবলের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বাণিজ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়া গেল। জলদস্যুর অত্যাচারে উৎপীড়নে ভারতবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সকলেই বুঝিতে পারিল,—বাহুবলই প্রবল বল। সুলতান বাহুবলে বাণিজ্যরক্ষা করিবার আশায়, আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে সমরসজ্জা করিলেন ; পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধিও তদ্দেশে আত্মশক্তি প্রবল করিবার আশায় কুইলোয়া নামক স্থানে দুর্গনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা মুসলমান ও খৃষ্টানের ধর্ম্ম-কলহরূপে এত কাল ভূমধ্যসাগরে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতে ব্যস্ত ছিল, যাহা কালক্রমে মালাবার-উপকূলে আসিয়া বাণিজ্য-কলহে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে আফ্রিকার উপকূলে আসিয়া সাম্রাজ্য-কলহের আকার ধারণ করিল।

আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে উপনীত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিক তদ্দেশের আড়-কাটিগণের সহায়তায়, ভারতবর্ষাভিমুখে পোতচালনা করিতেন। আড়কাটিগণ

সুলতানের প্রজা। সুলতানের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে মুসলমান আড়কাটির সহায়তা লাভ করা সহজ হইবে না। আল্‌মিডা এই কথা চিন্তা করিবামাত্র, একটি স্বতন্ত্র আড়কাটিদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতসমুদ্রে কাহার আধিপত্য প্রবল হইবে, তাহার উপরেই ফিরিঙ্গি বণিকের জয় পরাজয় নির্ভর করিতেছিল। আল্‌মিডা যে ভাবে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে শক্তিবিস্তার করিলেন, তাহাতে সুলতানের নৌ-সেনাদলের পক্ষে ভারতসাগরে আধিপত্য রক্ষা করিবার সম্ভাবনা রহিল না। তথাপি তাহারা চেষ্টার ত্রুটি করিল না।

আল্‌মিডার অধীনে দ্বাবিংশ অর্ণবপোত বাহুবলে ফিরিঙ্গির বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য ভারতসাগরে সম্মিলিত হইয়াছিল। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল না; সাহসী সেনানায়কগণের অভাব ছিল না; সুতরাং জলে স্থলে বাহুবলের পরীক্ষা চলিতে লাগিল। সে পরীক্ষায় সুলতানের সেনাদল জয়লাভ করিতে পারিল না; আফ্রিকার উপকূলে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। চারি বৎসর ধরিয়া ফিরিঙ্গি বণিক আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে গিয়া, কালিকট-রাজকে বহুবার পরাভূত করিয়া, সিংহল-রাজের মিত্রতা লাভ করিলেন। ইহাতে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

কালিকট-রাজ আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার ৮৪ খানি রণপোত ও ১২০ খানি ছিপ, ফিরিঙ্গি বণিকের সহিত জলযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। যখন কালিকট-রাজ পরাভূত হইলেন, তখন তাঁহার নৌসেনাদলের তিন সহস্র মুসলমান নিহত হইয়া গেল,—প্রাণ থাকিতে কেহ পরাভব স্বীকার করিল না।

সুলতান এই সকল পরাজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া, ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে আমীর হোসেন নামক সুদক্ষ নৌসেনাপতিকে সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন। আমীর হোসেন ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, কালিকটের সেনাদলের সহিত মিলিত হইবেন, এবং হিন্দু মুসলমানের সমবেত বাহুবলে দুর্দ্ধর্ষ ফিরিঙ্গি বণিককে সমুচিত শিক্ষাদান করিবেন, এই আশায় সুলতান যথাযোগ্য রণসজ্জার ত্রুটি করিলেন না।

আমীর হোসেন পর্ত্তুগালের ইতিহাসে মীর হোসেন নামে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বোম্বাই প্রদেশে উপনীত হইয়া, ভারতীয় নৌ-

সেনাদলের সহিত মিলিত হইলেন। সমবেত নৌবাহিনী দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, কালিকটের ছত্রভঙ্গ সেনাদলের সহিত মিলিত হইতে পারিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের সর্ব্বনাশ হইত। আমীর হোসেন কালিকটের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই, ফিরিঙ্গির নৌবাহিনী কর্ত্তৃক মধ্যপথে আক্রান্ত হইলেন। আল্‌মিডার দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক যুবা পুত্র লোরেঞ্জো এই জলযুদ্ধে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য-রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই গোলার আঘাতে তাঁহার পদদ্বয় ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি আহতকলেবরে মাস্তুলের নিকটে বসিয়া সেনাচালনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হিন্দু মুসলমানের নৌবাহিনী এই অসাধারণ আত্মত্যাগ দর্শন করিয়া, জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল; সমুচিত সমাদরে বীরপুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া, বীরপুত্রের অলৌকিক বীরত্বের জন্য আলমিডাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও, হিন্দু মুসলমান স্থায়ী ফললাভ করিতে পারিল না; পর বৎসরে তাহারা আবার পরাভূত হইয়া গেল। এই যুদ্ধ ডিউ নগরের সম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা ভারতযুদ্ধের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধে সমগ্র এসিয়াখণ্ডের ভাগ্যবিপর্য্যয় সম্পন্ন হইয়া গেল; এই যুদ্ধে সমস্ত ইউরোপের অভ্যুদয়লাভের পথ প্রশস্ত হইয়া পড়িল; এই যুদ্ধে এসিয়া আঁধার, ইউরোপ সৌভাগ্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। পর্ত্তুগাল-রাজ ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য চিরসংস্থাপিত করিবার আশায় নৌসেনাবল বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ অর্ণবপোত সকল ভারতসাগরেই প্রেরিত হইয়াছিল; সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ পোতাধ্যক্ষগণ তাহার পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী নৌসেনাদল তাহাতে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিল। পুত্রশোকার্ত্ত আল্‌মিডা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত অবসরকালের প্রতীক্ষায় দিনগণনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সিংহল হইতে কালিকট পর্য্যন্ত সকল স্থানে তাঁহার আধিপত্য প্রবল হইয়াছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী উত্তরাংশে বোম্বাই বন্দরের নিকটবর্ত্তী সাগর-সলিলে বিচরণ করিয়া, কালিকটের উদ্ধার-সাধনের অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ফিরিঙ্গি বণিকের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। আলমিডা

স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে তিন সহস্র মুসলমান প্রাণবিসর্জ্জন করে; এই যুদ্ধে মুসলমান-বাণিজ্য চিরদিনের মত পরাভূত হইয়া যায়; এই যুদ্ধেই ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য চিরপ্রতিষ্ঠিত ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল জলযুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার অনেক যুদ্ধের তুলনায় এই যুদ্ধ সামান্য যুদ্ধ বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু পরিণামফলের কথা আলোচিত হইলে, ইহাকেই পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় জলযুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; ইহাতে প্রাচ্যের প্রতিষ্ঠা প্রতীচ্য সমাজকে আশ্রয় করিয়া দুর্ব্বলকে সবল ও সবলকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে; যাহারা সমগ্র সভ্যসমাজে পণ্য বিক্রয় করিয়া ধনগৌরবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে দীনহীন কাঙ্গাল সাজাইয়া ভিক্ষাপাত্র-করে ইউরোপের দ্বারস্থ করিয়া রাখিয়াছে!

এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে পর্ত্তুগালের অসাধারণ সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য ঈর্ষ্যাদ্বেষ জন্মগ্রহণ করে নাই; বরং পর্ত্তুগালের বিজয়বার্ত্তা সমগ্র খৃষ্টান-সমাজের বিজয়বার্ত্তা বলিয়াই সর্ব্বত্র গৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছিল। এসিয়ার অবস্থা সেরূপ ছিল না। এসিয়াবাসিগণ ইহাকে কালিকটের হিন্দু মুসলমানের পরাজয় ভিন্ন সমগ্র এসিয়ার পরাজয় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। মুসলমান সমাজের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুদ্ধে উদীয়মান মুসলমান-প্রতাপ যে এসিয়া হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইল, মুসলমানগণ তাহা ভাল করিয়া অনুধাবন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তৎকালে মিশর ও ইউরোপীয় তুর্কিস্থানে দুই জন স্বতন্ত্র মুসলমান সুলতান বর্ত্তমান ছিলেন। ধর্ম্মে এক হইয়াও এই দুই সুলতান দুই সহচরের ন্যায় উভয়ের সাধারণ শত্রুর পরাজয়সাধনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না; এক সুলতান অপর সুলতানের রাজ্য জয় করিবার জন্য অশান্ত হইয়া উঠিলেন। এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার রাজ্যাপহরণের জন্য বাহু প্রসারিত করায়, মুসলমানের পক্ষে এই পরাজয় চিরপরাজয়ে পরিণত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের সমরবিজয়কে চিরবিজয়ে পরিণত করিয়া দিল। তুরস্কের সুলতান মিশরের সুলতানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া, কালক্রমে মিশর-বিজয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। স্বজাতি-

কলহে আত্মরক্ষার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া, মিশরের স্থলতান আর ভারতবাণিজ্যে মুসলমানের আধিপত্য-রক্ষার আয়োজন করিতে পারিলেন না!

যে পর্ত্তুগীজবীর এইরূপে প্রাচ্যসাগরে প্রতীচ্য-শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিলে, প্রাচ্য সাগরে পর্ত্তুগালের আধিপত্য চির-প্রতিষ্ঠিত হইত। আল্‌মিডা ভারতসাগরে স্বদেশের একাধিপত্য সংস্থাপিত করিবার আশায়, দ্বীপে দ্বীপে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া, নৌবাহিনীর উন্নতিসাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন; স্থলভাগে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া পণ্যরক্ষা বা রাজ্য-সংস্থাপনের জন্য লালায়িত হন নাই। পর্ত্তুগালরাজ স্থলদুর্গের উন্নতিসাধন করিয়া, রাজ্যসংস্থাপনের জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইমানুয়েল প্রভু; আল্‌মিডা রাজপুরুষমাত্র। তাঁহাকে রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইল। কিন্তু ইতিহাস এখন মুক্তকণ্ঠে রাজা অপেক্ষা রাজপুরুষেরই প্রশংসাবাদ করিয়া আসিতেছে! ইমানুয়েল দূরে বসিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই, তাঁহার রাজপ্রতিনিধির সমীচীন সৎপরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন।

আলমিডা সহজে সম্মত হইলেন না। তিনি পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন,—"স্থলদুর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া রাজ্যসংস্থাপনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রত্যেক দুর্গের সেনা সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িবে; তাহারা সহজে পরাভূত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের সর্ব্বনাশসাধন করিবে, তাহার পরিবর্ত্তে জলদুর্গের উপর নির্ভর করিলে, ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল প্রতাপ চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতবাণিজ্যে তাঁহাদের একাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়া দিবে।" ভৃত্য প্রভুকে যত দূর সতর্ক করিতে পারে, আলমিডা তাহার ত্রুটি করিলেন না। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন,—"ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান বণিক্‌কে চিরনির্ব্বাসিত করিবার প্রকৃত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে; সেই পথে অগ্রসর হইলে, ঈশ্বরেচ্ছায় অচিরেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে।" ইমানুয়েল এই সকল প্রতিবাদে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া মনে করিলেন,—আল্‌মিডা যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন; তিনি হয় ত রাজাদেশ গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং ইমানুয়েল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থল অধিকার করিবার জন্য আল্‌বুকার্ককে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলবুকার্কের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তিনি

ভারতবর্ষে আসিয়া অতি অল্প সময়ে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজসদনে তাঁহার আধিপত্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আলবুকার্ক সম্মুখের লাভের লোভে অন্ধ হইয়া, আলমিডার ন্যায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাজ্যবিস্তার না করিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যবিস্তারের অন্য পথ নাই। তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, রাজাকেও তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আল্‌বুকার্ক নৌবাহিণী সমভিব্যাহারে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে উপনীত হইয়া, সোকোট্রা নামক বিখ্যাত বন্দর আক্রমণ করিলেন। এই বন্দর লোহিত-সাগরের প্রবেশদ্বার রক্ষা করিয়া, মিশরের সহিত ভারতবর্ষের জলবাণিজ্যের প্রধান সহায় বলিয়া সুপরিচিত ছিল। এখানে বাণিজ্যোপলক্ষে বহু দেশের লোকের বসতি ছিল। এই বন্দর অধিকার করিবামাত্র আল্‌বুকার্ক মুসলমান-গণকে নির্ব্বাসিত করিয়া, তাঁহাদের তালবনে খৃষ্টানদিগের অধিকার সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। সোকোট্রা অধিকার করিবার পর, আল্‌বুকার্ক আরব দেশের উপকূলভাগ আক্রমণ করিলেন; মস্কট নগরের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া, পারস্যোপসাগরেও ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাধান্যসংস্থাপক সন্ধি সংস্থাপিত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের শেষে ক্যানানোরে উপনীত হইয়া আলমিডাকে নিয়োগপত্র দেখাইলেন। আলমিডা তখন পুত্রশোকের প্রতিশোধকামনায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং ডিউ নগরের নিকটবর্ত্তী মহাযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আল্‌মিডা পদত্যাগ করিলেন না; অগত্যা আল্‌বুকার্ক যুদ্ধাবসানের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

জলযুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া আল্‌মিডা যখন সগৌরবে মালাবারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি পদত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। আল্‌বুকার্ক তাহার জন্য পুনঃপুনঃ তর্জ্জন গর্জ্জন করায়, আল্‌মিডা তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন; এবং সেই ভাবেই তাঁহাকে পর্ত্তুগালে প্রেরণ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের "আশা" নামক কবিতায় কবিত্বের সৌরভ নাই ; কিন্তু কবির স্বদেশভক্তির উচ্ছ্বাস যে পবিত্র সংকল্পে পরিণত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রশংসা করি। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চীন দেশে" নামক গল্পটির আখ্যানবস্তু বড় উদ্ভট। ইহাতে কল্পনার সহিত সম্ভাবনার এত বিরোধ যে, গল্প-গত চরিত্রের সহিত সমবেদনা-রক্ষা একরূপ অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চারু বাবুর লিপিকৌশল প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মহানাটক" পূর্ব্ববৎ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "কাশ্মীরের দানশীল বৌদ্ধ" স্রগ্ধরাস্তোত্রের রচয়িতা সর্ব্বজ্ঞমিত্রের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক বলেন, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবল ছিল, এবং "এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের আবির্ভাবেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ ঘটে ও বৌদ্ধগণ হিন্দু সম্প্রদায়ে মিশিয়া যান।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের "ভারতবর্ষে ভাস্কো-ডা-গামা" প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। লেখক এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষে প্রতীচ্য বাণিজ্যের আদিম ইতিহাস বিবৃত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়-চন্দ্র মজুমদার "ইংরাজস্বার্থ এবং দেশের হিত" প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন, "এ দেশের প্রত্নতত্ত্বে এবং জাতিতত্ত্বে যাঁহাদের জ্ঞান এত প্রখর, আর্দালী না থাকিলে যাঁহারা কোন তত্ত্ব উদ্ধার করিতে পারেন না, তাঁহাদেরই গবেষণায় যদি বঙ্গদেশের ভাষাবিচ্ছেদ এবং অঙ্গচ্ছেদ ঘটে, তবে উপায় কি ?" একমাত্র উপায়,—স্বাবলম্বন। বঙ্গদেশের ভাষাবিচ্ছেদ ও অঙ্গচ্ছেদ বিদেশী রাজার সাধ্য নয়। মানচিত্রের রেখায় বঙ্গচ্ছেদ সম্ভব, কিন্তু অন্তরের বিচ্ছেদ মানচিত্রের আয়ত্ত নয়। ইংরাজের দপ্তরে ভাষাবিচ্ছেদ শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে পারে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তাহাকে স্থান দিব না। আমরা যদি মানুষ হই, তাহা হইলে এই আঘাতের প্রতিঘাতেই আমাদের মিলনবন্ধন আরও দৃঢ় করিব। "কোরিয়া-রমণী" একটি ক্ষুদ্র সঙ্কলিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "তুকারামের আত্মকাহিনী" নাম দিয়া তুকারামের একটি অভঙ্গের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "ঘরের কথা" চলিত কথায় চিত্রিত চটুল নক্সা। লেখকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও মানব-সহানুভূতি অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় রহস্যের অন্তঃস্তলে প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হেমন্তনাথ মহলানবিশ "এক না অনেক" প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"কোন প্রাণীকে আর একটি প্রাণী বলা চলে না। যাহাকে একটি প্রাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করি, সেই প্রাণীটি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর সমষ্টি। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর একত্র সমবায়ে একটি উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে: সুতরাং এক একটি প্রাণীকে প্রাণিপুঞ্জ বলা যাইতে পারে।" লেখক বোধ করি নূতন ব্রতী। কিন্তু তাঁহার ভাষা আশাপ্রদ

বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বুঝাইবার প্রণালীও সুন্দর। "আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে" এবার 'খারিয়রের মস্‌জিদ' ও 'কলেশ্বরের শিবমন্দিরের' বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর "তৃষিতের আবাহন" নামক কবিতাটি বোধ হয় রূপক। রচনাটি রূপকের হিসাবে অস্পষ্ট, এবং কবিতার হিসাবে হয়, রহস্যময়, নয় অত্যন্ত চলনসই। কবির বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "সাময়িক কথায়" পুণা হিন্দু বিধবা-আশ্রমের বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "গ্রন্থ-সমালোচনায়" শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী প্রণীত 'দ্রৌপদী' নামক কাব্যের সমালোচনায় লেখিকার সংস্কৃত বহুল রচনার নিন্দা করিতেছেন। আমরা 'দ্রৌপদী' দেখি নাই, এবং সমালোচনার সমালোচনাও আমাদের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু এই উপলক্ষে দীনেশ বাবুকে একটি প্রাচীন প্রবাদ উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—"চিকিৎসক! আপনার রোগ আরোগ্য কর।" দীনেশ বাবু প্রথমেই লিখিতেছেন,—"পেলব কোমল পদাবলী"। এক সঙ্গে পেলব কোমল ডবলব্যারেল বন্দুকের অপেক্ষাও ভয়ানক। অভিধান দেখিয়া যে গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়, দীনেশবাবু তাহার উপর বড় বিরূপ। কিন্তু অভিধান দেখিয়া না পড়িলে অনেক শব্দের অর্থ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। দীনেশ বাবুর প্রিয় 'পেলব' শব্দই তাহার প্রমাণ। সমালোচক বলিতেছেন, "সমাস-কণ্টকিত কাব্যরাজ্য হইতে ফুল-পেলবের বনে যাইবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা না হইয়া যাইবে না।" ফুলপেলবের বন ব্যাপারটা কি? উপসংহারে দীনেশ বাবু বলিতেছেন, "গ্রন্থকর্ত্রী যদি কাব্যশালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রন্ধন-শালার ভার গ্রহণ করেন, তবে অনেক উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। সে স্বাভাবিক পন্থা ছাড়িয়া তিনি ভিন্ন উপায়ে লোকরঞ্জনের প্রয়াসী হইয়া মোটেই ভাল করেন নাই।" বলা বাহুল্য. অনেক পুরুষ লেখকের পক্ষেও এই উপদেশ সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে। তবে তাঁহাদের 'স্বাভাবিক পন্থা' কি, তাহার নির্দ্দেশ বড় সহজ ব্যাপার নয়। আর, কেবল 'লোকরঞ্জনই' কি রচনার উদ্দেশ্য?

বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "দেশীয় রাজ্য" নামক প্রবন্ধে 'ভারতীয় উৎকর্ষের আদর্শ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রচারিত অনেক পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর ভাষার ব্যায়াম উপভোগের যোগ্য। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "প্রতাপচন্দ্র মজুমদার" উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। লেখক নিপুণতার সহিত দার্শনিক ভাবে স্বর্গীয় মজুমদার মহাশয়ের চরিত্রবিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "প্রাচ্য প্রতীচ্যের একটি বৈপরীত্যের" মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মোহিনী বাবুর বক্তব্য আমাদের অনধিগম্য; প্রবন্ধের ভাষাও আমাদের বোধশক্তির সম্পূর্ণ অতীত। "ইউরোপের ব্যবহার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরমার্থ-অনাশ্রিত" প্রভৃতি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে গ্রীক। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "গহেলী ও মতিরাম" পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

বিচিত্র নিয়তি।

কেরাণী প্রকাশচন্দ্র কলিকাতা ছাড়ি'
ছ' মাসের ছুটি নিয়ে আসিলা কটকে
বায়ু-বদলের লাগি'। সঙ্গে পরিবার,
পত্নী অমাময়ী আর তিন বছরের
শ্রীমান হরিশচন্দ্র। 'কাঠজুড়ী' তীরে
বাসা হ'য়ে ছিল ঠিক, কলরবহীন
নগরের উপকণ্ঠে। মুক্ত বন্দী-পাখী
ল'য়ে ক্ষুদ্র পরিবার লোকালয় ছাড়ি'
একান্তে বাঁধিল যেন সুখময় নীড় !
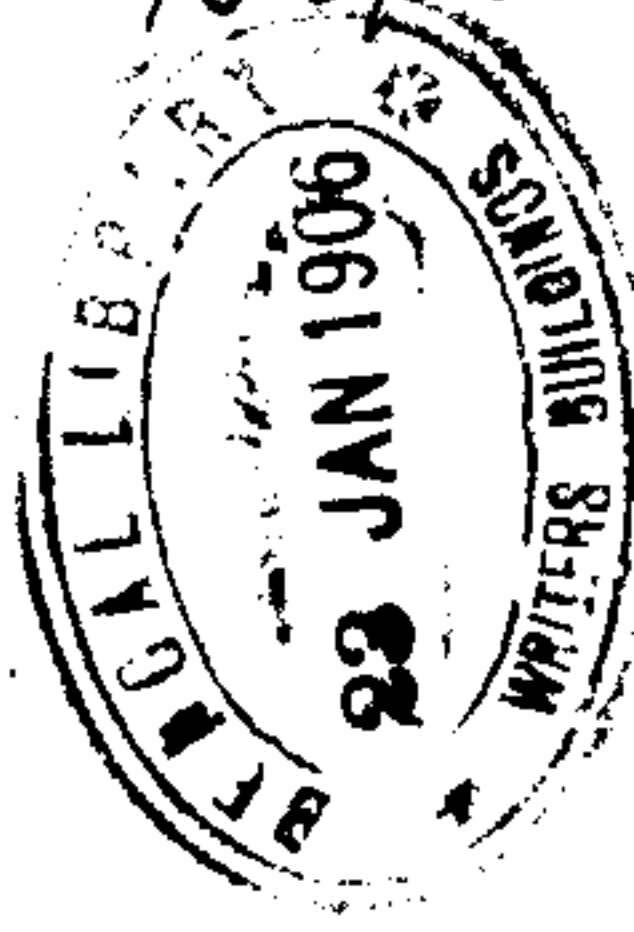
দুই মাস গেছে চলি'। পীড়িত প্রকাশ
হয়েছেন রোগমুক্ত। একদা প্রদোষে
স্বামী-স্ত্রীতে বসি ছাদে দেখিতেছিলেন
তটিনীর জললীলা ; শীর্ণা কাঠজুড়ী
উঠেছে লাবণ্যে ভরি' ; দৃষ্টি দোঁহাকার
মগ্ন ছিল নীল নীরে ; যেন স্বপ্নে জাগি',
মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে হতেছিল কথা।
কহিল প্রকাশ, 'সাধ যায়, সব গোল
চুকাইয়া বাঁধি এসে এই দেশে বাসা।'
উত্তর করিল অমা বিস্ময়ে, 'এখানে ?
এই বর্ব্বরের দেশে ?' কহিলা প্রকাশ,
'মিছে এ উড়িয়া-দ্বেষ ! কভু ইতিহাস
ছুঁইলে না, কি বুঝিবে ? দোষ নাই তব ;
স্ত্রীপাঠ্য হয়েছে এবে উপন্যাস-পাশ !'
বিষাদগম্ভীর মুখে উত্তরিল অমা,
'জানি গো তা জানি, আমি যোগ্য নই তব,
যদি আহা, পেতে তারে, হ'তে কত সুখী !
সমানে সমানে তবে হ'ত না মিলন ?

আমিই কণ্টক তব ; ইচ্ছা হয় মরি
তোমারে জন্মের মত করি' নিষ্কণ্টক !'
পরিহাস-হাসি হাসি' কহিলা প্রকাশ,
'লক্ষ্যহারা কেরাণীরে লক্ষ্মীছাড়া শেষে
করিতে কি চাও প্রিয়ে ?—না না, সত্য বলি,
যদি ভাগ্যে থাকে তা'ই, জানিও নিশ্চিত,
আর কারে করিব না শয্যাসহচরী।'
উত্তর করিল প্রিয়া সতেজে এবার,
'পুরুষের হেন দর্প শুনা যায় বটে
পত্নী যত দিন থাকে ! আছে বহু মূঢ়া
এ প্রবোধে অনায়াসে ভুলে যায় যারা।
বল দেখি সত্য ক'রে, আমি ম'লে, তারে
পাও যদি, কর না কি জীবনসঙ্গিনী ?
লজ্জাই বা কেন এতে ? সে যে গো ব্রাহ্মিকা ;
তারা শতগুণে শ্রেষ্ঠ হিন্দু মেয়ে হতে !'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'সেটা মিথ্যা নয় ;
কিন্তু ইহা নহে তব অন্তরের কথা !
এইমত হিন্দুঘরে করে দিবারাতে
লজ্জাহীন অক্ষমতা বিদ্রূপ-বড়াই !'
এই শেষকথাগুলি বাজিল অমারে ;
বস্ত্রাঞ্চলে মুছি' আঁখি রহিল নির্ব্বাক্।
ব্যথিত প্রকাশ উঠি' অভিমানিনীরে
আদরে বুকের কাছে লইল টানিয়া ;
সোহাগে সোহাগে দিল রাগ ভুলাইয়া !
ক্ষণেক নীরব দোঁহে ; দেখিতে লাগিলা
আবার লহরীলীলা ! শুনিতে লাগিলা
কলকল্লোলিত তান। অদূরে মধুরে
সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিল
উৎকলবালিকা কোন বৃন্দাবনগাথা।
স্থান-কাল নাহি গণি' দুষ্টু হরুবাবু

করিতেছিলেন মাঝে রসভঙ্গ শুধু!
মায়ের এলান চুলে পিতার চাদরে
গ্রন্থি বাঁধি' চুপে চুপে, সহসা সজোরে
টানিয়া, অমনি হাসি' যেতেছিলা দূরে!
মনে এই ঝাঁক, মুখে ততোধিক হাঁক,—
হেন বাহাদুরী যেন দেখে নাই কেহ
আর্থারবন্দরে কিংবা সাহোর প্রান্তরে!
ক্রমে ঘনাইয়া এল সন্ধ্যার আঁধার,
চাকর ডাকের চিঠি কেরোসিন আলো
দোঁহার সম্মুখে রাখি' চলে গেল কাজে।
নারীজনোচিত ক্ষুদ্র খর কৌতূহলে
অমাময়ী একে একে চিঠিগুলি খুলি'
কোনটি অর্দ্ধেক পড়ি', কোনটি না পড়ি'
দিতেছিলা রাখি' কাছে। শেষ-চিঠিখানি
ধৈর্য্য ধরি' বার বার করিলেন পাঠ;
বাড়ায়ে আলোকশিখা, তার নীচে ধরি'
সাবধানে পড়িলেন; তবু যেন তার
নাহি হ'ল অর্থবোধ। দেখিলেন শেষে
ভাল ক'রে শিরোনামা, বাড়ীর ঠিকানা।
অকস্মাৎ স্ফীতাধরে কম্পমানকরে
ছুঁড়িয়া ফেলিলা চিঠি স্বামীর সম্মুখে।
'বুঝিলাম, কেন মোরে এত অবহেলা!
বুদ্ধিহীনা আমি; ভাবি নাই অত শত!
তলে তলে চলে হেন পত্র-বিনিময়?
তোমায় সে কালামুখী ভালবাসে আজো?'
বিস্মিত প্রকাশচন্দ্র চিঠি কুড়াইয়া
পাঠ করি', উঠিলেন উচ্চহাস্য করি'!
কহিলেন, 'এই কথা? এরি লাগি এত?
সন্দেহেই এত দূর? সত্য হ'লে, বুঝি

এ চিঠি ননীর ; কিন্তু এ ননী—সে নয়।
এ আমার বাল্যবন্ধু ! জান তুমি তারে ;
সে-ই এ নষ্টের গোড়া ! দুই ছত্র লিখে
দুইটি প্রাণের মাঝে চিরদিন তরে
দিতেছিল দাগ ! সহজে হবে না ছাড়া,
শাস্তি পেতে হবে এর ! সশরীরে তারে
হাজির করায়ে হেথা তবেই ছাড়িব !
এবার তোমার সাথে করা'ব আলাপ।
বন্ধুপ্রীতি যতক্ষণ অন্তঃপুর হ'তে
নাহি পায় সমাদর, অসম্পূর্ণ তাহা।
তুমিও হইবে সুখী তার পরিচয়ে।
যেমনটি চাও তুমি, সেও সেইমত ;
সুরসিক সহৃদয় ; তাহাতে আবার
কাব্যপ্রিয় সুগায়ক ! মিলে যাবে বেশ !
তখন এ অভাগারে রবে ত স্মরণ ?'
বুঝিয়া আপন ভ্রান্তি অনুতপ্ত অনা
মরমে মরিতেছিল। ছিল অন্যমনে ;
রহিল নীরব। গোপন অন্তর হ'তে
প্রার্থনা উঠিতেছিল, ওহে অন্তর্যামী,
স্বামীরে দিয়েছি ক্লেশ আজি অকারণে
মিথ্যা অভিমানবশে ; দণ্ড দিও তার !
হরুবাবু সেইক্ষণে ফুৎকারে ফুৎকারে
দীপের সে দীপ-জন্ম দিলা ঘুচাইয়া !

প্রকাশ পরের দিন চিঠি দিয়ে ডাকে
কহিল অমারে এসে, 'কর আয়োজন
প্রিয় অতিথির লাগি'। লিখেছি ননীরে
এখানে আসিতে ত্বরা। এই চিঠি পেলে,
যেমন থাকুক্ ননী, আসিবে নিশ্চয়।'
কহিল ব্যথিতা ধীরে, 'সত্য সত্য তবে
কর নাই ক্ষমা মোরে ? কেন লজ্জা দাও

এ লজ্জাহীনারে আর !' প্রবোধি' পত্নীরে
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'বহুদিন হ'তে
লিখিতেছে ননী মোরে, আসিবে হেথায় ;
চিরকাল জানি তারে, অলসের শেষ ;
গৃহকোণ হ'তে তারে নড়ান দুষ্কর ;
তাই তারে জোর ক'রে করিব বাহির।
জান না কি, ননী মোর বড় আপনার !'
কহিল উৎফুল্ল অমা, 'তবে লিখে দাও,
কাজ নাই এসে তাঁর। ছোট বাসাবাড়ী,
তায় আমি একা প্রাণী ; ভাল ক'রে তাঁর
হ'বে না আদর যত্ন ! আজি—এই দণ্ডে
মাথা খাও, লিখে দাও,—চুকে গেছে কাজ !'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'সাধে কি গো বলি,
স্ত্রীলোকের ঝুটা মন ! ভদ্রতার ঘটা,
সে কি আত্মীয়ের তরে ? হোক্ তা নির্দ্দোষ,
ত্রুটীভরা আত্মীয়তা কত উচ্চে তার !
ননী কি মোদের পর ? তাই তারে এবে
বাঁধিয়া তুলিতে হ'বে আতিথ্যের ভারে ?'
পতির দৃঢ়তা দেখি' ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্নমনে
নীরবে নিশ্বাসি' অমা চলে গেল কাজে।
কি যেন অজ্ঞাত শঙ্কা সেইক্ষণ হ'তে
চাপিয়া বসিল বুকে ; মনে হ'তেছিল,
তাহাদের শান্তিস্তব্ধ এই সুখনীড়
কে যেন শ্যেনের মত আসিছে ভাঙ্গিতে !
যথাকালে ননী পেয়ে প্রকাশের লিপি
উঠিল ব্যাকুল হ'য়ে। 'বাড়িয়াছে পীড়া ?'
বার বার এই কথা আপনার মনে
করিল আবৃত্তি। আঁকা-বাঁকা লেখাগুলি
পড়িল সে বহুবার চিন্তাতপ্তমনে।
সেদিন গুছায়ে সব, মক্কেলের কাজ

অন্য উকীলের কাছে গছায়ে, হইল
প্রস্তুত যাত্রার তরে। মুহুরী তখন
ধরিল, 'মাম্‌লা এক, লক্ষ টাকা দাবী,
এইমাত্র আসিয়াছে, ছেড়ে দিতে হয়!'
লক্ষ হোক্, কোটি হোক্, কে ভাবিছে তাহা?
আমি ভাবি' কতক্ষণে পৌছিব কটকে!

যথাকালে বাষ্পরথ বহিয়া ননীরে
আসিল কটকে। নামিয়া পড়িল ননী;
সহসা প্রকাশচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে
ধরিলা ননীর কর। ফিরে চেয়ে ননী
বিস্ময়ে রহিল স্তব্ধ! দুই বন্ধু শেষে
ক্ষণেক লইলা হাসি'; আলাপে আলাপে
চলিলা গৃহের পানে আনন্দে কৌতুকে।

এক মাস গেছে চলি'। সেদিন পূর্ণিমা;
মেঘমুক্ত নীলাকাশে জ্যোৎস্না হাসিতেছে,
অঙ্গনে বিছায়ে পাটি, বন্ধু দুই জন
চাহিয়া আকাশ পানে। গৃহকর্ম্ম সারি'
অমাও একান্তে আসি' বসিল সেথায়।
আর এক পূর্ণিমায় এসেছিল ননী;
দু' দিন না যেতে, হয়েছিল উৎকণ্ঠিত
গৃহে ফিরিবার তরে! কবে, কোথা দিয়ে,
চলে গেছে দুটি পক্ষ অজ্ঞাত নেশায়!
বড় দ্রুত গেছে বুঝি এ কয়টি দিন?
হায় ননী! হায় কর্ম্মী! এই তব কাজ?
কোথা গৃহ, গৃহপ্রিয়? ফিরিবার কথা
ভুলে গেছ একেবারে? অভাগিনী অমা!
অয়ি আগুন্তকভীতা, আজ তব ভয়,—
অতিথি কখন যাবে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে!
এ কি? এ কি?—কে গাহিছে?—ধন্য ননীলাল!
কি নিপুণ সুরভঙ্গী, কি মধুর স্বর!

জানিছ কি, পাশে বসি' আত্মহারা অমা
তোমার ও কণ্ঠসুধা করিতেছে পান
আকণ্ঠ তৃষ্ণায়!—পড়িল নিশ্বাস কার!
চোখে জল গান শুনে'?—আর তুমি, ননী!
বহু স্থানে বহুবার গাহিয়াছ গান,
এমন ত গাহ নাই! রাগিণীর সাথে
মিলে নি এমন ক'রে তোমার হৃদয়!
কণ্ঠ কেন কাঁপিতেছে? ভুলিতেছ লয়?
থাক্ থাক্ ওই গীত—প্রেমের কাকুতি!
অন্য গান ধর কোনো! কিংবা গাহিও না!
লজ্জাহীনা হে পূর্ণিমা, হে মিলনদূতী,
অত হাসি বহুদিন হাস নাই তুমি!
এ কি ফাঁদ, এ কি হাসি করেছ বিস্তার!
কুহকিনী, দেখ চেয়ে, খোকা শ্রান্তিভরে
ঘুমায়ে পড়েছে ওই শয্যা আলো করি';
এমন সুন্দর শিশু! এমন সংসার
সুখশান্তিভরা! মনে রেখো যাদুকরী!
সহসা থামিল গীত; মৌনে উঠি' অমা
পশিল শয়নকক্ষে। সুপ্ত শিশু পানে
ক্ষণেক চহিয়া মুগ্ধা কহিল আবেগে,—
অশান্ত দুরন্ত মোর, সন্ধ্যাটি না হ'তে
ঢুলে' এসেছিল আঁখি না জানি কখন,
দেখে নাই মা তোমার; নেয় নি সে খোঁজ!
হয় ত বা অভিমানে একা গিয়ে যাদু,
শয্যাখানি বিছাইয়ে পড়েছ ঘুমায়ে!
ক্ষমিও এ কুমাতারে। মরি মরি রূপ!
এর কাছে আছে কিছু? এমন নির্ম্মল,
এমন পাগলকরা আছে কিছু আর?—
সেইক্ষণে শয্যা'পরে পড়িল লুটিয়া;
টানিয়া কোলের কাছে ঘুমন্ত শিশুরে

চাপিতে লাগিল বুকে কি যেন ব্যথায়!
আহারের আয়োজন করি' ভৃত্য যবে
ডাকিতে আসিল তারে, ব'লে দিল অমা,—
অসুখ হয়েছে তার।—দু'বন্ধু সে রাতে
ভোজনে বসিলা মৌনে! দেখিল প্রকাশ,
সদানন্দ রঙ্গপ্রিয় ননী যেন আজ
নিতান্ত বিষণ্ণ শুষ্ক। কহিল প্রকাশ,
'জানি ও গো জানি তাহা, ফাঁকি দিবে ঠিক,
দেখিবার লোক যবে নাই আজ কাছে!'
'না না, না না! সে কি কথা?' বলি ননীলাল
ভাঙ্গা স্বরে ম্লান হাসি হাসিল কেবল।
চমকি' প্রকাশচন্দ্র কহিলা ননীরে,
'হয়েছে অসুখ কোনো?' শশব্যস্তে ননী
কহিল বিকৃতকণ্ঠে, 'না না, কিছু নয়;
বহুদিন গৃহছাড়া; ছুটি চাই এবে।'
প্রকাশ কহিলা হাসি, 'মোরে বলা বৃথা,
যথাস্থানে আবেদন পাঠাইও কা'ল!'
পরদিন ব্যস্ত হয়ে প্রকাশ অমারে
ডাকিল শয়নকক্ষে, কহিল, 'এখনি
পাইলাম এই 'তার' কলিকাতা হ'তে;
গুরুতর কার্য্যতরে যেতে হ'বে সেথা;
বিলম্বে হইবে হানি! যেতে হ'বে আজি,
শীঘ্র শীঘ্র ক'রে দাও যাত্রার উদ্যোগ।'
ধরিয়া স্বামীর কর অকস্মাৎ অমা
রহিল আনতমুখে ক্ষণেক নীরব;
কহিল কাতরকণ্ঠে, 'প্রভু, প্রাণাধিক,
থাক থাক মোর কাছে! বড় একা আমি!
বড় একা! অসহায়! যেও না, যেও না!
যাবে যদি, একসঙ্গে চল ফিরি সবে।'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'বহুবার হেন

হয়েছে ত ছাড়াছাড়ি, দেখি নাই কভু
এত বাড়াবাড়ি তব! বুঝি উপন্যাস
অবিশ্রান্ত পড়িয়াছ এই কয়দিন;
সেই মিথ্যা মাদকতা ঘুরিছে মাথায়!
প্রত্যক্ষ সংসার এ যে; হেথা নাহি সাজে
সুরঙ্গিন কল্পনার মিষ্ট অভিনয়!
পক্ষকাল মধ্যে আমি ফিরিব নিশ্চিত;
ননী র'য়ে গেল হেথা; ভাবনা কিসের?'
ক্ষুব্ধার হৃদয় হ'তে কি একটি কথা
উঠিয়া মিলায়ে গেল গভীর নিশ্বাসে!
অনেক সাধিল ভীতা, অনেক কাঁদিল,
অটল প্রকাশচন্দ্র, শুনিল না কিছু।
এ দিকে হরিশচন্দ্র খেলা ছেড়ে এসে
ধরিল পিতার হাত; কহিলা 'বাবা লে,
আমিও কোকাতা যাব।' বহু প্রলোভন
খেল্‌না-বাজ্‌না আর আঙ্গুর-বেদানা
হ'ল যবে প্রতিশ্রুত, সুবোধ হরিশ
অগত্যা করিল সন্ধি। বিরহবিধুরা
বহুক্ষণ দ্বার দিয়া কাঁদিল বিরলে;
যাত্রার সময় এল; এবার প্রকাশ
বুঝিল, হৃদয়ব্যথা নহে কাল্পনিক,
নিদারুণ সত্য তাহা! ফেলিয়া নিশ্বাস
আঁকিয়া রোরুদ্যমানা প্রেয়সীর ছবি
শিশুর মলিনমুখ নিভৃত অন্তরে
ধীরে ধীরে অশ্রু মুছি' লইল বিদায়।
অধীর বাষ্পীয় রথ দৌড়িল যখন
বঙ্গরাজধানীমুখে, ফিরে এল ননী;
কিন্তু গেল না বাসায়। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল,
চাঁদ উঠে এল ধীরে, কাঠজুড়ীতীরে
ননী বেড়াইতেছিল একাকী সে রাতে

অধীর উদ্দেশ্যহীন চঞ্চলচরণে ।
আপন অধীর বক্ষ দুই হাতে চাপি'
যাতনাকাতরকণ্ঠে চাহি' ঊর্দ্ধ পানে
কহিল,—অনাথনাথ, বল দাও মোরে !
এই সুখী-পরিবার, সোনার সংসার,
ছারখার হ'য়ে যাবে ! হায়, বন্ধু আজ
করিবে বন্ধুর শিরে গোপন আঘাত ?
সরল প্রকাশচন্দ্র ! এমন লোকের
সর্ব্বনাশ করে কেহ ; ভাবে কেহ তাহা ।—
সেই স্তব্ধ রজনীতে ব্যাকুল প্রার্থনা
যেন ঊর্দ্ধে কারো কাছে পৌঁছিল বারেক !
স্বর্গ-আশীর্ব্বাদ সম, স্নিগ্ধ সমীরণ
সর্ব্বাঙ্গে লাগিল এসে সান্ত্বনার মত !
নিঃশব্দে চোরের মত সেই রাতে ননী
বাসায় আসিল ফিরি' । জানাল ভৃত্যেরে,—
আহারের ইচ্ছা নাই ।—চুপে শয্যা ল'য়ে
মুহূর্ত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে পড়িল ঢলিয়া ।

হেথা বিরহিণী অমা তপস্বিনী সম
কাটাতে লাগিল দিন ; রূপের মাঝারে
পড়িল মলিন ছায়া ; হাসি-রঙ্গ ছাড়ি'
যৌবনের চপলতা কি যেন সংযমে
ধরিল কঠোর মূর্ত্তি !—অমা আর ননী
দূরে দূরে থাকে দোঁহে অতি সাবধানে ।
কথা নাহি হয় আর ; বুঝি প্রতিদিন
দেখাও হয় না দোঁহে ; যেন দুই জনে
পরিচয় নাই কভু ! মাতা রোজ রাতে
পুত্রেরে টানিয়া কোলে ঊর্দ্ধপানে চাহি
কহে,—প্রভু, কতদিন—আর কত দিন
তাঁর ফিরিবার বাকী ! হয় নাই কাজ ?
এই ক'টি দিন নাথ এই দুর্ব্বলারে

দুই হাতে আগুলিয়া ! হে স্বামীর স্বামী,
যাবৎ না পাই সেই অনন্ত-নির্ভর,
তাবৎ করিও রক্ষা এই অনাথারে !
তাঁর কথা, তাঁর গুণ মোর স্মৃতিপটে
রাখ জাগাইয়া নিত্য ! দাও মোরে বল,
কায়মনে নাহি হই বিশ্বাসঘাতিনী !
এক পক্ষ গেল চলে। এল না প্রকাশ ;
অমা গণিতেছে দিন। আরেক সপ্তাহ
যেদিন হইবে পার, এল এক চিঠি।
চিনি' সেই হস্তাক্ষর কম্পমানকরে
খুলি' অমা পড়ে গেল একটি নিশ্বাসে।
লিখেছেন স্বামী—কাল পৌঁছিবেন আসি'।—
বার বার সেই লিপি লাগিল চুমিতে !
পাছে কেহ দেয় বাধা আনন্দ-আবেগে,
অধীরা একান্তে তাই বাহিরের ঘরে
একেবারে ছুটে এসে রুধি' দিল দ্বার।
সে ঘরে থাকিত ননী। কিন্তু অমা জানে,
বাহিরে বাহিরে ঘুরি রোজ ননীবাবু
নিশীথে সে ঘরে আসে।—প্রত্যহের মত
সেদিনো থাকিত ননী তখনো বাহিরে
যদি না ডাকের চিঠি পাইত সে পথে।
চিনি' কারো হস্তাক্ষর, দ্রুতহস্তে খুলি'
সে চিঠি পড়িল ননী। উঠিল চীৎকারি,'—
মুক্তি ! মুক্তি !—আর নয় ; এই কয় দিন
যা সয়েছি,—হৃদয়েরে কি বিশ্বাস আর ?
পলায়ন ! পলায়ন ! এই কারা ভাঙ্গি'
কারেও কিছু না বলি' চলে যাব কা'ল !—
ফিরিল বাসায় ননী আপনার ঘরে।
পশি' একা, চুপে চুপে শয্যায় পড়িয়া
আঁধারে ভাবিতেছিল !—ঠিক সেইক্ষণে

প্রকাশের লিপিহস্তে অমা ও সে ঘরে
পশি', সশব্দে রুধিল দ্বার।—চমকিয়া
উঠিল ডাকিয়া ননী, —কে ও ?—অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে কাঁপিতেছিল স্তব্ধ অমা যেথা,
ননী উঠে গেল সেথা ; চকিতে কাহারে
চিনি' ভয়ার্ত্তের মত সরিল পশ্চাতে।
তার পরে—তার পরে—একটি নিমেষ
এক ক্ষুদ্র ক্ষিপ্র ক্ষিপ্ত চপল পলক
ভাঙ্গি' চির প্রাণপণ সংযম—সংগ্রাম
সেই ক্ষুদ্র কক্ষলগ্ন অন্ধকার হ'তে
ফেলিল গভীরতর আঁধারে দোঁহারে।
চমক ভাঙ্গিল যবে, ত্রস্তে দ্বার খুলি'
দুই জন দু'ই দিকে বেগে গেল চলি'।
অমা পড়ি' শয্যাপরে লাগিল লুটিতে
যে ব্যথায়, যে জ্বালায়, ভাষার অতীত।
ক্ষিপ্ত ননী সেইক্ষণে হ'ল নিরুদ্দেশ।
  এক বর্ষ গেল ঘুরে। মুঙ্গের সহরে
একটি সুপরিচ্ছন্ন গৃহের অঙ্গনে
হাত-ধরাধরি করি' যুবক যুবতী
নীরবে ঘুরিতেছিলা। ফুলগাছগুলি
সুঘ্রাণ উড়াতেছিল ; অদূরে জাহ্নবী
কল্লোল তুলিতেছিল। তরুণীর বেশ,
আড়ম্বরবিবর্জ্জিত, তবু কি সুন্দর!
বাসন্তী রঙ্গের শাটী গুর্জ্জরী ধরণে
পরেছেন কুঁচাইয়া, অনবগুণ্ঠিত কেশ
আধেক ললাট ঢাকি বঙ্কিম রেখায়
জ্যাকেট-মণ্ডিত পৃষ্ঠে পড়েছে এলায়ে।
সুমসৃণ চর্ম্মাবৃত করবেষ্টী ঘড়ি
লতার কাঁকন সম পেতেছিল শোভা।
চর্ম্মের পাদুকা দুটি পাদপদ্ম চুমি'

দলবদ্ধ ভৃঙ্গ সম রয়েছে মূর্চ্ছিয়া
কালো রূপ মিশাইয়া কনক বরণে !
গাহিতেছিলেন নারী অস্ফুট গুঞ্জনে।
তাম্বূলের রাগহীন স্মিতাধর হ'তে
শুক্তিশুভ্র দন্তপাঁতি দিতেছিল উঁকি !
বাঙ্গালা পুঁথির সম অধীত পাতায়
তর্জ্জনী রাখিয়া ক্ষুদ্র মুঠিতে চাপিয়া
সে গ্রন্থ, তরুণী স্বচ্ছন্দে ঘুরিতেছিলা !
পড়িল সন্ধ্যার ছায়া ; অদূরে বাহিরে
উঠিল সহসা গোল। যুবক তা শুনি'
দেখিলা বাহিরে আসি, একপাল ছেলে
ঐ পাগ্‌লী ! ঐ পাগ্‌লী !—এই ধূয়া তুলি'
খেদায়ে আসিছে এক দীনা রমণীরে।
অশিষ্ট বালকদের হস্ত হ'তে যুবা
উদ্ধারিয়া বিব্রতারে সম্ভ্রমে সাদরে
আনিলেন ডাকি' তারে আপনার গৃহে।
মুখোমুখী তিন জন সন্ধ্যার আঁধারে
বসিলেন আঙ্গিনায়। কহিল রমণী,
'পাগল ?----পাগল হয় কি পুণ্য করিলে ?
আমি ত পাগল নই ; মাঝে মাঝে শুধু
কি এক আবেশ মাঝে সমস্ত চেতনা
ডুবে থাকে ক্ষণকাল ; তার পরে সেই
পুরাতন পরিচিত স্মৃতির দংশন !'
এত বলি' পাগলিনী আপনার হাতে
ছিঁড়িতে লাগিল কেশ ! সস্নেহে প্রকাশ
কহিলেন, 'অভাগিনী, কি দুঃখ তোমার,
প্রকাশের হয় যদি, বল খুলে সব।'
'কি দুঃখ ?—শুনিবে তুমি ?—ওই কণ্ঠস্বরে
কি যেন কি আকর্ষণ, লইতেছে টানি
গোপন অন্তর ! করিও না ঘৃণা তবে !'

এত বলি' ভিখারিণী মর্ম্মস্পৃক স্বরে
বলে' গেল আত্মকথা একটি নিশ্বাসে।
অধীর আকুল কণ্ঠে কহিলা যুবক,
'মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! তুমি—তুমি অমা?'
প্রগল্‌ভা না শুনি' তাহা কহিতে লাগিল
আ[illegible]াবে ভোর হয়ে।—'কলিকাতা হ'তে
যেদিন ফিরিলা স্বামী, মুমূর্ষুর মত
শয্যায় ছিলাম লীন। কাছে বসি' মোর
সযত্নে সোহাগে স্নেহে হাতখানি তুলে'
আপন কোলের কাছে, ছোঁয়াইলা ঠোঁটে!
কহিলা,—আছ ত ভাল?—সে আদরে মোর
সংযম ভাসিয়া গেল; পা দুখানি তাঁর
মাথায় নিলাম তুলে; কহিলাম তাঁরে
খুলিয়া সকল কথা। হ'ল না ভরসা
মার্জ্জনা ভিক্ষার! শুনিলেন স্বামী সব;
সাগরের মত সেই গভীর হৃদয়
ক্ষণেক স্তম্ভিত হ'ল; শেষে ধীরে ধীরে
সেই পুরাতন প্রেমে আশীর্ব্বাদছলে
লাগিলা বুলাতে শিরে কম্পমান কর।
কহিলেন গাঢ় স্বরে,—অমা, অমা মোর!
তোমারে করেছি ক্ষমা। এই যে ধরণী
প্রকাণ্ড ভুলের স্থান! কে না ভুল করে?—
তার পরে দুই দিন দুঃখে সুখে মোহে
কোনমতে কেটে গেল। যা ছিল তা যেন
কিছুতে হয় না আর!—বুঝিলাম তাহা;
তিনিও তা বুঝিলেন। তৃতীয় দিবসে
কারেও কিছু না বলি' অকস্মাৎ স্বামী
হইলেন নিরুদ্দেশ। সেইদিন হ'তে
খোকারো বাড়িল জ্বর; দুদিনের দিন,
সোনার হরিশ মোরে গেল ফাঁকি দিয়ে!

বাবা বাবা ক'রে আহা, প্রাণ দিল বাছা!
প্রায়শ্চিত্ত হ'ল মোর! হায় প্রাণাধিক,
হৃদয়দুলাল মোর, নিষ্পাপ নির্ম্মল,
নরকের কীট আমি দংশিলাম তোরে;
তাই ত ফুলের মত পড়িলি ঝরিয়া
কোরকজীবনে, যাদু!'—থামিল বিবশা।
যুবক ক্ষিপ্তের মত উঠিল চীৎকারি',
আমি—আমি পুত্রহন্তা! আকাশের বজ্র,
হও যদি দেবতার ন্যায়দণ্ড তুমি,
ভেঙ্গে পড় মোর শিরে! আমিই প্রকাশ!
আমি সেই শিশুঘাতী নির্ম্মম পাষাণ!'
কহিল উন্মত্তা, 'তুমি?—তুমি সে দেবতা?
ওই কণ্ঠস্বর শুনি' বার বার মন
হয়েছিল উচাটন, কিন্তু দুরাশারে
পারি নাই স্থান দিতে। তুমি—তুমি সেই?'
'আমি সেই কাপুরুষ, আমি সেই পাপী!
অনাথ শিশুরে আর কাতর পত্নীরে
চোরের মতন ফেলি' আসিনু পালায়ে!—
হায় অসহায় শিশু, প্রাণের পুতলি,
যবে তোর শিরে আসি' মৃত্যুর নিশ্বাস
পরশ করিতেছিল, হয় ত বিভ্রমে
বাবা বলে-ডেকেছিলি এই নরাধমে!
খুঁজেছিলি বৃথা কারে! ঘুমাও ঘুমাও
বিশ্বপিতা কোলে, বৎস। ঘুম যাও যাদু,
ভাঙ্গে না বিশ্বাস যেথা, ঘুচে না অভয়!
আর তুমি অভাগিনী, শোক-উন্মাদিনী,
এস পতিপুত্রহারা, এস পরিত্যক্তা,
এস অনুতাপদগ্ধা নিষ্পাপ পতিতা,
চল মোরা তিন জন সংসারের প্রান্তে
অভিনব গৃহস্থালী করি গে রচনা।—

হায় যদি ননীলাল ফিরিত এখন,
পুরাতন নিঃসঙ্কোচে এই আলিঙ্গনে
যদি সে আসিত ফিরে।—হায় তা কি হ'বে!—
চাহিয়া যুবতী পানে, ধরি' তার হাত
কহিতে লাগিল,—করিবে কি ক্ষমা, ননী?
ভাঁড়ায়ে পিতারে তব, বিপত্নীক বলি',
পূর্ব্বপরিচয়-বলে ধর্ম্মান্তর ল'য়ে
বিধবা, তোমারে যবে বিবাহবন্ধনে
বাঁধিয়াছি, ছলে হোক্, তবু সে বন্ধন
প্রেমের কুহকে আর ধর্ম্মের আলোকে
শুভ শুদ্ধ হয় নাই?—এবে শুধু বলি,
শৈশবের প্রেম স্মরি' ক্ষমা কর মোরে।—
সহসা উন্মত্তা উঠি' দাঁড়াল তখন,
কহিল কম্পিতকণ্ঠে চাহি দোঁহা পানে,—
'চিরসুখী হও দোঁহে। আজিকার কথা
ভুলিও দুঃস্বপ্ন সম।'—প্রকাশে চাহিয়া
কহিল গদ্গদকণ্ঠে,—'স্বামী! প্রাণাধিক!
ক্ষমা করেছিলে আগে; কিন্তু আজ দিলে
যাহা মোরে, তা যে মোর আশার অতীত।
যতদিন আছি বেঁচে, সেই স্মৃতি লয়ে
জীবন কাটায়ে দিব। এই ভালো, প্রভু!
আর বেশী কাজ নাই।—বিদায়! বিদায়'!—
এত বলি' অন্ধকারে গেল মিশাইয়া।
আঁধার চিরিয়া মৌনে চতুর্থীর চাঁদ
উঠে এল ধীরে ধীরে। যুবক-যুবতী
সেইখানে; কারো মুখে নাই কোন কথা।
রজনী গভীর হ'ল; ক্ষীণ কোলাহল
ক্ষীণতর হ'তেছিল; একটি কোকিল
অদূরে গাহিতেছিল; শীতল সমীরে
সদ্যঃস্ফুট ফুলবাস লাগিল উড়িতে;

সেইখানে একাসনে অভুক্ত দম্পতি
কাষ্ঠপুত্তলীর প্রায় রহিল বসিয়া।

জামাই বাবু।

১

সারদাচরণ বাগ্‌চী ও তস্য ভ্রাতা বরদাচরণ বাগ্‌চী কুসুমপুর গ্রামে ভ্রাতৃ-বাৎসল্যের আদর্শ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পল্লীরমণীগণ অনেক সময়ই বলিতেন, "আহা! দুটি ভাই নয় ত, যেন রাম লক্ষ্মণ, কলিতে ত এমন দেখা যায় না।" বড় ভাই সারদাচরণ রামজীবনপুরের জমীদার মজুমদার বাবুদের সদরনায়েব ছিলেন; ছোট বরদাচরণ বাড়ীতে বসিয়া সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন; বাড়ী, বাগান ও চাষবাস দেখিতেন। সংসারের সকল ভার স্নেহময় কনিষ্ঠ সহোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া, সারদাচরণ নিশ্চিন্তমনে বিদেশে অর্থোপার্জ্জনে রত থাকিতেন। বরদাচরণের এক এক সময়ে চাকরী করিবার সাধ হইত। কিন্তু দাদা বলিতেন, "চাকরীতে আর তোর দরকার কি? পরের গোলামী আমি করচি, করি; মিছামিছি কেন তুই দশ বিশ টাকার জন্য দাসত্ব কর্‌তে যাবি?" বরদাচরণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতেন, "চিরদিন বাড়ীতে বসে বসে তোমার অন্নধ্বংস করবো? সেটা কি ভাল দেখায় দাদা?" দাদা বলিতেন, "ও সব সৌখীন শিষ্টাচার রেখে দে! আমার খাবি নে ত কি ও পাড়ার মুখুজ্যেদের খেতে যাবি?" বরদাচরণকে অগত্যা নিরুত্তর হইতে হইত।

সারদাচরণ বড় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। অবৈধরূপে অর্থোপার্জ্জনের প্রবৃত্তি থাকিলে কুসুমপুরের মধ্যে তিনি এক জন সম্পত্তিশালী লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রবৃত্তি ছিল না। সে জন্য অনেকে তাঁহাকে সংসার-জ্ঞানহীন বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যে টাকা বেতন পাইতেন, তাহা যথেষ্ট হইলেও, তিনি একটি স্থাবর অট্টালিকা ও উৎসবাদিতে ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি অস্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন আর কিছুই

করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা দীনদুঃখীর দুঃখমোচনেই ব্যয়িত হইত।

বরদাচরণের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে স্বগ্রামে অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অস্থাবর সম্পত্তিগুলিও বরদাচরণের হেফাজতেই থাকিত। কারণ, তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা। সারদাচরণের স্ত্রী তাঁহার শিশুপুত্রটিকে লইয়া বাড়ীতেই থাকিতেন। বাসগ্রামের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক প্রবাসী হওয়া সারদাচরণ পাপ মনে করিতেন।

বাড়ীর অট্টালিকা-নির্ম্মাণেও সারদাচরণ অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারেন নাই; সেই জন্য অট্টালিকাটি তেমন প্রশস্ত হয় নাই। অন্দরের দুই অংশে দুই ভাইয়ের বাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বাহিরে সারদাচরণের অন্দর-সংলগ্ন একটি ছোট বৈঠকখানা। সারদার একমাত্র পুত্র শিবচরণ সেখানে বসিয়া পড়াশুনা করিত। বরদাচরণের বন্ধুগণ কদাচিৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, সেখানে বসিয়াই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইত। সারদাচরণের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর সহিত বরদাচরণের স্ত্রী মধুমালতীর মনের অমিল ছিল না। হেমাঙ্গিনী মধুমালতীকে ছোট ভগিনীর মত স্নেহ করিতেন; মধুমালতীও তাঁহাকে দিদির মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন; কখন কোনও বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইতেন না। অলঙ্কারপত্র কিছু গড়াইতে হইলে সারদাচরণ দুই বৌর জন্য সমানভাবে তাহা নির্ম্মাণ করাইতেন। বরদাচরণের কন্যা সরোজিনীর অন্নপ্রাশনে সারদাচরণ যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, পুত্র শিবচরণের অন্নপ্রাশনেও তাঁহার তত টাকা ব্যয় হয় নাই। বরদাচরণ বলিয়াছিলেন, "দাদা, মেয়ের 'ভাতে' এত ব্যয়বাহুল্যের দরকার কি?" সারদা বলিয়াছিলেন, "মেয়ে কি এতই তুচ্ছ? মেয়ে যদি সুপাত্রে পড়ে, তাহা হইলে জামাইকে দিয়ে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়।"

ভ্রাতৃবৎসল সারদাচরণের এই কথা শুনিয়া, সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে থাকিয়া একটু হাসিয়াছিলেন কি না, কে বলিতে পারে?

২

দশ বৎসরের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। দেখিতে দেখিতে সরোজিনী দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তাহার বিবাহের জন্য সারদাচরণ বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মেয়ের বিবাহ আর ত না দিলেই নয়! পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া সারদাচরণ সরোজিনীর বিবাহের কথা তুলিলেন। বরদা

নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "আরও দু' এক বছর যাক্ না দাদা! এরই মধ্যে এত তাড়াতাড়ি কি?" সারদাচরণ বিচলিতভাবে বলিলেন, "কি যে তুই বলিস্! হিন্দুর ঘরের মেয়ে ধেড়ে বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো রাখ্তে হ'বে নাকি? ঐ একটা মেয়ে, তার বিয়ে দিয়ে বাড়ীর ওরাও ত সাধ আহ্লাদ কর্ত্তে চায়। একটি ভাল পাত্র পাওয়া গেলে আমি আজ ছেড়ে কাল চাই নে।" বরদাচরণ হতাশভাবে বলিলেন, "যা ভাল বোঝ কর দাদা! আমাকে দিয়ে বিয়ে টিয়ের যোগাড় হ'য়ে উঠ্‌বে না।"

সংসারে সারদাচরণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল; অর্থব্যয়েরও শক্তি ছিল। নানা স্থানে কথা চলিতে লাগিল। ছেলেটি শিক্ষিত হয়, অথচ ঘরে ভাত আছে, এইরূপ পাত্রেরই তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর, মেডিকেল কলেজের তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ফকীরচন্দ্রকে নগদ তিন সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া, সারদাচরণ তাহারই হস্তে স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে সমর্পণ করিলেন। ফকীরচন্দ্রের মামা বীরভদ্র ঘটক বিবাহের রাত্রে সারদাচরণের সহিত আলিঙ্গন করিবার সময় সহাস্যে বলিল, "বেয়াই মশাই! 'রাজজামতা' লাভ কল্লেন, এ বাজারে বড় সস্তায় সওদা কল্লেন, পরে দেখে নেবেন, লাভটা কি রকম হ'ল।" কিন্তু এ বিবাহে বরদাচরণ বড় খুসী হইলেন না। বিবাহের পরদিন বরকনে বিদায় করিয়া কন্যাবিচ্ছেদবেদনায় উভয় ভ্রাতার চক্ষুই ছলছল করিতে লাগিল। বরদাচরণ মনের ভাব চাপা দিয়া বলিলেন, "কতকগুলো টাকা খরচ কল্লে, কাজটা কিন্তু বড় ভাল হ'লো না দাদা!" সারদাচরণ বলিলেন, "তোর ত কিছুতেই মন উঠে না; কেন, মন্দটা কি দেখ্‌লি?" বরদাচরণ বলিলেন, "রুদ্রপুরের তলাপাত্র গুষ্টির মেয়ে মর্দ্দ সকলেই শুনেছি পাকা ইঞ্জিনিয়ার, ঘর ভাঙ্গবার ভারি ওস্তাদ! ও ঘরে কাজ করিবার আমার আদতেই ইচ্ছা ছিল না।" সারদাচরণ বলিলেন, "তোর মনটা ভারি গোলমেলে; মেয়ে সুখে থাক্‌বে ব'লে পাঁচ হাজার টাকা খরচ কল্লেম; এখন বলছিস্, কাজ ভাল হ'লো না। এমন কার্ত্তিকের মত রূপবান ছেলে, আজ বাদে কাল মস্ত ডাক্তার হবে, বাপের অত বিষয়সম্পত্তি,—রাজার হাল! এমন ছেলে কি হাতছাড়া কর্‌তে আছে? তুই যে বল্‌ছিস্ ও বাড়ীর মেয়ে মর্দ্দে ঘর ভাঙ্গে, তা আমি মেয়ে দিয়েছি বৈ মেয়ে আন্‌তে যাইনি, আর মেয়ে আন্‌তামই যদি—তাতেই বা কি ভয়? ঘর আমাদের, পরে সে ঘর ভাঙ্গবে কি? এ কি বারোয়ারীর তহবিল যে, ভাঙ্গলেই হ'ল।"

বরদাচরণ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি দাদা পৃথিবীতে কারও দোষ দেখ না, সকলে যদি তোমার মত হ'ত!"

সারদাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা হ'লে পৃথিবী একেবারে বৈকুণ্ঠে গিয়ে ঠেক্‌তো! যেতে দে ও সকল কথা। চ'দেখি মাথায় একটু জলটল দেওয়া যাক্‌গে, বেলা অনেক হয়েছে।"

৩

ফকীরচন্দ্র জমীদারের ছেলে হইলেও বড় মেধাবী। সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য যে সকল শক্তির আবশ্যক, তাহা হইতে বিধাতা তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। ফকীরচন্দ্রের বংশমর্য্যাদার কথা পাবনা জেলার কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ফকীরচন্দ্রের পিতা নীলমণি তলাপাত্র, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা চালচলন অনেক বেশী মাত্রায় বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন; তিনি যে বড়লোক, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি সফর-নিরত ম্যাজিষ্ট্রেটের ভোগে ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ফণ্ডে সমান উৎসাহে চাঁদা ঢালিতেন, এবং কেহ যদি তাঁহাকে বলিতেন, "এবার নববর্ষ গেজেটে আপনি নিশ্চয়ই রায়বাহাদুর হইবেন,"—তাহা হইলে সেই সৌভাগ্যবান চাটুকারটিকে সে দিন বিলক্ষণ আহারের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইত। কিন্তু উপায় নাই, বড়মানুষীর লক্ষণই এই রকম।

বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতিতে সমারোহ করিতে গিয়া নীলমণির তহবিলটি গজভুক্ত কপিথবৎ সারহীন হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সাবধান হইলে হয় ত কতক রক্ষা পাইত, কিন্তু তিনি মা লক্ষ্মীকে বিদায় দিয়াও চাল বজায় রাখিলেন। ফলে, সমস্ত সম্পত্তি রেহানে আবদ্ধ হইল। চক্রবৃদ্ধি-হারে সুদ আরব্যোপন্যাসের আলাদীনের দৈত্য-বাহিত প্রাসাদের ন্যায় দেখিতে দেখিতে আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিল। সংসারের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় নীলমণি বাবু হঠাৎ এক দিন রাত্রে ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট লোকে যাত্রা করিলেন। তখন চারি দিক হইতে শবভোজী গৃধ্রের ন্যায় মহাজনেরা তাঁহার সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল; এবং ডিক্রী জারী করিয়া জলের দামে বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত নিলাম করিয়া লইল। পাঁচ জনে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল, "আহা! এত বড় ঘরটা একেবারে ফেরার হ'ল।" কিন্তু ফকীরচন্দ্রকে কেহই কোনরূপ সাহায্য করিল না। এমন কি, তাহার মাতুল বীরভদ্র ঘটক পর্য্যন্ত ভাগিনেয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ

করিয়া গা ঢাকা দিল। এতদিন পর্য্যন্ত কিন্তু বীরভদ্র ভগিনীপতির গৃহে দোল-ছুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকাণ্ডে ম্যানেজারি করিয়া আসিয়াছে। ভগিনী-পতি ও ভাগিনেয়ের উপর তখন তাহার বড় 'দরদ' ছিল।

ফকীরচন্দ্র দেখিলেন, শ্বশুরের নিকট সাহায্যপ্রার্থী না হইলে আর কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া চালান অসম্ভব। তিনি বরদাচরণকে এক-খানি পত্র লিখিলেন। বরদাচরণ সেই পত্রখানি তাঁহার দাদার নিকট পাঠাই-লেন, নিজে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। সারদাচরণ ফকীরচন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার বর্ত্তমান বিপদে আমি ছুঃখিত হইয়াছি; এত শীঘ্র তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কে জানিত? ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। যাহা হউক, তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। পরমেশ্বরের বিধানের উপর আমাদের কোনও হাত নাই। তুমি ও শিবচরণ ছু' জনেই আমার সমান স্নেহের পাত্র; অর্থাভাবে তুমি যে এখন কলেজ ছাড়িয়া দিবে, তাহা কোন মতেই হইবে না। তোমার কলিকাতার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আমি তোমাকে এখন হইতে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া পাঠাইব।" সারদাচরণ বাড়ীতে বরদাকে লিখিলেন, "ফকীরকে কি পরিমাণে মাসিক সাহায্য করিলে চলে, তাহা তুমি কিছুই লেখ নাই; আমি মনে করিতেছি, তাহাকে মাসিক পঁচিশ টাকা সাহায্য পাঠাইব। বোধ করি, এ টাকায় তাহার কষ্টে-স্বষ্টে চলিতে পারে। তাহার শেষ পরীক্ষার আর অধিক বিলম্ব নাই। অর্থাভাবে হঠাৎ এখন কলেজ ছাড়িয়া দিলে এত দিনের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সমস্ত পণ্ড হইবে। জামাইটি মানুষ না হইলে মেয়েটা ভবিষ্যতে কষ্ট পাইবে।"

ছুই বৎসর পরে ফকীর মেডিকেল কলেজের শেষ এল্. এম্. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই সারদাচরণের সোনার সংসারে আগুন লাগিল। সারদাচরণ হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিন মাস অতীত না হইতেই ভ্রাতৃবিয়োগশোকাতুর সরলহৃদয় বরদাচরণের জীবন-নাটকের মধ্যপথে যবনিকা পতিত হইল। শান্তিপূর্ণ সুখময় আনন্দময় পল্লীভবনে শোকের হাহাধ্বনি উত্থিত হইল, বিধবাদ্বয় সংসার অন্ধকার দেখিলেন। হেমাঙ্গিনী এই মহাশোকে আচ্ছন্ন হইয়াও বিংশবর্ষীয় পুত্র শিবচরণের মুখ চাহিয়া জীবনের শান্তিহীন বিরস দিনগুলি কাটাইতে লাগিলেন; মধুমালতীর পুত্র-সন্তান ছিল না, ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা সরোজিনীই তাঁহার জীবনের একমাত্র

অবলম্বনস্বরূপ হইয়া রহিল। দুইটি বিধবা একপরামর্শ হইয়া পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

৪

পিতার মৃত্যুর পর ফকীরচন্দ্রের সংসারে স্ত্রী সরোজিনী ভিন্ন দ্বিতীয় বন্ধন রহিল না। শৈশবেই তিনি মাতৃহীন; গৃহদ্বার বিষয়সম্পত্তি সমস্তই পরহস্তগত। ফকীরচন্দ্র ভাবিলেন, আর কেন, রুদ্রপুরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে, নূতন করিয়া যখন সংসার পাতিতে হইবে, তখন শ্বশুরবাড়ী গিয়া বসাই ঠিক, শাশুড়ীরও কোনও অভিভাবক নাই, বিশেষতঃ স্থানটি ভদ্রবাস। ব্যবসায় আরম্ভ করিলে প্রাক্‌টিসেরও বেশ সুবিধা হইবে।—এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি শাশুড়ীকে এক পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়া মধুমালতীর মনে আনন্দ হইল, কথাটা তিনি হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তা বেশ ত, ফকীর যখন আস্‌তে চাচ্চে, তখন এখানেই আসুক, এখানে ডাক্তারী কর্‌বে; ছেলেও যা, জামাইও তাই, মেয়ে দিয়ে ছেলে পাওয়া। আমাদের এখানে রক্ষক কেউ নেই, বিপদে আপদে চেয়ে দেখবার মানুষটি নেই; শিবু ত দুধের ছেলে, তারও এক জন অভিভাবক চাই।"

সুতরাং অনতিবিলম্বেই কুসুমপুর গ্রামে ডাক্তার ফকীরচন্দ্র তলাপাত্র এল্. এম্. এস্. মহাশয়ের আভ্যুদয় হইল। ফকীরচন্দ্র কয়েক মাসের মধ্যেই কুসুমপুরে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। লোকের মনোরঞ্জনে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া গেল; তিনি 'ভিজিট' না লইয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ফকীরচন্দ্র খুব 'মিশুক' লোক, মহকুমার জয়েণ্টম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গেও তিনি মধ্যে মধ্যে দেখা করিতেন, তাঁহার স্বাক্ষরিত ম্যাজিষ্ট্রেটের গুণবর্ণনা-পূর্ণ পত্র মধ্যে মধ্যে ইংরাজী সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গুণগ্রাহী ও কৃতজ্ঞ, তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই ফকীরচন্দ্র অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর ও লোকালবোর্ডের সভ্য-পদে নিযুক্ত হইলেন; ফকীরচন্দ্রের সুযশে কুসুমপুর গ্রাম পূর্ণ হইয়া উঠিল; সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য ফকীরচন্দ্রের নামে চারি দিক হইতে পত্র আসিতে লাগিল; এমন কি, কংগ্রেসে মিশিয়া স্বদেশহিতৈষী সাজিবার লোভটিও তিনি সংবরণ করিতে পারিলেন না।

যদি কন্যা সুপাত্রে পড়ে।'—জামাই হ'তেই বাগ্‌চীদের সংসারটা বজায় থাক্‌বে। বরদা ঠাকুরের পুণ্যির জোর ছিল—তাই এমন জামাই পেয়েছে।"

ফকীরচন্দ্রের এই সুসময়ে তাঁহার মাতুল বীরভদ্র ঘটক মহাশয়ের হঠাৎ এক দিন ভাগিনেয়ের কথা মনে পড়িল। মাতুল এক দিন আসিয়া ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল; ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই পূর্ব্ববৎ পাকিয়া উঠিতে লাগিল।

৫

ফকীরচন্দ্র শ্বশুরবাড়ীতে আশ্রয় লইবার অল্প দিন পরেই কৌশলক্রমে তিনি শ্বাশুড়ীকে হেমাঙ্গিনীর অনুগ্রহপাশ হইতে ছিন্ন করিয়াছিলেন, সুতরাং হাঁড়ী পৃথক হইয়াছিল। তাঁহার যুক্তি এই ছিল যে, তাঁহার জ্যেঠশ্বাশুড়ীর এখন এমন অবস্থা নয় যে, এক জন বাহিরের লোকের ভার বহিতে পারেন। ফকীরচন্দ্র উপার্জ্জক্ষম পুরুষ মানুষ, তাঁহারই বা ভার হইবেন কেন? তবে শ্বাশুড়ীকে ত আর ছাড়া যায় না, কাজেই হাঁড়ী ভাগ! কেহ কেহ বলিতেন, বাড়ী ভাগ করিয়া লইবার জন্যও ফকীরচন্দ্রের আগ্রহ আছে, কিন্তু হেমাঙ্গিনী তাহা দুষ্ট লোকের কল্পনামাত্র মনে করিতেন।

দুই এক টাকা ভিজিট লইয়া ডাক্তারী করিলে মফস্বলে সংসার প্রতিপালন করা কঠিন। তাহার উপর যাঁহারা ভিজিট দিতে পারেন—তাঁহাদের সহিত আনুগত্য রাখিবার জন্য ফকীরচন্দ্র তাঁহাদের কাছে প্রায়ই ভিজিট লইতেন না; সুতরাং তাঁহার আয়ে সংসার চলিত না। ভাগ্যে মধুমালতী দেবীর হাতে দু' পয়সা ছিল, তাহাই বাহির করিয়া তিনি জামাতার জন্য রসগোল্লা, দুধের সর ও মাছের মুড়ো সংগ্রহ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "জামাই-ই সংসার চালাচ্ছেন, আমার হাতে টাকাকড়ি কি কিছু আছে?"

কিন্তু এ ভাবে ত দীর্ঘকাল চলিতে পারে না; তাই মাতুল বীরভদ্র ভাগিনেয়কে একটি ডিস্‌পেন্সারী খুলিবার পরামর্শ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইয়া গেল যে, বীরভদ্রই সেই ডিস্‌পেন্সারীর ম্যানেজার, মুহুরী ও কম্পাউণ্ডারের কাজ করিবে।

কিন্তু ডিস্‌পেন্সারী খুলিতে প্রথমেই কিছু টাকার দরকার। ঔষধবিক্রেতা নরসিং দত্ত বা বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী যে প্রথম চালানেই হাজার দেড় হাজার টাকার ঔষধ ধারে দিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। ডিস্‌পেন্সারী

করিতে হইলে আরও নানাপ্রকার খরচ আছে, কিন্তু টাকা কৈ ?—ফকীরচন্দ্র এক দিন আহার করিতে বসিয়া কথায় কথায় শ্বাশুড়ীর কাছে টাকার কথা তুলিলেন। মধুমালতী বলিলেন, "টাকাকড়ি ত বেশী কিছু আমার হাতে ছিল না বাবা। এখন একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছি, তবে দুই একখানা গহনা আছে বটে ; তা আমার যা আছে, তা তোমাদেরই ; সেই গহনা বন্ধক দিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ করা উচিত বোধ কর ত কর। তোমাদের যাতে হিত হয়, তা করতে আমার কি অসাধ বাবা ?" পরমপরিতৃপ্তচিত্তে দশটি রসগোল্লা উদরস্থ করিয়া ফকীরচন্দ্র জলযোগ শেষ করিলেন।

৬

গহনা বন্ধক রাখিয়া ফকীরচন্দ্র পরদিনই নগদ দেড় হাজার টাকা লইয়া আসিলেন। স্থির হইল, এই টাকাতেই শিশিপত্র, ঔষধ, যন্ত্রাদি ও আলমারী সংগৃহীত হইবে। কিন্তু ডিস্‌পেন্সারী কোথায় স্থাপন করা যায় ?

অপরাহ্ণে জলযোগের পর সারদাচরণের অর্থে ক্রীত রূপার ফরসীতে তামাক টানিতে টানিতে ফকীরচন্দ্র শ্বাশুড়ীকে বলিলেন, "পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ত ঔষধ আনিতে কলিকাতায় যাইব ; কিন্তু ডাক্তারখানা খোলা যায় কোথায় ? বাজারে এক আধটা দোকান ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সন্ধানে জানিয়াছি, পনের টাকার কম ভাড়ায় দোকান মিলিবে না। ব্যবসায়ের আরম্ভেই মাসে পনের টাকা দোকান ভাড়া দেব ?—তা, ঐ বাহিরের ঘরটা ত পড়েই থাকে, ওখানে ঔষধ রাখিলে ক্ষতি কি ?"

মধুমালতী বলিলেন, "এ ত বেশ ভাল কথা। ও ঘরটা ত খালি পড়েই থাকে, সকালে শিবু যা এক আধটু পড়ে। সন্ধ্যার পর ঘরখানিতে আলো পড়ে না, মেঝেতে এক হাঁটু ধূলো। আহা! তোমার শ্বশুর যখন বেঁচে ছিলেন, রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তিনি ইয়ার বন্ধু নিয়ে ঐ ঘরে কত গল্প গুজব করিতেন, বলতে গেলে ও ঘরটা ত তাঁরই বৈঠকখানা ছিল।" পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মধুমালতী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

জামাই বাবুর চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইল! তিনি সন্তপ্তভাবে বলিলেন, "আপনার একটি ছেলে থাকিলে আর ভাবনা কি ছিল ? তা আমি পর হইলেও এখন আমাকেই ত সব দেখিয়া শুনিয়া লইতে হইবে ; আপনার আর কে অভি-ভাবক আছে ? যা হোক, জেঠীমার কাছে ঘরটার চাবি আছে, তিনি গোল

পরদিন সন্ধ্যাকালে খোলা বারান্দায় বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে মধুমালতী বড় জা হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন, "দিদি, ফকীর বাহিরের ঘরটাতে ওষুদ টোষুদ রাখতে চাচ্ছে। তা চাট্টিখানি শিশি রাখবার জন্য কোথায় আবার ঘর ভাড়া কর্ত্তে যাবে? আমি বলেছি, দিদির অমত হবে না, তিনি ঘর খুলে দেবেন।"

হেমাঙ্গিনী স্পষ্ট কোন উত্তর দিলেন না, জপবন্ধ করিয়া হরিনামের ঝুলিটি ললাটে স্পর্শ করিয়া তিনি বলিলেন, "ফকীর ত আমার পর নয়, তবে কি না জানিস্ ছোট বৌ! জামাই আদরের পাত্র, তাকে আদর যত্ন করা ভাল, ষোল আনার কর্ত্তা করা কিছু নয়।"

প্রতিবেশিনী দত্তগিন্নী নিকটে বসিয়া ছিলেন, "তিনি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "তা বড় বৌ ঠাক্‌রুণ ঠিক কথাই বলেছেন, কথায় বলে,

যম, জামাই, ভাগ্‌না,
তিন নয় আপনা'।"

হেমাঙ্গিনী একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওষুদ টষুদ ও ঘরে এনে রাখ্‌বে, বিক্রী করবে না?—ওষুদ বিক্রী আরম্ভ হ'লেই ছত্রিশ জাতের পাঁচ শ' রকমের রোগী আমাদের বাহিরের ঘরে ওষুদের জন্যে ধন্না দেবে। সেটা কি ভাল? গেরস্তর কল্যাণ আগে দেখ্‌তে হয়।"

মধুমালতী বলিল, "তা দিদি, তোমাকে মত দিতে হচ্ছে! বাজারে দোকান নিলে মাসে পনের টাকা ভাড়া যোগাতে হবে, আমার গহনাগুলো বন্ধক দিয়ে দোকানের পুঁজি করে দিয়েছি, তা ভেঙ্গে দোকান ভাড়া দিলে কি আর চলে?"

হেমাঙ্গিনী সহজ স্বরে বলিলেন, "তা কি করা যাবে বোন? আর দু দিন পরে ছেলেটির বিয়ে দেব, বৌটি ঘরে আস্‌বে, বাহিরের ঘরটা আমাদের বসত ঘরের লাগাও, ও ঘরে দশ জন বাহিরের লোক উঠাবসা কল্লে কি মান ইজ্জৎ থাকে, না ঘরে বসবাস করা যায়?"

মধুমালতী বিরক্তিদমনের চেষ্টা না করিয়াই বলিলেন, "নিজের জামাই হ'লে আর দিদির মুখ থেকে এমন কথা বেরুত না।"

হেমাঙ্গিনী ঈষৎ ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "দেখ্ মধু, আজ তোর মুখে এ কথাটা মানাচ্ছে না; তোর জামাই আর আমার জামাই এ দু'য়ে যদি ভিন্ন ভেদ থাক্‌তো, তবে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় ক'রে তিনি সরোর বিয়ে দিতেন

না; আমার যদি জামাই থাক্‌তো, আর তার যদি আক্কেল না থাক্‌তো, তা হ'লেও তাকে আমি এ কথা বলতে ছাড়তাম না।"

রাত্রে আহার করিতে বসিয়া ফকীরচন্দ্র সকল কথা শুনিলেন। সুরাদেবীর অনুগ্রহে তাঁহার মানসিক অবস্থা কিঞ্চিৎ তরল ছিল; সুতরাং অল্পেই মেজাজ গরম হইয়া উঠিল। তিনি তখন একটা মাছের মুড়া ভাঙ্গিয়া মুখে পুরিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই বলিলেন, "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! বড়গিন্নী যদি কালই বাহিরের ঘর ছেড়ে না দেয় ত পরশু 'প্যাটিসন' সুট আরম্ভ করব; যা কিছু আছে, চুল চিরে ভাগ নেব; ভেবেছিলাম, আপনি একটা নিষ্পত্তি টিস্পত্তি ক'রে নেওয়া যাবে, তা সে 'লাইনে' আর আমি যাচ্ছিনে।" মানসিক উত্তেজনায় জামাই বাবু ভাতের থালে সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াই "উহু গেছি গেছি!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

অর্দ্ধভুক্ত রুই মাছের মুড়োর হাড় জামাই বাবুর হাতে প্রবেশ করিয়া রক্তপাত করিল।

৭

পরদিন বাগচীদের প্রতিবেশিনী গিরির মা দূতী হইয়া হেমাঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। নানা কথার পর সে তাঁহার নিকট মধুমালতীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তুই মাগী আমাদের দুয়োর ঝাঁটিয়ে খাস্, তুই আমাদের ঘরের কথা মুখে আনিস্ কেন? ছোট বৌ মামলা করবে? ভয় দেখান হচ্ছে? বলিস্, দেশের সকলেই জানে, এ বাড়ী কে রোজগারের টাকা ভেঙ্গে তৈয়ারি করেছিল। পাঁচ বিঘে জমী চাষ ক'রে আর একালে পাকা ইমারত হয় না।"

গিরির মাকে বড় বৌর ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ছোট বৌ দরজার আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মিহি সুরে বলিলেন, "তোমার স্বামী ত কেবল পাল্কী চড়ে বাবুগিরি ক'রেই কাটিয়ে গিয়েছেন, আর আমাদের তিনি মুজুরের সঙ্গে ধূলো মাটি মেখে বাড়ীর জন্যে খেটেছেন, সংসারে কেউ দু' পয়সা বেশী দেয়, কেউ দু' পয়সা কম দেয়। বৈঠকখানাটা ত বল্‌তে গেলে তারই ছিল। দশ জন ভদ্রে যদি বলে, বাড়ীঘরে আমার অংশ নেই—"

হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়া বলিলেন, "কে বলচে তোমার অংশ নেই, অংশ আছে বলে ত আর কেউ বুকের উপর বসে দাড়ি উপড়োতে পারে না।"

মধুমালতী বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সহজে না দাও, আদালত খোলা আছে।"

গিরির মার গিরিধর জামাই বাবুর ভৃত্য ; গিরির মা জামাই বাবুর এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ; সে এতক্ষণ পরে কথা কহিল ; বলিল, "ঠিক কথাই ত ছোট বৌ ঠাক্‌রুণ, আমি হক্ কথার মানুষ। আদালতে এর বিচের হবে। মাছেট্রক সায়েবের সঙ্গে জামাই বাবুর ভাব কত, সায়েব এক কলম লিকে দিলে, বাড়ী ছেড়ে পালাবার পথ পাবেন না।"

সেই দিন অপরাহ্ণে উকীল ঘনশ্যাম বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া ফকীর শ্বাশুড়ীকে বলিলেন, "উকীলেরা বলিতেছে, একান্নভুক্ত পরিবারের সম্পত্তি—দুই অংশ সমান হইবে। মামলা করিলেই আমাদের জিৎ।"

গৃহবিবাদ সহজে মিটিল না। মামলা করাই স্থির হইল। ফকীরচন্দ্র ডাক্তারী শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া আইন শাস্ত্রের আলোচনায় মগ্ন হইলেন। ঘনশ্যাম বাবুর বাড়ীতে ঘন ঘন আড্ডা ও মদ চলিতে লাগিল।—শ্বাশুড়ীর গহনাবন্ধকের টাকা তখনও সব উড়িয়া যায় নাই।

শুভানুধ্যায়িগণ হেমাঙ্গিনীকে পরামর্শ দিলেন, যাহা কিছু আছে, আপোষে ভাগ করিয়া লও, মামলায় সব নষ্ট হইবে।

দুই এক দিন চিন্তা করিয়া হেমাঙ্গিনী আপোষে সম্মত হইলেন ; কিন্তু বলিলেন, "আমার ছেলের বাহিরের ঘর ছাড়িব না, আর আমার স্বামী যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি করেছিলেন, তা তাঁর ভায়ার কাছে ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরও ভায়া আমার হাতে চাবি দিলেন না ; তার পর ছোট বৌর হাতে সে চাবি পড়ে,—সম্পত্তি তার জিম্মাতেই আছে—আমি তার ভাগ চাই।"

মধুমালতী বলিলেন, "তোমার স্বামী সে সব মেয়ের বিয়ের সময় বেচে ফেলেছেন ; আমার কাছে কোনও জিনিস নেই।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তা দেখে নেব। সে ত আর চোরা মাল নয়।"

৮

দুই দিন পরে ফকীরচন্দ্রের মাতুল বীরভদ্র ঘটক ভাগিনেয়ের কুশলজিজ্ঞাসা করিবার জন্য কুসুমপুরে উপস্থিত!—কয়েক দিন পরে এক দিন মাতুল রাত্রিকালে প্রস্থান করিলেন ; কিন্তু গ্রামে জনরব উঠিল, বাগচী-বাড়ী হইতে তিনি দুই গাড়ী অস্থাবর মাল লইয়া গিয়াছেন।

চোর পলাইলে হেমাঙ্গিনীর বুদ্ধি বাড়িল, পরদিন তিনি চাবি

সম্মুখে কাঠের বড় বড় সিন্ধুকগুলি খোলান হইল ; সকলেই দেখিল, সব সিন্ধুক খালি।—কোনটিতে একবিন্দু ধূলাও পড়িয়া নাই।

এক জন দর্শক আর এক জনের কানে কানে বলিল, "এ ত ভাই দু' গাড়ীর কর্ম্ম নয়!"

এবার মধুমালতীর পথ খোলা। তিনি বাড়ী ভাগের জন্য এবার বেশী জিদ করিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কেবলই ভাবেন, "আমার স্বামীর এত কষ্টের টাকার বাড়ী—একটা পর এসে ঠকিয়ে নেবে! হা ভগবান, এই কি তোমার বিচার!"

এক সপ্তাহ পরে হেমাঙ্গিনী একখানি নোটীস পাইলেন। নোটীস প ঠাই-তেছেন শ্রীমতী মধুমালতী দেবী! নোটীসে লেখা আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া না দিলে সম্পত্তিবিভাগের জন্য আদালতের আশ্রয় লওয়া হইবে, আর তাহাকে মামলার সমস্ত খরচার জন্য দায়ী করা যাইবে।

এইবার হেমাঙ্গিনী অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন। পুত্র শিবচরণ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"—মায়ের হাত হইতে সে নোটীস-খানি টানিয়া লইল।

শিবচরণ বাপের বড় আদুরে ছেলে, দেহে বেশ শক্তি ছিল, আর কাহাকেও সে ভয় করিত না, এ শিক্ষা সে পিতার কাছে পাইয়াছিল।—সে সকলই বুঝিত, তাহার পিতার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাংশ ও বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিতে সে অসম্মত হইল। চক্ষুলজ্জায় এত দিন সে চুপ করিয়া ছিল, মায়ের অপমানে আজ সে আহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও সে চুপ করিয়া সরিয়া গেল।

শিবচরণ অপরাহ্ণে স্কুল হইতে আসিতেছে, প্রাঙ্গনে পা দিয়াই দেখিতে পাইল, ফকীরচন্দ্র ভুঁড়িটি পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া দাদ চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে তাহার মাতাকে কি স্পর্দ্ধাসূচক কথা বলিতেছে। শিবচরণ হঠাৎ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল, কর্কশস্বরে বলিল, "ফের যদি তুমি আমার বাড়ীর ভেতর দাঁড়িয়ে দাদ চুলকোবে, কি মার সঙ্গে সমান উত্তর করবে, তা হ'লে কান ধ'রে তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।"

ফকীরচন্দ্র বলিলেন, "ইঃ—তোমার একার বাড়ী কি না!"

শিবচরণের ঘাড়ে দুষ্টসরস্বতী চাপিয়াছিল; সে বলিল, "না, তোমার বাবার জমীদারী বন্ধক দিয়ে টাকা এনে এ বাড়ী তৈয়ের করেছিলেন! নিজের সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে এখন পরের ধনে পোদ্দারীগিরি কর্ত্তে এসেছেন, লজ্জাও করে না!"

"পরের মেয়ে নিয়ে সাধু হ'বার চেষ্টা!" বলিয়া ফকীরচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন; এবং ঘনশ্যাম উকীলের বৈঠকখানায় গিয়া একান্তমনে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

৯

দিন দুই পরে ফকীরচন্দ্র শাশুড়ীকে বলিলেন, "মা, শীঘ্র শীঘ্র নালিশ রুজু করিবার জন্য উকীলেরা পরামর্শ দিতেছেন; এত দিন ত কবে নালিশ রুজু হইত, এ দিকে হাতে যে টাকা আছে, তা তো আর এই মামলায় ব্যয় করা যায় না। হাজার দুই টাকার জোগাড় কি রকম করিয়া হয়? টাকাটা ধার করিয়া মামলা চালাইতে চাই, মামলা করিলেই ত আমাদের জিৎ। মামলা জিতিলেই বড় তরফের ঘাড় ভাঙ্গিয়া সব টাকা আদায় করিয়া লইব। খরচার দায়ে বাড়ী বিক্রয় করিয়া লইয়া শিবেটাকে পথে বসাব। তার মার হাতে খোলা দিব। তোমার মার কাছ থেকে হাজার দুই টাকা এনে দাও না, আমি টাকায় এক আনা হিসাবে সুদ দিব। তিনিও ত মহাজনী করেন, আমারও মহাজন হলেনই বা!"

মধুমালতী বলিলেন, "তা বাবা, মাকে বলব। বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন বটে, তা মা এতকাল খেলেন, আর আমাদের খাওয়ালেন, কি আর বেশী থাকবে? তোমার কথা তাঁকে বলব।"

মধুমালতীর উপায়হীনা বৃদ্ধা মাতা নাতজামাইয়ের জন্য টাকা লইয়া মেয়ের বাড়ী আসিলেন। ফকীরচন্দ্র এক আনা হিসাবে সুদের টাকা আগাম গণিয়া দিয়া ১২৮০৲ টাকা পাইলেন। শশুঞ্চ গৃহমাগতম্।

প্রায় চারি হাজার টাকা হস্তগত করিয়া ফকীরচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, অতঃপর তিনি শ্যাম ও কুল কি রাখেন!

সহসা বিধাতা তাঁহার কুলরক্ষা করিলেন!

ফকীরচন্দ্রের স্ত্রী সরোজিনীর স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না। ম্যালেরিয়ায় তাহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল; এই অবস্থায় একটি কন্যা প্রসব করিয়া সরোজিনীর পনের বৎসরের সংসারলীলার অবসান হইল। একদিনমাত্র জীবিত থাকিয়া কন্যাটিও মায়ের অনুসরণ করিল।

মধুমালতী মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; তাঁহার হৃদয়ভেদী রোদনে পাষাণও গলিয়া গেল। মেয়েটিই তাঁহার সংসারে একমাত্র অবলম্বন ছিল, এবং এই মেয়ের জন্যই তিনি আজন্মের হিতৈষিণী বড়দিদির সঙ্গে 'বিষয়' লইয়া মামলা করিয়াছেন। তিনি বিদীর্ণহৃদয়ে বলিলেন, "মা! তুই আমাকেও সঙ্গে নিলিনে কেন?"

বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই রাত্রেই ফকীরচন্দ্র মামলার তদ্বির করিবার জন্য জেলায় চলিলেন!—কিন্তু আজও গেলেন, কালও গেলেন। মধুমালতী মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিলেন ; ঘর শূন্য,—কোনও দিকে সাড়াশব্দ নাই! কেবল একটা টিকটিকি কড়িকাঠের কাছে এক-একবার টিক্ টিক্ করিতেছে।

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া সেই কক্ষে শিবচরণ প্রবেশ করিল, বলিল, "কাকীমা, উঠে এস, মা তোমার জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছেন, কেঁদে কেঁদে শরীর নষ্ট ক'রে ত কোনও লাভ নেই।"

এক মাস চলিয়া গিয়াছে, ফকীরচন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই। ঘনশ্যামবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাই ত, লোকটা যে এত পাজী, তা ত তখন মনে হয় নাই।"—ফকীরচন্দ্রকে পত্র লেখা হইল,—"তোমার শ্বাশুড়ী আর মামলা করিতে ইচ্ছুক নহেন, তুমি বাড়ী ফিরিয়া এস।"

কেহ বাড়ী ফিরিল না। উৎকণ্ঠায় মধুমালতীর দারুণ কন্যাশোকও ঢাকিয়া গেল। তিনি লিখিলেন, "তুমি না আসিলে আমি অনাহারে মরিব ; শিবু নাবালক, কতদিন আমি তাহার খাইব?"

এবার এক পত্র আসিল। একখানি চৌকা গোলাপী রঙ্গের খামে মোড়া। মধুমালতী নিজে লেখাপড়া জানিতেন না, দত্তদের বটকৃষ্ণ তাঁহার পত্রাদি লিখিত। মধুমালতী বটকৃষ্ণকে ডাকাইয়া পত্রখানি তাহাকে পড়িতে দিলেন। পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহার ভাবার্থ এই,—বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসের ২৯এ তারিখে দয়ানন্দপুরের জমীদার স্বর্গীয় রামজয় পাকড়াশীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবীর সহিত ডাক্তার ফকীরচন্দ্রের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইবে। অতএব তিনি যেন এই উপলক্ষে কলিকাতার নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন।—পথখরচ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।—পত্রের নীচে মাতুল বীরভদ্র ঘটকের নামস্বাক্ষর।

মধুমালতী হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন ; নূতন করিয়া সংসার অন্ধকার দেখি-

পর তিনি ভগ্নস্বরে চীৎকার করিয়া মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে বলিলেন, "হায়, হায়, কোথাকার এক হতভাগার হাতে আমার, আমার মার সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে সব খোয়ালেম !"

হেমাঙ্গিনী ব্যস্তভাবে মধুমালতীর কক্ষে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ছোট বৌ ! —হঠাৎ এ কি !"

মধুমালতী পত্রখানি দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, আমার মাথা আর মুণ্ড !" হেমাঙ্গিনী লেখাপড়া জানিতেন, পত্রখানি পড়িয়া মুখ তুলিলেন। মধুমালতী তখন নিতান্ত বিকলভাবে হেমাঙ্গিনীর পায়ের গাছে গড়াইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার গতি কি হ'বে দিদি !—এখন আমি কার দুয়োরে দাঁড়াব ?"

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে বসিলেন, ধীরে ধীরে অতি যত্নে ও সাবধানে সেই ধূল্যবলুণ্ঠিতা, সর্ব্বস্ববঞ্চিতা অভাগিনীকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন ; এবং শুভ্রাঞ্চলে তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন,—

"কাঁদিস্‌নে বোন ! যা অদৃষ্টে ছিল, হয়েছে। তোর যত আপনার লোক পর হোক না কেন, তুই কখন আমার পর হ'বি নে। ষষ্ঠীর নফর শিবু আমার এক শ' বছরের হ'য়ে বেঁচে থাক, তোকে কখনও এক মুঠো ভাতের জন্য পরের দুয়ারে যেতে হ'বে না। আমি দুটো খেতে পাই ত তুইও পাবি।"

ফকীরচন্দ্র এখন কলিকাতার সেই ঐশ্বর্য্যবান পাকড়াশী ভূম্যধিকারীর জামাই। কর্ত্তা বাঁচিয়া নাই, মেয়েটি ও জামাইটি লইয়া কর্ত্রী কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। তুচ্ছ সামগ্রীতে আর এখন ফকীরচন্দ্রের লোভ নাই ; সুতরাং শিবচরণ নিষ্কণ্টক হইয়াছে। ফকীরচন্দ্র কুসুমপুরের অনাথা শ্বাশু-ড়ীকে ঋণের সামান্য কয়েকটা টাকা প্রত্যর্পণ করাও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করিলেন।

ফকীরচন্দ্র বঙ্গচ্ছেদে বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের অনুকূলে মত দিয়াছিলেন, গোপনে লিখিয়াছিলেন, ইহাতে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল হইবে।

বিধাতার যাহা সাধ্য, ফকীরচন্দ্রকে একাল পর্য্যন্ত তাহা তিনি দিয়া আসিয়াছেন। সরকার বাহাদুর এবার তাঁহাকে কি উপাধি দান করিতে পারেন, রায় বাহাদুর, না একদম্ সি. আই. ই., তাহাই আমরা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি।

দুরাশা।

১

যখন দারিদ্র্যও মানবের উচ্চ আশার বিস্তার রোধ করিতে পারে না, তখন মধ্যবিত্ত হচিন্স দম্পতির পক্ষে একমাত্র সন্তান জর্জ্জকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহার সম্পদ ও সম্মানলাভের পথ মুক্ত প্রসারিত ও সুগম করিবার চেষ্টা নিন্দনীয় বলা যায় না। জর্জ্জের পিতা মফঃস্বল সহরে ব্যাঙ্কে চাকরী করিতেন; যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সংসারে কখনও অভাব অনুভূত হয় নাই। তাঁহার মাতা ব্যাঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যানেজারের দুহিতা। যৌবনে তিনি রূপলাবণ্য হেতু সহরের সমাজে সুপরিচিতা ছিলেন। জর্জ্জের পিতা রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। পিতার মৃত্যুশয্যায় কন্যার অকাতর শুশ্রূষায় বিস্মিত হইয়া তিনি তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। সেই শ্রদ্ধা তাঁহাকে জর্জ্জের ভাবী জননীর প্রতি আকৃষ্ট করে। তাহার ফলে উভয়ের পরিণয়।

সহরের বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া জর্জ্জ দূরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিল। জর্জ্জ যে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা করিল, সে দিন তাহার পিতা-মাতা ও তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবাদি তাহাকে বিদায় দিতে রেলওয়ে-ষ্টেশনে আসিলেন। যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন দুই জন রমণী ছলছলনেত্রে যত দূর দেখা গেল, সেই গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। জর্জ্জ গাড়ীর বাতায়নপথে রুমাল নাড়িতেছে, দেখিতে লাগিলেন। গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেলে উভয়েই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এক জন জর্জ্জের স্নেহময়ী জননী, অন্য জন তাহার প্রতিবেশি-কন্যা হেলেন।

পরিচিত সহরের পরিচিত ষ্টেশন যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন জর্জ্জ গাড়ীতে স্থির হইয়া বসিল। যুবক প্রবীণত্ব-প্রাপ্তির ভান করে। তাই এতক্ষণ জর্জ্জ সংসারসংগ্রামে অপগতযৌবনমনোবেগ স্থির প্রবীণ বয়স্কের গাম্ভীর্য্যের অনুকরণ করিয়াছিল। আর পারিল না। উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাহার নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। জননীর কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর হেলেনের মুখ মনে পড়িতে লাগিল। বিদায়কালে তাহার কাতর মুখচ্ছবি, অশ্রুসজল নয়নের করুণভাব, সে কি ভুলিবার? যৌবনে—যখন

মনোবৃত্তির প্রথম উন্মেষ, পরিজাতকুসুমগন্ধামোদিত হৃদয়নন্দনে যখন নবাগত বসন্তের প্রথম বিহগকূজন, তখন অনাবিল প্রেম শৈশবসহচরীর ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ প্রীতিস্নিগ্ধ আয়ত লোচনে যে দিব্যদীপ্তি দর্শন করে, তাহা জীবনে আর কখনও দর্শন করা যায় না। তখন প্রেম অবলম্বনের সন্ধান করে, এবং প্রথমপ্রাপ্ত অবলম্বনকে বেষ্টন করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যে তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলে, এবং সেই সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ হয়।

হেলেন বয়সে জর্জ্জ অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। শৈশব হইতে উভয়ে একত্র খেলা করিয়াছে। জর্জ্জ যখন কণ্টকতরু হইতে ফুল তুলিয়া রক্তাক্তহস্তে হেলেনকে তাহা দিয়াছে, তখন হেলেন জল আনিয়া সে হস্ত ধৌত করিয়াছে; সে যখন পুষ্পমধুপানমত্ত প্রজাপতির পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, তখন হেলেন তাহার বল দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছে। সে যখন নদীসৈকতে বসিয়া হেলেনকে নদী, পর্ব্বত, তারকা প্রভৃতির সম্বন্ধে তাহার নবলব্ধ জ্ঞানের কথা বলিত, তখন হেলেন তাহার বিদ্যার গভীরতায় মুগ্ধা হইত। এমনই ভাবে এত দিন কাটিয়াছে। ইহার মধ্যে কবে হেলেনের কোমল হৃদয়ে অজ্ঞাতে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সে জানিতে পারে নাই। আজ তাহার ষোড়শবর্ষ বয়সে—যখন তাহার বাল্যকাল কেবল যৌবনে আসিয়া বিকশিত হইয়াছে, অথচ যৌবন এখনও তাহার বিকাশ অনুভব করিতে পারিতেছে না, সেই সময়, এই বিচ্ছেদবেদনা বর্ষাবারিপাতে ধরণীর স্নিগ্ধ শান্তি ও শ্যাম শোভার মত তাহার যৌবন ও প্রেম উভয়েই আত্মপ্রকাশ করিল।

জর্জ্জের হৃদয়েও সে প্রেমের ছায়া পড়িয়াছিল; নহিলে আজ যাইবার সময় হেলেনের কাতর মুখচ্ছবি কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল কেন?

২

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম জর্জ্জের মন তাহার সেই দূরগৃহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। যুবকদলসংসর্গে সে ভাব শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। তাহার পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইল। গৃহে শাসন ও সংযম,—এখানে স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার। গৃহে পিতামাতার স্নেহসতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাহাকে লক্ষ্য করিত, এখানে কতকগুলি বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলা ব্যতীত সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বরং যুবকদলে সেই সকল নিয়মের ব্যতিক্রমও প্রশংসিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন কতিপয় যুবক

আপনারা একটি স্বতন্ত্র দল গঠিত করিয়া লইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ তাহাদিগের উপযোগী ছিল না; সাহিত্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগে খ্যাতি-অর্জ্জন ও কীর্ত্তিসংস্থাপন তাহাদের নিয়তি। তাহারা সাধারণ ছাত্রদল হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। জর্জ্জ সেই দলে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঋষির আদর্শ সমুন্নত; কিন্তু অবস্থা না বুঝিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহারই অনুকরণ সংসারীর পক্ষে সকল সময় সুখের কারণ হয় না। এই ছাত্রদলের অনুকরণ জর্জ্জের পক্ষে সেইরূপ হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠে তাহার আর মন বসিল না। সে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে লাগিল,—গদ্য ও পদ্য রচনায় তাহার ডেস্ক পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, কোনও মাসিকপত্র-সম্পাদকই তাহার স্বহস্তে ডাকবাক্সে প্রদত্ত সেই সকল অমূল্য রচনা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিলেন না। আহত অভিমানে অনাদৃত কবি ও ঔপন্যাসিক সমালোচক হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। চারি বৎসরে এই হইল।

এই সময়ের মধ্যে জর্জ্জ ছুটীতে কয়বার বাটীতে গিয়াছে। কিন্তু তখন তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যচর্চ্চাশূন্য ও সাহিত্য-সঙ্গিবিবর্জ্জিত গৃহে তখন তাহার আর পূর্ব্বের আকর্ষণ নাই। সে গৃহে আসিলে বিদ্যালয়ে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইত। গৃহে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। তাহার জননী তাহাতে ব্যথিতা হইতেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না।

জর্জ্জের এই ব্যবহারে আর এক জন অন্তরে বিষম ব্যথা পাইত—সে হেলেন। হেলেনের প্রেম জর্জ্জকে বেষ্টন করিয়া সুখস্বর্গ রচনা করিয়াছিল। সে দেখিতে লাগিল, জর্জ্জ ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; তাহার আবেগ ক্রমে ঔদাস্যে পরিণত হইতেছে। সে অনাদর তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, জর্জ্জ সহরে বাস করে; সে গুণহীনা শৈশব-সহচরীকে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? দীপ্তদিবাকর-দ্যুতির নিকট খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কে লক্ষ্য করে? কিন্তু হায়!—যাহারা গর্ব্বরক্ত গোলাপ পাইবে, তাহারা ভুলিয়া পত্রান্তরালবর্ত্তী কুন্দকলিকে আদর করে কেন? বিজন বনবাসে—পত্রচ্ছায়াই কুন্দকুসুমের উপযুক্ত আবাস। সে কি তাহা জানে না? কিন্তু—কে তাহার আশা বাড়াইয়াছিল? হেলেন মনের দুঃখ মনেই রাখিত, প্রকাশ করিত না। কিন্তু কুসুমহৃদয়বদ্ধ কীট যেমন ফুলের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, সেই মর্ম্মবেদনা তেমনই তাহার

সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে লাগিল। তাহার নয়নে আর যৌবনচাঞ্চল্য নাই,—তাহাতে কাতরতা স্বপ্রকাশ। তাহার আননে অকালগাম্ভীর্য্য প্রফুল্লতাকে দূর করিল—যেন অকালজলদোদয়ে কমলকুলানন্দ রবিকর নিবারণ করিল।

জর্জ্জ গৃহে আসিলে হেলেনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু সে হেলেনের কাতর মুখভাবে তাহার যাতনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিত না। সে তখন এমনই অন্ধ!

জর্জ্জ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া হেলেনকে বিবাহ করিবে, ইহাই জর্জ্জের পিতামাতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, জর্জ্জ তাহার শৈশবসঙ্গিনীকে সত্য সত্যই ভালবাসে; কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে সে আপনিই তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে; তাঁহাদের আর সে কথা বলিতে হইবে না।

৩

বলিয়াছি, অনাদৃত কবি ও ঔপন্যাসিক জর্জ্জ সমালোচক হইবার কল্পনা করিতেছিল। সে বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না। পঞ্চমবর্ষের প্রারম্ভেই তাহার পিতার মৃত্যু হইল। সংসারের ভার জর্জ্জের স্কন্ধে পড়িল। সাহিত্য-সেবায় ব্যয় যথেষ্ট হইয়াছে, আয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কাযেই জর্জ্জকে অন্য চেষ্টা করিতে হইল। চাকরীর চেষ্টায় জর্জ্জ কর্ম্মকেন্দ্র রাজধানীতে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আসিল।

নিদাঘে যখন দারুণ তাপে প্রকৃতি কাতরা হইয়া উঠে, তখন চাতকের আহ্বান সত্ত্বেও জলদ বিন্দুবর্ষণ করে না; কিন্তু বর্ষায় সেই নীরদ আপনি হৃদয়-রস-দানে ধরা প্লাবিত করিয়া দেয়। ভাগ্য কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করেন না, আবার কখনও স্বেচ্ছায় অপ্রত্যাশিত সাফল্যসম্পদ দান করেন। এত দিনে ভাগ্যদেবী জর্জ্জের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দুই তিন দিনের চেষ্টায় তাহার একটি চাকরী জুটিল। তাহার এক জন সতীর্থ সাহিত্যিক-দলে না মিশিয়া সাধারণ ছাত্রদলে সাধারণ ছাত্রপাঠ্য পাঠে মনোযোগ দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি গভর্মেণ্টের কোনও আফিসে প্রধান সহকারীর কার্য্য করিতেন। তাঁহার কৃপায় জর্জ্জের চাকরী হইল,—বেতনও নিতান্ত সামান্য নহে। জর্জ্জের চাকরী হইবার দশ দিন পরে তাহার একখানি পত্র তাহার কলেজ ও বাড়ী ঘুরিয়া তাহার হস্তগত হইল। "নব-মাসিক" পত্রে তাহার একটি গল্প গৃহীত হইয়াছে;—সম্পাদিকা কুমারী মেরী ব্রাউন

তাহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছেন, এবং তাহাকে, সম্ভব হইলে, আরও গল্প দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পত্রপাঠ করিয়া জর্জ্জ আনন্দমত্ততায় বিহ্বল হইল। সে দুইবার—তিনবার পত্রখানি পাঠ করিল। কি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য,—কি আনন্দের সংবাদ! সৌভাগ্যের অরুণ কিরণের বিকাশ কি মধুময়! সে আবার পত্রখানি পাঠ করিল;—সম্পাদিকার হস্তাক্ষর স্পষ্ট, শোভন; পত্রের কথাগুলি সুসংবদ্ধ—সযত্নরচিত। সে আবার পত্রখানি পাঠ করিল; তাহার পর পোর্টমেণ্ট খুলিয়া রচনার খাতাগুলি বাহির করিল।

প্রত্যেক গল্পের সহিত, প্রত্যেক কবিতার সহিত কত স্মৃতি জড়িত! জর্জ্জ আবার সেগুলি পড়িতে লাগিল। তাহার অজ্ঞাতে কখন্ দিনান্ত-তপন পশ্চিমমেঘে অন্তর্হিত হইতেছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। অস্পষ্ট আলোকে আর অক্ষর দৃষ্টিগোচর হয় না। জর্জ্জ খাতা রাখিয়া উঠিল। আফিস হইতে ফিরিয়াই সে পত্র পাইয়াছিল,—সে বেশপরিবর্ত্তনও করে নাই।

সন্ধ্যায় সে আলোক জ্বালিয়া আবার রচনার খাতা লইয়া বসিল; বাছিয়া বাছিয়া দুইটি গল্প ও দুইটি কবিতা নকল করিল। যখন সে কলম রাখিয়া উঠিল, তখন রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। সে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া শয়ন করিল; দারুণ শ্রমের পর অল্পক্ষণেই প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

প্রভাতে যখন জর্জ্জের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা আটটা। সে ঘড়ী দেখিয়া এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিল।

আফিসে যাইবার সময় জর্জ্জ পূর্ব্বরাত্রে নকল করা গল্প ও কবিতা সঙ্গে লইয়া গেল।

৪

কোনও অছিলায় আফিস হইতে একটু সকালে বিদায় লইয়া জর্জ্জ 'নব-মাসিক' আফিসে যাত্রা করিল।

আফিসে সে শ্বেতশ্মশ্রু, বিরলকেশ কার্য্যাধ্যক্ষের সমীপে নীত হইল। কার্য্যাধ্যক্ষ কি লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চশমার মধ্য দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে জর্জ্জকে দেখিয়া লইলেন। সে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় জর্জ্জের বিকাশোন্মুখ গর্ব্ব-শতদল যেন শুকাইয়া উঠিল। কার্য্যাধ্যক্ষ জর্জ্জকে বসিতে বলিয়া, তাহার

জর্জ্জ তাহার প্রয়োজন বিবৃত করিল।

এইরূপ নূতন লেখকের অত্যাচার কার্য্যাধ্যক্ষকে সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হইত। তিনি জর্জ্জের পাণ্ডুলিপি ও পত্র সম্পাদিকাকে পাঠাইয়া দিবেন, বলিলেন।

সেই দিন জর্জ্জ জানিয়া আসিল, সম্পাদিকা কুমারী ব্রাউন বিচারক সার্ রবার্ট ব্রাউনের বিদূষী কন্যা।

সাত দিন পরে জর্জ্জ সংবাদ পাইল, তাহার গল্প ও কবিতা গৃহীত হইয়াছে। ইহার পর রাত্রিজাগরণ করিয়া গল্প ও কবিতা-রচনা জর্জ্জের নিত্য কর্ম্ম হইয়া উঠিল। সব রচনা 'নব-মাসিক' আফিসে জমা হইতে লাগিল। সম্পাদিকার সহিত লেখকের পত্রব্যবহার ক্রমে আর বিরল রহিল না। এই ভাবে দুই মাস কাটিল।

তাহার পর 'নব-মাসিকে'র জন্মদিনের বার্ষিক উৎসবে জর্জ্জ নিমন্ত্রিত হইল। আফিসে স্থানাভাব; লেখকলেখিকাগণ সম্পাদিকার গৃহে সমবেত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সমাগমে, বহু লেখক লেখিকার মধ্যে—কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ও সমুজ্জ্বল অলঙ্কারের সমাবেশে—উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে রত্নদীপ্তি ও দীপ্ত দৃষ্টির মধ্যে, জর্জ্জের সহিত কুমারী ব্রাউনের পরিচয় হইল।

সান্ধ্যসমিতি হইতে জর্জ্জ গৃহে ফিরিল। তাহার জীবন-নাটকে নূতন অঙ্কের অভিনয় আরব্ধ হইল—আবার পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। সমস্ত রাত্রি সে সুখস্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল—অতীত অন্ধকার—ভবিষ্যৎ সুখ-সমুজ্জ্বল—যশ, সম্মান,—আর—প্রেম! জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। দ্বাবিংশবর্ষবয়স্কের সুখস্বপ্ন!

৫

'নব-মাসিকে'র প্রতি জর্জ্জের অসাধারণ যত্নে সম্পাদিকার সহিত অল্প দিনেই তাহার কিছু ঘনিষ্ঠ ভাব জন্মিল। সে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল নিষ্ফল চেষ্টার পর এই পত্রে যশের দ্বার মুক্ত দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; ক্রমে সে আকর্ষণ পত্রকে ছাড়াইয়া সম্পাদিকাকেও স্পর্শ করিল। যৌবনকে বিশ্বাস করিতে নাই।

বিদূষী রমণীর সহিত পূর্ব্বে কখনও জর্জ্জের পরিচয় হয় নাই। কুমারী ব্রাউনের ব্যবহার ও কথোপকথন তাহার নিকট যেমন নূতন, তেমনই মধুর

বোধ হইতে লাগিল। সে যেন স্বপ্নাবেশবিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপ স্বপ্নে বর্ষাধিককাল কাটিয়া গেল।

এই সময় জর্জ্জ একবার গৃহে গমন করিল। তাহার জননী তাহার চাকরীতে আহ্লাদিতা ও তাহার সাহিত্যিক সাফল্যে গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। আর এক জন রমণী তাঁহার আহ্লাদের ও গর্ব্বের অংশ লইয়াছিল—সে হেলেন। জর্জ্জের বিধবা জননীর নিঃসঙ্গবাসে সে-ই তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার নিঃসঙ্গবাসযাতনা দূর করিত। জর্জ্জের জননী পুত্রের আগমনপথ চাহিয়া ছিলেন,—আশা করিয়াছিলেন, উপার্জ্জনক্ষম পুত্র এইবার আসিলে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে। এই সময়ের মধ্যে হেলেন তাঁহার কত আপনার, কত অত্যাবশ্যক হইয়াছে, তাহা দেখিলে, সে হেলেনকে তাঁহার দুহিতা করিবে। তেমন গুণবতী বধূ তিনি আর কোথায় পাইবেন?

জর্জ্জ গৃহে আসিল। সে জননীর প্রতি হেলেনের ব্যবহার লক্ষ্য করিল। কিন্তু তাহাতে সে আকৃষ্ট হইল না। তাহার জননী পুত্রের ভাব লক্ষ্য করিলেন; পুত্রকে উদাসীন দেখিয়া মনের কথা স্বয়ং পুত্রকে বলিলেন। জর্জ্জ সে কথা মনেই করে নাই। সে বিপদ গণিল;—আরও দিন কতক পরে,—পুনরায় ছুটীতে গৃহে আসিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিবে—জননীকে এরূপ বুঝাইল। জননী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয়ে বিষাদের ও সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

সরলা হেলেনের কথায় জর্জ্জের বিদুষী কুমারী ব্রাউনকে মনে পড়িল। উভয়ে কি প্রভেদ! সে সরল বাঁশের বাঁশীতে বীণার ঝঙ্কার পাইবে কিরূপে? হায়, সরল বাঁশের বাঁশী, তুমিও হৃদয়োত্থিত মধুর স্বরে মুগ্ধ করিতে পার সত্য, কিন্তু সে যখন কেহ তোমার হৃদয়ে হৃদয়াবেগ ঢালিয়া দেয়। তোমার হৃদয়তন্ত্রী মর্ম্মাবেগস্পর্শ ব্যতীত—সামান্য অঙ্গুলীকম্পনে কাঁপিয়া উঠে না। সকলে তোমার মূল্য বুঝে না।

জর্জ্জ কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেল।

৬

প্রণয়ে প্রথম পথ দ্রুত অতিক্রান্ত হয়। জর্জ্জের তাহাই হইয়াছিল। কোনও বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলে, যদি তাহাতে বাধা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তবে মানুষ যত সত্বর সম্ভব, তাহা শেষ করিতে চাহে। গৃহ হইতে ফিরিয়া জর্জ্জ কুমারী ব্রাউনকে পাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল। মন সঙ্কল্পের দাস; সঙ্কল্প

যাহা দেখায়, মন তাহাই দেখে। তাই জর্জ্জের মন কুমারী ব্রাউনের ব্যবহারে তাহার প্রতি কুমারীর প্রেমের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে লাগিল। বিশেষতঃ পুংবৎপ্রগল্ভা বলিয়া কুমারী ব্রাউনের খ্যাতি ছিল। অন্য রমণী যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে সঙ্কুচিতা হয়েন, কুমারী ব্রাউন নিঃসঙ্কোচে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। জর্জ্জের মন জর্জ্জকে বুঝাইল,—প্রেম যুবক যুবতীকে পরস্পরের সন্নিহিত করিতে চাহে, যুবককে যুবতীর লজ্জা ও যুবতীকে যুবকের সাহস প্রদান করে; এ সকল আলোচনা সেই প্রণয়-প্রদত্ত সাহসের ফল। জর্জ্জের আশা বাড়িয়া গেল।

জর্জ্জ কয় দিন চেষ্টার পর, অনেকগুলি কাগজ নষ্ট করিয়া কুমারী ব্রাউনকে আপনার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিল। কবিজনোচিত যুক্তিতে ও ভাষায় সে পত্র পূর্ণ। সে লিখিল, সে কুমারী ব্রাউনের অনুপযুক্ত, কিন্তু প্রেম-সূর্য্য শতদল-দলেও যেমন, তৃণ-কুসুমেও তেমনই কিরণ দান করে। তাঁহারই প্রেমের কিরণে তাহার এ প্রেমপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন কি? সে বর্ষাধিককাল হৃদয়ে এই বাসনা লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছে,—বুঝিয়াছে, সে অযোগ্য হইলেও, তিনি অন্যকে যে অনুগ্রহ করেন, তদপেক্ষা তাহাকে অধিক অনুগ্রহ করেন। তাহাতেই সাহসী হইয়া সে এই প্রস্তাব করিল।

সে দিন কুমারী ব্রাউনের গৃহে সান্ধ্যসমিতিতে তাহার নিমন্ত্রণ ছিল। সে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেল। তাহার হৃদয় উদ্বেগকম্পিত, আশঙ্কায় তাহার মুখ পাণ্ডুর, তাহার নয়নে আশার উজ্জ্বল দীপ্তি।

৭

সান্ধ্যসমিতিতে জর্জ্জের প্রতি কুমারী ব্রাউনের ব্যবহার যদি বিরক্তিব্যঞ্জক না হইয়া থাকে, সে কেবল ভদ্রতারক্ষার্থ। কারণ, শিক্ষিত রমণীকে আর শিখাইতে হয় না যে, অতিথির প্রতি বিরক্তি-প্রকাশ ভদ্রতার নিয়মবিরুদ্ধ। জর্জ্জ তাঁহার ব্যবহার লক্ষ্য করিল। কিন্তু সহজে কেহ আশা ত্যাগ করে না। সে ভাবিল, ইহা লজ্জার বিকাশমাত্র।

গৃহে ফিরিয়া জর্জ্জ দেখিল, কুমারী ব্রাউনের পত্র আসিয়াছে। তাহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতে লাগিল। সে খামখানি চুম্বন করিল; তাহার পর সযত্নে ধীরে ধীরে খুলিয়া পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রখানি কুমারী ব্রাউনের বিশেষত্বব্যঞ্জক—পুরুষোচিত কঠোরতার পরিচায়ক। জর্জ্জের

পত্রে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াছেন। পুরুষ ও মহিলার পরিচয়কে যাহারা অনুরাগের নামান্তরমাত্র বিবেচনা করে, তাহারা সমাজের পক্ষে ত্যাজ্য। জর্জ্জ সামাজিক ও অন্যবিধ সমস্ত ব্যবধান অসাধারণ সাহসে অবহেলা করিয়াছেন। কুমারী ব্রাউনের অনুরাগ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কবিজনোচিত হইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণার বিষয় অবগত হইবার পর কুমারী ব্রাউন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা পত্রব্যবহার করা সঙ্গত মনে করেন না।

জর্জ্জের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; আকাশকুসুম আকাশেই ঝরিয়া গেল। পত্রের প্রত্যেক কথা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে দরিদ্র,—সে হীন!

জর্জ্জ আবার পত্রখানি পাঠ করিবার চেষ্টা করিল—পারিল না। সে কি ভ্রান্ত!—সে কি ভ্রান্ত!

জর্জ্জ উন্মাদের মত কক্ষমধ্যে পরিক্রম করিতে লাগিল। সে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হৃদয়ে যন্ত্রণা যেন ক্রমেই তীব্রতর হইতে লাগিল। সহসা টেবলের উপর একটা পাত্র তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কয় দিন পূর্ব্বে তাহার গ্রীবায় বেদনা অনুভূত হইলে চিকিৎসক এই ঔষধলেপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জর্জ্জের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া গিয়া পাত্র তুলিয়া লইল।

৮

চেতনাসঞ্চার হইলে জর্জ্জ দেখিল, মধ্যাহ্ন;—সে হাঁসপাতালে;—তাহার সতীর্থ—আফিসের সহকারী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন। একে একে সকল কথা তাহার মনে পড়িল।

তাহার সহপাঠী বন্ধু অপরাহ্নে আবার আসিলেন। জর্জ্জের পকেটে তাঁহার একখানি পত্র পাইয়া হাঁসপাতালের কর্ম্মচারীরা প্রথমে তাঁহাকেই সংবাদ দিয়াছিল। জিজ্ঞাসিত হইয়া জর্জ্জ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিল। তিনি তিরস্কার করিলেন না, সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, বুঝাইলেন।

রাত্রিকালে জর্জ্জ বহুক্ষণ ভাবিল। তাহার গৃহ ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীকে মনে পড়িল। আর সঙ্গে সঙ্গে আজ হেলেনের বিষাদমলিন মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে যে তাহারই পথ চাহিয়া আছে! অসার কাচের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া সে মহার্হ রত্ন হেলায় হারাইতে বসিয়া-

ছিল। তুলনায় আজ সরলা হেলনকে কত উন্নত, কত মধুর বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার পর জর্জ্জের নামে আত্মহত্যার চেষ্টার জন্য নালিশ হইল। বিচারক - সার্ রবার্ট ব্রাউন। জর্জ্জের পক্ষে তাহার সেই বন্ধু মকদ্দমার তদ্বির করিতেছিলেন। তিনি আফিসে জর্জ্জকে এক পক্ষের অবকাশ দিলেন; সে মকর্দ্দমার জন্য প্রস্তুত হইবে।

বন্ধু আশা করিয়াছিলেন, সার রবার্ট জর্জ্জকে চেনেন; অবস্থাবিবেচনায় তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। কন্যার সাহিত্যানুরাগের ফলে তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইত; তাই তিনি সুযোগ পাইলেই সাহিত্যের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। জর্জ্জের সমর্থক ব্যারিষ্টার কবিজনের মানসিক অবস্থা,— চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তনশীলতা প্রভৃতি নানা কথা বলিলেন। উত্তরে সার রবার্ট বলিলেন, সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা এইরূপ অপরাধীকে গুরুতর শাস্তিদান করা কর্ত্তব্য। ইহারা শিক্ষার অপব্যবহার করে; কেবল আপনারা নষ্ট হইয়াই নিরস্ত হয় না; সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকাদিগকে দেবীত্বে সমাসীনা করিয়া সংসারের অনুপযোগিনী করে। তিনি জর্জ্জের তিন শত টাকা অর্থদণ্ড করিলেন। জর্জ্জের বন্ধু আদালতে উপস্থিত ছিলেন; তিনি জরিমানার টাকা দিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেলেন।

বন্ধুগৃহে কিছুক্ষণ কাটাইয়া জর্জ্জ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার আর কয় দিন ছুটী আছে?"

বন্ধু বলিলেন, "আর সাত দিন। কেন?"

"আমি বাড়ী যাইব।"

জর্জ্জ বন্ধুগৃহ হইতে আপনার বাসায় আসিল।

বাসায় আসিয়া জর্জ্জ দেখিল, 'নব-মাসিক' আফিসের লোক কুমারী ব্রাউনের পত্র লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পত্রখানি লইতে প্রথমতঃ তাহার প্রবৃত্তি হইল না। শেষে সে পত্রখানি লইল। কক্ষমধ্যে যাইয়া সে দীপালোকে সেখানি পাঠ করিল। কুমারী ব্রাউন তাহার দণ্ডের কথা শুনিয়াছেন। সে তাহার অবিবেচনার ফলে কষ্ট পাইয়াছে, সে জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং 'নব-মাসিকের' সম্পাদিকারূপে 'নব মাসিকে'র লেখকের সাহায্যার্থ তিন শত টাকা পাঠাইয়াছেন।

জর্জ্জ পত্র ও নোট কয়খানি হর্ম্ম্যতলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল। কি উপহাস! তাহার অবস্থায়, সামাজিক সম্মানে, ক্ষমতার কি বিদ্রূপ! কি দুরাশায় চালিত হইয়া সে এই গর্ব্বিতাকে মানস-কল্পিতা দেবীকে দেখিয়াছিল? সে মধ্যবিত্তের গৌরব বিস্মৃত হইয়াছিল,—সে তাহার ফল পাইয়াছে। তখন আবার হেলেনকে মনে পড়িল। অভ্রভেদী প্রাণিমাত্রহীন গিরিশৃঙ্গের গর্ব্বোদ্ধত গাম্ভীর্য্যের তুলনায় শ্যামশোভাসম্পন্ন, নির্ঝরকলনাদমুখরিত, তরুমর্ম্মরধ্বনিত, জীবকুলাশ্রয় প্রান্তরের শোভা কত মধুর!

জর্জ্জ উঠিল। পত্র না লিখিয়া একখানি খামে কুমারী ব্রাউনের প্রেরিত নোট কয়খানি পুরিয়া সেই লোকের নিকট প্রত্যর্পণ করিল। সে এ পর্য্যন্ত কুমারী ব্রাউনের নিকট আর যত পত্র পাইয়াছিল, সে সব একটি সুদৃশ্য বাক্সে বদ্ধ ছিল। সেগুলি বাহির করিয়া সে সব পত্রগুলি ভস্মীভূত করিল। তাহার পর ব্যাগ লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

বীর।

[১]

১

নাহি সে অতীত সম্পদরাশি, সে বিপুল জনবল;
জীর্ণ তোরণ,—দুর্গপ্রাচীর; শুষ্ক পরিখাজল।
সম্পদ-রবি অস্ত-অচলে, ভাগ্য-লক্ষ্মী বাম,—
শুধু গৌরব-স্মৃতি ঘিরি' আছে বিজয়দুর্গ-নাম।
খণ্ডরাজ্য উঠেছে তাহার হৃত সম্পদ 'পরে,
নিবিলে তপন, চন্দ্র যেমন উজ্জ্বল তা'র করে।

২

কুসুমগড়ের তরুণ নৃপতি, ভাগ্য সদয় তাঁ'রে;
বর্ষাপুষ্ট প্রবাহের মত যশ আসে শতধারে।
ভাগ্য-গরবে মত্ত নৃপতি করে না কাহারে ডর;
বিজয়দুর্গে পাঠাইয়া দূত যাচিলা কন্যা-কর।

ভুলিলা তরুণ উদ্ধত ভূপ,—পূর্ব্বপুরুষ তাঁ'র,
বিজয়দুর্গে সেনাপতি-রূপে রাখিতা দুর্গদ্বার।

৩

বিজয়দুর্গে শুনিলা নৃপতি ;— তখন পড়িল মনে,—
কালিমাবিহীন কুলের কাহিনী, গাহে যা' চারণ-গণে।
ভুলিলা নৃপতি হত সম্পদ,—ক্রোধে আঁখিযুগ জ্বলে,—
কহিলা, "কহিও প্রভুরে তোমার, আমারি পতাকাতলে
যুঝিলা তাহার পূর্ব্বপুরুষ, যাচে সে কন্যা-করে!
লুটা'বে হে দূত, এ পাপ দম্ভ পথের ধূলির 'পরে।

[২]

১

কুসুমগড়ের তরুণ নৃপতি শুনিলা দূতের কথা,
বিজয়পুষ্ট দম্ভে তাহার বাজিল বিষম ব্যথা।
যাচিলা কন্যা যে পুরাণ কথা করিবারে নিরবাণ ;
বিজয়দুর্গে হয়েছে তাহার নবীন-জীবন-দান ;
যে ধূলি পতিত ছিল ধরা 'পরে, উঠিল ঝটিকা-বুকে,
বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন কথা ঘুরিবে লোকের মুখে।

২

কুসুমগড়ের নবীন নৃপতি সাজিলা সৈন্যবলে,—
বিজয়দুর্গ প্রাচীন—জীর্ণ, লুটাবে ধরণীতলে।
রাজ্যে তাহার প্রতি গ্রামে গ্রামে বাজি' উঠে ভেরীরব,
কাড়া দিল সাড়া নগরে নগরে,—'কর সাজ সেনা সব!'
গিরিগহ্বরে জাগি' উঠে ধ্বনি, নদীকূলে কোলাহল,
কুঞ্জকাননে অসি ঝন্ ঝন্ ; সাজে সৈনিকদল।

৩

কুসুমগড়ের উদ্ধত ভূপ সাজিয়া চলিল রণে ;
চলে দলে দলে সেনা তা'র সাথে, কোষে অসি ঝন্‌ঝনে ;
চলে ধনুষ্ক—তূণে থর শর, গর্ব্ব নাহিক করে—
শব্দবিহীন দংশনে শুধু শত্রু-জীবন হরে ;

বিজয়বাদ্য উছলে গগনে আকুল মত্ত স্বরে ;
পথে পথে উড়ে ঘনাকারে ধূলি সঘনে অশ্বক্ষুরে।

[৩]

১

ক্রমে লোকমুখে বিপদবার্ত্তা বিজয়দুর্গে আসে ;
শুনি' পুরজন চমকি' উঠিল, শিহরিল সবে ত্রাসে।
আসিল সকলে রাজার সদনে—হৃদয়ে চিন্তাভার ;
শুষ্ক পরিখা, জীর্ণ ফটক, উপায় নাহিক আর।
উপায় কেবল নগর-পূর্ব্বে খরপ্রবাহিনী নদী—
পরিখার মাঝে সলিল তাহার কোনরূপে পশে যদি।

২

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি যদি পুরবাসীদল—
পথ খুঁড়ি' আনে, তবে পরিখায় আসে তটিনীর জল।
নিবিল আশার ক্ষীণ দীপশিখা,—উপায় নাহিক আর—
নিশি না পোহাতে অরাতির করে পড়িবে দুর্গদ্বার।
কহিলা তখন বৃদ্ধ নৃপতি,—"কে আছ এ পুরমাঝে,
অরাতিরে দ্বারে আসিতে না দিবে, তারা না ফুটিলে সাঁঝে ?"

৩

নীরব জনতা-সম্মুখে আসে অমরসিংহ বীর—
পশ্চাতে তা'র বিংশ যুবক,—উন্নত দৃঢ় শির।
"জননী, ভগিনী, পত্নীর তরে মরিতে করি না ভয় ;—
দেবের কৃপায় বিজয়দুর্গ রক্ষিব",—বীর কয়,—
"রাজ-অনুমতি যাচি প্রাণ দিতে।" ধ্বনিল আকাশময়—
"দেব-রক্ষিত বিজয়দুর্গ ; জয়, শঙ্কর জয় !"

[৪]

১

আসন ত্যজিয়া উঠিলা নৃপতি, যত্নে আপন করে
আত্মসবর্ম্ম দিলা পরাইয়া বীরগণ-দেহ'পরে।
অস্ত রবির কিরণে তখন নীরদে স্বর্ণ গলে,—
শিথিলবৃন্ত চম্পকফুল ঝরি' পড়ে তরুতলে,—

রাজপথে উড়ে বায়ু'পরে ধূলি, গাভীরা ফিরেছে ঘরে,—
নীরবে গগনে ফুটিছে তারকা স্নিগ্ধ কোমল করে।

২

আসন ত্যজিয়া উঠিলা নৃপতি, যত্নে আপন করে,
আয়সবর্ম্ম দিলা পরাইয়া বীরগণ, দেহ 'পরে ;
মস্তকে বাঁধি' দিলা উষ্ণীষ ; দিলা অসি খরধার ;
গোধূলি-আলোকে ঝলিল বর্ষা ; তূণে খর-শর-ভার।
মুগ্ধ জনতা উল্লাসভরে উচ্চারি' উঠে—"জয় !"
তারায় তারায় জয়-রব যেন ধ্বনিল আকাশময়।

৩

বাতায়নপথে পুরনারীদল মুগ্ধনয়নে চাহি' ;—
দৃঢ়পদে চলি' গেলা বীরগণ নগরের পথ বাহি' ;
কেহ বা বরষে ফুলসম্ভার, কেহ ডাকে দেবতায়।
দৃঢ়পদে চলে বীর কয় জন। আঁধার ধরণী ছায়।
নগরসীমায় আসে বীরগণ, খুলিল জীর্ণ দ্বার ;
হরষে আশায় গর্জ্জে জনতা, পরিখা হইলা পার।

[৫]

১

ক্রমে বীরগণ আসি উপনীত যেথায় প্রহরী-ঘর,
ব্যবহারহীন রয়েছে এখনো দাঁড়ায়ে পথের 'পর ;
বন্ধ করিলা জীর্ণ কপাট, অর্গল দিলা টানি'।
তখন ধরণী ঘিরেছে নিশার আঁধার আঁচলখানি ;
নৈশ আঁধারে চারি দিকে মাঠে উঠে শিবা-কলরব ;
গম্ভীরে ডাকি' আহার খুঁজিয়া উড়িছে পেচক সব।

২

রজনীর তারা না নিবিতে প্রাতে আসিল অরাতিদল ;
ঢাকিল প্রভাত-বিহগ-কূজন সৈনিক-কোলাহল।
কুসুমগড়ের নৃপতি কহিল,—"দেহ ত্বরা দ্বার খুলি',
নহিলে মরিবে।" অমরসিংহ কহিল কণ্ঠ তুলি'—

"বিজয়দুর্গ-সেনাপতি-সুত! অন্তরে নাহি লাজ,
পিতৃপ্রভুর পুর লুণ্ঠিতে সাজিয়া এসেছ আজ ?"

৩

ক্রোধে জ্বলি' উঠে তরুণ নৃপতি, কহে ডাকি' সেনাদলে,—
"বৃথা বিলম্বে নাহি কায আর প্রবেশ এ গৃহ বলে।"
পড়ে সশব্দে জীর্ণ কপাট শত্রু-চরণ-ভরে;
আসে সেনাদল—ঝটিকাক্ষুব্ধ বারিনিধি বেলা'পরে।
লুণ্ঠিত দ্বারে শত্রুপ্রবাহ রোধে এক জন বীর;
—পর্ব্বত যেন সিন্ধুরে রোধে—যুদ্ধে অটল স্থির।

[৬]

১

দশ সহস্র সেনা সম্মুখে এক জন করে রণ;
সে জন ধরায় না পড়িতে ত্বরা আসে বীর আর জন।
ক্রমে একে একে পড়িল ধরায় দশ জন সহচর,—
অমরসিংহ দেখিলা, সূর্য্য এসেছে মাথার 'পর।
দিনশেষে যবে রক্ত তপন পশ্চিমে পড়ে ঢলি',—
একা রাখে দ্বার সহচরহীন অমরসিংহ বলী।

২

উঠিল গর্জ্জি' অরাতি-বাহিনী,—একা বীর রাখে দ্বার;
আয়সবর্ম্ম করে জর্জ্জর শত অসি খরধার।
পড়িছে অরাতি, সে বিপুল বল নাহি জানে যেন ক্ষয়;
নিস্তেজ হয়ে আসে বীরদেহ, বর্ম্ম শোণিতময়।
শিথিল মুষ্টি ত্যজে তরবার, ভূমিতলে পড়ে বীর;
ধরণীর কোলে লুটায়ে পড়িল উন্নত—দৃঢ় শির।

৩

মরণ-আঁধারে ঢাকিছে দৃষ্টি—উর্দ্ধে চাহিলা বীর—
আঁধার গগনে ফুটিয়া রয়েছে তারকার আঁখি, স্থির।
সহসা কর্ণে প্রবেশিল দূর উল্লাস-কোলাহল—
অজেয় দুর্গ, পুর-পরিখায় এসেছে তটিনীজল!

মরণ-শয়নে ফুটে উঠে হাসি বীরের অধর 'পরে ;—
জীবনের চেয়ে মরণ সুখের জন্মভূমির তরে !

স্নেহের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গিন্নি। শুন্‌লুম আজ জামাই এসেছিল নাকি, বাড়ীর ভিতর দেখা না করে' গেল যে ?

কর্ত্তা। তার নাম আর মুখে এনো না! অকালকুষ্মাণ্ড ছোঁড়াটার অহঙ্কারে মাটীতে আর পা পড়ে না!—আমি এত করে' বল্‌লুম, অবস্থা যখন ভাল নয়, তখন এইখানেই এসে বরাবর থাকুক্—বেটা কোন মতেই রাজী হ'ল না, বল্লে কি না, এক মাসের মধ্যে যদি মেয়েকে না পাঠান হয়, তবে আর একটা বিয়ে করবো।—আমি বলে' দিয়েছি, তার যটা ইচ্ছে বিয়ে করুক গে, আমি মেয়েকে কোন মতেই পাঠাব না। হারামজাদা !

গিন্নি। শ্বশুর জামাইয়ে ঝগড়া, এ দিকে মেয়েটা যে দগ্ধে গেল !

কর্ত্তা। তা' আমি কি করব। বেটার নিজের পেটের ভাত জোটে না—মেয়েকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি ?

গিন্নি। তাদের অবস্থা মন্দ হ'লেও মোটা ভাত কাপড় দিয়ে মেয়েকে পুষতে পারে, এমন সঙ্গতি আছে গো। তার যখন ঘরজামাই থাকৃতে এতই অনিচ্ছে, তখন তুমি না হয় মেয়ের নামে দশ বিশ হাজার টাকা ও একখানা ভাল বাড়ী করে' দাও না,—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমার ত অভাব নেই। মেয়ের মুখের দিকেও ত একবার তাকাতে হয়—স্বামী নিয়ে তাকেও ত ঘর করতে হ'বে।

কর্ত্তা। সবই বুঝি। রাণুর জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ও বেটার জেদ যে বজায় থাক্‌বে, এ আমি কোন মতেই সহ্য করতে পারব না। এ পর্য্যন্ত আমার মতের বিরুদ্ধে কেউ একটি কথাও কইতে সাহস করে নি—ঐটুকু ছোঁড়ার এত বড় সাহস! কখনই মেয়েকে পাঠাব না! তাকে

এখানে আন্‌ব, তবে ছাড়ব! তোমরা মেয়েমানুষ, এ সব বিষয়ে কোন কথা বোলো না।

"শেষকালে পস্তাতে হবে, এই বলে' রাখলুম"—এই বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে বিষণ্ণমনে চলিয়া গেলেন।

তখন বেলা প্রায় দশটা। বৃদ্ধ জমীদার গোপাল রায় উপরে বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজখানির আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করিয়া জমীদারী কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—এমন সময়ে প্রথমে জামাতা এবং তৎপরে গৃহিণী আসিয়া উক্ত ভাবে তাঁহার মনকে উত্ত্যক্ত করিয়া গেল। গোপাল রায় তামাক টানিতে টানিতে পঠিত খবরের কাগজখানা পুনরায় নাসিকাগ্রভাগে তুলিয়া ধরিলেন। যে কেহ তাঁহার তখনকার মুখের ভাব দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে, তাঁহার দৃষ্টি খবরের কাগজের দিকে সরল রেখায় থাকিলেও, তাঁহার মন কিন্তু অন্য দিকে ছিল।

গোপাল রায় শাঁখালির মস্ত জমীদার। তাঁহার জমীদারী যেমন সুবিস্তৃত ছিল, তাঁহার ক্ষমতারও তেমনি সীমা ছিল না। প্রজাবৃন্দ ও গ্রামস্থ অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে ভয় ও মান্য করিয়া চলিত,—ইহার কারণ, বিষয়কর্ম্মে রায় মহাশয় যেমন কড়া ছিলেন—নিক্তির ওজনে কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত পাওনা বুঝিয়া লইতেন, তেমনি আবার লোকের বিপদ আপদে মুক্তহস্তে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। রায় মহাশয়ের একটি প্রধান দোষ ছিল যে, তিনি তাঁহার মতের বিরুদ্ধতা কোনও মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধতা করিলে তাহার ভিটা পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না।

বৃদ্ধের এই স্বেচ্ছাচারী গর্ব্বিত মন জামাতার নিকটে আজ প্রথম বাধা প্রাপ্ত হইয়া রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জিতে লাগিল। দরিদ্রতনয় বিধুভূষণের সঙ্গে যখন প্রাণাধিকা একমাত্র কন্যা রাণীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন বৃদ্ধ মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বিবাহের পরেই জামাতাকে ঘরে আনিয়া রাখিবেন,—স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, গরীবের ছেলের এতটা স্পর্দ্ধা হইবে যে, তাঁহার বাটীতে থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিবে। এই জন্য বিবাহের পূর্ব্বে বৃদ্ধ এ বিষয়ে কোন কথাই উত্থাপন করা একেবারে অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন, মনের গতি সর্ব্বত্র অবাধ নহে—বুঝি বা এত দিনের পর নব্যযুবক জামাতার নিকটে তাঁহাকে অপদস্থ,

সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। অন্য দিকে কিন্তু মন আবার জীবনের একমাত্র বন্ধন স্নেহময়ী বালিকা কন্যার দিকে টানিতে লাগিল। বৃদ্ধ কন্যাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, সচরাচর পিতা কন্যাকে এরূপ ভালবাসেন না। রাণী যে তাঁহার কি ছিল, বলা কঠিন। তাহার কষ্ট হইবে ভাবিয়াই ত দরিদ্র স্বামীর গৃহে তাহাকে পাঠাইতে বৃদ্ধের এত অনিচ্ছা,—কিন্তু এক্ষণে যদিও মনে মনে বুঝিলেন, স্বামী হইতে পৃথক হইয়া থাকা অপেক্ষা দরিদ্র স্বামীর গৃহে বাস করাই কন্যার পক্ষে ভাল, তবুও চিরাভাস্ত জেদ বজায় রাখিতে গিয়া বৃদ্ধ আর সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এক মাস পরে একদিন অপরাহ্ণে ঝি দোকান হইতে ফিরিয়া রাণীর হাতে একখানি চিঠি দিল। রাণী তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল। লেখা ছিল, "রাণী, তুমি যদি আমাকে চাও ত পত্রপাঠ এখানে আসিবে। তোমাদের বাড়ীর চারি পাঁচখানা বাড়ী পরে আমার বন্ধু ঘোষেদের বাড়ীতে আমি আছি। ঝিকে বলিলেই সে বাড়ী চিনাইয়া দিবে। যদি না এস, জানিব, তুমি আমাতে আসক্ত নও। আমি আর তোমাদের বাড়ী যাইতেছি না। ইতি বিধুভূষণ।"

রাণী তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া চিঠির কথা বলিল। মাতা স্নেহবিগলিতস্বরে ছলছলনেত্রে কহিলেন, "আমি কি করব বল্ মা, তোর বাবার মত না হ'লে ত আর কিছু হ'বে না,—তিনি যে জেদ ধরেছেন।—"

"বাবার মত না হ'লে হবে না? আচ্ছা।"—এই বলিয়া রাণী তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল। তাহার শয়নকক্ষে ঢুকিয়া আলমারী হইতে গহনাপত্র বাহির করিয়া একে একে সবগুলি পরিল,—বিবাহে শ্বশুরবাটী হইতে প্রাপ্ত ঢাকাই শাড়ীখানা অঙ্গে জড়াইল, এবং অবশিষ্ট কাপড় জিনিসপত্র ইত্যাদি গুছাইয়া বাক্সে ভরিল। সব ঠিক করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে বাহিরে পিতার সমক্ষে গিয়া টিপ্ করিয়া একটি প্রণাম করিল। বৃদ্ধ তখন আফিঙ্গের ঝোঁকে ঢুলিতেছিলেন। চমক ভাঙ্গিয়া উঠিয়া সুসজ্জিত-বেশে কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া হতবুদ্ধিভাবে কহিলেন, "অ্যাঁ! এ কি!

রাণী কহিল, "শ্বশুরবাড়ী যাব বাবা।"

বৃদ্ধ। শ্বশুরবাড়ী? কি বল্‌চিস্?

রাণী আস্তে আস্তে কহিল, "তিনি আমাদের বাড়ীর কাছে ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। আমাকে যাবার জন্য চিঠি দিয়াছেন। আমাকে লইয়া আমার শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া আসিবেন।—"

বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "দূর হ! দূর হ! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ!—আমার সমস্ত গহনাপত্র রাখিয়া তোর যেখানে ইচ্ছা যা!"—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

রাণী সাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গিয়া গা হইতে সমস্ত গহনাপত্র খুলিয়া আলমারীতে তুলিয়া রাখিল,—হাতে কেবলমাত্র একগাছি কাঁচের চুড়ি রহিল। বাক্স বোঝাই কাপড় জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল, সব রাখিয়া দিল। তাহার পর দীনবেশে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আমি চল্‌লুম।"

মা বলিলেন, "এ কি বেশে শ্বশুরবাড়ী যাচ্চিস্ রাণু, চল্ মা, গহনাপত্র দিয়ে ভাল করে' সাজিয়ে দিই।"

রাণী কহিল, "না মা, তুমি জান না, বেশী সাজগোজ বড়মানুষী দেখে হয় ত তিনি আবার রেগে যাবেন - গরীব বেশেই যাওয়াই ভাল।"—আসল কথা মাকে জানিতে দিল না।

মাতা বুঝিলেন, কন্যা বুঝি অনেক কষ্টে পিতার মত করিতে পারিয়াছে—এই কারণে বিচ্ছেদের অতি তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন, বুক ফাটিয়া যাইলেও আপনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক স্নেহাশীর্ব্বাদে সিঞ্চিত করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই রাণী পাল্কীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল; কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে গিয়া উঠিল। দাসী সঙ্গে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধুভূষণ রাণীকে সঙ্গে লইয়া জয়নগরে দেশের বাটীতে পৌছিলে তাহার মাতাঠাকুরাণী বউকে নিরাভরণা দেখিয়া সপ্তমে গলার আওয়াজ চড়াইয়া কহিলেন, "ও মা কি হ'বে! জমীদারের ঝির এই সাজ! আমরা চোর না

ডাকাত যে, গয়না কেড়ে নেব!—গরীব বলে' এত তাচ্ছীল্য!—ওগো! আমাদেরও এককালে সব ছিল—সব ছিল!"—

বিধুভূষণ মাতাকে থামাইয়া কহিল, "মা, তুমি চুপ্ কর, বউ ইচ্ছে করে' গহনাপত্র সব রেখে এসেছে—আমি যখন দিতে পারব, তখন পরবে। এখন বউকে কিছু খেতে দাও, পথে বড় কষ্ট হয়েচে।"

"বউ না হয় ছেলেমানুষ, বুড়ো মাগী মিন্সেরও কি আক্কেল নাই—মেয়েকে এই রকম করে' শ্বশুরবাড়ী পাঠায়!—লজ্জায় মরে' যাই যে—কি হ'বে গো! একালের ছেলেরা আবার বউয়ের দিকে টানে!"—বলিতে বলিতে মাতাঠাকুরাণী রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

পথশ্রমে বিধুভূষণ রাণী উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—আহারাদির পরই শয়ন করিল। ইহার নিমিত্তও পরদিন প্রাতে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট হইতে রাণীকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বিধুভূষণের সংসারে বৃদ্ধা মাতা ও এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া অন্য কেহ ছিল না। অনেকদিন পূর্ব্বে বিধুভূষণের পিতার কাল হয়। পিতা পৌরোহিত্য কাজ করিয়া সংসার চালাইতেন। অল্প স্বল্প জায়গা জমী ভিন্ন আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই—দুই চারি ঘর প্রজাবিলিও ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিধুভূষণের যজমানগৃহ হইতে পাওনা ছিল—সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয়ের সংস্থান দাঁড়াইয়াছিল। ইহা ছাড়া পুষ্করিণীতে মাছ, ক্ষেতে ধান, ঘরে চারি পাঁচটা গরু ছিল—সংসার একপ্রকারে চলিয়া যাইত।

রাণী শ্বশুরবাড়ী আসিয়া সমস্ত গুছাইতে লাগিল। শাশুড়ীর গঞ্জনায় সে প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট বোধ করিত—কাজ করিতে গিয়া ভয়ে কিরূপ থতমত খাইত। একে সংসারের কাজ করা কখন অভ্যাস নাই, তাহার উপর পদে পদে টিট্‌কারী—সে একটুতেই কাঁদিয়া ফেলিত। কিন্তু ক্রমে সকলই অভ্যস্ত হইয়া আসিল। ঐশ্বর্য্যপালিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা অল্পদিনের মধ্যেই গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম্ম শিখিয়া লইল, এবং স্নেহ সেবা যত্নে সকলকে বশীভূত করিল। অমন যে শাশুড়ী, তাঁহাকেও একদিন বলিতে শুনা গিয়াছিল—"বিধু বেশ বউ এনেছে, বড় ঘরে এমন মেয়ে দেখা যায় না।"

রাণী নূতন সংসারের সহিত বনিবনাও করিয়া লইল, কিন্তু যে সংসারে তাহার জন্ম, সেই সংসারের নিকট যে নিরানন্দময় বিদায় লইয়া আসিয়াছে,

নাই, বাধ্য হইয়া তাহাকে যে পিতার কষ্টের কারণ হইতে হইয়াছে, ইহাই তাহার অন্তরে শেলসম বিঁধিতে লাগিল। রাণী পিতাকে চিঠি লিখিল ;—

"বাবা, আমি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি—ক্ষমা করিও। তুমি ইচ্ছাসুখে আমার হাতে যে ভার তুলিয়া দিয়াছ, সেই ভার বহিতে গিয়া তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, এই জন্য আমি বড় অসুখে আছি—তোমার পায়ে ধরিয়া আবার ক্ষমা চাহিতেছি। তুমি আমাকে বড় ভালবাস জানি,—তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে না জানিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও। মাকে আমার প্রণাম জানাইও—তুমিও গ্রহণ করিও। তোমাদের কুশলসংবাদ চাই। ইতি। তোমার স্নেহের রাণী।"

কন্যাকে নির্দ্দয় ভৎর্সনা করিবার পর হইতে বৃদ্ধ একেবারে নিতান্ত অবসন্ন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিকার-রোগী যেরূপ মস্তিষ্কের তীব্র উত্তেজনায় কিয়ৎক্ষণ ভীষণ অঙ্গ আস্ফালন করিয়া আবার দ্বিগুণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, বৃদ্ধের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। কন্যা চলিয়া যাইবার পর হইতে তাঁহার আহারে স্পৃহা ছিল না, কাজ কর্ম্মে মন ছিল না - কেমন এক রকম হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার উপর গৃহিণী যখন জানিতে পারিলেন, কন্যা কিরূপ ভাবে বিদায় লইয়া গিয়াছে, তখন বৃদ্ধের লাঞ্ছনা গঞ্জনার আর সীমা রহিল না। এইরূপ অবস্থায় রাণীর চিঠি পাইয়া বৃদ্ধ শোকে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। উন্মত্ত যেরূপ আপনার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না। বৃদ্ধ সেইরূপ অশ্রুবিগলিতনয়নে বারবার চিঠিখানি পড়িলেন— ইচ্ছা হইল, চিঠির উত্তর দেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না।

এইরূপে সাত আট মাস কাটিয়া গেল। রাণী অন্তঃস্বত্বা ছিল—অসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ দাঁড়াইতে লাগিল। রাণী নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল—পিতা-মাতার সহিত বুঝি বা দেখা হইল না ভাবিয়া সে আরও কাতর হইয়া পড়িল। রোগশয্যা হইতে পিতাকে একখানি চিঠি দিল ;—

"বাবা, আমার একটি ছেলে হইয়াছে—সে ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করে নাই, তাহাকে দেখিতে একবার তুমি এখানে এসো। আমি বড়ই পীড়িত, এ যাত্রা বুঝি আর বাঁচিব না। আর লিখিবার শক্তি নাই।"

চিঠি পাইয়া বৃদ্ধ একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আজই জামাইবাড়ী যাব; চিঠি দেখ, চিঠি দেখ, আর বুঝি

রাণীর সহিত দেখা হ'ল না!”—স্ত্রী ভূমিতলে আছাড় খাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভৃত্য কর্ম্মচারীরা আদেশ পাইয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল। দুই বড় বড় বাক্সভরা মহামূল্য গহনাপত্র সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ সস্ত্রীক যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার পর সকলে জয়নগরে পৌঁছিলেন। ষ্টেশন হইতে বিধুভূষণের বাড়ী খুব নিকটে ছিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই বৃদ্ধের জামাতার সহিত দেখা হইল—তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধ গদগদস্বরে কহিলেন, “বাবাজী, কিছু মনে করিও না, বুড়ো মানুষের সব সময়ে মাথার ঠিক থাকে না—রাণু কোথায়? রাণু কোথায়? একটু ভাল আছে ত?” জামাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে সঙ্গে লইয়া রাণীর ঘরে গেল। চৌকাট হইতে বৃদ্ধ দেখিলেন, রোগক্লিষ্টা শীর্ণকায়া কন্যা সন্তানকে পার্শ্বে লইয়া শয়ন করিয়া আছে। বৃদ্ধের ক্ষীণ দুটি চক্ষু বাষ্পে ভরিয়া গেল; ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, “মা, চেয়ে দেখ্ আমি এসেছি, মা, আমি এসেছি!”—কন্যা কষ্টে উঠিয়া পিতামাতার পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং পিতার দুই পা সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “বল, আমাকে ক্ষমা করিয়াছ, বল, আমাকে ক্ষমা করিয়াছ!” বৃদ্ধ আস্তে আস্তে পা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন, “মা, আমার কিছু মনে নাই,—সব ভুলে গেছি, সব ভুলে গেছি,—এখন তোকে আরাম হইতে দেখিলেই আমি বাঁচি! —তৎপরে গহনাভরা বাক্স দুইটি আনিয়া কন্যার কাছে রাখিয়া কহিলেন, “মা, তুই রাগ করে' সব ফেলে এসেছিলি; এই নে, তোর জিনিস তোরই রহিল, আরাম হ'য়ে যখন এই গহনাগুলি পরবি, তখন আমার সব দুঃখ যাবে।” বাক্স হইতে একটি ছোট হার বাহির করিয়া নবকুমারের গলায় পরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। সে মুদ্রিতচক্ষে একটুখানি হাসিল। সে হাসিয়া যেন বলিল, “কেমন দাদা, এখন জারিজুরি কোথায় রহিল? তৎপরে বৃদ্ধ জামাতাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, “তোমরা চলিয়া আসিলে আমি দানপত্র দ্বারা আমার বাড়ীখানা রাণীর নামে লিখিয়া দিয়াছি, এবং বিষয়সম্পত্তি সমস্ত তোমাদের উভয়ের নামে উইল করিয়াছি।” এই বলিয়া উইল ও দানপত্র বিধুভূষণকে দেখাইলেন,—“এক্ষণে তোমাদের বাটীতে তোমাদের থাকিতে কোনও লজ্জা নাই। রাণী ভাল হইলে তোমরা আসিয়া থাক, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।”

অপ্রতিভ হইল, এবং একটিও কথা না কহিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

পিতামাতাকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের যত্নে রাণী শীঘ্র সারিয়া উঠিল। বৃদ্ধ যখন সকলকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তখন সেই শূন্য গৃহ আবার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্নেহে পরাজিত হইয়া বৃদ্ধের সুখের আর সীমা রহিল না।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যযাতি ও দেবযানী।

[শ্রীমদ্ভাগবত।]

যযাতি।

আজিকে বিদায় তবে দেহ, দেবযানী,
ত্যাগ করি' আজন্মের রাজ্য রাজধানী
চলিয়াছি বনাশ্রমে।

দেবযানী।

এখনি বিদায়!
কোন অপরাধ দাসী করিয়াছে পায়?
এখনি সহস্র বর্ষ হয়েছে কি শেষ,
ভেঙ্গেছে কি যৌবনের প্রমত্ত আবেশ,
নিত্য নবসুধা মোর কিছু নাই আর,—
প্রিয়তম, ভোগতৃষ্ণা মিটেছে তোমার?

যযাতি।

মিটে নাই। মিটিবার নহে ত বাসনা,
ঘৃতাহুতি যত পায়—অনল-রসনা
তত বেশী জ্বলি' উঠে। এ কি ভ্রান্তি, হায়,
ভোগানলে দহিবারে চাহি বাসনায়!
যৌবনমদিরা পান করি' প্রতিদিন
জানি নাই বর্ষ মাস কেমনে বিলীন
হয়েছে স্বপন সম; ভোগ-অভিলাষ
অনন্ত বাড়িছে নিত্য, নাহিক বিনাশ;
তবুও জাগিছে চিত্তে অতৃপ্ত পিপাসা।
এত দিন পরে বুঝি আজি দীর্ঘ নিশা
হয়েছে প্রভাত, তাই মেলি' দুটি চোখ
দেখিতে পেয়েছি শুভ্র জ্ঞানের আলোক।
অলস মণ্ডূক যথা অবরুদ্ধ কূপে,
মগ্ন হয়ে ছিনু আমি রমণীর রূপে।
আজি আসিয়াছি উঠি' মাগিতে বিদায়,
বদ্ধ হ'য়ে মোহ-জালে সংসার-কারায়
আর থাকিব না বন্দী, হইব স্বাধীন।
বুঝিয়াছি, অয়ি প্রিয়ে, বৃথা এত দিন
অনুসরি' মরীচিকা মিটাতে তিয়াষ
আজি লভিয়াছি মহা সত্যের আভাষ;
ভোগ নহে, সুখ নহে, অটল অক্ষয়
পরিপূর্ণ শান্তি তাই খুঁজিছে হৃদয়।

দেবযানী।

চল তবে, প্রিয়তম, ছাড়ি' লোকালয়
শান্তিপূর্ণ তপোবনে লভিতে আশ্রয়।
যেখানে যাইবে তুমি—ছায়ার মতন
দাসীও যাইবে সাথে।

যযাতি।

আবার বন্ধন !
রমণীর প্রেমে ভুলি' ছিলাম সংসারে,
আজি যাব বনবাসে, সেথাও কি তারে
লয়ে যাব সাথে করি !
অয়ি দেবযানী,
পরিপূর্ণ ছিল মোর এ হৃদয়খানি
তোমার অনিন্দ্য রূপে ; কখনো বাহিরে
অনন্ত বিশ্বের পানে চাহি নাই ফিরে।
আজি সেই মায়ামোহ সোনার শৃঙ্খল
সবলে ছিঁড়িয়া শুধু আত্মার মঙ্গল
খুঁজিতে করেছি পণ। থাক তুমি প্রিয়া,
একা আমি যাব আজি ; কাননে পশিয়া
করিব দুশ্চর তপ।—বিদায় এখন।

দেবযানী।

হায় নাথ, নারী শুধু বিলাসের ধন !
যৌবনের কাম্য বস্তু, ক্ষণিক অসার
খেলনা পুরুষ-হস্তে। নাহি কিছু আর
প্রয়োজন তার, খেলা হ'লে সমাপন,
ছিন্নদল পুষ্প সম হেলায় তখন
দূরে ফেলে দিবে তারে !—বিলাস-রঙ্গিণী
নারী শুধু ! মুমুক্ষুর হইতে সঙ্গিনী
নাহি কোন অধিকার ? ধিক্ নারী-প্রাণ,
নীরবে কেমনে সহে এত অপমান
নিশিদিন !—শুন আজ কহিব সে কথা,
গোপনে হৃদয়তলে ছিল যেই ব্যথা
এত দিন। যবে পুত্রে সঁপি' জরাভার
তরুণ যৌবন মাগি' লইলে তাহার
ভুঞ্জিতে বিষয়-সুখ—রূপ রমণীর,—
আসিলে আমার পাশে, পুলকে অধীর,
বিভ্রস্ত করিলে মোরে সোহাগে আদরে,—
তখন সহসা নারী-জনমের পরে
জাগিল কি ঘৃণা মনে ! জন্মিল ধিক্কার
এ রূপ লাবণ্যে—যাহে ছিল অহঙ্কার—
হেরি' তব প্রত্যাগত নবীন যৌবনে
শুধু বাসনার জ্বালা ! জ্ঞান হ'ল মনে,
মোর প্রতি তোমার সে অজস্র উচ্ছ্বাস
আদরের, প্রাণহীন শূন্য পরিহাস।
নীরবে আপনি সেই বিষ করি' পান,
তবুও তোমায় সুধা করিয়াছি দান।
আজি নাথ শুভদিন ; এস, ব্রত ধরি'
হও তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সহচরী
তপস্বিনী। মহারাজ, চল দুই জনে
ত্যজি' রাজ্যভোগ, যাই বিজন কাননে,
পবিত্র প্রেমের ব্রত করি উদ্‌যাপন।
নিভে না বাসনা-বহ্নি যোগালে ইন্ধন,
তপস্যার শান্তি-বারি করিয়া করিয়া সেচন
নির্ব্বাপিত কর তারে। ক'রো না বর্জ্জন
পুণ্য-পথে এ দাসীরে।

যযাতি।

অয়ি সুচরিতা,
কুসুমকোমলা তুমি, বিলাস-লালিতা ;
কঠোর তপস্যা কভু সাজে কি তোমার ?
প্রিয় গৃহ পরিজন করি' পরিহার
কেমনে কাটাবে কাল আরণ্য আশ্রমে
অনাসক্ত পতি সনে ? অয়ি নিরুপমে,
ভাল করে' ভেবে দেখ !

দেবযানী।

ভুলো না, রাজন্,
ঋষিকন্যা আমি, ভালবাসি তপোবন।
শিখিয়াছি নারীধর্ম্ম। সে নির্জ্জন বনে
প্রতিদিন ফুল তুলি' আনিব যতনে
পূজিতে দেবাদিদেবে। প্রভাতে প্রদোষে
গাহিব বন্দনাগীতি পরম সন্তোষে

কলকণ্ঠ-কণ্ঠ সনে মিলাইয়া স্বর।
হৃদয়ে বহিবে সদা তৃপ্তির নির্ঝর।
বিষয়-বাসনা-তৃষা, দুঃখ, অবসাদ
স্পর্শিবে না কভু প্রাণ! দেব-আশীর্ব্বাদ
যোড়করে যাচি ল'ব দু জ'নার শিরে
ভক্তিভরে।

যযাতি।
ধন্য আমি, সহধর্ম্মিণীরে
চিনিতে পারিনু আজি।
তাই হোক্, প্রিয়া,
ভঙ্গুর বিষয়ভোগস্পৃহা বিসর্জ্জিয়া
চল তবে যাই মোরা শান্ত তপোবনে;
আত্মার অক্ষয় ধন শান্তি অন্বেষণে।

ভক্তি না ধর্ম্ম?

১

শ্যামাচরণ বেদান্তবাগীশ প্রাত্যহিক দেবপূজা সমাপ্ত করিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন। ভৃত্য প্রভুর জন্য তামাক সাজিয়া আনিল। স্নান ও পূজা আহ্নিক সমাপ্ত না করিয়া বেদান্তবাগীশ কখনও তাম্রকূট-ধূম পর্য্যন্ত সেবন করিতেন না।

তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। অদূরে গ্রামের হরকরার মূর্ত্তি দেখা দিল। সে নিকটে আসিলে বেদান্তবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরাণ, আমাদের চিঠিপত্র কিছু আছে নাকি?"

দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে গ্রামের সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। পরাণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিল।

পুত্র জ্ঞানচন্দ্র দুই বৎসর প্রবাসবাসী। সপ্তাহ অন্তর এক একখানি পত্র পাইলেও স্নেহশীল পিতার হৃদয় পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইত। বাইশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার পর জ্ঞানচন্দ্র লাহোর কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করে। অবকাশের অভাব ও তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি নূতন পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকায় দুই বৎসরের মধ্যে সে জনকজননীর চরণদর্শন করিতে পারে নাই। গর্ব্ব ও আশার অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, বংশের কুলপ্রদীপ পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া পিতা অধিকাংশ রজনী অনিদ্রায় অতিবাহন করিতেন; কিন্তু সে কথা তাঁহার গৃহিণী পর্য্যন্ত জানিতেন না।

গ্রামের কেহ কোনও বিষয়ে কখনও বেদান্তবাগীশকে বিচলিত হইতে দেখে নাই।

ব্রাহ্মণ পত্রখানি খুলিলেন। লেখা দেখিয়া বুঝিলেন, বনগ্রাম হইতে শ্যালক রামতারণ স্মৃতিভূষণ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মথুরা ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তথা হইতে ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য লাহোর পর্য্যন্ত ছুটিয়াছিলেন। তার পর,—

ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া রৌদ্রের কাছে পত্রখানি ধরিয়া আবার পাঠ করিলেন। না না! তাঁহার দৃষ্টির বিন্দুমাত্র ভ্রম নহে। পরিস্ফুট ভাবে প্রাণান্তকর ভীষণ সংবাদ পত্রে লিখিত রহিয়াছে।

বেদান্তবাগীশের সর্ব্বদেহ টলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। দেওয়াল ধরিয়া ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে প্রথম তীর আঘাতের বেগ সংবরণ করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে চৌকীর উপর বসিয়া পড়িলেন।

পতন! সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপ্রাণ. আদর্শ-চরিত্র পুত্র, যাহাকে তিনি হিমালয়ের ন্যায় অটল, ভাগীরথীর ন্যায় পুণ্যশীল, সূর্য্যের ন্যায় শুভ্র তীব্র দীপ্তিশালী ভাবিয়া এত দিন অপূর্ব্ব আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছিলেন, আজ সেই পুত্রের এমন শোচনীয় অধঃপতন! বাইশ বৎসরের ধর্ম্মশিক্ষা ধূলির তলে মিশাইয়া গেল! জ্ঞানের সুদৃঢ় বন্ধন একটা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না? দুই বৎসরের অদর্শনে এত কালের দীক্ষা ব্যর্থ হইয়া গেল? বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় একাগ্রধ্যানে তিনি ধীরে ধীরে যে ছবিটিকে শুভ্র যশের উজ্জ্বল প্রভায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাহা পথের ধূলির অপেক্ষাও কলঙ্কমলিন!

শ্যালক লিখিয়াছিলেন, হতভাগ্যের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে এখন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। দেশে আর সে কখনও যে ফিরিয়া যাইবে, সে সম্ভাবনা নাই। নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্য হইতে পাত্রী মনোনীত করিয়া বিবাহাদি করিবে। এই ব্যাপার লইয়া লাহোরপ্রবাসী বাঙ্গালী মহলে বেশ আন্দোলন হইতেছে। কোন পরিচিত বাঙ্গালীর নিকট এই সংবাদ পাইয়া স্মৃতিভূষণ ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই দারুণ মর্ম্মপীড়া লইয়া সেই রজনীতেই লাহোর ত্যাগ করেন।

অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় ব্রাহ্মণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। জীবনে তিনি

প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে যে দিবস পুত্র আশৈশবের অভ্যাস-অনুসারে চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পমাল্যে জনক-জননীর চরণবন্দনা করিয়াছিল, সেই সুপবিত্র দিনের স্মৃতি আজ বেদান্তবাগীশের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। জ্ঞানচন্দ্র যে এক দিনও পিতা মাতার পাদ্য-অর্ঘ্য পান না করিয়া আহার্য্য স্পর্শ করিত না! প্রতি দিন প্রত্যূষে উঠিয়া গায়ত্রী-জপ ও বেদপাঠ না করিয়া কোনও কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত না। পাশ্চাত্যশিক্ষা তাহার হৃদয়কে স্বধর্ম্মে আরও অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আশৈশব পুত্রকে স্বয়ং ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক দিবসের কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু কই, তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার চিহ্ন কোনও দিন ত তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই! তবে আজ অকস্মাৎ হিমাচলের উন্নত চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন?

ভৃত্য আসিয়া দুইবার সংবাদ দিল, আহার্য্য প্রস্তুত; মাঠাকুরাণী তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তখনও নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া রহিলেন।

সূর্য্য ক্রমে মধ্যাহ্ন গগন অতিক্রম করিল। ব্রাহ্মণের অকারণ বিলম্বে বাড়ীর লোক চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৃহিণী প্রমাদ গণিয়া স্বয়ং বহির্বাটীতে আসিলেন।

বেদান্তবাগীশ তখন একখানি পত্র লেখা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

স্বামীর আরক্ত নয়ন, মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া, অনিশ্চিত আশঙ্কায় পত্নীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভীতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ভাত খাবে না? আজ তোমার কি হয়েছে?"

ব্রাহ্মণ সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

গৃহতলে স্মৃতিভূষণের পত্রখানি পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণী সেখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কে লিখিয়াছে?"

"পড়িয়া দেখ।"

পত্রপাঠান্তে বেদনাবিদীর্ণহৃদয়ে শ্যামাচরণের পত্নী ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। বর্ষাপ্লাবিতা নদীর স্রোতের ন্যায় তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

"তখন তোমায় বলিয়াছিলাম, বিদেশে আমার জ্ঞানকে—"

ও নাম আমার বাড়ীতে কেহ উচ্চারণ করিতে পারিবে না।"

স্বামীর কঠোর বচনে পত্নীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বেদান্তবাগীশের প্রকৃতি তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন। অশ্রুসিক্তনয়নে, সকাতরে তিনি স্বামীর পানে চাহিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য ব্রাহ্মণের ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। হস্তস্থিত পত্রখানি তুলিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, "কি লিখিয়াছি, শুনিয়া রাখ।"

পত্রে লেখা ছিল, "শুনিলাম, তুমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছ। উত্তম। যদি তুমি মূর্খ অশিক্ষিত হইতে, আমি সস্নেহে তোমাকে তিরস্কার করিতাম, অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইতাম। কিন্তু তুমি মূর্খ নহ। আমার উপার্জ্জিত সমস্ত বিদ্যা তোমাকে দান করিয়াছি, সহস্র যুগের সঞ্চিত অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বহুল রত্ন তুমি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ও তোমাকে জ্ঞান দান করিতে কৃপণতা করে নাই। সুতরাং তুমি তিরস্কারের অযোগ্য, এক বিন্দু ক্ষমাও তোমার প্রাপ্য নহে। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে যাহার হৃদয় প্রদীপ্ত, সত্যানুসন্ধানের জন্য তাহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ, আমার মতে গুরুতর পাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কোনও ক্রমে সে ক্ষমা পাইবার অধিকারী নহে। পুত্র হইলেও সে ত্যজ্য। এত দিন যাহাদের সহিত তোমার রক্ত মাংসের সম্বন্ধ ছিল, আজ হইতে তাহাদের সহিত তোমার কোনও সংস্রব রহিল না। শিক্ষা ও জ্ঞানের এক কণিকাও যদি এখনও তোমাতে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আত্মীয়সমাজে তোমার কলঙ্কিত মুখ দেখাইবার চেষ্টা করিও না। আজ হইতে আমাদের কাছে তুমি মৃত, তোমার সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। মর্ম্মাহত পিতার অভিশাপে যদি এতটুকু ভয় থাকে, তবে ভবিষ্যতে আত্মীয়বর্গের সহিত বাক্যে বা ব্যবহারে সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রয়াস পাইও না।"

স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া পত্নী উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, এত নির্দ্দয় হইও না।"

বাহুপাশ হইতে চরণ মুক্ত করিয়া অকম্পিতপদে ব্রাহ্মণ আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

২

দুই সপ্তাহ স্বামীর কোনও সংবাদ না পাইয়া বসন্তকুমারী পত্র লিখিতে

নির্ম্মাণ করিতেছিল।

মাতার বাক্সটি খোলা দেখিয়া শিশু তাসের ঘর রাখিয়া দিল। নূতন কিছু খেলার জিনিস পাইবার আশায়, সে বাক্সের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, উলটিয়া পালটিয়া দেখিতে লাগিল। সহসা একখানি বাঁধান ফটো কাগজের অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। ফেলু ছবিখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "মা, মা, দেখ্ কেমন ছবি!"

বসন্তকুমারীর চিঠি লেখা শেষ হইয়াছিল। সে ফিরিয়া চাহিয়া পুত্রের কীর্ত্তি দেখিল। তখন তাড়াতাড়ি সে ফটোখানি কাড়িয়া লইতে গেল। শিশু প্রাণপণ যত্নে ছায়াচিত্রখানি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "না, আমি দেব না।"

মাতা বলিল, "ছিঃ বাবা, ছিঁড়ে যাবে। তোমার মামাবাবুর ছবি। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, দাও আমি রাখিয়া দি ; তুমি বড় হ'লে নিও।"

"মামাবাবু? মামাবাবু কে মা? কই আমি ত তাকে দেখি নি, সে কোথায়?"

বসন্তকুমারীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আজ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর দাদার স্নেহময় মূর্ত্তি সে দেখে নাই। কোথায় তিনি, কি অবস্থায় আছেন, তাহা সে জানে না। জানিবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত। জাতিচ্যুত ভ্রাতার অনুসন্ধান কে করিবে? সমস্ত সংসার যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে! প্রবাস-গমনের পূর্ব্বে দাদা সকলের ছবি তুলাইয়া ছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁহারও ছবি তোলা হইয়াছিল। সেই দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের ফটোখানি দাদার এক-মাত্র স্মৃতি। বসন্ত সেখানি অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছিল। পিত্রালয়ে বা স্বামীগৃহে সে ছবি প্রকাশ্যভাবে বাহির করিতে তাহার সাহস হইত না। যখন তাহার হৃদয় চঞ্চল হইত, সেই সময়ে গোপনে ছায়া-চিত্রখানি বাহির করিয়া দেখিয়া লইত।

মাতাকে নীরব দেখিয়া শিশু আবার বলিল, "বল্ না মা, মামাবাবু কোথায়? সে কখনও এখানে আসে না কেন? দেখা পেলে আমি তাকে মারবো।"

ফেলু অভিমানভরে তাহার ক্ষুদ্র মুষ্টি শূন্য পানে উদ্যত করিল।

বসন্ত নয়নে অঞ্চল চাপিয়া অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিতে চাহিল।

এমন সময় কক্ষের বাহিরে খড়মের শব্দ হইল। বেদান্তবাগীশ কন্যার

কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মুখ গম্ভীর। সেই গম্ভীর আননে বেদনার অস্ফুট রেখা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

শিশু দাদামহাশয়ের কাছে ছুটিয়া গেল। ফটোখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দাদামহাশয়, মা আমাকে মামাবাবুর ছবি দিয়েছে। দাদা, মামাবাবু কোথায় ? আমি তার কাছে যাব।"

কিন্তু অন্য দিনের মত দাদামহাশয়ের মুখে প্রসন্ন হাসিটি না দেখিয়া শিশু বিস্মিতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইল। দাদামহাশয় আজ তাহাকে কোলে লইল না কেন ? অভিমানে ফেলুর হৃদয় পূর্ণ হইল। ম্লানমুখে, ছল-ছল-নেত্রে সে জননীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

পিতা ডাকিলেন,—"বসন্ত !"

সে আহ্বানে সহস্র তিরস্কারের তীব্র গর্জ্জন যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অপরাধিনীর ন্যায় নতমুখে বসন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

ফেলু বিস্ময়দীপ্ত নয়নযুগল তুলিয়া একবার জননী, আর বার মাতামহের পানে চাহিতে লাগিল। তাহার কুন্দশুভ্র অকলুষ হৃদয়ে কুটীল সংসারের তীব্র তাপ ত স্পর্শ করে নাই !

গম্ভীরকণ্ঠে বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "পিতা হইয়াও যে পুত্রের আদর্শ-চরিত্রকে এক দিন মনে শ্রদ্ধা করিতাম, এখন তাহার অপবিত্র স্মৃতি হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছি। এই সরল সুন্দর শিশুর পবিত্র হৃদয়ে তাহার কলঙ্কিত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া তুমি মহাপাতক করিয়াছ। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহার কলুষিত ছবিখানি এই মুহূর্ত্তে অগ্নিতে সমর্পণ কর।"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বসন্ত বলিল, "বাবা, বাবা, অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

ব্রাহ্মণ তখন কক্ষ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

সেই রজনীতে ব্রাহ্মণ গৃহিণীকে বলিলেন, "অনেক দিন হইতে তুমি তীর্থ-ভ্রমণের কথা বলিয়া আসিতেছ। আমি সমস্ত ঠিক করিয়াছি, আগামী বুধবার পঞ্চমী তিথিতে যাত্রা করিব।"

৩

বেদান্তবাগীশ বারাণসীধামে আসিয়া যেখানে বাসা করিলেন, তাহার সংলগ্ন একটি প্রশস্ত ও প্রকাণ্ড অট্টালিকায় একটি দানছত্র। তথায় প্রত্যহ সহস্র

তীর্থে আসিয়া গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শন ব্যতীত ব্রাহ্মণের অন্য বিশেষ কোন কার্য্য ছিল না। তিনি অবশিষ্ট সময় দানছত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক দরিদ্রদিগের ভোজন কার্য্য পরিতৃপ্তনয়নে দর্শন করিতেন। ব্রাহ্মণ নিজ গ্রামে পূজার সময় স্বয়ং শত শত দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিয়া থাকেন। বার্ষিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আয়ের ব্রহ্মোত্তর জমীর অধিকাংশই তিনি দীন দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিতেন। সুতরাং পবিত্র তীর্থস্থানে এরূপ সুন্দর কল্যাণকর অনুষ্ঠান দর্শনে বেদান্তবাগীশ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

ছত্রের তত্ত্বাবধানের ভার জনৈক পরিণতবয়স্ক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। কর্ম্মচারী এই তেজঃপুঞ্জকলেবর পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে উভয়ের সৌহৃদ্য জন্মিল।

বেদান্তবাগীশ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এই অন্নছত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী ব্রাহ্মণ-কন্যা চিরকুমারী। স্বর্গীয় পিতার তুই লক্ষ টাকা আয়ের জমীদারীর সমস্ত অর্থই তিনি অন্নছত্রের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন।

সেদিন আকাশে ঘোরঘটায় মেঘ করিয়াছিল। পূর্ব্বরজনীতে প্রবল বারিপাত হইয়া গিয়াছে। বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। অন্নছত্রের পাচকেরা তখনও রন্ধনশালায় দেখা দিল না দেখিয়া কর্ম্মচারী প্রমাদ গণিলেন। বাতাস ক্রমে প্রবলতর হইল। বর্ষণ তখনও থামিল না।

বেদান্তবাগীশ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ও পূজা আহ্নিক সারিয়া অন্নছত্রে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আজিকার মেঘমেদুর আকাশ দেখিয়া তিনি আর বিশ্বেশ্বর-দর্শনে গমন করেন নাই।

উদরের জ্বালা যাহাদের প্রবল, ঝড় বৃষ্টির বাধা তাহাদের নিকট তুচ্ছ। একে একে ভিক্ষুকগণ প্রাঙ্গণতলে সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মচারী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় আর্দ্রদেহ, সিক্তবসন ভিক্ষুকমণ্ডলী হইতে একটি আনন্দ-কোলাহল উঠিল, "মায়ীজী কি জয়!"

বেদান্তবাগীশ সবিস্ময়ে দেখিলেন, অন্নপূর্ণার ন্যায় মহিমশ্রীমণ্ডিতা গৈরিক-বসনধারিণী এক নারীমূর্ত্তি প্রাঙ্গণসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর সংযমে রমণীর যৌবন-শ্রী এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ও মহিমায় উদ্দীপ্ত, কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল, দীপ্তিময় নয়নযুগলে, শান্ত সুন্দর করুণ মুখমণ্ডলে বিষাদরেখা অঙ্কিত। উজ্জ্বল প্রভাপ্রদীপ্ত রত্নের

অঙ্গে কেহ যেন একটি কাল রেখা টানিয়া দিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এই সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ইনিই অন্নছত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী, জমীদার-নন্দিনী। সন্ন্যাসিনী মন্থরগতিতে কর্ম্মচারীর সম্মুখীন হইয়া স্নিগ্ধ করুণ-কণ্ঠে বলিলেন, "আজ আমার অতিথি-সেবা কি ব্যর্থ হইবে ? এতদিনের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কি আজ এমনই ভাবে অসম্পূর্ণ থাকিবে ? দেখিতেছেন না, এত বেলা হইল, এতগুলি ক্ষুধিত প্রাণী ব্যাকুলভাবে অন্নের প্রতীক্ষা করিতেছে ?"

কর্ম্মচারী চঞ্চল হইলেন। নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কি করিব মা লক্ষ্মী, যে দুর্য্যোগ, একটি ব্রাহ্মণও আসিল না।"

"তবে কি আজ এতগুলি প্রাণী উপবাসী থাকিবে ?"

বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "মা, যদি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আজিকার রন্ধনশালার ভার আমার উপর দাও। বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও পাঁচ শত লোকের অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে বোধ হয় কাতর হইব না। এ শুভ কার্য্য হইতে আমায় বঞ্চিত করিও না মা।"

সন্ন্যাসিনীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সজলনেত্রে, উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আপনি কে জানি না, কিন্তু সত্যই আজ আপনি আমার পিতার কাজ করিলেন। আজ মহাপাতক হইতে আপনিই আমায় উদ্ধার করিলেন।"

বেদান্তবাগীশ নামাবলী কটিদেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রন্ধনশালার অভিমুখে গমন করিলেন।

৪

বাক্যে বা ব্যবহারে বেদান্তবাগীশের নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার কথা কখনও ব্যক্ত হইত না। কিন্তু যাহারা নীরবে সহ্য করে, তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়। পুত্রের প্রতারণায় ও নির্দ্দয় ব্যবহারে বেদান্তবাগীশের অন্তরতম প্রদেশে যে শেলাঘাত হইয়াছিল, দ্বাদশ বৎসরে তাহার ক্ষত বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও পরিপুষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছিল। যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার আশায় তিনি তীর্থবাসী হইয়াছিলেন। অন্নছত্রের কর্ম্মকোলাহলে ও দেবতা-অর্চ্চনায় দিবাভাগে তিনি আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়া, স্মৃতির অঙ্কুশ-তাড়না হইতে বিমুক্ত হইতেন বটে, কিন্তু রজনীর নিস্তব্ধতায় অধিকাংশভাগ অনিদ্রায় কাটিত।

এক মাস পরে একদিন সন্ধ্যার পর শ্যামাচরণ বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়াছিল। নির্জ্জনে একটু কাঁদিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

জনতা, কোলাহল আজ তাঁহার কাছে তিক্ত বোধ হইল। হৃদয়ের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বেদান্তবাগীশ বিস্মিত হইলেন। এত কোমলতা, এত দুর্ব্বলতা হৃদয়ে কোথা হইতে আসিল!

কোনও প্রবাসী বাঙ্গালী পথিক ঝিঁঝিঁটস্বরে গাহিয়া উঠিল,

"বড় আশা ক'রে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরাও না জননী!"

ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে চলিলেন। পথিকের সকরুণ সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার বিচলিত হৃদয় স্পর্শ করিল।

একেবারে বাড়ীর দ্বারে আসিয়া বেদান্তবাগীশ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠ হইতে দৌহিত্র ফেলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ব্রাহ্মণ গঙ্গার তীরাভিমুখে চলিলেন। কিছুক্ষণ নির্জ্জনে না বসিলে তাঁহার চঞ্চল-হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে না।

অন্নছত্রের সংলগ্ন ঘাটটি রাত্রিকালে জনশূন্য থাকে, বেদান্তবাগীশ ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ণশশাঙ্কের আলোক দীপ্তিতে নীল-অম্বরতল উদ্ভাসিত। ব্রাহ্মণ সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিলেন। জনশূন্য ঘাটে, সোপানগাত্রে তরঙ্গ প্রহত হইতেছিল।

বামপার্শ্বে একটি শিবমন্দির। মন্দিরের সম্মুখে একটি মর্ম্মর স্তম্ভ। সেখানে বসিলে সহসা কেহ দেখিতে পায় না। বেদান্তবাগীশ সেই দিকে চলিলেন। স্তম্ভের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি নারী-মূর্ত্তি তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণীর সম্মুখে স্তূপীকৃত গন্ধপুষ্প। ব্রাহ্মণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন রমণী দানছত্রের প্রতিষ্ঠাত্রী। মৃদুপবনে তাঁহার গৈরিক বসন রুক্ষ কেশভার অনাবৃত করিয়া ভূমিতলে লুটাইতেছিল।

রমণী যুক্তকরে উন্নত আনন আলোকপ্লাবিত গগনের পানে স্থাপিত করিলেন। বায়ুস্তর ও চন্দ্রকিরণদীপ্ত অম্বরতল বিদীর্ণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর ব্যাকুল হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা যেন অলক্ষ্য দেবতার চরণতলে ছুটিয়া চলিল।

বেদান্তবাগীশ বিস্মিত, মুগ্ধ ও পুলকিত হইলেন। এমন সুন্দর, পবিত্র, মোহন দৃশ্য ব্রাহ্মণ বহুদিন দেখেন নাই। সাধিকার নীরব অর্চ্চনা, একাগ্র আরাধনা তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ আলোড়িত করিল। বহু -- বহু পূর্ব্বে কেবল এক জন এমনি ভাবে নির্জ্জন প্রান্তরে, জনশূন্য জলাশয় তটে দাঁড়াইয়া এমনই ভক্তিভরে অনন্তের আরাধনা করিত। শত শত বার তিনি গোপনে সে দৃশ্য দেখিয়াছেন। কিন্তু সে ত অতীত যুগের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস। মিথ্যার কলঙ্ককালিমা সে অতীত কাহিনীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

শূন্য সাজি হস্তে তুলিয়া লইয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা সোপানোপরি শুভ্রবসন পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কে ওখানে ?"

"মা, ভয় নাই আমি।"

সন্ন্যাসিনী সে সস্নেহ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্তা হইয়া নিকটে সরিয়া আসিলেন। বেদান্তবাগীশকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "এমন সময়ে আপনি এখানে কেন ?"

"ক্ষমা কর মা, তোমার নির্জ্জন আরাধনায় বাধা দিয়া আমি অপরাধ করিয়াছি।"

"সে কি, আপনি পিতৃতুল্য, ওরূপ কথা বলিবেন না।"

বেদান্তবাগীশ উচ্ছ্বাসভরে বলিলেন, "মা, তোমার আরাধনা দেখিয়া আজ এক জনের কথা মনে পড়িয়াছিল। সে তোমারই মত এমনই ভক্তিভরে ভগবানের আরাধনা করিত ; কিন্তু—" বেদান্তবাগীশের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হইল। বহু প্রয়াসেও তিনি অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিতে পারিলেন না।

বেদনা-ব্যথিত স্বরে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তিনি কি বাঁচিয়া নাই ?"

"জানি না মা, জানিতে ইচ্ছাও নাই। মৃত্যুই তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। সে আমায় বড় দাগা দিয়াছে ; হায়, জ্ঞানের সুদৃঢ় রজ্জুও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সে এখন ভণ্ড, প্রতারক, বিধর্ম্মী।"

সন্ন্যাসিনী ভাগীরথীর পরপারস্থ সুদূরবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে যাহার হৃদয় সমুজ্জ্বল, তুচ্ছ অনুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে কি ? প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন ; কিন্তু ইহাতে আমার বিশ্বাসস্থাপন করিতে আস্থা হয় না।"

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বাতাস পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া আবার ছুটিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ মর্ম্মরস্তম্ভের

৫

বসন্ত বলিল, "বাবা, ফেলুর আজ তিন চার দিন হইতে অল্প অল্প জ্বর হইতেছে। ছেলেটা কিছু খাইতে চায় না।"

বেদান্তবাগীশ কয় দিবস সংসারের কোন তত্ত্ব লয়েন নাই। তাঁহার হৃদয়ে একটা বিপ্লব বাধিয়াছিল। কিন্তু দৌহিত্রের পীড়ার সংবাদে ব্রাহ্মণের বিক্ষিপ্ত মনটা সংসারের দিকে আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি ভাবিলেন, পরের ছেলেকে সঙ্গে আনিয়াছেন, সুতরাং তাহার শুভাশুভের জন্য তিনিই দায়ী। এত দিন তাচ্ছীল্য করিয়া কাজটা ভাল করেন নাই।

বাড়ীওয়ালার নিকট তিনি সংবাদ পাইলেন,—শিক্‌রোলে এক জন ভাল বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন। এরূপ বিজ্ঞ চিকিৎসক বারাণসীধামের মধ্যে আর নাই। গরীব দুঃখীকে তিনি বিনা অর্থে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। শ্যামাচরণ তাঁহাকেই ডাকা স্থির করিলেন। প্রথম হইতেই ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করানই সঙ্গত। উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং বহির্গত হইলেন।

তখন সন্ধ্যার শান্তিছায়া চারি দিকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। দেবালয়-সমূহে আরতির শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছিল।

স্বল্পায়াসেই ডাক্তার মুখার্জ্জির নাতিবৃহৎ আলোকিত একতল অট্টালিকা বেদান্তবাগীশের চক্ষে পতিত হইল। বেলা, জবা, গোলাপ ও যূথিকা কুঞ্জবহুল পুষ্পোদ্যানের মধ্য বিসর্পিত, কঙ্করাকীর্ণ সুদৃশ্য পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ ডাক্তার বাবুর বসিবার কক্ষে পৌঁছিলেন। কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল। এক জন ভৃত্য সম্মুখে বসিয়া ছিল। ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় শুনিয়া সে তাঁহাকে কক্ষমধ্যে বসিতে অনুরোধ করিল। ডাক্তার বাবু তখনও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, শীঘ্রই আসিবার সম্ভাবনা। ভৃত্য তামাক সাজিতে গেল। শ্যামাচরণ ডাক্তারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধূমপান করিতে করিতে বেদান্তবাগীশ কক্ষটির চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, দেওয়ালে নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর সুদৃশ্য চিত্র। গৃহের সর্ব্বত্রই গৃহস্বামীর সুরুচি ও সৌন্দর্য্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ ডাক্তারের সুরুচির নিদর্শন দেখিয়া অন্তরে তৃপ্তি লাভ করিলেন।

বাড়ীতে এক জন পাচক ও একটি ভৃত্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। ডাক্তার বাবু তথায় একাকীই থাকিতেন।

পার্শ্বস্থ একটি কক্ষ হইতে ঘন-সুগন্ধ বহির্গত হইতেছিল। সে সুগন্ধে ব্রাহ্মণের হৃদয় যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পার্শ্বস্থ আলোকিত কক্ষের দরজাটা খোলা ছিল। কোথা হইতে এমন সুগন্ধ আসিতেছে, দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণ দরজার কাছে সরিয়া গেলেন। দেখিলেন কক্ষটি জনশূন্য! একটি উজ্জ্বল আলোক দেওয়ালে জ্বলিতেছে। গৃহের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মরবেদী। বেদীর সম্মুখে একটি প্রশস্ত অনুন্নত স্তম্ভ। স্তম্ভের পাদদেশে প্রত্যগ্র পুষ্পভার। যেন কোনও ভক্ত বাঞ্ছিত ইষ্টদেবতার চরণতলে এইমাত্র পুষ্প অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গিয়াছে। বেদান্ত-বাগীশ চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, স্তম্ভগাত্রে দুইখানি সুবৃহৎ তৈল-চিত্র; নিম্নে, বেদীর পার্শ্বে অনুরূপ আর একখানি চিত্রপট।

সহসা কৌতূহলের আতিশয্যে ব্রাহ্মণের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আলেখ্যগুলি যেন নীরবে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। অলক্ষ্য আকর্ষণে অভিভূত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, নবযৌবনশ্রীমণ্ডিতা, বিচিত্রবেশধারিণী এ কিশোরীমূর্ত্তি কাহার? নয়নে কি অপূর্ব্ব দীপ্তি, অধরে কি মধুর হাস্য! এ স্নিগ্ধ হাস্যরেখা তিনি কাহার আননে উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন? সন্ন্যাসিনীর সহিত এই আনন্দ-লতিকার সাদৃশ্য কি বিস্ময়কর নহে?

বিস্মিত ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধে চাহিলেন। তৈল-চিত্রদ্বয়ের একটি নারী, অপরটি পুরুষমূর্ত্তি। এ সকল ছবি কে এখানে আনিল?

সহসা বাহিরে মনুষ্যকণ্ঠস্বর শোনা গেল। ব্রাহ্মণ দ্রুতবেগে বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এক ব্যক্তি সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "আপনি ডাক্তার বাবু?"

"আজ্ঞা না, তিনি বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছেন, এখনই ফিরিয়া আসিবেন। আমি কম্পাউণ্ডার। আপনার কোথায় থাকা হয়?"

লোকটি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী, কিন্তু তাহার বেশের সহিত বাক্যের যথেষ্ট প্রভেদ দেখিয়া শ্যামাচরণ কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন! কম্পাউণ্ডার বিশুদ্ধ ভাষায় বেদান্তবাগীশের সহিত আলাপ করিতেছিল।

কম্পাউণ্ডার বলিল, "আপনি বিদেশী, তাই অসময়ে আসিয়াছেন। এখানকার সকলেই জানেন, সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে না আসিলে ডাক্তার বাবুর দেখা পাওয়া যায় না। বিশ্বেশ্বরের চরণামৃতপান ও আরতিদর্শন

বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "আপনি ইঁহার কাছে কত দিন আছেন?"

কম্পাউণ্ডার হাসিয়া বলিল, "ডাক্তারী পাশ করিবার অনেক পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর সহিত আমার পরিচয়। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করেন। সেই অবধি আমি ডাক্তার বাবুর গোলাম।

ভৃত্য পুনরায় তামাক সাজিয়া আনিল। বেদান্তবাগীশ ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "ডাক্তার বাবুর সন্তানাদি কি?"

"সন্তান? এখনও তাঁহার বিবাহই হয় নাই!"

"বলেন কি মহাশয়, এত বয়সেও তিনি অবিবাহিত রহিয়াছেন?"

কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া কম্পাউণ্ডার বলিল, "একবার তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল; সে অনেক দিনের কথা, তখন তিনি ডাক্তারী পড়েন। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর পার্শ্বে লাহোরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকিতেন। তিনি বিলাতফেরত বাঙ্গালী। উভয়ে বহুকাল একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন, এ জন্য পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

এক দিন শোনা গেল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কনিষ্ঠা ভগিনীর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া পিতা মাতা কন্যা সহ লাহোরে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে আসিতেছেন। আমি তখন সর্ব্বদা ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে থাকিতাম।

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভগিনীর পনের বৎসর বয়স হইলেও, তখনও বিবাহ হয় নাই। ডাক্তার বাবু সর্ব্বদাই বন্ধুর বাড়ী যাইতেন। বিদ্যায়, রূপে, গুণেও কুলে শীলে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পিতা মাতা ডাক্তার বাবুর সহিত কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন।

"এক বৎসর পরে কন্যার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। এমন সময় এক দিন শুনিতে পাইলাম, ডাক্তার বাবু বন্ধুকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন। আকার ইঙ্গিত দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম, ডাক্তার বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভগিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন; কন্যাও ডাক্তার বাবুর অনুরাগিণী। অথচ অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না।

বেদান্তবাগীশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "পাশের ঘরে কয়েক খানি ছবি দেখিলাম। ছবিগুলি ডাক্তার বাবু কোথায় পাইলেন?"

"দুখানি ছবি ডাক্তার বাবুর পিতা মাতার! প্রত্যহ দুই বেলা তৈলচিত্রের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া ডাক্তার বাবু বিশ্বেশ্বরের চরণামৃতও পান করেন না। তৃতীয় চিত্রপট—"

ব্রাহ্মণের কম্পিত হস্ত হইতে হুঁকা সশব্দে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। বেদান্তবাগীশ আর দাঁড়াইলেন না।

রামকমল রায়।

১২৫৯ সালের আষাঢ় মাস। বাঙ্গালায় চাষার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, কাহারও ঘরে অন্ন নাই। আষাঢ় মাস কোন বৎসরই চাষার পক্ষে সুখের মাস নহে। এই সময়ে দরিদ্র কৃষক গৃহের সঞ্চিত শস্তের শেষ মুষ্টি পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে বপন করিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে; এবং নিজে ঘরে বসিয়া খায়, বা সময়ে সময়ে উপবাসী রহে। এবার অতিশয় দুর্বৎসর। পূর্ব্ববৎসর অজন্মা গিয়াছে বলিয়া কৃষকের অবস্থা ভাল ছিল না, কষ্টে তাহাদের দিন যাইতেছিল। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে অধিকাংশ লোককেই একবারে নিরাশ্রয় ও নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছে। * অনেকেরই ঘর বাড়ী গিয়াছে; কেহ পাতার কুঁড়ে, কেহ বা গাছের তলা আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু আশ্রয়স্থান অপেক্ষা মানুষের আহারের প্রয়োজন অধিক। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি বঙ্গীয় কৃষক ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে হা অন্ন হা অন্ন রব উঠিয়াছে। কাহারও অর্দ্ধাশনে কাহারও বা অনশনে দিন কাটিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। দরিদ্রের গৃহে কিছুমাত্র অর্থ নাই। মহাজনগণ সময় বুঝিয়া সুদের হার বাড়াইয়াছে। যাহাদের কিছু জমী জমা আছে, তাহারা তাহাই বন্ধক দিয়া ঋণ পাইতেছে। অন্যে তাহাও পাইতেছে না। খাটিয়া খাইতে অনেকে প্রস্তুত, কিন্তু খাটাইবার লোক অধিক নাই। নিরন্ন লোকদিগের মধ্যে কেহ দিনান্তে একটি কুষ্মাণ্ড, কেহ দুটি কাঁচকলা, এবং অভাবে কেহ কেহ কচুর শাক, ওলের ডাঁটা ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। যাহার দশ মুষ্টি তণ্ডুলের প্রয়োজন, সে হয় ত অতিকষ্টে দুই মুষ্টি সংগ্রহ করিয়া তাহা শিশুসন্তান-গুলিকে খাওয়াইয়া নিজে উপবাসী রহিতেছে। কেহ বা অল্পপরিমাণ তণ্ডুলের সহিত অধিকপরিমাণ শাকের ডাঁটা কাঁঠালের বিচি ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া, পরিবারস্থ সকলকেই সেই মিশ্রিত খাদ্যের এক এক মুষ্টি দিতেছে। যাহার কিছুই যুটিতেছে না, সে বিধাতার প্রদত্ত বিনামূল্যের সামগ্রী জল পান ও বায়ু সেবন করিয়াই দু' এক দিন কাটাইয়া দিতেছে।

* ১২৫৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের ভীষণ ঝটিকা বাঙ্গালার এক বিষম দৈবদুর্ঘটনা।

এই সময়ে দু' এক জন দানশীল লোক দুঃখী দরিদ্রকে দুটি অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিয়া আপন আপন অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। খরস্রোতা নদীর তীরবর্ত্তী গোপীনাথপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামের একটি বাড়ীতে প্রতিদিন দুই তিন শত লোক আহার পাইতেছিল। এই বাড়ীটি রামকমল রায়ের। রামকমল ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাড়ী "রায়ঠাকুরের বাড়ী" বলিয়া পরিচিত। গ্রামের মধ্যে রায়ঠাকুরেরাই একমাত্র সমৃদ্ধ লোক। রায়ঠাকুরদের জমা জমী ও নগদ টাকা - দুইই আছে। রামকমল ব্যবস্থা করিয়াছেন, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের গরীব দুঃখী যে আসিবে, সেই পেট পুরিয়া দুটি ভাত খাইতে পাইবে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন নির্দ্দিষ্টপরিমাণে কিছু তণ্ডুল বিতরিত হইবে। কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতেও যে আসিবে, সেই পাইবে। কোন দিন কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে পর দিন তাহা বিতরিত হইবে।

মাসের যত দিন যাইতেছে, রামকমলের বাড়ীতে সমাগত লোকের সংখ্যা ততই বাড়িতেছে। আজ ২৪এ আষাঢ়, রামকমল বাড়ীতে নাই। তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অন্ন ও তণ্ডুল বিতরণ করিতেছেন। দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও আসিয়াছে, এবং সকলেই সফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছে। অনেকেই অন্ন না চাহিয়া চাউল প্রার্থনা করিতেছে। খরস্রোতার অপর পারের এক অনাথা বিধবা আপনার শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া কিছু তণ্ডুল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। রমণী ধীবরজাতীয়া। কয়েক মাস হইল, সে পতিহারা হইয়াছে। গৃহে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী আর দুই বৎসরের শিশু সন্তান ভিন্ন অন্য কেহ নাই। রমণীর অতিকষ্টে দিন যাইতেছে। রায়ঠাকুরদের বাড়ীতে চাউল বিতরিত হয় শুনিয়া, সে আজ প্রথম গোপীনাথপুরে আসিয়াছে। আসিবার সময়ে সে তাহার গ্রামের দুই চারিটি লোকের সঙ্গে আসিয়াছিল। চাউল লইয়া ফিরিবার সময়ে তাহাদের সঙ্গ ধরিতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমণীর বাড়ী খরস্রোতার অপর পারে। খরস্রোতা গোপীনাথপুরের দক্ষিণ দিক দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা। যে খেয়া-ঘাটে পার হইয়া এই রমণীর বাসগ্রামে যাইতে হয়, ঐ ঘাট রায়ঠাকুরদের বাড়ী হইতে পূর্ব্বদিকে ক্রোশাধিক দূরে। রমণী রায়ঠাকুরের বাড়ী হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গ্রামের লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। কিন্তু সহসা আকাশে মেঘ হওয়ায় বৃষ্টি আসিবার ভয়ে লোকগুলি যখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘাটের দিকে ছুটিল, তখন রমণী তাহাদের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। একে স্ত্রীলোক,

তাহাতে সন্তানটি ক্রোড়ে, সঙ্গে সঙ্গে চাউলের ভারও কিঞ্চিৎ রহিয়াছে। সে কেমন করিয়া পুরুষের ন্যায় দৌড়াইবে?

অনাথা ধীবর-বিধবা যখন খেয়া-ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল, তখন সে আর তাহার গ্রামের লোকগুলিকে দেখিতে পাইল না। তাহারা পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। পারের নৌকাখানি নদীর অপর পারে বাঁধা রহিয়াছে। রমণীর বুক শুকাইয়া গেল। সে দেখিল, মেঘ ক্রমশই গাঢ় হইয়া আসিতেছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে। ঘাটের নিকটে কোনও লোকালয় নাই। নদীর এ পারে কিংবা ও পারে একটিও লোক দৃষ্ট হইতেছে না। স্ত্রীলোকটি গত্যন্তর না দেখিয়া ঘাটের উপরে নদীতটে যে একটি বটবৃক্ষ ছিল, তাহার নীচে যাইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রমণীর অঙ্গে যে সামান্য বস্ত্র ছিল, তাহার অঞ্চলের কতক অংশে রায়বাড়ীর চাউল ক'টি বাঁধা রহিয়াছে। সে অঞ্চলের অপরাংশ দিয়া ক্রোড়স্থ শিশুর মস্তকটি আবৃত করিল, এবং নিজে অনাবৃতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই বৃক্ষপত্রের সঞ্চিত বারি রমণীর মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল। রমণীর নিজের শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; তাহার চেষ্টা যাহাতে তাহার পুত্রটি ও চাউল কয়টি না ভিজে। কিন্তু সামান্য বস্ত্র এ অবস্থায় আর কতক্ষণ শুষ্ক থাকিবে! ক্রমে সমস্ত বস্ত্র আর্দ্র হইয়া আসিল; শিশুর শরীর ভিজিয়া গেল! অনাথা জননীর কোলে থাকিয়া সে শীতে কাঁপিতে লাগিল।

রমণী উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনার অঞ্চলবস্ত্রের খানিকটা নিঙ্গড়াইয়া লইল, এবং তদ্দারা শিশুর গাত্রমার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বক্ষে স্থাপিত করিল। নিজে ন্যুব্জভাবে রহিয়া পর্জ্জন্যদেবকে আপনার মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ পাতিয়া দিল।

কিন্তু এ অবস্থায় সে সুস্থ থাকিতে পারিবে কেন? রমণী পুনঃপুনঃ চারি দিকে চাহিতে লাগিল; কিন্তু কোনও দিকেই আশার কিছু দেখিতে পাইল না। নদীর অপর পারে বাঁধা কাষ্ঠতরণী যেন নির্ম্মমপাষাণরূপে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অঙ্গে বৃষ্টিবারিপতনে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই খরস্রোতা আপনার প্রবল স্রোতকে অধিকতর প্রবল করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিতেছে। জনমানবের চিহ্ন কোন দিকেই নাই। একটি ক্ষুদ্র খাল এই খেয়া-ঘাটের পূর্ব্ব দিক দিয়া উত্তর দিক হইতে খরস্রোতাতে আসিয়া পড়িতেছে। রমণী

দুই একবার সে দিকেও দৃষ্টিপাত করিতেছে। মনে মনে ভাবিতেছে, যদি এই খাল দিয়া একখানি নৌকা আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহার চক্ষু যত দূর যায়, তত দূর কিছুই দেখা যাইতেছে না। সে চিন্তা করিতে করিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। শেষে ভাবিল, ফিরিয়া গোপীনাথপুরে যাই। রমণী পুত্রটি কোলে লইয়া উঠিল।

২

দুঃখিনী বিধবা বৃক্ষের তলা ছাড়িয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল। অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক না গেলে আর লোকালয় মিলিবে না। সে দুই চারি পদ অগ্রসর হয়, আর এক একবার পশ্চাতে, দক্ষিণে ও উত্তর দিকে ফিরিয়া চাহে। দুই চারিবার এইরূপ চাহিবার পরে সে দেখিতে পাইল যে, পূর্ব্বোক্ত খালের মধ্যে উত্তর দিকে বহু দূরে একখানি নৌকা দক্ষিণমুখে আসিতেছে। ধীবরকন্যা ফিরিল, এবং পুনরায় বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে আশা এই যে, নৌকার লোকগুলিকে বলিলে তাহারা দয়া করিয়া তাহাকে খরস্রোতা পার করিয়া দিতে পারে। রমণী একবার ভাবিল, যদি তাহারা খরস্রোতার অপর পারে না যায়, যদি তাহারা তাহার প্রার্থনা নাই শুনে। সে মনে মনে উত্তর করিল, নৌকাটা আসা অবধি এখানে থাকি, শেষে গোপীনাথপুর গেলেই চলিবে।

অল্পকালমধ্যেই নৌকাখানি খরস্রোতায় আসিয়া পড়িল, এবং মাঝিরা নৌকা থামাইয়া গুণ বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রমণী বুঝিল, এ নৌকা খরস্রোতা উজাইয়া পশ্চিম দিকে যাইবে; ও পারে যাইবে না। তাহার আশা প্রায় নির্ম্মূল হইল। সে তথাপি সাহসে ভর করিয়া দু' এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা ও গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, মাঝিদের মধ্যে একটি যুবক বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "এস, নৌকা তোমার জন্যই এনেছি।" রমণীর মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইল। সে কেবল পশ্চাতে ফিরিয়া পুনরায় বৃক্ষতলের দিকে যাইবে বলিয়া এক পা বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে নৌকার আরোহী এক জন ভদ্রলোক বিদ্রূপকারী মাঝিকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুই ত ভারী দুষ্ট, জিজ্ঞেস কর্, ও কোথায় যাবে।" মাঝি অপ্রস্তুত হইয়া স্ত্রীলোকটিকে একটু রুক্ষভাবে প্রশ্ন করিল, "তুমি যাবেন কোথা?" রমণী নৌকারোহী ভদ্রলোকটির স্বরে ও ব্যবহারে আশ্বস্ত না হইলে হয় ত এ প্রশ্নের উত্তরই দিত না। সে মুখ ফিরাইয়া অতি

মৃদু ও কাতর স্বরে কহিল, "আমি ও পারে যাব।" নৌকারোহী ব্যক্তি মাঝিকে কহিলেন, "ওকে নৌকায় তোল্।" নৌকার বৃদ্ধ কর্ণধার এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। সে বলিল, "কর্ত্তা, এখন ও পারে যেতে গেলে ঠিক ছ' দণ্ডের ফের। যে স্রোত পড়েছে নদীতে, একবার পাড়ি দিয়ে ফিরে আস্তে গেলে বাড়ী যেতে যেতে সন্ধ্যা হবে।" "তা হয় হবে, তোরা ত একবার খেয়েছিস, আমারই খাওয়া হয় নাই, ওকে দে পার ক'রে। এ দুর্দ্দিনে খেয়া নৌকা আর এ পারে নাও আস্তে পারে।" আরোহী এই বলিয়া উত্তর করিলেন। মাঝিরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্ত্রীলোকটিকে নৌকায় তুলিল, এবং পরপার অভিমুখে চলিল। অনাথা বিধবা নীরবে এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া কৃপালু-ভদ্রলোকটির প্রতি প্রাণের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাইল, এবং নৌকার কাষ্ঠে মস্তকস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

বৃষ্টি তখনও থামে নাই, কিন্তু বেগ কমিয়া আসিয়াছে। রমণী আর্দ্রবস্ত্রে নৌকার সম্মুখভাগে অনাবৃত অংশে বসিয়া আছে। পুনঃপুনঃ নিঙ্ড়াইয়া সে অঞ্চলাংশটি কতকটা শুষ্ক রাখিয়াছে। কিন্তু আপনার লজ্জা নিবারণার্থ মস্তকে অবগুণ্ঠন ও শিশুসন্তানটির শরীরে বৃষ্টিপতনবারণার্থ তাহার অঙ্গে আবরণ দিতে রমণীর ক্ষুদ্র অঞ্চলে কুলাইতেছে না। সে একবার শিশুর গাত্র হইতে কিঞ্চিৎ বস্ত্র টানিয়া লইয়া নিজের মস্তকে দিতেছে, আবার মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ বস্ত্র সরাইয়া পুত্রের গাত্র আবৃত করিতেছে। সহৃদয় ভদ্র-লোকটির প্রাণে এ দৃশ্য সহ্য হইল না। তিনি একখানি বস্ত্র বাহির করিয়া রমণীর নিকট নিক্ষেপ করিলেন, এবং কহিলেন, "আমি তোমার ছেলেকে এই কাপড়খানি দিলাম।" অনাথা বিধবার প্রাণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। সে যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে স্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সে ক্রন্দন মর্ম্মস্থলনিঃসৃত কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক। নৌকার মধ্যে বসিয়া আরোহী ভদ্রলোকটিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। জগদ্বিখ্যাত ভাবুক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কহিয়াছেন, মানুষের অত্যাচার নৃশংস ব্যবহার প্রভৃতি অপেক্ষা তাহার কৃতজ্ঞতাই অনেক অধিক সময়ে মানুষকে কাঁদাইয়া থাকে।

অশিক্ষিতা রমণীর প্রাণের বেগ থামিলেই সে কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ইনি কে? গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বারবার পরমেশ্বরকে ডাকিয়া-ছিলাম। ইনি কি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন?

ইনি মানুষ না দেবতা? মানুষের কি এত দয়া? সে একবার মনে করিতেছিল, এক জন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করি, ইনি কে। কিন্তু লজ্জা তাহাকে কথা কহিতে দিল না।

যখন নৌকা নদীর অপর পারে আসিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। রমণী নৌকারোহীকে প্রণাম করিয়া নৌকা হইতে নামিল। নূতন বস্ত্রখানির একাংশে তণ্ডুলগুলি বাঁধিল, এবং অপরাংশ বালকের গাত্রে দিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বাড়ীমুখে চলিল। নৌকাখানি যত দূর পর্য্যন্ত দেখা গেল, সে এক একবার তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং এক এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। বাড়ী পঁহুছিলে বৃদ্ধা শাশুড়ী তাহার মুখে নৌকারোহীর দয়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বালকটি পিতামহীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "গ্যাখ্ ঠাকুমা, আমাকে ক্যামন কাপল দিয়েছে।"

এই নৌকারোহী ভদ্রলোকটির পরিচয় পাইবার নিমিত্ত পাঠকের কৌতূহল জন্মিয়া থাকিতে পারে। ইনিই সেই রায়ঠাকুরদের বাড়ীর কর্ত্তা রামকমল রায়। রমণী যাঁহার বাড়ীতে তণ্ডুল লইয়াছিল, তাঁহার হস্ত হইতেই এই বস্ত্র পাইল। রামকমল সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাড়ী পঁহুছিলেন। তখনও তাঁহার স্নানাহ্নিক হয় নাই।

৩

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রামকমলের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বাড়ীতে তণ্ডুল বিতরণ করিতেছিলেন। রামকমলের সংসার এই দুই ভ্রাতুষ্পুত্র লইয়া, অথবা তাহাদেরই সংসার। রামকমল তাহার অনাসক্ত কর্ত্তা মাত্র। ইঁহারা রামকমলের জ্যেষ্ঠ সহোদর নীলকমল রায়ের সন্তান। নীলকমল ও রামকমলের পিতা মাতা অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। নীলকমলও দীর্ঘজীবী হন নাই। তিনি অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এখন সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কানাইলালের বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর, আর কনিষ্ঠ কিশোরীলালের বিশ একুশ বৎসর হইবে।

রামকমল বিবাহ করেন নাই। যখন নীলকমলের কাল হয়, তখন রামকমলের বিবাহের বয়স হইয়াছে। দুই এক স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ প্রস্তাব করিয়া ঘটক আসিতেছে, এমন সময়ে নীলকমল কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত

হন, সেই পীড়াই তাঁহার শেষ পীড়া। রামকমল অগ্রজ-গত-প্রাণ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি কেবল শোকে কাতর হইলেন, তাহা নহে, সংসারের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার নিজের স্কন্ধে পড়িল বলিয়া, তিনি বিশেষ চিন্তিত হন। অগ্রজের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর অনেকে রামকমলের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি আজীবন অবিবাহিত থাকিবেন বলিয়া ঘটকমাত্রকেই প্রত্যাখ্যান করেন। দুই এক জন আত্মীয় কুটুম্ব তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলেন যে, হিন্দুর পক্ষে সংসারে থাকিয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করা সঙ্গত নহে, আর ইহা পালন করাও অতি কঠিন। রামকমল তাঁহাদের মধ্যে এক জন বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়কে তাঁহার মনের ভাব জানাইয়া দেন। তিনি বলেন, "আপানারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হই। আর যে বংশে জন্মিয়াছি, সেই বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি। পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ই ত আমার পুত্রস্থানীয়। আমি দারপরিগ্রহ করিলে যদি আমার সন্তান হয়, তাহা হইলে উহাদের প্রতি আমার স্নেহের হ্রাস হইতে পারে, এই কথা ভাবিতেও আমার মনে কষ্ট হয়। গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদে আমি যেন উহাদিগকে পালন করিতে ও সুশিক্ষা দিতে পারি। আর কোনরূপ কুকার্য্য করিয়া পবিত্র পিতৃকুল কলঙ্কিত না করি।" ইহার পরে আর কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে নাই।

রামকমল তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হইয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে তিনি পুত্রনির্বিশেষে পালন করিয়াছেন, এবং রীতিমত সুশিক্ষা দিয়াছেন। সে শিক্ষা অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে। তখনকার দিনে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণসন্তানের যে শিক্ষা ছিল, কানাই ও কিশোরীলাল সেই শিক্ষা পাইয়াছেন। রামকমলের নিজের বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই বয়সেই তিনি আপনার আচরণ চরিত্রের গুণে অনেকের নিকট বৃদ্ধের ন্যায় সম্মানিত। তিনি শিশুর ন্যায় সরল, বীরের ন্যায় নির্ভীক ও যোগীর ন্যায় জিতেন্দ্রিয়। পনের বিশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি নিকটস্থ বহু গ্রামে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষের সৎকার্য্য অসৎকার্য্য সুখ্যাতি অখ্যাতি জীবনের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না। এক এক জন লোক অল্পকালমাত্র সংসারে থাকিয়া যে সুনাম বা দুর্নাম রাখিয়া চলে, অনেকে দীর্ঘজীবন যাপন করিয়াও তাহা

পারেন না। বলা বাহুল্য, সংসারের উপকারী সৎকার্য্যময় পুণ্য জীবন অল্প-কালস্থায়ী হইলেও তাহা কোনরূপ গুণশূন্য দীর্ঘজীবন অপেক্ষা অনেক অধিক শ্লাঘ্য ও মূল্যবান। জগতের অপকারী মনুষ্য নামের অযোগ্য পাপীর জীবনের কথায় আর প্রয়োজন কি?

অনাথা ধীবররমণী যে রামকমলকে দেবতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল, আমরা তাহাতে তাহাকে দোষ দিতে পারি না। মনুষ্যে দেবত্ব অধিক থাকিলেই লোকে তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে সম্ভ্রম করে। রামকমলের দেবগুণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা রামকমলের বংশমর্য্যাদার কথা বলিয়াছি। রামকমল এই বংশের এক অতি উজ্জ্বল রত্ন হইলেও, তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই গোপীনাথপুরের রায়-পরিবার সৎকর্ম্মান্বিত সুব্রাহ্মণ-বংশ বলিয়া বিখ্যাত। রামকমলের পূর্ব্বপুরুষেরা কোনও এক প্রাচীন ধনবান ভূস্বামি-বংশের দীক্ষাগুরু ছিলেন। তাহাতেই তাঁহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। অনেক ব্রহ্মত্র জমী ছিল। এখন জমী তত অধিক না থাকিলেও নগদ টাকা অনেক বাড়িয়াছে। দেবসেবা, অতিথিসৎকার, পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতিতে রীতিমত ব্যয় করিয়াও বার্ষিক আয়ের অর্থ প্রায়ই কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। নিকটস্থ পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের কেহ যাইয়া অভাব জানাইলেই, রামকমল তাহাকে টাকা ধার দিয়া থাকেন। তাঁহার পিতামহের সময় হইতেই এইরূপ টাকা ধার দেওয়া চলিয়া আসি-তেছে। ইহাতে খত-পত্র তমশুকাদির প্রয়োজন হয় না। রামকমল তাঁহার এক খাতায় অধমর্ণদিগের নাম লিখিয়া রাখেন মাত্র। সমর্থ ব্যক্তিরা, অথবা যাহারা টাকা লইয়া কারবারে খাটায়, তাহারা কিছু কিছু সুদ দেয়; অসমর্থ ও দায়গ্রস্ত লোকে বিনা সুদেই টাকা পায়। বিপন্ন ব্যক্তিরা অবস্থানুসারে দান পাইয়া থাকে। দিনের বেলা অপেক্ষা রাত্রিতেই রামকমলের টাকা দেওয়া নেওয়া অধিক চলে। তাঁহার এক কথাই ছিল যে, "সত্য গুড় আঁধারেও মিঠা লাগে।"

রামকমলের বাড়ীতে গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। এই গোপীনাথ বিগ্রহের নাম হইতেই তাঁহাদের গ্রামের নাম গোপীনাথপুর। গোপীনাথের মন্দির বাড়ীর বাহিরে অবস্থিত। রামকমলের বাড়ীর অধিকাংশ ঘরই কাঁচা, বাড়ীর ভিতরে দুইটি ঘর, আর এই গোপীনাথের মন্দির ইষ্টকনির্ম্মিত। গ্রামের হিন্দুগৃহস্থেরা প্রায় প্রত্যেকেই দিনান্তে একবার আসিয়া গোপীনাথকে প্রণাম

করিয়া যায়। দিনে ও রাত্রিতে গোপীনাথের উদ্দেশে যে ভোগ উৎসর্গ করা হয়, অতিথি অভ্যাগত অল্পসংখ্যক হইলে তাহাই প্রসাদ পাইয়া থাকে।

রামকমলের শান্তিময় সংসারে তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। জ্যেষ্ঠ কানাইলালের বিবাহ হইয়াছে, এবং তাহার এক পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। শিশুর বয়স দেড় বৎসর। কনিষ্ঠ কিশোরীলালের আজিও বিবাহ হয় নাই। আঠার বৎসর বয়সে তাহার কোষ্ঠীতে সংঘাতিক পীড়ার কথা লিখিত ছিল। কিশোরীলাল সে ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিয়াছেন। দুই এক স্থান হইতে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে। রামকমল কন্যা দেখিবার জন্য এক স্থানে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে সেই অনাথা ধীবররমণীকে যে ভাবে খরস্রোতা পার করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

৪

পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি কিশোরীলালের বিবাহ হইয়া গেল। রামকমল যে কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন, সেই কন্যাই তাঁহার মনোনীত হইল; এবং তাহারই সহিত তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিলেন। এই কন্যার পিতা এক জন সমৃদ্ধ লোক। তিনি বরকন্যাকে আপনার অবস্থানুসারে বিলক্ষণ দান করিলেন; কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ ফর্দ্দ প্রস্তুত হয় নাই বাঙ্গালায় তখন পুত্র-বিক্রয়-প্রথা ছিল না,—"বিবাহ-বিভ্রাট" বা "বলিদান" কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। রামকমল ও কিশোরীলালের শ্বশুরের দেনা পাওনা লইয়া কোনরূপ বাক্যব্যয় হয় নাই। কিশোরীলালের শ্বশুরবাড়ী গোপীনাথপুর হইতে ষোল ক্রোশ দূরে। নৌকাপথে দূরত্ব আরও অধিক হইবে। বিবাহের পর দিন মধ্যাহ্নভোজনান্তে আট দশখানি নৌকাযোগে বরকন্যা ও বরযাত্রিগণ গোপীনাথপুর অভিমুখে রওনা হইলেন।

কিশোরীলালের শ্বশুরবাড়ী হইতে গোপীনাথপুরে আসিতে হইলে প্রথমতঃ একটি বড় নদী বহিয়া অনেক দূর আসিতে হয়, তার পর একটি ছোট নদী দিয়া তিন চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই একটি ক্ষুদ্র খাল পাওয়া যায়। এই খালই আসিয়া খরস্রোতায় পড়িয়াছে। খরস্রোতায় পড়িলে রায়ঠাকুরদের বাড়ী আর অধিক দূর নহে, ইহা পাঠক জানেন।

কিশোরীলালের বিবাহের নৌকাগুলি পূর্ব্বোক্ত বড় নদী ছাড়িয়া যখন ছোট নদীতে আসিয়া পড়িল, তখন বেলা প্রায় গিয়াছে। এই নদী উজাইয়া

আসিতে হইবে। বড় নদীর স্রোত ভাঁটা, অথবা অনুকূল ছিল। ছোট নদীতে আসিয়াই মাঝিরা গুণ ধরিয়াছে, এবং নৌকাগুলি ধীরে আসিতেছে। বর্ষাকাল বলিয়া নদীতে স্রোত প্রবল ছিল, আর নদীর উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে জঙ্গল হইয়াছিল বলিয়া, গুণ টানিবার তেমন সুবিধা ছিল না। নদীটির পরিসর অধিক নহে। মধ্যে মধ্যে দু' একটি ছোট খাল আসিয়া নদীতে পড়িয়াছে। যেগুলিতে জল কম, মাঝিরা গুণ লইয়া তাহা পার হইয়া যাইতেছে। যে খালে জল অধিক, তাহা পার হইতে না পারিয়া গুণ গুটাইয়া নৌকায় আসিতেছে; এবং সুবিধা বুঝিয়া খালের অপর পারে বা নদীর অন্য তীরে যাইয়া পুনরায় গুণ ধরিতেছে।

অন্য নৌকাগুলি প্রায়ই বরের নৌকার পশ্চাতে রহিতেছে। বরের নৌকার মাঝিগুলি ভাল ও সংখ্যায়ও অধিক বলিয়া তাহারা গুণ টানিয়া অন্য নৌকাগুলি হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিল দেখিয়া কিশোরীলাল মাঝিদিগকে কহিলেন, "অন্য নৌকাগুলি আসিতেছে; সব এক সঙ্গে যা'বি।" মাঝিরা সম্মত হইল। এই সময়ে তাহাদের নৌকা একটি বড় খালের মুখে আসিয়া পঁহুছিল। গুণ তুলিতে হইল। মাঝিরা গুণ গুটাইয়া নৌকায় উঠিবে, এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড উপস্থিত!

খালের মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া আট দশ জন সহসা বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া কিশোরীলালের নৌকা আক্রমণ করিল। যে কয়েক জন মাঝি গুণ ধরিয়া উপরে ছিল, তাহাদিগকে প্রহার করিয়া জলে নামাইল, এবং নৌকার উপরে উঠিয়াই কিশোরীলালকে অতি কর্কশস্বরে কহিল, "যাহা কিছু আছে, সহজে দাও। নচেৎ ভাল হইবে না।" কিশোরীলালের নৌকায় কেবল তাঁহার নবপরিণীতা বালিকা বধূ, আর তাহার পিত্রালয়ের এক বর্ষীয়সী দাসী ছিল। কিশোরীলাল দস্যুদিগের আকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন, এ অবস্থায় ইহাদিগকে বাধা দিবার উপায় নাই। বালিকা ভার্য্যাকে কহিলেন, "তোমার গায়ে যে অলঙ্কারগুলি আছে, খুলিয়া দাও।" দস্যুদিগের এক জন কহিল, "হাঁ, তাহা হইলে আর আমরা ব্রাহ্মণকন্যাকে স্পর্শ করিব না। গহনাগুলি যা আছে—দাও, আর তোমার বরসজ্জার জিনিসগুলি বাহির কর; যা দামী থাকে, তাই নেবো। তা হ'লে আর কোনও অত্যাচার করিব না।" মুহূর্ত্তমধ্যে দস্যুদিগের আদেশ প্রতিপালিত হইল। বৃদ্ধা দাসী চক্ষের জল ফেলিতে

ফেলিতে নববধূর গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দিল। কেবল শাঁখা দু'গাছি হাতে রহিল। বালিকা ভয়ে স্বামীর ক্রোড়ে মস্তক লুকাইল। দেখিতে দেখিতে দস্যুগণ তাহাদের ক্ষুদ্র ও ক্ষিপ্রগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া সেই খাল দিয়া অনুকূল স্রোতে অন্তর্হিত হইল।

কিছুকাল পরেই অন্যান্য নৌকাগুলি কিশোরীলালের নৌকার পশ্চাতে আসিয়া লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বরযাত্রিগণ দস্যুতার বিবরণ শুনিল, এবং ক্ষণকালের জন্য সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শেষে "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ" ইত্যাদি রবে নৌকাগুলি ভরিয়া গেল। অনেকে বলিতে লাগিলেন, "এবার যে বৎসর, তাহাতে চুরি ডাকাতি ত হ'বেই। বরের নৌকা এ ভাবে আগে আসিতে দেওয়াই ভাল হয় নাই। আমি বলিব বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বরের নৌকা পেছন থেকে ডাক্‌ব না ব'লে বলা হয় নাই।" কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "এ নিশ্চয়ই সেই ভীমা বাগ্‌দীর দল। তাহার লোক না আছে কোথায়?" দু' এক জন বৃদ্ধ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কহিলেন, "এখন সব নৌকাগুলি একত্র হইয়া আস্তে আস্তে চল। প্রত্যেক নৌকাতেই এক একটা বাতি জ্বালো, আর বাদ্যকরেরা খুব জোরে বাজাইতে বাজাইতে চলুক। এখানে আর থাকা ঠিক নয়।" এই পরামর্শই স্থির হইল। নৌকাগুলি আবার চলিতে লাগিল। দস্যুদিগের পশ্চাদ্ধাবন মূর্খতা, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল।

রামকমল ইহার কিছুই জানেন না। তিনি ইহাদের সঙ্গে ছিলেন না। পূর্ব্ব রাত্রিতে বিবাহ শেষ হইয়া গেলে তিনি একখানি ডিঙ্গি নৌকায় বাড়ী রওনা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেখানে যাইয়া বরকন্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

৫

রামকমল অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। তাঁহার প্রাতঃকৃত্য খরস্রোতায় সম্পন্ন হইত। নদীতে অবগাহন করিয়া তিনি ঘাটে বসিয়া স্নানাহ্নিক সারিতেন। তখনও গোপীনাথপুরের অনেক লোক নিদ্রার ক্রোড়ে থাকিত। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রামকমল বাড়ী মুখে ফিরিতেন। তাঁহার পরিধান একখানি পট্টবস্ত্র, হস্তে এক ঝারি জল, তদুপরি প্রাতঃকালের পরিত্যক্ত ধৌত বস্ত্রখানি, গলদেশে শুভ্র উপবীত, মস্তকে স্কন্ধে গামছাখানি। পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, সেই তাঁহাকে প্রণাম বা অভিবাদন

করিত। রামকমল প্রত্যেকের সহিত দু' একটি কথা কহিতেন। কথা কেবল তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে নহে। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহার সংবাদ যাহার রাখিবার কথা, রামকমল তাহাকে সেই প্রতিবেশীর কথাও জিজ্ঞাসা করিতেন। লোকে অসংকোচে তাঁহাকে সকল কথাই বলিত। ইহাতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে তিনি গ্রামের প্রায় সমস্ত কথাই সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ঝারিটি রাখিয়া রামকমল হয় ত নিজের ধৌতবস্ত্রখানি নিজেই শুকাইতে দিতেন, এবং একটি ফুলের সাজি হাতে লইয়া বাড়ীর সমীপস্থ ফুলবাগানে যাইয়া পূজার জন্য নিজের হাতে ফুল তুলিতেন। এই সময়ে দু' এক দিন কানাইলালের শিশুপুত্র আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিত, এবং "দাদা! আমি ফুল তুলিব, আমি ফুল তুলিব" বলিয়া তাঁহার হাতের সাজিটি বাড়াইয়া ধরিত। রামকমল আনন্দে গলিয়া যাইতেন। ফুলবাগান হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই গ্রামের অনেক লোক আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ প্রার্থনা ইত্যাদি জানাইত। রামকমল ফুলের বাগানে থাকিয়াই অনেকের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতেন, এবং সকলেরই কথার উত্তর দিতেন। সমাগত নরনারীদিগের মধ্যে অনেকেই কিছু না কিছু হাতে করিয়া আসিত। কেহ তাহার গরুর দুগ্ধ, কেহ তাহার গাছের একটি নাউ বা কুমড়া। কেহ দুটি শাক, কেহ দুটি কলা, এবং সময়ানুসারে কেহ চারিটি আম, কেহ বা একটি কাঁঠাল ইত্যাদি। রায়ঠাকুরের বাড়ীতে রিক্তহস্তে প্রায়ই কেহ আসিত না। আবার ইহাদের মধ্যে অনেকেই রামকমলের কাছে কিছু না কিছু প্রার্থনা করিত। কেহ দুটি মুগের ডাউল, কেহ বা একটু আকের চিনি, কেহ বা একটু মিষ্টি, কেহ বা কিছু পুরাতন ঘৃত। রামকমলের গৃহে দরিদ্র প্রতিবেশীদের জন্য এই সমস্ত জিনিস সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিত; এবং যাহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত, সে আসিয়া তখন তাহা চাহিয়া লইয়া যাইত।

রামকমল ফুলবাগান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার তণ্ডুলাদি বিতরণ শেষ হইয়াছে। তিনি কুটুম্বদিগের আহারের আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমন সময়ে কিশোরীলালের এবং বরযাত্রীগণের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। বরকন্যার নৌকা বরণ করিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া আনিতে হইবে বলিয়া এক জন লোক ঘাট হইতে সংবাদ দিতে আসিল।

তাহার মুখে পূর্ব্বরাত্রির ঘটনার বিবরণ শুনিয়া বাড়ীর মধ্যে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিশোরীলালের জননী "ওমা সে কি গো" বলিয়াই ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

রামকমল ক্ষুণ্ণ না হইলেন, এমন নহে, কিন্তু তিনি ভ্রাতৃজায়াকে প্রবোধ দিয়া কহিতে লাগিলেন, "আপনি ইহাতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবেন না। আমি বলিতেছি, ইহাতে কোন অমঙ্গল হইবে না। এ কোন দৈব-বিপৎপাত নহে, মানুষের অত্যাচার মাত্র। ডাকাইতেরা যে বধূমাতার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই, ইহাই মঙ্গলের বিষয় জানিবেন। গহনা বধূমাতার হইলে তিনি অবশ্যই তাহা আবার পাইবেন। আপনি চক্ষের জল ফেলিবেন না। বর বধূ ঘরে তুলিয়া আনুন। গোপীনাথ আছেন, তিনিই মঙ্গল করিবেন।"

রামকমলের বাক্যের শক্তি ছিল। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ দেবরকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রামকমলের চরিত্র যেমন পবিত্র, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিও তেমনই প্রবল ছিল। তিনি যাহা বলিবেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না, কেবল বাড়ীর লোকের কেন, তাঁহার পরিচিত অনেক লোকের এইরূপ এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তিনি যখন বলিয়াছেন, ইহাতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, তখন সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। ভ্রাতৃজায়া চক্ষের জল মুছিয়া বর বধূ আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমস্তই রীতিমত সম্পাদিত হইল। আত্মীয় কুটুম্বদিগের আহারের আয়োজন, লোক জন বিদায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুতেই কোনরূপ ত্রুটী হইল না। ফলতঃ রামকমলের ব্যবহারে কেহই বুঝিতে পারিল না যে, কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রামকমল থানা পুলিসে কোন সংবাদ দিলেন না, অন্য কাহাকেও কিছু জানাইলেন না। কানাইলালের স্ত্রীর অঙ্গ হইতে দুই একখানি আভরণ লইয়া নববধূর গাত্রে পরাইয়া দিলেন, আর সেই দিনই স্বর্ণকার ডাকাইয়া কয়েকখানি নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন।

রামকমল আর যাহা করিলেন, তাহা বাড়ীর লোক ভিন্ন অন্য কেহ বড় জানিল না। বর বধূকে উপবাসী রাখিয়া তিনি তাহাদিগকে গোপীনাথের চরণামৃত পান করিতে দেন, আর তাহাদের অঙ্গে শান্তি-জল সেচন করেন। তাহাদের কল্যাণার্থ সেদিন নারায়ণকে অতিরিক্ত তুলসীও দিয়াছিলেন। লোকে বলিত, রামকমলের যাহা কিছু অভাব অভিযোগ, তাহা তিনি

৬

বরযাত্রীরা দস্যুদিগের সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক। তাহারা ভীমা বাগ্দীর দলের লোক বটে। এই সময়ে ভীমা বাগ্দীর নাম মধ্যবঙ্গের অনেক স্থলেই সুপরিচিত ছিল। ভীমার নাম অনেকে জানিত বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছে, এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। ভীমা যেন লোক-লোচনের অদৃশ্য থাকিত। তাহার দলের লোক ভিন্ন অন্য কেহই প্রায় তাহার দর্শন পাইত না। সে নিজে কেবল দু' এক স্থলে ডাকাইতি করিতে যাইত, আর অধিকাংশ স্থলেই তাহার অনুচরেরা এই বীভৎস কার্য্য সম্পন্ন করিত। শতাধিক গ্রাম ব্যাপিয়া তাহার অনুচর ছিল। ভীমার কাছে যাইয়া তাহারা যেন দীক্ষিত হইয়া আসিত; এবং শেষে সুবিধামত যেখানে সেখানে দস্যুতা করিত। ভীমা তাহাদিগকে কয়েকটি সঙ্কেতবাক্য শিখাইয়া দিত, এবং ইহারই বলে তাহারা পরস্পর আপনাদের দলের লোক চিনিতে পারিত।

ভীমার গায়ে ভীমের ন্যায় বল ছিল। লাঠী খেলায় সে সিদ্ধহস্ত। কল কৌশল তাহার অনেক জানা ছিল। সে কখনও কোন সার্কাসের দলে যায় নাই, তথাপি তাহার শরীরকে সে নানা ভাবে চালাইতে পারিত। দুই-খানি বংশখণ্ডের সাহায্যে সে এক রাত্রিতে পনের ক্রোশ পথ যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিতে পারিত। ভীমার পুত্র-কলত্র কিছু ছিল না। দস্যুতা করিয়া সে যাহা পাইত, তাহা প্রায়ই দরিদ্রের উপকারার্থ ব্যয় করিত। ভীমা অনেক সময়ে এক বাড়ী হইতে ডাকাইতি করিয়া অর্থ আনিয়া দশ বাড়ীতে তাহা বিতরণ করিয়া দিয়া আসিত। কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ হইতেছে না, কেহ ভাঙ্গা ঘর বাঁধিতে পারিতেছে না, কেহ স্ত্রী পুত্র লইয়া উপবাসী রহিয়াছে, এমন কথা ভীমা জানিতে পারিলেই সে তাহাদিগকে সাহায্য করিত। প্রকাশ্যভাবে সে কিছুই দিত না, কিন্তু রাত্রিতে এমন ভাবে এমন স্থানে অর্থ রাখিয়া আসিত যে, পরদিন প্রভাতে তাহা সর্ব্বপ্রথমেই সেই দরিদ্র গৃহস্থের চক্ষে পড়ে। কেহ এরূপ অর্থ পাইলেই লোকে বলিত, এ "ভীমার দান" পাইয়াছে। সহসা কাহারও অবস্থার উন্নতি দেখিলেই প্রতিবেশীরা সন্দেহ করিত, এ সেই ভীমার কাজ। বস্তুতঃ ভীমার নাম অনেক সময়ে অনেক স্থলে ঘোষিত হইত।

ভীমা সকল সময়ে মহা আড়ম্বরে কালী পূজা করিত। কোনও বিস্তীর্ণ

সমস্ত উদ্যোগ আরম্ভ হইয়া রাত্রিতেই পূজা শেষ হইয়া যাইত। তাহার শিষ্যেরাই কেহ প্রতিমা, কেহ পূজার উপকরণ লইয়া আসিত। তাহারা ভিন্ন অন্য কেহই এ পূজার সন্ধান জানিত না। পূজা প্রায়ই প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে হইত, এবং এক পূজার স্থলেই পরবর্ত্তী পূজা কোথায় হইবে, তাহা স্থির হইয়া যাইত। শিষ্যগণ অন্য সময়ে যেখানেই থাকুক না কেন, অমাবস্যার রাত্রিতে আসিয়া সকলে ভীমার সহিত মিলিত হইত, এবং তাহার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর কে কি কার্য্য করিয়াছে, তাহার এক প্রকার নিকাশ দিত। দস্যুতা করিয়া যে যাহা পাইত, তাহা তাহার সম্মুখে আনিয়া ধরিত, এবং সে ইচ্ছা করিয়া যাহাকে যাহা দিত, সে তাহাই লইত।

যাহারা কিশোরীলালের নৌকায় ডাকাইতি করিয়া ছিল, তাহারাও নিয়মিত প্রথা মত পরবর্ত্তী অমাবস্যার রাত্রিতে অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া ভীমার নিকট উপস্থিত হইল। ভীমা তাহাদের নিকট ঘটনার বিবরণ শুনিয়াই অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিল, এবং কহিল, "আমার কোন শিষ্য বোধ হয় এ পর্য্যন্ত এ প্রকার ডাকাইতি করে নাই। আমি কি পুনঃপুনঃ তোদের বলিয়া দিই নাই যে, যাহারা গরীবের সর্ব্বনাশ করিয়া পয়সা করে, তাহারাই আমার শত্রু? তোরা জানিস কোন্ ব্রাহ্মণের এইরূপ অনিষ্ট করেছিস্? বিয়ের কনে, তার গা থেকে গয়না খুলে আনা! যা, দূর হ আমার সাম্‌নে থেকে। আমি ইহার কিছুমাত্রও স্পর্শ করিব না।"

দস্যুদল অপ্রস্তুত হইল, এবং আত্মসমর্থনার্থ কহিল, "যে বামুনের বাড়ীর বউ, সেও বড় ভাল লোক নয়। তার টাকা যথেষ্ট আছে, সে টাকা লাগায়, আর সুদ খায়। তার বাড়ী অনেক দূরে বটে, কিন্তু আমরা সব খবর রাখি।"

ভীমা একটু নরম হইল। সে কখনও গোপীনাথপুরের দিকে যায় নাই। দস্যুরাও রামকমল রায়ের নাম করে নাই। সে কহিল, "আচ্ছা যা, গয়নাগুলি আমি রেখে দিচ্ছি, আর এর দাম যা হ'তে পারে, তা তোদের দিয়ে দিচ্ছি। তোরা এই টাকা নিয়ে যা। আমি সে ব্রাহ্মণের সন্ধান নেবো। যদি সে গরীবের সর্ব্বনাশ করা লোক হয়, তবে তার বাড়ীতে ডাকাতি কর্‌বো। আর যদি ব্রাহ্মণ ভালমানুষ হয়, তা হ'লে তোদের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নাই।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামকমল রাত্রিতে লোককে টাকা ধার দিতেন।

বঞ্চনা করিত না। তিনি জীবনে কথনও কাহারও বিরুদ্ধে রাজদ্বারে যান নাই। রাজদ্বারে যান নাই, কেবল তাহাই নহে, কখনও আদালত, ফৌজদারীর নাম মুখে আনিতেন না। কোন লোক তাঁহার সহিত কোন দুর্ব্যবহার করিলে, বা অন্যের সহিত অকারণে বিবাদ বাধাইলে, রামকমল তাহাকে কহিতেন, "তুই ত ভারী ঠ্যাঁটা, জমিদারবাড়ী থেকে পেয়াদা আনিয়ে তোর বাড়ীতে বসাইয়া রাখা দরকার।" বলা বাহুল্য, লোকের প্রতি এই তাঁহার অতি উচ্চ ভর্ৎসনা ছিল।

একবার কোন একটি লোক রামকমলের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, অনেক দিনের মধ্যে তাহা পরিশোধ করে নাই। তাহার বাড়ী রামকমলের বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। কানাইলাল এখন অনেক সময়ে কাগজপত্র দেখেন, এবং বিষয়কর্ম্মে পিতৃব্যের সাহায্য করেন। খাতায় ঐ লোকটির নাম দেখিয়া এক দিন তিনি আহারান্তে তাহার বাড়ী যাইয়া টাকাটির জন্য তাগাদা করিবেন বলিয়া কাপড় পরিতেছেন, এমন সময়ে রামকমল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই! কোথায় যাও?" কানাই লোকটির নাম করিয়া কহিলেন, "দেখি একবার গিয়ে যদি টাকাগুলি দেয়।" রামকমল কহিলেন, "আঃ গোপীনাথ! তুমি কেন তার বাড়ীতে যাবে? তার যখন হ'বে, তখন সে আপনিই এসে তোমার টাকা দিয়ে যাবে।" কানাইলাল কাপড় খুলিয়া রাখিলেন।

দেশের সৌভাগ্যক্রমে তখন যেমন রামকমল রায়ের ন্যায় মহাজন ছিলেন, সাধারণলোক ও খাতকেরাও তেমনই সরল ও অপ্রবঞ্চক ছিল। লেখাপড়ায় এত বাঁধাবাঁধি দলীলদস্তাবেজ প্রভৃতি ছিল না। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস ছিল যে, রামকমল রায়ের ন্যায় মহাজনকে এক পয়সা ফাঁকি দিলে, দশ পয়সা লোক্‌সান হইবে। সকলেই মনে করিত,—তিনি যেমন এক কথায় টাকা দিয়াছেন, তেমনই এক কথায় শোধ করিতে চেষ্টা করিব। আজ কাল যেমন মহাজনেরা অনেক সময়ে মিথ্যা নালিশ করেন, খাতকের প্রদত্ত টাকা প্রাপ্তি অস্বীকার করেন, আবার খাতকেরাও রেজেষ্টারী-দলিল অস্বীকার করে, অথবা অন্যরূপ মিথ্যা জবাব দেয়, রামকমলের আমলে ইহার কিছুই ছিল না। তখন পল্লীগ্রামে লেখাপড়া অধিক প্রবেশ করে নাই। রামকমল ত দূরের কথা, কানাইলাল কিংবা কিশোরীলালের হাতে টাকা দিয়াও, কেহ

পূর্ব্বাধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনার পরবর্ত্তী কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে এক দিন বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে, রামকমল গোপীনাথের মন্দিরের দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে একটি অপরিচিত যুবক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রামকমল তাহার পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "আজ্ঞে, আমি হরি ঘোষের ছেলে, আমার নাম কানাই। আমার বাপ এই গ্রামেই বাস করিতেন। পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি এখান হইতে পলাইয়া যান। আমি তখন ছেলে মানুষ। আমরা দু'টি ভাই। এখন আমরা ভড়ভড়ায় আছি; বাবা মারা গিয়েছেন। মা বেঁচে আছেন। ঈশ্বর-ইচ্ছায় এখন আমরা দুটি ভাই-ই কাজ কর্ম্ম কর্‌তে শিখেছি। আমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে। এক দিন মা বল্লেন, 'বাবা, বিবাহ করিবার আগে একটা কাজ করতে হ'বে। যখন আমরা গোপীনাথপুর ছেড়ে আসি, তখন রায় ঠাকুরের কিছু দেনা ছিলাম; সেই টাকাটা শোধ করা চাই। রায় ঠাকুরের টাকা যে মারে, তার কখনও ভাল হয় না।' আমি সেই জন্য এসেছি। বাবা কত ধারতেন, জানি না। দয়া করিয়া একবার হিসাবটা দেখিবেন, আমি বাবার দেনা শোধ করিব।" যুবকের চক্ষু দিয়া একটু জল পড়িল। রামকমল কিছুকাল ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুই হরির ছেলে কানাই, এত বড় হয়েছিস্। যা, তেল টেল মাখ্‌গে, স্নান কর, খা দা, তার পর হিসেব দেখা যাবে। সে আর ইচ্ছা করে' টাকা ফাঁকি দেয় নাই। ব্যারাম হয়ে একবারে অচল হয়ে পড়লো, তাই তার শ্বশুরবাড়ী না কোথায় চলিয়া গেল। হরি বরাবর আমাদের দই ক্ষীর ছানা দিয়েছে। তার দেনার কথা আমার মনেই নাই।"

গোপ-নন্দন আহারাদি করিল। অপরাহ্ণে হিসাবের কথা জিজ্ঞাসা করায়, রামকমল এক পুরাতন কাগজ বাহির করিলেন, এবং কহিলেন, "হাঁ, দেনা আছে চব্বিশ টাকা।" হরির পুত্র মায়ের কথা মত পঞ্চাশটি টাকা আনিয়াছিল। সে কহিল, "আর সুদ কত দিতে হ'বে?" রামকমল কহিলেন, "তুই চব্বিশ টাকাই দে, সুদ এক পয়সাও দিতে হ'বে না। হরির কাছে আমি কখনও সুদ নিই নাই। টাকা নিত, আর দই ক্ষীর ছানা দিত।" যুবক প্রফুল্লবদনে চব্বিশটি টাকা রামকমলের পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "তা হ'লে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি বিদায় হই।" রামকমল চারিটি টাকা হাতে লইয়া কহিলেন, "এই তোর আশীর্ব্বাদ; বেঁচে বর্ত্তে থাক্, সুখী হ'।" কানাই টাকা

কয়েকটি দেখিয়া কহিল, "এমন আজ্ঞা করিবেন না; আমাকে মুখে আশীর্ব্বাদ করুন।" রামকমল কহিলেন, "তোর ত বিয়ে হ'বে বলছিলি, হরির ছেলে, তুই আমার আশীর্ব্বাদ নিবি না? আচ্ছা, আমি তোর আইবুড়ো-ভাতের কাপড় দেবো। আর তুই আজ যাবি কোথা? বেলা গেছে, আজ থাক্। কানাই বাড়ী নাই, সে হয় ত রাত্রেই আস্‌বে। তার সঙ্গে দেখা ক'রে কাপড় নিয়ে কাল সকাল বেলা যাস্। কানাই তোর সঙ্গে ছেলেবেলায় কত খেলা করেছে। তোর নামে নাম। তুই তার ক' মাসের বড়। হরি এক এক দিন তোরে কোলে ক'রে আন্‌তো। যা, আজ একবার গ্রামটা বেড়াইয়া সকলের সঙ্গে দেখা শুনা করে আয়। তোর বাপ্‌কে না চিন্‌তো কে? তোকে দেখলে গ্রামের বুড়ো বুড়ীরা অনেকেই খুসী হবে।" কানাই আর বাক্যব্যয় করিল না। রামকমলের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার সম্বন্ধে তার মার কাছে যা শুনিয়াছিল, মনে মনে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাহার প্রাণ ভরিয়া গেল। সে রায়বাড়ীর এক জন চাকর সঙ্গে লইয়া গ্রাম দেখিতে চলিল।

হরি ঘোষের পুত্র সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আসিল, এবং গোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূজা ও আরতি দেখিল। আরতি শেষ হইয়া যাইবার পর সে ভক্তিগদগদ-চিত্তে দুইটি টাকা বিগ্রহের প্রণামী দিল। রামকমল কহিলেন, "কি রে! কাপড় দেবো বলেছি ব'লে তার দামটা আগে দিয়ে রাখ্‌ছিস বুঝি। তা দে, ঠাকুরকে দিবি, তাতে আমার কি?"

রামকমল কানাইলালের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তাঁহার বাড়ী আসিবার কথা ছিল। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলেও যখন তিনি আসিলেন না, তখন আহার করিতে গেলেন। হরি ঘোষের ছেলে, ঠিক ঘরের ছেলের মত বাড়ীর ভিতরে যাইয়া প্রসাদ পাইল।

আহারান্তে রামকমল শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বাড়ীর ভিতরে সংবাদ গেল যে, এক জন অতিথি আসিয়াছে। রামকমল বাহিরে আসিলেন। দেখেন, এক জন দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক রামকমলকে দেখিয়াই প্রণাম করিয়া কহিল, "অতিথি।" রামকমল কোনও পরিচয় না জিজ্ঞাসা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "রাত্রিতে কি খাবেন?" অতিথি উত্তর করিল, "আজ্ঞে দু'টি মাছের ঝোল ভাত প্রসাদ হ'লেই ভাল হয়, নচেৎ

করিয়া বাহিরবাড়ীর দরজার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আহারাদির বন্দোবস্ত ত সমস্তই তাঁহার হাতে। অতিথির কথাগুলি তাঁহার কানে গেল। রামকমল বাড়ীর ভিতরে আসিতেই পথে তাঁহার দর্শন পাইলেন। এই যে আপনি উঠেছেন বলিয়া তিনি ভ্রাতৃজায়াকে অতিথির আহারের কথা কহিবেন, এমন সময়ে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া কহিলেন, "উঠেছি ত, এত রাত্রে মাছ কোথায় পাইব?" রামকমল কহিলেন, "আপনি তা হ'লে অতিথির কথা শুনেছেন। মাছ পেলেই ভাল হয়। বাড়ীতে কি কিছু নাই?" রমণী উত্তর করিলেন, "হাঁ, আছে, কইবিলের গোটাকতক বড় বড় কই মাছ। কানাই সেগুলো বেছে বেছে রেখে দিয়েছে, কই মাছ বড় ভালবাসে! সেই মাছ ক'টি তার জন্যে জিয়ানো আছে।" রামকমল মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে আর পুকুরে জাল নামাবার জন্য এত রাত্রে জেলে ডাক্‌তে হ'বে না। আমি কানাইএর জন্য আবার কই মাছ আনিয়ে দেবো। আপনি ঐ মাছগুলি অতিথির জন্য দিন।" কানাইলালের জননী দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন, এবং জিয়ানো কই মাছগুলি কুটিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অতিথি তাঁহার কথাগুলি সমস্তই শুনিয়াছে। তিনি অতিথির কথাগুলি ইচ্ছা করিয়া শুনেন নাই। অতিথি তাঁহার কথাগুলি চেষ্টা করিয়া শুনিয়াছে। তখন অন্য লোক কেহই ছিল না। কানাইলালের মাতা মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিলেন বলিয়া, অতিথি অনেকটা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রামকমল ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার কথা শেষ হইতেই, অতিথি যাইয়া হরি ঘোষের পুত্রের প্রতি কিঞ্চিৎ অত্যাচার আরম্ভ করিল। সে ঘুমাইয়াছে, তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের সংবাদ লইয়া, শেষে, সে কেন এই বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গোপ-নন্দন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিল। অতিথি শেষে কহিল, "আমি ভাত খেয়ে নি, দু' জনে এক সঙ্গে শোব।" হরির পুত্র এ অনুরোধ রক্ষা করিল না, সে কহিল, "আপনিই এখানে শোবেন, আমি অন্যত্র যাইয়া শুইতেছি।" এই বলিয়া সে উঠিয়া গেল। অতিথি এই সময়ে আহার করিতে আহূত হইল।

সে দেখিল, বাস্তবিকই কইমাছগুলি অতিশয় লোভনীয়, রন্ধন অতি সুন্দর হইয়াছে। রামকমলের বাড়ীর রন্ধনের খ্যাতি ছিল। কানাইলালের জননী কইমাছও অনেকগুলি রাঁধিয়াছেন, এবং সমস্তই অতিথিকে দিয়াছেন।

তাঁহার দেবর বলিয়া দিয়াছিলেন, লোকটি বোধ হয় ভোক্তা ভাল, মাছের ঝোল কিছু বেশী পরিমাণ করিবেন। অতিথি অতি তৃপ্তির সহিত সমস্তই খাইল, এবং আহারান্তে বাহিরবাটীতে আসিয়া শয়ন করিল।

পর দিন প্রভাতে রামকমল যখন হরি ঘোষের পুত্রকে কাপড় দিতে আসিলেন, তখন পূর্ব্ব রাত্রির অতিথিকে দেখিতে পাইলেন না। গোপ-পুত্র কহিল, "সে খানিক রাত্রি থাকিতেই চলিয়া গিয়াছে। আপনি যখন স্নানে যান, তার অনেক আগে। আমার রাত্রিতে ভয়ে ঘুমই হয় নাই। লোকটির কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী কেমন এক রকমের। আমাকে বলে' ছিল কাছে শু'তে, আমি তা শুই নাই।" রামকমল কেবল কহিলেন, "লোকটা খেতেও পারে বেশ।"

ইহার পর এই অতিথি সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনও আলোচনা হইল না। বাড়ীর অনেকে তাহাকে দেখেই নাই। হরি ঘোষের পুত্র চলিয়া গেল।

পূর্ব্বাধ্যায়ের লিখিত ঘটনার পর আট দিন গিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে এক দিন রাত্রিতে রামকমল আহারান্তে বাড়ীর ভিতরে বসিয়া আছেন, কানাইলালের স্ত্রী আহারে নিযুক্ত, তিনি রন্ধনশালায় রহিয়াছেন, তাঁহার শিশু পুত্রটি রামকমলের কাছে রহিয়াছে। সে জাগিয়া থাকিলে এইরূপ সময়ে রামকমলের নিকটেই থাকিত। রামকমল তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। উভয়ে বিবাদ বাধিয়াছে। রামকমল বলিতেছেন, "রান্নাঘরে বসে' আছেন আমার মা।" বালক বলিতেছে, "না আমাল মা।" রামকমল আবার কহিতেছেন, "না আমার মা।" বালক পুনরায় বলিতেছে, "না আমাল মা।" রামকমল ভ্রাতুষ্পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মা! তুমি কার মা?" শিশু কাঁদিয়া কহিতেছে, "আমাল মা।" রামকমল বলিতেছেন, "তবে আমি কাঁদি, আমি মা পাব-না—উঁ উঁ।" বালক তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিতেছে, "না, আমালও মা, তোমালও মা।" রামকমল শিশুকে চুম্বন দিতেছেন, আর কহিতেছেন, "আচ্ছা তাই ঠিক।" এমন সময়ে বাহির হইতে একটি লোক আসিয়া বলিল, "এক জন অতিথি আসিয়াছে।" রামকমল শিশুকে কোলে লইয়াই উঠিলেন। বাহিরে যাইয়া দেখেন যে, সে দিন রাত্রিতে আসিয়া যে কানাইলালের কইমাছ খাইয়া গিয়াছিল, আজ আবার সেই অতিথি।

রামকমল কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই অতিথি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, এবং তাঁহার পায়ের কাছে একটি পঁটুলি রাখিয়া কহিল,—

"এই আপনার ভাইপো বধূর গহনা। আমার নাম ভীম সর্দ্দার। গয়নাগুলি মিলিয়ে দেখুন সব আছে কি না!" রামকমল কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে পুনরায় কহিতে লাগিল,—"আজ্ঞে, যারা এ গয়না নিয়াছিল তাদের কেউ ভাল নাই। কারও ছেলে মরেছে, মেয়ে মরে'ছে, জামাই মরে'ছে, কেউ বা নিজেই গেছে। এক জনকে বাঘে খেয়েছে। যে দিন গয়নাগুলি আমার কাছে নিয়ে যায় আমি সেই দিনই বলেছিলাম।"

রামকমল এতক্ষণে কহিলেন, "তবে কি তুমি এর মধ্যে ছিলে না?" ভীমা 'না' বলিয়া, তাহার নিজের কথা অনেক কহিল। শেষে বলিল, "আপনি যদি দয়া করেন, তা হ'লে আমি আপনার চরণতলে পড়ে' থাকৃতে চাই। কাছে না রাখেন তাতেও ক্ষতি নাই, কেবল সময়ে সময়ে এসে একটু পাদোদক গ্রহণ করিব, আর দুটি প্রসাদ পাবো। আর যদি আপনি কোন তীর্থদর্শনে যান তা হ'লে আমি কুকুরের ন্যায় সঙ্গে যাব।"

রামকমল "আচ্ছা, তুমি খাও দাও" বলিয়া পুটুলিটি হস্তে লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিশোরীলালের জননী আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। আর কহিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপোর মুখ দিয়ে যখন বের হ'য়েছিল যে গয়না পাওয়া যাবে, আমি তখনই জানি যে উহা পাওয়া যাবে। পুটুলিটি খুলিয়া কহিলেন, "বউমার দাসীর মুখে যা শুনেছি, তা সব গয়নাই আছে। যাক, বিয়ের গয়না যে বছরের মধ্যেই পাওয়া গেল এই রক্ষা। কালই বউমার বাপেরবাড়ী চিটি দেবো, আর গোপীনাথকে খুব তুলসী দেবো।"

পূর্ব্ববারে ভীমাকে তিনি কতকটা অনিচ্ছার সহিত কানাইলালের কই মাছগুলি রাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এবারে আহ্লাদের সহিত দস্যুপতির জন্য তিনি স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

ভীমাকে দেখিবার জন্য বাড়ীর সকলেরই আগ্রহ হইল। কিশোরীলাল তাহাকে দেখিয়া আসিয়া জননীকে কহিলেন, "না মা ডাকাতের নৌকায় এ ছিল না।"

উপসংহার।

ইহার কিছুকাল পরেই রামকমল পুনঃপুনঃ কানাই ও কিশোরীলালকে বলিতে লাগিলেন, "বাবা এইবার তোমাদের সমস্ত

ছেড়ে দাও।" তাঁহারা দুই ভাই প্রথমতঃ এ কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রামকমল বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমরা ত এখন কাজ কর্ম্ম বুঝেছ। খোকার উপর ক্রমশই মায়া বাড়ছে, এখন না বেরুলে আর আমি যেতেই পারিব না। আচ্ছা আমি মাঝে মাঝে এক একবার তোমাদের এসে দেখে যাবো।"

তাঁহাকে আর কেহ ঘরে রাখিতে পারিল না। তিনি তীর্থভ্রমণ জন্য বাহির হইলেন। ভীমা বাগ্‌দী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত-অনুচরের ন্যায় ফিরিতে লাগিল।

রামকমলের কাল হইয়াছে। ৬০ বৎসর বয়সে তিনি কাশীধামে দেহ-ত্যাগ করেন। কানাইলাল কিশোরীলাল কেহই জীবিত নাই। কিশোরী অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন। কানাইলালের সেই পুত্র এখন রায় ঠাকুরদের বাড়ীর কর্ত্তা। ছোট ঠাকুরদাদার নাম করিতেই তাঁহার চক্ষে জল আসে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

প্রতিশোধ।

ভীমদাস কর্ম্মকার ভীমেরি মতন।
চল্লিশে পা দিয়ে তবু দেহের মনের
অটুট রয়েছে স্ফূর্ত্তি; সোজা তাজা মন,
পীড়িতের চিরবন্ধু, পীড়কের ত্রাস;
হেন লাঠি-খেলোয়ার, হেন কুস্তিগীর
গ্রামে আর দু'টি নাই; তেজস্বী সাহসী।
এ দিকে সে একেবারে মাটির মানুষ।
ছাত্রবৃত্তি পাশ করি প্রশংসার সাথে,
ইংরেজীও কিছুদিন পড়েছিল স্কুলে,
তবুও সে ছাড়ে নাই পৈত্রিক ব্যবসা।
সবাই মানিত তারে, চলিত ডরায়ে।
তার ডাকে গ্রামশুদ্ধ হ'ত তার পাছে;

অথচ সে পাড়াগেঁয়ে লোহার কামার,
জুড়িয়া আসে না যার প্রাণপণ শ্রমে,
আগুনের তাতে পুড়ি লোহা পিটাইয়া
কষ্টে অন্ন ক'রে খায়। তবু বড়-মুখে
চলে সে সবার কাছে। নির্লোভ, নির্দ্দোষ,
ধারে না কাহারো ধার; মানে শুধু দুই—
উপরে পরমেশ্বর, মাটিতে মুনিব।

বাহিরের ঘরে ভীম হাপরের কাছে
হাতড়ী পিটিতেছিল; তার একমাত্র
ষোড়শী বিধবা কন্যা, পিতার জীবন
আলো ক'রে বসেছিল কালো কেশ ছাড়ি
আগুনের কাছে। ভীম বসেছিল যেন

ক্ষণেক হাতুড়ী রাখি মুছিয়া ললাট,
ফেলিয়া নিঃশ্বাস পিতা চাহি কন্যা পানে
কহিল অশ্রুত স্বরে,—'হা রে অগ্নিশিখা,
কি জ্বালা, জানিস্, স্নেহে পুষিতেছি গৃহে ;
এ জ্বলন্ত কুণ্ড হ'তে ন্যূন নহে তাহা!
আঁধার জীবনে তবু তাই মোর আলো।'
আবার পড়িল ধীরে একটি নিঃশ্বাস।
হেনকালে পল্লীপথ সচকিত করি
হ্যাট-কোটধারী এক অশ্বারোহী যুবা,
শ্বেতমুখে কালো সরু গোঁফের আঁচড়,
সাহেব অথবা কোন অর্দ্ধেক-সাহেব,
ইঙ্গ ঘেঁসা দারোগার শিকার-সুহৃদ—
তাদের সম্মুখ দিয়া গেলেন চলিয়া।
যতক্ষণ দেখা গেল, সতৃষ্ণ নয়নে
ব্যথিয়া সে শুদ্ধমতি লজ্জা-প্রতিমারে
বিদেশী দেখিতেছিল রূপ—সেই রূপ,
যে রূপের পদতলে গর্ব্বোন্নত শির
বিস্ময়ে সম্ভ্রমে ত্রাসে চাহে লুটাইতে।
মনে হ'তেছিল তার,—'কিবা কালো আঁখি!
এর কাছে নীল চোখ? ঈষৎ পীতাভ
কি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ! এর কাছে, ছি ছি,
সাদা পাথরের রঙ্? নাই যার মাঝে
জীবনের রক্তরাগ, লাবণ্যের জ্যোতি!
মরি, মরি, কি বাহার দীর্ঘ কালো চুলে ;
ঝুঁটি-বাঁধা কটা কেশ পা'র যোগ্য নয়!'
দারোগার নিমন্ত্রণে শিকার খেলিতে
সাহেব আসিয়াছিলা। মোহের নয়নে
দেখিয়া গেলেন পথে আরেক শিকার।
থানার অঙ্গনে এসে নামিলা আরোহী।
দারোগার কৃষ্ণ-পৃষ্ঠ শ্বেত করাঘাতে
পূত পুলকিত করি, মিষ্ট সম্ভাষণে
নিভৃতে আনিয়া তাঁরে বহুক্ষণ ধরি'
রহিলেন গুপ্তালাপে ; যেন দুই জনে
একান্তে চলিল অতি নিগূঢ় মন্ত্রণা।

জানিল দারোগা সেই ইঙ্গপুঙ্গবের,
মুণ্ডু ঘুরে গেছে পথে বঙ্গরূপ হেরি!
ভাবিল,—মাথাটিশুদ্ধ না উড়ে এবার
পল্লীকামারের সেই হাতুড়ীর ঘায়ে!
চিনিত সে ভীমদাসে। সভয়ে বিনয়ে
বুঝায়ে কহিল সব। শুনিয়া সাহেব
মুখে করিলেন দম্ভ ; ভিতরে ভিতরে
মানিয়া নিলেন যুক্তি। হ'ল শেষে স্থির,
কৌশল চালিতে হবে। পলাশীপ্রান্তরে
পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি পড়িল স্মরণে।
ভাবিলেন,—শৌর্য্য বীর্য্য দয়া ধর্ম্ম ন্যায়,
এ বর্ব্বর দেশ তরে নহে ইহা সব।
তাই মোরা আসি হেথা যাত্রার প্রত্যূষে
সপ্তসিন্ধুপারে রাখি যা কিছু মোদের
গরবের, গৌরবের। আসি পণ করি,—
হব না বিমুখ কভু, হব না বিফল!
এই ক'টি মূলমন্ত্র শিখি হেথা এসে,
কালারা শিকার হবে, গোরারা শিকারী,
কালারা মজুর হবে, গোরারা ব্যাপারী,
কালালোক খাবে পানি, গোরালোক দুধ ;
গোরালোক খাবে খানা, কালালোক ক্ষুদ!
—জগতে ইংরেজ জাতি শ্রেষ্ঠ কে না জানে,
হাপ্-সাহেবেরা পাবে সে মহত্ত্ব কোথা?
তবু ঝুটা নকলটি চাই ষোল আনা।
সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ভীমদাস সেই
আগুনের কাছে বসি' তেমনি আগ্রহে
হাতুড়ী পিটিতেছিল। লাল পগ্গধারী
রুল পেটীবিমণ্ডিত নীল কোর্ত্তা-পরা
চারিটি বাহন সনে থানার দেবতা
দিলেন দর্শন সেথা। সসব্যস্তে ভীম
আনি দিল চৌকি সেই ধর্ম্ম-অবতারে।
কহিল, "হুজুর, হেথা কি মনে করিয়া?"
হুজুর শোনে নি কিছু! সে দেখিতেছিল,—
ভাঙ্গা বেড়াটির ফাঁকে রয়েছে ফুটিয়া

দু'টি বড় কালো চোখ ! সে এমন চোখ
দেখে নাই ; মনে হ'ল,—উহাই প্রেমের
অনন্ত বিহারতীর্থ, উহাই সমাধি !
আর কিছু দেখে নাই, তবু তার মনে
নাহি ছিল দ্বিধালেশ—এ আঁখি যাহার,
সে পূর্ণলাবণ্যময় দেহেরো ঈশ্বরী।
ভাবিল,—সার্থক এই গরিবের গৃহ,
এ হেন ঐশ্বর্য্য যেথা। আজ সেই ঘরে
চোরের লোলুপদৃষ্টি আসিয়াছি লয়ে !
অচিরে আত্মস্থ হ'য়ে স্বভাবসুলভ
কুলিশ পুলিসীস্বরে কহিল, 'এসেছি
তোমারে চালান দিতে শান্তিভঙ্গ-দোষে।'
'শান্তিভঙ্গকারী আমি ! সে কি কথা, বাবু ?'
কহিল বিস্ময়ে ভীম। 'তুই বেটা কম ?'
অবতার নিজমূর্ত্তি ক'রেছে ধারণ !—
"জনকত ইস্কুলের নামকাটা ছোঁড়া
নিষ্কর্ম্মা ইংরেজীপড়া ক'টি গ্রাম্য বাবু,
পেশাদার হল্লাকারী, সৌখীন কাঁদুনে,
তাদের পাল্লায় প'ড়ে গেছিস্ গোল্লায় !
ছাড়ি এই লোহাপেটা উঠেছিস্ মেতে
স্বদেশী হুজুগে। তুলি দেশহিত-ধূয়া
মুলুক-মালিকী যাঁর, তাঁর প্রতি হেলা ?
যারা চিরকেলে শিষ্ট চাষা ছোটলোক
তারাও উঠেছে ক্ষেপে মিছে অসন্তোষে !'
উত্তরিল ভীমদাস,—'এই কথা ?—বলি,
মা কি এই মুলুকের কেউ নন আজ ?
হাঁ মানি, আমরা তাঁ'রে করেছিনু হেলা।
বুঝেছি এখন তাহা, পূজার লাগিয়া
তাই উঠিয়াছি মেতে।' কহিল দারোগা,
'মা, মা, বলে মায়া-কান্না গারদে পচিলে,
ঘুচে যাবে। দেখা যাবে, কোন্ মা ঠেকায় !'
উত্তরিল ভীমদাস, 'হা দারোগাবাবু !
তুমি মার ছেলে নও ? ভাই নই মোরা,
তোমার স্বদেশী ভাই ? আমরা ইতর,
তোমরা ভদ্রের ছেলে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে মানে,
এ অধম ভাইদের হাতে ধ'রে যদি
তোমরা না তোল আজ, কাঙ্গালেরা তবে
কার মুখ পানে চাবে ? যারা পণ্য দিয়া
বিদেশের পুণ্য-রক্ত শুষিছে কৌশলে,
দিয়েছি তাদেরি ভাতে আজ মোরা হাত ;
বণিক-ইংরাজ সনে দ্বন্দ্ব আমাদের ;
রাজা—ইংরাজের সাথে নাহি কোন বাদ !
ইহা কি অন্যায়—এই আপনারে চেনা ?
নিজের যা আছে, তাই কুড়ায়ে গুছা'য়ে
সাজাতেছি শান্তচিত্তে নব গৃহস্থালী ;
দাসত্ব-জীবনযাত্রা এ নূতন পথে
শান্তিভঙ্গ করে যদি বিদেশী প্রভুর
আমরা নাচার তবে ! কহিল দারোগা,
'বড় লম্বা-চৌড়া কথা ! দু'পাতা পড়িয়া
হ'য়েছ পণ্ডিত বুঝি, শিখেছ ভণ্ডামি !
ওই পড়া-বুলি ছাড়ি পর্ হাত-কড়ি ;
চল্ আগে থানা-মুখে !' কহিল আগ্রহে
ভীমদাস, 'এই দণ্ডে দাও হাত-কড়ি ;
রাজার বিচারালয় নহে পণ্যশালা !
যাব যেথা যেতে বল যে নরকে মোরে ;
তার আগে, একবার প্রাণভ'রে এস
বলি,—বন্দে মাতরম্ ! ভুলি ভেদাভেদ—
আমি ছোট, তুমি বড়, এস দুই জনে
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বারেক নির্ভয়ে
বলি,—বন্দে মাতরম্ !' তখন দারোগা
হঠাৎ নরম হয়ে কহিল তাহাকে,
'যা বলি করিবে তাহা, কর অঙ্গীকার ;
শীঘ্রই জানিবে তাহা, আজ চলিলাম।'

দুসপ্তাহ গেল চলি। পল্লীজমিদার,
ভীমদাস কামারের সোণার মুনিব !
তাঁহারি প্রেরিত ক'টি পশ্চিমী পেয়াদা

একদিন ভীমদাসে করিল হাজির
জমিদারী কাছারীতে। পিতার আসনে
বার দিয়া ব'সেছেন যুবা জমীদার।
শোভে দুই ধারে হিসাব-নিকাশ বক্তা,
খাজাঞ্চী সুমারী মুন্সী আত্মীয় পার্ষদ ;
ইন্দ্রে বেড়ি' শোভে যেন দেবের সমাজ!
হেনকালে ভীমদাস কৃতাঞ্জলি হ'য়ে
দাঁড়াল নিকটে। কহিলেন জমীদার,
'এত দূর বাড়াবাড়ি ভাল নয়, ভীম ;
জলে থেকে কুমীরের সাথে বাদ সাধা!'
বিনয়ে কহিল ভীম, "কেন মহারাজ ?
অপরাধ মোর ?" কহিলেন মহারাজ,
"অপরাধ ?—এই যে কি স্বদেশী হুজুগ
বাঁধিয়া বসেছ গাঁয়ে ; আমারো বাড়ীটি
সংক্রামিত, কলঙ্কিত!" উত্তরিল ভীম,
"এ যে সন্তানের মাতৃ-পূজা!" কহিলেন
জমীদার, "মা কোথায় ? হ'য়ে গেছে তাঁর
কোন্ দিন বিসর্জ্জন!" উত্তরিল ভীম,
"আবার আমরা তাঁরে মাথায় বহিয়া
আনিয়াছি তুলে', যত্নে করেছি স্থাপন
অক্ষয় অপরাজিত মন্দিরে মন্দিরে।
বল,—বন্দে মাতরম্!" উত্তরিলা রোষে
জমীদার, "ভাবিস্ কি ? এই ন্যাকামোটা
আমিও ধরিব শেষে ? ও সব চীৎকারে
কে দিত বা কাণ ?—এবার যে সাহেবেরা
উঠিয়াছে খাপ্পা হ'য়ে ; জানিস্, ওরা যে
আমারে করিছে দায়ী! আমার প্রজারা
আমার অমত স্থলে করিছে এমন,
বিশ্বাস করে না তারা। তাই ত সে দিন
ম্যাজিষ্ট্রেট গোসা করি নিল না সেলাম।
পুলিস সাহেব, সেও মুখ ফিরাইল!
জীবনে উচ্চাশা ছিল, 'রাজা' উপাধিটি
'বাহাদুর' অলঙ্কারে করিব ভূষিত!

বড় কষ্টে ভীমদাস রাগ সামালিয়া
রহিল ক্ষণেক মৌন। কহিল সতেজে,
"মহারাজ, ভেবে দেখ, তুমি আমাদের
পিতা মাতা বন্ধু রাজা শিক্ষক রক্ষক।
মানি না সাহেব সুবা, জানি না তাদের ;
তোমার নফর বলি গর্ব্বে চলি মোরা!
ওই মুখে এই কথা ? তুমি মহারাজ!
আমরা দিয়েছি এই খেতাব তোমারে
হৃদয়ের ভক্তিপূত দরবার হ'তে ;
কি ছার ইহার কাছে ভিক্ষালব্ধ নাম,
মনে মনে হাসে দাতা দান করি যাহা!
তারি আশে ফিরিতেছ পরের পশ্চাতে
পথের ভিখারী সম ; উচ্ছিষ্টের মত
ঘৃণায় তোমার পিতা রাখিতা যা দূরে ?
মাথার উপরে, ওই প্রতিমূর্ত্তি পানে
চেয়ে ভাব একবার, কার পুত্র তুমি!
সেই তুমি, আজ সেই পিতৃপদে বসি',
দেশের—দশের মুখ হাসাবে এরূপে!"
কতগুলি পার্শ্বচর উঠিল চীৎকারি,'
"ছোট মুখে বড় কথা ? দেখি, তোর কাঁধে
ক'টা মাথা, বেটা!" উত্তরিল ভীমদাস,
"আগে যার যার মাথা খোঁজ, আছে কি না,
তার পরে নিও মাথা! খাও, পর সুখে ;
মজাতে চেও না এই সোণার সংসার!
এ ঘরের পুরাতন সমস্ত গৌরব
উড়াইছ উপেক্ষায়!—ভগ্ন দেবশালা!
অতিথি-ভবন শুষ্ক! অস্পৃশ্য দীর্ঘিকা
আজি পঙ্কোদ্ধার বিনা ;—জল! জল!—করি'
কাঁদে প্রজা তৃষ্ণাতুর! ব্যাধি অন্নাভাব
মেলিয়াছে লোলজিহ্বা! তোমরা সে সব
ডুবাইবে পরিহাসে রঙ্গ কোলাহলে!"
এইখানে বেধে গেল বড় গণ্ডগোল।
ক্রুদ্ধ জমীদারপুত্র সিংহশিশু সম

নিয়ে যা ত এ বেটারে কয়েদখানায়!'—
ছুটি হিন্দুস্থানী আসি' ধরিল ভীমেরে।
হেনকালে কোথা হ'তে চমৎকারি' সবে
'ভীমদা,' 'ভীমদা' বলে' নাচিতে নাচিতে
আট বছরের এক আনন্দ দুলালী,
কোঁকড়ান কেশগুচ্ছ দুলিতেছে পিঠে,
চরণে বাজিছে মল;—(ঘুঙুর গলায়
পাছে পাছে পোষা এক হরিণ-শাবক!)
—যেন ক্ষুদ্র কল্পনার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি—
আসিল ছুটিয়া সেথা। অমনি কুহকে
সেই কাঠখোট্টা দু'টি ভীমদাসে ছাড়ি'
দাঁড়া'ল পশ্চাতে হটি'। জমীদারে চাহি'
ক্ষুদ্র মুঠিটিতে তু'লে ক্ষুদ্র এক কিল
কহিল বালিকা, "বাবা, ভারি দুষ্ট তুমি,
ভীম দা'রে ধরে' নিতে বলেছ ওদের!"
এত বলি,' ভীমদাসে নিমেষের মাঝে
জননী যেমন ক'রে কোলের শিশুরে
করেন আদর, করিল সোহাগ কত!
আত্মহারা ভীমদাস 'লক্ষ্মীদিদি!' বলি'
ভাসিতে লাগিল শুধু নয়নের জলে!
বালিকার সেই প্রিয় হরিণ-শিশুটি
অভিমানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ রহি' তাকায়!
বালিকা কপট রোষে ভুরু বাঁকাইয়া
কহিল, "কাজ্‌লা, তুই বড়ই হিংসুটে!"
পাগ্‌লা কাজ্‌লা শুধু জংলী-ধরণে
রাগিয়া খুঁড়িতেছিল মাটী তক্ষ খুরে।
সাক্ষাৎ ভীমের মত এই ভীমদাস
ক্ষুদ্র বালিকার কাছে শিশুর অধিক!
বুড়া আর গুঁড়া, এ অদ্ভুত ভাই বোনে
যে সংসার পেতেছিল, বাহিরে তাহার
কেহ লয় নাই খোঁজ। লুকায়ে লুকায়ে
কত ফুল, কামরাঙ্গা ভগ্নীভক্ত ভাই
যোগাত বোনের তরে; বালকের মত
খুঁজে খুঁজে এনে দিত পাখীর শাবক;
পিঁজরা, ঘুঙুর গড়ে' দিয়ে যেত চুপে,
দাম নাহি নিত কভু, হাসিটুকু দেখে
ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবিত তাহাই!
লাঠিবাজি কুস্তিখেলা দেখিয়া বালিকা
যখন 'ভীমদা!' বলে' কোলে ছুটে এসে
জড়ায়ে ধরিত তারে, সেই স্পর্শটুকু
বহু গৌরবের দিনে বহু জয় হ'তে
স্পৃহনীয় জ্ঞান করি' নিত বক্ষে ভরি'।
সেদিন তাহার হাতে চলিত হাতুড়ী
যেন কি নূতন ছন্দে!
এ দিকে বালিকা
ভীমদা'রে বশ করি' আসিল ছুটিয়া
অভিমানী পিতাপাশে। সহসা পশ্চাতে
আঁচলে পড়িল টান, জংলী ছেলেটি
টানিছে বসন দন্তে!—ফিরিয়া বালিকা
একটি চুম্বন দিল। পশুর সৌভাগ্য
মানলোভী জমীদার লোলুপদৃষ্টিতে
দেখিতেছিলেন; বুঝে, পিতার সোহাগী
পিতারে করিল খুনী একটি চুম্বনে!
"পাগ্‌লা কাজ্‌লা! মোর জংলী দাদাটি!"
ডাকিতেই, মাকে ছেড়ে মাতামহ বাছে
আসি' তাঁর হাত সুখে লাগিল চাটিতে।
মেয়ে-নাতি-সাথী সঙ্গে ভুলিলা ক্ষণেক
জমীদার,—লেভী লাট খেলাৎ খেতাব!
কহিলা সদয়কণ্ঠে, "ভীম, তোর দোষ
এ যাত্রা করিনু মাপ।" উত্তরিল ভীম,
"বাপেই ত সয় ক্ষ্যাপা ছেলের উৎপাত!
তোমরা যে সাতপুরুষে দয়াল মুনিব,
মোরা পেয়ারের প্রজা। আমাদের আর
এত জোর কোথা চলে? কথা আছে ঢের;
আজ্ঞা হ'লে সঙ্গোপনে পারি জানাইতে।"
কহিলেন জমীদার স'রে যেতে সবে:
কন্যাটিরে কোলে টানি' লাগিলা শুনিতে।
ভীমদাস আরম্ভিল ভ্রুভঙ্গি করিয়া,

"শুনেছি বিশ্বস্ত মুখে আমার উপরে
অকস্মাৎ পুলিশের জুলুমের হেতু।—
আমার বিধবা কন্যা"—কহিতে কহিতে
রক্তবর্ণ হ'ল মুখ, মুষ্টিবদ্ধ কর,
কথা বেধে গেল কণ্ঠে ঘৃণা রোষে ক্ষোভে!
আপনা সংবরি' থামি' ক্ষণেক কহিল,
"আমার পবিত্র কুলে, ফিরিঙ্গী বানর,
কালী মাখাইতে চাহে! বেটা কাপুরুষ,
তাই মোর হাতুড়ীর হাত এড়ায়েছে!
বড় দুঃখ, টুপিশুদ্ধ মুণ্ডুটা তাহার
নারিলাম গুঁড়া গুঁড়া করিতে এ হাতে!"
কহিলেন জমীদার মুখভঙ্গি করি'
ভারি মুরুব্বির মত, "কি করিবে বাপু?
উহারা রাজার জাত, তাই ছোট-বড়
সকলেরি কড়া ধাত্। বলে যারা পারে,—"
ভীমদাস উঠিল গর্জ্জিয়া, "এত দূর
ধামাধরা কাপুরুষ অপদার্থ তুমি!
সতীপ্রতিমার মত মেয়ে কোলে নিয়ে,
শুক্লকেশ জনকের মূর্ত্তির সাক্ষাতে,
তুমি রাজা, দেবতার মত জানি তোমা,
মানি তোমা সেই ভাবে, পূজা করি যারে,
এই উক্তি তার মুখে? তোমার মেয়েতে,
আমার মেয়েতে কিছু আছে কি প্রভেদ?
এ অপমানের প্রতিশোধ নিব আমি;
নহিলে, আমার নাম নহে ভীমদাস!"
"মুখ সাম্‌লে কথা ক, কামারের পো!"—
উত্তরিলা জমীদার।—কামারের পো'র
হ'ল মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, অমনি বালিকা
কহিল ভয়ার্ত্তকণ্ঠে, "ভীমদা, ও কি ও?"
কাজ্‌লারো চোখে সেই ত্রাসটি ফুটিল!
"কিছু না! কিছু না!" বলি' সে স্নেহদুর্ব্বল
চেয়ে ঊর্দ্ধে একখানি তৈলচিত্র পানে,
একটি প্রণাম থুয়ে কহিল আবেগে,

রক্ষক যোগায় হেথা তক্ষকের গ্রাস!
চৌদ্দপুরুষের এই ভিটামাটী ছাড়ি,'
যেথা দুই চক্ষু যায়, চলে যাব সেথা!'
একদিন পিতা-পুত্রী বাস্তু'পরে লুটি'
অঙ্গে মাখি' পুণ্যধূলি ছেড়ে গেল মাটী।
সেদিন চালের পরে লাউডগাগুলি
বাতাসে কাঁপিতেছিল; বাঁশঝাড় হ'তে
মর্ম্মর উঠিতেছিল; নিকটে ডোবায়
হেলেঞ্চা-কলমীলতা দেখিতে লাগিল
এই দুঃখীযুগলের বিদায়-উদ্যোগ!
কোন্ ক্ষণে এর মাঝে ভীমদাস গিয়া
তার কচি-দিদিটিরে দিয়েছিল দেখা,
কেমনে ভুলায়ে তারে নিয়ে গিয়েছিল
তার কাছে, আর তা'র কাজ্‌লার কাছে
অনন্ত-বিদায় কাঁদি, কেহ নাহি জানে!
দশ বর্ষ গেছে ঘুরে। সমস্ত ভারতে
'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র পড়েছে ছড়ায়ে।
ভারতের প্রতি গৃহ বিপণী বাজার
ছেয়েছে স্বদেশী পণ্যে। পরার্থজীবীর
অক্ষর কীর্ত্তিন মঠ, নিজ শিক্ষাশালা,
নিজ বিদ্যাদরবার হয়েছে স্থাপিত!
সব কর্ম্মে সব ভাবে সকল গৌরবে
'স্বদেশী' 'জাতীয়' এই জয়চিহ্ন আঁকা!
ধনে-ধান্যে জ্ঞানে-পণ্যে করে ঝলমল্
নব অভ্যুদিত দেশ! চলিছে তেমনি
দশ বর্ষ আগে যেমন চলিতেছিল
স্বদেশসেবার ব্রত। ভক্ত কোটি কোটি
স্বাস্থ্য স্বার্থ শক্তি সুখ করিয়াছে পণ
দেশ-দেবতার পায়। 'জয় মা তোমার!'
উঠে ধ্বনি লক্ষ কণ্ঠে গগন ভেদিয়া;
ত্রিশ কোটী সন্তানের হৃদয়রাজীবে
বিরাজিছে মাতৃমূর্ত্তি, স্মিতবিভাসিত
অপূর্ব্ব গৌরব-গর্ব্বে!

যুবতী কন্যারে লয়ে' চলেছেন রেলে।
দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কক্ষ ভাড়া করি'
চলেছেন পিতাপুত্রী; সঙ্গী লোক জন
দূরের গাড়ীতে সব। মোগলসরাই
যখন ছাড়িল গাড়ী, সন্ধ্যা হ'য়ে এল।
সেই ক্ষণে মৃদুমন্দ চলন্ত গাড়ীতে
সবেগে অনেক গোরা উঠিয়া, পশিল
তাঁদের কাম্‌রা খুলি'। এই কাণ্ড তার,
তৃতীয় শ্রেণীর এক যাত্রীগাড়ী হ'তে
আগ্রহে দেখিতেছিল একটি আরোহী।
বাবুটি সেলাম ঠুকি' জড়-সড় হ'য়ে
কহিলেন সসম্ভ্রমে, "কাম্‌রাটি শুদ্ধ
নিয়েছি আমরা ভাড়া; অন্যের হেথায়
প্রবেশ নিষেধ।" শ্বেতাঙ্গ না শুনি' কিছু
যুবতীর কাছে এসে বসিল ঘেঁসিয়া।
লজ্জিতা সরিয়া গেলা; সেও সেই ক্ষণে
উঠিয়া, নিকটে গেল; তরুণীরে চাহি'
ভাঙ্গা হিন্দী-বাঙ্গলায় অকথ্য ভাষায়
আরম্ভিল পরিহাস। বৃথা বঙ্গবীর
মিষ্ট সাধ্য-সাধনায়, কাতর স্তুতিতে
চাহিলেন থামাইতে ইঙ্গকুলাঙ্গারে।
ক্রমে সেই নরাধম উঠিল ক্ষেপিয়া,
অসহায় রমণীরে চাহিল ধরিতে;
উঠিল চীৎকার নারীকণ্ঠে। হেনকালে
হঠাৎ ঝড়ের মত চলন্ত গাড়ীতে
সিংহসম দৃপ্ত এক প্রৌঢ় কোথা হ'তে
উঠিল একটি লম্ফে; দুয়ার খুলিয়া
প্রবেশিল কাম্‌রাতে; পাগলের মত
কালো হাতে ভালো ক'রে লাগিল মারিতে
চড়ের উপরে চড়, সাদা নাকে মুখে!
শেষে অবলীলাক্রমে তার মাথা ধ'রে
ঠুকিতে লাগিল জোরে জানালার কাঠে।
শ্বেতাঙ্গ সাধিলা কত, করিলা মিনতি,
'যানে দেও! যানে দেও!'—কোথা? জাহান্নমে
কহি' প্রৌঢ় সেই চেষ্টা লাগিল দেখিতে।
নিরুপায় বাঁকা-ছাঁদে উঠিল চীৎকারি,'
'হামি বণ্ডে মাটরম্!—মৎ মারো আর!'
হাসিয়া, ছাড়িলা প্রৌঢ়। বুদ্ধিমান উঠি,'
গাড়ী হ'তে তাড়াতাড়ি পড়িল সরিয়া
টুপি ছেড়ে ভুলে।—আসন্নবিপদমুক্তা
কহিলা গদ্‌গদ কণ্ঠে, "ভীমদা! ভীমদা!
তুমি?—তুমি ভাই!"—আর কথা ফুটিল না;
নয়ন ভাসিয়া গেল! "লক্ষ্মীদিদি!" বলি'
কাঁদিয়া ফেলিল প্রৌঢ়!—কৃতজ্ঞ পিতাও
নতজানু হ'য়ে সেই ত্রাতার সম্মুখে
কহিলেন, "ভীমদাস, তুমি—তুমি আজ
এই খানে এই ভাবে নিলে প্রতিশোধ!—
খুব শিক্ষা হ'ল মোর; ধিক্ এ উপাধি,
খেলাৎ-খেতাব-নেশা! আজ কায়-মনে
হ'ল এ বিশ্বাসঘাতী স্বদেশের দাস!
সেদিন যে নাম শুনে' পুণ্যনামদ্বেষী
পাপিষ্ঠ দৈত্যের মত উঠেছিনু জ্বলি,'
আজ প্রায়শ্চিত্ত করি প্রাণ ভরে' ডেকে,
প্রাণ ভরে' শুনে', সেই নাম! দুই ভাই
কণ্ঠ মিলাইয়া বলি,—বন্দে মাতরম্!"
ধনী দীন দুই জনে বাক্যহারা হ'য়ে
বহুক্ষণ রহিলেন আলিঙ্গনে বাঁধা।
অকস্মাৎ নারীকণ্ঠে সে স্তব্ধতা ভাঙ্গি'
মধুরে ধ্বনিত হ'ল—বন্দে মাতরম্!
গালভরা হাসি ল'য়ে মার দিকে চেয়ে
তিন বছরের এক সুন্দর বালক
কৈল তার প্রতিধ্বনি,—বণ্ডে মাটরম্!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

কুমার কার্ত্তিকেয়।

বৈদিক দেবতাবর্গের মধ্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের নাম নাই। বেদ বা বৈদিক সাহিত্যে নাম না থাকিলেই যে দেবতা অবৈদিক হয়েন, সর্ব্বত্র এ কথা খাটে না। কোনও কোনও পৌরাণিক-দেবতা সম্পূর্ণরূপে আর্য্যসমাজের বাহির হইতে আসিয়াছেন, কেহ কেহ বা আর্য্যসমাজের বাহির হইতে আসিয়াও একটু রূপপরিবর্ত্তন করিয়া কোনও এক বৈদিক দেবতার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আবার এমন দেবতাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহার উৎপত্তি অনার্য্য বা বিদেশী সমাজে নহে; কোনও একটা বৈদিক দেবভাব কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া একটি নূতন দেবতার জন্মদান করিয়াছে। কোনও অনার্য্য বা বিদেশীয় ভাবের বিনা সংস্রবেই যে অনেক বৈদিক পুরাণ কালবশে নূতন আকারে বিকশিত হইয়াছে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কাজেই সযত্নে দেখিতে হইবে যে, কোনও বৈদিক দেবভাব হইতে কুমারের উৎপত্তি হইয়াছিল কি না।

বালগঙ্গাধর তিলক লিখিয়াছেন যে, "বেদে সপ্তবধূ উপাখ্যানের মূলে যে পুরাণ আছে, উহারই ক্রমবিকাশে কুমার-পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে।" কথাটা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না। বৈদিক ঋষিগণ উত্তরমেরু-প্রদেশে বসিয়া ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন কি না, এবং উত্তরমেরু মতবাদ স্বীকৃত হইলে বেদের অর্থ সহজ হইয়া আসে কি না, সে সকল কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সকল স্থলে প্রাচীন ঋষিরা ঐ সকল বেদমন্ত্রের অর্থ ও পুরাণ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সে সকল স্থলেও তিলক মহাশয় টানিয়া বুনিয়া উত্তরমেরু-ঘটিত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। একটা মতবাদ মাথায় ঢুকিলে ঐরূপই ঘটে।

বেদমন্ত্রের অর্থ বুঝিতে হইলে বৈদিক পুরাণেতিহাস জানিবার প্রয়োজন। মন্ত্রগুলি মণ্ডলে মণ্ডলে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। এক একটি সূক্তে আপাত-দৃষ্টিতে কত অসম্বদ্ধ ভাব একত্র রহিয়াছে; ঐ সকল বিভাগ ও যোজনা কেন ঐরূপ হইল, তাহা বেদখানি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় না। প্রাচীনকালে যখন বৈদিক মন্ত্র পঠিত বা গীত হইয়া বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানাদি হইত, তখন এক দল লোক সেখানে বসিয়া ঐ বেদসম্পর্কীয় পুরাণেতিহাস

পাঠ করিতেন। এই রীতির কথা সকল ক্রিয়াকলাপের গ্রন্থেই আছে। এ কালেও কোনও শুভ অনুষ্ঠানাদির সময় পুরাণপাঠ করাইবার প্রথা রহিয়াছে। এই পুরাণেতিহাস চিরকাল 'পঞ্চমবেদ' বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে; বেদও যেমন কণ্ঠস্থ থাকিত, পুরাণেতিহাসও তেমনই আবৃত্তি-কারক সূতদিগের কণ্ঠস্থ থাকিত। অমুক ঋক্ কেন প্রথমতঃ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনার নাম হইল ইতিহাস। উহা পড়িলে কি ফল হয়, অথবা কোন্ বিশেষ সময়ে কোন্ ঋক্-পাঠে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েন, উদাহরণ সমেত সেই আখ্যায়িকাদি ছিল পুরাণ। কাজেই ক্রিয়া-কলাপের সময় বেদমন্ত্র-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণেতিহাস পঠিত হইত।

যে সকল প্রাচীন বৈদিক-গ্রন্থে বেদাদির মর্ম্ম ও অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল আখ্যায়িকাও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে পদে পদে বৈদিক আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়া, কোন্ সময়ে কোন্ ঋক কোন্ দেবতার নামে পঠিত হওয়া উচিত, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তিলক সুপণ্ডিত, এবং নিজে চিন্তা করিয়া বেদের একটা অর্থ বাহির করিতেও পারেন। হইতে পারে যে, তিনি যাস্ক শৌনক প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষাও বেদের মর্ম্ম অধিক বুঝিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র উত্তর-মেরুর খাতিরে প্রাচীন ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছি না।

সপ্তবধ্রি নাম কেন হইল, পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের সহিত পরবর্ত্তী ঋকের সম্পর্ক কি, এ সকল কথার ব্যাখ্যা বৃহদ্দেবতায় আছে; অথচ তিলক একটা মনগড়া অর্থ বাহির করিয়াছেন। বৃহদ্দেবতায় রহিয়াছে যে, ঋষি সাতবার পত্নীতে নিযুক্ত হইয়াও যখন সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন নাই, তখন এক জন ভারত রাজা তাঁহাকে বৃক্ষদ্রোণীতে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি তখন "যথা বাতা" প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। ঐ সকল মন্ত্র কায়ামুক্তির পক্ষে ফলদায়ক। ব্যাখ্যার ধরণে বোধ হয় যে, ঐ মন্ত্রও পুরাতন মন্ত্র। সপ্তবধ্রি তাহাই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। উহার সঙ্গে এমন মন্ত্রও যুক্ত আছে, যাহা পাঠ করিলে গর্ভিণী সুপ্রসবা হয়েন। এখন তিলক বলিতেছেন যে, গর্ভমুক্তির কথা "যথা বাতা" প্রভৃতি মন্ত্র এক সঙ্গে রাখিলে অর্থ হয় না। কেন যে তিনি বৃহদ্দেবতার ৫ম অধ্যায়ের ৮২ হইতে ৮৬ পর্য্যন্ত শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, দশ মাসের গর্ভের অর্থ, সূর্য্যের দশ মাস অদর্শন বলিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভের কুমারের নাম

হইতেই কুমারপুরাণের মূল ধরিয়া ফেলিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তিলকের গ্রন্থেই সায়নের যে টীকার আভাস পাইলাম, তাহাতে মনে হইল, সায়নাচার্য্য বৃহদ্দেবতাদি দৃষ্টে টীকা করিয়াছিলেন। তিলক বলিয়াছেন যে, সায়ন অবলম্বন করিলে অর্থ হয় না।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে শত-পথ ব্রাহ্মণে অগ্নির অনেক নাম আছে। তাহার মধ্যে তাঁহার কুমার নামও পাওয়া যায়। বিভিন্ন গুণানুসারে অগ্নিকে ভব, ভৈরব, রুদ্র প্রভৃতিও বলা হইয়াছে। কিন্তু বেদ বা কোন বৈদিক সাহিত্যে কার্ত্তিকেয় কুমারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; এবং স্কন্দপুরাণের কোন কথাই পাওয়া যায় না। খৃঃ পূঃ সময়ের বৌদ্ধ সাহিত্যেও এই দেবতার অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায় না। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাভাষ্যের এক স্থলে যাহা পাওয়া যায়, কৈয়ট-টীকার আলোকে তাহার বিবরণ দিয়েছি। এক শ্রেণীর দেবল নামে খ্যাত গ্রাম-যাচকেরা স্কন্দ, বিশাখ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলি বিক্রয় করিতেন; এবং উহাদের পূজা-প্রচার করিতেন। এই দেবলেরা অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনুসংহিতাদিতে উল্লিখিত। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, দেবলেরা উচ্চশ্রেণীতে হেয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও, নিম্নস্তরে তাঁহাদের প্রভাব ছিল; এবং স্কন্দ তখন ধীরে ধীরে আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিতেছিলেন।

ইহার পরেই মহাভারত ও রামায়ণে স্কন্দের পুরাণ পাই। মহাভারতের ও রামায়ণের সকল পুরাণ-কথাই বৈদিক পুরাণ হইতে স্বতন্ত্র। ঐ পুরাণ-কথাগুলি যেখানে সম্পূর্ণ বৈদিক, সেখানেও নূতন শাখা প্রশাখা লইয়া বিকশিত। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে পুরাণ-কথা পাওয়া যায়, মহাভারতাদির পুরাণ-কথা তাহা হইতেও স্বতন্ত্র বা অধিকতর বিকশিত-অবস্থা-প্রাপ্ত।

প্রথমে মহাভারতসংহিতার কুমার-পুরাণের আলোচনা করিব। মহাভারতের বনপর্ব্বের ২২২ অধ্যায় হইতে ২৩১ অধ্যায় পর্য্যন্ত কুমারের জন্ম, কর্ম্ম ও মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ১১৬ হইতে ১২১ অধ্যায় পর্য্যন্ত আঙ্গিরস উপাখ্যানে অগ্নির মাহাত্ম্য ও সুবিস্তৃত বংশের বিবরণ বাহুল্যভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর মার্কণ্ডেয় কার্ত্তিকেয়ের বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই দশ-অধ্যায়-ব্যাপী বৃত্তান্তের অতি সংক্ষিপ্ত কথাটুক বলিতেছি।

অসুরেরা যখন দেবসেনা বিধ্বস্ত করিতেছিল, তখন এক দিন কেশী অসুর একটি রমণীকে হরণ করিতেছিল; ইন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করেন। রমণীর নামও দেবসেনা। ইনি রূপকের রমণী। রমণীও বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভগিনী দৈত্যসেনাকে পূর্ব্বেই দৈত্যেরা হরণ করিয়াছে। দেবসেনা উপযুক্ত-পতিপ্রার্থিনী হইলেন। ইন্দ্র ও ব্রহ্মা সে বিষয়ে তাঁহাকে আশা দিলেন। এমন সময়ে এক দিন অগ্নি সপ্তর্ষিদিগের সাতটি পত্নী দেখিয়া তাহাদের প্রতি মনে মনে আসক্ত হয়েন। তখন স্বাহা দেবী (অগ্নির স্বাহা ও রূপক) এক এক দিন এক এক ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করিয়া ছয় দিন অগ্নির প্রেমালিঙ্গন লাভ করেন। অরুন্ধতী অত্যন্ত সতী বলিয়া স্বাহা তাঁহার রূপ ধারণ করেন নাই; ছয়টি ঋষিপত্নীর রূপ ধরিয়াই অভীষ্টলাভ করেন। দেবী স্বাহা, এক শৈলকুণ্ডে ছয়বার অগ্নির রেত নিক্ষেপ করেন; সেই স্কন্ন বা স্খলিত তেজ হইতে উৎপন্ন কুমার স্কন্দ হইলেন। ইনি খুব বলশালী হইলেন; এবং ইঁহার বাহন হইল কুক্কুট; ময়ূর নহে। ইনি এত বলশালী হইলেন যে, পূর্ব্বে ত্রিপুরঘ্ন মহাদেব সুরারি-নাশের জন্য যে ধনুঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই ধনুঃশ্রেষ্ঠ তুলিয়া তাহার নাদে সর্ব্বলোক কম্পিত করিয়াছিলেন। ইঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য মাতৃকাগণ (ইঁহারা প্রেতিনীপ্রায়) প্রেরিত হয়েন। তাঁহারা কিন্তু কুমারকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিলেন; এবং শূলহস্তে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। কেবল তাহাই নয়, লোহিত সাগরের কন্যা [ইনি এঃবা এবং লোহিত (শোনিত। ভোজনা] কুমারকে পুত্রবৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। কুমারের ছয়টি মস্তকের মধ্যে একটি ছিল ছাগমুণ্ড। সেইটিতে মাতৃকাগণ বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে, ইঁহার শরীরে ইন্দ্রের বজ্র পড়িয়া বিশাখ ও অন্যান্য পুত্র ও কতকগুলি কন্যা উৎপন্ন হয়েন। তাঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্কন্দের নাম হইল কুমার-পিতা। বিশ্বামিত্র যখন কুমারের পূজা করিতে গেলেন, তখন কুক্কুটেরও পূজা করিয়াছিলেন।

তাহার পর ইন্দ্র ও সমুদায় দেবগণ কুমারের পূজা করিলেন। মহাদেব ও পার্ব্বতীও সেখানে আসিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বা এই যুগে সপ্তর্ষি নক্ষত্রকেই কৃত্তিকা বলিত বলিয়া কুমারের নাম হইয়াছিল কার্ত্তিকেয়। ২২৮ অধ্যায়ে নিতান্ত অসম্বদ্ধভাবে, দেবগণ কর্ত্তৃক কুমার-অর্চ্চনার কথার মধ্যে বলা হইয়াছে (২৭ হইতে ৩১ শ্লোক) যে,

দেবতারা রুদ্রকেই অগ্নি বলেন, অতএব স্কন্দ রুদ্রপুত্র; এবং রুদ্রতেজে উৎপন্ন শৈলে অগ্নিতেজে জন্ম বলিয়াও ইনি রুদ্রপুত্র। এই অদ্ভুত তর্ক দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, এ অংশটুকু পরবর্ত্তী যোজনা। প্রথম পুরাণে স্কন্দ অগ্নিরই পুত্র, এবং পরে রুদ্র শিবের সহিত যখন অগ্নি এক হইয়া গেলেন, তখন উনি মহাদেবের পুত্র হইয়া নূতন পুরাণ হইল।

এইখানেই শেষ হয় নাই। যে অধ্যায়ে (২৩০ অঃ) স্কন্দের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, এবং স্কন্দ কর্ত্তৃক মহিষাসুর-বধের কথা আছে, সে অধ্যায়ের মধ্যে হঠাৎ ব্রহ্মা স্কন্দকে বলিয়া বসিলেন, "রুদ্র অগ্নিরূপে উমাতে তোমার জন্ম দিয়াছিলেন, অতএব রুদ্র তোমার পিতা, তুমি তাঁহার নিকট যাও।" স্কন্দও সেখানে গিয়া মহাদেবের পূজা করিলেন। এই শ্লোকগুলি যে কোনও প্রকারে যুক্ত করিয়া দিয়া, পরবর্ত্তী সময়ের পুরাণকথার সহিত মিল রক্ষার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে? আরও দেখুন যে, স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত, মাহাত্ম্য, কীর্ত্তি প্রভৃতি সমুদায় নিঃশেষে বর্ণনা করিবার পর, যুধিষ্ঠির পুনরপি স্কন্দের নামাবলী শুনিতে চাহিলেন। তাঁহার যত নাম ও যত কীর্ত্তি, সমুদায়ই পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছিল। অতএব এই প্রশ্নের কোন কারণ ছিল না। ২৩১ অধ্যায়ে কেবল নামাবলী দিয়া উপাখ্যান শেষ করা হইয়াছে; এবং উহার ১৫ শ্লোকে আছে,— "গঙ্গাসুতস্ত্বং স্বমতেন দেব, স্বাহামহীকৃত্তিকানাং তথৈব।" এ আবার কি? গঙ্গা লইয়া যে পুরাণ, তাহার বিন্দুবিসর্গ এই কুমারপুরাণে নাই। গঙ্গাগর্ভে তেজোরক্ষার কথাই এ পুরাণের বিরোধী; অথচ, কুমার গঙ্গাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, বলা হইল।

হরপার্ব্বতী ও গঙ্গা-ঘটিত কথার পুরাণ এখন প্রচলিত। এই অর্ব্বাচীন পুরাণের প্রথম উল্লেখ পাই, রামায়ণে। কাজেই রামায়ণের পুরাণ যে মহাভারত-কথিত পুরাণের পরবর্ত্তী, তাহা অনায়াসে প্রতীত হইতে পারে। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩৬ ও ৩৭ অধ্যায়ের কুমার-উৎপত্তির বর্ণনা, এখন সকলেরই পরিচিত। মহাভারতে কার্ত্তিকেয় ও স্কন্দ নামের যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। এখানে অবস্থান্তরে জন্ম বলিয়া অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তি পাই। লিখিত হইয়াছে যে, গঙ্গার গর্ভ হইতে নির্গত বলিয়া দেবতার নাম হইয়াছিল স্কন্দ; এবং কৃত্তিকাগণ দুগ্ধপান করাইয়াছিলেন বলিয়া নামী হইয়া ছিল, কার্ত্তিকেয়। (৩৭ অধ্যায়, ২৪ হইতে ২৮ শ্লোক)। রামায়ণে

মদন-ভস্মের যে কথা আছে, তাহা হরপার্ব্বতীর বিবাহের পূর্ব্ব সময়ের কথা লইয়া নহে; এবং মদন দেব হিমালয়ের তপস্যাক্ষেত্রে দগ্ধ নহেন। ইহাতে রামায়ণের পুরাণ, কালিদাসের অবলম্বিত পুরাণকাহিনীর পূর্ব্ববর্ত্তী, বুঝিতে পারি। এই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শেষ পুরাণকথা কোন্ সময়ে প্রথম প্রচারিত, তাহা নিশ্চিত না হইলেও, উহার অর্ব্বাচীনতা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

যে সময়ে প্রথমে মহাভারতে স্কন্দের বিবরণ প্রদত্ত হয়, সে কত দিনের কথা? যে সময়ে ভারতী কথা পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি এক সঙ্গে সংগ্রহ করিয়া (রচনা করিয়া নহে), মহাভারতসংহিতা রচিত হয়, সে সময়ে এই স্কন্দপুরাণ উহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল কি না? যাঁহারা মহাভারত-রচনার কাল প্রাচীন বলিতে চাহেন, তাঁহারা উহার অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন যে, তাঁহার মতে বনপর্ব্বের সমগ্র মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত রচনা। এখানে প্রক্ষিপ্ত অর্থটাও বুঝিয়া লইতে হইবে। এক সময়ে পূর্ব্বপ্রচলিত কথা, ইতিহাস ও পুরাণ লইয়া যখন সংহিতা গঠিত হইল, তখন ঐ সকলগুলি যোগ করিয়া সাজাইবার জন্য যতটুকু নূতন রচনা করিতে হয়, তাহা ছাড়া হয় ত নূতন কিছু যুক্ত হয় নাই। সেই সময়ের পরেও অনেক রচনা মহাভারতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া, শেষোক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বলা হয়।

সমগ্র মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান যে মহাভারতসংহিতা-গঠনের পরে যুক্ত হইয়াছিল, ইহার অনুকূলে কোনও প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই। বিশেষ বিশেষ অধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ যে সকল স্থলে দেবতাবিশেষের জন্য বা অন্য কোন কথার জন্য বিশেষ অধ্যায় লিখিত হইয়াছে), যদি সাধারণভাবে সমগ্র মহাভারত পাঠ করা যায়, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থে যে দেবতত্ত্ব ও পুরাণ পাওয়া যায়, যদি বিশেষ স্থলগুলিতে সেই দেবতত্ত্বের ও পুরাণের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত বা অনেক পরের যোজনা। এই বিচারে সমগ্র মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান না হউক, অন্ততঃ স্কন্দ উপাখ্যানটি প্রক্ষিপ্ত বলা চলে কি না, তাহার বিচার করিতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রামায়ণের স্কন্দ-উপাখ্যান মহাভারতের স্কন্দ-কথারও পরবর্ত্তী।

বনপর্ব্বের স্কন্দপুরাণ ব্যতিত, শল্যপর্ব্বের দুইটি স্থানে ও অনুশাসনের দুইটি স্থানে কেবল স্কন্দের নাম আছে। শান্তিপর্ব্বের মধ্যে বিশেষভাবে সকল দেবতাদিগের কথা আছে; ঐ পর্ব্বে স্কন্দের কথা কিছুই নাই।

বনপর্ব্বে স্কন্দের যে প্রকার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি অনেক দেবতার উপরে ; এবং তাঁহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। অথচ মহাভারতের অন্য কুত্রাপি তাঁহার নামে স্তুতি, কিংবা তাঁহার প্রাধান্যের কথা নাই। ইহা দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইবার কথা। যদিও বনপর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে স্কন্দের কথা যুধিষ্ঠির শ্রবণ করিয়াছিলেন, তথাপি সরস্বতী ও সোমতীর্থের কথার পর, তিনি স্কন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৪ অধ্যায়ে যে ভাবে উহা বর্ণিত, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ; অথচ ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হইল কেন? যে বিষয়ের কথার পর ঐ কথা উঠিল, তাহাতেও স্কন্দের কথা কেন উঠিল, ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। এখানে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্কন্দের পুরাণ নূতন হইয়া গিয়াছে। বনপর্ব্বের পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া মহাদেব, উমা ও গঙ্গার কথা লইয়া ঐ পুরাণ বর্ণিত হইয়াছে। স্কন্দ-উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত না হইলেও, এই অধ্যায় যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পুরাণ-বিরোধ হইতেই প্রতিপন্ন হয়। শল্য-পর্ব্বের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অনুশাসনের ৮৪ ও ৮৫ অধ্যায়ের উপন্যাস সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। কারণ, এখানেও পূর্ব্ব পুরাণ অস্বীকৃত হইয়া, নূতন পৌরাণিক-কথা বলা হইয়াছে।

বনপর্ব্বের স্কন্দ-পুরাণ পরবর্ত্তী রচনা কি না, তাহার নির্ণয় হইল না; কিন্তু এই রচনা যে পূর্ব্ব-প্রদর্শিত প্রক্ষিপ্ত অংশের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন স্কন্দপুরাণে গ্রহাদির কথা আছে বলিয়া, ঐ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলা চলে কি না, তাহার বিচার করিতে হইবে। রবি, সোম ইত্যাদি লইয়া বার-গণনা কোনও প্রাচীন-সাহিত্যে নাই, মহাভারতেও নাই। ঐটি যে বিদেশের আমদানী, তাহার প্রমাণ এখানে দিতে গেলে চলিবে না। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যোতিষ-গ্রন্থ-সমালোচনার সময়, নব্যভারতে সে সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। কেবল বার-গণনা নয়, গ্রহ ও রাশিচক্রও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এ দেশে আসিয়াছিল। প্রাচীন গ্রন্থে যেমন এক দিকে তিথির দ্বারা দিন-গণনা দেখা যায়, তেমনই সমুদায় নক্ষত্রমণ্ডলী, নক্ষত্র ও তারা নামে পরিচিত। গোভিল-গৃহ্য-সূত্রের পরিশিষ্টের গ্রহ-কথা যে পরবর্ত্তী যোজনা, তাহার প্রমাণ অন্য সমসাময়িক গ্রন্থ ও জ্যোতিষ-গ্রন্থ; এবং পরবর্ত্তী মনুসংহিতা। কোন অতি প্রাচীন গ্রন্থে যে গ্রহের কথা নাই, তাহা সকল বিশেষজ্ঞেরাই স্বীকার করিয়াছেন।

মহাভারতে কেবল দুইটি স্থলে গ্রহের উল্লেখ আছে; এ দুইটিই বনপর্ব্বের

মার্কণ্ডেয়-কথিত পুরাণে। ১ম কলিযুগ বর্ণনায় ১৯০ অধ্যায়ে, এবং দ্বিতীয় স্কন্দ-পুরাণে। কলিযুগ-বর্ণনার অধ্যায়ে সুস্পষ্ট রাশিচক্রের কথা পাওয়া যায়। ১৮৮ অধ্যায়ে কলির ফলাফল বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে; অথচ ১৯০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির যেন সকল কথা ভুলিয়া গিয়া, পুনর্ব্বার কলির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই জন্য ১৯০ অধ্যায়টির প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দিগ্ধ অধ্যায়েই কলির ভবিষ্যৎ বলিতে গিয়া অনেক দূরের ভবিষ্যৎ বলা হইয়াছে। পঞ্চম শতাব্দীতে যে রাজনৈতিক অবস্থা হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ আছে। ১৯০ অধ্যায় পরিত্যাগ না করিলে মহাভারতসংহিতাকে অসম্ভব অর্ব্বাচীন করিতে হয়।

এখন বাকী রহিল স্কন্দ-পুরাণের এক অধ্যায়ে গ্রহের কথা। ২২৫ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে গ্রহ উল্লিখিত, তাহার অর্থ সত্য সত্যই জ্যোতিষ্ক-গ্রহ। "গ্রহা দীপ্তা দিশঃ খঞ্চ ররাস চ মহী ভৃশম্।" এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলের গ্রহ অর্থ ভূতযোনি; খাঁটি গ্রহ নহে। মাতৃকাদিগের মত উহারা শিশুদিগের ঘাড়ে চাপিয়া উৎপাত করিত, বলা হইয়াছে। মহাভারত-শরীরে প্রায় সর্ব্বত্রই দ্বিতীয় শতাব্দীর অনেক চিহ্ন আছে; সে কথা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি। কিন্তু নবাগত গ্রহ ও রাশিচক্র হঠাৎ গৃহীত হইয়াছিল, স্বীকার করা কঠিন। ১৯০ অধ্যায়টি অনেক পরবর্ত্তী সময়ের চিহ্ন লইয়া বর্ত্তমান। কাজেই উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেই হইবে। এখন কেবল একটি স্থলের কথা লইয়া বিচার। যখন দেখিতে পাইতেছি যে, স্কন্দ-কথার মধ্যে, পরবর্ত্তী পৌরাণিক কথা সুস্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন ভীষণতার বর্ণনায় দু একটি নূতন কথা যোগ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। স্কন্দ-পুরাণের সহিত মহাভারতের সাধারণ পৌরাণিক সম্বন্ধ যেরূপ শিথিল, তাহাতে স্কন্দ-পুরাণটুকু প্রক্ষিপ্ত বলা চলিতে পারিত; কিন্তু এক দিকে যখন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্কন্দের অস্তিত্ব দেখা যায়, এবং অন্য দিকে যখন রামায়ণে পরবর্ত্তী সময়ের স্কন্দ-পুরাণ রহিয়াছে, তখন সংহিতা-সংগ্রহের সময়ে অগ্নি হইতে উৎপন্ন স্কন্দের কথা প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু রামায়ণে যখন অনেক স্থলেই গ্রহ রাশির কথা আছে, তখন বাল্মীকির প্রাচীন পৌলস্ত্য-বধ অবলম্বনে লিখিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (বালকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ দ্রষ্টব্য), খুব প্রাচীন নহে, মনে করা যাইতে পারে। বিশেষ পুরাণ-কথার তুলনা করিলে, পদে পদে রামায়ণখানি মহাভারত-

সংহিতার পরবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এরূপ স্থলে রামায়ণের স্কন্দ-কথা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ পাওয়া যায় না।

সময় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু ঠিক কি অবস্থায় ও কোন্ সময়ে কুক্কুটধ্বজ স্কন্দ আসিয়া উপস্থিত হইয়া এতটা প্রভুতা বিস্তার করিলেন যে, তাঁহার জন্য প্রথমতঃ অর্দ্ধ বৈদিক, ও পরে শৈবপুরণ রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনও সিদ্ধান্ত করিতে পারা গেল না। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে শকজাতি এ দেশে প্রাধান্যলাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের বৃষ প্রভৃতি যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস তত জটিল নহে। কিন্তু শকাদি কোনও জাতির মুদ্রায় কুমারের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিদেশাগত হইলে শক-আগমনসময়েই, দেবলদিগের নিকট উঁহার মূর্ত্তি পাওয়া যাইত না।

প্রাচীন কালে স্কন্দের মূর্ত্তি পাই, কিন্তু তখন তিনি উচ্চশ্রেণীর আর্য্যের অগ্রাহ্য। মহাভারতের অগ্নিজাত স্কন্দ-পুরাণে স্কন্দের অত্যন্ত প্রভাব বর্ণিত, অথচ মহাভারতের মধ্যে লোকসাধারণের পূজায় মহাদেব ও কৃষ্ণ বিষ্ণুই পূজিত। গুপ্ত রাজাদিগের প্রথম আমলে, বিষ্ণুপূজা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে স্কন্দ পূজিত হইতেছিলেন, অনুমান হয়। কুমার গুপ্ত, স্কন্দ গুপ্ত প্রভৃতি নামগুলি হইতেও যেন উহা সূচিত হয়। কালিদাসের কাব্য পড়িলে সহজেই জানা যায় যে, কবির আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই স্কন্দপূজা বহুপ্রচারিত হইয়াছিল। দক্ষিণ প্রদেশের চালুক্য রাজাদিগের মধ্যে যে স্কন্দপূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহাদের সপ্তম ও পরবর্ত্তী শতাব্দীর লিপি হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু এ সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, মৃচ্ছকটিক, দশকুমারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে, স্কন্দকে চৌর্য্যের নায়ক দেবতা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্কন্দ কি পূর্ব্বে কোনও ক্ষমতাশালী দস্যুজাতির কুলদেবতা ছিলেন?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিক্স।

কৈকেয়ী রাণী মন্থরার প্ররোচনায় দুইটি বর চাহিয়াছিলেন; এক বরে (নন্দিগ্রামপ্রবাসী) ভরতেরে করিব দণ্ডধর, আর বরে (অযোধ্যাবাসী) রামচন্দ্র হবে বনচর। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। কিন্তু সরকার বাহাদুরের হালের দুই একটা ব্যবস্থায়, ত্রেতা যুগের কতক কতক কথা মনে পড়ে। তাঁহারা সম্প্রতি, কাহার প্ররোচনায় জানি না, দুইখানি সার্কুলার জারী করিয়াছেন। একখানিতে মফস্বলবাসী শিক্ষকগণকে দণ্ডধর (special constable) নিয়োগের প্রস্তাব, অপরখানিতে সহরবাসী কতকগুলি ছাত্রের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ডের আজ্ঞা। ছাত্রগণের অপরাধ, তাহারা নাকি পলিটিক্স্ ঘাঁটাইয়াছে; আর নিরীহ শিক্ষকগণের অপরাধ,—এই সকল ছাত্রদিগের শিক্ষার ভার তাঁহাদিগের হাতে।

কোনও একটা নূতন বস্তু সম্মুখে পাইলে, বৈজ্ঞানিক তাহার স্বরূপনির্ণয় করিবার প্রয়াসী হয়েন। পলিটিক্স্ জিনিসটাকে ঠিক নূতন বলা যায় না, ইহা বহুকাল হইতে আছে। কোনও বৈজ্ঞানিক এ পর্য্যন্ত ইহার স্বরূপনির্ণয় করিতে পারিয়াছেন কি না, জানি না। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে কোন্‌টা পলিটিক্স, কোনটা পলিটিক্স্ নহে, ইহা স্থির করা শক্ত। কথাটার কেহ রাজনীতি, কেহ রাষ্ট্রনীতি বলিয়া অনুবাদ করেন, কিন্তু ইহা ত অনুবাদ; অনুবাদে জিনিসটার নিদান কি, তাহা বুঝা যায় না। একবার এক জন ছাত্র, আর এক জন ছাত্রকে শালা বলিয়া গালি দিয়াছিল, এবং ইহা লইয়া কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের নিকট নালিশ হইয়াছিল। সাহেব গালিটার ইংরাজীতে অর্থ জানিতে চাহিলে, ছাত্র বলিয়াছিল,—"এ গালির তর্জ্জমা করিলে ইহার (force) জোর থাকে না।" আমাদের দেশে পলিটিক্স্ শব্দেরও এইরূপ তর্জ্জমা চলে না। এক জন য়ুরোপীয় সমালোচক, গ্রীক্-দৃশ্য-কাব্যপ্রণেতা Aeschylusএর মাহাত্ম্য বুঝাইতে গিয়া তাঁহার কাব্যগুলিকে untranslatable (অনুবাদের অসাধ্য) বলিয়াছেন; politics মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে ইচ্ছা করে। আলঙ্কারিকের পরিভাষায় শব্দটি পরিবৃত্ত্যসহ। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের ছাত্রজীবনে ইল্‌বার্ট-বিল লইয়া ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল। সাহেব মেম ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী বা ফরিয়াদী হইলে, এ দেশী

হাকিম তাহার বিচার করিতে পাইবে কি না, ইহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কথাটা অতি সহজ, আইন ও আইনগত অধিকার লইয়া। কিন্তু এদেশের জল-বায়ুর দোষে বা আমাদের অদৃষ্টদোষে, বিষয়টা অনতিবিলম্বেই পলিটিক্স্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আবার আজ কাল স্বদেশী আন্দোলন লইয়া নূতন করিয়া এই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—ইহা পলিটিক্স্ কি না? দেশের লোক দেশের শিল্পীর প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে, বিদেশী জিনিস কিনিয়া বিদেশীর পায়ে অজস্র টাকা ঢালিয়া দেশটাকে দিন দিন নিঃস্ব করিয়া তুলিবে না; ইহারই নাম স্বদেশী-আন্দোলন। কথাটা অত্যন্ত সোজা। পলিটিক্স্ বলিলে সহজবুদ্ধিতে লোকে যাহা বুঝে, ইহা ত তাহার ত্রিসীমানায়ও আসে না। এটা অর্থনীতির কথা, বড় জোর সমাজনীতির কথা, রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির নহে। কিন্তু সরকার বাহাদুরের ঘোষণা অন্যরূপ। লোকে দেখিয়া শেখে, এবং ঠেকিয়া শেখে। আমরাও ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি যে, যাহাতে বিজেতা জাতির স্বার্থের সহিত বিজিত জাতির স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ অপরিহার্য্য, এবং সেই সঙ্ঘর্ষে বিজেতা জাতির স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে, তাহাই ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে পলিটিক্স্ আখ্যা লাভ করে। ইহার অভিধানসম্মত (definition) সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন, আমাদের দেশে ইহার অর্থ এইরূপ। বিশ্বকোষ-কার এই বিশুদ্ধ সংজ্ঞাটি লইতে প্রস্তুত আছেন কি?

সংক্ষেপে স্বদেশী-আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝাইয়াছি। দেশের লোকে যাহাতে দেশের টাকা দেশেই রাখে, বিদেশী জাহাজ বোঝাই জিনিসের পরিবর্ত্তে, জাহাজ বোঝাই করিয়া টাকার রাশি বিদেশে না পাঠায়, সেই কথাটা কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি কিছু দিন হইতে দেশের আপামর সাধারণকে বুঝাইতেছেন। উদ্যমশীল ছাত্রগণ যৌবনসুলভ উৎসাহবশতঃ এ কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দেশের ইতর ভদ্র সকলের মধ্যে কথাটা লইয়া তোলাপাড়া হইতেছে। অনেকেই দেশের হিত বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। অনেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যথাসাধ্য স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিব।" সভাসমিতি বক্তৃতা প্রবন্ধ দ্বারা, দেশের লোকের মতি-গতি ফিরাইবার চেষ্টা হইতেছে, অনুনয় বিনয় অনুরোধ উপরোধ করিয়া লোককে সুপথে আনিবার চেষ্টা হইতেছে। শেষোক্ত কার্য্যে নাকি ছাত্রগণই অগ্রণী। ইহার জন্য

এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও বেআইনী কাজ করা হয় নাই, করিবার প্রয়োজনও নাই। করিলে তাহার দণ্ডও হাতে হাতে হইবে, ইংরাজ গভর্মেণ্ট ছাড়িয়া কথা কহিবার পাত্র নহেন।

আর যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়াই লওয়া যায় যে, ছাত্রগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছে, তাহা হইলে সে কাজটাই কি অত্যন্ত গর্হিত? উপন্যাসে পড়িয়াছি বটে, এক জনকে এক-শ-কুঠারি বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতে অনুমতি দিয়া, সেই সঙ্গে বলিয়া রাখা হইয়াছিল, আর সকল কুঠারি ইচ্ছামত খুলিতে পার, কিন্তু একটি কুঠারি খুলিও না, খুলিলেই তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। ছাত্রগণের পক্ষে রাজনীতি দেখিতেছি সেই নিষিদ্ধ কুঠারির ন্যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রগণ যোগ দিলেই যে 'ভাগবত অশুদ্ধ' হইল, আমাদের ত এরূপ বিবেচনা হয় না। তাহাদিগের চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য, তাহারা যাহাতে মানুষ হয় এই জন্য, ক্ল্যাসের পড়া মুখস্থ করা ছাড়া, তাহাদিগের আরও অনেক ভাবে মানসিক শক্তির নিয়োগ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগের তর্ক-সভা, বক্তৃতা-সভা প্রভৃতি আছে। সেগুলিকে এ যাবৎ কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দিয়াই আসিতেছেন। এই সকল সভায় সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সকল বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। ইংরেজের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়সংযুক্ত এই সকল ক্লবে গ্ল্যাডষ্টোন প্রভৃতি মহাত্মা ছাত্র-জীবনে বাগ্মিতা অভ্যাস করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। আমাদের দেশে তাহার অনুকরণ কি দোষাবহ? অবশ্য সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নহে। ছাত্রেরা ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকে, তাহাতে কিছুই অন্যায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যদি প্রবল উৎসাহে ঘরে আসিয়া শালগ্রাম শিলা ছুঁড়িয়া ফেলে, বা ঘরের বর্ষীয়সী মহিলাগণের বিধবা বিবাহ দিবার উদ্যোগ করে, তাহা হইলে অবশ্য তাহা কাহারও চক্ষে ভাল লাগিবে না। সেইরূপ, ছাত্রেরা যদি রাজনীতির হুজুগে পড়িয়া দেশময় বিপ্লব উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে বাড়াবাড়ির সকলেই নিন্দা করিবে। কিন্তু আমাদের ছাত্রগণ রুসিয়া, জার্ম্মানী, ফ্র্যান্স প্রভৃতি দেশের ছাত্রগণের ন্যায় রাজবিপ্লব ঘটায় নাই, ঘটাইবেও না। ছাত্রগণ রাস্তায় রাস্তায় জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইলেই ইংরেজ-রাজত্ব টলমল করিবে, সরকার বাহাদুরের কি শাসনদণ্ড এতই দুর্ব্বল! এই দুর্ব্বলতার জন্যই কি আমাদের ছোটলাট সাহেব একা গোটা বাঙ্গলা দেশটা শাসন করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াছিলেন!

“বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।” সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা, স্কুল কলেজের ছাত্রবর্গ ধীর ও শান্তশিষ্ট হইয়া ক্লাসের পড়া মুখস্থ করিবে। দেশে ভাবের প্রবল বন্যাই ছুটুক, আর দেশের আকাশে ঝঞ্ঝাবাতই বহুক, অথবা প্রলয়ের মেঘই উঠুক, কিংবা উদ্দীপনার অগ্নিশিখাই জ্বলিয়া উঠুক, ছাত্রগণ হিমাদ্রির ন্যায় অটল অচলভাবে যোগাসনে বসিয়া নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হইয়া স্বকার্য্য-সাধনে রত থাকিবে। তাহাদের বিদ্যার জ্যোতি নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত জ্বলিবে। আশে পাশে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, সে সংবাদে তাহাদের প্রয়োজন কি ? বাইবেলে পড়িয়াছি, য়িহুদীজাতির উপর জীহোবার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল ; তাই যখন যীহোবার ক্রোধে সমগ্র মিশর দেশে শিলাবৃষ্টি ও অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল, তখন য়িহুদীজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত গোষেন নামক প্রদেশে নির্ম্মল আকাশ ও প্রসন্ন রৌদ্র ছিল। ছাত্রগণের প্রতিও সরকার বাহাদুরের অপার করুণা, তাই তাঁহাদের ছাত্রদিগের হৃদয়-আকাশ দেশের এমন দিনেও নির্ম্মল ও প্রফুল্ল রাখিতে চাহেন। যীহোবার অলৌকিক ক্ষমতায় আর এক স্থানে আর একটি অত্যদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। যখন সমুদয় প্রান্তর শিশিরসিক্ত, তখন এক খণ্ড মেষলোম সম্পূর্ণ শুষ্ক ছিল। সরকার বাহাদুরেরও ইচ্ছা, ছাত্রগণের হৃদয়ক্ষেত্র ঐ মেষলোমের ন্যায় শুষ্ক থাকে ; স্বদেশপ্রেমের অশ্রুকণা তাহাদের হৃদয় আর্দ্র না করে। তবে এটা হিন্দুর দেশ, বাইবেল-বর্ণিত অলৌকিক ব্যাপার এখানে বড় ঘটে না। আমাদের শাস্ত্রে আছে, পরমযোগী মহাদেবেরও দুইবার চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল। একবার দক্ষযজ্ঞে দেবাদিদেব মহাদেবকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অন্য সমস্ত দেবতা নিমন্ত্রিত হইলে, তিনি সতীর অবমাননায় যজ্ঞধ্বংসের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আর একবার কামনার পূর্ণমূর্ত্তি কন্দর্পের বিলাস-লাস্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ধীরচিত্ত ছাত্রগণেরও দুইবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। একবার বঙ্গদেশ ছাঁটিয়া বাঙ্গালা-বিভাগ গড়াতে মাতৃভূমির অবমাননায় তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। আর একবার বিলাতী বণিকের বিলাসোপকরণ সিগারেটের রাশি সজ্জিত দেখিয়া তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছে। এ উত্তেজনা স্বাভাবিক, ইহা বোধ করা শমপ্রধান বৃদ্ধেরও অসাধ্য, উষ্ণশোণিত যুবকগণের ত কথাই নাই। একটা কিংবদন্তী আছে, “পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভূমিকম্প হইলেও কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। কেন না কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর আছে।” কর্তৃপক্ষেরও সেইরূপ

ধারণা, সমস্ত বঙ্গসমাজ আলোড়িত হইলেও ছাত্রদিগের হৃদয় স্পন্দন অনুভব করিবে না, কেন না, তাহারা পেড্‌লার সাহেবের ত্রিশূলের উপর আছে। এই ত্রিশূলের এক ফলা বিশ্ববিদ্যালয়, আর এক ফলা শিক্ষাবিভাগ (department of public instrticon), তৃতীয় ফলা পাঠ্যনির্ব্বাচনসমিতি (Text-book Committee) রূপে বিরাজমান। তবে এ কলিকাল কি না, তাই কাশীতেও ভূমিকম্পের কথা শুনি। আমাদের শাসনতন্ত্রেও ঘোর কলির প্রকোপ, তাই ছাত্রদিগের হৃদয়ও উদ্বেজিত হইয়া পড়িয়াছে!

এরূপ জাতীয় আন্দোলনের দিনে যদি ছাত্রগণ কোনওরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা হইলেও কঠোর শাসনের পরিবর্ত্তে সহানুভূতিপূর্ণ মৃদু ভৎসনাই প্রযোজ্য। যদি সত্য সত্যই কোনও বে-আইনী কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও (school boy freak) বালকসুলভ চপলতা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দেওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য। কর্ত্তৃপক্ষ কথায় কথায় আমাদের দেশের ছাত্রবর্গের অবিনয়ের কথা তোলেন। তাঁহাদের নিজের দেশের ছাত্রবর্গের মতিগতির কথা আমরা জানি না, এমন নহে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহাদের দেশের মত্স্যমাংসাশী ছাত্রগণ যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ষণ্ডামি (rowdyism)র পরিচয় দেয়, শাক-মাছ-ভোজী বাঙ্গালীর ছেলে তাহার তুলনায় নিষ্পাপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও রুসীয় ছাত্রগণ তত্তৎ দেশে রাজবিপ্লব পর্য্যন্ত সংঘটিত করিতেছে, তাহার কি সরকার বাহাদুর খবর রাখেন না? আমরা তাঁহাদিগকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা, ষণ্ডামি ও বিদ্রোহিভাব এ দেশের ছাত্রদিগের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। বালকসুলভ চপলতা দেখিয়া একটা প্রলয়কাণ্ডের আশঙ্কা করিবেন না। মশা মারিতে কামান পাতার উদ্যোগ করিয়া সাধারণের উপহাসাস্পদ হইবেন না।

আমাদের বেশ মনে আছে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ছাত্রাবস্থায় ঠিক এইরূপ একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল। ইলবার্ট-বিলের আন্দোলন ও সুরেন্দ্র-নাথের জেল, এই দুই ব্যাপারে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের জেল হওয়াতে দেশের আপামর সাধারণ বিচলিত হইয়াছিল, নগরে নগরে সভাসমিতি বসিয়াছিল, স্কুল কলেজের ছাত্রগণ, এমন কি, সরকারী কর্ম্মচারিগণ সেই সকল সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সে সময়ে খুলনা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটা (Student Case) ছাত্রঘটিত মোকদ্দমাও হইয়াছিল,

অবশ্য তথাকথিত পলিটিক্সের সঙ্গে এই সমস্ত মোকদ্দমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। বলা বাহুল্য, সে সময়েও সরকার বাহাদুর ছাত্রদিগের অবিনয়ের কথা তুলিয়া শিক্ষাবিভাগে ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষা-দানের ব্যবস্থার জন্য সার্কুলার জারী করেন। জুলুমবাজ পুলিশের কারসাজিতে ছাত্রগণ হায়রান পেরেশান হইতেও ত্রুটি হয় নাই। যাহা হউক, আহ্লাদের বিষয়, সে সময়ে, সরকারী কলেজের সাহেব অধ্যক্ষ ও সরকারী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছাত্রদিগের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, এবং সরকার বাহাদুর ছাত্রদিগকে শাস্তি দিবার জন্য শিক্ষাবিভাগে কোনও সার্কুলার জারি করেন নাই। তখন রীপণের রামরাজত্ব। যে সকল পুলিশকর্ম্মচারী ছাত্রদিগকে অনর্থক জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের যথোচিত শাস্তি হইয়াছিল।

সরকার বাহাদুর বলেন, এ সমস্ত ব্যাপারে যোগ দিলে ছাত্রগণের পড়া শুনার ক্ষতি হইবে। কোনও কোনও বিজ্ঞ অভিভাবক ও শিক্ষক এ কথায় সায় দেন। অবশ্য, সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখা পড়া করে, নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে, ইত্যাদি অনেক কথা শিশুশিক্ষায় লেখে বটে। কিন্তু উপরওয়ালাদের কি সত্য সত্যই ধারণা যে, ছাত্রগণ এই আন্দোলনের পূর্ব্বে শিশুশিক্ষার উপদেশ-অনুসারে কাজ করিয়া আসিতেছিল? আজ হুজুগে পড়িয়া তাহাদের ব্রতভঙ্গ হইয়াছে? বস্তুতঃ ছাত্রগণ পূর্ব্বে বাজে কাজে বাজে গল্পে অনেক সময় নষ্ট করিত। রঙ্গালয়ে অভিনয়-দর্শন বা নিজেরাই সখের অভিনেতার দলগঠন, খেলাধূলা, সভায় অধিষ্ঠান প্রভৃতি নানা খেয়ালে ব্যাপৃত থাকিত, সর্ব্বক্ষণ নোট মুখস্থ করিত না। এই ভাবে তাহাদের যে সময়টা নষ্ট হইত, এখন সেই সময়টা দেশের কাজে দিতেছে। ইহাতে লাভ বই লোকসান ত দেখি না। আমাদের ছাত্রাবস্থায় যে আন্দোলনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে যোগদান করিয়া সে বৎসর কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ছাত্রগণ পরীক্ষায় মন্দ ফল দেখায় নাই; এফ্. এ. ক্লাসের যে সকল ছাত্র দাঙ্গা করিয়াছে বলিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহারা সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল!

পদ্যপাঠে পড়িয়াছি "সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন।" কিন্তু সেটা কিরূপ বিদ্যা? সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বহু পুস্তক পড়িয়া অনেক জ্ঞানলাভ করা যায় জানি। কিন্তু ছাত্রগণ এই ভাবে

নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া হস্তপদবিশিষ্ট বিশ্বকোষে পরিণত হইলেই কি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? সাহিত্য, মনুষ্য-জীবন ও সমাজের সহিত নিত্যসম্বন্ধ; সাহিত্য পাঠ করিয়া মানবজীবনের জটিলসমস্যা ও মানবহৃদয়ের অনন্ত ভাবলীলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, পাঠকের হৃদয়ে উদার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে, মহৎ ও পবিত্র উদ্দীপনার আবির্ভাব হইলে, সাহিত্য-পাঠের প্রকৃত ফল হয়। সুধু গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্ত, গ্রন্থপ্রণয়নের সন তারিখ, গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচকগণের মতামত, ব্যাখ্যা ও পদপরিবর্ত্তন জানার নাম সাহিত্য-পাঠ নহে। ভূগোল পড়িয়া গোটাকতক দেশের নাম মুখস্থ করিয়া, অথবা বড় জোর পৃথিবীর কোথায় কোন্ পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, কোন্ দেশের গাছপালা কিরূপ, জীব জন্তু কিরূপ, আব হাওয়া কিরূপ, ইত্যাদি জ্ঞানলাভ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে না পারিলে ভূগোলপাঠের প্রকৃত ফল হয় না। ইতিহাস পাঠ করিয়া গোটাকতক যুদ্ধের সন তারিখ ও ফৌজ-সংখ্যা মনে রাখিলে তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস-জ্ঞান বলা যায় না। অতীতের ঘটনাবলি হইতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-লাভেই ইতিহাসপাঠের প্রকৃত ফল হয়। এইরূপ অর্থনীতি ও রসায়ন প্রভৃতি পাঠ করিয়া কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিলে ঐ ঐ বিষয়পাঠের প্রকৃত ফল হয় না। অধীত বিদ্যার ব্যবহার শিখিতে হইবে, সেই শক্তি দেশের কাজে লাগাইতে হইবে, তাহাই হইল প্রকৃত শিক্ষা। স্বদেশী আন্দোলনে যদি দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দিকে, দেশের লোকের সুখ দুঃখের দিকে ছাত্রগণের মন ফিরে, তাহাতে কি প্রকৃত শিক্ষার অন্তরায় হইবে?

ক্যাপিট্যালের মিষ্টার ম্যাক্স্ না কি আমাদের পরম বন্ধু। যাহাতে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হয়, দেশেই দেশের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, এবং এই উপায়ে সাধারণের অভাবমোচন ও দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অনেক সুপরামর্শ দিতেছেন। আমাদিগকে কুমীরের চাম্ড়া, বাঘের নখ, শজারুর কাঁটা, নারিকেলের ছোব্ড়া প্রভৃতি হরেক রকম নূতন বাণিজ্য-দ্রব্যের রপ্তানি করিতে উৎসাহিত করিতেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সুধু তাঁহার কেন, উদারচেতা ইংরেজমাত্রেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমরা বিলাতী জিনিস 'বয়কট্' করার যে ধুয়া তুলিয়াছি, তাহাতে সুবুদ্ধি ম্যাক্স্ সাহেব হাসিতেছেন, এবং এ কার্য্যটা নিতান্ত গর্হিত, ইহাও বুঝাইতে ছাড়িতেছেন না। আমরা কিন্তু এই প্রভেদটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম

না। আমরা ত বুঝি, স্বদেশী দ্রব্য চালাইবার চেষ্টা ও বিলাতী বা বিদেশী দ্রব্য বন্ধ করিবার চেষ্টা, একই বিষয়ের দুইটা দিক্ ; ইহার একটা ধরিলে অপরটা ছাড়িবার যো নাই, বস্তু ও ছায়ার ন্যায়, কুব্জ ও ন্যুব্জ ভাগের ন্যায়, অবিচ্ছিন্ন। ঈসপের গল্পে পড়িয়াছিলাম, এক ঘোড়াওয়ালা এক জনকে ঘোড়া ভাড়া দিয়াছিল ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাড়া লইয়াছিল, সে যখন ঘোড়ার ছায়ায় বসিতে গেল, তখন তাহাকে বারণ করিল ; কেন না, সে ঘোড়াই ভাড়া দিয়াছে, ঘোড়ার ছায়া ত ভাড়া দেয় নাই। ম্যাক্স সাহেবের কথাও এইরূপ। স্বদেশী দ্রব্যের কাট্তি হউক, কিন্তু বিলাতী জিনিস 'বয়কট্' করার কথা মুখে আনিও না। বিদেশী জিনিস বন্ধ না করিলে কিরূপে স্বদেশী জিনিসের কাট্তি হইতে পারে, এ সমস্যা আমরা ত সহজবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রত্যেক গৃহস্থই কি দুই প্রস্থ করিয়া জিনিস কিনিবে, একপ্রস্থ স্বদেশী—স্বদেশপ্রেমের খাতিরে, আর এক প্রস্থ বিলাতী—রাজভক্তির অভিনয় করিবার জন্য ? না, তাহারা বিলাতী জিনিস কিনিয়া রাখিবে ; এবং যুবরাজের শুভাগমন উপলক্ষে বাজী না পোড়াইয়া সেইগুলির অগ্নিসৎকার করিবে ? ম্যাক্স্ সাহেব হাজার হোক ইংরেজ, তাই বিলাতী জিনিসের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। কিন্তু ধীরভাবে প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গেলে বিদেশী পরিহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশেই এই উপায়ে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করা হইয়াছে। তবে সে সকল দেশে সেই উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের ব্যবহারকারীদিগের ও আমদানীকারী মহাজনদিগের উপর যেরূপ দৌরাত্ম্য করা হইয়াছিল, এখানে সেরূপ কিছুই হয় নাই। তবুও আমরা সরকার বাহাদুরের বিরাগ-ভাজন হইয়াছে।

যে সকল জিনিস আপাততঃ এ দেশে প্রস্তুত হয় না, সে সম্বন্ধে এই বিদেশীপরিহারনীতি অবলম্বিত হইবে কি না, ইহা এক্ষণে জিজ্ঞাস্য। জিনিসটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইলে সে জিনিসটা যতক্ষণ এ দেশে প্রস্তুত হইবে না, ততক্ষণ বরং তাহা ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত থাকিব, তথাপি বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা প্রশংসনীয়। অনেক সভ্য দেশ এরূপ পণ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের বেলায়ও যদি এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ত সে আরও উত্তম। তবে যে স্থলে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার ভিন্ন উপায়ান্তর

নাই, সে স্থলে জাপানী মাল লইব, কি বিলাতী মাল লইব, য়ুরোপের মাল লইব, কি অন্যান্য দেশের বা মার্কিন মুল্লুকের মাল লইব, ইহা লইয়া একটা তর্ক উঠিতে পারে। বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা হয় ত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন, "যেটা সস্তা ও টেকসই সেইটাই লইব, তার কে জানে মার্কিন, কে জানে জাপানী, আর কে জানে বিলাতী।" অনেকে নাকি কোট ধরিয়াছেন, "যেখানে স্বদেশী মাল পাইব না, সেখানে জাপানী মাল লইব, জাপানী না পাইলে মার্কিন লইব, জার্ম্মাণ লইব, তথাপি বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করিব না।" কথাটা বড় কর্কশ শুনায়; হাজার হউক, আমরা ইংরেজের মহাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, বিলাতী মাল ছাঁটিয়া ফেলিয়া অন্য বিদেশী মালের দিকে ঝুঁকিলে ইংরেজের প্রতি যেন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবজ্ঞা বা বিরাগ দেখান হয়। কিন্তু এ দোষটা কি একা আমাদের? ইহা কি সত্য নহে যে, ইংরেজের মহাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশে ভারতীয় শ্রমজীবীকে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় না; দেওয়া হইলেও, নানাপ্রকারে তথায় বসবাসের রাজনৈতিক-অধিকার-সঙ্কোচ করা হয়, এবং তাহাকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়? শুনিয়াছি, ক্রিকেট-বীর রণজিৎসিংজীকে অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া যাইবার সময় তথাকার গবর্মেণ্ট তাঁহার বিশেষ খাতির করিয়া উক্ত আইন পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রবেশের অধিকার দেন। যখন বিশাল ইংরেজসাম্রাজ্যে পূর্ব্ব হইতেই এরূপ অসমদর্শিতা আছে, তখন আজ ভারতবাসী যদি ইহার অনুকরণ করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহাকে দোষ দাও কি বলিয়া? ইহা ছাড়া, এ দেশের শিল্প উৎসন্ন দিতে স্বার্থপর ইংরেজবণিক্ যেরূপ বিধিমত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা মনে করিলে হৃদয় অবশ্য ইংরেজবাৎসল্য-রসে পুরিয়া উঠে না।

শত্রুপক্ষ বলিবেন, কথাটা ঢাকা দাও কেন? বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষে বাঙ্গালী জাতক্রোধ হইয়া ইংরেজজাতির অনিষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে। স্বীকার করিলাম যে, বিলাতী-বর্জ্জনের মূলে একটু অভিমানের কথা আছে। ভারতসাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা যখন সমগ্র বাঙ্গালীজাতির শত শত আবেদন ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া চরণে ঠেলিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও বাঙ্গালীর মর্ম্মচ্ছেদ করিলেন, বিশাল ইংরেজজাতি যখন কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হেলাইয়াও ইহার প্রতিবিধান করিলেন না, আমরা অক্ষম জাতি বলিয়া উপেক্ষা করিলেন, তখন

জাতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ বণিকের ব্যবসায়ের খর্ব্বতা, আর্থিক ক্ষতি ও মানের লাঘব কিঞ্চিৎপরিমাণেও করিতে সমর্থ? কথামালায় পড়িয়াছি, একদা এক সিংহ জালে পড়িয়াছিল, সামান্য একটা মূষিক তাহার জাল কাটিয়া তাহার উদ্ধারসাধন করিয়াছিল। আজ স্বল্পপ্রাণ বাঙ্গালী-মূষিক, বৃটিশ কেশরী তাহার চতুর্দ্দিকে যে বাণিজ্যের বেড়াজাল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহা ছেদন করিবার প্রয়াসী হইয়াছে। দেখা যাউক, ক্ষুদ্র দন্তের কত জোর? ইহাকে ইংরাজদ্রোহ বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা রাজদ্রোহ নহে। আইনের কূটতর্কে, শাসননীতির ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিয়া, এই পরাধীন পরপ্রত্যাশী জাতির উপর রাজদ্রোহের অপবাদ আনিও না। ইংরেজের বাণিজ্যনীতির প্রভাবে আমাদের তাঁতীকুল বহুদিন হইল নির্ম্মূল হইয়াছে, এখন আবার শাসননীতির কঠোর বিধানে আমাদের বৈষ্ণবকুলও যায়, নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়া যে আমাদের একটা সুনাম ছিল, তাহাও যে আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

বাস্তবিক পক্ষে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারের সহিত এই স্বদেশী আন্দোলনের ঠিক কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নহে। অনেক দিন হইতে ইহার সূচনা হইতেছে। এ দেশে কন্‌গ্রেস্ স্থাপিত হইবার পর হইতে নানা ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার দিকে কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালাদিগের নজর পড়িয়াছে। স্বর্গীয় ডিগ্‌বীর Prosperous India, মহাত্মা দাদাভাই নওরোজীর Un-british Rule in India ইত্যাদি গ্রন্থে ভারতের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। অবশ্য তাহাতে বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানী একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এ সকল পুস্তকে home charges প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে সমস্ত রাজনীতির কথা। কিছু দিন হইল মিঃ টহ্‌লরাম গঙ্গারাম কলিকাতায় আসিয়া স্বদেশী-শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দেন, এবং ইংরাজীতে উদ্দীপনাপূর্ণ গান রচনা করিয়া ছাত্রমহলে প্রচার করেন। তখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। ইহা ছাড়া চিন্তাশীল কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষিতসম্প্রদায়কে অনর্থক রাজনীতিচর্চ্চা দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণজ্বর উৎপাদন না করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে যে সকল কাজ আমরা নিজে হাতে করিতে পারি, তাহা করিতে পরামর্শ দিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করেন। পলিটিকস্-চর্চ্চা করা দূরে থাকুক, ইনি পলিটিকস্ পরিত্যাগ করিতেই পরামর্শ দেন, এবং তজ্জন্য

তথাকথিত patriot দেশহিতৈষীদিগের বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে নূতন করিয়া সেই কথাটিই উঠিয়াছে। যখন দেখা যাইতেছে, সহস্র চীৎকারে ও ফূৎকারে আমরা দেশের শাসননীতি বদলাইতে পারিব না, যখন এ দেশে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, আমাদের নাড়াবনে কীর্ত্তন করিয়া কোনও ফলোদয় হইবে না, তখন সে পথ ছাড়িয়া যাহাতে আমাদের ক্ষমতায় যাহা আছে, দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, ও সেই উপায়ে দেশের আর্থিক-স্বচ্ছলতা-বিধান, সামাজিক নানারূপ হিতকর কার্য্যসাধন ইত্যাদি,— সেই দিকেই আমাদের যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত। সে পথে গবর্মেণ্টের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা নাই, বরং তাঁহাদের সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাইবার আশা আছে। গত কয়েক বৎসর হইতে কন্‌গ্রেস্ উপলক্ষে দেশীয় শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইতেছে, তাহাতে গবর্মেণ্ট অকুণ্ঠিতভাবে অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এ অবস্থায় দেশের লোক স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত করিলে হঠাৎ গবর্মেণ্ট চটিয়া উঠিবেন, এবং যাহা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির সম্পর্কবিরহিত, এমন কি, রাজনীতি-বর্জ্জন করিবার জন্যই যে পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতেও গবর্মেণ্ট রাজনীতির গন্ধ পাইবেন, এবং রাজদ্রোহের পর্য্যন্ত বিভীষিকা দেখিবেন, ইহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর।

ধরিতে গেলে, এই আন্দোলন আর একটা বৃহত্তর ও মহত্তর ব্যাপারের অঙ্গ। জাতীয়তা-রক্ষার দিকে এখন আমাদের মন ফিরিয়াছে। আমরা আচার ব্যবহারে, আহার বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, জাতীয়ভাব পোষণ করিব, এই বিষয়ে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের একটা ঐকান্তিক স্পৃহা জন্মিয়াছে। সকল দেশেই প্রকৃত শিক্ষা ফলবতী হইলে ভিন্ন জাতির অনুকরণস্পৃহা লোপ পায়, এবং জাতীয়তার ভাব আসে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে এই প্রবৃত্তিটা আরও বলবতী হইয়াছে। সকলে বুঝিতেছে, সরকার বাহাদুর যখন শাসনের সুবিধার জন্য (তা যে অর্থেই বুঝুন) বাঙ্গলা দেশটাকে দ্বিখণ্ড করিয়া 'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই,' করিতেছেন, উভয় অংশের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছেন, তখন আমাদের কর্ত্তব্য, একটা জাতীয় ঐক্যসাধন করিয়া 'ভাই ভাই, এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই', এই জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় করি। ইহাতে ইংরাজদ্রোহও নাই, রাজদ্রোহও নাই। আশা করি, এই জাতীয়তার ভাব ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া all India movement করিয়া দাঁড়াইবে। এই ঐক্য দেশীয় সমাজ লইয়া, ইহাতে পলিটিকসের

সম্পর্ক নাই। এই চারি দিকে কেরাণী, কম্‌পোজিটর, কন্‌ডক্‌টর প্রভৃতি মহলে ধর্ম্মঘট হইতেছে, ইহারও মূলে এই জাতীয়তার ভাব আছে। ইহারাও বুঝিতেছে যে, আমরা একটা বিশাল জাতির অন্তর্ভুক্ত, আমাদের ক্ষমতা অল্প হইলেও আমাদের সমগ্র জাতি যদি আমাদের পক্ষ অবলম্বন করে, তবে অচিরে আমাদের কষ্টনিবারণ হইতে পারে। ইহারা অনেক দিন হইতেই অনেকরূপ অন্যায় অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আসিতেছিল, শ্বেতপুঙ্গবগণের petty tyranny দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া আসিতেছিল; আজ তাহারা বড় আশা করিয়া বাঙ্গালী জাতির মুখ চাহিয়া সেই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকার চাহিতেছে। ইহাতে বিদ্রোহিভাব নাই, ইহাও জাতীয়তার স্বাভাবিক স্ফুরণমাত্র। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বাঁধন ছিঁড়িতেছে, অধীনতার শিকলি কাটিতেছে, ত্বরায় জাপানের ন্যায় স্বাধীন হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি ভাষায় টিট্‌কারী করিবারও প্রয়োজন নাই, সরকার বাহাদুরের ডরাইবারও কোনও হেতু নাই। উৎকট কন্‌গ্রেসওয়ালারাও কখনও বলেন নাই যে, তাঁহারা ইংরাজকে দূরীভূত করিয়া দিয়া দেশটাকে স্বাধীন করিতে চাহেন। তাঁহারা কেবল ব্রিটিশশাসনের কলঙ্কস্বরূপ কতকগুলি অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে চাহেন, এবং শাসন, বিচার প্রভৃতি কার্য্যে অধিকতর দেশীয় লোক নিযুক্ত হইয়া নিজেরা নিজের দেশের কাজ করিতে পারে, স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই সকল সংস্কার প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। প্রজার মতে রাজা চলিলে তাহাতে রাজার সিংহাসনের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়, 'broad based upon the people's will,' এ কথা ইংরেজ কবির মুখেই শিখিয়াছি। ইংরেজ এই ভাবে স্বায়ত্তশাসনের ভার দিয়া এ দেশে রাজচক্রবর্ত্তী (suzerain power) হইয়া থাকুন, ইহাই শিক্ষিত ভারতবাসীর কামনা। ভারতবর্ষে যেরূপ নানা জাতি নানা ধর্ম্ম ও নানা ভাষার সমাবেশ, তাহাতে এখানে ইংরেজের ন্যায় নিরপেক্ষ রাজা মাথার উপর না থাকিলে প্রজাবর্গ মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষে দেশ অরাজক হইয়া উঠিবে, দুর্ব্বল জাতি সবলের হস্তে নিগৃহীত হইবে, এমন কি সেই রন্ধ্র দিয়া বহিঃশত্রু পর্য্যন্ত দেশে প্রবেশ করিয়া দেশ কবলিত করিবে, তাহা শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিলক্ষণ বুঝে। ইহা ছাড়া, ইংরেজ এ দেশের রাজা হইয়া বর্ণনির্ব্বিশেষে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশের কল্যাণসাধন করিয়াছেন, এই সুশিক্ষার প্রভাবে অনেক সামাজিক

কুপ্রথা ধীরে ধীরে উৎসাদিত হইতেছে, নানারূপ দেশহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, সাহিত্যচর্চ্চা, সমাজগঠন, ধর্ম্মতত্ত্ব-নিরূপণ প্রভৃতি মহৎ ব্যাপারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহ হইতেছে; ইংরেজ এ দেশ হইতে চলিয়া গেলে, আর্থারের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যে বর্ব্বরতা আসিয়াছিল, সভ্য জাতির সংস্পর্শবিরহিত হইলে আমাদেরও সেই দশা ঘটিবে, তাহা কি আমরা বুঝি না? যাহাতে এই সকল মঙ্গল স্থায়ী হয়, তাহাই আমরা প্রার্থনা করি। স্বায়ত্তশাসনের ভার আমাদের হস্তে দিলেই যে ইংরেজরাজত্ব শিথিল হইল, রাজপুরুষেরা এরূপ ভাবেন কেন? লর্ড মেকলে বাঙ্গালী জাতিকে অনেক গালি দিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষিত ভারতবাসী কোনও দিন স্বায়ত্তশাসনের ভার লইতে পারিবে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেই দিন ইংরেজের গৌরবের দিন হইবে। লর্ড কর্জ্জনও আমাদিগকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে উদ্যোগী ছিলেন। এই প্রভেদটুকু দেখিলে 'কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি শ্লোক মনে পড়ে।

আজ যদি লর্ড মেকলে বা লর্ড রীপণ ভারতে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে, এই স্বদেশী আন্দোলনে, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিপ্রয়াসে তাঁহারা কত না আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন! যাহাতে দেশীয় শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়, দেশীয় শিল্পদ্রব্যের কাট্‌তি হয়, দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, দেশের লোক দু' মুঠা খাইতে পায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা ত গবর্মেণ্টেরই কর্ত্তব্য। তাঁহারা বরাবর মুখে ও কাগজে-কলমে এ কথা বলিয়াও আসিয়াছেন। কিন্তু যখন দেশের লোক সেই দিকে অগ্রসর হইল, তখন তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, গবর্মেণ্ট একেবারে বাঁকিয়া বসিতেছেন। এটা inconsistent নহে কি? তবে কি আমরা বুঝিব, ইংরেজ বণিকের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া ভারতের শিল্পদ্রব্যের উন্নতি করা ইংরেজ গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত নহে? স্বজাতিবাৎসল্য কি রাজধর্ম্মের অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল? গবর্মেণ্ট যদি এই আন্দোলন একটা বৃথা হৈ চৈ মনে করেন, তবে ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেই ত পারেন। আর যদি ইহা প্রকৃত কাজের চেষ্টা মনে করেন, তবে ত উৎসাহ দেওয়াই রাজধর্ম্ম। ইহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ বা ভীত হইবার ত কোনই কারণ

যাক্, গবর্মেণ্টের শাসননীতির সমালোচনা না করিয়া এক্ষণে ঘরের কথা বলা যাউক। এই দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন কি টিকিবে? ইহা ক্ষণিক উত্তেজনা, না চিরস্থায়ী ভাবাবেশ? চারি দিকে যে সব লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে ত বুঝিতেছি, এ আগুণ নিবিবে না। মুটে মজুর জেলিয়া ধোপা জুতা-ক্রুস পর্য্যন্ত এক ভাবে বিভোর হইয়াছে, চাষা ভদ্রের এক সাধারণ-মিলনক্ষেত্র হইয়াছে, বাঙ্গালার ইতিহাসে এমনটি কখনও ঘটে নাই। ইহাতে ত বোধ হয়, বাঙ্গালীর একপ্রাণতা জন্মিয়াছে। যেখানেই দশ জন লোক একত্র হইয়া গল্প গুজব করিতেছে, সেখানেই এই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের কথা, দেশের অভাবমোচনের কথা; পরনিন্দা ছাড়িয়া এখন লোকে দেশের কথা বলিতেছে, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা? ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভুলিয়া এখন সকলে এক হইতেছে। কবির কথায় বলিতে গেলে আজকাল সকলে "ছেড়ে দলাদলি করে গলাগলি, ছেড়ে রেষারেষি করে মেশামেশি।" যাঁহারা কন্‌গ্রেসের গলাবাজিতে বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারাও পূর্ণ উৎসাহে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতেছেন। এই ত ভিতরকার অবস্থা। ইহার উপর ইংলিশম্যান পত্রিকার তীব্র কশাঘাত, ম্যাক্সের মিঠেকড়া উপদেশ ও সরকার বাহাদুরের এইরূপ দুই চারিখানা সার্কুলার চলিতে থাকিলে, বাঙ্গালীর ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হইবে, অত্র সন্দেহো নাস্তি।

শত্রুপক্ষ এই আন্দোলনকে কৃত্রিম বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। এক হিসাবে ধরিতে গেলে আন্দোলনমাত্রই কৃত্রিম। সকল আন্দোলনেই জনকতক মহাপ্রাণ ব্যক্তি দেশের কল্যাণ বা সমাজের কল্যাণসাধন করিতে অগ্রণী হয়েন। তাঁহাদের বাগ্মিতার প্রভাবে ও বিষয়মাহাত্ম্যে সমগ্র দেশ জাগিয়া উঠে। তখন দুর্ব্বল বল পায়, সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্দেহ ধাঁধা দূর হয়, স্বার্থপর লজ্জার খাতিরেও স্বার্থবিসর্জ্জন করে, আত্মসুখতৎপর ব্যক্তি আত্মসুখের মোহ কাটাইয়া দেশের হিতের জন্য ছুটে। একটা প্রবল ভাব যে একেবারে না বলা না কহা সকলের মন হইতেই স্বতঃ উৎসারিত হয়, এরূপ ঘটনা অতি অল্প স্থলেই দেখা যায়। অতএব বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা হইলেই যে আন্দোলম কৃত্রিম হয়, এমন কথা বলা চলে না। আন্দোলনের প্রকৃতি দেখিলেই তাহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম বুঝা যায়। আজকালকার আন্দোলনে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, ইতর, ভদ্র,

লোক কি জনকতক বক্তা ও লেখকের কৌশলে পুঁতুল-নাচের পুঁতুলের ন্যায় নাচিতেছে? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

আন্দোলনের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ নাই। তবে আন্দোলনটি দ্বারা স্থায়ী ফললাভ করিতে হইলে সকলে মিলিয়া সমস্বরে হৈ চৈ করিলে চলিবে না। কার্য্যের বিভাগ (division of labour) চাই; সকলেই সব করিব বলিয়া আস্ফালন করিলে সব পণ্ড হইবে। একেবারে সব কাজে হাত দিলে চলিবে না, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইবে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ-বাক্য আছে,—Rome was not built in a day; আমাদের দেশটাকে আমাদের মত করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে সময় লাগিবে। শনৈঃ পন্থাঃ। একেবারে সব দিকে দেখিতে গেলে কোনও দিকই হইবে না; ইহাকেই ইংরাজীতে বলে too many irons on the fire; ফরাসীবিপ্লবে বার মাসের নাম পর্য্যন্ত বদ্‌লান হইয়াছিল, সেরূপ ঢালিয়া সাজার এক্ষণে সময় হয় নাই। এখন আমাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত অর্থ একটি কাজে লাগাইতে হইবে—কাপড়ের কল ও তাঁত-সংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক সূতা প্রস্তুতের বন্দোবস্ত ও কাপাসের চাষ। ইহাই হইল আমাদের প্রধান অভাব। এই বিষয়ে আমাদিগকে ভিন্নদেশীয়দিগের যেরূপ মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। এই বস্ত্রের অভাব দূর হইলে, অন্নের অভাবও থাকিবে না। আমাদের এখন বুলি হওয়া উচিত, 'গাঁয়ে গাঁয়ে চালাও তাঁত, তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত'। মনে রাখিতে হইবে, স্বদেশী বস্ত্র কিনিব, বিদেশী বস্ত্র কিনিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করা অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু কিরূপে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায়; তাহার উপায়-নির্দ্ধারণ তদপেক্ষা অনেক কঠিন। সস্তায় ও প্রভূতপরিমাণে দেশী কলের ও তাঁতের কাপড় প্রভৃতি সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করা বহুব্যয়সাধ্য ও বহু আয়াসসাধ্য। বাঙ্গালীর ব্যবসায়বুদ্ধি নূতন করিয়া উন্মেষিত করিতে হইবে, অজ্ঞাত ও অনভ্যস্ত কাজে মন দিতে হইবে; এখন এই প্রশ্ন সমাধানেই সকলকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে; অন্য পাঁচটা কাজ লইয়া শক্তি ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিলে এই কঠিন সমস্যার পূরণ হইবে না, ইহা অবধারিত। এ ক্ষেত্রে কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিত্ত, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই একটা সাধারণ কর্ত্তব্য আছে। সকলকেই স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার

ও বিদেশী দ্রব্য (যথাসাধ্য) বর্জ্জন করিতে হইবে, এবং অন্যকে তর্ক যুক্তি দ্বারা, অনুনয়-বিনয়ে, প্রয়োজন হইলে মৃদু ভৎর্সনায়, বর্জ্জন করাইতে হইবে। ইহাতে প্রথম প্রথম হয় ত আর্থিক ক্ষতি হইবে, বিলাসস্পৃহা চরিতার্থ হইবে না। কিন্তু দেশের মুখ তাকাইয়া সেটুকু ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে অধিকারিভেদ নাই। তাহার পর সম্প্রদায়গত কর্ত্তব্য আছে। ধনী সম্প্রদায় কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া সরকার বাহাদুরের মেদবৃদ্ধি না করিয়া, তেলা মাথায় তেল না ঢালিয়া, সেই অর্থে কল কারখানা সংস্থাপন করুন; বিলাতী Capitalist-গণের অনুকরণ করুন, তাহাতে স্বদেশী নামে কলঙ্ক হইবে না। শিল্পি-সম্প্রদায় কুলিগিরি, কেরাণীগিরি বা অন্যরূপ উঞ্ছবৃত্তি ছাড়িয়া পৈত্রিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হউন। কবি ও লেখকগণ গদ্যে পদ্যে গানে গল্পে বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে একটা বিরাট্ সাহিত্য প্রস্তুত করুন, তাহাতে স্বদেশী ভাবের পূর্ণ উদ্দীপনা হউক। ভিখারী বৈষ্ণব গান ও ছড়া গাহিয়া দ্বারে দ্বারে এই জাতীয় ভাবটিকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত, ও ফলিত করুক। গৃহস্থের প্রাঙ্গনদ্বারে, আয়না, চিরুণী, ব্রুস প্রভৃতি সৌখীন জিনিসে, কাপড়ের পাড়ে, রুমালের কোণে, চিঠীর কাগজে খামে, পোষ্টকার্ডে, মুখরোচক মিষ্টান্নে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র অঙ্কিত হউক। এই জাতীয় মহাভাব আমাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জাতে মজ্জাতে, প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে প্রবেশ করুক। আমরা ধন্য হই। *

পরিশেষে, একটি ক্ষুদ্র ইংরেজস্তোত্র পাঠ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। আমরা পৌরাণিক হিন্দু। পৌরাণিক দেবতাদিগের দ্বিবিধ স্বরূপ দেখা যায়। লৌকিক কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিতে হইলে শিব ও কৃষ্ণ লম্পট-শিরোমণি। আবার শাস্ত্রের প্রকৃত বাণী, দেবাদিদেব মহাদেব নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় পরমযোগী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, 'যথা কৃষ্ণ স্তথা ধর্ম্মঃ।' সেইরূপ কলির দেবতা ইংরেজেরও দুই মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তিতে ইংরাজ পশুবলে দৃপ্ত, স্বজাতির গৌরবের বা স্বজাতির বাণিজ্যস্বার্থের জন্য অন্যায় যুদ্ধ ও

* যে সময়ে ষ্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকায় কার্লাইল-সার্কুলারের আভাসমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রবন্ধটি সেই সময়ে রচিত। তাহার পরে পূর্ব্ববঙ্গে (ও খাস বাঙ্গালারও) সরকার বাহাদুর যে প্রকার শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা

নরহত্যাদি অত্যাচার করিয়া পৃথিবীতলে স্বীয় প্রভুত্ববিস্তারে সচেষ্ট। চীনযুদ্ধ ও সেদিনকার বুয়রযুদ্ধ তাঁহার এই তামসিক প্রকৃতির জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অপর মূর্ত্তিতে ইংরেজ বিজিত প্রদেশে লোকশিক্ষা, রাজনৈতিক অধিকার-দান, স্বায়ত্তশাসন প্রচলন, সমাজিক কুপ্রথা-নিবারণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান দ্বারা সভ্যতার আলোকবিস্তারে উৎসাহশীল। এই মূর্ত্তিতে ইংরেজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্যায় যুদ্ধ হইলে দুর্ব্বলের ও নিরীহের সহায়। এই মূর্ত্তিতে ইংরেজ নৃশংস দাসব্যবসায় রহিত করিবার জন্য দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরেজের এই সাত্ত্বিক প্রকৃতি শেক্ষপীয়র, মিল্‌টন, টেনিসন প্রভৃতি মহাকবির কাব্যে, বার্ক, মেকলে প্রভৃতি বাগ্মিগণের ঐতিহাসিক প্রবন্ধে, কার্লাইল, রাস্‌কিন প্রভৃতি মনীষিগণের গম্ভীর রচনায়, স্পেন্‌সার, মিল প্রভৃতি দার্শনিকগণের তত্ত্বগ্রন্থে স্পষ্ট প্রতীয়মান। আমরা ইংরেজের সাহিত্য ইতিহাস পাঠ করিয়া ইংরেজের এই মূর্ত্তি ভালবাসিতে শিখিয়াছি। তাই ভক্তিভরে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, প্রভু, তোমার ব্রড্‌রিক্‌, কর্জ্জন, ফ্রেজার, ফুলার মূর্ত্তি সংবরণ কর, এবং রীপণ, কটন, হিউম, ডিগ্‌বী, কেন, ওয়েডারবর্ণ মূর্ত্তি প্রকট কর, জগৎ তোমার মহিমায় উদ্ভাসিত হউক।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী সাহিত্য।

চীনে দাম্পত্যবিধি।

গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের "লা রিভিউ" নামক সংবাদপত্রে পলডি এঞ্জম নামক জনৈক লেখক, চীনে বিবাহবিধি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারভাগে তিনি বলিয়াছেন, জাপানের বিবাহসংক্রান্ত নিয়মাবলীর সহিত চীনের বিবাহপদ্ধতি ও বিধির সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ।

লেখক উল্লিখিত বন্ধে পত্নী ও পতি-ত্যাগ-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলেন, চীনদেশে স্ত্রী বন্ধ্যা, অসচ্চরিত্রা, ঈর্ষ্যাপরতন্ত্রা, পরনিন্দাপরায়ণা, চৌর্য্যরতা ও পতির জনক-জননীর প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্না হইলে, পতি পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারেন। পরিত্যক্তা পত্নীও স্বেচ্ছামত পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। আদালতে পত্নী ত্যাগ অভিযোগের বিচারকালে

যদি স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের সীমা-লঙ্ঘন বা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ-অবমাননার অভিযোগ হয়, তাহা হইলে, পরিত্যক্তা পত্নী বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার নিকট আবেদন করিতে পারে। শাসনকর্ত্তা সেরূপ স্থলে স্বামীর প্রতি অশীতি-সংখ্যক বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অধিকন্তু স্বামী পত্নীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

দম্পতীর মধ্যে মতের অনৈক্য ঘটিলে, অথবা পরস্পরের হৃদয়ের গতি প্রতিকূল হইলে, উভয়ের সম্মতি-অনুসারে দাম্পত্য-বন্ধনের উচ্ছেদ হইতে পারে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কেহ দাম্পত্য-গৃহাশ্রয় পরিত্যাগ করিলে, পুরুষ বা স্ত্রী, ইচ্ছানুসারে পরস্পরকে পরিত্যাগ করিতে পারে। ধর্ম্মপত্নী স্বামীর আশ্রয়ত্যাগ করিলে, দোষের শাস্তিস্বরূপ তাহাকে এক শত বেত্রদণ্ড সহ্য করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী ইচ্ছা করিলে, পত্নীকে পুনর্গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে পারেন। পতি সেই পরিত্যক্তা পত্নীকে পুনরায় অন্য পুরুষের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিলেও করিতে পারেন। পতি-গৃহ-ত্যাগের পর, এবং স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, কুলত্যাগিনী রমণী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ চীন-বিচারালয়ের আদেশে তাহার ফাঁসী হইয়া থাকে। এরূপ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা চীন দেশে কেবলঃ ব্যভিচারিণী রমণীর প্রতিই প্রযুক্ত হয়।

পতি পত্নীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলে, চীনদেশের বিধান অনুসারে পত্নী তিন বৎসর কাল পতির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই তিন বৎসর কালের মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর যদি কোনও সংবাদই না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, পত্নী পতিকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহাকে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা বা ম্যান্দারিনের অনুমতি লইতে হয়। অতঃপর উক্ত রমণী পুনরায় অপর পুরুষকে স্বামিত্বে বরণ করিতে পারে। স্বামীর নিরুদ্দেশকালের তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে যদি পত্নীও স্বামিগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহাকে অশীতিসংখ্যক বেত্রাঘাত দণ্ড সহ্য করিতে হয়। বিবাহ করিলে তাহার প্রতি এক শত বেত্রদণ্ড প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে, অথবা স্বামীর অঙ্গে প্রহার করিলে, পতি তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য। স্বামীও যদি স্ত্রীকে প্রহার করে, এবং সেই প্রহারজনিত আঘাতে তাহার দেহের কোনও অংশে ক্ষত হয়, বা কোনও চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে, পত্নীও সেরূপ পতিকে পরিত্যাগ করিতে আইনানুসারে বাধ্য।

উদ্বাহ-বন্ধন-ছেদনের পক্ষে কয়েকটি অন্তরায় আছে। যদি পত্নী তিন বৎসর কাল পতির জনকজননীর বিয়োগজনিত শোক-বসন পরিধান করিয়া থাকে, কিংবা দরিদ্র অবস্থায় বিবাহের পর দম্পতীর অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, অথবা যদি স্ত্রীর অন্য কোথাও আশ্রয়স্থল না থাকে, তাহা হইলে, সেরূপ ক্ষেত্রে স্বামী কোনও অপরাধের জন্য পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

জাপানে শ্রম-শিল্প।

"ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাগাজিন" নামক সাময়িক পত্রে শ্রীযুক্ত চার্লস এলবার্টসন্ নামক কোন লেখক, জাপানের বে-সরকারী পোতাশ্রয় (Dock-yard) এবং পোত-নির্ম্মাণোপযোগী বৃক্ষাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে লেখক জাপানী শ্রম-শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি নাগাসাকির সন্নিহিত 'মিটসুবিসি' নামক পোতাশ্রয় (Dock-yard) এবং তত্রত্য কল-কারখানার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উক্ত পোতাশ্রয় ও কারখানার পরিচালকবর্গ বহুসংখ্যক কর্ম্মক্ষম উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী সংগ্রহের জন্য, প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রায় দুই শত ছাত্র উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এক-শত-সংখ্যক শিক্ষানবীশ ব্যতীত প্রতিবৎসর পঞ্চাশটি ছাত্র উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যে কেহ উক্ত বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে পারে। উক্ত কোম্পানীর ব্যয়ে তথায় একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকগণ বিনা-ব্যয়ে উক্ত কারখানার কর্ম্মচারিবর্গের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কোম্পানী কর্ম্মচারীদিগের জন্য পেন্সন ও জীবন-বীমা (Insurance) পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছেন। প্রভু ও ভৃত্য সমান হারে প্রতিমাসে চাঁদা দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর চেষ্টায়, কারখানার সহিত একযোগে একটি সেভিংস্ ব্যাঙ্কও খোলা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কে, টাকার সুদ অন্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিক। কোম্পানীর আয়ের বাৎসরিক লভ্যাংশ হইতে, কর্ম্মচারীদিগকে কিছু কিছু অর্থও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কোবীর সন্নিহিত ইওয়াসাকি পোতাশ্রয় কোম্পানীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক জাপানের ভূতপূর্ব্ব সচিব কাউণ্ট মাটসুকাটার অন্যতম পুত্র মিঃ. কে. মাটসুকাটা। এইরূপ সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর জাপানীরা অধুনা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে জাপানে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত সময়ের পূর্ব্বে কোনও সম্ভ্রান্ত জাপানী ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া গৌরবজনক মনে করিতেন না। অধিকন্তু কেহ ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহাকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে জাপানের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাণিজ্য ব্যবসায় যে যে কোন শ্রেণীর লোকের পক্ষে গৌরবকর, জাপানীরা এখন তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে লিপ্ত হইতেছেন বলিয়া, জাপানের বাণিজ্য-সংক্রান্ত বহু আকাঙ্ক্ষিত ও অতীব প্রয়োজনীয় আদর্শ সংস্থাপিত হইয়াছে।

'ইওয়াসিকি পোতাশ্রয়' কোম্পানী প্রতিবৎসর পর্য্যায়ক্রমে এক এক জন ইঞ্জিনিয়ারকে উৎকৃষ্টতর যন্ত্র নির্ম্মাণ-প্রণালী ও designs শিক্ষাকল্পে আমেরিকা ও ইউরোপে প্রেরণ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর বাণিজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য, তাঁহারা প্রতিবৎসর এইরূপ প্রণালীতে ছাত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিদেশে দেশীয় পণ্যসম্ভার রপ্তানী করিবার জন্য উক্ত কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথম অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রবন্ধ-লেখক ইওকোহামা ডক্ কোম্পানী সম্বন্ধে বলেন, "অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও শ্রমসংক্রান্ত বিষয়ে প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। এখানকার শ্রমজীবীরা অর্থ সম্বন্ধে কোনরূপ অসঙ্গত দাবী করে না; এবং প্রভুকে কোনরূপ অসুবিধায় ফেলিতে চাহে না। তাহারা মনে করে যে, তাহারা উক্ত কোম্পানী ও কর্ম্মচারিবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। বাস্তবিক তাহাদিগের ব্যবহার দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, উক্ত কোম্পানীর একাংশ শ্রমজীবীদিগকে লইয়াই গঠিত হইয়াছে। কার্য্যপরিচালন বিষয়ে শ্রমজীবীরা যেরূপ আত্মগৌরব অনুভব করে, এবং আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের একান্ত পরিশ্রম ও কর্ম্মনিষ্ঠার প্রভাবে যে কোম্পানীর স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কর্ত্তৃপক্ষও শ্রমজীবিগণের প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এমন কি, কারখানার কার্য্য যখন অল্প থাকে, এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে কার্য্যের যখন অভাব ঘটে, তখনও কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে বিদায় দান করেন না। কারণ, একবার তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলে, সহজে তাহাদিগকে আর কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান যায় না। এখানে ও জাপানের অন্যান্য স্থানে এখনও প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত প্রবল। আমাদের দেশের (ইংলণ্ডের) লোকেরা এই পবিত্র সম্বন্ধের গম্ভীরতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

প্রবন্ধ-কার জাপানী শ্রমজীবিকুলের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। জাপানী শ্রমজীবীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। ওসাকার লৌহ-কারখানায় শতকরা ৯০ জনের অধিক শ্রমজীবী কখনও প্রত্যহ উপস্থিত থাকে না। বাকী দশ জন মনে করে, কার্য্যালয়ে তাহাদের উপস্থিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ, কর্ত্তৃপক্ষকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, কেহ অসুস্থ, কাহারও বন্ধু পীড়িত, কেহ হয় ত বন-ভোজনে ব্যস্ত, অথবা পক্ষি-শিকারে প্রবৃত্ত। কেহ বা বাড়ীতে ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছে, কিংবা কেহ হয় ত প্রচুর সংগৃহীত অর্থ ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে ব্যয় করিতে ব্যস্ত; অভাবপক্ষে এমনও মনে করিয়া লইতে হইবে যে, তাহারা দুই এক দিনের জন্য বিশ্রাম করিতেছে, সুতরাং তাহারা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই। প্রত্যহ শতকরা দশ জন অনুপস্থিত থাকিবেই। শ্রমজীবিগণের মনে এমন ধারণা হয় না যে, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোম্পানীর কার্য্যের ক্ষতি করিতেছে। প্রত্যহ যথাসময়ে কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকা যে একান্ত আবশ্যক, জাপানের শ্রমজীবিকুল সে কথা স্বীকার করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। ইংলণ্ডে শ্রমজীবিগণের এরূপ ব্যবহার কেহ সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু জাপানের কথা স্বতন্ত্র।"

ফিরিঙ্গি বণিক্।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজ্যলাভ।

Albuquerque entered at once on those vast schemes of conquest which have made him one of the heroes of Portugal.—*Portuguese Conquests in India.*

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকার্কের জন্ম হয়। তখনও পর্ত্তুগাল পরপদানত নগণ্য দেশ। তাহার পর যে সকল ঘটনাসূত্রে পর্ত্তুগাল ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করিতেছিল, তাহা সমস্তই আল্‌বুকার্কের সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া যে স্বদেশ-প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, পরিণত জীবনে তাহার মাত্রা ক্রমেই বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আসিয়া রাজপ্রতিনিধির উচ্চপদ অধিকার করিবার সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষাট বৎসর হইয়াছিল; তথাপি তিনি উৎসাহে অধ্যবসায়ে ও দৃঢ়নিশ্চয় যুবকগণকে লজ্জা দিতে পারিতেন। তিনি বাণিজ্য অপেক্ষা রাজ্যলাভকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়াছিলেন। স্বহস্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিবামাত্র আল্‌বুকার্ক লক্ষ্যসাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

মালাবারের বিবিধ বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের লুণ্ঠনের প্রতাপে অন্যান্য বণিকের বাণিজ্য-তরণী একরূপ অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল;—তথাপি কালিকটের বন্দর যেন ফিরিঙ্গি বণিকের চিরশত্রুরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আতঙ্ক-সঞ্চার করিতে বিরত হয় নাই। কেবল কালিকট-রাজের ভয়েই ফিরিঙ্গি বণিক এত দূর আতঙ্কযুক্ত হইতেন না। সমগ্র মুসলমানসমাজ কালিকট-রাজের পক্ষভুক্ত হইতে পারেন, এই আতঙ্কই ফিরিঙ্গি বণিককে নিরতিশয় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ আসিতেছে,—ঐ আসিল,—সর্ব্বদা এইরূপ উৎকণ্ঠায় ফিরিঙ্গি বণিক্ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আল্‌বুকার্ক ইহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই ফিরিঙ্গি বীরের মুসলমান-বিদ্বেষ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি ইতিহাসে তাহার যে সকল প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প নহে।

কিন্তু তাঁহার চরিতাখ্যায়ক যে সকল গুপ্ত সংকল্পের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আরও ভয়ঙ্কর! মিশরের মুসলমান সুলতানকে শিক্ষাদান করিবার জন্য, আল্‌বুকার্ক খাল কাটিয়া নীল নদকে লোহিত সাগরে টানিয়া আনিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহাতে সমগ্র মিশর দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইত। সমগ্র মুসলমানসমাজকে শিক্ষাদান করিবার জন্য মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের পবিত্র অস্থি সর্ব্বসমক্ষে ভস্মসাৎ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহার কোনও সংকল্পই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতেই আল্‌বুকার্কের মুসলমান-বিদ্বেষের মাত্রা কত দূর চড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

আল্‌বুকার্কের এই মুসলমান-বিদ্বেষ সেকালের সকল ফিরিঙ্গির সাধারণ-বিদ্বেষরূপে প্রচলিত থাকায়, চরিতাখ্যায়কগণ ইহার উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই। এত কালের সুশিক্ষা ও সভ্যতা এখনও ফিরিঙ্গি-হৃদয় হইতে মুসলমান-বিদ্বেষ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। এখনও নানা কার্য্যে তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

হিন্দু-বিদ্বেষেরও অভাব ছিল না। হিন্দু-মুসলমান একত্র মিলিত হইয়া কালিকট-রাজের সহায়তা করিত, কালিকটের বন্দর তাহাদের প্রধান সম্মিলন-ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং কালিকট-ধ্বংস করাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। জল-যুদ্ধে হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত শক্তি পরাভূত হইয়াছিল; কিন্তু স্থলবর্ত্মে হিন্দুমুসলমানের সমবেত শক্তি অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে বর্ত্তমান ছিল। আল্‌বুকার্ক সেই শক্তি চূর্ণ করিবার আশায় রাজ্য-লাভার্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই কালিকট আক্রান্ত হইল! ফিরিঙ্গি বণিক নগর দাহ করিয়া রাজপথ অধিকার করিলেন। তখন হিন্দু-মুসলমানগণ রাজ-

---

* "There are two actions suggested by the magnanimity of his heart which he determined to perform. One was to divert the channel of the Nile to the Red Sea and prevent it from running through Egypt, there by to render the lands of the Grand Turk sterile; the other to carry away from Meca the bones of the abominable Mafoma (Mahammad) that there being reduced publicly to ashes, the votaries of so foul a sect might be confounded.—*Machado.*

প্রাসাদে সমবেত হইয়া, প্রবলপ্রতাপে ফিরিঙ্গিগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা সে বীর-প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, অর্ণবপোতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। প্রথম পরাজয়ের অবসাদে আল্‌বুকার্ক আপাততঃ কালিকট পরিত্যাগ করিয়া, অন্য কোনও স্থানে রাজধানী সংস্থাপিত করিবার জন্য স্থানান্বেষণে নিযুক্ত হইলেন।

স্থান মিলিল। এক জন ভারতীয় জল-দস্যু স্থান দেখাইয়া দিল। তাহা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। সেই দ্বীপে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, আদিল শাহ নামক নরপতি রাজত্ব করিতেন। আল্‌বুকার্ক ১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই ক্ষুদ্র দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। হিন্দু মুসলমান ও পারসীক নাগরিকগণ সে আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করায়, আল্‌বুকার্ক সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিল শাহ মে মাসে পুনরায় নগর অধিকার করায়, যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ছয় মাসের যুদ্ধে নগর ও দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ হইয়া গেল; ফিরিঙ্গি বণিক পুনরায় নগর অধিকার করিলেন। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহা পর্ত্তুগীজ-রাজধানী গোয়া-নগরী নামে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

ফিরিঙ্গি বণিকের ভারত-বাণিজ্যের রাজধানী শীঘ্রই সুদৃঢ় দুর্গে বেষ্টিত হইয়া ধনরত্নে সম্পন্ন হইয়া উঠিল। এই রাজধানীতে রাজ-কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়া, রাজপ্রতিনিধি আল্‌বুকার্ক রাজ্যশাসন ও বাণিজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন।

লোহিতসাগর ও পারস্যোপসাগর মুসলমান-বাণিজ্যের আশ্রয়স্থল। এই উভয় সাগর-পথের প্রবেশদ্বারে মুসলমানগণ দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য-রক্ষা করিতেন। সে বাণিজ্য কেবল ভারত-বাণিজ্য নহে,—তাহার প্রকৃত নাম প্রাচ্য-বাণিজ্য। সুদূর জাপান, চীন ও প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইত, তাহাও এই পথে মিশর ও পারস্য দেশে আনীত হইয়া, ভূমধ্য-সাগরপথে ইউরোপের নানা স্থানে প্রেরিত হইত। আল্‌বুকার্ক এই চিরপ্রচলিত বাণিজ্যপ্রবাহের গতি উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে আকর্ষণ করিয়া সমগ্র প্রাচ্য-বাণিজ্যে ফিরিঙ্গি বণিকের একাধিপত্য সংস্থাপিত করিবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

লোহিতসাগরের প্রবেশদ্বারের এ'ডন ও অরমজ নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-দুর্গ আক্রান্ত হইল। অরমজ পরাভূত হইয়া ফিরিঙ্গি-দুর্গে পরিণত হইল;

এডেন বিধ্বস্ত হইয়া গেল! পারস্যোপসাগরের প্রবেশপথেও ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

মুসলমানগণ সুদূর প্রাচ্যদ্বীপাবলী হইতে যে পণ্যভাণ্ডার সংগৃহীত করিতেন, ফিরিঙ্গি বণিক তাহা হস্তগত করিবার জন্য ভারতসাগরে দস্যুবৃত্তি করিতেন। আল্‌বুকার্ক সেই সকল প্রাচ্যদ্বীপের আবিষ্কার ও অধিকার-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালাক্কা দ্বীপে পূর্ব্বেই ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সুলতানের মুসলমান প্রজাবর্গের তাড়নায়, পর্ত্তুগীজ নৌসেনাপতি কুঠিয়ালগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আল্‌বুকার্ক স্বয়ং কুঠিয়ালগণের উদ্ধারসাধন করিবার আশায় মালাক্কা দ্বীপে উপনীত হইলেন।

মালাক্কা পরাভূত হইল। তদ্দেশে ফিরিঙ্গির দুর্গ নির্ম্মিত হইল; শাসন-ভার ফিরিঙ্গিহস্তেই নিপতিত হইল। এইরূপে সমগ্র ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাধান্যই প্রবল হইয়া উঠিল। মালয় উপদ্বীপের নিকট দিয়া অন্য কাহারও পক্ষে প্রাচ্য-বাণিজ্যে অগ্রসর হইবার উপায় রহিল না; মালাবারের উপকূলেও অন্য কাহারও আধিপত্য বিস্তার করিবার সম্ভাবনা রহিল না। যাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে এই সকল বাণিজ্য-বন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য-বাণিজ্যে জীবিকার্জ্জন করিত, যাহাদের বিভবচ্ছটায় ইউরোপের সুসম্পন্ন জনপদ সকল বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিত, তাহারা প্রভুত্ব হারাইয়া দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল! ফিরিঙ্গি বণিকের জন্য পণ্য সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই গোয়া নগরীর ফিরিঙ্গি-রাজধানীকে প্রাচ্য-বাণিজ্যের প্রধান বন্দরে পরিণত করিতে লাগিল। যাহারা ফিরিঙ্গি বণিকের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাহাদের আশ্রয়ে বাণিজ্য করিতে অসম্মত হইল, তাহাদের বাণিজ্য-পোত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

অতি অল্পকালের মধ্যে ফিরিঙ্গি বণিক যেরূপ প্রবলপ্রতাপে প্রাচ্য-বাণিজ্যের ভাগ্যবিপর্য্যয় সাধিত করিয়া, জলে স্থলে ফিরিঙ্গির নাম সুপরিচিত করিয়া তুলিলেন, তাহা উপন্যাস-কাহিনীর ন্যায় বিস্ময়াবহ বলিয়াই বোধ হয়। ইতিহাসের অনেক কথা উপন্যাসের ন্যায় বিস্ময়কর বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। উপন্যাসের কাহিনী কল্পনাপ্রসূত বলিয়া তাহার মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা আবিষ্কৃত হয় না। ইতিহাসের কাহিনী প্রকৃত বলিয়া তাহার মধ্যে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই

পার্থক্য না থাকিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের রাজ্যলাভ-কাহিনীকে উপন্যাস বলিলে অত্যুক্তি হইত না!

সে সংঘর্ষে প্রাচ্য প্রতীচ্যের পুরাতন সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সমগ্র ইউরোপ সম্মিলিত শক্তিতে লিপ্ত হইলেও, বিস্ময়ের অভাব থাকিত না। পর্ত্তুগালের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের চেষ্টায় তাহা অতি অল্পকালে সুসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বিস্ময় আরও অধিক হইয়া রহিয়াছে।

তথাপি ভারত-বাণিজ্যে পুরাতত্ত্বের অলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বিস্ময় বিদূরিত হইয়া যায়। যাহারা সত্যনিষ্ঠাকেই বাণিজ্যের একমাত্র সহায় বলিয়া জানিত, যাহারা বাহুবলের কথা বিস্মৃত হইয়া কর্ম্মবলকেই বাণিজ্য ব্যাপারের প্রধান বল বলিয়া বুঝিত, যাহারা দস্যুবৃত্তিকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিত, তাহারা ফিরিঙ্গি বণিকের মত অশান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ ছিল না! প্রাচ্যশক্তি বিচ্ছিন্নভাবে বিবিধ স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল; প্রতীচ্য-শক্তি একত্র সংহত হইয়া আঘাত করিবামাত্র বিচ্ছিন্ন প্রাচ্যশক্তি একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্তের "মাতৃভূমির প্রতি" নামক কবিতাটির "শাণিত বিপদরাশি উদাত স্বাধীন ঘুরে ভদ্রবেশে" প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার রচনারীতির অনুগত নয়, বুঝিবারও কোনও উপায় দেখিতেছি না। লেখকের শব্দচয়ন প্রশংসনীয়। কিন্তু শব্দবিন্যাস ভাব প্রকাশ করিবার জন্য, ভাব প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক। "জননীর অদ্বৈত আলয়" কি? "চিনিব তোমায়—ভুলিব না আর বিমাতায়!" এই দুই চরণের অর্থ কোনও মতে বোধগম্য হইবার নহে। মাকে বিমাতা বলিয়া আর ভ্রম করিব না, এই অর্থই যদি কবির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। রচনায় লেখকের শক্তির পরিচয় আছে, সেই শক্তির বিকাশের আশায় তাঁহার দোষনির্দ্দেশ করিলাম। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "নির্বাসিত" নামক ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটি চলনসই। কিন্তু ইহার আখ্যানবস্তু ক্ষুদ্র গল্পের অনুকূল নহে। বিশেষতঃ, লেখক অতিবিস্তৃতিদোষে দুষ্ট করিয়া রচনাটির সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছেন। বোধ করি, সংক্ষিপ্ত হইলে অধিকতর মনোরম

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "তিব্বত দেশের বজ্রভৈরব" প্রবন্ধে বজ্রভৈরব নামক তিব্বতী দেবতার ইতিহাস তিন পৃষ্ঠার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর "সুখ" নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। "অমঙ্গল" নামক লেখকের নামহীন প্রবন্ধটি উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "জীবন-অভিনয়" ক্ষুদ্র গল্প তিন পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে, এ জন্য আমরা রচয়িত্রীর নিকট কৃতজ্ঞ। নমুনা,—"জনার্দ্দন তাহার নয়নের অনলাশ্রুরাশি অঙ্গুলি দ্বারা সজোরে ভূমিনিক্ষিপ্ত করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।" জনার্দ্দনের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য প্রশংসার যোগ্য,—তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। "অনলাশ্রু"স্পর্শে আঙ্গুল পুড়িয়া গেলে অনেককেই "আঁউ মাঁউ" করিতে হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনার্দ্দন কি না আগ্নেয়গিরি, তাই "নিস্তব্ধে" দাঁড়াইয়াছিল! শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মহানাটক" সমান চলিতেছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "ঘরের কথা" সুখপাঠ্য। লেখকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি অতুলনীয়। বলিবার প্রণালী সহজ, স্বাভাবিক,—নূতন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের "ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার" নামক সময়োপযোগী ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য-পাঠ্য। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর "বয়কট এবং স্বদেশীয়তা" কাজের কথায় পূর্ণ, চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

উদ্বোধন। আশ্বিন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মনের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত" ভক্তগণের প্রীতিপ্রদ হইবে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষের "বঙ্গে অকালমৃত্যু ও প্রতীকারের উপায়" প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। যিনি পড়িবেন, তিনি উপকৃত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত স্বামী অখণ্ডানন্দের "তিব্বতে তিন বৎসর" পূর্ব্ববৎ রমণীয় হইতেছে। স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের "আগমনী" উল্লেখযোগ্য। আগমনী যে যুগের গান, সে যুগ কালসাগরে বিলীন হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের গানে সেকালের হিন্দুর মনের ছবি মুদ্রিত রহিল। এ কালের সহিত তাহার কত প্রভেদ!

বঙ্গদর্শন। আশ্বিন। এবারকার বঙ্গদর্শনের প্রথমেই সম্পাদকের "সোনার বাংলা" নামক বঙ্গবিশ্রুত গানটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই গানটি মুদ্রিত ও লক্ষ কণ্ঠে গীত হইয়াছে। এখনও বঙ্গের কুটীরে প্রাসাদে "সোনার বাংলা" প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এ হিসাবে গানটি সার্থক। রবীন্দ্র বাবু ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অসংখ্য 'লিরিক' ও গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু "সোনার বাংলা"র মত আর কিছু এমন সার্থক হয় নাই, তাহা সাহস করিয়া বলা যায়। একবার দেশের ঘোর দুর্দ্দিনে ধীরাজ গাহিয়াছিলেন,—

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কল্লে ছারখার।"

আজ আবার বাঙ্গালীর মাকে মনে পড়িয়াছে, তাই মাতৃভক্ত কবির বীণায় "সোনার বাংলার" ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। নীলকরের 'শ্যামচাঁদ' আর গুর্খার গুঁতায় প্রভেদ আছে। 'শ্যামচাঁদ' ব্যক্তিগত অত্যাচারের নিদর্শন, প্রকৃতির কঠোর নিয়মে আজ শ্যামচাঁদ নামশেষ,—নিরীহ প্রজার বুকের রক্তে যে নীলের চারা বাঙ্গালার ধানের ক্ষেতে গজাইয়া উঠিয়াছিল, জর্ম্মনীর

"নীলদর্পণে" মানবের দানবতার ছবি রাখিয়া নীল ও নীলকর বাঙ্গলা হইতে বিদায় লইয়াছে; কিন্তু হায়, বাঙ্গালীর সেই দুর্দ্দিন আজ লক্ষ গুণ প্রবল হইয়া বাঙ্গলা-গ্রাসে সমুদ্যত। সেবার মুষ্টিমেয় ইংরেজের স্বার্থপরতায় বাঙ্গলার প্রজা প্রায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল;—কিন্তু এবার? বিশাল ব্রিটিশ-রাজের বিরাট বাণিজ্য,—সমগ্র রাজশক্তি ও লক্ষ লক্ষ বন্দুক ও বেয়নেট যাহার সহায়,—তাহার স্বার্থের প্রতিকূলে প্রজার স্বার্থ। তখন রাজাই বাঙ্গালার প্রজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন ভাগ্যবিপর্য্যয়ে রাজশক্তি আমাদের প্রতিকূল। এখন স্বাবলম্বন আমাদের একমাত্র সহায়। তখনকার বাঙ্গালীর 'জান' ছিল,—আর এখন?—হায় তোরাপ! হায় নবীন-মাধব! তবে এখন নিরুপায় বাঙ্গালী! গাও বন্দে মাতরম্! গাও সোনার বাংলা! মৃন্ময়ী জননীর শতরূপ ধ্যান কর,—বিচার বিতর্ক এখন থাক।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "রামায়ণের রচনাকাল" প্রবন্ধে এবার "শব্দবিচারে" প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যিনি "আর্ট কাহাকে বলে" সঙ্কলন করিয়াছেন, তিনি নাম প্রকাশ করেন নাই। ফিরিঙ্গী বাঙ্গলার ব্যূহ যদি কেহ ভেদ করিতে পারেন, তিনি পরিশ্রমের পুরস্কার লাভ করিতে পারেন। বিশ্ববিখ্যাত টলষ্টয়ের আর্ট-সম্বন্ধীয় অভিমত সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য বাঙ্গালায় লিখিলে আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ হইতাম। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ত্রিবঙ্কুর ও কোচিন" সুখপাঠ্য, রমণীয় চিত্র। লোটীর শব্দচিত্র চমৎকার! যেমন পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, তেমনই সৌন্দর্য্যদৃষ্টি; যেমন সর্ব্বোভৌমিকতা, তেমনই সমবেদনা। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু লোটীর "ভারত-ভ্রমণ" বাঙ্গালায় সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; "আগমন" শীর্ষক কবিতায় লেখকের নাম নাই,—কিন্তু চিরপরিচিত কবির বীণার ঝঙ্কার প্রচ্ছন্ন থাকিবার নহে। "আগমন" উপভোগের যোগ্য। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "রাজা ও প্রজা" নামক সুচিন্তিত সুলিখিত প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনাকে এই জন্য এখন অন্তর্মুখীন হইতে হইবে। ইংরেজের অনুকম্পার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে এখন আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।" "অবস্থা ও ব্যবস্থা" সম্পাদকের রচিত একটি সুদীর্ঘ ব্যবস্থা। রবীন্দ্র বাবু এই সকল কথাই পুনঃপুনঃ বলিতেছেন। অবস্থাও বেশ বুঝিয়াছি, ব্যবস্থাও দেখিতেছি, কিন্তু অবস্থা ও ব্যবস্থার সামঞ্জস্য দেশের পোড়া কপালে ঘটিয়া উঠে কই? দুঃখের বিষয়, আমাদের "সোনার বাংলা"র উপদেষ্টার যেমন প্রাচুর্য্য, উপদেশ শুনিবার লোকের তেমনই অভাব। তাই উপদেশ শুনিতে শুনিতে বারংবার "সদ্ভাবশতকে"র সেই দুটি চরণ মনে পড়ে,—

"উপদেষ্টা কোথা বল আছে হে এমন,
আপনার উপদেশ যে করে গ্রহণ?"

ইস্‌লামে বৌদ্ধ-প্রভাব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

[১৫শ ভাগ ৩৮৭ পৃষ্ঠার পর হইতে]

এই ৮ম শতাব্দী হইতেই নানাজাতীয় লোকের সহিত সংঘর্ষ হেতু ইস্‌লামগণ রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-রাজ্যের পরিধি-বিস্তার করিতে আরম্ভ করিতেছিলেন। কিন্তু তৎকালে রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনে ইউরোপের জ্ঞানগরিমা ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন ওজস্বিনী ভাষায় তদানীন্তন ইউরোপের দুর্দ্দশার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক ও পরিব্রাজকগণ চীন হইতে তাতার পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হন নাই, এবং ভারতেও তখন বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব হয় নাই। এই সময়ে চীন-পরিব্রাজকগণ মোঙ্গোলিয়ার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে যাতায়াত করিতেছিলেন।

আব্বাসাইড-বংশীয় খলিফাগণ বোগ্‌দাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া শিক্ষা সভ্যতার উৎকর্ষসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। মুসলমান বণিক্‌গণ ভারতবর্ষজাত বিবিধ বিলাসোপকরণ লইয়া বোগ্‌দাদে বিক্রয় করিতে লাগিল। ভারতীয় শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া খলিফাগণ ভারতের প্রতি ক্রমশঃ অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। বাণিজ্যব্যপদেশেই ভারতের সহিত খলিফাগণের প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ হইয়াছিল।

বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লাম-রাজধানী বোগ্‌দাদ ক্রমে ক্রমে শিক্ষা সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। শিক্ষাবিস্তার দ্বারা যুক্তিবাদী বিদ্বদ্‌বর্গের ধর্ম্মান্ধতা শিথিলভাবাপন্ন হইতে লাগিল। তখন বোগ্‌দাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের প্রভূত প্রভাব। প্রচলিত ইস্‌লামধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবলবেগে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ক্রমে "জিন্দিক" (Zindik) গণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ কিছু বিচলিত হইলেন। যাঁহারা বৌদ্ধ-সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনা করিতেন, তাঁহারাই "জিন্দিক" নামে অভিহিত হইতেন। কারণ, "জুহ্‌দ" (Zuhd) শব্দ হইতে "জিন্দিক" শব্দ ব্যুৎপন্ন। "জুহ্‌দ" অর্থে নির্ব্বাণ। অর্থাৎ, বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণমতাবলম্বী মুসল-

মানিগণ গোঁড়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক "জিন্দিক" বলিয়া কথিত হইতেন। তদানীন্তন আরবী সাহিত্যে "বিলাহর-ভা বুদাসিফ" ও "কিতাব অল্-বুদ" ("Bila-hauhva-Budasif" and "Kitab-al-Bud") প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক বৌদ্ধ-প্রাধান্যের পরিচয় প্রদান করে। জিন্দিকদিগের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মান্ধতার সংকীর্ণ সীমায় পরিমার্জ্জিতবুদ্ধি যুক্তিবাদী মুসলমান দার্শনিকগণ আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। একদিষ্ট মুসলমানগণ ধর্ম্ম বিষয়ে নির্ব্বাণরূপ শান্ত ভাবের ঘোর বিরোধী। প্রবলভাবে পরধর্ম্ম-আক্রমণ ও তরবারির সাহায্যে স্বীয় ধর্ম্মের সংস্থাপনকেই তাঁহারা মহম্মদীয় উপদেশের মূল সূত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। স্বর্গের প্রলোভন তাঁহাদিগকে কঠোর কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া থাকে।

কিন্তু বোগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত বিদ্বদ্‌বর্গ বুদ্ধ দেবের নির্ব্বাণ-মতে মুগ্ধ হইলেন। ইস্‌লাম-স্বর্গের মনোমোহন উজ্জ্বল দৃশ্যপট তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হইল না। ইহাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ সীমা সত্যের স্বাভাবিক স্রোতকে সংরুদ্ধ করিতে পারিল না। উদীয়মান বৌদ্ধপ্রভাবে সাধারণের চিন্তাস্রোতও ক্রমশঃ একটু উদারতর হইয়া উদ্বেলিত হইল। বিধাতার ইচ্ছায় শুভক্ষণে উদারহৃদয় হারুণ উল্‌রসীদ বোগ্‌দাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার শাসনকাল ও তৎপরবর্ত্তী অল্‌মামুনের রাজত্বকালকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। ভারতের বিক্রমাদিত্য, গ্রীসের পেরিক্লিস্, রোমের অগষ্টস্ ও ইংলণ্ডের এলিজাবেথের রাজত্ব-কালের সহিত ইহাঁদের রাজত্বের সাহিত্যোন্নতি স্পর্দ্ধা করিতে পারে। বৌদ্ধযুগের তক্ষশিলা, নালন্দা বা বিক্রমশিলার অনুকরণে বোগদাদে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই বিদ্যায়তনে পারসীক, খৃষ্টান, য়িহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান,—সকলেই সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে একাসনে বসিয়া অধ্যাপকের নিকট জ্ঞান ও ধর্ম্মের উদার উপদেশ শ্রবণ করিতেন। এই সার্ব্বজনীন উদারতাস্রোতে ইস্‌লামরমণীগণের অবরোধপ্রথা বিদূরিত হইয়াছিল।

খলিফাগণের এই উদারনীতিক শাসনকালে সাহিত্য ও দর্শন যুগপৎ পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল, এবং বুদ্ধদেবের অলৌকিক কাহিনী চিন্তাশীল সহৃদয় মুসলমান বিদ্বদ্‌বৃন্দের অন্তঃকরণে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়রসের সঞ্চার

করিয়া দিল। কবিগণও হৃদয়ের সংরুদ্ধ উচ্ছ্বাসের উৎস খুলিয়া দিলেন। এই রূপে প্রচলিত ধর্ম্মবিরোধিদলের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সলি-বেন-আব্‌দুল্‌-কুদ্দুস নামক এক জন তাৎকালিক কবির কবিতায় নিম্নলিখিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়,—

"কত শত মক্কাযাত্রী বিনষ্ট হইল?
বিধাতা মক্কার ধ্বংস সাধন করুন।
মক্কাবাসিগণ যেন অনাহারে প্রাণত্যাগ করে,
এবং তাহাদের মৃতদেহ চিতানলে দগ্ধ হউক।"

এইরূপ স্বাধীন চিন্তার উদ্দাম উচ্ছ্বাসে যাঁহারা স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহারা নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। প্রসিদ্ধ আবুল-আতাহিয়া নির্ভয়ে কোরাণ-বিরুদ্ধ মতের প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাধীন-চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থাবলী রুসো ও ভল্টেয়ারের গ্রন্থানুস্যূত ভাবের সহিত সমসুরবদ্ধ। তিনি বুদ্ধের এক জন অনুরক্ত উপাসক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্রে গঠিত। তিনি এক স্থলে শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন,—"যদি তোমরা মনুষ্যের মধ্যে মহত্তম আদর্শ দেখিতে চাও, তবে ভিক্ষুবেশপরিহিত রাজপুত্র বুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। তিনিই মনুষ্যের পবিত্রতম আদর্শ।"

আবুল আতাহিয়ার এই শিক্ষায় ও স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত গ্রন্থনিচয়ে ইস্‌লামসমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। একদিষ্ট মুসলমানগণ চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। আতাহিয়ার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইল। বিচারে তিনি কারারুদ্ধ হইলেন, এবং ৮২৮ খৃঃ কারাগৃহেই প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বুদ্ধের অলৌকিক মহিমার প্রচারে বিরত হইলেন না। তিনিও অবিলম্বে কারারুদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ ইস্‌লামসমাজের অজ্ঞাতসারে লোকলোচনের অগোচরে আতাহিয়ার শিক্ষাবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে অচিরকালমধ্যে ইস্‌লাম-চিন্তারাজ্য উদারতা ও সার্ব্বজনিকতার ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উদারহৃদয় সম্রাট্ হারুণ উল্‌-রসীদ সেই সাধারণ চিন্তার প্রজ্বলিতানলে উৎসাহের ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন। বোগ্‌দাদে শিক্ষা সভ্যতার নবযুগ জাগিয়া উঠিল। প্রতি মস্‌জিদে ভারতীয় সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অনুকরণে

হিন্দু অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করিলেন। অনেক ব্রাহ্মণও ইস্‌লাম-রাজধানী বোগ্‌দাদে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর (ব্রহ্মত্র ?) ভূমি পাইয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যের অমূল্যসম্পৎ জ্ঞানপিপাসু মুসলমানকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন মুসলমানের প্রতি ভারতবাসীর বিদ্বেষ জন্মিবার হেতু উপস্থিত হয় নাই। তখনকার মুসলমানগণ "বকর" শব্দের বৃহৎ পশু এই বিকৃত অর্থ উদ্ভাবন করিয়া গোবধ করিতেন না।

নবপ্রবর্ত্তিত বোগ্‌দাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দিগ্দেশ হইতে ছাত্রগণ সমাগত হইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। চীন, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, স্পেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ বোগ্‌দাদে আসিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে ওমায়দ-বংশীয় আবদর রহমান্ স্পেন দেশে বিস্তীর্ণ ইস্‌লাম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। স্পেনের অন্তর্গত কর্ডোবা নগরে গ্রীক-দর্শন ও বোগ্‌দাদে হিন্দু দর্শনসমূহ আরবী-ভাষায় অনুবাদিত হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি ভারতীয় বিজ্ঞান সকলের অনুবাদ হইল। আবদুল্ ওয়ালিদ্ (Abdul walid), মহম্মদ ইব্‌ন-আক্‌মেদ, (Mahammad Ibn Achmed) এবং ইব্‌ন রোস্‌দ (Ibn Roschd) য়্যাভারোস্ (Averroes) নামে খ্যাত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিষ্টটলের সমগ্র গ্রন্থাবলী বিস্তৃত টীকা টিপ্পনীর সহিত অনুবাদ করিলেন। বেন্‌জেদ (Benzaid) ও আবুল মন্দের (Abul Mander) ইস্‌লাম-সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত লিখিলেন। গ্রাণাডার প্রসিদ্ধ মহম্মদ-আবু-আবদাল্লার বিদ্যোৎসাহিতায় আরবী ভাষার "এন্‌সাইক্লোপীডিয়া" সঙ্কলিত হইতে লাগিল। ইব্‌ন-এল্-বেইদার্ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। অল্‌রসি ও আবিসেন্না দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি করিতে লাগিলেন। অল্ গেজেল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গ্রীক ও লাটিন ভাষার সারগর্ভ গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ করিলেন। কাব্য-শাস্ত্রেরও আলোচনা হইতে লাগিল। সুদূর স্পেনেও ভারতীয় গ্রন্থাবলী অনুবাদিত হইল। এবম্প্রকারে ইস্‌লামসাম্রাজ্য মানসিক উন্নতির সঙ্কীর্ণ সীমা পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্নতির পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত 'য়্যাভারোস্' মত ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণবাদের সহিত একী-

ত্যাগ করিয়া এই নূতন মত গ্রহণ করিতে লাগিল। জন্ উইলিয়াম্ ড্রেপার বলিয়াছেন যে, ভারতীয় গ্রন্থাবলীর আলোচনা হইতেই ইস্‌লামসমাজে এই বিদ্যা-বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে য়্যাভারোগণের মৃত্যুর পরে আরবী ভাষায় দার্শনিক চিন্তার স্বাধীন-উৎস এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং কোরাণের নিয়মনিগড় ধীরে ধীরে লোক-হৃদয়কে বদ্ধ করিতে লাগিল। ইউবারওয়েগ্ বলেন যে, য়্যাভারোগণ কোরাণ-বিরুদ্ধ মতের প্রচারের জন্য লুসেনায় (Lucena) নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। লক্‌হার্ট বলেন যে, একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক ভারতলুণ্ঠনের পরে ও সুপ্রসিদ্ধ অল্‌বেরুণীর ভারত হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতেই ইস্‌লামসাম্রাজ্যে বৌদ্ধ-মতের আধিক্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। * গোল্ডজিহের বলেন যে, মামুদের ভারতাক্রমণসময়ে অনেক মুসলমান পণ্ডিত ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এলিয়টের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিজেতা ইস্‌লামবীরগণ পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ঐতিহাসিক, কেহ ধর্ম্মযাজক, ও কেহ বা দার্শনিক থাকিতেন। এই সমস্ত লেখকগণের উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠ করিলে তদানীন্তন ভারতীয় ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

মামুদ সৈন্য সামন্তের সহিত যৎকালে দেবালয় মধ্যস্থ যুগ-যুগান্তসঞ্চিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মণিমাণিক্যরত্নরাজিসংগ্রহে ব্যস্ত থাকিতেন, তৎকালে, তাঁহার সহযোগী বিদ্বদ্‌বর্গ সরস্বতীর অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দুই একটি মণিমুক্তা সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহারা মথুরা ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি নগরীর শিল্পনৈপুণ্যালঙ্কৃত বিচিত্র মর্ম্মর-প্রস্তরগ্রথিত অম্বরচুম্বী মন্দিরনিচয় অবলোকন করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস সংরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। মন্দির-মধ্যস্থ গ্রন্থরাজি, পুরোহিতবর্গ ও এমন কি নর্ত্তকীগণ পর্য্যন্ত ইস্‌লামরাজ্যে নীত হইয়াছিলেন।

তৎকালে বৌদ্ধভিক্ষুগণ বাক্‌ট্রিয়ার রাজধানী বাল্ক বা প্রাচীন বাহ্লীকে দলে দলে অবস্থান করিতেন। এই স্থানেই আবার তাঁহাদের অনুকরণে-

* এ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মত,—"Al-Beiruni travelled into India lived among the Hindus, studied their language, their sciences; there literature, their customs and manners, their law, their philosophy, and ..."

মুসলমান দরবেশগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা ভিক্ষুধর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারাই ইস্‌লাম-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিচরণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতেন।

বোগ্‌দাদে যাঁহারা আতাহিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা পরে প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রীকনীতি অপেক্ষা বৌদ্ধনীতির সমধিক সমাদর করিতেন। ইহাঁদের গ্রন্থাবলীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি সুস্পষ্টরূপে চিনিতে পারা যায়।

আতাহিয়ার পরবর্ত্তী স্বাধীন চিন্তাশীল মনীষীদিগের মধ্যে আবুল্‌-আল্‌-অল্‌-মাররি (Abul-ala al-Ma'arari) সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। তিনি নির্ভীকহৃদয়ে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের মূল-সূত্র (Dogma) সকলের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মাধ্যক্ষ-গণের নির্দ্দয়ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালীকে অত্যাচার ও অন্যায়াশ্রাত বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মানসিকবৃত্তির উৎকর্ষ ও বিবেক ধর্ম্মজীবনের দুইটি প্রধান স্তম্ভ। তিনিই নির্ব্বাণমুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ১০৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। বর্ত্তমানকালে তাঁহার গ্রন্থের কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে। অধ্যাপক মার্গোলিউথ (Prof Margoliouth) ও মিঃ রেণল্ড এ. নিকল্‌সন (Mr. Reynold A. Nicholson) রয়্যাল-এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় মাররির অনেক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আল্‌ফ্রেড্‌ ক্রেমার * ভিয়েনা একাডেমীর পত্রিকায় যে সারগর্ভ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাররি প্রত্যহ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। কোন প্রকার জান্তব-খাদ্য তিনি স্পর্শ করিতেন না। এ বিষয়ে তিনি হিন্দু ব্রহ্মচারীদিগকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। কারণ, ব্রাহ্মণগণ ঘৃত দুগ্ধকে নিরামিষ ও সাত্ত্বিক খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু মাররি জান্তব-খাদ্য বলিয়া ঘৃত, দুগ্ধ ও মধু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না। আল্‌ফ্রেড ক্রেমার বলেন, মাররি একজন আদর্শ বুদ্ধ ছিলেন। নির্ব্বাণই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মাররির ধর্ম্মজীবনের এই অলৌকিক আদর্শে তাৎকালিক মুসলমানসমাজ চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার উপদেশাবলী ধীরে ধীরে লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

এইরূপে সুফি সম্প্রদায়ের অঙ্কুর হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী সুফি-মত হইতেই ইস্‌লামসমাজের কঠোরতা (rigid dogmatism) বহুলপরিমাণে তিরোহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, সাধারণে কোরাণনিবদ্ধ ব্যবস্থা-পালন অপেক্ষা হৃদয় ও মনের ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে অগ্রসর হইল।

সুফিগণ কোরাণোল্লিখিত ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহারের সম্যক্ অনুষ্ঠান অপেক্ষা, হৃদয়ের ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বাহ্যশুদ্ধি অপেক্ষা আন্তরিক শুদ্ধির জন্য অধিকতর যত্নপরায়ণ হইলেন। এই প্রকার নৈসর্গিক ভাবের প্রবর্ত্তনে ইস্‌লামসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উদার হইয়া উঠিল।

এইরূপে ইস্‌লামসমাজের প্রচলিত প্রথাপদ্ধতি ও কোরাণনিবদ্ধ বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুইটি প্রতিক্রিয়মাণ প্রবাহের সৃষ্টি হইল; তাহাতে মুসলমানধর্ম্মের মূলস্রোত অনেক পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথম প্রবাহ জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের যুক্তিতর্কপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব; দ্বিতীয় প্রবাহ, আধ্যাত্মিকতা-পূর্ণ ভক্তিবাদ। অর্থাৎ, জ্ঞান ও ভক্তি ইস্‌লামসমাজে প্রবেশ করিল। ইস্‌লামগণ যে কঠোর কর্ম্মবাদের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আপনাদের অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত জাতীয়কেতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন,—সেই কর্ম্মবাদ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। হিন্দুদর্শনের চিন্তাধারা, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিসূত্র ও গ্রীকদর্শনের তত্ত্ব সকল ইস্‌লামের জ্ঞানরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এই বিপ্লবের সৃষ্টি করিল। একেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকী প্রীতির অজ্ঞেয়বাদ হইতে ইস্‌লামে বেদান্তবাদ বা বৌদ্ধ মতের উৎপত্তি হইল। সুফিগণ উপদেশ দিলেন যে,—"ঈশ্বরেই কেবল বিশ্বের যথার্থ সত্ত্বা, তদ্ব্যতীত এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।"

সুফিমতাবলম্বী লেখকগণ বহুসংখ্যক পুস্তকের রচনা করিয়া সাধারণে উক্ত মত প্রচারিত করিতে লাগিলেন। কবিগণও স্বাধীন কল্পনার প্রমুক্ত উচ্ছ্বাসে নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক ও রূপক কাব্য লিখিয়া উক্তমতপ্রচারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ দরবেশ-সম্প্রদায়ের আবি-র্ভাব হইল। তাঁহাদের সাধুতায় সাধারণে মুগ্ধ হইলেন। পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলেন যে, বৌদ্ধভিক্ষুগণের সাধুজীবনের অনুকরণে ইহাঁদের উৎপত্তি।

কেবলমাত্র কোরাণবাদী ইস্‌লামধর্ম্মের একদিক ...

সম্প্রদায়কে নির্য্যাতন ও নির্ব্বাসনের বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ও ধর্ম্মপুস্তক হইতে 'জাহান্নম' ও 'জাহিম' নামক নরকদ্বয়ের বীভৎস-চিত্র উদ্ধার করিয়া কোরাণপথভ্রষ্টগণকে পরকালের ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু সাধারণে তাহাতে বড় বিচলিত হইল না।

তখন ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ সাধারণকে স্বর্গের মনোমোহন প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। ইস্‌লাম-স্বর্গ বিলাসবাসনা ও ইন্দ্রিয়সুখের লীলানিকেতনস্বরূপ তাহার সমুজ্জ্বল বর্ণনার নিকট, হিন্দুর মন্দাকিনীপ্রবাহিতা নন্দনকাননসুলভ-মন্দারালঙ্কৃতা উর্ব্বশীরম্ভামেনকাতিলোত্তমাদি অপ্সরোগণাধ্যুষিতা কল্পতরু-বিমণ্ডিতা অমরাবতীও বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। 'জুন্নাৎ-উল্‌নাইম্' বা হীরক-স্বর্গ, জুন্নাৎ-উল-ফর্দ্দুস্ বা স্বর্ণ-স্বর্গের মনোমোহন ইন্দ্রিয়-সুখকর চিত্র-প্রদর্শন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে পাঠকবর্গের এইটুকু জানা বিশেষ আবশ্যক যে, মুসলমানধর্ম্মের নিকৃষ্টতম বিশ্বাসী ব্যক্তিও স্বর্গে যাইয়া ভোগ-বিলাসের জন্য ৭২ জন রূপলাবণ্যবতী যুবতী প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং তাহার তুলনায় উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিকদিগের স্বর্গে যে কিরূপ সুখ, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ কল্পনাবলে অনুমান করিয়া লইবেন। যাহা হউক, স্বর্গের এত প্রলোভনেও সুফিগণ ভুলিলেন না। তাঁহারা বেদান্তের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা বৌদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভরূপ যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সুফিদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় নাই। দেশভেদে ও পাত্রভেদে এই মত বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রচারক বা ধর্ম্মব্যাখ্যাতার নিকট ইহা নূতন মূর্ত্তিতে ভূষিত হইয়াছে। বুদ্ধ দেবের একই অখণ্ড উপদেশ যেমন, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক, এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে, একই ব্রহ্মসূত্র যেমন শিক্ষকভেদে অদ্বৈত, দ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি ভিন্ন প্রস্থানে বিভক্ত হইয়াছে,—সেইরূপ মতভিন্নতা অনুসারে সুফি মতও বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সুফিগণের এই বিভিন্ন সম্প্রদায়কে খৃষ্টীয় "মনাষ্টিক" (monastic) শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। দেশ-পাত্রভেদ ও স্থানীয় ধর্ম্মমতের প্রভাবই এইরূপ বিভিন্নতার কারণ। কোনও কোনও স্থলের সুফি-মত নাস্তিকতার অবিকল অনুরূপ। সিরিয়া দেশের সুফি-মতে খৃষ্টভাবের প্রভাব দেখা যায়; বোখারায় সুফি-মতে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধপ্রভাব। এতদ্ভিন্ন কোন কোন স্থলে বেদান্তেরও ছায়াপাত দেখা যায়।

প্রতীচ্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতমণ্ডলী সুফি-মতের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহা বৌদ্ধ-মতের অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত সোপেনহার উহাকে অবিকল বৌদ্ধ-মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুফিধর্ম্মের যে বিস্তীর্ণ সাহিত্য রহিয়াছে, অভিনিবেশসহকারে তাহা পাঠ করিলে এই বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

গোল্ডজিহের বলেন যে, পরিব্রাজক দরবেশদিগের "জিকির" প্রথা খৃষ্টীয় "ইউচিট্‌স্ মেসালিয়ানি-(Euchits Messaliani)-দিগের অনুকরণে উদ্ভূত। ইঁহারাই উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনার সারবত্তা স্বীকার করেন। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে সিরিয়া দেশে মেসোপোটেমিয়ায় সর্ব্বপ্রথমে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। 'মেসালিয়ানী' ভিক্ষুক দল ও দরবেশ-সম্প্রদায়ে কোনও পার্থক্য নাই। সুফিদিগের কোন কোন গ্রন্থের নীতিসূত্রের মধ্যে বাইবেলের নিউটেষ্টমেণ্টের অবিকল অনুবাদ দৃষ্ট হয়। যথা ম্যাথু ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২২-৩০। গ্রীক-দার্শনিক প্লেটোর মত খৃষ্টধর্ম্ম-প্লাবিত দেশসমূহে সুফি-সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আডালবার্ট মারক্‌স্ (Adalbert Marx) সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সিরিয়া দেশের গির্জ্জায় এক জন নষ্টিক (Gnostic-নাস্তিক ?) উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহার মতে সুফি-সম্প্রদায়ের বিশেষ পরিপুষ্টি হইয়াছিল। তিনি গ্রীক ও হিন্দুদর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং উপাসনামন্দিরে খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন। কেহ কেহ বলেন, 'নষ্টিক'-গণ কেবল প্লেটোর আলোকে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্লেষণ করিতেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মিষ্টার রেণল্ড এ. নিকল্‌সন (Ms Reynold A. Nicholson) 'সাম্‌সি তেব্রিজে'র (Shamssi Tebriz) কবিতা-ব্যাখ্যায়, এবং এডওয়ার্ড জি. ব্রাউন (Edward G. Browne) তৎপ্রণীত পারসী সাহিত্যের ইতিহাসে দৃঢ়তাসহকারে স্বীকার করিয়াছেন যে, সুফিধর্ম্মে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কেবল 'নষ্টিক'-গণ-প্রবর্ত্তিত প্লেটোর নব মতেই (Neo-Platonism) সুফিধর্ম্ম পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাচ্য ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত সকল একবাক্যে উক্ত মতের প্রতিকূলে যুক্তি তর্ক প্রদর্শন করিয়া সুফিধর্ম্মে অবিসংবাদী বৌদ্ধপ্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। ইস্‌লাম যৎকালে প্রাচ্য দেশসমূহে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়েই বুদ্ধ দেবের নির্ব্বাণ মত সুফিধর্ম্মের অঙ্কুর উৎপাদন করিয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রবাদ-পরম্পরায় ইহার অনেক আভাষ পাওয়া যাইবে।

ইব্রাহিম ইব্‌ন এধেম (Ibrahim ibn Edhem) সুফি-মতের এক জন প্রধান আচার্য্য ছিলেন। তিনি ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি নাস্তিক সুফিরই দৃষ্টান্তস্থল। এবং এই মত সর্ব্বতোভাবে বৌদ্ধমতেরই অনুরূপ। কথিত আছে, ইব্রাহিম বাহ্লীকের (Balkh) এক রাজপুত্র ছিলেন। এক সময়ে তিনি মৃগয়াব্যপদেশে একটি খেঁকশেয়ালের প্রাণসংহার করেন। খেঁকশেয়াল তাঁহার তীরাঘাতে বিদ্ধ হইবামাত্র অন্তরীক্ষে দৈববাণী হইল,—"ইব্রাহিম! তুমি কি প্রাণিহিংসা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ?" শ্রবণমাত্র ইব্রাহিম তাঁহার পিতার এক মেষপালকের সহিত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে ভৃত্যকে সুসজ্জিত অশ্ব প্রদান করিয়া যথার্থ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অরণ্যে ও মরুভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি অনেক অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

ইব্রাহিমের বৈরাগ্য অবলম্বন সম্বন্ধে পুস্তকান্তরে এইরূপ বর্ণনা আছে। যখন তিনি 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিয়া শিষ্যবর্গকে উপদেশ দান করিতেছিলেন, তখন এক জন শিষ্য তাঁহার গৃহত্যাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছিল;—"আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া কি জন্য রাজপ্রাসাদের সুখ সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন?" তাহাতে ইব্রাহিম উত্তর করিলেন, "আমি এক দিন সভাসদবর্গে পরিবৃত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট ছিলাম; সেই সময়ে অকস্মাৎ রাজপথের এক ভিক্ষুকের প্রতি আমার দৃষ্টি নিপতিত হইল আমি দেখিলাম, ভিক্ষুক রাজপ্রাসাদের পার্শ্বে বসিয়া এক খণ্ড শুষ্ক রুটি জলসিক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ লবণসংযোগে উদরসাৎ করিল, এবং জলপান করিয়া তৃপ্তিলাভপূর্ব্বক ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করিল। তৎপরে সে ছিন্ন-কন্থা বিস্তৃত করিয়া সুষুপ্ত হইল। বিধাতার ইচ্ছায় আমি এই সমস্ত অবলোকন করিলাম, এবং পরিচারককে ভিক্ষুকের নিদ্রাভঙ্গের পর তাহাকে আমার নিকট আনিবার আজ্ঞা দিলাম। ভিক্ষুক নিদ্রাভঙ্গে পুনর্ব্বার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। এমন সময়ে আমার পরিচারক তাহাকে কহিল, 'আমাদের রাজ্যেশ্বর আপনার সহিত কোনও কথা কহিতে ইচ্ছা করেন।' ভিক্ষুক কহিল, 'ঈশ্বর ব্যতীত জগতে আর কাহারও কোন শক্তি নাই; আচ্ছা, চল আমি যাইতেছি।' ভিক্ষুক আমার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যখন তুমি রুটিখণ্ড ভক্ষণ করিয়াছিলে, তখন কি তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল ? এবং রুটিভক্ষণে কি তোমার সম্পূর্ণ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল ?' বৃদ্ধ ভিক্ষুক উত্তর করিল, 'হাঁ মহারাজ।' তখন রাজকুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি নিরুদ্বেগে সুষুপ্তি-জনিত তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলে ?' ভিক্ষুক বলিল, 'হাঁ মহারাজ।' ভিক্ষুকের উত্তর শুনিয়া আমি ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ভিক্ষুক একখণ্ড শুষ্ক রুটি খাইয়া ও ছিন্ন কন্থায় শুইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিল, কিন্তু আমি বিশাল সাম্রাজ্যে, প্রভূত ধনরত্ন ও বিবিধ বিলাস বৈভবের অধিপতি হইয়া, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাপ্রকার সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য আহার করিয়া সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান হইয়া কেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না ? নিদ্রা দেবী ত আমার গন্ধতৈলপূর্ণদীপাবলী-প্রজ্বলিত, নিরন্তর তালবৃন্তসঞ্চালিত প্রমোদপ্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমার চিন্তাক্রান্ত অশান্ত অন্তঃকরণে শান্তি-শীতল করস্পর্শ করেন না। আমি চতুর্দ্দিকে চক্ষুঃ কর্ণের আনন্দবর্দ্ধক কত শত দৃশ্য ও শ্রাব্য পদার্থ সম্ভোগ করিতেছি, কই তাহাতে আমার ত চিত্তরঞ্জন হয় না ! কিসে আমার এই চির-অতৃপ্তির নিবৃত্তি হয় ? কি প্রকারে আমার মন শান্তির শীতলছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিবে ? এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পরে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে, আমি রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করিলাম, এবং রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিলাভের জন্য প্রান্তরে কান্তারে বিচরণ করিতে লাগিলাম।"

তৎপরে ইব্রাহিম শিষ্যসম্প্রদায়ের নিকট আপনার জীবনের অলৌকিক কাহিনী সকল বর্ণনা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত আখ্যায়িকা পাঠ করিলে সকলের স্মৃতিপথে বুদ্ধ দেবের কাহিনী উদিত হয়। রাজপুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের পক্ষে বুদ্ধ দেবের জীবন সকলেরই দৃষ্টান্তস্থানীয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক আখ্যানে বুদ্ধের অলৌকিক কাহিনীর ছায়াসম্পাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোগদাদের সর্ব্বগুণসম্পন্ন খালিফ হারুণ উল্ রসীদের পুত্র 'অল্ সব্‌তি' (Al-sabti) সম্বন্ধেও বুদ্ধের ন্যায় সংসারত্যাগের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। আরব্যোপন্যাসের একটি গল্পে এই ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নোএলডিক্ (Noeldeke) যথার্থই বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত উপাখ্যানের একমাত্র মূল উপাদান বুদ্ধ দেবের অলৌকিক জীবনকাহিনী।

ইব্রাহিমের উপদেশমালায় অনেক কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। এক দিন তিনি মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক জন সৈনিককে দেখিতে পাইলেন। সৈনিক পুরুষ ইব্রাহিমের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে নগরে যাইবার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহা শুনিয়া ইব্রাহিম তাঁহাকে একটি সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। ইব্রাহিম গোরস্থানের মধ্যে আসিয়া সৈনিককে কহিলেন, "এই ত চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের বসতি দেখিতেছি।" তখন সৈনিকপুরুষ বিরক্ত হইয়া ইব্রাহিমের ললাটে যষ্টির আঘাত করিবামাত্র আহত স্থান হইতে প্রবলবেগে রক্তপাত হইতে লাগিল। কিন্তু ইব্রাহিম তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিধাতার নিকট তাহার কল্যাণ-কামনা করিলেন। সৈনিকপুরুষ ইব্রাহিমের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন ইব্রাহিম কহিলেন, "সেনানায়ক! তুমি আমার যে মস্তকে রক্তপাত করিয়াছ, আমি বহুকাল পূর্ব্বে তাহা বাহ্লীকের রাজপ্রাসাদে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। যেখানে আমি সংসার-তুরঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হস্তে অশ্ববল্গা ধারণ পূর্ব্বক মহাড়ম্বর-পূর্ণ বিলাসবৈভবালঙ্কৃত রাজপথে প্রফুল্লচিত্তে ধাবমান হইতাম, আজি আমার সে মস্তক নাই। যিনি সংসারের ভোগ সুখ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ না করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সুখ শান্তি লাভ করিবার বাসনা থাকে, তবে অবিলম্বে সিংহশার্দ্দূলাদিশ্বাপদসঙ্কুল সংসার ত্যাগ কর। তাহা হইলে তুমি অমৃত পান করিতে পারিবে।" ভিক্ষুবেশী রাজপুত্র ইব্রাহিমের এইরূপ বহুসংখ্যক উপদেশপূর্ণ আখ্যান প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ইব্রাহিম যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন, তখন স্বীয় যুবক পুত্রকে দেখিয়া ইব্রাহিম পুত্রস্নেহের নৈসর্গিক প্রেরণায় উদ্বেলিতচিত্তে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজৈশ্বর্য্যের পূর্ব্বস্মৃতি, ভোগবিলাসের বিপুল প্রলোভন, লাবণ্যবতী প্রণয়িনীর প্রেমালিঙ্গন, দিব্যকান্তি হৃদয়নন্দন তনয়ের মুখকমল তাঁহার চিত্তপটে অকস্মাৎ সমুদিত হইয়া তাঁহাকে ক্ষণ কালের জন্য বিচলিত করিল। তখন কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য্য ইব্রাহিম হৃদয়ের আবেগরাশিকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া কহিলেন, "হে বিধাতঃ! আমি তোমার চরণতরী পাইবার জন্য মানবসমাজ ত্যাগ করিয়াছি, দারা-পুত্রদিগকে অসহায় করিয়া নেত্রনীরে ভাসাইয়াছি।

আজি যদি তুমি আমাকে সেই প্রেম হইতে বঞ্চিত কর, তবে আমার একমাত্র সম্বল তুমি ভিন্ন আর কাহার কাছে যাইব? প্রভো! আমার দুর্ব্বল চিত্তে পুনরায় বল প্রদান কর।"

"হে বিধাতঃ! দয়াময় কোথা এ সময়,
বিষম বিপদে মোর ব্যাকুল হৃদয়;
লভিতে চরণ-তরী, গৃহসুখ পরিহরি',
দারাপুত্র পরিবার করি' বিসর্জ্জন,
বনে বনে কত কাল করেছি ভ্রমণ!
হায়! আমি যার লাগি' হয়েছি সর্ব্বস্বত্যাগী,
তথাপি বিরাগী প্রভো হৃদয় সম্বল
দুর্ব্বল হৃদয়ে দাও বৈরাগ্যের বল॥"

এই বলিয়া ইব্রাহিম আত্মসংযম করিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের সান্নিধ্য পরিহার করিলেন; এবং মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহার পুত্র সর্ব্বপাপবিমুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে পর্য্যটন করিতে পারে।

উপরিউক্ত বিবরণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের আদর্শই ইসলামের ধর্ম্মজীবনে অভিনব যুগের অবতারণা করিয়াছিল। সংসারত্যাগই মুক্তিলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। সুফিগণ বুদ্ধের এই উপদেশেই অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুফিগণ অনেক বাহ্যপ্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণগণের অনুকরণ করিয়াছিলেন। জপমালা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ইহার পরিচায়ক। মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধগণ জপমালা ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।

সুফিগণ স্বীয় সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্রই জপমালার প্রচলন করিয়াছিলেন। ইস্‌লামধর্ম্মে ঈশ্বরের নাম নবনবতি ৯৯। তজ্জন্য জপমালায় উক্ত সংখ্যা গৃহীত হইয়া থাকে। প্রথমে ইস্‌লামের উলেমাগণ জপমালা-প্রবর্ত্তন ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ইস্‌লামসম্প্রদায়ও জপমালার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সুফি-মতের এক জন প্রসিদ্ধ প্রবর্ত্তক আবুল কাসিম এল্ জুনেইদ (Abul Kasim El juneid) যৎকালে হস্তে জপমালা ব্যবহার করিতেন, তখন লোকে তাঁহাকে সেই নূতন প্রথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন যে, "জপমালা আমাকে আল্লার [illegible]

আমি কখনই তাহা ত্যাগ করিব না।” শ্রমণগণের দৃষ্টান্তে দরবেশ-গণ সর্ব্বত্র এই প্রথা প্রচারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হিজিরার ৯ম শতাব্দীতে এই প্রথা অনেক স্থলে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুজুতি (Sujuti) ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। যে সমস্ত ব্যক্তি জপমালা-প্রচার ইস্‌লামনীতিবিরুদ্ধ পদ্ধতি বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য সুজুতি এক প্রকাণ্ড প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণ ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম্ম ও সুফি-মতের মূল সূত্রে নানাপ্রকার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তৎসমুদয় ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীত হয় যে, সুফি-মত যেন ভিন্ন পরিচ্ছদে বৌদ্ধ-মতের নামান্তর-মাত্র। বৌদ্ধ-মত হিন্দু বেদান্তদর্শনের অভিব্যক্তি হইলেও, সুফি-মত বেদান্তের দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। সুফি-মত বৌদ্ধধর্ম্মের অনুজ; কিন্তু ইহা বৌদ্ধ-মতের মধ্যবিন্দুর ন্যায় কোনও স্থির কেন্দ্র দ্বারা নিয়মিত হয় নাই। কারণ, বোধিসত্ত্বের ন্যায় কোনও অমানুষিকশক্তি-সম্পন্ন ধর্ম্মপ্রচারক প্রত্যক্ষভাবে সুফি-মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন না। সুফি-মত-প্রবর্ত্তকগণ কোনও পুস্তকবিশেষ হইতে বৌদ্ধ-মত প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা ত্রিপিটক আরবী বা পারসীতে অনুবাদিত করিয়াছিলেন কি না, তাহাও অজ্ঞাত। সর্ব্বদেশব্যাপী বৌদ্ধপ্রচারক শ্রমণগণের প্রত্যক্ষ উপদেশ হই-তেই বৌদ্ধ-দর্শনের মূল তত্ত্ব ইসলামে প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম-বীরগণের প্রত্যক্ষ দৃশ্য আদর্শজীবন ভোগাসক্ত ইসলামকে কঠোর সন্ন্যাস পথে পথিক হইতে শিক্ষা দিয়াছিল। উদারনীতিক চিন্তাশীল ইস্-লামগণ অবিলম্বেই মুণ্ডিতমস্তক পর্য্যাটক শ্রমণগণের যথার্থ মহত্ত্ব অব-ধারণ পূর্ব্বক বৌদ্ধবিহারের অনুরূপ মঠাদি নির্ম্মাণ করিয়া নির্ব্বাণতত্ত্বের অনুশীলন করিতেন। তাঁহারাও ভিক্ষুগণের অনুকরণে ভিক্ষা দ্বারা জীবন-ধারণ করিতেন।

এ বিষয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অবিসংবাদি প্রমাণ এই যে, বাহ্লীক রাজ্যেই সুফি-মত প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইস্‌লামের জন্মের পূর্ব্বেও বাহ্লীক মধ্য-এসিয়াস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখনও তথায় বহুতর বৌদ্ধ-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইব্রাহিম ইব্‌ন এধেম বাহ্লীকের রাজকুমার ছিলেন। তিনি সংসারত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সুতরাং বৌদ্ধ-মত-প্লাবিত বাহ্লীকের চিন্তা-

রাজ্যে বৌদ্ধ-মত যে ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত ছিল, সে বিষয়ে কোনও সংশয়ই থাকিতেছে না।

আলেক্‌জাণ্ডার ক্রেমার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা নগরে (Culturgeschichtliche Streifezuge auf dem Gebiete des Islams) 'ইস্‌লাম সভ্যতায় বৈদেশিক প্রভাব' নামক অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিপুল গবেষণার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধ-মত নিঃসংশয়িতরূপে সুফি-মতের সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্রেমার বৌদ্ধ-মত ও প্লেটো-মতের উৎকর্ষাপকর্ষ-বিচারে বৌদ্ধ-মতকে পার্থিব দর্শনরাজ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই জীবনেই সুখ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক পৌনঃপুনিক জন্মের অঙ্কুর নির্ম্মূল করা বা নির্ব্বাণলাভই বুদ্ধ-দেবের সর্ব্বপ্রধান উপদেশ। সুফিগণের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 'ফনা' (Fana) (নির্ব্বাণ) ও মহ্‌ব (Mahv) (জন্মনাশ) অর্থাৎ, সুখদুঃখাতীত হইয়া পুনঃপুনরাগত জন্মালোক নির্ব্বাণ করাই সুফিগণের মূল সূত্র।

অনেকেই জানেন যে, নির্ব্বাণ শব্দের অর্থান্তর আছে। এ সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন যে, নির্ব্বাণ ও সম্পূর্ণ ধ্বংস (Complete a nnihilation) অভিন্ন, সুতরাং তাহা মনুষ্যের পার্থিব জীবনে অসাধ্য। কিন্তু মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, চিত্তের রাগপরিশূন্যতাই নির্ব্বাণের লক্ষণ, অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল সাংসারিক সুখ দুঃখে সম্পূর্ণরূপে অস্পৃষ্ট থাকাই নির্ব্বাণের প্রকৃতার্থ।

যখন মনুষ্যের আমিত্ব-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়, যখন আশার আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যখন সুখ দুঃখের কোনও অনুভূতিই চিত্তকে অভিভূত করে না, তখন বৌদ্ধ-মতে নির্ব্বাণলাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক, সুফিগণ 'ফনার' কিরূপ ব্যাখ্যা করেন। সুফিগণের মতে, "যখন আত্মার (জীবাত্মা Ego) অনুভূতি বা ভববন্ধনের নাশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমিত্বের সমস্ত সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়, যখন সংসারবদ্ধ জীব পার্থিব পদার্থের সুখ দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়, যখন ইচ্ছা, কৃতি, উদ্দেশ্য সমস্তই অন্তর্হিত হয়,—সেই সময়ে পরিচ্ছিন্নপ্রকৃতি জীবাত্মা অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরে মিশিয়া যায়।"

এক্ষণে নির্ব্বাণ ও 'ফনা' শব্দের সাদৃশ্য বুঝা যাইবে। 'ফনা' শব্দ

নির্ব্বাণের নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল পার্থক্যের মধ্যে ঈশ্বরাস্তিত্ব। শূন্যবাদী বৌদ্ধ ঈশ্বর মানেন না। সুতরাং সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বেদান্তের সহিত সুফি মতের অনেক ঘনিষ্ঠতা আছে। বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণান্তে শূন্যে বিলীন হন; সুফিগণ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে মিশিয়া যান; আর বৈদান্তিক হিন্দু ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। এই তিন প্রণালীর তারতম্য-নির্ণয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

সুফি-মতে জীবাত্মা যখন সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরে মিশিয়া যায়, তখনই মুক্তি হয়। এক জন সুফি-প্রচারক বলিয়াছেন, "যখন চক্ষুঃ কিছুই দেখিতে পায় না, যখন আল্লা ব্যতীত মনে অন্য কোনও জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না, যখন মনে হয়, আল্লা ব্যতীত জগতে আর কিছুরই সত্ত্বা নাই, তখনই 'ফনা'-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।" সুতরাং ইস্‌লামের ফনা ও বেদান্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। সুফি-মতে, জীবাত্মা বা ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয় না, উহা ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যায়। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে, এবং জলবুদ্বুদ যেমন সলিলরাশিতে মিশিয়া যায়, সুফিগণের জীবাত্মাও সেইরূপ ঈশ্বরে মিশিয়া যায়। তখন ব্যবহারদশাতে যাহা সৎ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই মিথ্যা প্রপঞ্চ একেবারেই নষ্ট হয়। ইহাই সুফি-মতের নির্ব্বাণ, বা 'ফনা'। জেলালুদ্দীন রুমি তাঁহার 'মেথনেভি'তে (Methnevi) বলিয়াছেন যে, চিত্ত যখন সুখ দুঃখের অতীত হয়, তখন সেই অবস্থার নাম 'ইস্তিহ্লাক; (Istihlak) অর্থাৎ, তখন জীবাত্মা দেশ কাল পাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তখন বিশ্বের সত্ত্বার সহিত জীবাত্মা একীভূত হইয়া যায়। এই অধ্যাত্মবাদী কবি তাঁহার কাব্যে লিখিয়াছেন,—

দীর্ঘচ্ছন্দ পারসী কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ।

মুস্‌লিম, নহিক আমি অগ্নি-উপাসক কিংবা য়িহুদী খৃষ্টান;
প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্যেতে সাগরে বা পৃথিবীতে নহে বাসস্থান,
জন্ম নহে নিসর্গেতে, ঘূর্ণামান গ্রহ হ'তে, অন্তরীক্ষস্থলে,
পৃথিবীর ধূলি মাঝে, সাগরের জলে, কিংবা অনিলে, অনলে;
আলোকের পরমাণু, কিংবা স্বর্গসিংহাসনে নাহি অধিকার,
অস্তিত্ব নাহিক মোর, জীবন আলোক নাই, কিংবা অন্ধকার,
ভূলোকে কি লোকান্তরে, ভীষণ নরকে, কিংবা স্বর্গ মনোহর;
আদি পিতা মানবের আদম ইভের আমি নহি বংশধর;

ইডেন উদ্যান, কিংবা 'রিজ্‌ওয়ান্', কিছুতেই নাহি প্রয়োজন;
স্থান মোর স্থান-শূন্যতায় অচিহ্ন আমার শুধু চিহ্ন অনুক্ষণ;
শরীর অথবা আত্মা, নাহি মোর, এ দেহ যে প্রিয় বিধাতার,
দ্বৈতজ্ঞান ফেলিয়াছি দূরে স্বর্গ মর্ত্ত সদা হেরি একাকার;
একের সন্ধান করি, জানি একে, দেখি একে, ডাকি এক জনে,
ইহা ভিন্ন নাহি জানি, সর্ব্বময় তিনি আমি, ভাবি সদা মনে।

পাঠকগণ উল্লিখিত কবিতায় তদানীন্তন সুফি-মতের উদার ও উন্নত ভাবের পরিচয় পাইবেন। এই প্রকারে যাঁহার আমিত্ব একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, যিনি ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন, তিনি 'ফনা' প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তাঁহাকে 'আলিন্‌সান্-অল্-কামিল' বা পূর্ণ মনুষ্য বলা যায়। এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের নিম্নে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন সোপান আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে যেমন বুদ্ধত্বের নিম্নস্থ স্তরমালার সুন্দর অভিধা আছে, সুফিগণেরও সেইরূপ ভিন্নতাবোধক বিবিধ সংজ্ঞা আছে। বৌদ্ধমতে 'তথাগত'-অবস্থা-প্রাপ্ত ব্যক্তি বুদ্ধত্বের উচ্চ আদর্শস্থানীয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যগণ 'অর্হৎ' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক স্থলে ইহার অনুরূপ নাম দৃষ্ট হয়। যে ইস্‌লাম সাধুগণ 'ভেলিক্‌স্' আখ্যা পাইয়া থাকেন, তাঁহারা জ্ঞানবলে নৈসর্গিক পঞ্চভূতের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। এইরূপ অলৌকিক শক্তি যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রবন্ধগৌরব-ভয়ে এখানে তৎসমুদয়ের উদ্ধার করিলাম না। সে সমস্ত শক্তি হিন্দুদিগের অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব প্রভৃতির অনুরূপ। এ বিষয়ে ইস্‌লামধর্ম্মে যে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব সংক্রান্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ শ্রমণ ও ইস্‌লাম সুফিগণ প্রায়ই এক প্রণালীতে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নির্ব্বাণ বা 'ফনা'-প্রাপ্তির উপায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বদ্ধ। বৌদ্ধ-মতে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পথে আটটি বিভাগ আছে। এই বিভাগগুলি পর্য্যাটক তীর্থযাত্রিকের বিশ্রামস্থানের সহিত তুলিত হইয়া থাকে। যাঁহারা নির্ব্বাণরূপ তীর্থে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে উক্ত আটটি বিশ্রাম-স্থান (Station) দিয়া যাইতে হয়। সুফিগণও অবিকল এই প্রণালীর অনুকরণ করিয়াছেন। সুফি-মতেও 'ফনা'-প্রাপ্তির

পথে বিশ্রাম-স্থান আছে; ইহার নাম 'তারিক'। 'মরিফৎ' বা তত্ত্বজ্ঞানের পথে 'তারিক' অতিক্রম না করিলে 'ফনা'-প্রাপ্তি হয় না। আবার সুফিগণও অধ্যয়নকে 'মুলুক' বা ভ্রমণ নামে অভিহিত করেন। 'আবুল-অল্-তারিক, আবুল্-অল্-মুলুক,' বা 'অল্-সলিকুনা' প্রভৃতি তীর্থযাত্রিবোধক সুফি-সংজ্ঞা-গুলি উক্ত ভাবের পরিচায়ক। অশিক্ষিত সাধারণের ভাষায় সুফি-মতের নাম 'তারিক', এবং উত্তর আফ্রিকায় সুফি-মত 'ত্রিক' (তারিক) নামে অভিহিত।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিবরণসমূহের অনুধাবন করিলে, সুফি-মত ও বৌদ্ধমতের সাদৃশ্যকে কাকতালীয়বৎ বা দৈবাৎ-সংঘটিত সাদৃশ্য বলা চলে না।

সুফিগণ যে পথে 'ফনা'য় প্রবেশ করেন, তাহার একটি সোপানের নাম "মুরাকাব", বা ধ্যান। সুফিগণ এই ধ্যান বা চিত্তবৃত্তিনিরোধকে আমিত্ব-নাশের প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ-মতেও উক্ত পথের নাম ধ্যান, বা সমাধি। সুতরাং সুফি ও বৌদ্ধের 'ফনা' ও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির মার্গও অভিন্ন। বৌদ্ধের সমাধি ও সুফির 'মুরাকাব' সম্পূর্ণ একার্থবাচক।

সুফিগণের 'ফনা'-প্রাপ্তির পথে 'খল্‌বৎ' (Khalvat) বা নির্জ্জনতা একটি প্রধান উপায়। যাঁহারা একেবারে মানবসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'ফনা' লাভে যথার্থ অধিকারী। যাঁহারা একেবারে সংসারত্যাগে অসমর্থ, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন অরণ্যে ধ্যানার্থ গমন করেন। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দরবেশগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা দৃষ্ট হয়। 'খল্‌বতি' মতে প্রতি বৎসর ৪০ দিন উপবাসপূর্ব্বক নির্জ্জনবাস ('চিল্লে') করিতে হয়। কিন্তু ইজিপ্ট বা মিশর দেশে 'দেমির্‌দশি' তিন উপবাসে ও নির্জ্জনবাসে খল্‌বৎ সিদ্ধি হয়। এই তিন দিন দরবেশগণকে সম্পূর্ণরূপে মৌনাবলম্বন করিতে হয়। উল্লিখিত পদ্ধতি বৌদ্ধগণের বিবেকাদির অনুরূপ।

ইসলামধর্ম্ম যখন যে দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন ইহা সেই দেশের অনেক প্রথা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়াছিল। ইতিহাসের আলোকে এক্ষণে সত্যের প্রকাশ হইতেছে। ভ্যাম্‌বেরি (Vamberi) বোখারাবাসী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নর্‌সখির (৯৪৪-৯৪৮ খৃঃ) ইতিহাস হইতে একটি সুন্দর তত্ত্বের উদ্ধার করিয়াছেন। মোঙ্গল-ভাষায় বুখারা শব্দের অর্থ 'বিহার-সমূহ'। বৌদ্ধ অভ্যুদয়কালে বুখারা সহস্র চৈত্য-স্তূপে অলঙ্কৃত হইয়া এসিয়ার সর্ব্বত্রই বুদ্ধের মহিমা ঘোষণা করিত। বুখারায় প্রতিবৎসর দুইবার মহামেলা

সংঘটিত হইত। সর্ব্ব দেশের বণিক্‌সম্প্রদায় এই বৌদ্ধ-মহামেলায় উপস্থিত হইয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেন। 'নর্‌সখি' বলেন, পূর্ব্বে এই মেলায় কেবল ৫০০০ স্বর্ণ দীনারের বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তিই বিক্রীত হইত। এতদ্ভিন্ন কত যে শিল্পজাত পণ্য বিক্রীত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবিত বুখারার চৈত্য-স্তূপে অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত ইস্‌লামের জাতীয় কেতন উড্ডীন হইল। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এই সুধাময়ী বাণী বহুকালের জন্য মোঙ্গলিয়ার বক্ষঃ হইতে বিদায় লইল। কিন্তু বিজয়ী ইস্‌লাম অজ্ঞাতসারে পরাজিত বৌদ্ধ-মতের অনুকরণ করিতে নিবৃত্ত হইল না। ইস্‌লাম প্রচারকসাধারণের বদ্ধমূল বৌদ্ধ-বিশ্বাস একেবারে বিদূরিত করিতে পারিলেন না। বৌদ্ধ সাধুগণ ইস্‌লাম সাধুশ্রেণীতে স্থান পাইলেন। বুদ্ধ দেবের পবিত্র চিহ্ন সকল মহম্মদের নামাঙ্কিত হইল। বহুবৌদ্ধস্তূপাকীর্ণ গান্ধারে (কান্দাহারে) শ্রমণগণের মধ্যে বুদ্ধ দেবের একটি জলপাত্র ছিল। যখন বৌদ্ধগণ ইস্‌লাম ভজনা করিলেন, তখন সেই জলপাত্র বুদ্ধ দেবের পরিবর্ত্তে মহম্মদের নামে প্রচলিত হইল। পাত্রের পবিত্রতা নষ্ট হইল না। কালবশে কেবল মহম্মদ বুদ্ধের আসনে বসিলেন।

সিংহলে বুদ্ধ দেবের যে পবিত্র পদাঙ্ক উপাসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক ভক্তির সহিত পূজিত হইত,---যৎকালে বিজয়ী মুসলমান সিংহলে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন যে, উহা আলির পদচিহ্ন। আলি যে সিংহলে পদার্পণ করেন নাই, তদ্বিষয়ে কেহ তখন বিতর্কের অবতারণা করিলেন না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাট্রিউল ডি রিহ্‌নস্‌এর (Dutreuil de Rhins) সঙ্গী গ্রিনার্ড (Grenard) তুর্কিস্থানের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক আবিষ্কার উপলক্ষে এক অপূর্ব্ব গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব তুর্কিস্থানের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধমহিমার পদচিহ্ন দেদীপ্যমান। এই স্থানে ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ-প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমানগণ বৌদ্ধস্তূপগুলিকে আলি কিংবা মহম্মদের সমাধি বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই তুর্কিস্থানে পদার্পণ করেন নাই। ভারতবর্ষেও স্থলবিশেষের 'আল্লাবাঁধের' কথা শিক্ষিত পাঠকমাত্রই জানেন। বিদ্যমান বৌদ্ধ-বিহারগুলি কালে দরবেশগণের লীলানিকেতন হইয়াছিল। সাধারণে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তুর্কিস্থানের স্তূপাবলীতে পূজা দিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বুদ্ধের নামে দিত, এক্ষণে আল্লার নামে দিতেছে, এইমাত্র পার্থক্য। গ্রিনার্ড

যথার্থ বলিয়াছেন, "Un Avatar Musulman de Buddha", বুদ্ধ যেন ইস্‌লামের নবাবতারে বিরাজ করিতেছেন। পুরুষানুক্রমিক প্রবাদপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, কেবলমাত্র নামের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোক বহুকাল একত্র থাকিলে পরস্পর পরস্পরের কোনও কোনও ভাব গ্রহণ করেন, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহাতে কাহারও মহত্ত্বের ন্যূনাতিরেক হয় না। বুদ্ধ দেব হিন্দুর অঙ্কে জন্মিয়াছিলেন। হিন্দু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৌদ্ধভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধও হিন্দুভাবেই আপন মত গঠন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে বৌদ্ধভাব বহুলপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব। বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও সর্ব্বদেশের বিদ্বৎসমাজে যেরূপ বৌদ্ধ-ভাবের আবির্ভাব দেখিতেছি, তাহাতেও বুদ্ধ দেবের অলৌকিক মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। উদয়নাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণী—

"ঐশ্বর্য্যমদমত্তোঽসি মামবজ্ঞায় বর্ত্তসে। পুনর্বৌদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতিঃ॥"

যদি ফলবতী হয়, তবে পৃথিবীর রঙ্গালয়ে নূতন নাটকের অভিনয় হইবে।

বিসর্জ্জন।

শশাঙ্কশেখর যখন নবীন যৌবনের প্রখর আলোকে সমগ্র জগত মধুময় দেখিত, তখন সৌন্দর্য্যকে লাভ করিবার বাসনা তাহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

কিন্তু যখন মাতা বহু সন্ধানের পর তাহার জন্য একটি লক্ষ্মীরূপিণী সুন্দরী বধূ গৃহে আনিলেন, তখন শশাঙ্কশেখর চঞ্চল হইয়া পড়িল। আশানুরূপ রূপলাবণ্যশালিনী গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া প্রথমতঃ তাহার কল্পনামুখর অতৃপ্ত হৃদয় উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু পত্নীর দেহে সুষমা-দীপ্তি যতই উজ্জ্বল ও যৌবন-শ্রী যতই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, শশাঙ্ক ততই বিব্রত ও অস্থির হইয়া পড়িল। এ সৌন্দর্য্য সে কেমন করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিবে, সেই চিন্তায় সে অহর্নিশি দগ্ধ হইতে লাগিল। শতবার নানা ছলে সে অন্তঃপুরে আসিত, সতর্ক-দৃষ্টিতে, সাবধানে পত্নীর প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিত। অন্তঃপুরে যে সকল পুরুষের প্রবেশাধিকার

ছিল, তাহাদের গতিবিধি ও ব্যবহার সে দার্শনিকের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু লোচনে পর্য্যবেক্ষণ করিত।

সুতরাং শশাঙ্কের হৃদয়ে তিলমাত্র শান্তি ছিল না। প্রচ্ছন্ন সন্দেহ মানুষের সকল সুখ হরণ করে। একটা ভিত্তিহীন সন্দেহের ছায়া সর্ব্বদা তাহার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, বা স্বপ্নে, কিছুতে তাহার শান্তি ছিল না।

কোনও আত্মীয়ের গৃহেও পত্নীকে পাঠাইতে শশাঙ্কের সাহস হইত না। তাহার মনে সর্ব্বদা আশঙ্কা ছিল যে, তাহার রূপসী পত্নীটিকে লুফিয়া লইবার জন্য সমগ্র পুরুষ জাতি যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছে!

এরূপ আশঙ্কার একটি কারণও ছিল। শৈলবালা একে সুন্দরী, তাহাতে বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা। পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহারা সযত্নে শৈলবালাকে নানারূপ ললিতকলা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় বড় কবির অনেক কাব্য তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল।

এই সকল কারণে হতভাগ্য শশাঙ্ক বড়ই উদ্বিগ্ন ও অসুখী ছিল। ভিনোলিয়া ও পেয়ার্সের সাবান তাহার দেহের বর্ণকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে কি না, প্রত্যহ শতবার দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শশাঙ্ক তাহা মনে মনে বিচার করিয়া দেখিত। তাহার ভয় ছিল, বিদুষী রূপবতী পত্নী বুঝি তাহার এ মূর্ত্তিতে পরিতৃপ্ত নহে! মনোরঞ্জনার্থ সর্ব্বদা পত্নীর অঞ্চলছায়ায় থাকিতে শশাঙ্ক ভালবাসিত না; কিন্তু তাহাকে নয়নের অন্তরালে রাখাও নিরাপদ নহে, এ চিন্তাও শশাঙ্কের হৃদয় সর্ব্বদা দগ্ধ করিত। অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্কটসঙ্কুল, সেই সময় জননী আদেশ করিলেন যে, শশাঙ্ককে পর দিবস প্রত্যূষেই জয়রামপুরের কাছারীতে যাত্রা করিতে হইবে। শশাঙ্ক পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। কাল যে দোল-পূর্ণিমা!

দুঃখে হৃদয় জর্জ্জরিত হইলেও শশাঙ্ক জননীর আদেশ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইল না। বিদ্রোহী কথাগুলি জিহ্বাগ্রে আসিয়াই ফিরিয়া গেল। মাতা স্নেহপরায়ণা হইলেও তাঁহার সংকল্প অটল, এ কথা শশাঙ্ক বিলক্ষণ বুঝিত।

সুতরাং পরদিবস প্রত্যূষেই সন্দিগ্ধহৃদয়ে ক্ষুণ্ণমনে শশাঙ্ক গৃহ হইতে যাত্রা করিল।

২

চন্দ্রালোকচিত্রিত গগনতল, হারমোনিয়মের মিষ্ট স্বর ও পুরুকণ্ঠের সঙ্গীত-

ধ্বনিতে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তরঙ্গ ঠেলিয়া শশাঙ্কশেখরের বজরা প্রস্তরমণ্ডিত সোপানশ্রেণীর পার্শ্বে আসিয়া লাগিল। গঙ্গার উপরেই তাহাদের অট্টালিকা। শশাঙ্কের কর্ণে সে গীতরব প্রবেশ করিল। শশাঙ্ক চকিত হইয়া উঠিল। কে গান গায়?

জননীর পত্রে সে অবগত হইয়াছিল, তাহার ভগিনীপতি বিহারীবাবু বহুকাল পরে ছুটী লইয়া আরা হইতে আসিয়াছেন, এবং সম্প্রতি শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতেছেন। শৈলবালা লিখিয়াছিল, বিহারী বাবুর আগমনে নিত্য উৎসব হইতেছে। গানে, গল্পে ও হাস্য-পরিহাসে তাহাদের দিন বড় সুখে কাটিয়া যাইতেছে। বিহারী বাবু অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, বিশেষতঃ তাঁহার গলাটি ভারী মিষ্ট।

সংবাদ পাইয়াই শশাঙ্কের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু গুরুতর কার্য্যভার হস্তে থাকায় উহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং নিয়তির অনুশাসনে শশাঙ্কশেখরকে বাধ্য হইয়া নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত কোনরূপে জয়রামপুরে থাকিতে হইয়াছিল।

শশাঙ্ক দুইবারমাত্র তাহার ভগিনীপতিকে দেখিয়াছিল। ডেপুটীগিরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিহারী বাবু শশাঙ্কের কনিষ্ঠা ভগিনী তরুলতার পাণিগ্রহণ করেন। তার পর সস্ত্রীক পশ্চিমে চাকরীস্থলে গমন করেন। সেই অবধি পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি আর শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। কেবল গত বৎসর কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তিনি একাকী একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং তিন রাত্রি তাহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন।

শশাঙ্ক সুপুরুষমাত্রকেই ভয় করিত। বিহারী বাবু সুপুরুষ, সুগায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুতরাং শশাঙ্ক তাহার পত্নীর জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তিন মাস পরে গৃহে ফিরিয়াও শশাঙ্কশেখর বিন্দুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারিল না। হায়! "যেখানে অস্ত্রের লেখা ব্যথাও তথায়!" পাংশুবর্ণ-মুখে, স্পন্দিতবক্ষে, শশাঙ্ক বজরা ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। জননীর চরণবন্দনার পর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, তাহার প্রতীক্ষায় কেহ তথায় বসিয়া নাই। কেবল ছাদের উপর হইতে সঙ্গীতধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিল,—

"তোমারে সঁপেছি আমারি প্রাণ, ওগো বিদেশিনী!"

দুই হস্তে কম্পিত বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া অপরাধীর ন্যায় সন্তর্পণে ও লঘুগতিতে শশাঙ্ক দ্বিতলের ছাদে উঠিল। দ্বারপার্শ্ব হইতে উঁকি মারিয়া সে দেখিল, তাহার ভগিনীপতি বিহারী বাবু হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতেছেন। তাহার বিধবা জেষ্ঠা ভগিনীর পুত্রকন্যারা বিহারী বাবুকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। অদূরে তরুলতা ও তাহার জীবনসঙ্গিনী শৈলবালা বসিয়া একাগ্রমনে সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছে।

শশাঙ্কশেখর হাড়ে চটিয়া গেল। পরপুরুষের সঙ্গীতশ্রবণে তাহার পত্নীর কি অধিকার? এত আগ্রহই বা কেন?

শশাঙ্কের চরণ আর উঠিল না। সে একবার বিহারী বাবু ও পরক্ষণে আপনার দেহের প্রতি চাহিয়া দেখিল।

সিঁড়ির দরজায় একটা শব্দ শুনিয়া তরুলতা ফিরিয়া চাহিল। কি লজ্জা! দাদা যে! মস্তকে অবগুণ্ঠনের পরিসর বাড়াইয়া দিয়া তরুলতা উঠিয়া দাঁড়াইল। বালক-বালিকারা আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিল, "মামাবাবু! ওরে মামাবাবু এসেছেন!"

বিহারীলাল হারমোনিয়ম রাখিয়া বলিলেন, "আরে কেও শশাঙ্কবাবু যে? এস এস, তুমি বাড়ী ছিলে না, আমার ছুটীটা বৃথা কাটিয়া গেল।"

বহুকাল পরে শ্যালক ও ভগিনীপতির সম্মিলনে শ্যালক অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয় সংশয়ের তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলিতেছিল। কিন্তু সংসার ও সমাজের বিধান বড় কঠোর। অন্তরের জ্বালা বাহিরে প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং শশাঙ্ক মুখের উপর কৃত্রিম হাসি ফুটাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল।

শৈলবালা স্বামীর আগমনে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিল; কিন্তু বিহারী বাবু বাধা দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "সে কি হয় বৌদি, তুমি গেলে আমাদের সমস্ত আমোদটাই মাটী হয়ে যাবে। এখন কাহাকেও যাইতে দিব না। আজ যুগলরূপ না দেখিয়াই ছাড়িয়া দিব?"

তরুলতা ও শৈলবালা অগত্যা অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া এক ধারে বসিয়া রহিল। বিহারীবাবু হারমোনিয়মে সুর দিয়া গাহিলেন,—

"আমি নিশি দিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিও।"

'বরদাস্ত' করা তাহার পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিল। শরীর নিতান্ত অসুস্থ বলিয়া শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

পরিহাসের অবসর ত্যাগ করিতে না পারিয়া বিহারীবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যেতে পার ; কিন্তু তোমার গৃহিণীকে আপাততঃ ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না। অন্ততঃ গোটা দুই জয়দেবের পদাবলী না শুনাইয়া আমি সভাভঙ্গ করিব না।"

শশাঙ্ক অলক্ষ্যে একবার পত্নীর প্রতি তীব্র জ্বালাময় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

৩

আর দুই দিন পরে তরুলতা স্বামীর সহিত পশ্চিমে চলিয়া যাইবে, সুতরাং আজ সন্ধ্যার পর হইতেই তাস খেলার ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

অপরাহ্ণে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আর্দ্র বাতাস ফুলের গন্ধ বহিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। গঙ্গার ঘাটে বসিয়া কে বাঁশী বাজাইতেছে। আলোকিত কক্ষমধ্যে পুষ্পগন্ধময় বাতাস ও বাঁশীর করুণ তান যেন কাহাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে।

সঙ্গীর অভাবে তিন জনে গোলাম-চোর খেলিতেছিল। পুনঃপুনঃ চোর হইয়াও বিহারীলালের উৎসাহভঙ্গ হইল না। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, এবার আমি নিশ্চয়ই জিতিব।" কিন্তু তাঁহার পড়্‌তা আর ফিরিল না। সকলের হাতের কাগজ মিলিয়া গেল, কেবল সঙ্গিহীন রুহিতনের গোলাম বেচারা বিহারীলালের হাতে রহিয়া গেল। তরুলতা ও শৈলবালা আনন্দে মৃদু করতালি দিয়া উঠিল।

বিহারী বাবুর অত্যন্ত স্ফূর্তি বোধ হইল। খেলায় হারিয়া এমন আনন্দ তিনি অনেক দিন অনুভব করেন নাই।

ডিবার পান ফুরাইয়া গিয়াছে দেখিয়া তরুলতা বলিল, "তোমরা একটু ব'স, আমি গোটা কয়েক পান নিয়ে আসি।"

তরুলতা পান আনিতে গেল। শৈলবালা উৎসাহভরে তাস গুছাইতে লাগিল।

বিহারীলাল একটা সিগার ধরাইয়া বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। আজিকার রাত্রিটা তাঁহার বড় মিষ্ট লাগিতেছিল।

"বৌমা! একবার এ দিকে এস ত ?"

শ্বাশুড়ীর আহ্বান শুনিয়া শৈলবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিহারী বাবু সহাস্তে বলিলেন, "এখনি ফিরে এস কিন্তু, আজ বড় হারিয়েছ। রীতিমত শোধ না দিয়ে আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই।"

শৈলবালা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

উপবন-বিহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া শশাঙ্কশেখর সবে গৃহে ফিরিয়াছিল। পত্নীকে শয়ন-কক্ষে দেখিতে না পাইয়া সে তাহার সন্ধানে আসিতেছিল। সহসা তাহার কর্ণে বিহারী বাবুর কথার শেষভাগ ও পত্নীর সহাস্ত উত্তর প্রবেশ করিল।

শশাঙ্ক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের উপর যেন একটা পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শৈলবালা কক্ষ ত্যাগ করিবামাত্র শশাঙ্ক নিঃশব্দচরণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, তাহার ভগিনীপতি একা বসিয়া আছেন; শয্যার উপর তাস ছড়ান।

শশাঙ্ক হৃদয়ে একটা দারুণ বেদনা অনুভব করিল। সে আর দাঁড়াইল না। নিঃশব্দচরণে কক্ষত্যাগ করিল। বিহারীলাল জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন, তিনি শশাঙ্কের আগমন বা প্রস্থানের সংবাদ জানিতেও পারিলেন না।

সে রজনীতে হতভাগ্য শশাঙ্কের আদৌ নিদ্রা হইল না। পত্নীর ব্যবহার লক্ষ্য করিবার জন্য সে শয্যার উপর জাগিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু শৈলবালা পরম নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা গেল।

৪

শরতের অনাবিল আকাশ আজ সন্ধ্যার পর হইতেই মেঘভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। শয়নগৃহের বাতায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া শৈলবালা কি ম্রিয়মাণ গগনের নিবিড় মেঘরাশি ও স্তিমিত আলোকরেখা নিরীক্ষণ করিতেছিল? মেঘমেদুর আকাশের স্তব্ধতায় তাহার বেদনাক্লিষ্ট হৃদয় যেন আরও শোকাকুল হইয়া উঠিল।

অদূরে ফেনশুভ্র শয্যার উপর খণ্ডজ্যোৎস্নার ন্যায় এক বৎসরের শিশু ঘুমাইতেছিল। শৈলবালা ক্লান্ত নয়নদ্বয় তুলিয়া একবার নিদ্রিত পুত্রের মুখমণ্ডলের উপর স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার হৃদয় মথিত করিয়া বহির্গত হইল।

আজ পাঁচ বৎসর নারীজাতির মঙ্গল আশীর্ব্বাদরেখা সীমন্তে ধারণ করিয়া সে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। শ্বাশুড়ীর অপরিমেয় স্নেহ, ননদিনীর অগাধ ভালবাসা, সে অযাচিতভাবে, প্রচুরপরিমাণে লাভ করিয়াছে। বাড়ীর দাসদাসী, এমন কি, কুকুর বিড়ালটি পর্য্যন্ত তাহার অনুরক্ত, কিন্তু তবু তার প্রাণে সুখ নাই কেন? ধনী পিতার আদরের সন্তান বলিয়া সে আজন্ম কেবল ভালবাসায় ও স্নেহেই লালিত হইয়াছে, এখনও ত আদর যত্নের তিলমাত্র ক্রটী নাই; কিন্তু হায়! তথাপি এই সপ্তদশবর্ষ বয়সে, জীবনের আলোকপূর্ণ উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে তাহাকে কেবল, অশান্তি, অতৃপ্তি ও অবসাদের বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হইতেছে কেন?

স্বামীও ত তাহাকে ভালবাসেন, আদর যত্ন করেন। কিন্তু সে ভালবাসায় কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস কোথায়? শৈলবালার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ ত তাহাতে পুলকিত হইয়া উঠে না! তাহার হৃদয়তন্ত্রী স্বামীর ভালবাসার মোহনস্পর্শে ঝঙ্কৃত হয় না কেন? যে কোমল উজ্জ্বল আলোকপ্লাবনে নারীজন্ম সার্থক হয়, স্বামীর ভালবাসা কি শৈলবালার হৃদয়ে সে স্নিগ্ধ আলোকদীপ্তি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল?

শৈলবালা বহুবার তাহার হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু হায়! সেই পবিত্র, চিরপ্রার্থিত প্রেমসঙ্গীত তাহার অন্তরের সুপ্ত বীণার তন্ত্রীতে কখনও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে নাই। স্বামীর ব্যবহার তাহার একটা দুর্ব্বোধ প্রহেলিকার মত বোধ হইত। শৈলবালা সে প্রহেলিকা, সে ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারিত না। পারিত না বলিয়াই তাহার হৃদয়ে তিলমাত্র শান্তি ছিল না।

দাসী গৃহে আলোক জ্বালিয়া দিয়াছিল। শৈলবালা বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া শিশুপুত্রের দিকে অগ্রসর হইল। সহসা উজ্জ্বলালোকে সে দেখিল, স্বামী দ্বারপার্শ্বে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

শশাঙ্ক চকিতবৎ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হাস্যমুখে বলিল, "আমি এই আসিতেছি। তুমি কি ভাবিতেছিলে বলিয়া আমি তোমাকে বিরক্ত করি নাই।"

শৈলবালা স্বামীর মুখের পানে চাহিল। এ হাস্য কি কৌতুকের রূপান্তর! এ স্নেহসম্ভাষণ কি নিরর্থক প্রাণহীন! হায়! এ মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সত্যের উজ্জ্বল আলোক কখনও কি দেখা দিবে না?

স্বামীর মুখমণ্ডলে তাঁহার অন্তরের চিত্র শৈলবালা দেখিতে পাইল না। সেই পুরাতন রহস্যআবরণ শশাঙ্কের দৃষ্টি ও হাস্য যেন তেমনই গাঢ়রূপে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। শৈলবালা মর্ম্মে মর্ম্মে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিল। বহ্নি কোথায়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, অথচ তাহার দাহিকা-শক্তির জ্বালাময় উত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, এ বড় বিড়ম্বনা!

শৈলবালা নীরবে তাহার বক্ষের উপর নিদ্রিত শিশুটির কুসুমকোমল-স্নিগ্ধ দেহ চাপিয়া ধরিল। সংসার-মরুভূমির মধ্যে এই শিশুটিই যে তাহার একমাত্র ওয়েসিস্!

৫

তিন দিনের হাসি ও বাঁশীর উদ্দীপনাপূর্ণ আনন্দসুরে একটা করুণ ঝঙ্কার তুলিয়া জগন্মাতা বাহক-স্কন্ধে উঠিলেন।

বন্ধুবর্গের উপরোধে পড়িয়া শশাঙ্ক বিসর্জ্জন দেখিতে গিয়াছিল।

পূজার ছুটীতে এ বৎসরও বিহারী বাবু সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন। তরুলতার সাধ, ভ্রাতুষ্পুত্রটির মুখ দেখিয়া যায়।

প্রতিমা চলিয়া গেলে তরুলতা স্বামীকে বলিল, “চল না, ভাসান্ দেখে আসি? অনেক দিন বিসর্জ্জন দেখি নাই।”

বিহারীলালও বহুকাল বিজয়ার উৎসব দেখে নাই, সুতরাং অত্যন্ত উৎসাহে তিনি প্রস্তুত হইলেন।

তরুলতা বলিল, “মা, তুমি যাবে না?”

জননী বলিলেন, “না বাছা, তোরা দেখে আয়। বৌমাকেও নিয়ে যাস্। বাছা আমার কোথাও যেতে পায় না।”

উৎসব দেখিতে দেখিতে সহসা শশাঙ্কের মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কোনও গতিকে বন্ধুবর্গের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া সে রাত্রি আটটার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জননীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই সে তাড়াতাড়ি স্বীয় শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল; কিন্তু বিজয়ার শুভ অর্ঘ্য লইয়া কেহ ত তাহাকে বন্দনা করিতে আসিল না!

বস্ত্রত্যাগ না করিয়া সে দ্রুতপদে অন্যান্য কক্ষগুলি খুঁজিয়া আসিল। কিন্তু কোথায়? শৈলবালা, বিহারী বাবু ও তরুলতা, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শশাঙ্কের বক্ষঃস্থল অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

দাসী যখন বলিল, বৌদিদি, জামাই বাবু ও দিদিমণির সহিত বিসর্জ্জন

দেখিতে গিয়াছে, তখন পৃথিবীটা যেন তাহার পদতল হইতে সরিয়া গেল। দলে পড়িয়া সে আজ দুই এক পাত্র কারণ-সুধা পান করিয়াছিল, বোধ হয়, তাহারই প্রভাবে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে নাই!

মিষ্টান্নের থালা সম্মুখে রাখিয়া দাসী বলিল, "দাদা বাবু, একটা ডাব কাটিয়া দিব?"

বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে শশাঙ্ক দাসীকে বলিল, "যা, যা, তোর আর ন্যাকাম করিতে হইবে না।"

পালঙ্কের নিম্নে জলখাবারের পাত্র, ডাব ও কাটারী রাখিয়া দিয়া দাসী চলিয়া গেল।

বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ স্তব্ধ মেঘের মত শশাঙ্ক বসিয়া রহিল। তাহার মস্তকের মধ্যে ও হৃদয়ের স্তরে স্তরে অগ্নি জ্বলিতেছিল।

প্রতিবেশীরা বিজয়ার সম্ভাষণার্থ আসিয়া শশাঙ্কশেখরের সন্ধান করিল। শশাঙ্ক কক্ষত্যাগ করিল না। মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোর অসুখ করেছে না কি?"

এত বয়স পর্য্যন্ত শশাঙ্ক জননীর মুখের উপর জোর করিয়া একটিও কথা কহিতে সাহস করে নাই। আজ সে তীব্রস্বরে বলিল, "যাও, যাও, বিরক্ত ক'রো না। আমার কিছু হয় নি।"

৬

শাশুড়ীর প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ লইয়া শৈলবালা স্বামিসন্দর্শনে চলিল। অনেক দিন পরে আজ তাহার মুখখানি প্রফুল্ল পদ্মের মত দেখাইতেছিল। সদ্যোনিদ্রোত্থিত খোকা মাতার কোলে চড়িয়া জননীর স্নেহদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। গভীর স্নেহভরে শৈল পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই শৈলবালা ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। কিন্তু শশাঙ্ক মুখ ফিরাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

শৈলবালা মানসিক প্রফুল্লতাবশতঃ স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই। সে পুত্রকে স্বামীর কোলের উপর বসাইয়া দিয়া সহাস্যে বলিল, "আজ বিজয়া, খোকাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

অগ্নিতে যেন ইন্ধন পড়িল। শশাঙ্কের মস্তকে কে যেন ভীম লৌহদণ্ড প্রহার করিল। সে ছিন্ন-গুণ ধনুর ন্যায় সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পুত্রের মুখে

দারুণ ঘৃণাভরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। তার পর সবলে শিশুকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিল, "কুলটা, বিশ্বাসঘাতিনী, ও কি আমার ছেলে? যে ওর জন্মদাতা, এতক্ষণ ত তার কাছেই ছিলি। যা, তার কাছেই ওকে নিয়ে যা, সে আদর কর্‌বে।"

শশাঙ্কের নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। আরক্ত চক্ষুযুগল হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। পত্নীর আনমিত দেহে পদাঘাত করিয়া শশাঙ্ক উল্কার ন্যায় বেগে কক্ষ ত্যাগ করিল।

তরুলতা ও বিহারী বাবু শশাঙ্কের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। পরিচারিকারাও সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া তখনই সকলে ফিরিয়া গেল।

স্বামীর নিদারুণ বাণী শৈলবালার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা বিস্ফোরক গোলার ন্যায় তাহার পদতলে বিদীর্ণ হইয়া গেল। বহুক্ষণ এই বজ্রাগ্নিপূর্ণ কথাগুলি ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

এই স্বামী? এই সংসার? ইহারই নাম প্রণয়? উত্তপ্ত শোণিতস্রোত শৈলবালার মাথায় উঠিল। প্রচণ্ড আকর্ষণে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন দীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শৈলবালা হৃদয়ের মধ্যে একটা মহাশূন্য অনুভব করিল। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল?

শিশুপুত্র ভূমিতলে পড়িয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। শৈলবালার কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিল; কিন্তু তাহার হৃদয়ের কোনও কোমল তন্ত্রী তাহাতে আহত হইল না। সে কেবল নির্নিমেষলোচনে শিশুর পানে চাহিয়া রহিল।

আঘাতের প্রথম অবস্থায় তাহার ক্রিয়া অনুভব করা যায় না; কিন্তু যখন প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়, তখন সে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। স্বামীর নিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড শক্তিশেল শৈলবালার হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। যন্ত্রণা ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিল।

শৈলবালা অনুভব করিল, বিশ্বের সমুদয় কৌতূহলী চক্ষু যেন বিদ্রূপভরে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। বাড়ীর দাস-দাসীদিগের নীরব-হাস্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে তীক্ষ্ণ-মুখ শূলের ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে। গৃহের বাতাসও যেন ক্রমশঃ তাহার নিকট লঘু হইতে লঘুতর

হইয়া আসিল। শৈলবালার বোধ হইল, কেহ যেন কঠিন লৌহহস্তে তাহার কণ্ঠরোধ করিতে আসিতেছে!

শিশু আবার কাঁদিয়া উঠিল। স্বামীর নিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবন শিশুর শুভ্রললাট ও আনন কলঙ্কিত করিয়া যেন প্রদীপ্ত অঙ্গারখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছিল। তাহার বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে পবিত্র দেব-শিশু পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছে, তাহার ললাটে এ কি মসী-চিহ্ন!—সে জারজ?

অসহ্য যন্ত্রণাভরে শৈলবালা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। অমনই তাহার বোধ হইল, সহস্র কণ্ঠের ব্যঙ্গহাস্যধ্বনি যেন তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে, লক্ষ রসনা যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—ঐ, ঐ জারজ সন্তান।

দুই হস্তে অভাগিনী নয়নযুগল চাপিয়া ধরিল। কর্ণে অঙ্গুলি চাপিয়া শ্রবণ-পথ রুদ্ধ করিতে চাহিল; কিন্তু আজ পৃথিবীতে কি অন্য কোনও শব্দ নাই? আকাশের বজ্র,—সেও কি নীরব?

সহসা শৈলবালার হৃদয়ে একটা রাক্ষসী প্রকৃতি প্রচণ্ডতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সংহারিণী শক্তি তাহাকে যেন মাতাল করিয়া তুলিল। এ কি অগ্নি! এ কি তীব্র যন্ত্রণা! আজ পৃথিবীতে কি নরকের অনলকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে? শৈলবালার নয়নে কালাগ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিয়া উঠিল।

সহসা একটা তীব্র আর্ত্তনাদ ও বিকট চীৎকারধ্বনি কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া গেল। বিপদের আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বাগ্রে তরুলতা স্বামীর সহিত শশাঙ্কের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কি সর্ব্বনাশ!—বিস্ময়ে আতঙ্কে তাহাদের বক্ষঃ-স্পন্দন যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শোণিতপ্লাবিতদেহে মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর শিশু ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছে! তাহার গলদেশে ও স্কন্ধে গভীর ক্ষতচিহ্ন। শশাঙ্কের অভুক্ত মিষ্টান্ন ও ডাব শোণিতচর্চ্চিত; কক্ষতল শিশুর রক্তে প্লাবিত!

সম্মুখে অর্দ্ধবিবসনা উন্মাদিনী কর্ত্তরিকা-হস্তে দাঁড়াইয়া শিশুর পানে শূন্য-নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। এই কি সেই মাতৃত্বের পূর্ণ-মূর্ত্তি শৈলবালা? আজ তাহার স্নেহকাতর-নয়নে সে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি কোথায়? আজ এ কি সংহারিণী মূর্ত্তি!

লৌহ-অস্ত্রের অঙ্গ বহিয়া উষ্ণ রক্তধারা ভূমিতল সিক্ত করিতেছিল। বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনে বিসর্জ্জনের বাদ্য তখনও থামে নাই।

মিশরের রাজ-সিংহাসন।

বৈদিক যুগের অবসানসময়ে আর্য্যভূমে ব্রাহ্মণ্য-শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তখন হইতেই ভারতবর্ষে কৌলিক-পৌরোহিত্য-প্রথা সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে সমাজের শীর্ষস্থানে রক্ষা করিতে যত্নবান হইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারতের যুগে যখন আর্য্যধর্ম্ম বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতিলাভ করিয়া শুধু আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের বাহুল্যে সরলচিত্ত আর্য্যহিন্দুকুলকে ব্যাকুল করিয়াছিল, তখন দোয়াবখণ্ডে নিত্য নব নব রাজ্যবিস্তার করিয়া, নব নব গ্রাম জনপদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আর্য্য বীরসিংহগণ, আর্য্য নৃপতিগণ, অশ্বমেধাদি নানাবিধ বৃহৎ ও জটিল যজ্ঞ করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তখন ক্রিয়াধর্ম্মনিপুণ বেদমন্ত্রাভিজ্ঞ পুরোহিতগণ নৃপতিদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া সমাজমধ্যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে পঞ্জাবের হিন্দুকুলে রাজন্যজাতির সৃষ্টি হয় নাই। তাঁহারা তখন রণনিপুণ, সাহসী, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী; তাঁহাদিগের উন্মুক্ত শাণিত কৃপাণের পশ্চাতে তখন বিজয়ের পর বিজয়, প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠা, অনার্য্য-পরাভবের পর অনার্য্য-পরাভব। তখনকার যুগে সুদাস কিংবা বিশ্বামিত্র আর্য্যবীরকুলের প্রধান নেতা বলিয়াই সমধিক পূজিত,—সিংহাসনারূঢ় নৃপতি বলিয়া নহে। কিন্তু শস্যশ্যামল গাঙ্গ্যতীরবর্ত্তী হিন্দুকুলের অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল।

সমরকুশলী কুরু ও পাঞ্চালের যুগে জাতিভেদপ্রথা ভারতে অধিকারলাভ করে নাই, কিন্তু শান্তিপ্রিয় কোশল ও বিদেহ-রাজগণ যখন সগৌরবে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তখন রাজন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন কোশলের ও বিদেহের নৃপতিদিগের সভায় রাজকীয় সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা পরিদৃষ্ট হইত; তখন দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় পর্য্যন্ত রাজসম্মানলাভের আশায় রাজসভায় আগমন করিতেন।

মানসনয়নে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, রামায়ণ মহাভারতের যুগে হস্তিনাপুর, কাম্পিল্য ও অযোধ্যা স্বর্ণপুরীসদৃশ ছিল। সুগঠিত, সুদৃঢ়, উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত নগর; নগরের মধ্যে চতুর্দ্দিকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন সরল রাজপথ; সেই সকল সুদীর্ঘ পথিপার্শ্বে রম্য হর্ম্ম্যনিচয় সগৌরবে ঐশ্বর্য্য ও

আড়ম্বর বিজ্ঞাপিত করিতেছে। নগরের কেন্দ্রস্থলে রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের সিংহদ্বার সদা মুক্ত; কখন বা এক জন কলহপ্রিয় ক্ষুব্ধ প্রত্যন্তরাজ, অথবা বর্ম্মচর্ম্মধারী এক জন অশিক্ষিত সৈনিকযুবক, অথবা দীর্ঘজটাজূট-সমন্বিত শান্তস্বভাব তেজঃপুঞ্জকান্তি এক জন বৃদ্ধ তপস্বী কমণ্ডলুকরে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেছেন। প্রহরে প্রহরে ঐক্যতানবাদ্যোদ্যমের সুস্বরলহরী নগর সঞ্জীবিত করিতেছে। সুশীল, শান্ত, অপেক্ষাকৃত ভীরুস্বভাব, দরিদ্র, রাজন্যেতর জাতি তখন কোশল ও বিদেহের রাজসভা দর্শনে সবিস্ময়ে মনে করিত;—এত সৌভাগ্য, এত সম্পদ, এত শক্তি কখনই মনুষ্যে সম্ভবে না;—ইঁহারা মনুষ্য নহেন, মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রাজপুরে তখন উৎসবের অবধি ছিল না। দরিদ্র প্রজাকুল উৎসব-কোলাহলে যোগ দিয়া সানন্দে রাজপ্রাসাদে যাতায়াত করিত। প্রতি মুহূর্ত্তে নৃপতির ধন সম্পদ সমৃদ্ধি দেখিয়া চমকিত হইত; তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে ভয়-ভক্তি করিত। এই ভীতিবিমিশ্রিত ভক্তি কেমন করিয়া যুগান্তরে ধীরে ধীরে স্নেহে,—শিশুসন্তান যেমন পিতাকে ভালবাসে, সেইরূপ ভালবাসায়—পরিণত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে চিত্রিত রহিয়াছে।

ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, রাজন্যগণ ততই সিংহাসনের বাহ্যিক আড়ম্বরে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ের অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; শক্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল। তখন নিরীহ রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ সভয়সম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে ক্রমেই দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। পুরোহিতগণ তখন সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, শক্তিও তখন তাঁহাদিগের অপরিসীম। ভাগীরথীতীরে তখন যে সকল নৃপতি ও ক্ষত্রিয়গণ বাস করিতেন, তাঁহারা সৌভাগ্যে সম্পদে তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; পঞ্চনদের হীনবল কৃষককুল এক হস্তে হল ও অপর হস্তে অসি লইয়া আর তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিতে সাহস করিত না। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সেই বৈশ্যজাতির কণ্ঠে যে বশ্যতাশৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া নিজেরা একান্ত স্বতন্ত্র ও সমুন্নত হইলেন, সে শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিবার সামর্থ্য আর কাহারও রহিল না। তখন হইতেই ক্ষত্রিয় বা রাজন্যজাতির দুহিতারা স্বজাতির কণ্ঠে কুসুমমালা অর্পণ করিয়া স্বয়ংবরসভায় স্বয়ং বৃতা হইতে লাগিলেন। বৈশ্যদিগের আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল। পুরোহিতগণ ইতি-পূর্ব্বেই পৃথক হইয়াছিলেন। এখন রাজন্যজাতিও পৃথক হইয়া গেলেন।

স্বাধীন স্বতন্ত্র ক্ষত্রবীরগণ যদিও সিংহাসনে আরোহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৃত নৃপতি রহিলেন ব্রাহ্মণ।

ধর্ম্মের সহিত রাজসিংহাসনের ও সিংহাসনের সহিত স্বদেশ ও সমাজ-শাসনের চিরঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মিশরীয়গণ তাহা বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মের রক্ষক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হইতে রাজা নির্ব্বাচিত হইত। যদি কখনও ক্ষত্রিয় রাজা হইতেন, তাহা হইলে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ব্রাহ্মণধর্ম্মে দীক্ষিত এবং শিক্ষিত হইতে হইত। সিংহাসনের পার্শ্বে বসিয়া মহানুভব জ্ঞানবৃদ্ধ পুরোহিতগণ নৃপতিকে সর্ব্ব বিষয়ে পরিচালিত করিতেন।

হিন্দুর গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ; সেই কারণেই আর্য্যহিন্দু একদিন সর্ব্বজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের উপনয়নে, বৌদ্ধের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয়গ্রহণে, খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনে, হিন্দুর বেদে, মুসলমানের কোরাণে, খ্রীষ্টানের বাইবেলে, সর্ব্বত্রই অভিষেক-ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। অভিষেক করিয়া মাঙ্গলিক কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রথা সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের মধ্যেই আছে।

সেকালে হিন্দু রাজকুমার সিংহাসনারূঢ় হইবার পূর্ব্বে রাজসিংহাসন ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইত। ব্যাঘ্রের মুখ পূর্ব্বদিকে রক্ষিত হইত। পুণ্য-সলিলে সুস্নাত, দিব্য বসন ভূষণে সুসজ্জিত সুকুমার যুবরাজ সেই ব্যাঘ্র-বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে পশ্চাৎদিক হইতে সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইতেন। মুগ্ধ হৃষ্ট প্রজাবৃন্দের আনন্দধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন করিত। তখন একজানু ভূমিতলে সংলগ্ন করিয়া বসিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত রাজসিংহাসন সসম্ভ্রমে ভক্তিভরে স্পর্শপূর্ব্বক যুবরাজ মন্ত্র পাঠ করিতেন। সে মন্ত্র কেবল আশীর্ব্বাদ ও শক্তি-ভিক্ষামাত্র।

তখন স্বর্ণ-কলসে সঞ্চিত আয়াসে সংগৃহীত পূতবারি লইয়া পবিত্রহৃদয়, শুদ্ধদেহ, মহাজ্ঞানী পুরোহিতগণ যুবরাজের উড়ুম্বরশাখাসমাচ্ছাদিত শিরে ঢালিয়া দিতে দিতে বলিতেন,—"সুখসম্পদবিধায়ক বারি দ্বারা তোমাকে আজ আমরা নিষিক্ত করিলাম। এই বারিস্পর্শে সর্ব্ব দুঃখ সর্ব্ব ব্যাধি বিনষ্ট হয়; ইহার পবিত্র স্পর্শে তোমার রাজ-শক্তি বিকশিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। অমর প্রজাপতি একদিন দেবরাজ ইন্দ্রকে যে বারিযোগে স্নান করাইয়াছিলেন, আমরাও আজ সেই বারি দ্বারা তোমাকে স্নান করাইলাম। তুমি ভূমণ্ডলের

একচ্ছত্র অধিপতি হও। মহামহিমময়ী জননী তোমাকে বিশ্বশাসনের জন্যই জন্ম দিয়াছেন।" ইত্যাদি।

তার পর যখন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত নরপতির শিরে কনককিরীট অর্পিত হইত, পুরোহিতগণ তখন বলিতেন,—"বিশ্বের বিধাতা সেই পরমেশ্বর তোমাকে প্রজাশাসনের শক্তি প্রদান করুন। গৃহে গৃহে যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে ও নিয়ত পূজিত হয়, সেই অগ্নি তোমাকে সর্ব্বশক্তিমান্ করুন;—তুমি সেই হোমাগ্নির ন্যায় প্রতি গৃহস্থের পূজনীয় হও। বৃক্ষাদির রাজা সোম তোমাকে অরণ্যের উপর আধিপত্য প্রদান করুন; বৃহস্পতির বরে তোমার কণ্ঠে সরস্বতী আবির্ভূতা হউন। সর্ব্বদেবের শ্রেষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে সকলের শ্রেষ্ঠ করুন;—পশুকুলের রক্ষক রুদ্রের বরে তুমি সর্ব্বপশুর নিয়ন্তা হও। সত্যরূপে পরিচিত স্বয়ং মিত্র তোমাকে সত্যের মূর্ত্তি প্রদান করুন;—সৎকর্ম্মের আধার বরুণদেবের কৃপায় তুমি সর্ব্বদা সৎকার্য্যে ব্যাপৃত হও।"

নবাভিষিক্ত নরপতিকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহারা প্রজাকুলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন,—"হে কুরুবংশীয়গণ! হে পাঞ্চালগণ! যিনি তোমাদের সম্মুখে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, আজ হইতে তিনিই তোমাদিগের রাজা।" রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ তখন নৃপতির মঙ্গলকামনায় মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিত। সে দৃশ্য কি মহান্, কি পবিত্র, কি স্বর্গীয়! তখন ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দেবতার বর সম্মিলিত হইয়া অভিষেকবারিনিষিক্ত নৃপতির মস্তকে পুষ্পরাশি বর্ষণ করিত। তাঁহাকে কর্ম্মের, ধর্ম্মের ও কর্ত্তব্যের পথে চির-প্রবুদ্ধ করিত।

তখন পুরোহিতগণ শেষবার নরপতিকে কহিতেন,—"হে রাজন্! যদি আপনি ধরণীর শাসক হইতে চাহেন, তাহা হইলে আজ হইতে দুর্ব্বলে সবলে কোনও ভেদ করিবেন না; সকলকেই সমভাবে দেখিবেন, সর্ব্বদা সর্ব্ব-সাধারণের মঙ্গলবিধানের জন্য আজ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য আজ হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইবেন।" এখনও হিন্দু নরপতিদিগের অভিষেক হয়, কিন্তু সে অভিষেকে কি এই মহামন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে?

ভারতের ন্যায় মিশরেও সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে অভিষেক করিবার বিধি ছিল। অভিষেকসময়ে কি কি কার্য্য হইত, তাহার বিশদ বিবরণ পাইবার উপায় নাই। প্রাচীন মিশরে চিত্রাক্ষর প্রচলিত ছিল। অনেক

ধর্ম্মমন্দিরের গাত্রে নানাবিধ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল চিত্র যে লেখকের কল্পনাপ্রসূত, তাহা নহে; উহাদিগের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ঐ সকল চিত্র হইতেই প্রাচীন মিশরের অনেক কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সকল কাহিনীই এখন মিশরের ইতিহাস নামে খ্যাত।

মিশরের রাজা তৃতীয় রেমেসিস্ একদা এসিয়াখণ্ডে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। যুদ্ধে বিজয়লাভপূর্ব্বক মিশরে প্রত্যাগত হইয়া থিবির মন্দিরে ও অন্যান্য স্থানে বিজয়-বিবরণ চিত্রিত করাইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদসংলগ্ন মেদিনেত হাবুর মন্দিরগাত্রে সেই সময়ের অনেক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে অভিষেক-কাহিনীও লিখিত আছে।

মন্দিরগাত্রে চিত্রাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, তৃতীয় রেমেসিস্ আমুন্‌ক্কেম্ নামক বিগ্রহের সম্মুখে পূজারত। দেবতার আসন প্রফুল্ল কুসুমরাশিতে পূর্ণ। অন্যান্য অর্ঘ্যও তথায় বিদ্যমান। দ্বিতীয় চিত্রে,—দ্বাবিংশ জন পুরোহিত একখানি শিবিকা বহিয়া লইয়া যাইতেছেন; শিবিকাখানি বহুমূল্য আস্তরণে ও ঝালরে সুশোভিত। রাজ-অমাত্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ ছত্র চামর লইয়াছেন। শিবিকার অভ্যন্তরে আমুন্‌ক্কেম্ বিগ্রহ যত্নে স্থাপিত; পশ্চাতে কাহারও স্কন্ধে বিগ্রহের আসন, কাহারও নিকট অর্ঘ্যস্থাপন করিবার টেবিল (Table); সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতার স্বরূপ একটি শ্বেতকায় ষণ্ড ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং নরপতি গমন করিতেছেন। দূরে অবস্থান করিয়া রাজমহিষী এই যাত্রা নিরীক্ষণ করিতেছেন। এক জন রাজ অমাত্য একখানি কাগজ খুলিয়া পাঠ করিতেছেন, এবং মহিষীকে শুনাইতেছেন।

তৃতীয় চিত্রে অঙ্কিত আছে, এক জন পুরোহিত সেই ধবল বলীবর্দ্দটিকে গন্ধদ্রব্যাদি প্রদান করিতেছেন, এবং অপর এক জন করতালিধ্বনি করিয়া পশ্চাৎবর্ত্তী Hicraphosi-(এক শ্রেণীর পুরোহিত)-দিগকে ত্বরিতপদে আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তাঁহাদিগের কাহারও হস্তে জাতীয় পতাকা, কাহারও হস্তে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি, কেহ বা ধর্ম্মের বাহ্যিক পবিত্র চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া চলিয়াছেন। যে সকল পুরোহিত অগ্রে যাইতেছেন, তাঁহাদিগের হস্তে তৃতীয় রেমেসিসের পিতৃপুরুষদিগের মূর্ত্তি।

চতুর্থ চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরোহিতমণ্ডলীর সভা। সেই সভার অধ্যক্ষ একটি দীর্ঘ আশীর্ব্বচন পাঠ করিতেছেন। এক জন ব্রাহ্মণ ছয়-

গাছি ধান্যশীর্ষ লইয়া দেবতার সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। কিরীটধারী রেমেসিস্ স্বর্ণনির্ম্মিত কর্ত্তনী দ্বারা এই ধান্যশীর্ষগুলি কর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমুন্‌ক্ষেম্ বিগ্রহের সম্মুখে নৃপতির পূর্ব্বপুরুষদিগের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে,—তাঁহারাও যেন দেবতার নিকট বংশধরের কল্যাণকামনায় নিযুক্ত। শ্বেত ষণ্ডটিও তথায় বর্ত্তমান। এখানেও মহিষী দূরে থাকিয়া দেখিতেছেন তৃতীয় রেমেসিস্ পূজারত,—ভক্তিভরে আমুন্‌ক্ষেমের পদে অর্ঘ্যভার ঢালিয়া দিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন।

পঞ্চম চিত্রে লিখিত আছে, Adtant ও Hat (মিশরীয়দিগের দেবতা) শক্তি ও প্রাণ-সঞ্জীবনী সুধাধারা বর্ষণ করিয়া রেমেসিস্‌কে পুনঃপুনঃ নিষিক্ত করিতেছেন; অন্য স্থানে শ্রেষ্ঠ পুরোহিতগণ পথপ্রদর্শকস্বরূপ অগ্রে চলিয়াছেন; রেমেসিস্ তাঁহাদিগের সঙ্গে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও মঙ্গলময় দেব দর্শনে গমন করিতেছেন।

ষষ্ঠ চিত্রে চিত্রকর Pthah Sakari ও knepp-এর মূর্ত্তি লিখিয়াছেন। রেমেসিস্ ইহাঁদিগের পূজা করিতেছেন। প্রথমোক্ত দেবতার সম্মুখে ধূপের ন্যায় এক প্রকার গন্ধদ্রব্য জ্বলিতেছে, তাহার সুগন্ধে সমস্ত মন্দির ও প্রাঙ্গন সুবাসিত। পরের চিত্রে দেখা যায়, রেমেসিসের আটটি তনয় ও চারি জন প্রধান অমাত্য গমন করিতেছেন; দুই জন পুরোহিত তথায় উপস্থিত। এমন সময় তৃতীয় রেমেসিস্ আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পুরোহিতদ্বয় নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লইয়া রাজার করে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছেন। রাজসিংহাসনের অমিতবিক্রম ও অসীম দূরদৃষ্টির চিহ্নস্বরূপ একটি শ্যেনপক্ষী সর্ব্বাগ্রে বাহিত হইয়া চলিয়াছে; অষ্টাদশ জন পুরোহিত Nofri Atmoo নামক দেবতার চিহ্নধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। পশ্চাতে মহতী জনতা। জনতার মধ্যে Heeraphosiগণ নানাবিধ বিজয়-পতাকা, রাজসিংহাসন, রাজকীয় জাতীয় চিহ্নাদি বহিয়া লইয়া যাইতেছেন;—বাদ্যকরেরা মহোল্লাসে নানাবিধ যন্ত্র বাজাইতেছে; সকলের পশ্চাতে অমাত্যগণ ও ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া pshent পরিধান করিয়া স্বয়ং নৃপতি তৃতীয় রেমেসিস্ গমন করিতেছেন।

হিন্দু নরপতির অভিষেক ও মিশরীয় নরপতির অভিষেকে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। তবে মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ, দেবতার নিকট কৃপা ও শক্তি ভিক্ষা,

দেবপূজা, বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি উভয় দেশেই ছিল। ভারতেও যেমন, মিশরেও তেমনই শক্তিশালী ব্রহ্মণ্যের কৃপা সর্ব্ব কার্য্যে প্রয়োজন হইত।

এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া মিশরের নরপতি স্বদেশের শাসক ও প্রতিপালক রূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। সাধারণতঃ রাজপুত্রই রাজা হইতেন; রাজপুত্রের অভাবে রাজার নিকটতম আত্মীয়ও সিংহাসনে বসিতে পাইতেন; আবার কখনও কখনও রাজমহিষীও রাজ্যভার গ্রহণ করিতেন।

হিন্দু নরপতির ন্যায় মিশরীয় নরপতিও ধর্ম্মের রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। দেব-মন্দিরে বলি ও পূজার ব্যবস্থা তিনিই করিতেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে তিনি স্বহস্তে ভোগ ও পূজা দিতেন। দেবতার উপলক্ষে যে সকল উৎসব হইত, সেই সকল উৎসবে জনসাধারণের প্রসাদপ্রাপ্তি ও অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের তত্ত্বাবধান রাজাকে করিতে হইত। নরপতি ভিন্ন আর কেহই ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন না। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধঘোষণা, শান্তিসংস্থাপন, সৈন্য-পরিচালন, বীরের সম্মান, কাপুরুষের দণ্ডবিধান প্রভৃতি রাজার বিচারের উপরই নির্ভর করিত।

যদিও ঐতিহাসিক ডিওডোরস্ বলিয়াছেন, প্রাচীন মিশরে রাজত্ব বংশগত ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই প্রথাই সর্ব্বদা অবলম্বিত হইত কি না, বলা নিতান্ত দুরূহ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, উভয় সম্প্রদায় হইতেই নরপতি-নির্ব্বাচনের প্রমাণ মিশরের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

যিনিই যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তাঁহাকেই চিরপ্রচলিত বিধি নিয়মের দাস হইয়া থাকিতে হইত। মিশরের অনুশাসনগুলি ধর্ম্মগ্রন্থের অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইত; সাধারণের বিশ্বাস ছিল, মিশরের মঙ্গল-দাতা দেবতা এক শুভমুহূর্ত্তে সেই সকল অনুশাসনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মভীরু মিশরীয়গণ কোনও মতেই সেই সকল অনুশাসনের ব্যত্যয় ঘটিতে দিত না। বিধি-নিয়মগুলি যে শুধু জনসাধারণের জন্যই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে; স্বয়ং নরপতির গার্হস্থ্যজীবন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বশবর্ত্তী ছিল। এমন কি, তাঁহাদিগের দৈনিক আহার্য্য পেয় প্রভৃতিও তথাকথিত ঐশ্বরিক অনুশাসনে আদিষ্ট ও স্থিরীকৃত ছিল; নিজের ব্যক্তিগত অসুবিধা বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা স্বেচ্ছাচারিতার তাড়নে সেই সকল অনুশাসন লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কোনও নৃপতিরই ছিল না।

মিশরের সুবর্ণযুগে ক্ষত্রিয় নরপতির সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও তাহাই দৃষ্ট হইবে। হোম-যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা লইয়াই ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; পরমার্থ চিন্তাই তাঁহাদিগের একমাত্র চিন্তা ছিল; ঐহিক সুখসম্পদের দিকে কোনও কালেই তাঁহাদিগের দৃষ্টি ছিল না। ব্রাহ্মণ-যোদ্ধা যে ইতিহাসে অপরিচিত, তাহা নহে। বরং নিতান্ত সুপরিচিত। কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ বীরত্বে সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহারা অনন্যচিন্ত হইয়া কেবল অস্ত্রচালনাই করিতেন, শক্তির পূজায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা প্রভৃতিতে এককালে তাঁহাদিগের আদৌ কোন অধিকারই ছিল না, পরে হইয়াছিল বটে। ব্রাহ্মণ পালনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইয়াছিলেন সংহার করিয়া রক্ষা করিবার জন্য। ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতেছিলেন, ক্ষত্রিয় পালন করিতেছিলেন, রক্ষা করিতেছিলেন। ক্ষত্রিয়ের অভাবে ব্রাহ্মণ শুধু তীব্র দীপ্ত তেজোমাত্র; ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা অপ্রতিহত মূঢ়শক্তিমাত্র। শক্তি ছিল বলিয়া ব্রহ্মণ্য-তেজঃ ধৃত হইয়াছিল; তাই আর্য্যভূমি জীবিত ছিল, উন্নত হইয়াছিল, পূজা পাইয়াছিল। মিশরেরও সেই অবস্থা।

সেই জন্য যখন ক্ষত্রিয় বীর মিশরসিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন তাঁহাকে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হইত। দেবপূজা, দেবমাহাত্ম্য, ধর্ম্মতত্ত্ব, ব্রাহ্মণসমিতির আচার ব্যবহার, দেশের প্রচলিত অনুশাসন ও নরপতির কর্ত্তব্য প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয় ক্ষত্রিয় নরপতি ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা করিতেন; ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতে ও মিশরে ক্ষত্রিয় আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় নরপতি সম্যক্ শিক্ষালাভের পূর্ব্বে যাহাতে কুসংসর্গে পতিত না হয়েন, যাহাতে স্বেচ্ছাচারী না হয়েন, এই জন্য নিম্নশ্রেণীর কোনও ব্যক্তিই তাঁহার নিকটে আসিতে পাইত না, দাস দাসী পর্য্যন্ত নহে। শুধু শিক্ষিত, উন্নতচরিত্র ব্রাহ্মণকুমারগণ তাঁহার সেবা করিত; সেবায় মুগ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয় নরপতি তাঁহাদিগেরই নিকট কত শিক্ষালাভ করিতেন। যে দাস সেবায় শিক্ষা দেয়, সে দাস নহে, পরম গুরু। আত্মত্যাগ ব্রাহ্মণের চিরধর্ম্ম; ব্রাহ্মণ দধীচি তাই আত্মত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ের হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ধন্য ব্রাহ্মণ!

রাজা স্বাধীন ছিলেন না; মহাজ্ঞানী পূর্ব্বপুরুষগণ দেশের ও জাতির কল্যাণকামনায় যে সকল বিধি-নিয়মের গঠন ও প্রচলন করিয়া গিয়াছিলেন,

মিশর-নরপতি সেই সকল অনুশাসনের চিরদাস ছিলেন। জনসাধারণে জানিত, নরপতি রাজ্যের এক জন অন্যতম অমাত্যমাত্র; রাজসিংহাসন শুধু তাঁহারই সুখসম্ভোগের জন্য নহে; যে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির তিনি শাসক, সেবক, যে জাতির তিনি সর্ব্বমঙ্গলামঙ্গলকারী, সিংহাসন তাহাদিগেরও সুখসম্পদের জন্য। মিশর জাতি নৃপতির অধীন ছিল না বলিলেও বলা যায়।

প্রভাতে রাজকার্য্য আরব্ধ হইত। তখন সমুদয় পত্রাদিপঠন, লিখন ও তদ্বিষয়ের আলোচনার সময় ছিল। প্রভাতের মত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাজা স্নান করিতেন। স্নানান্তে শুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহাকে প্রধান দেবমন্দিরে যাইতে হইত। তথায় পূজা ও নিত্য বলি সুসম্পন্ন হইত। দেবতার উদ্দিষ্ট বলি যখন বেদীর সম্মুখে আনীত হইত, তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত রাজার নিকটে সরিয়া দাঁড়াইতেন; সমাগত জনসাধারণ অল্প দূরে থাকিয়া নরপতির সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা, প্রজাবৃন্দের সহিত সদ্ব্যবহার ও চিরাচরিত অনুশাসনে সম্মান প্রভৃতির জন্য দেবতার নিকট রাজসিংহাসনের চিরমঙ্গল প্রার্থনা করিত। তখন পুরোহিতশ্রেষ্ঠ একে একে নৃপতির সমুদয় গুণাবলীর বর্ণনা করিতেন; তাঁহার দেবতায় ভক্তি, সস্নেহ ব্যবহার, আত্মসংযম, তাঁহার অহিংসা ও লোভহীনতা, অপরাধীর প্রতি সকরুণ ব্যবহার ও সাধুতার পুরস্কারপ্রদান প্রভৃতির সাধুবাদে মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিত।

সাধুবাদ সমাপ্ত হইলে রাজার রাজকার্য্য ও চরিত্রসমালোচনা আরব্ধ হইত। প্রধান পুরোহিত তখন নৃপতির ভ্রমত্রুটী প্রদর্শন করিতেন। ইংরাজী বাক্য,—"King can do no wrong" অর্থাৎ নরপতি সর্ব্বদাই অপরাধশূন্য,—আইনের ইতিহাসের প্রধান গ্রন্থি। প্রাচীন মিশরীয়গণ সেই যুগেও ইংরাজের এই সত্য জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই রাজচরিত্র-সমালোচনায় তাঁহার ভ্রম ত্রুটী, অপাত্রে বিশ্বাসস্থাপন প্রভৃতির প্রদর্শনকালে কখনই নৃপতির স্কন্ধে দোষারোপ করিতেন না। রাজার মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্যদিগের উপরই সে সকল অপরাধ আরোপিত হইত; কেন না, তাঁহারাই সর্ব্বকার্য্যে নৃপতির পরামর্শদাতা ছিলেন। এইরূপ চরিত্রসমালোচনায় রাজ্যের ও রাজার যথেষ্ট কুশল হইত।

এই সকল কার্য্য সমাপ্ত হইলে মন্দিরের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী

(পুরোহিত) ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে মহানুভব ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি পাঠ করিয়া রাজাকে শুনাইতেন ;—পূর্ব্বনরপতিগণ জীবনব্যাপিনী অভিজ্ঞতার ফলে যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিতকামনায় যে সকল শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তও পঠিত হইত ; রাজা একান্তমনে সেই সকল মধুর কাহিনী শ্রবণ করিতেন।

নৃপতি যে কেবল বাহিরেই এইরূপে শিক্ষালাভ করিতেন, তাহা নহে ; গৃহেও শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। রাজা কোন সময়ে ভ্রমণ করিবেন, কখন স্নান করিবেন, কখন আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবেন, প্রতিদিন কি পরিমাণে আহার ও পান করিবেন, সে সমস্তও লিপিবদ্ধ থাকিত। সে সকল নিয়ম কোনও কারণেই লঙ্ঘিত হইত না। অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন, এত বিধি-নিয়মের অধীন হইয়া জীবনযাপন করা অসম্ভব। কিন্তু অভ্যাস সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, গার্হস্থ্য-জীবনসম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলি এত বিচক্ষণ ছিল যে, দেখিলে মনে হয়, কোনও বুদ্ধিমান সদ্বিবেচক চিকিৎসক তাঁহার কোনও কঠিন রোগীর জন্য আহার বিহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন ; ইহার সকলগুলিই অবশ্যপ্রতিপাল্য ; একটির ব্যত্যয় ঘটিলেই জীবনধারণ, অসম্ভব বা আশঙ্কাজনক হইবে।

এইখানেই ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কের পরিচয় রহিয়াছে। আরও পরিচয় আছে ; নৃপতি অথবা কোন প্রধান অমাত্য যে অবিবেচকের ন্যায়, অথবা ক্রোধপরবশ হইয়া, কিংবা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, অথবা অসদভিপ্রায়ে কাহাকেও অন্যায়রূপে শাস্তি দিবেন, তাহার উপায় ছিল না। অনুশাসনগুলি এইরূপ দৃঢ় ও সর্ব্বদর্শী ছিল। যাহা সদা সত্য, সদা শিব, সদা সুন্দর, মানুষ তাহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না ; মিশরের নরপতিও তাই বিনা বাক্যব্যয়ে মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত সর্ব্ব বিষয়ের সকল বিধিব্যবস্থা দেবাদেশতুল্য জ্ঞান করিয়া অবনতমস্তকে শিরে গ্রহণ করিতেন ; মিশরে তাই রাজায় প্রজায় পিতা পুত্রের সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। প্রজাগণ যেমন স্ব স্ব স্ত্রী পুত্র পরিজনের মঙ্গলবিধান ও মঙ্গলকামনায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত, নরপতির জন্যও তেমনই ব্যাকুল হইত। রাজা তাহাদিগের নিতান্ত আপন ছিলেন। রাজা ও প্রজায় এই স্নেহের বন্ধন ছিল বলিয়াই, মিশর বহিঃশত্রুর ভয়ে ভীত হইত না ; সর্ব্ব বিষয়ে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া

মিশর তাই জগতের ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সেকালে মিশরে রাম-রাজত্ব ছিল।

রাজা যেমন প্রজার বাধ্য ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, প্রজাও তেমনই রাজার বাধ্য ছিল। রাজার আদেশ ঈশ্বরের আদেশের ন্যায় পালিত হইত। প্রজাগণ বিবেচনা করিত, রাজা সর্ব্বদা অভ্রান্ত; তাই তিনি যাহা আদেশ করিতেন, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া জনসাধারণ তাহা পালন করিয়া কৃতার্থ হইত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, স্বয়ং পরমেশ্বর গোপনে নৃপতিকে সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন।

নৃপতির প্রতি দেবতুল্য ভক্তি ও পিতৃতুল্য স্নেহ যে তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্তই থাকিত, তাহা নহে; তাঁহার মৃত্যুর পরও মিশরবাসিগণ নানা উপায়ে সেই পুণ্য-স্মৃতি জাগ্রত রাখিত। রাজার মৃত্যু হইলে ৭২ দিবস পর্য্যন্ত শোক-প্রকাশ করিবার রীতি ছিল। কালো-ফিতা-ধারণ সেই শোকপ্রকাশের চরম নিদর্শন ছিল না। ৭২ দিবস ধরিয়া দেশের সমস্ত দেবমন্দির রুদ্ধ থাকিত; মন্দিরদ্বারে আর বলি আসিত না; আর বাদ্য বাজিত না; ধর্ম্মভীরু মিশরীয়গণ আর অর্ঘ্যভার বহিয়া মন্দিরপ্রান্তে উপস্থিত হইত না। ৭২ দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার আনন্দ-উৎসব বন্ধ থাকিত। প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, আবালবৃদ্ধবনিতা মিলিত হইয়া, ছিন্নবসনে, মলিনবদনে, দেহে ও কেশে ধূলা মাটি মাখিয়া, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া মুক্ত রাজপথে শোকগীত গাহিয়া বেড়াইত; সকলেই উপবাস করিত;—কেহই মদ্য ও কোনপ্রকার সুখসম্ভোগ বা বিলাসের সামগ্রী স্পর্শও করিত না।

এই দীর্ঘ শোকপ্রকাশের কাল অতিবাহিত হইলে পর নৃপতির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন হইত। তখন মহাসমারোহে, উপযুক্ত গৌরবে ও সম্মানে তাঁহার মৃতদেহ কবরমধ্যে নিহিত হইলে সর্ব্বসমক্ষে নৃপতির কার্য্য ও ব্যবহারের দীর্ঘ বিবরণী পঠিত হইত। উপস্থিত প্রজাবৃন্দের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে নরপতির কুকার্য্যের কথাও প্রকাশ করিতে পারিত। প্রজা অসন্তুষ্ট থাকিলে মৃত্যুর পর নরপতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও হইত না; মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নরপতিগণ জীবিতকালে সেই ভয়েই অত্যন্ত ভীত থাকিতেন, এবং সর্ব্বদা প্রজারঞ্জনে অবহিত হইতেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

মন্দির।

ভারতীয় দেবমন্দিরে—সমাধি-মন্দিরের ছাদের মত নিম্ন ও গুরুভার থিলানের নীচে, সন্ধ্যা বরাবরই যেন একটু পূর্ব্বাহ্ণে দেখা দেয়।

আজিকার সায়াহ্নে, অস্তমান সূর্য্যের আলো এখনও রহিয়াছে; ইহারই মধ্যে মাদুরার বৃহৎ মন্দিরের প্রবেশ-পথ-সমূহে প্রস্তরখিলানে ঢাকা বারাণ্ডা-পথের দুই ধারে ছোট ছোট প্রদীপ জ্বলিতেছে। এই ঢাকা প্রবেশপথটি, মন্দিরের প্রবেশ-দালানেরই যেন পূর্ব্ব-উদ্যোগ। এইখানে মালাকারেরা পুষ্পমাল্য বিক্রয় করিতেছে। এই ঢাকা-বারাণ্ডার কুলঙ্গি-থাদির ন্যায় গভীর দেশে দুই ধারে অবস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহের ফাঁকে ফাঁকে, এই সকল মালাকারদিগের দোকান বসিয়াছে। আমার মত কোন লোক যখন বাহির হইতে আইসে, তখন হঠাৎ ছায়ান্ধকারের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, সমস্তই যেন তাহার নিকট একাকার হইয়া যায়; মানুষ, পুতুল, বিকটা-কার মূর্ত্তি, মানুষের প্রতিমূর্ত্তি, বড় বড় প্রস্তরপ্রতিমা ও দুই-হাত-বিশিষ্ট মানুষের মত বহুবাহুবিশিষ্ট মূর্ত্তিদিগের বাহুর বিচিত্র আন্দোলন-ভঙ্গী, সমস্তই যেন একত্র মিশিয়া যায়। এখানেও সেই পবিত্র গাভীবৃন্দ; সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ করিয়া, ঘুমাইবার জন্য মন্দিরে যখন প্রবেশ করিতে যায়, তখনও উহারা দ্বারদেশের নিকট 'গয়ংগচ্ছ ভাবে' ডাঁটা ও ফুল চিবাইতে থাকে।

এই ঢাকা-বারাণ্ডা-পথের পরেই গগনস্পর্শিনী প্রকাণ্ড মন্দির-চূড়া। মন্দিরের তলদেশে, সুরঙ্গপথের মত ক্ষুদ্র দ্বার। এই দ্বার দিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু ইহা ত মন্দির নহে; ইহা একটা নিস্তব্ধ শব্দ-যোনি নগর বলিলেই হয়। নগরের ন্যায় আড়া-আড়ি ভাবে কত দিক্ দিয়া ঢাকা-রাস্তা গিয়াছে, এবং এই সব রাস্তার জনতা, সমস্তই প্রস্তর-প্রতিমা। ছোট বড় প্রত্যেক থামই অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। কি করিয়া যে উহাদিগকে খাড়া করা হইয়াছে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র বাহুর সমবেত বল ও চেষ্টায় এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া-ছিল। এই সকল থামের গায়ে, নানাপ্রকার দেবতা ও বিকট জীবের মূর্ত্তি,

খুব গভীরভাবে উৎকীর্ণ। মন্দিরের খিলানগুলি প্রায়ই সমতল হইয়া থাকে। উহার ভারসাম্য কি করিয়া রক্ষিত হয়, তাহা বুঝা যায় না। ১০-১১ গজ প্রমাণ অখণ্ড-প্রস্তরে এই খিলান নির্ম্মিত, এবং শুধু দুই প্রান্তে ভর দিয়া রহিয়াছে। এইরূপ অসংখ্য প্রস্তরফলক, আমাদের সামান্য পুরু তক্তার মত, পাশাপাশি স্থাপিত; এই খিলান, কতকটা "থেব্‌" ও "মেম্‌ফিস্‌" মন্দিরের ধরণে গঠিত, অবিনশ্বর ও প্রায় অনন্তকালস্থায়ী। "শ্রী-রাগম্‌"-মন্দিরের ন্যায়, সারি সারি ঘোটকমূর্ত্তি, শূন্যে পদাস্ফালন করিতেছে,—সারি সারি দেবমূর্ত্তি চলিয়াছে;—সমস্তই দূর অন্ধকারে ক্রমশঃ মিলাইয়া গিয়াছে। ঈষৎকৃষ্ণবর্ণ মসৃণ প্রাচীরের নিম্নদেশে, যে পর্য্যন্ত মানুষের হাত ও শরীর পৌঁছায়, সমস্তই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের প্রাচীনত্ব শুধু ইহাতেই সূচিত হয়। এখানে বিরাট মহিমার সহিত গোময়-আবর্জ্জনা, অলকা-তুল্য বিলাস-বিভবের সহিত বর্ব্বরোচিত একপ্রকার অযত্নতাচ্ছীল্য যেন মিশ্রিত। খাগ্‌ড়া ও কাটা-কলাপাতার মালা, যাহা পূর্ব্বে কোনও উৎসব উপলক্ষে থামে থামে ঝুলান হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা পচিয়া ধসিয়া নীচে ঝরিয়া পড়িতেছে। উৎসব-সমারোহের সাজসজ্জাগুলি অদ্ভুত কাল্পনিক জীবজন্তু, স্বাভাবিকশরীর প্রমাণ কাগজ ও কাঁইময়দার সাদা হাতী, মন্দিরের কোনও প্রচ্ছন্ন কোণে গলিতেছে, পচিতেছে। পবিত্র গাভীবৃন্দ ও যে সব জীবন্ত হস্তী মন্দিরের মধ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করে, উহাদের বিষ্ঠা—নগ্নপদঘর্ষণে মসৃণীকৃত চক্‌চকে সানের উপর ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে। ভীষণ খিলানের গায়ে অসংখ্য বাদুড় ঝুলিতেছে; নৌকা-পালের মত কালো কালো ডানাগুলা (পালকের ডানা হইলে বিষম শব্দ হইত) চারি দিকে নাড়িতেছে—অথচ কোনও শব্দ শুনা যায় না * * *।

একটা অন্তঃপ্রাঙ্গণে, মুক্ত আকাশে, সন্ধ্যার আলোক আবার দেখিতে পাইলাম। সেখানে একটি লোকও নাই,—কেবল কতকগুলা ময়ূর, পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া, প্রস্তরময় পশুমূর্ত্তির উপর অধিষ্ঠিত। প্রাচীর-ঘেরের উপরে অপেক্ষাকৃত দূরে ও নিকটে মন্দিরের লাল ও সবুজ চূড়াগুলি—সেই সব বিস্ময়জনক দেবস্তূপের "পিরামিড্‌" আকাশে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। সেই মূর্ত্তিস্তূপের মাঝামাঝি একটা স্থানে, চাতক ও তোতা পাখীরা, লম্বমান নীড়ের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই শিখরদেশ, যেখানে চূড়ার কোণগুলা খোঁচার মত চারি দিক হইতে উঠিয়াছে, এবং যাহা

এখনও সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত,—সেই শিখরদেশের আরও সন্নিকটে, কাক চীলেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া, মন্দিরের আরও গভীরদেশে, সেই পুরোহিতকে আমি অবশেষে দেখিতে পাইলাম। যাঁহার নিকট বিশেষ করিয়া আমার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল, এবং যিনি আমাকে দেবীর সাজসজ্জা দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কাল বোধ হয় এই সব সাজসজ্জা দেখিতে পাইব না। কেন না, কাল একটা উৎসবের দিন। "শ্রীরাগমে" বিষ্ণু যেরূপ প্রতিবৎসর রথে করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করেন, সেইরূপ এখানে, মাদুরার হরপার্ব্বতী, প্রতি বৎসর, নৌকায় করিয়া একটা বৃহৎ হ্রদের চারি ধারে ভ্রমণ করেন। এই নৌ-যাত্রা কাল হইবে।

কিন্তু পরশ্ব প্রত্যূষে, মন্দিরের মধ্যে একটু আলোক দেখা দিলেই, গুপ্ত-কক্ষের দ্বার আমার জন্য উদ্‌ঘাটিত ও দেবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার আমার সমক্ষে প্রসারিত হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মায়া।

মাধুরী-মন্দারমালা,—স্নেহের বন্ধন,
উল্লাস-সারল্যময়ী করুণার ছবি;
পুণ্যের প্রতিমা নব নয়ন নন্দন,
হিমাদ্রির হেমাগারে কুমারী জাহ্নবী!
হাসিতে শেফালি ফুটে চারু চন্দ্রালোকে,
স্নেহগর্ব্বে পরিপূর্ণা বাপের দুলালী!
প্রভাত-তারার স্বপ্ন দু'টি মুগ্ধ চোখে,
আনন্দ-চন্দন-ধারা প্রাণে দেয় ঢালি'!
নবনী-নিন্দিত ক্ষুদ্র দু'টি বাহুপাশে
পিতারে ক'রেছে বন্দী মায়াময়ী মায়া;

স্নিগ্ধ করে দগ্ধ বুক সুধাকলভাষে;
তপ্ত মরুপথে স্থির নব-ঘনচ্ছায়া!
স্বর্গ মর্ত্ত নিরখিছে সস্নেহনয়নে,
শুভ শুভ্র শুচিশোভা অম্বুজ-আননে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্যে ব্যবসায়।

অধ্যাপক হ্যারি থরস্টন্ পেক্ গত সেপ্টেম্বর মাসের "মন্সেস্ ম্যাগাজিন্" নামক সাময়িক পত্রে, "প্রকাশক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গ্রন্থাবলী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে "রবিন্সন্ ক্রুসো", "টমকাকার কুটীর", "জেন আয়ার" প্রভৃতি বহুসংখ্যক লোক-প্রসিদ্ধ উপন্যাস ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ-সংক্রান্ত বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বে অনেক সময় প্রকাশকের বা পাঠকবর্গের ভ্রমবশতঃ বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকাশকেরা অনেক সময় বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাঁহারা মনে মনে বেশ জানেন, ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে পাঠকসমাজ অতিমাত্র আগ্রহে বরণ করিয়া লইবে, অবিলম্বে বহুসংখ্যক গ্রন্থ বিক্রীত হইবে; কিন্তু পাছে জনপ্রিয় গ্রন্থকার, রচিত গ্রন্থের পরিবর্ত্তে প্রচুর অর্থ দাবী করিয়া বসেন, এ জন্য তাঁহারা গ্রন্থে নানা দোষের আবিষ্কার ও ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকারকে পাণ্ডুলিপি ফিরাইয়া দিয়া থাকেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ অধ্যাপক পেক্ সর্ব্বপ্রথমে "রবিন্সন্ ক্রুসো"র পাণ্ডুলিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ লণ্ডনের প্রকাশকসম্প্রদায় ডিফোর এই গ্রন্থে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেহই "রবিন্সন্ ক্রুসো" মুদ্রিত বা প্রকাশিত করিতে চাহেন নাই। অবশেষে জনৈক স্বল্পবিত্ত নগণ্য প্রকাশক উহা মুদ্রিত করেন। গ্রন্থখানির স্বত্ব অতি সামান্য অর্থেই বিক্রীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা প্রকাশিত হইবামাত্র ডিফোর সাহিত্য-প্রতিভা প্রতিষ্ঠিত হইল, "রবিনসন ক্রুসো" সর্ব্বজনসমাদৃত হইল। আমেরিকাতেও "টম্কাকার কুটীরে"র এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। প্রকাশক প্রথমতঃ উহা প্রকাশিত করিতে ইতঃস্ততঃ করিয়াছিলেন; কিন্তু গ্রন্থখানি জনসমাজে আবির্ভূত হইবামাত্র, তিন দিনের মধ্যে দশ সহস্র খণ্ড

গ্রন্থ বিক্রীত হইয়াছিল। খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল ব্যতীত, আমেরিকাতে "টমকাকার কুটীরে"র পাঠক-সংখ্যার ন্যায় অধিকসংখ্যক পাঠক অন্য কোনও গ্রন্থের নাই।

শার্লোটী ব্রণ্টী, স্যার কোনান ডয়েল, মিঃ রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং, মিঃ মার্টেল প্রভৃতি বহুসংখ্যক ঔপন্যাসিকের প্রথম গ্রন্থ এইরূপে প্রকাশকগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াছিল। কেবল ঔপন্যাসিকেরাই যে এইরূপে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছেন, তাহা নহে। প্রেস্‌কট্‌ ও মটলেকেও এইরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রকাশক লংম্যান ও মরে কোম্পানী প্রেস্‌কটের "ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলা" মুদ্রিত করিতে চাহেন নাই। অবশেষে বেণ্টলে কোম্পানী উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। মটলের "History of the Dutch Republic" নামক গ্রন্থখানি লণ্ডনের প্রায় সমস্ত প্রকাশক কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে গ্রন্থকারের নিজ ব্যয়ে জন চ্যাপ্‌ম্যান কোম্পানী উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত করেন।

জাপানে শিক্ষা।

জাপানে ছাত্রের চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে মিঃ ই. পি. কল্‌ভারওয়েল নামক জনৈক লেখক সম্প্রতি "ন্যাশনাল রিভিউ" নামক সাময়িকপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, জাপানের প্রাথমিকশিক্ষা-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যহ ছয়টার সময় প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল সাতটা হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার নিয়ম। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আবার খেলা ও ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য কিয়ৎকাল অবকাশ দেওয়া হয়। রবিবারে বিদ্যালয় একেবারে বন্ধ থাকে; শনিবারে একবেলা ছুটী। শীতকালে বালকেরা এক পক্ষ অবকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত এপ্রেল মাসে এক সপ্তাহ ও সম্পূর্ণ আগষ্ট মাসটা বিদ্যালয়ের ছুটী থাকে। খেলার সময় জাপানী বালকেরা কখনও কলহ করে না। জনৈক ইংরাজ দুই বৎসরকাল কোনও জাপানী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, উক্ত সময়ের মধ্যে কোনও জাপানী বালককে ক্রীড়ার সময় তিনি কখনও পরস্পরের সহিত কলহ করিতে দেখেন নাই।

জাপানী বিদ্যালয়ে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগুলির অধ্যাপন হয়। এই এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষণীয় সমুদয় বিষয়ই বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। জাপানী ছাত্রের প্রতি শিক্ষকেরা কখনও শারীরিকদণ্ডের বিধান করেন না। কোনও জাপানী শিক্ষক যদি দৈবক্রমে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে ধৈর্য্যচ্যুতির জন্য জনসমাজে তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হয়। পাঠে একাগ্রতা জাপানী ছাত্রের চরিত্রের বিশেষত্ব। ইংরাজ ছাত্রবৃন্দের ন্যায় জাপানী ছাত্রগণ পাঠে অবহেলা করিতে জানে না। জাপানে ধনী ও দরিদ্রসন্তান একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বশ্রেণীর জাপানীরা বাক্যে ও ব্যবহারে বিনয় ও শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

ছাত্রদিগের জন্য জাপানে পারিতোষিকের ব্যবস্থা বড় নাই। ধর্ম্মসংক্রান্ত উপদেশাবলী জাপানীমাত্রেই গভীরভক্তিসহকারে পালন করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, ধর্ম্মোপদেশপালন

আত্মোন্নতির জন্য নহে, উহা মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। পারিতোষিকের ব্যবস্থা না থাকিলেও, জাপানী ছাত্রদিগের জন্য "ঋণবৃত্তি" (Loan Scholarship) আছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ভবিষ্যতে উক্ত অর্থ অন্য কোনও ছাত্রের কল্যাণার্থ দান করিবে,—এইরূপ সর্ত্তে উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। ছাত্রগণকে অতি যত্নের সহিত ব্যায়াম-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাখীর ন্যায় পাঠ মুখস্থ করিবার প্রণালী জাপানী শিক্ষকেরা আদৌ শুভাবহ ও সুসঙ্গত বলিয়া মনে করেন না।

জাপানে প্রাথমিক-শিক্ষা-বিদ্যালয়ে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা ও মধ্যবৃত্তি-বিদ্যালয়সমূহে সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হয়। নীতি-পাঠের উপাদান ঐতিহাসিক মহাপুরুষদিগের কার্য্যাবলী ও বেসরকারী (Private) ব্যক্তিবর্গের জীবনচরিত হইতে সংগৃহীত হয়। এই সকল কাহিনীতে মদগর্ব্বিত বিজয়ীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও বাহুবলের কোনও সংস্রব নাই; ইহাতে কেবল আত্মবিসর্জ্জন ও নিষ্কাম ধর্ম্মের পবিত্র শিক্ষালাভ হইয়া থাকে।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহিনী এই সকল জাপানী কাহিনীর সহিত কিছু কিছু তুলিত হইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিলে পরিণামে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু জাপানীরা বলে, স্বর্গপ্রাপ্তি বা পুরস্কারের আশায় আত্মোৎসর্গ করিলে তাহার সমস্ত কর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যায়। আত্মবিলোপ ও আত্মসংযম-সাধনের প্রবল ইচ্ছা জাপানীদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল। জাপানীদিগের স্বদেশপ্রেম, আত্মবিলোপ ও আত্মসংযম হইতেই উদ্ভূত। ধর্ম্মের জন্য জাপানীদিগের কোনরূপ বাহ্য উত্তেজনা নাই। বিগত ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে একবার একটি বিদ্যালয়ের কোন এক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,—"তাহাদের জীবনের প্রিয়তম অভিলাষ কি?" উত্তরে বালকেরা লিখিয়াছিল, "প্রিয়তম সম্রাটের কল্যাণকল্পে আত্মজীবন উৎসর্গ ব্যতীত আমাদের প্রিয়তম বা উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা নাই।" প্রবন্ধের শেষভাগে লেখক বলিয়াছেন, খৃষ্টান মিশনরীগণের হস্ত হইতে শিক্ষার ভার অপহৃত হওয়া অবধি জাপানে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা। *

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই মনে করেন যে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সকলই নিজস্ব, সকলই মৌলিক। প্রাচীন ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অণুমাত্র চিহ্ন তাঁহারা দেখিতে পান না। কিন্তু পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই, ভারতীয় সভ্যতায় বা ভারতীয় জ্ঞানে যে বিশেষ মৌলিকত্ব আছে,

* ভাগলপুর শাখা সাহিত্যপরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

তাহা স্বীকার করেন না। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে নিতান্তই বিরল। পাশ্চাত্য জাতিগণের সভ্যতা, গ্রীক-সভ্যতার ভিত্তিতে স্থাপিত। এ অবস্থায় তাঁহাদের স্বভাবতঃই বিশ্বাস হইতে পারে যে, ভারত, গ্রীসের নিকট বহুপরিমাণে ঋণী; আর আমাদের স্বদেশীয় যাঁহারা মনে করেন, ভারত অন্যের নিকট কিছুই গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা কেবলমাত্র জাতীয় সভ্যতায় অনুরাগ হেতু প্রকৃত সত্যনির্দ্ধারণে অক্ষম। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাচীনভারতসম্বন্ধীয় অনেক নূতন তথ্যের নির্দ্ধারণ ও মৃৎপ্রোথিত অনেক প্রাচীন দ্রব্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার ফলে, পুরাতন মত অনেক স্থলেই ভুল বলিয়া স্থির হইয়াছে। যেরূপ ভাবে নিয়তই নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অনেক বিষয়েই এখনকার সর্ব্ববাদিসম্মত মতও পরে গ্রাহ্য হইবে না। যাহা হউক, মহাত্মা জোন্‌স্‌ ও কোল্‌ব্রুক্‌ যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, এখন অনেক পথিক সেই পথের পথিক হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে পথও এখন অনেক সুগম হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের মতেরও সামঞ্জস্য নাই। এরূপ স্থলে বিভিন্নমতের বিচার করিয়া স্বীয় মতের সমর্থনের জন্য যুক্তি দিয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধমাত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব। তবে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধে সামান্যভাবে এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রশ্ন এই যে, পাশ্চাত্য, গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার নিকট প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা কোনও অংশে ঋণী কি না; এবং যদি ঋণী হয়, তবে তাহার পরিমাণ কিরূপ? কোনও কোনও বিষয়ে, আমার বিবেচনায়, প্রাচীনভারত গ্রীস ও রোমের নিকট ঋণী বটে, তবে প্রাচীন গ্রীসও, ভারতের নিকট তদপেক্ষা সামান্য হইলেও, কিয়ৎপরিমাণে ঋণী, এবং গ্রীক সভ্যতাই রোমীয় সভ্যতার আদর্শ।

এ প্রবন্ধে পাশ্চাত্য জাতি অর্থে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী জাতিবর্গকেই বুঝিব।

আমার এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, কয়েকটা কথা পূর্ব্বেই মনে রাখিতে হইবে। প্রথম কথা এই যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে

অনেক নূতন কথা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জানা গিয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক কথা জানিতে বাকী আছে। ভারত-ইতিহাস এখনও নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এরূপ স্থলে ভারতের কোন জিনিসটা মৌলিক, কোনটা বা বৈদেশিক-সংস্কার-প্রসূত, তাহা এখনও ভাল করিয়া জানা যায় নাই। আমরা যে জিনিসটা ভারতের নিতান্তই নিজের মনে করি, তাহা হয় ত পরে নূতন আবিষ্কারের ফলে পরের দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। অক্ষরপ্রণালীর বিচারকালে ইহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই প্রবন্ধেই দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, গ্রীক ও রোমীয়গণ প্রাচীন আর্য্য-জাতিরই শাখামাত্র; হিন্দুজাতিও আর্য্যজাতিরই শাখাবিশেষ। এরূপ স্থলে ভাষা ও প্রাচীন ধর্ম্মে ভারতের সহিত গ্রীস ও রোমের কোনও কোনও স্থলে সাদৃশ্য আছে। সে সমস্ত সাদৃশ্য-প্রদর্শন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই সমস্ত সাদৃশ্য দেখিলে ভ্রম জন্মিতে পারে যে, এক জাতি অপর জাতির নিকট এ সব স্থলে ঋণী। বস্তুতঃ এই তিন দেশই প্রাচীনতম আর্য্যজাতির নিকট হইতে এই সাদৃশ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি।

সভ্যতা বা জ্ঞানের বহু অঙ্গ। প্রত্যেক বিষয়ের পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। কেবল যে সব বিষয়ে পাশ্চাত্য সংস্কার থাকা কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, বা যাহাতে বাস্তবিকই পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্ত্তমান, তাহারই আলোচনা করিলে চলিবে। কোন কেন জার্ম্মান পণ্ডিত মনে করেন, কয়েকটি বিষয়ে,—ভাষা, রাজকার্য্য, যুদ্ধকার্য্য, রীতিনীতি, ধর্ম্ম, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে, পাশ্চাত্য সংস্কার আছে, মনে করেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, বস্তুতঃ এ সব বিষয়ে পাশ্চাত্য সংস্কারের নিতান্ত অভাব।

ভাষা।—প্রাচীন ভারতীয় ভাষায়, পাশ্চাত্য বৈদেশিক কোনও ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায় না। পঞ্জাবে যখন গ্রীক বা ব্যাক্ট্রীয়া-দেশীয় গ্রীকগণ আধিপত্য করিতেন, তখন তাঁহাদের রাজসভায় গ্রীক ভাষার প্রচলন থাকিলেও, প্রজাবৃন্দ তাহা গ্রহণ করে নাই, বা দেশীয় ভাষায় উহা প্রবেশ-লাভে সমর্থ হয় নাই।

রাজনীতি।—ভারত, রাজকার্য্যেও কোনও বিষয় পাশ্চাত্য বৈদেশিক-গণের নিকট স্থায়িরূপে শিক্ষা করে নাই; তবে মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক উহা কিয়ৎকালের জন্য অনুকৃত হইয়াছে মাত্র। মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আপন

সাম্রাজ্যের কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে; কোনও বৈদেশিক তাঁহার রাজ্যমধ্যে আসিলে, তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে। বোধ হয়, ইহা গ্রীক-নীতির অনুকরণ। প্রাচীন ভারতীয়গণ বৈদেশিকগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, ম্লেচ্ছ বা অনার্য্যবোধে ঘৃণা করিতেন। চন্দ্রগুপ্তের এ নীতি ভারতে নূতন, এবং প্রাচীন ভারতে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিলুপ্ত হয়। চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে ভারতীয় রাজগণ বিদেশে দূত প্রেরণ আরম্ভ করেন; কিন্তু তাহাও কেবলমাত্র মৌর্য্য-সম্রাটগণ, ভারত-সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, জনৈক শক-রাজ, জনৈক চালুক্য-রাজ ও জনৈক পাণ্ড্যরাজ ভিন্ন অপর কোনও রাজা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। মৌর্য্য-সম্রাটগণের সাম্রাজ্যশাসনপ্রণালীর কতক অংশ পারসীক সাম্রাজ্য হইতে গৃহীত; কিন্তু তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে অনেকগুলি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন, পঞ্জাবে যৌধেয় ও মদ্রকগণ, রাজপুতানায় ও মালবে অর্জ্জুনগণ, আভীর ও মালবগণের মধ্যে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কেরল প্রদেশে ও সমুদ্রতীরে বর্ত্তমান নায়ারগণের মধ্যে এক সময়ে সাধারণতন্ত্র দেখা যাইত। তথায় প্রজাগণ সাত জন ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাচিত করিতেন; তাঁহারাই রাজ্য চালাইতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "সাহিত্যে" আমি "দেবতন্ত্র" নামে যে প্রবন্ধ লিখি, তাহাতে এই অভিনব রাজ্যশাসনপ্রণালীর বর্ণনা করিয়াছি। এই সমস্ত সাধারণতন্ত্র দেখিলে ভ্রম হইতে পারে যে, ইহা গ্রীক সংঘর্ষের ফল; কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময়েও পঞ্জাবের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সেই সব রাজ্যের অধিবাসিগণ অনেকেই আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ ও যুদ্ধ করে।

যুদ্ধনীতি।—প্রাচীন ভারতের যুদ্ধপ্রণালীতেও পাশ্চাত্য সংস্কারের অভাব বলিয়াই বোধ হয়। গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পরেই মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী মৌর্য্য সম্রাটগণের রাজত্বকালে সুবৃহৎ বাহিনীর স্থায়িরূপে নিয়োগপ্রথা (যাহাকে ইংরাজীতে standing army বলে) প্রচলিত ছিল। বিশেষ বিচার না করিয়া দেখিলে সহসা বোধ হয়, ইহা গ্রীক সংঘর্ষের ফল। কিন্তু স্থায়িভাবে সৈন্য-নিয়োগপ্রথা ভারতে তাহার পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে। গ্রীক আক্রমণের

পূর্ব্বেই পাটলিপুত্র-রাজ মহাপদ্মনন্দের ৮০ হাজার অশ্বারোহী ও দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। বোধ করি, এ প্রথা পারসীক সম্রাটগণের নিকট হইতে মগধরাজগণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আচার ব্যবহার।—ভারতের রীতিনীতি বা আচার ব্যবহার প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত; বৈদেশিক ব্যবহারের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। বৈদেশিক জাতি ও তাহাদের আচার ব্যবহার প্রাচীন ভারতে নিতান্ত অবজ্ঞাত ছিল। মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে যবন প্রভৃতি জাতি ভ্রষ্টাচার বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। এ অবস্থায় প্রাচীন ভারতের রীতিনীতিতে বৈদেশিক সংস্কার কখনও সম্ভবপর নহে, বস্তুতঃ দেখিতেও পাওয়া যায় না।

ধর্ম্ম।—ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। বৈদিকধর্ম্মের কতক অংশ সমগ্র আর্য্যজাতির সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু উপনিষদ্, বা ষড়দর্শন, বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বা পুরাণাদি ও লৌকিকধর্ম্ম ভারতের নিজস্ব। প্রাচীন ভারত অন্যের নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করে নাই। প্রাচীন পাশ্চাত্যজগতে গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম ও জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় কোথায়? বেদান্তের মায়াবাদ ও সাংখ্যের ও উপনিষদের অপূর্ব্ব দর্শনই বা কোথায়? বুদ্ধদেব যে অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ ও কর্ম্মফলের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বা কোথায়? প্রাচীন ভারত অন্য জাতিকে বৌদ্ধধর্ম্ম দান করিয়াছে, এবং আজিও বহু কোটী বৈদেশিক সেই ভারতীয় ধর্ম্মের মতাবলম্বী। তবে ভারতবর্ষ বলিলে এখন আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ পশ্চিম দিকে তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান চিত্রল ও উত্তরপশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী অন্যান্য দেশসমূহ, এমন কি, কাবুল পর্য্যন্ত তখন ভারত নামে অভিহিত হইত। উক্ত প্রদেশ বহুকাল যাবৎ ব্যাক্ট্রিয়া-দেশীয় গ্রীকগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। এরূপ অবস্থায় সিন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী ভারত অপেক্ষা ঐ সব স্থানে গ্রীকসংস্কার অধিক হইবার সম্ভাবনা; হইয়াছিলও তাহাই। প্রাচীন গান্ধার * দেশের প্রান্তভাগে স্থিত বর্ত্তমান কাফ্রিস্থানের অধিবাসিগণ এতদিন পর্য্যন্তও অনেক গ্রীক-দেবতার পূজা করিয়া আসিতে-ছিল; তবে আজ কয়েক বৎসর হইল, আমীর আবদর রহমন তাহাদিগকে

* পেশোয়ার ও তৎসন্নিহিত পশ্চিম-উত্তর-সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ; পেশোয়ার ইহার রাজধানী ছিল, এবং তাহা পুরুষপুর নামে কথিত হইত।

নির্য্যাতিত করিয়া মুসলমান করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক সংস্কারের এ নিদর্শনও লোপ পাইয়াছে।

চিকিৎসা।—হিন্দুদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষম মতভেদ। প্রফেসর হ্যাস (Haas) অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ন্যায় গ্রীক-প্রতিভায় মুগ্ধ ; পৃথিবীর সভ্যতা তিনি গ্রীক-ময় দেখেন। তাঁহার মতে, মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর, আরবেরা গ্রীকদের নিকট হইতে গ্রীকচিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করে, এবং হিন্দুরা মুসলমানের নিকট হইতে এ শাস্ত্র শিক্ষা করে,—তাহাও আবার ভাল করিয়া শিখিতে পারে নাই। এরূপ বাতুলের তুল্য উক্তির উত্তর দিবার বড় একটা প্রয়োজন দেখি না। আরব-পণ্ডিতগণ নিজেরাই এ বিষয়ে হিন্দুর নিকট প্রভূতপরিমাণে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুতের আরবীয় অনুবাদ বোগদাদে রীতিমত পঠিত হইত। অবশ্য মুসলমানেরা যুনানী বা গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রেরও সবিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন। হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্র অতীব প্রাচীন। চিকিৎসার অনেক তত্ত্ব বেদেও আছে। আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ মহাভারত প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থেও আছে। হোমরের অবিনশ্বর কবিতায় গ্রীক-চিকিৎসার উল্লেখ থাকিলেও, পরবর্ত্তিকালে হিপোক্রেট্সের সময়েই ইহার সমধিক উন্নতি হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ হোমরেরও বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, চরক ও সুশ্রুতই হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি করেন, ও পরবর্ত্তিকালে বাহ্বট প্রভৃতি মনস্বিগণ এ শাস্ত্রকে আরও প্রকৃষ্ট করেন। এক্ষণে দেখা যাউক, চরক ও সুশ্রুত প্রণীত শাস্ত্রে, গ্রীকসংস্কারের ফল দেখা যায় কি না। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ সালে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় হইতেই ভারতের সহিত গ্রীসের সংস্পর্শ। ভারতে যাহা কিছু গ্রীক সংস্কার বর্ত্তমান, তাহা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরবর্ত্তিকালেই ঘটিয়াছিল। প্রধানতঃ ব্যাক্ট্রিয়া-দেশীয় গ্রীক রাজগণের সংস্রবেই ঘটিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ভারতের সহিত গ্রীসের সাক্ষাৎভাবে কোন সংস্রব ছিল না, এবং এক জাতির নিকট অপর জাতির শিক্ষারও বড় একটা সুবিধা ছিল না। চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থ, গ্রীক-আক্রমণের পূর্ব্বেই রচিত। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে সকল যুক্তি দ্বারা এ কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রচলিত সুশ্রুত ও চরক নাগার্জ্জুন ও অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক সংস্কৃত। প্রাচীন চরক ও সুশ্রুত গ্রীক-আক্রমণের পূর্ব্বে রচিত, সুতরাং তাহাতে গ্রীকসংস্কার থাকিতে

পারে না। বিশেষতঃ, চরক ও সুশ্রুতের গ্রন্থে চিকিৎসাশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি দেখা যায়, গ্রীক-চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহা কোথায়? সুশ্রুতের গ্রন্থে যে সকল অতিসুন্দর অস্ত্রের বর্ণনা আছে, গ্রীক-চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহা কোথায়? পরবর্ত্তী হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রীকসংস্কারের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না।

গণিত।—এক্ষণে গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রাচীনকালে দুই জাতি গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; এক হিন্দুজাতি, অপর গ্রীকজাতি। কিন্তু এমন কোনও প্রমাণ নাই যে, গ্রীক-গণিত হইতে ভারতীয় গণিতের কোনও অংশের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীক-গণিতকারগণের প্রধান ডাইওফান্টাস্। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণিতকার আর্য্যভট্ট-কৃত গণিতশাস্ত্র, ডাইওফান্টাসের গণিত অপেক্ষা অনেক উন্নত। ভাস্করাচার্য্য পরবর্ত্তিকালে জন্মিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গণিতশাস্ত্রের আরও উন্নতি করেন। ডাক্তার থিবো দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দু-জ্যামিতিশাস্ত্রও অতি প্রাচীন ও উন্নত; এবং বৃত্তসম্বন্ধীয় জ্যামিতির কোন কোন তত্ত্ব ভারত বহু-কাল যাবৎ অবগত থাকিলেও, ইউরোপ উহা আধুনিককালে জানিতে পারিয়াছে। তবে পরবর্ত্তিকালে রেখাগণিত ও জ্যামিতিশাস্ত্রের কতকগুলি অভিনব তত্ত্ব, ভারত, গ্রীসের নিকট শিখিয়াছিল, ইহা জানা যায়।

জ্যোতিষ।—জ্যোতিষশাস্ত্রে ভারতের কতটা মৌলিকত্ব, তাহা লইয়া আজ পর্য্যন্ত অনেক বিতণ্ডা চলিতেছে। তবে এ সম্বন্ধে মোটামুটি গোটা-কতক কথা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। যাঁহাদের মতে, ভারত পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিকট জ্যোতিষ শিখিয়াছেন, তাঁহারা দুই দফায় এ শিক্ষা হইয়াছে, বলেন; একবার জ্যোতিষের মূল-সূত্রগুলি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী ক্যাল্‌ডীয় কৃষকগণ ভারতকে শিক্ষা দিয়াছিল; দ্বিতীয় দফায় ইহার অনেক দিন পরে আবার গ্রীস ও রোম ভারতের জ্যোতিষশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছে। ক্যাল্‌ডীয়গণ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিত, এবং পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে সকলের পূর্ব্বে জ্যোতিষচর্চ্চা করিয়াছিল, ইহা জানা যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে হিন্দুরা তাহাদের নিকট জ্যোতিষ প্রথম শিক্ষা করেন, ইহার প্রমাণ আমি দেখি নাই। এমন কোনও কথা নাই যে, প্রাচীনকালে দুই জাতি একই শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে মনে করিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতির নিকট সে শাস্ত্র শিখিয়াছে। ক্যাল্‌ডীয়গণের জ্যোতিষজ্ঞান অতি সামান্যই ছিল। জ্যোতিষের তখন প্রথমাবস্থা। হিন্দুরা যে তৎকালে সে

জ্ঞানটুকু নিজের আবিষ্কারফলেই লাভ করেন নাই, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বিশেষতঃ, জ্যোতিষের অনেক কথা, মৃগশিরা ও রোহিণী নক্ষত্রের কথা বেদেও আছে। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে বেদ পৃথিবীর আদিম পুস্তক ও অতি প্রাচীনকালে রচিত। যদি মনস্বী তিলকের মত যে বেদ খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত বিশ্বাস্য নাই হয়, তথাপি আজি হইতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদের কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও মানেন। এখন কি কেহ বলিবে যে, সেই অতিপ্রাচীনকালে ক্যাল্‌ডীয়গণ ভারতকে জ্যোতিষশিক্ষা দিয়াছেন? সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভারতীয়গণেরই আবিষ্কার, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বেণ্টলি সাহেব ভারতের জ্যোতিষ-জ্ঞানের মৌলিকত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তথাপি তিনিও স্বীকার করেন যে, এ আবিষ্কার অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে হইয়াছে। ক্যাল্‌ডীয়গণ এ সব বিষয় অবগত ছিল না। পরাশর, জ্যোতিষের অতি প্রাচীন আচার্য্য। তাঁহার সময়ে ভারতীয় জ্যোতিষের উন্নত অবস্থা। তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তিকালের লোক। তাঁহার সময়ে গ্রীক ও রোমীয় জ্যোতিষের সংস্কার ভারতে কখনও সম্ভব নহে। গ্রীক-আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতীয় জ্যোতিষ আরও উন্নতিলাভ করে। গ্রীকদের জ্যোতিষ-জ্ঞান তখন সামান্য, এবং পরবর্ত্তিকালেও ভারতের জ্যোতিষ-জ্ঞান প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতির জ্যোতিষ-জ্ঞান অপেক্ষা অনেক অধিক। তবে প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমানদের এ বিষয়ে জ্ঞান ভারতীয়দের অপেক্ষা সাধারণতঃ অনেক অল্প হইলেও, তাহারা কোন কোন কথা হিন্দুদের পূর্ব্বেই শিখিয়াছিল, এবং হিন্দুরাও পাশ্চাত্য আচার্য্যগণের নিকট হইতে পরবর্ত্তিকালে শিক্ষার কথা অস্বীকার করেন নাই। জ্যোতিষের পঞ্চসিদ্ধান্তের মধ্যে রোমকসিদ্ধান্ত অন্যতর; ইহার নামেই জানা যায় যে, ইহা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ। যবনাচার্য্য জ্যোতিষের এক প্রধান আচার্য্য। সৌর রাশিচক্র ভারত গ্রীকগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। বৈদেশিকগণের নিকট হইতে এ শিক্ষার পর হিন্দুরা জ্যোতিষের আরও উন্নতি করেন। যে মাধ্যাকর্ষণ নিউটন আধুনিককালে ইউরোপকে শিক্ষা দেন, ভাস্করাচার্য্য একাদশ শতাব্দীতে তাহা জানিয়াছিলেন। কোপর্নিকাস ও গ্যালিলিও আর্য্যভট্টের আবিষ্কারের সহস্র বৎসর পরে ইউরোপকে জানান যে, পৃথিবী আপন অক্ষোপরি পরিভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতেছে।

লিপি।—লিখনপ্রণালীতে পাশ্চাত্য সংস্কার আছে কি না, তাহার বিচার অতি দুরূহ ব্যাপার। এ সম্বন্ধে বিষম মতভেদ বিদ্যমান। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত এই যে, ভারতীয় লিপি সেমিটিক কোনও লিপি হইতে সম্ভূত। গ্রীকপ্রতিভায় মুগ্ধ এক দল পণ্ডিতের মত ইহা গ্রীক-লিপি-সম্ভূত; আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পর ইহার প্রচলন হইয়াছে। তৃতীয় মত এই যে, ভারতীয় লিপি ভারতের নিজস্ব। দ্বিতীয় মত এক্ষণে পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে; কারণ, এক্ষণে জানা গিয়াছে, আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় লিপি কয়েক স্থলেই ভারতেই উৎকীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকার ও ভাণ্ডারকর সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জগতের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি অন্ততঃপক্ষে খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীর লোক। তখন গ্রীস নিজেই ফিনীশিয়ার নিকট শিক্ষানবিশ। অথচ পাণিণির সময়ে ভারতে যে লিপিপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। এই মহান্ আদর্শ বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের রচনা, লিপিপ্রণালীর অস্তিত্ব না থাকিলে, কখনও সম্ভব হইত না। তখন ভাষার চরম উন্নতি। বিশেষ পাণিনি লিখন-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক শব্দ তাঁহার ব্যাকরণে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যাবনিক লিপি অর্থে যবনানী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এ যবনানী লিপি যে গ্রীক-লিপি নহে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বে গ্রীসের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়, গ্রীক-সংস্কার তখন সম্ভব নহে। মহাভারতও অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহাভারতেই দেখা যায়, তাহা লিখিত হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য প্রথম ও তৃতীয় মতের মাঝামাঝি। আমার মনে হয় যে, অতি প্রাচীনকালে বৈদিক স্তোত্ররচনার কালে ভারতে লিপিপ্রণালী ছিল না। বেদের অপর নাম শ্রুতি। অর্থাৎ শুনিয়া যাহা শিক্ষা করিতে হয়। বেদ পূর্ব্বে গুরুমুখে শুনিয়াই শিখিতে হইত। এমন কি, ভারতে লিপিপ্রথা-প্রচলনের বহুকাল পরেও বেদ এইরূপে শুনিয়াই অভ্যাস করিবার প্রথা ছিল। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বেদের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থ পুস্তকাকারে লিখিত না থাকিলে, কেবল শুনিয়া অভ্যাস করা অসম্ভব। হুয়েনসাংএর পরবর্ত্তী ইসিং নামক চীনের বৌদ্ধ পরিব্রাজক, তাঁহার "পাশ্চাত্য দেশে (অর্থাৎ ভারতে) বৌদ্ধাচার" *

---

* জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালী ভাষার অধ্যাপক ডাক্তার তাকাকুশু এই পুস্তকের অতি সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

নামক গ্রন্থে, আধুনিক বিহারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন নালন্দার প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে লিখিয়াছেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, অনেক ব্রাহ্মণ কেবল গুরুমুখে শুনিয়াই বেদাভ্যাস করেন, ব্রাহ্মণগণের স্মরণশক্তি অত্যাশ্চর্য্য। প্রাচীন গ্রীসে, প্যালেস্টাইনে, মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ও প্রাচীন স্কান্দিনেভিয়া দেশে পূর্ব্বে লিপিপ্রথা না থাকিলেও সাহিত্য ছিল, এবং বহু গাথা প্রচলিত ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বেদ শুনিয়াই অভ্যাস করা হইত, ইহা বিচিত্র নহে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি কর্ত্তৃক বেদ-বিভাগের সমকালেই বোধ হয়, বেদ প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। যাহা হউক, অতি প্রাচীনকালে ভারতে লিপিপ্রণালী না থাকিলেও, পরে ভারতেই ইহার সৃষ্টি হয়।* পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি চিত্রলিপি। ভারতেরও প্রাচীনতম লিপি এই চিত্রলিপি। এ চিত্রলিপির নিদর্শন ভারতে একটিমাত্র আছে; ইহা পঞ্জাবে হরপ নামক স্থানে এক স্তম্ভে বর্ত্তমান। এখনও তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। মিশরদেশীয় চিত্রলিপি হইতে সেমিটিক লিপির উদ্ভব। এই ভারতীয় চিত্রলিপি ভিন্নপ্রকারের। প্রাচীন সভ্যজগতে তিনটি মৌলিক চিত্রলিপি ছিল; এক মিশর-দেশীয়, দ্বিতীয় ভারতীয়, তৃতীয় চীনদেশীয়। এই ভারতীয় চিত্রলিপি হইতে উৎপন্ন মানবকণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তিসূচক আধুনিক প্রণালীর লিপির মধ্যবর্ত্তী লিপির নিদর্শন রাজগৃহে শিলাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান; তাহার এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই। অশোকের পূর্ব্বকালীন আধুনিক প্রণালীর অতি প্রাচীন ভারতীয় লিপির নিদর্শনও খুব অল্প। প্রাচীন গান্ধার দেশে এরূপ লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী কালের লিপির নিদর্শন মধ্যভারতে সাঞ্চীস্তূপে পাওয়া গিয়াছে, এবং কয়েক বৎসরমাত্র পূর্ব্বে কপিলাবস্তু-খননকালে পিপরা নামক স্থানে বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ যে কুম্ভের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা এক্ষণে কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, তাহাতে এই কয়েকটি কথা, এই প্রাচীন ভারতীয় লিপিতে লিখিত আছে,—"ইয়ং সলিলনিধানে বুদ্ধস্য ভগবতে শাক্যানাং সুকিতিভাতিনাং সভগিনিকানাং সপুতাদলানাং।" এই সকল লিপির সহিত সেমিটিক বা অন্য কোনও লিপির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ইউরোপীয় পণ্ডিতের ভারতীয় লিপির সম্বন্ধে মতামত, বুদ্ধদেবের এই ভস্মাবশেষ আবিষ্কারের পূর্ব্বেই, বদ্ধমূল হইয়াছে। এই লিপির অবস্থান্তর হইয়া প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপির সাধারণতঃ উৎপত্তি হয়। তবে ফিনীশীয় ও সেমিটিক বণিকগণের সংস্রবে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির সহিত পাশ্চাত্য লিপির

কিছু সংমিশ্রণ ঘটিয়া অশোকলিপির উদ্ভব হয়। লিপিপ্রথার পাশ্চাত্য সংস্কার, এই বোধ করি, ভারতে প্রথম। পণ্ডিতবর বুলার এই উত্তরকালীন ব্রাহ্মীলিপি ও অন্যান্য বহুতর সেমিটিক লিপির যে প্রতিকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ব্রাহ্মীলিপির কোনও কোনও অক্ষরের সহিত কোনও কোনও সেমিটিক লিপির সাদৃশ্য আছে। তবে ব্রাহ্মীলিপির অধিকাংশ অক্ষরই ভারতে প্রচলিত পূর্ব্বোল্লিখিত লিপি হইতে উৎপন্ন। গান্ধারপ্রদেশস্থিত শিলাপৃষ্ঠে ক্ষোদিত অশোকের অনুশাসন ব্রাহ্মীলিপি নহে; তাহা তদ্দেশে তৎকালে প্রচলিত খরোষ্ট্রী বা শকলিপি। কাশ্মীরের উত্তরবর্ত্তী খোটানের ইহা প্রাচীন লিপি। খোটানের প্রাচীন নাম খরোষ্ট্র। এই খরোষ্ট্র-লিপি সেমিটিক লিপি হইতে উৎপন্ন, এবং দক্ষিণ দিক হইতে লিখিত হইত। বোধ হয়, এই বৈদেশিক লিপি গ্রীক-আক্রমণের কিছু পূর্ব্বেই গান্ধার দেশে প্রচলিত হয়। যাহা হউক, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভারতে প্রচলিত পরবর্ত্তি-কালের অবস্থান্তরিত ব্রাহ্মীলিপিতে ও গুপ্ত-লিপিতে, খরোষ্ট্রী লিপির কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তরকালীন ভারতীয় প্রাচীন লিপিতে পাশ্চাত্য সংস্কার বর্ত্তমান। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, প্রাচীন ভারতীয় লিপিপ্রণালীতে বৈদেশিক সংস্কার বর্ত্তমান থাকিলেও, প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালা ভারতের নিজস্ব, এবং আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতি সংস্কৃত ভাষা বা বর্ণমালার তুল্য বৈজ্ঞানিক ভাষা বা বর্ণমালার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য।—প্রাচীন ভারতের কোনও কোনও স্থলে শোভন-কার্য্যে (Decorative art) গ্রীক-সংস্কার বর্ত্তমান ছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর আফগানিস্থানের পূর্ব্বোত্তর প্রদেশে বালখ্ বা ব্যাক্‌ট্রিয়া দেশ বহুকাল যাবৎ গ্রীকরাজ্য ছিল, বলিয়াছি। কাবুলও অনেক কাল যাবৎ এই রাজ্যরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং সিন্ধুনদ ইহার পূর্ব্বসীমা ছিল। ব্যাক্ট্রিয়া-দেশীয় গ্রীকরাজগণ সময়ে সময়ে ভারত আক্রমণ করিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৯০ সাল হইতে খ্রীষ্টের জন্মের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত পঞ্জাবের পশ্চিম অংশ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল। এমন অবস্থায় পঞ্জাব প্রদেশে গ্রীক-সংস্কারের পরিমাণ অধিক হওয়া সম্ভব হইলেও, বস্তুতঃ তাহা ঘটে নাই। তবে শোভন-কার্য্যে এ সংস্কারের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকেই জানেন যে, স্তম্ভ তিন প্রকারের। এক ডোরিক; ইহার উপরিভাগ সোজা, কোনও কারুকার্য্য

নাই। দ্বিতীয় আইওনিক; এই স্তম্ভের উপরিভাগের চারি কোণ মোচড়ান থাকে। তৃতীয় করিন্থিয়ান; ইহার উপরিভাগে লতাপাতা অঙ্কিত থাকে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শোভন। এই তিন প্রকার স্তম্ভই গ্রীকগণের সৃষ্ট, এবং মুসলমান রাজত্বকাল হইতে ভারতে সবিশেষ প্রচলিত। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এক গ্রীক-অধিকৃত দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও গ্রীকপ্রণালীর স্তম্ভ ছিল না। বর্ত্তমান রাওলপিণ্ডি নগরের অনতিদূরবর্ত্তী তক্ষশিলা নগর অতি প্রাচীন ও অতি বৃহৎ। এই নগরে হিন্দু প্রণালীতে নির্ম্মিত হিন্দুমন্দিরে আইওনিক স্তম্ভ দেখা গিয়াছে। মথুরা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে গ্রীক অধিকারে ছিল;— তথায়ও আইওনিক স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে কনিষ্কের সময় হইতে গান্ধার দেশ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। তথায় বহুসংখ্যক বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়মে এরূপ অনেক প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ঐ সকল ভাস্কর্য্য উক্ত প্রদেশের গ্রীকসংস্কারের ফল। তত্রত্য অনেক স্তম্ভ সুদৃশ্য করিন্থিয়ান প্রণালীতে নির্ম্মিত। এই সব বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তির মুখের ভাব অন্যদেশীয় বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন, সুন্দর, এবং দেখিতে অনেকটা গ্রীকদেশীয় প্রতিমূর্ত্তির ন্যায়। বুদ্ধদেবের দেশীয় প্রতিকৃতিতে গুম্ফ দেখিতে পাওয়া যায় না; পেশোয়ার বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ঐ সব প্রতিমূর্ত্তিতে অনেক স্থলে গ্রীকদেশীয় দেবতার প্রতিকৃতির ন্যায় গুম্ফ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি গান্ধারদেশীয় প্রতিমূর্ত্তি নামে খ্যাত। নিকটবর্ত্তী কাশ্মীর দেশে ডোরিক স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্তম্ভে গ্রীকদেশজাত আকান্থাস নামক বৃক্ষের পত্র অঙ্কিত আছে। অশোকের রাজত্বকালের কোনও কোনও শোভনকার্য্য গ্রীক-অনুকরণের ফল। আজ কয়েক বৎসরমাত্র হইল, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাটলিপুত্র-খননকালে যে সব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে কোনও কোনও শোভনকার্য্যে গ্রীক-প্রণালীর অনুকরণ দেখা যায়। ইহা ভিন্ন প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যে গ্রীক-সংস্কার দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যে অজন্তা ও ইলোরার সুন্দর গুহামন্দিরের কথা শিক্ষিতমাত্রই জানেন। এই অজন্তায় যে সব মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি পারসীক মূর্ত্তি ও পরবর্ত্তিকালের পারসীকগণের প্রণালী-অনুসারে উহা নির্ম্মিত। আমি ইতিপূর্ব্বেই জনৈক চালুক্যরাজের কথা বলিয়াছি। তিনি চালুক্যরাজ পুলিকেশিন্। তিনি ৬২৫ খৃঃ অব্দে পারস্যরাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই পারস্য-

দূতদিগের পুলিকেশিনের রাজসভায় আগমন অজন্তার প্রস্তরোপরি ক্ষোদিত রহিয়াছে। এ সব মূর্ত্তি গ্রীকপ্রণালীজাত পারসীক প্রণালী-অনুসারে নির্ম্মিত। দাক্ষিণাত্যে সাক্ষাৎভাবে গ্রীককলাবিস্থার প্রভাব না থাকিলেও, এই অজন্তার সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিগুলি গ্রীক-সংস্কারেরই ফল, বলিতে হইবে। নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতে গ্রীকগণের স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য প্রণালীর প্রভাব আর কোথাও দেখিতে পান, ইহা আমি জানি না।

নাটক।—ওয়েবার প্রভৃতি কতিপয় জর্ম্মান পণ্ডিতের মতে, হিন্দুর নাটক গ্রীক নাটক হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত সিল্‌ডেন লিভী দেখাইয়াছেন যে, এ মত ভ্রান্ত। মৃচ্ছকটিক আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের কয়েক বৎসর পরেই রচিত। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি তাহার পূর্ব্বেই হইয়াছে। নাট্যাচার্য্য ভরত আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বে আবির্ভূত। গ্রীক নাটক ও ভারতীয় নাটকের রচনাপ্রণালী নিতান্ত বিভিন্ন। বিশেষতঃ, এরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণফলে ভারতীয় জ্ঞানে বা ভারতীয় সভ্যতায় কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডার ভারতে কেবল যুদ্ধ করিয়াই দুই বৎসরকাল বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করিয়াছেন; তাঁহার অভিযানের ফলে ভারতে কোনও স্থায়ী সংস্কারের উৎপত্তি অসম্ভব। পরবর্ত্তিকালে মিনান্ডার প্রভৃতি ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণও কেবল এইরূপ অভিযানই করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলেও ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। সুতরাং, গ্রীক নাটক হইতে প্রাচীন ভারতে নাটকের সৃষ্টি সম্ভব বোধ হয় না।

মুদ্রা।—প্রাচীন ভারতের অনেক মুদ্রায় গ্রীক ও হিন্দুভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়। অবশিষ্ট কতকগুলি খাঁটি বৈদেশিক মুদ্রা। সেগুলিকে ভারতীয় মুদ্রা বলা যায় না। ভারতে স্থানবিশেষে প্রচলিত ছিল মাত্র। এখনও এইরূপ তিব্বত প্রভৃতি ভারতের প্রান্তবর্ত্তী দেশে ভারতীয় মুদ্রা বৈদেশিক হইলেও প্রচলিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্জাবের কতক অংশ বহুকাল যাবৎ ব্যাক্ট্রিয়াদেশীয় গ্রীকগণের অধিকারভুক্ত ছিল। সময়ে সময়ে ইঁহারা পূর্ব্বে যমুনাতীর ও দক্ষিণে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই গ্রীক আধিপত্যের ফলে ব্যাক্ট্রিয়াদেশীয় গ্রীকগণের মুদ্রা, পঞ্জাবে, এমন কি, সৌরাষ্ট্র দেশেও প্রচলিত ছিল। এগুলি খাঁটি গ্রীক মুদ্রা। ইহাতে গ্রীক অক্ষর বর্ত্তমান ও গ্রীকমূর্ত্তি অঙ্কিত; ভারতে ইহার প্রচলন ছিল, এইমাত্র। দক্ষিণ ভারতেও

এইরূপ খাঁটি বৈদেশিক মুদ্রা ছিল। প্রাচীন কেরল দেশ * বা মালাবার ও প্রাচীন পাণ্ড্যদেশ বা মাহুরা ও তাহার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেশসমূহের সহিত রোমের বাণিজ্য বড় অল্প ছিল না। সেই জন্য এই সব দেশে রোমীয় মুদ্রার ব্যবহার ছিল। এই গেল খাঁটি বৈদেশিক মুদ্রার কথা। পরবর্ত্তী সময়ের কতিপয় ব্যাক্ট্রিয়াদেশীয় গ্রীক রাজগণের মুদ্রায় ও গান্ধারদেশীয় কুশান-বংশীয় শকসম্রাটগণের মুদ্রায় গ্রীক ও ভারতীয় ভাবের সংমিশ্রণ। খরোষ্ট্রী লিপির আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল উত্তরকালীন গ্রীকরাজ-গণের মুদ্রায় ও কুশানবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় কাদফাইসেসের মুদ্রার এক দিকে গ্রীক অক্ষর ও অপর দিকে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী ভারতের প্রাচীন খরোষ্ট্রী লিপি ব্যবহৃত হইত। কাদফাইসেসের পরবর্ত্তিকালে বিখ্যাত কনিষ্ক প্রভৃতি শকসম্রাটগণের মুদ্রায়, এক দিকে গ্রীকলিপি ও অপর দিকে হিন্দু দেবতার, বা কখনও কখনও বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইত। কাদফাইসেস, কনিষ্ক প্রভৃতি ভারতীয় সম্রাটগণের মুদ্রায় কতকটা রোমীয় সংস্কার দেখা যায়। এই সকল মুদ্রার আকৃতি ও গুরুত্ব রোমীয় সম্রাটগণের মুদ্রারই অনুরূপ, ছিল। এই শকরাজগণের মুদ্রা পূর্ব্ব দিকে মগধ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আলেকজাণ্ডার, মীনাণ্ডার প্রভৃতি গ্রীকগণ কেবল ভারতে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এ দেশে স্থায়ী আধি-পত্য করেন নাই। কেবলমাত্র পশ্চিম পঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী দেশেই তাঁহাদের আধিপত্য ছিল। এমন অবস্থায় উক্ত দেশ ভিন্ন অন্যত্র গ্রীক-সংস্কারের অভাব হইবারই সম্ভাবনা। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বিশেষ কিছু সংস্কার দেখিতেও পাওয়া যায় না। পঞ্জাবে ও গান্ধারে গ্রীকসংস্কার কিছু অধিক হইলেও, বড় অধিক নহে। প্রাচীন হিন্দুরা সহসা অন্যের নিকট, বিশেষতঃ বৈদেশিকগণের নিকট, শিক্ষা করিতে চাহিতেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহারা আপনাদের সভ্যতাকে সর্ব্বা-পেক্ষা প্রকৃষ্ট মনে করিতেন। হিন্দু বৈয়াকরণ পাতঞ্জল ও হিন্দু জ্যোতিষী গর্গ, মীনাণ্ডার প্রভৃতি যবনগণের শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যবনদিগকে অসভ্য বর্ব্বর মনে করিতেন, এবং তাহাদের নিকট কোনও

* কেরলের পরবর্ত্তী নাম চেরা; চেরা কেরল শব্দের রূপান্তরমাত্র।

বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তাহা তাঁহারা মনের কোণেও স্থান দিতে পারেন নাই। তবে প্রাচীন ভারত সাধারণতঃ যে গ্রীক সভ্যতা গ্রহণ করে নাই, আজ এতদিন পরে, ইংরাজের দ্বারা, সেই সভ্যতা ভারতে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে, এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে নূতন ভাবে গঠিত করিতেছে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "দশভুজা" নামক কবিতার প্রথম আট চরণ ভক্তের প্রার্থনা। গদ্য-গন্ধি; কিন্তু তাহাতে ভক্তির সৌরভ আছে। শেষ ছয় চরণ কবিতা,—আমরা উদ্ধৃত করিলাম।—

> "জ্যোৎস্নামহিমাময়ী মরি মরি শারদী যামিনী,
> পাতিয়াছে বনপথে তোর লাগি' কনক-আসন।
> ফলায়েছে অলক্তের নব রাগ রক্ত-কমলিনী
> করিতে রঞ্জন মাগো! আহা তোর ও রাঙ্গা চরণ!
> কি উৎসর্গ! কি আনন্দ! কোটি কোটি ঝরিছে শেফালি!
> আমরাও তোর পদে দিনু আজি এ জীবন ঢালি'।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত "মহানাটকে"র পঞ্চম অঙ্ক পূর্ব্ববৎ। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী "বত্রিশ-সিংহাসন" নামক প্রবন্ধে কতকগুলি কিম্বদন্তী একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। ইহাতে অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ "আশ্রয়" নামক কবিতায় অতি সহজে তুলিকার দু' একটি টানে দিব্য একখানি রেখা-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আশা করি, স্বদেশী ভাবের এই ক্ষুদ্র তরঙ্গটি বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়তটে আঘাত করিতে পারিবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "বুশিদো" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে জাপানী ক্ষাত্রধর্ম্মের পরিচয় দিতেছেন। এই হিতকারী অথচ মনোহারী প্রবন্ধটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। জাপানী নীতিশাস্ত্রে 'ঋজুতা'র যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কবে ভারতবর্ষে সেই ঋজুতা জয়যুক্ত হইবে? জ্যোতিরিন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"এক জন প্রখ্যাত সামরাই অথবা 'বুশি' ঋজুতাকে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—'বিবেকবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অবিচলিতভাবে কোন কার্য্য অনুসরণ করাকেই ঋজুতা বলে,—যখন মরণ উচিত মনে হইবে, তখন মরা, যখন আঘাত করা উচিত মনে হইবে, তখন আঘাত করা'।" শ্রীযুক্ত শশধর রায় "অনন্ত জীবন" প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, "বহুকোষিক জীবের দেহ মরে, কিন্তু এক-

কৌষিক জীবের পৃথক দেহ না থাকায় উহার মৃত্যু নাই। * * * (মৃত্যু) যে দেহকে মারিল, তাহাকে সম্পূর্ণ মারিতে পারিল কৈ? সে মরিবার পূর্ব্বেই একাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপত্য-রূপে রাখিয়া গেল, সুতরাং জীবপ্রবাহ এবং দেহপ্রবাহ অক্ষুণ্ণই রহিয়া গেল।" বহুকৌষিক, এককৌষিকের পরিবর্ত্তে, এককোষ, বহুকোষ লিখিলে, বোধ করি, শ্রুতিমধুর হইত। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামীর "বর্ণচিত্র" নামক চিত্রকলাবিষয়ক প্রবন্ধটি মনোরম, এবং শিক্ষণীয় বিষয়ে পূর্ণ। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় আর কেহ এ বিষয়ে কিছু রচনা করিয়াছেন, মনে হয় না। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর "বঙ্গনারীর রাখী-বন্ধন" নামক কবিতায় মাতৃভূমির লক্ষ্মীস্বরূপ নারীসমাজের গভীর ও গম্ভীর মঙ্গলশঙ্খধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "ঘরের কথা"—একাদশ পরিচ্ছেদে এবার কোনও মতে 'নিয়মরক্ষা' হইয়াছে। অমৃত বাবু এক জন সৌখীন হোমিওপ্যাথ, তাহা জানি; কিন্তু তাই বলিয়া পাঠকের কৌতূহল-রোগনিবারণের জন্য এমনতর হোমিওপ্যাথিক 'গ্লবিউলে'র ব্যবস্থা করিলে আমরা ছাড়িব না। লেখকের বলিবার প্রণালী অভিনব, এবং রচনায় চমৎকার বৈচিত্র্য আছে। তিনি দরিদ্রের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে ডাক্তারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যসুলভ 'কালীঘাটের পটে' সচরাচর দেখা যায় না। দেখুন,—"ডাক্তার বাবু নিজের পকেটস্থ শিঙ্গা দেখাইয়া তাহা ফুঁকিবার জন্য রোগীকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তুষার ঢালিয়া মস্তকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা করিয়া দিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাহাতেও বড়বাবু গোঁ গোঁ করেন, তখন তিনি এক মোহর কুল-মর্য্যাদা দিয়া এক জন শ্বেতপুরুষকে আনাইলেন, * * * পুরুষবর আসিবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বড়বাবু তাড়াতাড়ি একটা বেলেস্তারার ওয়েষ্টকোট গায়ে দিয়া দুর্গা শ্রীহরি করিলেন। সাহেবের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বাড়ীতে হরিবোলের তরঙ্গ উঠিল।" এই মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গের স্তরে স্তরে করুণা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় বহিতেছে। অনিপুণ হস্তে যে ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ হৃদয়হীনতার হলাহল হইয়া উঠিত, নিপুণ শিল্পীর হস্তে তাহা সহৃদয়তার সুধায় স্নিগ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এনেষ্ট পিরিউর প্রণীত মূল ফ্রেঞ্চ হইতে "সমসাময়িক ভারত ও জাতীয় আন্দোলন" প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। এক জন চক্ষুষ্মান ফরাসী ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিজেতা ইংরেজ ও বিজিত ভারতবাসী উভয়েরই সমান পথ্য। শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিকের "চীনজাহাজে যাত্রী" সুখপাঠ্য।

বঙ্গদর্শন। কার্ত্তিক। "বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা" একটি সাময়িক প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের রচনা। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ "নূতন গুরুমহাশয়" নামক চলনসই নক্সায় বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত তথাকথিত 'কিণ্ডারগার্ডেন' প্রণালীকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্কলিত "কোচিন" সুরঞ্জিত ও সুলিখিত প্রকৃতি-চিত্র। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "জাপান ও হিন্দু-আশিয় সাধনা" উল্লেখযোগ্য। লেখকের মতে,—"এই জাপ রুস সংগ্রামে জাপান কেবল আপনার অসাধারণ শক্তি ও অলোকসামান্য সংযম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু হিন্দু-আশিয় সাধনা বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, যাহা খ্রীষ্ট-ইউরোপীয়

সাধনা হইতে নিকৃষ্ট নহে, বিশ্বমানবের অঙ্গপুষ্টির জন্য যে সাধনার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক, যে সাধনা অকালে নির্ম্মূল হইলে বিশ্বমানবের অঙ্গহানি হইবে, তাহাও জাপান বর্ত্তমান সময়ে প্রমাণিত করিয়াছে।" যাঁহারা 'হিন্দু-আশিয় সাধনা'র স্বরূপ জানিতে চাহেন, তাঁহারা মূল প্রবন্ধ পাঠ করুন। প্রবন্ধের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সর্ব্বত্র বাঙ্গলা রচনা-রীতির অনুগত হইলে, লেখকের বক্তব্য অনায়াসে সমাজের সকল স্তরে সঞ্চারিত হইতে পারিত। দুঃখের বিষয়, একাগ্র সাধক ভাবের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গিয়াছেন, ভাষায় অবহিত হইবার অবকাশ পান নাই। "সাধনা হইতে নিকৃষ্ট নহে" ইংরাজী, "সাধনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট" বাঙ্গালা রচনা-রীতির অনুগত, এবং ইংরাজী ভাষার অনভিজ্ঞ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য। প্রমাণস্বরূপ একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াই নিরস্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "মর্ম্মচ্ছেদ" প্রবন্ধে বাঙ্গালীকে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রায় সমস্তই পূর্ব্বশ্রুত। রচনাটিকে আর এক হিসাবে 'বাঙালী' শব্দের 'নামাবলী' বলা যাইতে পারে। অবশ্য আধুনিক 'বঙ্গদর্শনে'র বাঙ্গালী 'ঙ্গ'-বর্জ্জিত। 'বঙ্গদর্শন ঙ দিয়া ঙ্গ-র অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রেসে ঙ-র বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, তাই রক্ষা! আর কোনও ছাপাখানা এত ঙ সরবরাহ করিতে পারিত না। বঙ্গ শব্দ হইতে বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তি। 'বাঙালী' যদি 'ঙ' কাঁধে করিয়া তরিয়া যায়, তাহা হইলে 'বঙ্গ' বেচারী ঙ্গ-র হুলে বিদ্ধ হইবে কেন? বঙ্গদর্শনের 'ঙ্গ'কে গঙ্গায় মিশাইয়া দিয়া, বঙ্দর্শন' না করিলে, বঙ্গে ও বাঙালীতে সামঞ্জস্য থাকে না।

নবনূর। কার্ত্তিক। "উত্থান-গীতি" কবিতায় কবিত্ব নাই; উদ্দীপনা আছে। "স্বদেশী আন্দোলন" সময়োপযোগী প্রবন্ধ বটে। শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর "মৃণালিনী" গল্পটি উল্লেখযোগ্য, রচনা আশাপ্রদ। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তের "মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস" প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। আমরা এইরূপ প্রবন্ধের পক্ষপাতী। শ্রীযুক্ত আফ্‌সরউদ্দীন আহমদের "ঋষিকল্প বসরহাফী" সুখপাঠ্য সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।

পুণ্য। আশ্বিন-কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর "রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যা-শিক্ষা"র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমতী মনীষা দেবীর "মহিলাদিগের কর্ত্তব্য" পাঠিকাগণের পঠনীয়। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "ভিনিস-ভ্রমণ" মন্দ নহে, কিন্তু মাত্রায় একবিন্দু। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশিত করিয়া সম্পাদক সাহিত্য-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মাইকেল একখানি চিঠিতে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছেন,—"কবিতা আমাকে একেবারে বশ করিয়া রাখিয়াছে। বোধ করি তোমার এই বন্ধু বেচারী ভিন্ন আর কেহ কবিতায় এত অধিক মত্ত হয় নাই। সরস্বতীর সেবায় আমি দিবারাত্রই নিযুক্ত। * * * * 'বিদ্যা আগে পরে রাজা'—ইহাই আমার মন্ত্র।" অন্যত্র— "আমি যে অন্যান্য লেখক অপেক্ষা বেশী পরিশ্রমী তাহা নয়, সময়ে সময়ে আমি অতিশয় অলস হইয়া পড়ি; কিন্তু আবার এক এক সময় প্রাণের মধ্যে এমন এক উচ্ছ্বাসের বেগ আসে যে, তখন আমার লেখনী পর্ব্বতনির্ঝরের ন্যায় ছুটিতে থাকে। মদ্য এবং যাবতীয় নীচ পাপবৃত্তির বিষয় বলিতে গেলে—যদিও আমি একটি সাধুপুরুষ নহি ও মদ্যপান একেবারেই করিব না বলিয়াও প্রতিজ্ঞা করি নাই, কবিতা লিখিবার কালে আমি কখন সুরাপান করি না। যদিও

কখন করি, তাহা হইলে তখন আমার মনের ভাবগুলি একেবারে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। তিলোত্তমার মধ্যে একটি ছত্র নাই যাহা এমন কি এক গ্লাস গোলাপী শেরী বা বীয়ারের স্থায় মৃদু মাদক দ্রব্যের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে।" মাইকেল যে প্রতিভাকে প্রবৃত্তির দাসী হইতে দেন নাই, তাঁহার কাব্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু হায়! মাইকেলের স্বর্গীয় প্রতিভা যদি প্রবৃত্তিকে তাঁহার হৃদয়রাজ্য হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিতে পারিত! যদি কবিপ্রতিভার অগ্নিতে মানবের পাপবৃত্তি ভস্মীভূত করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এই জগৎই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত। এই পত্রের উপসংহারে মাইকেল বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—"আমার ইচ্ছা যে ইটালিয়েন অট্টোভা রিমার (Ottova Rima) ছন্দে একটি উপন্যাস লিখি।" বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মাইকেলের এই সাহিত্য-সঙ্কল্প সফল হয় নাই। মাইকেলের মুকুট ইতিমধ্যেই যাঁহাদের মাথায় ছোট হইয়া গিয়াছে, সেই কবিদের কেহ মাইকেলের শেষ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করুন না। পুণ্যে প্রকাশিত মাইকেলের পত্রগুলি সম্ভবতঃ ইংরাজী ভাষায় লিখিত মূল পত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ। "হেক্টর-বধে" মাইকেলের বাঙ্গালা গদ্যের যে নমুনা দেখিয়াছি, পত্রের বাঙ্গালা সে ধরণেরই নয়। পুণ্যের প্রিয় সম্পাদক-দ্বয়, কবিগুণসাগর ও কবিভাস্কর মহাশয়েরা, পাঠকসমাজের এই ভাষার ধাঁধা ভাঙ্গিয়া দিলে প্রকৃতই পুণ্যসঞ্চয় করিবেন। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পদ্মরাগে"র "তুমি আদি চিরকবি" অতি সুন্দর। আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

তুমি আদি চিরকবি!
অনন্ত আকাশে জ্যোতির অক্ষরে
কিবা আঁকিয়াছ ছবি;
তুমি আদি চিরকবি!

শুভ্র ছায়াপথ চারু রচনায়
ফুটিয়াছে শশী রবি;
তুমি আদি চিরকবি!

বনে বনে তব সুষমা রচনা
ফুটে কুসুম সুরভি,
তুমি আদি চিরকবি!

হৃদয়ে লিখেছ অক্ষর রচনা
অপ্রতিম প্রেম-ছবি,
তুমি আদি চিরকবি!

সুলতান মাহমুদ গজনী।
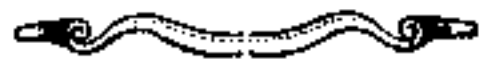
হারুন-অল-রসিদের পরলোকগমনের পর এসলাম-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। হারুনের পরবর্ত্তী খলিফাগণের দৌর্ব্বল্যবশতঃ এসলাম-সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশসমূহের শাসনকর্ত্তৃপদে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সকল শাসনকর্ত্তার এক রাজ-নাম ব্যতীত আর কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ব্যপদেশে রাজকোষে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব-প্রেরণ রহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিপুল অর্থরাশি দ্বারা সৈন্যপালন করিয়া আপন আপন ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার মানসে শক্তিসঞ্চয় করিতেন। এই সকল কারণে খলিফাগণ ক্রমশঃ এত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে বোগদাদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ব্যতীত আর সমস্ত দেশ এসলাম-সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া যায়,এবং একমাত্র ধর্ম্ম বিষয়েই খলিফাগণের প্রাধান্য আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু এ অবস্থাতেও শাসনপতিগণ আপনাদিগকে এসলাম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই পরিচয় দিতেন, এবং রাজকীয় কাগজপত্রে এসলাম-সাম্রাজ্যের নাম ব্যবহার করিতেন।

ইহাঁদের মধ্যে খোরসান ও মাওরান্নাহার প্রদেশের শাসনাধিকারী এস্মাইল সামানি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলেন। সামানি ২৬৩ হিজিরী অব্দে স্বনামে খোতবা ও সিক্কা প্রচলিত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শিল্প ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থান বোখারা নগরীতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মাওরান্নাহার, খোরসান, পারস্যের কিয়দংশ, কান্দাহার, কাবুল ও জাবুলিস্থান প্রভৃতি দেশ শাসনাধীন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই রাজকুল-চূড়ামণি প্রবল প্রতাপ ও ন্যায়পরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনের পর তদীয় বংশধরগণের প্রাধান্য ন্যূনাধিক নবতি বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সামানি-রাজবংশীয় রাজন্যবৃন্দ ন্যায়পরায়ণতা ও মৃদু স্বভাবের নিমিত্ত খ্যাতি লাভ করেন। সামানির অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম আব্দুল মালিক নু। ৩৫০ হিজিরী অব্দে তিনি আবুল মনসুর নামক একমাত্র শিশু পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে

পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সম্বন্ধে রাজপুরুষগণের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। এক দল রাজপুরুষ অল্পবয়স্ক আবুল মনসুরকেই রাজপদ প্রদান করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন। অপর দল শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যবিধানার্থ পরলোকগত নরপতির পূর্ণবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে মনন করেন। রাজপুরুষগণ মিলিত হইয়া এই বিবাদমীমাংসার ভার খোরসানের বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা আলেপ্তগীনের হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি মনসুরকে অল্পবয়সনিবন্ধন রাজকার্য্যনির্ব্বাহের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তদীয় পিতৃব্যের অনুকূলে মত প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যবাহক দূতের বোখারায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বিভিন্নবাদী রাজপুরুষগণ মতদ্বৈধের পরিহার করিয়া মনসুরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। আলেপ্তগীন নবাভিষিক্ত রাজার রাজ্যাধিকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার বিরাগ-ভাজন হন। মনসুর তাঁহাকে শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী বোখারায় প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন।

আলেপ্তগীন বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি প্রথমে এক জন ক্রীতদাস ছিলেন; ক্রমশঃ প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়া অবশেষে বোখারার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। এ জন্য দরবারের অসূয়াপরবশ বহু রাজপুরুষ তাঁহার বিপক্ষতা-চরণে নিরত ছিলেন। আলেপ্তগীন অসূয়াপরতন্ত্র রাজপুরুষগণে পরিবেষ্টিত, অসন্তুষ্টচিত্ত রাজার সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করা বিপদ্‌সঙ্কুল বিবেচনা করিয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বিরত হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন; কিন্তু রাজসৈন্যের সম্মুখীন হইবার উপযোগী বলসঞ্চয় করিতে অসমর্থ হইয়া তদীয় কার্য্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে খোরসান পরি-ত্যাগপূর্ব্বক গজনী অধিকার করিবার কল্পনায় তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। আলেপ্তগীন সসৈন্যে গজনীতে উপনীত হইলে, তৎস্থানবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিল। কিন্তু তিনি ইহাতে হতাশ্বাস না হইয়া নগরীর বাহিরে শিবিরসংস্থাপনপূর্ব্বক অতি সহজে গজনীর উপকণ্ঠ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। তিনি এরূপ নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে এই বিজিত স্থানসমূহের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন যে, তত্রত্য অধিবাসিগণ শান্তিলাভ করিয়া অচিরে বিজেতার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। একদা তিনি রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন,

এমন সময় তাঁহার এক দল ভৃত্য নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে কতকগুলি পাতিহাঁস লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। ভৃত্যেরা তাঁহার সমীপস্থ হইলে, আলেপ্তগীন, কিরূপে পক্ষীগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল যে, পল্লীবাসীরা উপযুক্ত মূল্যে পক্ষীগুলি তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাদের বাক্যে আস্থাস্থাপন না করিয়া ঐ গ্রামের মণ্ডলকে আনয়ন করিবার জন্য এক জন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করিলেন। মণ্ডল উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। আলেপ্তগীন মণ্ডলের বাক্য শ্রবণ করিয়া অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে আদেশ দিলেন। সেনানায়কগণ অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডবিধানের জন্য নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি পক্ষীগুলির পা রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রজ্জুর অপর মুখ অপরাধীদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে বন্ধন করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। পাতিহাঁসগুলি মুক্তিলাভের জন্য এরূপ সজোরে পাখা ঝাপটাইয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিল যে, তাহারা অচিরে রক্তাক্তকলেবর হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তাহাদিগকে সৈন্যাবাস প্রদক্ষিণ করাইবার নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল। বিচারের বৃত্তান্ত চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, দুর্গবাসিগণ তৎশ্রবণে চমৎকৃত হইল। অতঃপর তাহারা সমবেত হইয়া নির্দ্ধারণ করিল যে, আলেপ্তগীনের ন্যায় সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই তাহাদের শাসনকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। এ জন্য তাহারা অবিলম্বে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

আলেপ্তগীন গজনী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে অখণ্ড প্রভুত্ব সংস্থাপিত করিয়া প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময় সামানি রাজসৈন্য তাঁহার উচ্ছেদসাধনের জন্য আগত হইল। কিন্তু তাঁহার নবতেজোদৃপ্ত সৈন্যের হস্তে বারংবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। অতঃপর আলেপ্তগীন সমগ্র কাবুল ও কান্দাহারে প্রভুত্বসংস্থাপন করিয়া প্রবলপ্রতাপে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা বিপত্তি অতিক্রান্ত হইবার পর যে অভিনব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, উত্তরকালে তাহা গজনীর রাজবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে, এবং ধনগৌরবে ও প্রবল প্রতাপে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। গজনীর রাজবংশীয় নরপতিগণই ভারতবর্ষে দৈব বিপদের ন্যায় পতিত হইয়া ভারতবাসীর শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করেন। আলেপ্তগীন পঞ্চদশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া পরলোকে গমন করেন ;—এই সময় তিনি পদগৌরবে ও ক্ষমতায় মুসলমান জগতে অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন।

আলেপ্তগীন লোকান্তরিত হইবার পর তদীয় পুত্র আব্দুল আইজাক পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। তিনি ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হন। আইজাক নিঃসন্তান ছিলেন। এ জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর সৈন্যগণ মিলিত হইয়া আপনাদের অধিনায়ক সবক্তগীনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। সবক্তগীন এক জন তুর্কিজাতীয় ক্রীতদাস ছিলেন। আব্দুল মালিক মুসামানির রাজত্বকালে নছর হাজি নামক বণিক্ সবক্তগীনকে ক্রয় করিয়া বোখারায় লইয়া যান। এই ক্রীত বালকের মুখে চোখে বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মশীলতার দেদীপ্যমান চিহ্ন ছিল। মালিক নুর শ্রেষ্ঠতম অমাত্য আলেপ্তগীন তাঁহাকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া ক্রয় করেন, এবং তার পর উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সবক্তগীন সর্ব্বদা কি সম্পদে, কি বিপদে, ছায়ার মত স্বীয় প্রভুর অনুসরণ করিতেন। আলেপ্তগীন কর্তৃক গজনী অধিকৃত হইবার সময় সবক্তগীন তাঁহার এক জন প্রধান সহায় ছিলেন। ফলতঃ, স্বীয় প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। অবশেষে তিনি প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। তার পর প্রভুর পুত্রের অকালে মৃত্যু হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজপদ লাভ করিলেন। সবক্ত-গীন রাজ্যলাভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই স্বীয় প্রভুকন্যার পাণিপীড়ন করিলেন, এবং তদ-নন্তর নিঃশত্রু হইয়া রাজ্যশাসনের জন্য শৃঙ্খলাস্থাপনপূর্ব্বক পররাজ্যহরণার্থ প্রয়াসী হইলেন। ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী বলিয়াই দুর্ভাগিনী। ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্য্যের জনশ্রুতি তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি পররাজ্যহরণ ব্যাপারে মনোনিবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে আপনার প্রচণ্ড বাহু উত্থিত করিলেন।

"এ সময় ভারতবর্ষীয় রাজগণের আধিপত্য কিরূপ ছিল,তাহা জানা আবশ্যক। লাহোরে জয়পাল আধিপত্য করিতেছিলেন; উত্তরে হিন্দুকুশ, পশ্চিমে লাহোর, পূর্ব্বে কাশ্মীর ও দক্ষিণে মূলতান পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য ছিল। দিল্লীতে তোমরবংশীয় রাজপুতের রাজত্ব ছিল। কান্যকুব্জে রাঠোরবংশীয়গণ আপনাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিয়াছিলেন। উত্তরে পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে কাশী, পশ্চিমে বুন্দলখণ্ড ও দক্ষিণে মিবার পর্য্যন্ত ইহাঁদের প্রভুত্ব ছিল। উত্তরে আরাবল্লী পর্ব্বত, দক্ষিণে ধার প্রমার, পশ্চিমে গুজরাট, এই সীমার মধ্যবর্ত্তী মিবাররাজ্যে গোহিলাট (সাধারণতঃ গিহ্লোট) বংশীয় রাজপুতগণ আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণে চালুক্যগণ,বঙ্গে পাল ও সেনবংশীয়গণ,উড়িষ্যায় কেশরিবংশীয়গণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে যদুবংশীয়গণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং যখন গজনীর অধিপতি-

গণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত এবং গুজ-রাট হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজগণের আধিপত্য ছিল।” (১)

সবক্তগীন ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশে বিপুল বাহিনী সহ উপনীত হইলেন। এই দেশে জয়পালের আধিপত্য ছিল। লাহোরে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। সবক্তগীন রণক্ষেত্রে জয়পালকে পরাজিত করিয়া অগণ্য ধনরত্ন লুণ্ঠনপূর্ব্বক দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ করিবার জন্য বহুসংখ্যক নরনারী সঙ্গে লইয়া সগৌরবে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য পর বৎসর জয়পাল অসংখ্য সৈন্য সহ গজনী আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। গজনী রাজ্যের প্রান্তসীমায় উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। কিন্তু এই সময় অকস্মাৎ প্রবলবেগে তুষারপাত আরম্ভ হওয়াতে হিন্দুসৈন্য শীতের প্রাবল্য সহ্য করিতে না পারিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। জয়পাল এক লক্ষ দিরহাম জরিমানা স্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে সবক্তগীন কুপিত হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এবারও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিয়া পঞ্জাবে এক জন শাসনকর্ত্তা রাখিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইবার প্রত্যাগমনের পর সবক্তগীন আর ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। স্বরাজ্যের নানা কার্য্যেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনগুণে সামন্ত-কলহের কারণ নিবারিত ও দেশমধ্যে পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিনহাজ উদ্দীন তাঁহাকে বিজ্ঞ, ন্যায়বাদী, সাহসী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায়সঙ্গত সদয় ব্যবহারে প্রজাবৃন্দ সন্তুষ্ট ছিল। সবক্তগীন বিংশ বৎসর রাজত্বের পর ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পরলোকে গমন করেন।

সবক্তগীনের পরলোকপ্রাপ্তির সময় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমুদ রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। এ কারণ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এস্মাইল রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এই সূত্রে পিতৃপরিত্যক্ত অগাধ ধনভাণ্ডার হস্তগত করিয়া অমাত্যবর্গকে বহুমূল্য উপঢৌকন, সৈন্যদিগের বেতনবৃদ্ধি ও জনসাধারণকে রঙ্গ তামাসা দ্বারা

---

(১) ৺রজনীকান্ত গুপ্ত।

পরিতুষ্ট করিয়া আপন সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে যত্নশীল হন। সম্ভবতঃ মাহমুদ সবক্তগীনের পরিণীতা পত্নীর পুত্র ছিলেন না। এ জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ স্বভাবতঃই এস্মাইলের পক্ষপাতী ছিল। তদুপরি তাহাদের সন্তোষবিধানের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করাতে, রাজ্যের অধিকাংশ লোক তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠে। কিন্তু ঈদৃশ অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও তাঁহার অদৃষ্টে দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ ঘটে নাই। মাহমুদ পিতার মৃত্যু ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া সসৈন্যে রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক ভ্রাতার মস্তক হইতে রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। মাহমুদ প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। ৩৬১ হিজিরী অব্দের মরেম মাসের ১০ই তারিখে রাত্রিকালে মাহমুদের জন্ম হয়।

মাহমুদ দৃঢ়কায়, দ্রুতগামী, সাহসী ও রণনিপুণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আকৃতি শ্রীহীন ছিল। তারিখ-ই-গুজিদা নামক ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা মাহমুদ দর্পণে মুখাবলোকন করিয়া বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হয়েন। তদীয় প্রধান পারিষদ তাঁহাকে বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল দেখিয়া কারণজিজ্ঞাসু হন। মাহমুদ উত্তর করেন, "প্রজাবর্গ রাজদর্শন লাভ করিয়া উৎসাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যেরূপ কদাকার দেহ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা আমাকে দেখিয়া কখনও প্রীত হইবে না।" প্রধান আমাত্য তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বলেন, "জাঁহাপনার দর্শনলাভ করিতে পারে, তাদৃশ সৌভাগ্যবান্ প্রজার সংখ্যা বিরল। কিন্তু আপনার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য আপামর সাধারণ সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় আকর্ষণ জন্য রাজোচিত গুণগ্রামই যথেষ্ট।" পারিষদের বাক্যে প্রীত হইয়া মাহমুদ স্বীয় গুণগ্রামের উৎকর্ষসাধনার্থ যত্নশীল হন। বস্তুতঃ, তিনি রাজোচিত গুণগ্রামে সমকালীন রাজন্যবর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন।

মাহমুদ ন্যায়বিচারক ও শাসন কার্য্যে দৃঢ়চিত্ত বলিয়া জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তদীয় পিতা সবক্তগীন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন তাঁহার গৃহস্থিত অগ্নিকুণ্ড হইতে একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে ছায়াবিস্তার করিয়াছে। স্বপ্নান্তে সবক্তগীন জাগ্রত হইয়া জানিতে পারেন যে, তদীয় মহিষী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী সবক্তগীন-দৃষ্ট স্বপ্নের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন

যে, নবজাত শিশুর ন্যায়বিচার ও সুশাসনে অত্যাচারদগ্ধ প্রকৃতিপুঞ্জ সুশীতল হইবে। ঐতিহাসিককুলতিলক ফেরিস্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পণ্ডিত-মণ্ডলীর ব্যাখ্যা সার্থক হইয়াছিল। তিনি মাহমুদের ন্যায়বিচার ও সুশাসনের অনেক প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, তাঁহার রাজত্বকালে ব্যাঘ্র ও মেষ-শাবক এক সঙ্গে জলপান করিত, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

মাহমুদের ন্যায়বিচার ও সুশাসনের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বভাব অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ও লালসাপূর্ণ ছিল। কুক্ষণে এক জন নগরবাসীর সহধর্ম্মিণীর বিমল রূপরাশি তাঁহার পাপচক্ষে পতিত হইয়াছিল। রাজকুমার সে অলোক-সামান্যা রূপবতীকে হস্তগত করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু এই কুল-কামিনীকে প্রলোভনে বিচলিত করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতি রজনীতে বলপূর্ব্বক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার পাপবাসনা চরিতার্থ করিতেন। উৎপীড়িত নাগরিক রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলে ক্রোধে ও ক্ষোভে মাহমুদের নয়নযুগল আরক্ত ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠে। তিনি স্বচক্ষে সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যথাযোগ্য শাস্তিবিধানের জন্য রাত্রিযোগে অভিযোগ-কারীর গৃহে গমন করেন, তথায় উপনীত হইয়া প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে কথিত পাপকার্য্যে লিপ্ত দেখিতে পান। এই সময় গৃহাভ্যন্তর দীপালোকে আলো-কিত ছিল। মাহমুদ গৃহদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া স্বহস্তে প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রের শিরশ্ছেদন করেন, এবং পরমুহূর্ত্তেই জল জল করিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তাঁহার আদেশ-অনুসারে এক পাত্র জল আনীত হইলে তিনি উহার কিয়দংশ পান করেন। অভিযোগকারী নাগরিক কৃতজ্ঞ-অন্তরে উচ্ছ্বসিতচিত্তে মাহমুদের পদতলে পতিত হয়, এবং তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে দীপনির্ব্বাণ ও জল-পানের কারণ জিজ্ঞাসা করে। তদুত্তরে মাহমুদ বলেন, "ন্যায়বিচারের নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক, তাহার সম্পাদনকালে প্রিয়পাত্রের মুখসন্দর্শনে স্নেহ-পরবশ হইয়া আমি কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইতে পারিতাম, এই জন্যই দীপনির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছিলাম ; এই ব্যভিচারের উপযুক্ত দণ্ডবিধান না করিয়া কোনও প্রকার পানীয় বা আহার্য্য গ্রহণ করিব না বলিয়া ঈশ্বরের নিকট শপথ করিয়াছিলাম ; প্রবল তৃষ্ণায় মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল বলিয়া জল আনয়ন করিবার জন্য তাদৃশ ব্যগ্রভাবে আদেশ করি।"

একবার পারস্যদেশে এক দল দস্যু এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহার

সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল। নিহত ব্যক্তির মাতা সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করে। তাহাতে তিনি বলেন, "দস্যুদল অতি দূরে বাস করে। তাহাদিগকে কি প্রকারে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে?" অভিযোগকারিণী রমণীর প্রকৃতি তেজস্বিনী ছিল। রমণী উত্তর করিল, "জাঁহাপনা! যদি সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতে না পারেন, তবে দেশজয় করিয়া কি লাভ? শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রজার রক্ষা না করিলে ঈশ্বরের নিকট প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।" মাহমুদ রমণীর সঙ্গতবাক্যে লজ্জিত হইয়া তদ্দেশের দস্যুর উপদ্রবনিবারণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

আর একটি ঘটনার বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। একবার মাহমুদ কিরমানের নরপতিকে উপঢৌকন দিবার জন্য নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মসায়ুদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে এক দল দস্যু এই সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনার পর রাজকুমার সুলতানের নিকট উপনীত হইলে, তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও বিরত ছিলেন। মসায়ুদ পিতৃরোষ দর্শন করিয়া ভয়ব্যাকুলচিত্তে ভূতলে পতিত হইয়া স্বীয় অপরাধের কারণজিজ্ঞাসু হন। তদুত্তরে মাহমুদ বলিলেন, "তুমি আমার পুত্র, কিন্তু তোমার চোখের সম্মুখে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, আর, তুমি তাহার কিছুই করিতে পার নাই। ইহাতে আমি কখনও তোমার প্রতি প্রীতিমান থাকিতে পারি না।" মসায়ুদ পিতৃবাক্য শুনিয়া বলেন, "জাঁহাপনা, আমি হিরাটে অবস্থিতি করিতেছিলাম, আর ডাকাতি থাবিসের মরুভূমিতে হইয়াছে; আমার কি দোষ?" মাহমুদ উত্তর করেন, "আমি তোমার কোনও আপত্তি গ্রাহ্য করিব না; জীবিতাবস্থাতেই হউক, কি মৃতাবস্থাতেই হউক, সমস্ত দস্যুকে আমার নিকট ধৃত করিয়া আনিতে না পারিলে আমি তোমার মুখাবলোকন করিব না।" ইহার পর মসায়ুদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কৌশলপূর্ণ চেষ্টায় দস্যুদল ধৃত হয়, এবং মাহমুদ তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ফলতঃ, মাহমুদ ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রণকুশলতা ও অজেয় বাহুবলই তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী খ্যাতির কারণ ছিল। বাল্যকালেই তাঁহার যুদ্ধসম্বন্ধীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মাহমুদ যখন চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক বালক, তখন একবার পঙ্গপালসদৃশ বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য সবক্তগীনকে বিধ্বস্ত করিতে সমাগত হইয়াছিল। সবক্তগীন শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য উপায়নির্দ্ধারণার্থ মন্ত্রিসভা আহ্বান করিলে,

কিশোরবয়স্ক মাহমুদ যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাই সকলের নিকট সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং তদনুসারে কার্য্য করাতেই শত্রুসৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

কেবল রাজার নিজের বাহুবল ও রণকুশলতাই রণক্ষেত্রে জয়লাভপক্ষে যথেষ্ট নহে। প্রভুর কার্য্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ অনুরক্ত সেনাপতি ও সৈন্যেরও আবশ্যক। মাহমুদ এ বিষয়েও সৌভাগ্যশালী ছিলেন। মাহমুদ সৈনিকগণের সুখদুঃখের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন বলিয়াই তাহারা তাদৃশ প্রভুভক্ত ছিল, এবং প্রভুর কার্য্যে জীবন তুচ্ছবোধ করিত। একবার শীতকালে মাহমুদ সসৈন্যে শত্রুর অনুসরণ করিতেছিলেন। রাত্রিকালে তিনি নিজের পট্টাবাসের চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বালিতে আদেশ করেন। এই অগ্নির তাপে অনেক পারিষদ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া পড়েন। এই সময় ডিল্ক নামক এক জন সামন্ত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া মাহমুদ বলেন, "ডিল্ক, তুমি বাহিরে যাইয়া শীতকে বল, 'তোমাকে সুলতান গ্রাহ্য করেন না।' ডিল্ক বাহিরে গমনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করেন, 'নিদারুণ শীত জাঁহাপনার কথা পরিজ্ঞাত হইয়া বলিয়াছে, 'রাজার পট্টাবাসে আমার অধিকার নাই; কিন্তু অন্য রাত্রিতে সৈন্যাবাস এরূপ ভাবে অধিকার করিব যে, তিনি প্রাতঃকালে নিজ হস্তে অশ্ব সজ্জিত করিতে বাধ্য হইবেন।" সামন্তের রহস্যবাক্যে সুলতান ঈষৎ হাস্য করেন, এবং এই প্রবল শীতকালে আর অগ্রসর হইলে সৈন্যবৃন্দের কষ্ট হইবে বুঝিতে পারিয়া, পরদিন প্রাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেন।

রণকুশলতা ও সৈন্যবৃন্দের গভীর অনুরাগে বর্দ্ধিত স্বীয় বীর-হৃদয়ের উচ্চাভিলাষপূরণার্থ মাহমুদ পৃথিবীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত করেন। দিগ্বিজয়-কালে তিনি নিষ্ঠুর অত্যাচারের একশেষ করিয়া আপনার নাম অপযশে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ছিল না। স্বেচ্ছা-চারী রাজার সভায় যে সকল শোকাবহ দৃশ্য উপস্থিত হয়, তৎসমুদায় কখনও মাহমুদকে কলঙ্কিত করে নাই। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিলে তিনি বিদ্রোহীকে কারারুদ্ধ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন; অন্য কোনও প্রকার নিষ্ঠুর দণ্ডের বিধান করিতেন না। মাহমুদ প্রাণদণ্ড বিধান করিবার সময়ও কোনও প্রকার বর্ব্বরতার পরিচয় দিতেন না। সময় সময় তাঁহার হৃদয়ে করুণার জ্যোতিঃও চকিতের ন্যায় প্রতিফলিত হইত। আমরা ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ

আখলাক-ই-মুহশিনী নামক গ্রন্থ হইতে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার বিবরণ প্রদান করিতেছি। এই ঘটনায় এক দিকে তাঁহার দয়ার্দ্র প্রকৃতি, এবং অন্য দিকে তাঁহার দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল। একদা এক জন শ্রমজীবী একখণ্ড বৃহদাকার পাথর বহিয়া লইয়া যাইতেছিল; পাথরের গুরুভারে তাহার শরীর অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। মাহমুদ তাহার কষ্ট দেখিয়া দয়াদ্র চিত্তে পাথরখানি নামাইবার জন্য আদেশ করেন। শ্রমজীবী তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া পাথরখানি ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তদবধি উহা সেই খানেই ছিল। পাথর-খানি রাজপথের একাংশ ব্যাপিয়াছিল বলিয়া, একদিন কতিপয় শরীররক্ষক উহা স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করে। পাথরখানি রাজাদেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানেই রক্ষিত হইয়াছে, তথা হইতে উহা স্থানান্তরিত করিতে বলিলে পূর্ব্ব আদেশের অন্যথা হইবে, এই বলিয়া মাহমুদ অনুচরদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

মাহমুদের কোমল হৃদয়ের আর একখানি চিত্র আমরা প্রদান করিতেছি। এ চিত্রেও কোমলতার পার্শ্বে রুদ্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিন রজনীযোগে মাহমুদ সুরাপানে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়তমার আজানুলম্বিত কেশপাশ কাটিয়া ফেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে লূনকেশা প্রিয়তমাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। যে বীর নররক্ত প্রবহমান দেখিয়াও কখনও মর্ম্ম-পীড়িত হয়েন নাই, তিনিই এক জন কামিনীর কান্তি শ্রীহীন করিয়া, ব্যথিতচিত্তে একবার উপবেশন, আবার গাত্রোত্থান, তার পরক্ষণেই পরিভ্রমণ, বারংবার এইরূপ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যেন বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবার সাহস কাহারও ছিল না। এইরূপ অবস্থায় এক জন কবি—

প্রিয়ার কুন্তল করি' অপচয়
কেন আজি তব চঞ্চল হৃদয়?
সাইপ্রাস তরু হ'লে ছিন্নশাখা,
দেখা যায় আর সুষমা মাখা,
এ সুখের দিনে অসুখের মেলা
পরিহরি' লও মদের পেয়ালা। (১)

---

(১) সুললিত পদবিন্যাসই এ কবিতার মূল সৌন্দর্য্য। বঙ্গানুবাদে সে সৌন্দর্য্য রক্ষা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

বলিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হন। কবিবাক্যে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়, এবং তিনি প্রফুল্ল-অন্তঃকরণে কবির মুখ মূল্যবান্ মণি মুক্তায় পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। ইহার পর সুরাস্রোতে মাহমুদের দুঃখরাশি ভাসিয়া যায়, উচ্চহাস্যে রঙ্গালাপে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠে।

মাহমুদের অবসরকাল কখনও কখনও এইরূপ সুরাপানে যাপিত হইত। তিনি কি ভাবে সুরাপান করিতেন, তাহার অনেক বর্ণনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা একদিনের বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

সুন্দর উদ্যানবাটিকা। মাহমুদের চিত্ত প্রীতিপ্রফুল্ল। তিনি এক জন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন কি সুরা পান করা যাইতে পারে?" পারিষদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "এমন দিন, আর আপনি প্রীতিপ্রফুল্ল, সুরা এখন সুপেয়।" তখন মাহমুদ পাত্র মিত্র সহ সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়েন। বুলহাসন ছয় পেয়ালা পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া উঠেন। সপ্তম পেয়ালার সময় তাঁহার বুদ্ধি লোপ পায়। অষ্টম পেয়ালা পান করিয়া তিনি বমন করিতে আরম্ভ করেন। পাঁচ পেয়ালা পান করিবার পর চিকিৎসাব্যবসায়ী বুল আলার মাথা ঢুলিয়া পড়ে। খলিল দাউদ দশ পেয়ালা ও সিয়াবরজ নয় পেয়ালা পান করিয়া শক্তিশূন্য হইয়া পড়েন। ঝুইম বারো পাত্র পান করিয়া গৃহ হইতে দৌড়াইয়া বাহির হয়েন। ইহার পর দাউদ মইমদি ঢলিয়া পড়িতে না পড়িতেই গায়িকা ও বিদূষকের দল বিহ্বল হইয়া উঠে। কেবল মাহমুদ ও খাজে আব্দুল রজক স্ববশে থাকেন। কিন্তু আঠার পেয়ালা নিঃশেষিত করিবার পর খাজেরও মাথা ঘুরিয়া যায়। তিনি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করেন। তখন মাহমুদ একাকীই মদ্যপান করিয়া আমোদ করিতে থাকেন। সাতাইশ পাত্র পানের পরেও তিনি অবিচলিত ছিলেন। অতঃপর মাহমুদ হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া মধ্যাহ্ণ ও অপরাহ্ণকালীন নমাজ পাঠ করেন। তাঁহার এই সময়ের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন তিনি একবিন্দু সুরাও স্পর্শ করেন নাই। নমাজ-পাঠান্তর তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সুরাপান এস্লাম-শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মাহমুদ সুরাপানাসক্ত হইয়া এস্লাম শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এসলাম-শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানের ত্রুটী ছিল না। তিনি সুরাপানকালেও নমাজের সময় যত ঈশ্বরোপাসনা করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। মাহমুদ এস্লামশাস্ত্রানুগত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই খলিফা অল কাদের বিনের নিকট উপাধির প্রার্থী হইয়াছিলেন।

খলিফা অলকাদেরের কোনও ক্ষমতাই ছিল না। তিনি নামসর্ব্বস্ব খলিফা ছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি এস্লামধর্ম্মজগতের প্রধান ছিলেন, এ জন্য লোকে তাঁহার হস্ত হইতে উপাধি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইত। মাহমুদ নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া খলিফা তাঁহাকে "অলকাদের বিনের মিত্র" উপাধি প্রদান করিয়া খেলাৎ প্রেরণ করেন। ঈদৃশ উচ্চ উপাধি ইহার পূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। এই উপাধি লাভ করিয়া মাহমুদ আনন্দোৎফুল্ল হইলেন, এবং নূতন খেলাতে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পয়গম্বরের উত্তরাধিকারীর নিকট বশ্যতা জ্ঞাপন করিলেন। ধর্ম্মজগতের অধিনেতার নিকট হইতে উপাধি লাভ করাতে তাঁহার ধর্ম্মভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; তিনি প্রতিবৎসর হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক শপথ করিলেন। (১) পৌত্তলিক জাতিকে কোরাণোক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত অথবা বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত করা এস্লাম ধর্ম্মানুশাসনের প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি তাদৃশ কর্ত্তব্যপালন করেন, তিনি গৌরবজনক গাজি উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। মাহমুদও ধর্ম্মযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার মনন করিলেন। এইজন্য তিনি ক্রমান্বয়ে সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ভারত-আক্রমণে তাঁহার প্রচুর অর্থলাভও ঘটিয়াছিল। ফলতঃ পুণ্যসঞ্চয়ের সঙ্গে অর্থলাভ সম্মিলিত হইয়াই মাহমুদকে ভারত-আক্রমণ ব্যাপারে তাদৃশ অনুরাগী ও অবহিত করিয়াছিল।

মাহমুদের আক্রমণে থানেশ্বর, কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, মিরাট, মথুরা, কালিঞ্জর, গুজরাট, প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর ও রাজ্য ছারখার হইয়া গিয়াছিল। অসংখ্য নর নারী আজীবন গজনীতে দাসত্ব করিবার জন্য অবরুদ্ধ, শত্রু কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া প্রধান প্রধান নগরগুলি শ্রীভ্রষ্ট, এবং যোজনব্যাপী শস্যক্ষেত্র সৈন্যের পদমর্দ্দনে তৃণশূন্য হইয়াছিল; বহুসংখ্যক দেবালয় ভগ্নস্তূপে পরিণত ও হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়া মুসলমানের ধর্ম্মবিদ্বেষের সাক্ষ্য দিতেছিল। কথিত আছে, মাহমুদের জন্মসময়ে হিন্দুস্থানের একটি দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার হস্তে যেরূপ উৎকট দেবতানিগ্রহ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার জন্মক্ষণে দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়া যে আবশ্যক, ইহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে!

(১) Tarikh Yamini of Utbi.

(১) মাহমুদ সর্ব্বপ্রথমে ৩৯০ হিজিরী অব্দে ভারতবর্ষের প্রান্তসীমায় সসৈন্যে উপস্থিত হয়েন। ঐতিহাসিক উতবি লিখিয়াছেন, ধর্ম্মের গৌরব, সাধুতার প্রচার, সত্যের আলোক ও ন্যায়পরতার শক্তিবর্দ্ধনের জন্যই ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করা হইয়াছিল। এই শত্রুর নাম জয়পাল। জয়পাল শত্রুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিপুলবিক্রমে তাঁহার গতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আত্মীয় স্বজন সহ শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। এই সময় তাঁহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। মুসলমান-সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে অপকর্ম্মীর মত রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কাহারও হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করা হইয়াছিল, কাহারও গণ্ডদেশ আবদ্ধ করা হইয়াছিল; কেহ বা অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। জয়পালের দুর্দ্দশা প্রদর্শন করিয়া হিন্দুসাধারণের নিকট এসলামের গৌরব ও প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যগণ তাঁহাকে লইয়া নগর প্রদক্ষিণ করে। ইহার পর মাহমুদ রাজবন্দিগণকে সঙ্গে লইয়া সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জয়পাল বিপুল ধনরত্ন ও পঞ্চাশৎ সংখ্যক রণহস্তী প্রদান করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত মুক্তিলাভ করিলেন। জয়পাল এ অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় পুত্র অনঙ্গপালকে রাজ্যদানপূর্ব্বক চিতারোহণে জীবনবিসর্জ্জন করিলেন।

(২) ৩৯০ হিজিরী অব্দের অভিযানে মাহমুদের বিপুল ধনরত্ন লাভ হইয়াছিল। পুনর্ব্বার ভারতবর্ষের ধনরত্ন-অপহরণ ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর রক্তপাত করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্যে, ৩৯১ হিজিরী অব্দে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়। উতবি লিখিয়াছেন, সুলতান প্রথম যুদ্ধে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ ও শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এ জন্য সানন্দে দ্বিতীয়বার ধর্ম্মযুদ্ধবহ্নি প্রজ্বলিত করিতে সঙ্কল্প করেন। এবার মাহমুদ বিহান্দে (এই স্থান বর্ত্তমান আটকের পনর মাইল দূরে সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত ছিল) সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া হিন্দুসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়োল্লাসে গজনীতে প্রতিগমন করিলেন।

(৩) দ্বিতীয় অভিযানের পর তিন বৎসরকাল বিশ্রামে অতিবাহিত হয়; এই সময় মাহমুদ পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলাবিধানে মনোযোগী ছিলেন। বিশ্রামান্তে মাহমুদ নবতেজে ৩৯৫ হিজিরী অব্দে ভাটিয়া (ভাটিয়া ঝিলামের তীরে অবস্থিত ছিল) আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন। ভাটিয়ার অতুল

ঐশ্বর্য্যের কথা প্রজাদের মত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের কাহিনীই মাহমুদকে আকর্ষণ করিয়াছিল। ফলতঃ, অতুল ঐশ্বর্য্যই ভাটিয়ার কালস্বরূপ হইয়াছিল। ভাটিয়া তিন দিকে সমুদ্র ও সম্মুখে সুপ্রশস্ত পরিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুর পক্ষে অজেয় ছিল। রাজার সৈন্যবলও অপরিমিত। রাজার নাম বিজয় রায়। তিনি মাহমুদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সৈন্যবল প্রদর্শনপূর্ব্বক ত্রাসযুক্ত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিন অহোরাত্রব্যাপী যুদ্ধের পর চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে হিন্দুসৈন্য শত্রুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিজয় রায় তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া নিজের প্রাণরক্ষার জন্য কতিপয় আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। কিন্তু মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে চারি দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিল। তখন তিনি পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া আত্মহত্যা পূর্ব্বক সমস্ত লাঞ্ছনা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। মুসলমান সৈন্য সর্ব্বত্র হনন ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল। ভাটীয়াবাসীরা সর্ব্বস্বান্ত হইল। এই সময় বহুসংখ্যক গজ অশ্বাদিও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সুলতান নিজের অংশেই বিংশোত্তর এক শত হস্তী লাভ করেন। বহুসংখ্যক নর নারী প্রাণরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া কল্মা পড়িল। মাহমুদ তাহাদের ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহার্থ মোল্লা নিযুক্ত করিয়া দি.লন, এবং তদনন্তর সগৌরবে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

(৪) বহু বিগ্রহের পর মাহমুদ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বিশ্রাম তাঁহার অদৃষ্টে কখনও লিখিত ছিল না। তৃতীয় অভিযানের পর বৎসরই তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সবক্তগীন ও মাহমুদ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেই ঘটনাচক্রে মূলতানরাজ্য শিথ হাসিদ লোদী নামক এক জন মুসলমান সেনাপতির হস্তগত হইয়াছিল। মাহমুদের সময়ে তদীয় পৌত্র আবুল ফতে দাউয়া রাজপদে আসীন ছিলেন। তিনি এস্লাম ধর্ম্মে নূতন মতের প্রবর্ত্তন করিয়া মাহমুদের ক্রোধভাজন হয়েন। এই কারণে ৩৯৬ হিজিরী অব্দে মাহমুদ তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিতে সসৈন্যে রাজধানী হইতে বহির্গত হন। এই সময় বর্ষা নিবন্ধন নদনদীসমূহ স্ফীত হওয়াতে মূলতান-গমনের পথ অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য তিনি অনঙ্গপালের রাজ্য অতিক্রম করিয়া বক্রপথে মূলতানে গমন করিবার মনন করিলেন। কিন্তু অনঙ্গপাল এ প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন; মাহমুদের ক্রোধানল প্রজ্বলিত

হইয়া উঠিল, এবং তাহাতে পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশ ভস্মীভূত হইয়া গেল। গৃহ-দাহ, লুণ্ঠন ও লোকনাশ প্রভৃতি উপদ্রব চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সুল-তান অনঙ্গপালের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিলেন। তরবারি ও খঞ্জর অবিরত লোকনাশ করিয়া লুপ্তধার হইয়া পড়িল। অধিত্যকা বা উপত্যকা, কোন স্থানেই অনঙ্গপাল সুস্থির হইতে পারিলেন না। তিনি নানা স্থানে বাত্যাতাড়িত বৃক্ষ-পত্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন। প্রবল বিক্রম মাহমুদ সর্ব্বত্রই তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তন করিতেছিলেন। তদীয় অনুচরগণ শোণিতলোলুপ বন্য জন্তুর মুখে পতিত হইয়া জীবনবিসর্জ্জন করিল, কতক কাশ্মীর রাজ্যে পলায়ন করিয়া প্রাণ ও মান রক্ষা করিল। পরাক্রান্ত অনঙ্গপালের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আবুল ফতে দাউদ সমস্ত ধনরত্ন সমভিব্যাহারে শরণদ্বীপে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সুল-তান মুলতান অধিকার করিয়া তৎস্থানবাসীদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। তাহারা ২০০০০০০০ দিরহাম জরিমানা দিয়া অব্যাহতি পাইল। অতঃপর মাহমুদ সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই আক্রমণের সময় সুখপাল নামক এক জন হিন্দুসেনাপতি এস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন; ইহাতে মাহমুদ প্রীত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে মূলতান তাঁহাকে রাজ্যের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া যান। উনসরির মতে এই অভিযানকালে দুই শত দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল।

(৫) মাহমুদের ভারতবর্ষপরিত্যাগের পর সুলতান (মুসলমানী নাম নওশা শাহ) স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই জন্য চতুর্থ অভিযানের পর দুই বৎসর মধ্যে তাঁহাকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াছিল। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নওশা শাহ পলায়ন করিলেন। মাহমুদ পুনর্ব্বার তদ্দেশ অধিকার-পূর্ব্বক এক জন মুসলমান সেনাপতির হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(৬) মাহমুদের চতুর্থ অভিযানকালে অনঙ্গপালের রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কতিপয় বৎসর মধ্যে পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিয়া মস্তকোত্তোলন করেন; এ জন্য মাহমুদ তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিবার কল্পনায় ৩৯৯ হিজিরী অব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। অনঙ্গপালও মুসলমানের আক্রমণরোধার্থ উজ্জয়িনী, গোয়া-লিয়র, কান্যকুব্জ, দিল্লী ও আজমীরের ভূপতিগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া বিপুল-বাহিনী সংগ্রহ করিলেন। দেশের ও ধর্ম্মের শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহকল্পে হিন্দুরমণীগণ আপন আপন গাত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া প্রেরণ

করিলেন। ফলতঃ মাহমুদকে বিনষ্ট করিবার জন্য বিপুল আয়োজনের কোনও ত্রুটীই হয় নাই। এই বিপুলবাহিনী দেখিয়া মাহমুদ কিয়ৎ পরিমাণে ত্রাসযুক্ত হইলেন, এবং সবিশেষ বিজ্ঞতাসহকারে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হিন্দু সৈন্যের প্রবল আক্রমণে তাঁহার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় অনঙ্গপালের হস্তী অস্ত্রাঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া পলায়ন করিল। হিন্দুসৈন্য তাঁহার অদর্শনে হতাশ্বাস হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মাহমুদ তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিবার নিমিত্ত কতিপয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা অনুসরণকালে আট হাজার হিন্দুকে তরবারিমুখে অর্পণ করিয়া নিষ্ঠুরাচরণের একশেষ প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর মাহমুদ পঞ্জাবে প্রবেশপূর্ব্বক নগরকোলাইর বিখ্যাত দেবালয় লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সহ গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া বিজয়োৎসবে মগ্ন হইলেন। এই উৎসব উপলক্ষে লুণ্ঠিত রত্নরাশি জনসাধারণকে প্রদর্শন করিবার জন্য স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। মণি মুক্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ আভা, মরকতপুঞ্জের বিস্ফুরিত বিভা ও হীরকখণ্ডসমূহের দাড়িম্ববীজতুল্য শোভা সন্দর্শন করিয়া দর্শকমাত্রেই বিস্মিত হইয়া সহস্রমুখে প্রশংসাবাদ করিয়াছিল। এই বিজয়োৎসব তিন দিন ছিল। সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকগণের জন্য চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ আহারসামগ্রীর বন্দোবস্ত ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মহার্ঘ উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন।

(৭) ধনরত্নলাভের সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদের ধনতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছিল, এবং তাঁহার প্রকৃতিও সাতিশয় কর্ম্মাভিলাষিণী ছিল। এই জন্য ষষ্ঠ অভিযানের এক বৎসর পরেই তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এবার তিনি গুজরাটের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। এই সময় গুজরাট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তবর্গে পূর্ণ ছিল। তাঁহারা সুলতানের প্রবল পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে বশ্যতা স্বীকার করেন। মাহমুদ দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণ ও নরনারীর রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(৮) প্রাগুক্ত আক্রমণের পর মাহমুদ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দেখা গেল, মূলতানের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি আবুল ফতে পুনরায় শক্তিসঞ্চয় করিতেছেন, এ জন্য মাহমুদ তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত ৪০১ হিজিরী অব্দে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই সময় মূলতান প্রদেশে মোসলমান নামে পরিচিত উন্মার্গগামী এক সম্প্রদায়ের বাস ছিল। মাহমুদ এই সম্প্রদায়ভুক্ত

লোকদিগকে বিকালঙ্গ করিয়া বন্দী করিলেন। মাহমুদ আবুল ফতেকে বন্দী করিয়া গজনীতে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর সুলতান রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য গোরখ দুর্গের কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

(৯) ৪০৫ হিজিরী অব্দে অনঙ্গপাল পরলোকে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মাহমুদ পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এইবার তিনি নিন্দুলা দুর্গ অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরজয় পাল এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য পরাক্রমশালী সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বয়ং কাশ্মীরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সুলতানের সুকৌশলে সহজেই দুর্গ অধিকৃত হইল। তিনি দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেন, এবং সারোগা নামক এক জন সেনাপতিকে দুর্গের ভার প্রদান করিয়া পুরজয় পালের আশ্রয়স্থান কাশ্মীরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু পুরজয় পাল তাঁহার সম্মুখীন না হইয়া পলায়ন করিলেন। মাহমুদ কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া বহু সামগ্রী ও দাস দাসী প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর কাশ্মীরে এসলামধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(১০) ৪০৫ হিজিরী অব্দে মাহমুদ হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র থানেশ্বর বিধ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। থানেশ্বর হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মাহমুদের সময় থানেশ্বরের যে দেবমন্দির পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভেই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুর বিশ্বাস ছিল। থানেশ্বর অসংখ্য দেবালয়ে পূর্ণ ছিল। থানেশ্বর হিন্দুর পক্ষে আনন্দকাননস্বরূপ ছিল। মাহমুদ এই আনন্দকাননে নিরানন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়া মুসলমানজগতে ধার্ম্মিককুলের শিরোভূষণরূপে প্রথিত হইবার কল্পনায় বিপুল বাহিনী সহ সমাগত হইলেন। দিল্লীর রাজা প্রতি বৎসর কর দিতে স্বীকৃত হইয়া মাহমুদকে থানেশ্বর রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। মাহমুদ তদুত্তরে বলিলেন, "পয়গম্বরের ধর্ম্মমতবিস্তারের ও পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটনের পরিমাণ-অনুসারে মুসলমানের পরকালে সদ্গতির তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং আমি থানেশ্বর রক্ষা করিব না।" মুসলমানের প্রবল প্লাবন রুদ্ধ করিতে না পারিলে কালক্রমে সমগ্র হিন্দুস্থান নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া দিল্লীর রাজা (থানেশ্বর ইহার রাজ্যভুক্ত ছিল) ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দকে সসৈন্যে সমাগত হইতে আহ্বান করিলেন।

কিন্তু তাঁহাদের সম্মিলনের পূর্ব্বেই মাহমুদ থানেশ্বরে প্রবেশ করিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ ও নগর লুণ্ঠন করিয়া ফেলিলেন। অসংখ্য নরনারী নিহত হইল। উতবি লিখিয়াছেন, রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে থানেশ্বরবাহিনী স্রোতস্বিনী রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, এবং কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত উহার জল পানের অযোগ্য ছিল। মাহমুদ থানেশ্বরের দুই লক্ষ নরনারীকে অবরুদ্ধ করিয়া গজনীতে লইয়া গেলেন। ফলতঃ, এত অধিক হিন্দু নরনারীর সমাগমে গজনী হিন্দুনগরীর ন্যায় আকার ধারণ করিল।

(১১) মাহমুদ হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র থানেশ্বর বিধ্বস্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু লুণ্ঠনলোলুপ কর্ম্মপরায়ণ স্বভাব তাঁহাকে দীর্ঘ দিন সুস্থির রাখিল না। তিনি দশম আক্রমণের পর বৎসরই কাশ্মীর আক্রমণ করিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। কাশ্মীরের প্রবেশদ্বারেই প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত লক্ষত দুর্গ তাঁহার গতিরোধ করিল। মাহমুদ দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু এই সময় তুষারপাত আরম্ভ হওয়াতে প্রবল শীত পড়িল। মুসলমান সৈন্য তাদৃশ প্রবল শীত সহ্য করিতে না পারিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। প্রতিগমনকালে পথভ্রম হওয়াতে তাহারা বহু যোজনব্যাপী জলাশয়ের পার্শ্বে উপনীত হইল। এই জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার সময় বহুসংখ্যক সৈন্য জলমগ্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। মাহমুদ কতিপয় দিবস পরে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া ভগ্নদশায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই আক্রমণে তাঁহার কোনও ফললাভ হয় নাই; পক্ষান্তরে বহু ক্ষতি হইয়াছিল।

(১২) এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সুলতান মাহমুদ ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অচিরে এক লক্ষ অশ্বারোহী ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে মথুরা ও কান্যকুব্জ জয় করিতে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। মাহমুদ সসৈন্যে কান্যকুব্জের প্রান্তদেশে উপনীত হইলে, তত্রত্য শাসনকর্ত্তা তাঁহার বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। এই স্থান হইতে সুলতান বর্ণর দুর্গের নিকট উপনীত হইলেন। দুর্গাধিপতি দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং অন্য স্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। দুর্গবাসীরা তাদৃশ প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে সাহসী না হইয়া বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক আড়াই লক্ষ মুদ্রা ও ত্রিশটা হস্তী উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিল। সুলতান তথা হইতে মহাওয়ান দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তত্রত্য অধিপতি কুলচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও দুর্গরক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী

পার হইবার উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় শত্রুসৈন্য তাঁহাকে চারি দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। কুলচন্দ্র শত্রুহস্তে নিগৃহীত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া স্বহস্তে মহিষীকে বধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। মুসলমান সৈন্য তথা হইতে বিচিত্র সৌধাবলীশোভিত মথুরায় উপনীত হইল। সহস্রাধিক দেবমন্দির এই নগরীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিত। এই সকল দেবমন্দিরের সম্বন্ধে স্বয়ং মাহমুদ লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈদৃশ মন্দিরের নির্ম্মাণকল্পে বহু লক্ষ স্বর্ণ দিনার ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ন্যায় আর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দুই শত বৎসর আবশ্যক।" মুসলমানসৈন্য মথুরার দ্বারদেশে আগমন করিল; কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে উত্থিত হইল না। মাহমুদ সমগ্র নগরী লুণ্ঠন করিয়া দেবমন্দিরসমূহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিলেন। মাহমুদ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জের অভ্যন্তরে প্রবেশার্থ ধাবিত হইলেন। অতঃপর তিনি কান্যকুব্জের গড় অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারণ করিলেন। কান্যকুব্জের গড় সাতটি স্বতন্ত্র দুর্গে গঠিত ছিল। এই সাতটি দুর্গ একদিনেই অধিকৃত হইল। কান্যকুব্জে দশ সহস্র দেবালয় ছিল। হিন্দুগণ দেবদেবীর মূর্ত্তির দুর্দ্দশা দেখিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া অনাথা বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালকের ন্যায় পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিল। যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না, তাহাদের রক্তপাতে পৃথিবী রঞ্জিত হইল। (১) কান্যকুব্জের অধিপতি মাহমুদের সঙ্গে অকীর্ত্তিকর সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া ভবিষ্যৎ আশঙ্কার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অতঃপর মাহমুদ সগৌরবে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এই আক্রমণকালে দুই কোটী দিরহাম, ত্রিপঞ্চাশৎ সহস্র বন্দী ও সার্দ্ধ তিন শত হস্তী সংগৃহীত হইয়াছিল।

---

(১) কোনও কোনও ইতিহাসলেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কান্যকুব্জে যুদ্ধ হয় নাই। কান্যকুব্জাধিপতি প্রথমে সন্ধিসংস্থাপন করিয়া মাহমুদের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। আমরা উতবির অনুসরণ করিয়াছি। উতবি মাহমুদের সমসাময়িক লেখক। এ জন্য তাঁহার বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিবার কারণ কি? আমরা মাহমুদের একাদশ আক্রমণ পর্য্যন্ত যে বিবরণ দিয়া আসিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, মাহমুদ ভারতবর্ষ বারংবার বিধ্বস্ত করিলেও, কোনও রাজাই তাঁহার সঙ্গে সন্ধিসংস্থাপন করেন নাই, কেবলমাত্র দিল্লীর রাজা থানেশ্বর রক্ষা করিবার জন্য বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মাহমুদ কোনও কোনও রাজ্য একাধিকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভাবী দ্বিতীয় আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই কনৌজরাজ সন্ধিসংস্থাপন করেন। কোনও

(১৩) মাহমুদ দ্বাদশ অভিযানের পর তিন বৎসর বিশ্রাম করেন। কালিঞ্জরের নরপতি নন্দ কান্যকুব্জের অধিপতিকে মুসলমানের মিত্র বলিয়া উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। মাহমুদ তাঁহার সহায়তা করিবার ব্যপদেশে ত্রয়োদশবার ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহার আক্রমণের পূর্ব্বেই কান্যকুব্জের অধিপতি শত্রুহস্তে নিহত হয়েন। মাহমুদ নন্দকে শাস্তি দিবার জন্য ধাবিত হইলেন। কিন্তু অসংখ্য শত্রুসৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া গজনীর অভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। অনঙ্গপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল মাহমুদের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু মাহমুদ তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া নিরাপদে গজনীতে ফিরিয়া গেলেন।

(১৪) ত্রয়োদশ অভিযানের পর বৎসরেই মাহমুদ পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হন। এবার তিনি পঞ্জাবের প্রান্তবর্ত্তী বর্ত্তমান বাজৌর প্রভৃতি স্থানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই দেশ নানাফলপূর্ণ ও শীতপ্রধান। মাহমুদ অতি সহজেই সে স্থানের অধিবাসীদিগকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কাশ্মীরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশ্মীরের প্রথম আক্রমণকালে (মাহমুদের ত্রয়োদশ অভিযান) যেরূপ করিতে হইয়াছিল, এবারও তদ্রূপ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমেই কাশ্মীরের প্রবেশদ্বারস্থিত লক্ষত দুর্গ আক্রমণ করিতে হইল। কিন্তু একমাসব্যাপী অবরোধের পরও দুর্গ অধিকৃত হইল না দেখিয়া তিনি স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

(১৫) চতুর্দ্দশ অভিযানের পর বৎসরই মাহমুদ পুনরায় ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন। কালিঞ্জরের অধিপতিকে বিনাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। গোয়ালিয়র দুর্গ সর্ব্বপ্রথমে আক্রান্ত হইল। চারি অহোরাত্রির পর তত্রত্য অধিপতি পঁয়ত্রিশটি রণগজ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া মাহমুদের কৃপাপ্রার্থী হইলেন। সুলতান এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিলেন, এবং তথা হইতে কালিঞ্জর দুর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। কালিঞ্জরের দুর্গ প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত ছিল। মাহমুদ এই দুর্গ অবরোধ করিলে, নন্দ রাজা তিন

রাজাই সন্ধিসংস্থাপন করেন নাই। এরূপ অবস্থায় এক জন রাজাকে সন্ধিসংস্থাপনে নিযুক্ত দেখিয়া, তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই সন্ধি হইয়াছিল বিবেচনা করা অসম্ভব নহে। যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে কনৌজবাসীরা শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করে নাই, অতি সহজেই শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ইহাও ইতিহাসলেখকগণের ভ্রমে পতিত হইবার অন্যতম কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে

শত হস্তী প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন, এবং মাহমুদের স্তুতিসূচক কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন। সুলতান এই সম্মাননায় প্রীতিলাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে পনরটি দুর্গের আধিপত্য ও নানাবিধ উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(১৬) পঞ্চদশ অভিযানের পর চারি বৎসর বিশ্রামে অতিবাহিত হয়। তৎপর মাহমুদ বিপুল বাহিনী সহ সুপ্রথিত সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসার্থ পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করেন। গজনী হইতে সোমনাথ বহুদিনের পথ। পথে সার্দ্ধ তিন শত যোজনব্যাপী জললেশশূন্য বালুকাময় মরুভূমি; তদুপরি সমস্ত পথ অপরিচিত ও শত্রুপরিপূর্ণ। কিন্তু কোনও বাধাই মাহমুদকে নিরুদ্যম করিতে পারিল না। তিনি প্রবল উৎসাহে ও বিপুল উদ্যমে এই দুরূহ পথ অতিক্রম করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তিনি সসৈন্যে গজনী পরিত্যাগ করিয়া মূলতানে আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিংশতি সহস্র ভারবাহী উষ্ট্র ছিল। আজমীরের নিকট উপস্থিত হইলে, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র অদৃশ্য হইল। মুসলমান সৈন্য মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তিনি মহাপরিশ্রমে আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে উপনীত হইলেন। তাঁহার অতর্কিত আগমনে গুজরাটরাজ ভীত হইয়া সমতলভূমি পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সমস্ত গুজরাট তাঁহার হস্তগত হইল। কিন্তু এই বিজয়লাভে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল না। তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সোমনাথের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে বহুবিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া হিন্দুর মহাতীর্থক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। "ভারতের ইতিহাসে সোমনাথ চিরপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট সোমনাথ চিরপবিত্র। সোমনাথের মন্দির অতি রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত। গুজরাটের পশ্চিমপ্রান্তে সমুন্নত পর্ব্বতের উপরিভাগে ঐ মন্দির নির্ম্মিত ছিল। সম্মুখে বিশাল অনন্ত সমুদ্র সর্ব্বদা বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভৈরবরবে পর্ব্বতের পাদদেশ বিধৌত করিতেছে, যত দূর দৃষ্টিপাত করা যায়, তত দূরই নীলবারিরাশিফেনিল বারিধি ক্রমে গাঢ়নীল হইয়া অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পর্ব্বত মনোহর বৃক্ষ লতায় পরিশোভিত। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নীচে অনন্ত নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে পাদপপরিবৃত সুনীল পর্ব্বতে দেবাদিদেব সোমনাথের পবিত্র মন্দির। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির এইরূপ গম্ভীর ভাবের মধ্যে শান্তিময় পরম

দেব আপনার উপাসকদিগের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তিরস বিকাশ করিতেন। (১) * * * (সোমনাথআক্রান্ত হইলে) হিন্দুগণ আপনাদের পবিত্র দেবতার গৌরবরক্ষার জন্য অকাতরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"তাঁহারা পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদের পরাক্রমে নিরস্ত থাকে। শেষে চতুর সুলতান মাহমুদ আপনার সৈন্যদল ফিরাইয়া, পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইয়া শিবিরস্থাপন করেন। হিন্দুরা দেখিলেন, দুরন্ত মুসলমান আপনার সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহাদের পবিত্র মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষত রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে আমোদ করিতে লাগিলেন। সুলতান মাহমুদ এই সুযোগে রাত্রিশেষে জাফর ও মজফ্ফর নামক দুই ভ্রাতার অধীনে এক দল সাহসী সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিবার জন্য পাঠাইলেন। মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয় অলক্ষিত-ভাবে দ্বারদেশে আসিয়া পঁহুছিল। বৃহদাকার হস্তীর পরাক্রমে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ইহার মধ্যে সুলতান মাহমুদও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিপুলবিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। অসময়ে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইলেও

---

(১) সোমনাথ মন্দিরের বিপুলতা প্রদর্শন করিবার জন্য নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল।—

"It is related in many authentic historical works that the revenue of ten thousand popnlated villages was set apart as an endowment for the expenses of the temple of Somnat, and more than one thousand Brahmans were always engaged in the worship of that idol. There hung in the temple a golden chain which weighed two hundred Indian Mans. To this were attached numerous bells, and several persons were appointed whose duty it was to shake it at stated times during day and night and summon the Brahmans to worship. Amongst the other attendants of this temple there were three hundred barbers appointed to shave the heads of the pilgrims. There were also three hundred musicians and five hundred dancing girls attached to it and it was customary even for the kings and Rajas of India to send their daughters for the service of the temple. A salary was fixed for every one of the attendants, it was duly and punctually paid. On the occurence of an eclipse multitudes of Hindus came to visit this temple from all parts of Hindustan. We are told by many historians that at every occurence of this phenomenon there assembled more than two hundred thousand persons bringing offerings.—*Tarikhi Alfi.*

রাজপুত বীরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শোণিত-তরঙ্গিণী অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ আরাধ্য দেবতার জন্য অকাতরে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সাত শত বীরপুরুষ অসি হস্তে লইয়া মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই শেষ উদ্যমও সফল হইল না। ভয়াবহ শোণিতপ্রবাহমধ্যে আর্য্যবীর-পুরুষগণের দেহরত্নের সহিত চিরপবিত্র আর্য্যকীর্ত্তির চিহ্ন বিনষ্ট হইয়া গেল।" (১) অতঃপর মুসলমান সৈন্য মন্দির ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিল। সোমনাথের মূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ ও তাহার কিয়দংশ গজনীতে প্রেরিত হইল। (২)

মাহমুদ সোমনাথের চতুর্দ্দিকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় কিছুকাল বাস করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের শাসন জন্য তাঁহাকে অচিরে সোমনাথ পরিত্যাগ করিতে হইল। মাহমুদ সোমনাথের ধ্বংসব্যাপার সম্পন্ন করিয়া সিন্ধু-দেশের পথে স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই মুসলমান সৈন্য মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিল। এই সময় সৈন্যমধ্যে প্রবল জলকষ্ট উপস্থিত হইল। কোনও দিকেই জলের সন্ধান মিলিল না। পথদর্শককে জলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "আমি সোমনাথের আত্মত্যাগী উপাসক। তাঁহার দুর্দ্দশার প্রতিশোধ লইবার জন্য আপনাকে সসৈন্যে জলশূন্য মরুভূমির মধ্যে আনিয়াছি। এখানে জল-

---

(১) ৺রজনীকান্ত গুপ্ত।

(২) কথিত আছে, ব্রাহ্মণগণ সোমনাথ বিগ্রহ রক্ষা করিবার জন্য কয়েক কোটী স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া মাহমুদ বলেন, "শেষ বিচারের দিন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবমূর্ত্তির বিনাশকারী মাহমুদ বলিয়া আমাকে আহ্বান করা হইবে, আমি ইহাই ইচ্ছা করি। 'অর্থলোভে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবমূর্ত্তির বিক্রেতা মাহমুদ কোথায়?' বলিয়া আমাকে আহ্বান করিবে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না।" এই কথা বলিয়া মাহমুদ সোমনাথ-মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তখন ভগ্ন বিগ্রহের উদর হইতে রাশি রাশি ধনরত্ন বাহির হইয়া পড়ে। সোমনাথ-বিজয়ের পঞ্চশতাধিক বৎসর পরে লিখিত ফেরিস্তার ইতিহাস ও তারিখ-ই-আলফি নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে। সোমনাথ-বিজয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিবার সময় ফেরিস্তার 'রোজতস সকল নাকম' ইতিহাসই অবলম্বন ছিল। কিন্তু তাহাতে এরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইবুন আসির ইঁহাদের অপেক্ষা প্রাচীন লেখক। তাঁহার গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ নাই। আলবেরুণীও এরূপ কোনও ঘটনার বিষয় উল্লেখ করেন নাই। এই সকল কারণে ফেরিস্তার উক্তি ভিত্তিশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

তৃষ্ণায় সকলকে মরিতে হইবে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুলতান তাঁহাকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়া সৈন্যদিগকে শিবিরসংস্থাপন করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া এক দল জলচর পক্ষীকে উড়িয়া যাইতে দেখা গেল। সুলতানের আদেশে মুসলমান সৈন্য পক্ষী দলের অনুসরণ করিতে করিতে জলাশয় প্রাপ্ত হইল। তাহারা দৈবানুকম্পায় আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু জাঠগণ মাহমুদকে বিব্রত করিয়া তুলিল। মাহমুদ অবশেষে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন, এবং হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিগ্রহ চূর্ণ করিবার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই দীর্ঘকাল পরে (১) বিজয়োল্লাসে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

(১৭) সোমনাথ বিনষ্ট হইবার পর বৎসরই সুলতান মাহমুদ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। পূর্ব্ব-অপরাধের জন্য জাঠদিগকে বিধ্বস্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এবার জলযুদ্ধের ব্যবস্থা হইল। তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ভীষণ যুদ্ধের পর জাঠগণ পরাজিত হইল। অধিকাংশ জাঠ যুদ্ধকালে জল-নিমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল; যাহারা অবশিষ্ট ছিল, মাহমুদ তাহাদিগকে তরবারিমুখে অর্পণ করিলেন। তাহার পর তিনি জাঠগণের স্ত্রীপুত্রপরিজন-দিগকে অবরুদ্ধাবস্থায় সঙ্গে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রাগুক্ত অভিযানই মাহমুদের শেষ ভারতাভিযান। ইহার পর আর তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই। মাহমুদ ক্রমাগত সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার আক্রমণে দেশে হাহাকারধ্বনি উঠিত; তাঁহার সৈন্যের পদস্পর্শে শস্যশ্যামলা ভারতভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইত। লুণ্ঠন ও কাফেরের রক্তপাতে পুণ্যসঞ্চয়ই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেই তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে যমুনা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ সুলতান-সেনার পদস্পর্শে বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

---

(১) ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন লিখিয়াছেন, ষোড়শ আক্রমণ উপলক্ষে মামুদকে ভারতবর্ষে দেড় বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ফেরিস্তার মতে, আড়াই বৎসর লাগিয়াছিল। প্রাইস্ এক স্থানে লিখিয়াছেন, মাহমুদ আড়াই বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি অন্য এক স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনবৎসরাধিক কাল পরে সুলতান গজনীতে প্রত্যাগমন করেন।

মাহমুদ ভারতবর্ষ হইতে শেষবার ফিরিয়া যাইবার সময় পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি দুই বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন; কিন্তু এই দুই বৎসরও সন্ধিবিগ্রহেই যাপিত হইয়াছিল।

এই সময় গেলজুকগণ পারস্য দেশের অন্তর্গত বিদউরদ্ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। সুলতান এই সংবাদ অবগত হইয়া আমীর তুস নামক সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর আমীর তুস শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া সুলতানকে আহ্বান করিলেন। সুলতান অবিলম্বে সসৈন্যে আমীর তুসের সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন। মাহমুদ বিদউরদে উপনীত হইয়া শত্রুর বিষদন্ত উৎপাটন করিলেন। সমস্ত প্রদেশ শত্রুহীন ও শান্তিপূর্ণ হইল। সুলতান বিদউরদ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই স্বীয় সেনাপতি কর্তৃক ইরাক্ বিজিত হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। মাহমুদ সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ইরাকের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তৎকালে এক জন বিধবা অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমারের প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে-ছিলেন। তিনি মাহমুদের দুরভসন্ধির সংবাদ অবগত হইয়া বলিয়া পাঠান যে, যতদিন তাঁহার বীর্য্যশালী স্বামী জীবিত ছিলেন, ততদিন মাহমুদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল; কিন্তু আমার ন্যায় অনাথা কখনও মাহমুদের ন্যায় হৃদয়বান্ নরপতি কর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইবে না। এই কৌশলপূর্ণ বাক্যে মাহমুদ নিরস্ত হন। কিন্তু কালক্রমে এই রাজমহিষীর পুত্র রাজত্বলাভ করেন, এবং রাজ্যলালসা মাহমুদের হৃদয় অধিকার করে। তিনি ইরাক-অধিকারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল তাঁহার বহুদিনের আশা ফলবতী করে। মাহমুদ ইরাক-জয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় গমনপূর্ব্বক শত্রুর সঞ্চিত ধনরাশি কাড়িয়া লইলেন। এই স্থানের মুসলমানগণ ভ্রান্তপথাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিল। মাহমুদ তাহাদের মধ্যে এসলাম ধর্ম্মের সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গজনীতে ফিরিয়া আসিলেন।

গজনীতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অল্প পরেই মাহমুদ পাথুরী রোগে আক্রান্ত হন। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই পীড়িতাবস্থাতেই কোনও গুরুতর রাজ-কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে বাপিকে গমন করিতে হইল। ৪১৯ হিজিরী অব্দের বসন্তকালের প্রারম্ভে মাহমুদ বাপিকের কার্য্য শেষ করিয়া গজনীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দারুণ পীড়া ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করিল, এবং ৪১৯ হিজিরী অব্দের রিবি মাসের ১৯শে তারিখে ভারতবর্ষের কালান্তকযমস্বরূপ বীর-পুরুষ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

মাহমুদ সৌভাগ্যবান্ বীরপুরুষ ছিলেন। বিজয়শ্রী সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইতেন। মুসলমান-সমাজে তিনি ধার্ম্মিককুলতিলক বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে স্বদেশে অতুল যশ ও বিদেশে বিপুল প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি ও সুখ ছিল না। একদিন রাত্রিকালে মাহমুদ মদ্যপান করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে রাজকুমারদ্বয় দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই সময় পর-লোকগত সবক্তগীনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। পিতার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র সুলতান তাঁহার আত্মার কল্যাণকামনায় প্রার্থনা করিয়া বাষ্পাকুললোচনে বলেন, "স্বর্গগত সুলতান রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা প্রণয়ণপূর্ব্বক তৎসমুদয় কার্য্যে পরি-ণত করিবার জন্য ঐকান্তিক যত্ন করিয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার অভাবের পর নিরাপদে সুখশান্তিতে স্বীয় ক্ষমতা পরিচালন করিয়া আমোদ প্রমোদে আহার বিহারে কালযাপন করিতে পারিব; আমার প্রবল প্রতাপ চারি দিকে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সুলতানের অভাবের পর যখন তাঁহার প্রভাব অন্তর্হিত হয়, তখনই আমার নিকট প্রকৃত অবস্থা প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি লোকান্তরিত হইবার পর আমি একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারি নাই। তোমরা মনে কর, আমি আমোদের জন্য সুরাপান করি, তাহা নহে; আমি শান্তি-লাভোদ্দেশ্যই সুরার শরণাপন্ন হইয়া থাকি।"

সুশাসিত রাজ্য, পরিপূর্ণ রাজকোষ, প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রদ্ধাভক্তি, অমিত বাহুবল, বিক্রমশালী সৈন্য, মাহমুদের কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি নিরতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়াও মুসলমানসমাজে সম্মানিত ছিলেন। ধর্ম্ম শান্তিপ্রদ। তথাপি কেন তাঁহার ভাগ্যে শান্তি ও সুখ ঘটে নাই? অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতেই তাঁহার পক্ষে শান্তি ও সুখ বিরল হইয়াছিল। রণক্ষেত্রে জয়লাভের পরেই তাঁহার আদেশে সৈন্যগণ নরনারীর রক্তস্রোত প্রবাহিত ও অবিশ্বাসিগণের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিত। (১) পরস্বাপহারীর নিকট হইতে শান্তি সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করে। ধনতৃষ্ণাই মাহমুদের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। মাহমুদ অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই মাহমুদের সময় রণক্ষেত্রে বা মন্ত্রণাকক্ষে

(১) দেশলুণ্ঠনই যে মাহমুদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে কখনও লুণ্ঠনের পথ হইতে একতিলও বিচলিত হন নাই। থানেশ্বর ও সোমনাথ আক্রমণকালে অর্থের প্রলোভন তাঁহাকে দেবতার ধ্বংস হইতে বিরত করিতে পারে নাই, ইহা সত্য, কিন্তু দেবতার ধ্বংসই এসলাম ধর্ম্মের প্রচার নহে। অর্থগ্রহণ করিয়া দেবমন্দির-সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিলে, তাঁহাকে মুসলমানসমাজে অপবাদগ্রস্ত হইতে হইত; ইহাও তাঁহার

অতিবাহিত হইয়াছে; তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রাম অল্পই ঘটিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইলেই সুলতান স্বীয় স্বভাবসুলভ উৎসাহ ও অধ্যবসায়-সহকারে বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি গজনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নানা ভাষায় রচিত বহুসংখ্যক-গ্রন্থ-সংবলিত পাঠাগার ও প্রকৃতির বিস্ময়োৎপাদক বস্তুপূর্ণ যাদুঘর এই বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত ছিল। তাঁহার রাজধানী প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাদৃশ বিদ্বজ্জন-সমাগম এসিয়াখণ্ডের আর কোনও রাজসভায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মাহমুদ শাস্ত্রজ্ঞগণের বৃত্তিপ্রদানের জন্য বর্ষে বর্ষে দশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিতেন। তাঁহার আশ্রয়ে বহু কবি প্রতিভা-দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ফলতঃ, সুলতান বিদ্বজ্জনের পরিপোষণের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। কিন্তু প্রবল ধনতৃষ্ণা কখনও কখনও তাঁহার হস্ত সঙ্কুচিত করিত। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ফির্দ্দৌসীর সহিত তাঁহার ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। সুলতান মাহমুদ পারস্যের প্রাচীন রাজন্যবর্গের ইতিহাস সুললিত পদ্যে গ্রথিত করাইবার অভিলাষী ছিলেন। তাঁহার এই সাধুসঙ্কল্প সর্ব্বত্র সুবিদিত ছিল। কবি ফির্দ্দৌসী মাহমুদের মনোমত কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ফির্দ্দৌসী তুসের শাসনকর্ত্তার উদ্যানপালকের পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্মপরিগ্রহের অব্যবহিত পরে তদীয় পিতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, নবজাত শিশু বিদ্বজ্জনের শিরোভূষণ হইবেন! তাঁহার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছিল। ফির্দ্দৌসীর সমসাময়িক কোনও কবিই পারস্যের রাজবংশের ইতিবৃত্ত পদ্যে গ্রথিত করিতে সাহসী হন নাই। তরুণবয়স্ক ফির্দ্দৌসী এই

অর্থপ্রত্যাখ্যানের কারণ হইতে পারে। যদি মাহমুদ ভারতবর্ষের কোনও এক প্রদেশে স্থায়ী অধিকার সংস্থাপিত করিতেন, তবে তাহা এসলাম ধর্ম্মের প্রচারপক্ষে তাঁহার সমস্ত আক্রমণ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইত। ধর্ম্মের নামেই মাহমুদ পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেশ ছারখার করেন। এই জন্য এসলামধর্ম্মের কঠোর মূর্ত্তিই হিন্দুর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। কঠোর ধর্ম্ম কখনও মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারে না। ফলতঃ, মাহমুদের ভারতাক্রমণ এসলামধর্ম্মের প্রচারপক্ষে অন্তরায়স্বরূপই ছিল। পঞ্জাবের কিয়দংশে তাঁহার স্থায়ী অধিকার সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রদেশেও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ভারতবর্ষে একমাত্র কান্যকুব্জের রাজার সঙ্গেই তাঁহার সখ্য ছিল; কিন্তু তিনিও হিন্দু ছিলেন। গুজরাটের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিনি এক জন হিন্দু সাধুকে নিযুক্ত করেন। অন্ততঃ এ ব্যাপারে যে এসলামধর্ম্মের প্রচার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তাঁহার পিতার উদ্যানবাহিনী স্রোতস্বিনীর কূলে বসিয়া একাগ্রচিত্তে শাহনামা রচনা করিতেন। কখনও কখনও স্রোতস্বিনী স্ফীতকলেবরা হইয়া তীরদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিত। ইহাতে ফির্দ্দৌসীর কাব্যের গতি প্রতিহত হইয়া পড়িত। এই জন্য তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, শাহনামার্ রচনা করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জিত হইবে, তাঁহা দ্বারা স্রোতস্বিনীর তীর বাঁধাইয়া দিবেন। এই অর্থ দ্বারা স্বগ্রামে একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করিবার কল্পনাও তাঁহার ছিল। ফির্দ্দৌসী সময়ে সময়ে কাব্যের অংশবিশেষ সুলতানের নিকট পাঠ করিতেন, এবং সুলতান তদীয় রচনার লালিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করিয়া সুখী হইতেন। কিন্তু এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত হইলে মাহমুদ কবিকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন, তাহা আশানুরূপ হয় নাই। কথা ছিল, প্রত্যেক শ্লোকের জন্য সুলতান তাঁহাকে একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিবেন। ফির্দ্দৌসী অর্থলাভাশায় কাব্যের গতি সংযত করেন নাই। ষষ্টি সহস্র শ্লোকে পারস্যের ইতিহাস পরিসমাপ্ত হয়। কবিকে প্রতিশ্রুত পুরস্কারপ্রদানের জন্য ষষ্টি সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পুঞ্জীকৃত হইলে সুলতানের কার্পণ্য ভাব উপস্থিত হয়, এবং তিনি স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে রৌপ্যমুদ্রা দিতে আদেশ করেন। ফির্দ্দৌসী রাজপ্রসাদ অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশে গমনপূর্ব্বক সুলতানের গ্লানিসূচক কবিতার প্রচার করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছিলেন। (১) বস্তুতঃ, মাহমুদের অর্থতৃষ্ণা এত দূর প্রবল ছিল যে, তিনি অর্থলাভের জন্য লোকের মিথ্যা দুর্নাম করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

তাঁহার সময়ে নিশাপুরে এক জন ধনীর বাস ছিল। এই ব্যক্তি বিপুল ধনের অধিকারী ছিলেন। সুলতান তাঁহার বিপুল ধনের সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি রাজসভায় উপনীত হইলে, সুলতান তাঁহাকে বিধর্ম্মী ও পৌত্তলিক বলিয়া ভৎসনা করেন। ইহাতে ধনী উত্তর

---

(১) এই গ্লানিসূচক কবিতা প্রচারিত হইলে, মাহমুদ আত্মদৌর্ব্বল্যের জন্য লজ্জিত হন। কবি সুলতানের বিরুদ্ধে মর্ম্মান্তিক অপবাদের প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন, এই জন্য তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহার নিকট আশাতীত ধনরত্ন প্রেরণ করেন। সুলতানের দানে কোনও ফল দর্শে নাই। এক দ্বার দিয়া ধনরত্নবাহকগণ ফির্দ্দৌসীর গৃহে প্রবেশ করে, অপর দ্বার দিয়া শববাহকগণ তাঁহার মৃতদেহ লইয়া বহির্গত হয়। তদীয় কন্যা প্রথমতঃ রাজদত্ত ধনরাশি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু সুলতানের আগ্রহাতিশয্যে পরে উহা গ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় কবির অভিপ্রায়মত স্রোতস্বিনীর তীরে বাঁধ বাঁধাইয়া দেন।

করেন, "আমি বিধর্ম্মী অথবা পৌত্তলিক নহি। তবে এ কথা যথার্থ যে, আমি বিপুল ধনের অধিকারী। জাঁহাপনার অভিরুচি হইলে, তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু আমার ধন ও সুনাম উভয়ই যুগপৎ নষ্ট করিয়া অবিচারের মাত্রা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিবেন না।" অতঃপর সুলতান তাঁহাকে ধৃষ্টতাসূচক বাক্যের জন্য শাস্তিপ্রদান করিয়া তাঁহার ধনরাশি বাজেয়াপ্ত করেন। মাহমুদের মৃত্যুকালেও তাঁহার প্রবল অর্থলিপ্সার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তিনি রাজভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরত্ন স্বীয় শয্যাপার্শ্বে সজ্জীকৃত করিবার জন্য আদেশ করেন। সজ্জীকৃত ধনরাশি অবলোকন করিয়া তাঁহার নেত্রযুগল বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। শরীরের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় করিয়া যে অগণ্য ধনরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অচিরে পরলোকগামী হইতে হইবে, এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। সুলতান সজ্জীকৃত ধনরত্নের এক কপর্দ্দকও সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ না করিয়া সমস্তই পুনর্ব্বার রাজকোষে প্রেরণ করিবার আদেশ দান করেন। তাহার পরদিন সৈন্য ও অশ্বগজাদি রোগক্লিষ্ট সুলতানের সম্মুখে প্রদর্শিত হয়। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই, এবং শোকাকুলচিত্তে প্রাসাদে গমন করেন।(১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার বোধ হয় বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। পুরাণখানি তাদৃশ প্রাচীন নয়। পশ্চাল্লিখিত হেতুতে ইহা অনুমান করিতে পারা যায়।

(ক) পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কথা আছে। পঞ্চগোত্রের নাম যথা,—বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণি, ভারদ্বাজ ও কাশ্যপ। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(1) It was probably this anecdote that suggested to Sadi a story which he relates in the Gulistan, A certain person, he says, saw Sultan Mahmud (then long dead) in a dream. His body was reduced to bare skeleton, but his eyes (the organ of covetousness with the Asiatics) were still entire, and gazed eagerly from their sockets, as if they were insatiable and indestructible like the passion which animated them.

(খ) গোপ, নাপিত, মোদক, তাম্বুলী, স্বর্ণকারকে সৎশূদ্রের মধ্যে ধরা হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

(গ) বিশ্বকর্ম্মা হইতে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধার, চিত্রকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। পুরাণকার সূত্রধার, চিত্রকার ও স্বর্ণকারকে অযাজ্য বলিয়াছেন। স্বর্ণকার বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে জলাচরণীয় ও অনাচরণীয়।

(ঘ) পুরাণকার নিম্নলিখিত কয়েকটি জাতির নাম করিয়াছেন ; যথা,— কোটক, তৈলকার, তীবর, লেট, মল্ল, মণ্ড, মাতর, ভড়, কোড়, কলন্দ, চণ্ডাল, চর্ম্মকার, মাংসচ্ছেদ, কোচ, কৈবর্ত্ত, কর্ত্তার (কাওরা), ডোম, হড্ডি, গঙ্গাপুত্র, জুঙ্গি, শুণ্ডী, শৌণ্ডিক, আভীর, ধীবর, রজক, কোয়ালা, সর্ব্বস্বী, ব্যাধ, কুদর, বাগতীত (বাগ দী), জোলা, শরাক, বৈদ্য, করণ, ব্যালগ্রাহী (সাপুড়ে), রাজপুত, সূত, গণক, অগ্রদানী।

কোচ ও বৈদ্য বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যদেশে দৃষ্ট হয় না। লিখিত আছে, স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের ঔরসে এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদ্যজাতির আদিপুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। রাজপুতদিগকে ক্ষত্রিয় হইতে ভিন্ন জাতি বলা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার হইতে গণক ও অগ্রদানীর উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জুঙ্গী জাতি, যোগিজাতির প্রাচীন নাম। প্রাচীন জুঙ্গী বা জুগি, এখন যোগী হইয়াছে।

(ঙ) ব্রহ্মবৈবর্ত্তে একটি আবাহনমন্ত্র আছে। তাহাতে পদ্মাবতী ও স্বর্ণরেখার নাম দৃষ্ট হয়। স্বর্ণরেখার নামান্তর সুবর্ণরেখা। পদ্মাবতী ও সুবর্ণরেখা বঙ্গদেশের নদী।

(চ) দোলোৎসবের নাম আছে। দোল শব্দটি বঙ্গদেশেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(ছ) চৈত্রমাসে শিবব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বেত্রপাণি হইয়া নৃত্য করিলে পুণ্য হয়। বঙ্গদেশের চড়কপূজা শিবব্রত। উহাতে ভক্তদিগের নৃত্য করিবার প্রথা আছে।

(জ) আষাঢ়মাসের সংক্রান্তিতে মনসা দেবীর পূজার কথা আছে। বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের কোনও না কোনও সংক্রান্তিতে মনসার পূজা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে বিষহরীর এত সম্মান নাই।

(ঝ) কৈলাস পর্ব্বতে পার্ব্বতীর ব্রতোৎসবে লক্ষ্মী স্বয়ং পায়স, পিষ্টক, উত্তম শালি ধান্যের অন্ন ও ঘৃতসংযুক্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের গৃহলক্ষ্মীদিগের ব্রতোৎসবে প্রতিবেশিনী কোনও অন্নপূর্ণা এইরূপেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

(ঞ) নারায়ণ দেবর্ষিগণ সহ ভোজন করিলেন। সভায় গিয়া বিদ্যাধরীর নাচ দেখিলেন। ঠিক যেন, বাঙ্গালা দেশের কোন জমীদার নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক-গণের সঙ্গে আহার করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাইনাচ দেখিতে বসিলেন।

(ট) পার্ব্বতী গণেশকে খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, শ্রীফল, করঞ্জ, আম্র, পনস, জাম, নারিকেল ও কদলী খাইতে দিলেন। এই ফলগুলি যে অন্য দেশে না জন্মে, এমন নয়; তবে বঙ্গের বড় গৃহস্থের বাগানে এগুলি সচরাচর জন্মে। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মী এগুলির একটি বা অন্যটি দিয়া দুরন্ত ছেলে মেয়েকে সান্ত্বনা করিয়া থাকেন।

(ঠ) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সঙ্গে যখন জামদগ্ন্যের যুদ্ধ হয়, তখন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, সৌহ্ম ও বঙ্গীয় রাজগণ কার্ত্তবীর্য্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ের প্রাচীন নাম সুহ্ম। কোনও প্রাচীন গ্রন্থে রাঢ় ও বরেন্দ্রের নাম পাওয়া যায় না। পুরাণকার বঙ্গদেশবাসী ছিলেন, ইহাতে অনুমান করা যায়।

(ড) স্ত্রীজাতির রূপ-বর্ণনা ভারতচন্দ্রাদির কৃত রূপবর্ণনার অনুরূপ। এ রকম বেশভূষা বঙ্গমহিলারাই ধারণ করিতেন।

(ঢ) এক তারকান্বিত গগন দর্শন করিলে চক্ষু কর্ণের পীড়া হয়। বাঙ্গালা দেশে এক-তারকা-দর্শনে দোষ ভাবে।

(ণ) স্ত্রীলোকে কুষ্মাণ্ড ছেদন করিলে সপ্ত জন্ম রোগ ভোগ করে। বাঙ্গালা দেশের স্ত্রীলোকেরা কুষ্মাণ্ড ছেদন করেন না।

(ত) গৃহের কোন স্থানে লতা বৃক্ষ থাকা শুভজনক। বাঙ্গালা দেশের অনেক গৃহস্থের চালের উপর লাউ কুমড়ার গাছ ঝুলিয়া থাকে।

(থ) রুক্মী, রুক্মিণীর জন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে যে যে দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বলিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে, অঙ্গ, বঙ্গ, সুবঙ্গ, মুদ্গল, ভল্লুক, রাঢ়, বারেন্দ্রদেশের নাম আছে। মুঙ্গেরের প্রাচীন নাম মুদ্গল। মালদহ জেলার উত্তর পশ্চিম ও পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া ভল্লুক রাজ্য ছিল। সুবঙ্গ, উপবঙ্গ, অধিবঙ্গ প্রাচীন বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাগকে বুঝাইত।

(দ) এই পুরাণের অনেক স্থানে নাগর ও নাগরী শব্দের উল্লেখ আছে। বঙ্গভাষার প্রাচীন কাব্যগুলিতে এই দুই শব্দ অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ধ) কোন্ শাস্ত্র ঈশ্বরকে কিরূপ বলেন, তাহার উল্লেখস্থলে লিখিত হইয়াছে, ন্যায় ও শঙ্কর ঈশ্বরকে অনির্ব্বচনীয় বলেন। এখানে শঙ্কর শব্দে শঙ্করাচার্য্যকে বুঝাইবে ; কারণ, তিনি এক জন প্রগাঢ় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শঙ্করাচার্য্যের পরে এই পুরাণখানি রচিত হইয়াছে।

(ন) গ্রীষ্মকে আদি করিয়া ছয় ঋতুর গণনা করা হইয়াছে। এইরূপ গণনাক্রম আধুনিক।

(প) শিবালয়, দুর্গালয় ও বিষ্ণুমন্দিরের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। যে সময়ে যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক হূণেরা ভারত হইতে তাড়িত হয়, তাহার পরবর্ত্তী পাঁচ শত বৎসর কাল ভারতভূমি নিরুপদ্রব ছিল। কোনও বৈদেশিক জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। এই সময়ে ভারতে বড় বড় দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এই সময়ের শেষভাগে রচিত হইয়াছে।

(ফ) কোণার্দ্ধে (কোণার্কে) ও জগন্নাথক্ষেত্রে সূর্য্য ও জগন্নাথমূর্ত্তি দর্শনের ব্যবস্থা আছে। এই দুইটিই অপ্রাচীন তীর্থ।

(ব) এই পুরাণ-রচনার সময় ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রকে শূদ্র বলিতেছিলেন। যাহাদের জল গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকে সৎশূদ্র বলিতেন। জলাচরণীয় শূদ্রজাতিমাত্রই যে আর্য্যবংশজাত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। নাগর নামক অনার্য্য জাতি, অল্প দিন হইল, জলাচরণীয় হইয়াছে। যখন ব্রাহ্মণ জাতির প্রভুত্ব চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতি-মাত্রকে শূদ্র বলিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই বলিলেও হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংখ্যা অধিক হইলে ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ বলিতে সাহসী হইতেন না। হিন্দুরাজত্বকালেও ঐরূপ বলিতে পারিতেন না। ইহাতে বোধ হয়, এই পুরাণের রচনাকালে হিন্দুরাজত্বের অবসান হইয়াছিল।

(ভ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-কার রাধাকবচ প্রভৃতিকে বেদের মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব-শাখোক্ত বলিয়াছেন। হিন্দু রাজত্বকালে দ্বিজাতির বেদজ্ঞানের এতাদৃশী অধো-গতি হয় নাই।

(ম) এই পুরাণের নানা স্থানে চিঁড়া ও মূড়ীর নাম আছে। ইহা প্রচুর-পরিমাণে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এই সকল খাদ্যের প্রচুর ব্যবহারের উল্লেখ নাই। প্রাচীন কালে ভারতভূমি যখন সমৃদ্ধিমতী ছিল, তখন সাধারণ লোকেও "নুণ মিরচাই" দিয়া "ভুজা" খাইত না। তবে কোনও

কোনও গ্রন্থে শক্তুর উল্লেখ না আছে, এমন নয়। কিন্তু নিতান্ত গরীবেই তাহা খাইত। ইহাতে বোধ হয় এই পুরাণ প্রাচীন কালের গ্রন্থ নয়।

(য) গলদেশে শালগ্রামশিলা বাঁধিয়া কোনও কোনও যোগী ভ্রমণ করিতেন। এই ব্যবহার আধুনিক।

(র) শিবের স্বরূপ দেখিয়া কামিনীগণ স্ব স্ব পতির নিন্দা করিয়াছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র আপনাদের গ্রন্থে এই বিষয়ের অধিকার-লাভ করিয়াছেন।

(ল) মহাদেব মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরাসুর-বধ-সময়ে মহাদেব শূন্য হইতে পড়িয়া বড় আছাড় খান। মহাদেব বিষ্ণুর পরামর্শে দুর্গার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবী দুর্গা, মঙ্গলচণ্ডীরূপে আবির্ভূতা হন। যখন মহাদেব মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়াছিলেন, তখন শৈব ধনপতি সদাগরের মঙ্গলচণ্ডীর ঘট লঙ্ঘন করা উচিত হয় নাই। মঙ্গলচণ্ডী যে শিবেরও আরাধ্যা, ধনপতি হয় ত তাহা জানিতেন না। জানিতে পারিলে ধনপতি ও শ্রীমন্তের এত লাঞ্ছনা হইত না।

অপ্রাচীন মঙ্গলচণ্ডীর পূজা যে গ্রন্থে ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহা যে কত অপ্রাচীন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

বোধ হয়, কিয়ৎপরিমাণে বুঝাইতে পারিলাম যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে, বা অবসানকালে রচিত হইয়াছে। এখানি প্রকৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে। সময়ান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

আরসী।

হইয়া আসিল দিনপাত;
অস্তগামী কমলিনীনাথ।
যুবতী বসিয়া ঘরে, বস্ত্রগুলি পাট করে,—
দেশান্তরে স্বামী তাঁর যাবেন প্রভাতে;
সে সব যাইবে তাঁর সাথে।

আঁব, কলা, নারিকেলগাছে
ঘরখানি সব ছেয়ে আছে ;
সম্মুখে পল্লীর পথ আঁকা বাঁকা রেখাবৎ,—
সারাদিনে বড় জোর জন দুই তিন
পদ-স্পর্শে করে তা' মলিন।

ছায়াময় ঘরখানি তার
স্বভাবতঃ দিনে অন্ধকার ;
আজিকার সন্ধ্যা তবু যে ছায়া আনিল, ক
এ মলিন ছায়া তার ঘরে আর মনে
পশেছিল,—আসে না স্মরণে।

নিশ্বাস ফেলিয়া করে কাজ ;
কেহ তার নাহি যেন আজ !
সমস্ত গুছান হ'লে, চোখ দু'টি ভাসে জলে,
পশ্চাতে কে আসি' বলে, "সাবাস্ সাবাস্ !"
সুধাকণ্ঠ—প্রফুল্ল, সহাস।

হাসি' বালা চাহে পতি পানে,
গোপনে অঞ্চল চক্ষে টানে,—
"পায়ে পড়ি বল না, কি দিতে আর আছে বাকী,
এ কাজ কখন মোর অভ্যাস ত নাই,
এটা দিতে, ওটা ভুলি তাই।"

সরল সুন্দর শশিমুখে
চুম্বিয়া টানিল যুবা বুকে ;
কহিল, "কি বাকী আর ? সব দেছ, যা' দেবার,
তুমি গৃহলক্ষ্মী যার, তার কি অভাব ?"
নারীনেত্রে বারির প্রভাব।

রমণী বাঁধিতে জানে প্রাণ ;—
শুভ কর্ম্মে অশ্রু অকল্যাণ,
অতএব অশ্রু নয় ;— হাসি শুভ অসংশয়,—

কথায় কথায় কত হাসিল দু' জন;
জ্ঞানে এক,—অন্য অচেতন।

কিন্তু নিশি পোহা'ল যথন,
অবিচ্ছিন্ন দম্পতি-জীবন
বিচ্ছিন্ন করিতে, পতি সাজিল ত্বরিতগতি
নির্ম্মম প্রবাসে দূর করিতে প্রয়াণ;—
নারী-চক্ষে বহিল তুফান।

কৃতাঞ্জলিপুটে করে মানা,
"উপার্জ্জনে কাজ নাই,—না—না,
দেশে আছে শাক ভাত, বিদেশের রত্ন, নাথ,
বিদেশীর ভাল, তাতে লোভ কেন করা?
না, না, না!"—নয়ন বারি-ভরা।

কিম্বদন্তী,—পুরুষের প্রাণ
লৌহে নির্ম্মিল ভগবান্;
খানিক সোহাগ-স্বরে, খানিক যুক্তির ভরে,
নিবারিয়া দয়িতারে দয়িত পলায়;
ভূমে পড়ি দয়িতা লুটায়।

কতক্ষণ পরে ওঠে বামা,
অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি রাঙ্গা;
রোদ্দুরে উজ্জ্বল মাঠ, হয়নি ঘরের পাট,—
ঘর যেন খেতে আসে,—জ্যৈষ্ঠের প্রভাত—
তার,—ভরা ভাদরের রাত!

হেন কালে আসিল ছুটিয়া
ধামী পুরি' আঁব কুড়াইয়া,
পাঁচ বছরের মেয়ে, অরুণ-কিরণে নেয়ে;
হাওয়ায় উড়িছে চুল, চোখে মুখে হাসি;
পাপে তাপে অজ্ঞান, অভাবী।

বছর কাটিতে যায়, কিছু না বারতা পায়,
পতি তার কোন দেশে, কোথায়, কেমনে,
কি ভাবে যাপিছে দিন, অবলা ভাবিয়া ক্ষীণ,
মুখে নাহি হাত ওঠে, সুখ নাহি মনে।

কত না পার্ব্বণ গেল, তার প্রাণে নাহি আলো,
অন্ধের কি রাত্রি দিন—সকলই সমান;
দিন আসে, দিন যায়, আশা কি উত্তম, হায়!
করে নাকো সঞ্জীবিত দুঃখিনীর প্রাণ।

শুধু সেই শিশু মেয়ে— ধ্রুব-তারাটিরে চেয়ে,
যেমন তেমন ক'রে কাটায় জীবন;
যা' তা' ক'রে দিনপাত,— বাঁচান দু'কুড়ি সাত,—
তাও সে শিশুর তরে—দান-সমাপন।
ক্রমে দেহ হ'ল ভার; শুইলে উঠিতে আর
ইচ্ছা নাহি করে, নাহি শক্তিতে কুলায়;
শুধু সে 'দাওয়া'র ভুঁয়ে ইচ্ছা হয় ভাবে শুয়ে;—
তবু ওঠে, খাটে, পাছে বাছা ভয় পায়।
মাঝে মাঝে খুকী আসে, সাগ্রহে মাতারে ভাষে,
"বাণিজ্য করিয়া বাবা ফিরিবে মা! কবে?"
মা বলে, "মা! নাহি জানি, শীঘ্র তবে অনুমানি",
শুষ্ক চক্ষু মুদি', তায় নীর না সম্ভবে।
কত আর সয় ভোগ? উপজিল হৃদরোগ,—
বাহিরে না যায় দেখা, ভিতরে উজাড়;
দুঃখিনী বুঝিল শেষ, হায় ক্রূর পরদেশ!
এখনও রাখিলি তাঁরে নয়নের আড়।

এক দিন মায়ে ঝিয়ে শুইল উঠানে গিয়ে,—
সে দিন গুমোট—আঁব-কাঁঠাল-পাকানো;
শুয়েই ঘুমায় মেয়ে, মা জেগে আকাশে চেয়ে,

কেঁদে ডাকে, "হরি! তাঁরে একবার আনো!"
আকাশে হাসিছে চাঁদ,— সমবেদনার ধাত
কেহ না আরোপে ওই কলঙ্কী ঠাকুরে;
জীবে হেরি' ম্রিয়মাণ সদা হেসে আটখান,—
যেন কত জ্ঞানবান্, কত দৃষ্টি দূরে।
বিষাদিনী চাঁদ পানে চায়, তার গায় প্রাণে,—
"যে দেশে প্রাণেশ আছে, সেথাও কি অই
আকাশে অমনি চাঁদ? আমার মত কি নাথ
চাঁদ চেয়ে ভাবে আমি কোথা পাপময়ী?
হে চাঁদ! আমায়ে বল, নয় ত লইয়া চল
নাথের সদনে, নয় তাঁরে এনে দাও!"
শুনি' সে প্রলাপরাশি, চাঁদের ধরে না হাসি,
সহসা কে ডাকে আসি,'—"জেগে না ঘুমাও,
উঠি' খুলে দাও দাও দোর!" শত মত্ত হস্তী জোর
প্রমদার,—ছুটে' উঠে' খুলিয়া কপাট
পড়িল ও কার বক্ষে? ও কেমন নাট?

৩

বড় সে বিজন গ্রাম, জনতার বার,
ঝোপের ভিতর ক'টি কুটীরের সার।
দুনিয়ার দেনা লেনা মাজা ঘষা বেচা কেনা
জানে না গ্রামের তারা; কুটীর ভিতরে
ছোট ছোট সুখ দুঃখ আলোচনা করে।
আকাশে তাদের সদা পড়ে থাকে প্রাণ,
'হাজা' 'শুকো' দুইটি কথায় অভিধান।
যুবক বছর পরে যখন আনিল ঘরে
সহর ঘুরিয়া নানা নূতন জিনিস,
পাড়ায় পড়িল সাড়া,— সারা গ্রাম নাড়াচাড়া,
কারও বা হরিষ, কারও উপজিল রিষ।
খুলি' কাপড়ের গাঁট, দেখে বিলাসের হাট

আনিয়াছে পতি তার, নারী পুলকিত,
গন্ধ-তেল, ছবি, আর ফিতা, চুড়ী চমৎকার,
পুতুল খুকীর তরে ঝুড়ি পরিমিত,—
সবার প্রধান এক অপূর্ব্ব আরসী,—
সমস্ত মুখটা তায় একেবারে দেখা যায়!
এত বড়,—অবাক তা' নিরখি রূপসী!
দর্পণে যতই দেখে মুখ আপনার,
ততই প্রবল হয় তৃষ্ণা দেখিবার!
খুকী ছুটে আসে কাছে,— "কি আছে মা! ওর মাঝে?"
জিজ্ঞাসে অবোধ; করে উত্তর রমণী,—
"ওর মাঝে আছে ও মা! তোমার জননী!"
আবার সাজিল নারী যত্ন করি' কত—
মুখে হাসি—ভাঙ্গা ঘরে চাঁদনীর মত।

৪

নির্ব্বাণ-উন্মুখ দীপপ্রায়
দিন দুই জ্বলিল সে হায়,
নিবিল তাহার পর অন্ধকার করি' ঘর,
সদর্পে পশ্চাতে সব ফেলে গেল বালা,
জগতের শোক তাপ জ্বালা।

রুগ্ন-হৃদি-গ্রন্থিগুলি তার
অতি ক্ষীণ ছিল নিরাহার;
প্রিয়-মিলনের বারি অভাবিত লভি' নারী
আকণ্ঠ অঞ্জলি পূরি' করেছিল পান;
কেন তার বধিল পরাণ!

ভীম শূন্য করিয়া রচনা,
পলাইল সহসা ললনা;
সে শূন্যে ডুবিয়া পতি, হইল উৎক্ষিপ্তমতি;
সে শূন্যে পড়িল শিশু সরলা বালিকা,
বনফুল-কিশোর-কলিকা।

বুঝিল না ইন্দ্রজাল কোন্
মাকে তার করিল হরণ ;—
মুখটি কাতর ক'রে, যে দিন মা-হীন ঘরে
প্রথম বসতি তার, প্রথম পারণ,
সে ভাবিল, সে দিন স্বপন।

যে রজনী প্রথম তাহার
মার কোলছাড়া ঘুমাবার
নীতি-শিক্ষাপ্রদায়িনী,— তাহারে রাখিল চিনি',
ভুবিল না মোহে তার, থাকিল জাগিয়া ;
ক্ষুদ্র মনে কত কি ভাবিয়া।

পরদিন প্রভাতে পিতায়
জিজ্ঞাসিল, "মা গেল কোথায় ?"
রুদ্ধকণ্ঠ পিতা, হায় ! উত্তর না খুঁজি পায়,—
বাষ্পে অন্ধ আঁখি, শ্রান্ত উত্তরিল শেষে—
"দেশে গেছে—পুন আসিবে সে।"

বাবা এল বিদেশ হইতে—
মার ভাল এখন যাইতে ?
অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত মনে চিন্তা ভাসে কত,
কিছু না বুঝিতে পারে;—কভু প্রাণ তার
সংশয়ের ধারেনি যে ধার।

বসিয়া ভাবিল কতক্ষণ ;—
উঠে' শেষ করে আনয়ন
যতনে দর্পণখানি— কি বুঝিয়া নাহি জানি,
বাহিরে অঙ্গনে আনি' অতীব যতনে
ধীরে ধীরে চাহিল দর্পণে।

পিতার পড়িল তবে শ্বাস,
অন্যমন হবে শিশু,—আশ,
খুকী ডাকে, "বাবা ! বাবা !" রুদ্ধবাক্ বাবা হাবা,—

খুকী বলে, "বাবা! তুমি জান ত নিশ্চয়,
দেশে গেলে মা কি ছোট হয়?"

না বুঝিল পিতা প্রহেলিকা;—
প্রবোধিতে বিধুরা বালিকা,
"হাঁ" বলি' নাড়িল ঘাড়,— খানিকটা তোলপাড়
কমিয়া আসিল শুনি' কিশোরীর প্রাণে,
কি বুঝিয়া কি ভাবি কে জানে।

ঘোরে ফেরে নিরখে মুকুরে,
মুগ্ধ ফণী যথা বংশী-সুরে,—
মুকুরে মোহিত মন,— নাড়াচাড়া অনুক্ষণ
মুকুর লইয়া;—রাতে ঘুমন্ত চমকে,
দীপ জ্বালি' মুকুরে নিরখে।

খেলুড়ীরা কত আসি' ডাকে;
সে ঘরের কোণে বসে থাকে;
"তুমি যে বিদেশে গেলে, ফের ত ফিরিয়া এলে?"
বাবা বলে, "এসেছিনু বছরের পর।"
"মার কি গো হয় নি বছর?"

ক্রমে বাছা লইল বিছানা—
কান্ত দেহ শীর্ণ সিকিখানা;
মৃদু জ্বর, মৃদু কাশী,— জনক হইল ত্রাসী,—
বুঝিল, খুকীও চলে মার কাছে দেশে,—
এ দেশে একাকী থাকিবে সে।

শিয়রে মুকুরখানি আছে;—
অজ্ঞানে হাতাড়ে,— কেহ পাছে
চুরি করে নিয়ে যায়;— যেটুকু চেতনা পায়,
মুকুরেই চেয়ে থাকে,—ক্রমে দেহ ভার;
মুকুর নাড়িতে নারে আর।

এক নিশি তৃতীয় প্রহরে,
(দিনরাত বিকারের পরে)
মেলিল নয়ন দুটি'— অতি ক্ষীণস্বরে ফুটি'
প্রকাশিল কথা কটি,—"ও বাবা কোথায়,—
একবার দেখাও না মায়!

"কোথা সে আরসীখানি আনো,
তার মাঝে মা আছে, তা জানো ?
ধর না আমার চক্ষে!" বজ্র-বিদারিতবক্ষে
উদ্ভ্রান্ত জনক ধরে নয়নে তাহার
মুকুর—মাণিক বালিকার।

প্রতিবিম্ব নিরখি' তাহায়,
সানন্দে সে কহিল পিতায়,—
"ওই দেখ, ওর মাঝে মা আমার ব'সে আছে!"
"ও মা! মা!" পাগল পিতা কেঁদে উঠে কয়—
"ওমা যে আমার, তোর নয়।"*

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিল চুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেহারা ঘরে বহুক্ষণ বাতি জালিয়া দিয়া গিয়াছিল। ঘড়িতে টুং টুং করিয়া শব্দ হইল। তখন হাকিম মিষ্টার মিঃ হেমচন্দ্র মুখার্জ্জি চাহিয়া দেখিলেন, সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া চাপরাসী হাজির হইল। 'সাহেব' জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেম্‌সাহেব বাড়ী ফিরিয়াছেন ?"

সসম্ভ্রমে সেলাম বাজাইয়া চাপরাসী জানাইল, এখনও তিনি ফিরিয়া আসেন নাই।

"ব্যারিষ্টার সাহেব ?"

---

* Matsuyma Mirror নামক একটি জাপানী উপকথার ছায়া অবলম্বনে রচিত।

৭১

"তিনিও না।"

হাকিম সাহেব একটা খোলা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নগ্নপ্রকৃতি লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে উচ্ছ্বসিত। অদূরে বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন রাজ-পথের একটি শাখা আঁকিয়া বাঁকিয়া মাঠের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। পক্কশীর্ষ শস্যক্ষেত্রের উপর আস্তৃত কুহেলিকা বিস্তীর্ণ যবনিকার মত ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

এখনও ফিরিয়া আসিল না? কি অন্যায়! অন্ততঃ তাঁহাকে একবার বলিয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গেল কোথায়? এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, মিঃ মুখার্জ্জির মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ছায়া ততই নিবিড় হইয়া আসিল। পত্নীর এতটা স্বেচ্ছাচারিতা কখনই সঙ্গত নহে। স্বাধীন ইচ্ছা ক্রমেই যেন কর্ত্তব্যের নির্দ্দিষ্টমাত্রা অতিক্রম করিতেছে! সংশয়, সন্দেহ ক্রূর সর্পের মত তাঁহার হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ সিগারেট-ধূমে চিন্তাটা বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া হাকিম টুপি ও ভ্রমণযষ্টি লইয়া বাহিরে আসিলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, দূরে কেবল অবিচ্ছিন্ন কুয়াসার স্তর। পথ জনহীন। মুগ্ধের মত চলিতে চলিতে হাকিম ক্রমশঃ গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া মাঠে আসিয়া পড়িলেন। দুই পার্শ্বে কুয়াসা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে পথ করিয়া দিতেছিল।

"হ্যালো মিঃ মুখার্জ্জি! এমন সময় এ দিকে কোথায়?"

মুখার্জ্জি সাহেব চমকিত ভাব সংশোধন করিবার পূর্ব্বেই ব্যারিষ্টার বন্ধু মিষ্টার বিশ্বাস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। পশ্চাতে মিসেস্ মুখার্জ্জি,—কিরণময়ী।

মিসেস্ মুখার্জ্জি অস্ফুট চন্দ্রালোকে অভিষিক্ত হইতেছিলেন। তাঁহার তরঙ্গিত বক্ষের উপর বন্যকুসুমের মালা। পুষ্পগুচ্ছ জমাট ফেনপুঞ্জের মত কবরী ও অলকে যত্ন-বিন্যস্ত। সর্ব্বাঙ্গে অবসাদের ছায়া সত্ত্বেও তাঁহাকে সেই মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে, ঝিল্লী-রব-মুখরিত কুহেলি-আলোক-চিত্রিত রজনীতে যেন ফুলরাণীর মত দেখাইতেছিল।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মিসেস মুখার্জ্জি বলিলেন, "তুমি! তুমি এই শীতে এত রাত্রে মাঠের মধ্যে কোথায় যাইতেছিলে?"

হৃদয়চাঞ্চল্য সংযত করিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন, "বেড়াইতে বেড়াইতে এত দূর আসিয়া পড়িয়াছি। তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?"

মিসেস্ মুখার্জ্জি স্বামীর বামহস্ত দক্ষিণ করে ঈষৎ চাপিয়া বলিলেন, "তুমি সে সময় কাছারীতে ছিলে; সেই জন্য তোমাকে বলিয়া আসিতে পারি নাই। আমরা রুদ্রপুরের বনে শিকারে গিয়াছিলাম। দুপুর বেলা কোনও কাজ ছিল না; মিঃ বিশ্বাস বলিলেন, তিনিও নিশ্চিন্ত, শিকারে গেলে ভাল হয়। দুপুর বেলাটা সেখানে বেশ কাটিয়া গিয়াছে। মিষ্টার বিশ্বাস বেশ শিকারী; অনেকগুলি ঘুঘু ও স্নাইপ মারিয়াছেন। সাত আট মাইল হেঁটে আসা কি সহজ ব্যাপার? তাই এতটা রাত হইয়া গিয়াছে।"

একরাশি চুরুটের ধোঁয়া বাহির করিয়া মিঃ বিশ্বাস কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "শিকারের অবাধ আনন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে আপনাকে মনে করিয়া একটু দুঃখ হইয়াছিল। এমন আমোদটা আপনার বাদ গেল! আপনি সঙ্গে থাকিলে আমোদের অঙ্গটা আর অসম্পূর্ণ থাকিত না। নিবিড় ঝোপের মধ্যে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকা, নিঃশঙ্ক পাখীকে তাহার সঙ্গীতের মাঝখানে অকস্মাৎ গুলির আঘাতে পাড়িয়া ফেলা,—কি উদ্দীপনাপূর্ণ! কখনও বা শাখাবহুল গাছের ডালে চড়িয়া বসা, বন্য খরগোসের পেছনে দৌড়িয়া যাওয়া, আবার শিকারে শ্রান্ত হইয়া বিজন নদীতীরে শ্যামল শষ্পশয্যায় বসিয়া বিশ্রাম করা, এ সব উপভোগের জিনিস। কি বলেন মিসেস্ মুখার্জ্জি?"

"বাস্তবিক!" বলিয়া কিরণময়ী মুখ ফিরাইয়া আকাশের পানে চাহিলেন।

মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "এত বড় বোঝাটা বহিয়া আনিতে আপনার বড় কষ্ট হইয়াছে, দেখিতেছি। এক জন চাপরাসী সঙ্গে লইয়া গেলে আর এ কষ্টটা সহ্য করিতে হইত না।"

বন্দুকের ডগায় 'স্নাইপ-ষ্টিক'টা ঝুলাইয়া স্কন্ধদেশে রাখিয়া ঈষৎহাস্যে বারিষ্টার সাহেব বলিলেন, "কি জানেন মিঃ মুখার্জ্জি! অনেকটা পথ! একটা প্রাণীকে অনর্থক কষ্ট দিয়া ফল কি? সুধু বোঝা বহিয়া তাহার কি সুখ হইত?"

এতটা সহানুভূতি, উদার মন্তব্য ও পরদুঃখকাতরতা দেখিয়া হাকিম সাহেব অলক্ষ্যে একবার দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাকিমের প্রীতিভোজে সহরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সকলেই আজ তাঁহার অতিথি।

মাঠে বড় বড় তাঁবু পড়িয়াছে। কক্ষমধ্যে পিয়ানো, বেহালার মধুর সুরের

বিচিত্র ঝঙ্কার। ফুলের মালার কোমল গন্ধ, ঝাড় লণ্ঠনের তীব্রজ্যোতিঃ ও সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার পৌষের শীতল বাতাসকেও যেন তুষারস্বপ্ন হইতে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

একখানি গোলাপী পার্শী শাড়ীতে কিরণময়ীর সমুদয় সৌন্দর্য্য আজ ছন্দোময়ী কবিতার মত ঝঙ্কৃত, উচ্ছ্বলিত জলরাশির মত তরঙ্গিত হইয়া ফুটিয়াছিল। তিনি সকলকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। মিঃ মুখার্জ্জি কখনও পত্নীর যৌবনলাবণ্যপুষ্পিতা দেহলতায় নিবদ্ধদৃষ্টি, কখনও বা মুগ্ধের মত কিরণময়ীর অনুসরণে নিরত।

স্বামীকে গৃহের বিজন প্রান্তে ডাকিয়া কিরণময়ী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে বলিলেন, "তুমি আজ অমন করিতেছ কেন? কোথায় সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবে, না চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ! বিশ্বাস সাহেব কেমন সকলের সঙ্গে গল্প গুজব করিতেছেন! যাও, তুমি তাঁহার সাহায্য করগে।"

মিঃ মুখার্জ্জি অপ্রতিভও হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনে একটু বিরসভাবও অনুভব করিলেন। বলিলেন, "যাইতেছি।"

কিরণময়ী বলিলেন, "তোমাদের উপর অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার, আহারের ভার আমার; অভ্যর্থনার যেন ত্রুটী না হয়, তাহা হইলে নিন্দা হইবে।"

তখন পিয়ানো বড় মধুর বাজিতেছিল। মিঃ মুখার্জ্জি মরালগামিনী কিরণময়ীর লীলাচঞ্চল গতিভঙ্গী দেখিতে দেখিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন?

বিশ্বাস সাহেবের সুন্দর শ্রী একটা কালো সান্ধ্যপরিচ্ছদে বড় খুলিয়াছিল। হাত পা নাড়িয়া তিনি যখন নিমন্ত্রিতদের সহিত গল্প করিতেছিলেন, তখন সকলেই মুগ্ধচিত্তে তাঁহার গল্প শুনিতেছিল।

গান গল্প আমোদ প্রমোদ বেশ জমিয়া আসিয়াছে। নিমন্ত্রিতগণও প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। মিঃ মুখার্জ্জি সহসা লক্ষ্য করিলেন, বিশ্বাস সাহেব কক্ষে নাই। তিনি কোথায় গেলেন? অন্যের অলক্ষ্যে মিঃ মুখার্জ্জি সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

একটা বিস্তৃত কক্ষে মিসেস্ মুখার্জ্জি স্বহস্তে মিষ্টান্ন ও ফলের ডিস্ সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। নিকটেই একখানা আসনে বসিয়া বিশ্বাস সাহেব তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলিতেছিল।

অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালার ধারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গৃহস্বামী দেখিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মিঃ মুখার্জ্জি শব্দিতচরণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিলেন, "এ কি! নিজের হাতে এ সব করিতেছ কেন? চাকরদের বলিয়া দিলেই চলিত।"

আনতমুখে ফল সাজাইতে সাজাইতে মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "তাহারা অন্য কাজে ব্যস্ত, তাই এগুলি আমরাই করিতেছি। বড় বাকী নাই, প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।"

মিষ্টার মুখার্জ্জি একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। বলিলেন, "তবে আমিও তোমাদের একটু সাহায্য করি; কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক্।"

কিরণময়ী বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, তুমি বাহিরে যাও। আমরা সকলেই যদি এখানে থাকি, তাহা হইলে অতিথিরা কি মনে করিবেন! বিশ্বাস সাহেব আমাকে সাহায্য করিতেছেন, তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। তুমি বাহিরে তাঁহাদের কাছে যাও।"

ব্যারিষ্টার সাহেব একটা চুরুট ধরাইয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, "ঠিক কথা। মিঃ মুখার্জ্জি! আপনি বাড়ীর কর্ত্তা, আপনার সব সময় সেইখানে থাকা দরকার। আমি ও মিসেস্ মুখার্জ্জি এ দিকে আছি। সব ঠিক হবে, আপনি সে জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না।"

ক্ষুব্ধহৃদয়ে হাকিম বাহিরে আসিলেন। হিমবর্ষী অনন্ত আকাশে কি উন্মুক্ত স্বাধীনতা, কি অকৃত্রিম উদারতা! প্রকৃতির স্তরে স্তরে কি অখণ্ড কল্যাণ বিকশিত! কিন্তু তাঁহার বোধ হইল, এই জড় জগতের সর্ব্বত্রই কেবল একটা নির্ব্বাক বিদ্রূপ যেন পরিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে।

ড্রয়িংরুমে পিয়ানো তেমনই মধুরে বাজিতেছিল। হাস্য পরিহাসের শব্দ কক্ষে কক্ষে তেমনই উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রীতিভোজের পরদিন প্রভাতে তারযোগে সংবাদ আসিল, কি একটা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্বয়ং কমিশনার বাহাদুর জেলায় আসিতেছেন।

অগত্যা বিশ্বাস সাহেবকে হাকিম বন্ধুর আতিথ্য ছাড়িয়া ডাক্‌বাঙ্গলোর নির্জ্জনতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পড়িতে পড়িতে বইখানা বন্ধ করিয়া হাকিম ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। এ কি! সাতটা বাজিয়া বিশ মিনিট হইয়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! বিশ্বাস সাহেব

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় আসিবেন বলিয়া দিয়াছিলেন। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা চলে না। ব্যারিষ্টার সাহেবের আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের চলিয়া যাওয়া চাই।

গাড়ী তৈয়ার করিতে হুকুম দিয়া মিষ্টার মুখার্জ্জি পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি তখন একখানা বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িতেছিলেন। মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে না? রাত হ'য়ে গেল যে!"

মিসেস্ মুখার্জ্জি ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখনও ঢের দেরি আছে। আটটার সময় আরম্ভ হইবে বোধ হয়।"

মুখার্জ্জি বলিলেন, "আর দেরি করা উচিত নয়। আকাশে যে মেঘ করিয়াছে, শীঘ্র বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। এর মধ্যে বৃষ্টি আসিলে কাজেই বিলম্ব হয়ে যাবে। ও দিকে আমরা না গেলে থিয়েটার আরম্ভই হবে না। সুতরাং বুঝতে পাচ্ছ, তা হ'লে কতকগুলি ভদ্রলোককে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হবে।"

স্বামীর ব্যগ্রতা দেখিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গাড়ীবারাণ্ডায় গাড়ী প্রস্তুত।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। আকাশের ছিদ্রশূন্য ঘন মেঘে ও ধরণীর তিমির-ছায়ায় গাছপালা এক একটা গাঢ় মসীলিপ্ত চিত্রের মত দেখাইতেছিল।

জজ সাহেবের গেটের লণ্ঠনের মধ্য হইতে একটা ক্ষীণ আলোকরেখা পথের মিলনস্থলের খানিকটা অন্ধকার দূর করিয়া দিয়াছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় মিঃ মুখার্জ্জি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন।

তাঁহার বোধ হইল, যেন দুইখানি চিরপরিচিত পেণ্টলুন-পরা লম্বা লম্বা পা অন্ধকাররাশি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অতিদ্রুত চলিয়া আসিতেছে! মুখার্জ্জি মুহূর্ত্ত-মধ্যে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করিলেন, পথে কোথাও না থামাইয়া গাড়ী একেবারে যেন চলিয়া যায়।

দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

মিঃ মুখার্জ্জি কান পাতিয়া শুনিলেন, যেন দূর হইতে একটা ক্ষীণস্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

কিরণময়ী শুনিতে পান নাই ত? তিনি গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

কিরণময়ী বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ও কি, দরজা বন্ধ করিলে কেন?"

কিরণময়ীর স্বামী সংক্ষেপে বলিলেন, "বড় ঠাণ্ডা লাগিতেছে।"

গাড়ী আসিয়া যখন নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌঁছিল, তখনও অভিনয় আরম্ভ হইবার

কিছু বিলম্ব আছে। বৃহৎ হলের এক পার্শ্বে রঙ্গমঞ্চ; মধ্যস্থলে দর্শকদের বসিবার স্থান।

হাকিম-দম্পতী আসন গ্রহণ করিতে না করিতেই প্রবলবেগে বৃষ্টি নামিল। এত ঝড়বৃষ্টিতে কি বিশ্বাস সাহেব আসিতে পারিবেন? সম্ভাবনাটা মিঃ মুখার্জ্জির বড়ই অল্প বলিয়া বোধ হইল। নিশ্চিন্তমনে একটি চুরোট ধরাইয়া তিনি ধূমপানে মন দিলেন।

তখন ঐক্যতানবাদন আরম্ভ হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের কনসার্টের উন্নতি সম্বন্ধে জজ সাহেবের সহিত হাকিমের দুই চারিটা কথা হইতেছে, এমন সময় তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে কে বলিল, "ও মিঃ মুখার্জ্জি, আজ বড় কষ্ট পেয়েছি। সারা পথটা দৌড়াইয়া ভিজিয়া আসিতে হইয়াছে। এত চীৎকার করিয়া ডাকিলাম; কিন্তু আপনার গাড়ী কোনও মতেই থামিল না।"

মুখার্জ্জি সাহেব চাহিয়া দেখিলেন, বিশ্বাস সাহেব! মুহূর্ত্তে তাঁহার বুকের ভিতর খানিকটা যেন বসিয়া গেল। স্বাভাবিক প্রফুল্লতাটুকুকে জোর করিয়া মুখের হাসিতে ধরিয়া রাখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিতান্ত অপ্রতিভের মত বলিলেন, "আহা বিশ্বাস সাহেব, তাই ত, আপনার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। আপনার কথা বোধ হয় বাতাসে শোনা যায় নাই, নহিলে নিশ্চয়ই গাড়ী থামাইতাম।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি সাহেবকে দেখিয়া নিকটে সরিয়া আসিলেন। বিস্মিতভাবে বলিলেন, "এ কি মিঃ বিশ্বাস! আপনি যে একেবারে ভিজিয়া আসিয়াছেন!

তখন যবনিকা উঠিয়াছে। অভিনয় আরম্ভ হইবে। পার্শ্বের আসনে বিশ্বাস সাহেবকে বসাইয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি অপেরাগ্লাস্‌টি চক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার স্বামীকে অগত্যা পশ্চাতের আসনে বসিতে হইল।

সকলে যখন অভিনয়-দর্শনে একাগ্রচিত্ত, মিঃ মুখার্জ্জির সমুদয় অন্তরেন্দ্রিয় তখন বেদনার শক্তিশেল অনুভব করিতেছিল। সরলা বঙ্গবধূর সেই সলজ্জ ক্ষুদ্র হৃদয়ের অগাধ অব্যক্ত প্রেম, বিলাসবিহীন লজ্জানত দৃষ্টি, স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোকে এত পরিবর্ত্তিত!

এ সৃষ্টি কাহার?—শিক্ষার, না শিক্ষকের?

অভিনয় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্যান্য দর্শকের ন্যায় পলকহীননেত্রে তিনিও রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া ছিলেন; কিন্তু অভিনেতা, দৃশ্যাবলী ও আলোকমালা এক একটা অপরিচিত "চৈনিক" অক্ষরের মত তাঁহার দৃষ্টির উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল।

যবনিকা যখন পড়িয়া গেল, জজ সাহেব তখন হাকিমকে বলিলেন, "মিঃ মুখার্জ্জি! মিসেস্ মুখার্জ্জি আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

আত্মবিস্মৃতির জন্য ঈষৎ লজ্জিত হইয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিসেস্ মুখার্জ্জি বিশ্বাস সাহেবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কি বলিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, "আসুন, আপনাদের সঙ্গে যাইব বলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

গাড়ী তিন জনকে বহন করিয়া ছুটিয়া চলিল। বৃষ্টিবারিসিক্ত শীতল বাতাস গাড়ীর মধ্যে হু হু করিয়' প্রবেশ করিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাকিম সাহেব একাকী বসিয়া চা পান করিতেছেন, এমন সময় ঘরের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বিশ্বাস সাহেব প্রবেশ করিলেন। ভ্রমণযষ্টি টেবিলের উপর রাখিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। একবার গুপ্তকটাক্ষে মিঃ মুখার্জ্জি দেখিলেন, ব্যারিষ্টার সাহেবের মুখমণ্ডল উত্তেজনাপূর্ণ।

একটা সিগার ধরাইয়া টানিতে টানিতে মিষ্টার বিশ্বাস ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "মিঃ মুখার্জ্জি, গেজেটে দেখিলাম, আপনি তিন মাসের ছুটী লইয়াছেন। বড়ই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়, আমাদের মত অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও আপনি পূর্ব্বে এ কথার আভাসমাত্রও দেন নাই।"

গৃহস্বামী বিনীতভাবে বলিলেন, "ছুটী পাই কি না পাই, এই জন্য আপনাদের পূর্ব্বে জানাই নাই। ভাবিয়াছিলাম, যদি কমিশনার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন, তখন বলা যাইবে। সে জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। মিসেস্ মুখার্জ্জিও কিছু জানিতেন না। তাঁহাকে আজ সকালে বলিয়াছি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বিশ্বাস সাহেব বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি ছুটী লইতেছেন কেন?"

সিগারেটের ভস্মাগ্রভাগ ঝাড়িয়া মিঃ মুখার্জ্জি ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এ জায়গাটার জলবায়ু কিছুতেই আমার সহ্য হইতেছে না। ক্ষুধা ভাল হয় না, রাত্রে গভীর নিদ্রার অভাব। তাহা ছাড়া মিসেস্ মুখার্জ্জিরও দেখিতেছি এখানকার জলবায়ু সহ্য হইতেছে না।"

বিশ্বাস সাহেব রুমালে একবার মুখখানি মুছিয়া, একবার কাশিয়া বলিলেন, তাহা হইলে একান্তই আমাদের মায়া কাটাইতেছেন? কবে যাওয়া স্থির করিলেন?"

মিঃ মুখার্জ্জি প্রশান্তভাবে বলিলেন, "শনিবারে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়াই যাইবার ইচ্ছা আছে।"

"ক'টার সময় তাহা হইলে রওনা হইবেন ?"

"ইংলিশম্যান্"খানার দিকে চাহিয়া হাকিম বলিলেন, "দশটায়।"

* * * * * *

স্নিগ্ধ কোমল প্রভাত-ছবি পদ্মার উচ্ছ্বসিত জলরাশির উপর সুপ্ত সুন্দরীর জাগরণের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। বিহঙ্গকলস্বরে সহস্র মধুর রাগিণী মুখরিত। সুদূর জলবিস্তারের শেষে পরপার ছায়াময় পরীরাজ্যের মত প্রসারিত। মুক্ত প্রভাতবায়ু ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানিকে তালে তালে নাচাইতেছিল।

চিমনী হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে। সারেঙ্গ, খালাসী, এঞ্জিন-চালক, যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া তীরের দিকে উৎসুকনয়নে চাহিয়া আছে।

তীরে বিস্ময়মুগ্ধ কৌতূহলী চাষার দল বিস্ফারিতলোচনে ব্রিটীশ-পতাকা-চিহ্নিত ক্ষুদ্র বাষ্পীয়তরীখানি দেখিতেছে।

বন্ধুর রাজ-পথ ধ্বনিত করিয়া একখানা গাড়ী আসিয়া পদ্মার তীরে থামিল। মুখার্জ্জি সাহেব পত্নীর হস্তধারণ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। সসম্ভ্রমে দর্শকগণ পিছাইয়া পড়িল। ঈষৎ বিরক্তস্বরে মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "তোমার সব কাজেই তাড়াতাড়ি। একটু বেলা হইলে চলিত না কি ?"

মিঃ মুখার্জ্জি সংক্ষেপে বলিলেন, "সকাল সকাল গেলে ষ্টীমারের কষ্টটা কম হবে।"

কিরণময়ী ধীরে ধীরে বলিলেন, "কাহারও সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত হইল না।"

কথাটা যেন তাঁহার স্বামীর কর্ণে প্রবেশই করিল না।

সারেঙ্গ নামিয়া আসিয়া টুপি খুলিয়া দাঁড়াইল। জানাইল, "ষ্টীমার ছাড়িবার এই উপযুক্ত সময়। হুকুম হয় ত—"

উভয়ে ষ্টীমারে উঠিলেন। কিরণময়ী ডেকের উপর একটা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চূর্ণ অলকগুচ্ছ ও বসনপ্রান্ত লইয়া পদ্মার বাতাস খেলা করিতে লাগিল। কিরণময়ী তীরের গাছ পালা পথ ঘাটের দিকে স্বপ্নাকুলনয়নে চাহিয়া রহিলেন।

দূরে একখানা 'বাইক' যেন পাখীর মত উড়িয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আরোহী তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। তিনি মিঃ বিশ্বাস।

সারেঙ্গ তখন বাঁশীর দড়ি টানিয়া ধরিয়াছিল। এঞ্জিন-চালক বয়লারে চাবিটা ঘুরাইয়া দিয়াছিল। ষ্টীমার ধীরে ধীরে চলিতেছিল।

মিষ্টার মুখোপাধ্যায় ক্যাবিনের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। পত্নীর নিকট রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইয়া তীরের দিকে চাহিলেন। একটা টুপি বিদায়চিহ্নস্বরূপ তখনও ঘন ঘন ঘুরিতেছিল। তাঁহার মুখে শোণিতস্রোত বেগে প্রবাহিত হইল, তিনি পার্শ্বে ফিরিয়া চাহিলেন।

ষ্টীমারের চাকার আবর্ত্তে সফেন জলরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। মুখোপাধ্যায় দেখিলেন, ফেন-পুষ্পিত তপন-চুম্বিত পবন-কম্পিত পদ্মাপ্রবাহে একখানি শুভ্র রেশমী রুমাল ভাসিতেছে। জলাবর্ত্তের সঙ্গে রুমালখানি মুহূর্ত্তমধ্যে ডুবিয়া গেল। একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া মিঃ মুখার্জ্জি একাগ্র-মনে টানিতে লাগিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

কবিতা-কুঞ্জ।

অতৃপ্তি।

হে সুন্দর! কেন দিলে একবিন্দু সুধা—
এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মাধুরী-মদিরা?
অতৃপ্তির এ কি দাহ! এ কি তৃষ্ণা-ক্ষুধা!
দাও—আরো দাও নাথ! এ অপূর্ব্ব বীরা!
লোকে লোকে কালে কালে—এ কি এ অদ্ভুত!
সৌন্দর্য্য-সুরার স্রোত উঠিছে উচ্ছ্বসি',
রবি শশী গ্রহ তারা বিচিত্র বুদ্বুদ
ফুটিছে টুটিছে নিত্য দিগন্ত ঝলসি'!
আমি সহিব না আর এই তীব্র তাপ
পদাঙ্কচিত্রিত তপ্ত পথ-ধূলিতলে,
ছিঁড়িব এ দেহবন্ধ—ঘুচাব এ পাপ,
সুরম্য মাধুরী সুরা কাড়ি ল'ব বলে!
পূর্ণপানপাত্র বিশ্ব ধরিয়া অধরে
নিভাব এ তৃষ্ণা মোর চিরদিন তরে!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সন্ধ্যাদীপ।

জ্বালো, ওগো গৃহলক্ষ্মী, সন্ধ্যাদীপ জ্বালো।
ক্লান্ত কর্ম্মকোলাহল, সংসার নির্জ্জন,
দিগন্তে মিশিয়া যায় দিনান্তের আলো,
সায়াহ্নের অন্ধকার ঘিরিছে ভুবন।
সন্ধ্যাতারা ধীরে আসি' সুদূর গগনে
অনিমেষে চেয়ে আছে ধরণীর পানে,
তুমি এস পুণ্যময়ী, এই শুভক্ষণে,
নবীন আশ্বাস দাও মানবের প্রাণে।
সযতনে জ্বালি' তব ক্ষুদ্র দীপখানি
আলোকিত করে' রাখ পবিত্র আলয়,
অজ্ঞাত অসীম বিশ্ব—তারি মাঝে, রাণী,
তোমার কুটীর রাজ্য—অটল আশ্রয়।
থাক্ অকম্পিত দীপশিখাটি তোমার,
বাহিরে ঘনায়ে আসে—আসুক আঁধার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সন্ন্যাসীর প্রত্যাবর্ত্তন।

রে বিহঙ্গ! প্রত্যুষের স্নিগ্ধ নভে চেয়ে
যে উন্মদ সুখোচ্ছ্বাসে গেয়েছিলি গান
বিস্তারিয়া পক্ষ দু'টি ঊর্দ্ধপানে ধেয়ে,
কোথা সেই উচ্ছ্বসিত সুখ, সে উদাত্ত তান?
শ্রান্ত কি রে শুভ্র পাখা সায়াহ্নেরই আগে
ধরিত্রীর নীড় লাগি'? সারা দীর্ঘ দিন
ভেবেছিলি কাটাইবি দীপ্ত অনুরাগে
দিক্ হ'তে দিগন্তরে; অম্লান নবীন
চিরন্তন যৌবনের পূর্ণ সাধনায়
বিরচি' বিরাট নীড় ঊর্দ্ধ নভোদেশে
মোক্ষের সংবাদ দিতে ফিরিবি ধরায়;
ব্যর্থ তাহা ওরে শ্রান্ত! তাই দীনবেশে
খর-রবি-দগ্ধদেহে লাঞ্ছনা বহিয়া
সর্ব্বসহা পৃথ্বী-নীড়ে আসিলি ফিরিয়া!

এই পৃথ্বী—জননীর স্নেহ-তপ্ত হিয়া—
চিরদিন রহিয়াছে পুত্র-মুখ চাহি'
শস্য আলো সমীরণ স্তন্য-ধারা দিয়া
অনুক্ষণ সেবারতা—শ্রান্তি তাহে নাহি।
এই পৃথ্বী শত লক্ষ স্নেহের বন্ধনে
নিতান্ত আপন করি' রাখেনি কি তোরে?
তোরে ছেড়ে দিতে হায়! দুঃসহ বেদনে
মাতৃ-বক্ষ হাহাকারে ওঠেনি কি ভরে'?
ওরে শ্রান্ত! ভুলে গেলি কিসের দুরাশে
কল্পিত সে মুক্তি শুধু মায়া মরীচিকা?
ব্যর্থকাম ফিরি' আসি' সেই মাতৃ-পাশে
দেখ্ চেয়ে কি মুরতি শাপার্ত্তিহারিকা!
বল্ নত শিরে বল্—"জননি গো তুমি!
স্বর্গ হ'তে গরীয়সী পুণ্যময়ী ভূমি!"

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

হাফিজের অনুসরণ।

তরুণী ইরাণী বালা! বারেক ফিরিয়া যদি চাও,
আকুল বাহুটি মোর কণ্ঠে তব জড়াইয়া দাও;
গোলাপ-কপোল দুটি, কর শতদল সুকুমার
অপার আনন্দরসে ডুবাইবে কবিরে তোমার।
বোখারা-সুবর্ণরাশি, সমর্‌খন্দ রত্নরাজি দিলে,
ছার সে ঐশ্বর্য্যশোভা! তোমার সাথে তুলনা
কি মিলে?

ঢাল ঢাল স্বর্ণপাত্রে তরল মদিরা সুধাধার,
দূর করি' দাও দূরে বিষাদের কুয়াসা-আঁধার।
কপট ধার্ম্মিকদল যদি কিছু বলে রুক্ষস্বরে,
তখনি সমুচ্চকণ্ঠে বলো' তার মুখের উপরে—
কোথায় তোদের স্বর্গে রুক্নাবাদ স্ফটিকনির্ম্মলা,
বুলবুল-কাকলীপূর্ণ কোথা সেথা নিকুঞ্জ মোজেলা?
রে মোহিনী! রে নিঠুরা! রে সুন্দরী জ্বলন্ত মাধুরী!
চিরকাল তুই কি রে করিবি রে চিত্ত মোর চুরি!
আহত হৃদয় বিঁধি' জাগে তোর নয়ন অরুণ,—
তাতারের তীক্ষ্ণ শর নহে কভু অত অকরুণ।
হায়, প্রেম দিশাহারা-বৃথায় কাঁদিয়া শুধু মরে;—
বৃথা বহে দীর্ঘশ্বাস, বৃথায় নয়নে ধারা ঝরে!
চিরসুন্দরীর কাছে এ সকল মিথ্যা অর্থহারা,
যতই ফাটুক বুক—যতই ঝরুক্ আঁখিধারা!
তুলো না ভাগ্যের কথা, বীণাযন্ত্রে ধর অন্য সুর,
কর স্তব সিরাজের স্বচ্ছশোভা সুবর্ণ-সীধুর।
চলুক সুগন্ধগীত, কুসুমের উঠুক বন্দন,—
অলীক অনিত্য সব,—জীবন ত নিশার স্বপন।
গাহ প্রণয়ের গান, মজি' রহ আনন্দপাথারে,
যেও না খুঁজিতে মিছে রহস্যের অজ্ঞাত আঁধারে।
রে মোহন, ত্রিভুবন মুগ্ধ তোর অপূর্ব্ব সঙ্গীতে,
রে সুন্দর, সুর নর ফিরে তোর অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে।
সীমাহারা তোর শক্তি শ্রেষ্ঠ বীর তুই ধরাতলে,
স্বর্গের দেবতা আসি' পড়ে লুটি' তোর পদতলে।
রে চির-রহস্যময়ী, একি তোর নিদারুণ রঙ্গ,

হায় দীপ্ত বহ্নিশিখা,—হায় ক্ষুদ্র মানব-পতঙ্গ!
হে মোর তরুণী সাকি, ধর এই উপদেশকথা,
নবীনের মুগ্ধকর্ণে প্রবীণের অভিজ্ঞ বারতা।
সুস্বর সারঙ্গধ্বনি কানে যবে করে পরবেশ,
ফেনিল উচ্ছল সুরা চোখে আনে অপূর্ব্ব আবেশ,
মন্দ মন্দ সন্ধ্যাবায়ু বসোরার গন্ধ বহি' আনে,—
নিঃশেষে করহ ভোগ; নীতিকথা তুলিও না কানে।

নিঠুর বচন তব শুনিয়াছি আপনার কানে,—
তবু কত ভালবাসি—সে যে শুধু অন্তর্য্যামী জানে।
তীব্র অবহেলাপূর্ণ এত যে নিঠুর তব বাণী—
মধুর অধর হ'তে আসে তাই মধু ব'লে জানি।
অমিয়া নিঙ্গাড়ি' যেবা অধরের মধুর গঠন,
কেমনে ফুটিবে সেথা নিদারুণ পরুষ বচন?
সহজ কথায় রচা, সঙ্কোচে সন্দেহে ম্রিয়মাণ,
তোমারি উদ্দেশে প্রিয়া রচি' দিনু ছোট এই গান।
অনিপুণ হস্তে গাঁথা তুচ্ছ এই প্রবালের মালা
তোমার কোমলকণ্ঠে পরাইতে বড় সাধ বালা।
করুণ তরুণীদলে বলে বটে এরে মনোহর,
তোমারি পরশলাভে শুধু হবে সার্থক সুন্দর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগচী।

প্রিয় ও প্রেম।

পিয়া হ'তে পিয়া-প্রেম বড় গরীয়ান্,
পিয়া ত জীবন, প্রেম মরণ সমান!
পিয়া জাগরণ, প্রেম পুলক-স্বপন;
পিয়া শশী, প্রেম তার অমল কিরণ;
দোঁহাকার প্রেম থাক্ চিরদিন জীয়ে,
মাটীর তনুয়া যাক্ মাটীতে মিশিয়ে।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

সতী।

[শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর রচিত
ইংরাজী কবিতার অনুবাদ।]

হে মোর জীবন-দীপ, মৃত্যুর অধর
ফুৎকারে নিবায়ে দিল তোমার কিরণ;
আর না জ্বলিবে সেই আলোক সুন্দর।
কেন তবে বহি আমি আঁধার জীবন?

হে মোর জীবন-তরু, হৃদি-শিলাসার
মরণ চরণতলে দলিল তোমায়,
তোমার সে শোভারাশি ফিরিবে না আর।
বাঁচে কি কুসুম, যবে পাদপ শুকায়?

তোমার প্রাণের প্রাণ, মৃত্যু তীক্ষ্ণধার
ছিন্ন করি' ভিন্ন কৈল তোমায় আমায়,
এক মোরা, ভিন্ন তবু অসিমুখে তা'র।
থাকে কি এ দেহ, যবে আত্মা চলি যায়?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আরাম। *

"আরামে" হাস্য-গম্ভীর-রসাত্মক মোট একত্রিশটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই হাস্যরসাশ্রিত; বোধ করি, তজ্জন্যই বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিহাস-কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের নামে কবি এই কাব্যখানি উৎসৃষ্ট করিয়াছেন। উৎসর্গটি শোভন হইয়াছে। "উপহার"-পত্রে কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝা গেল যে, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালই এই কবিতা-মালিকাটির প্রসূন-নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

কাব্যারম্ভে একটি "মাঙ্গলিক" পাঠ করিলাম। সঙ্গীতটি "স্বদেশী" সঙ্গীত-গায়কগণ কণ্ঠস্থ করিয়া গান করিতে পারেন। এ পুস্তকে ইহা কোন্ হিসাবে সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত হইয়াছে, বুঝিলাম না। গানটি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। তবে, এ কাব্যে অপ্রাসঙ্গিক।

"মাঙ্গলিকে"র পরই কবি বলিতেছেন যে, তিনি "চারুস্বপ্ন এককালে" হেরিয়াছিলেন। সম্প্রতি "সত্য" তাঁহাকে "এহেন সংসারে জাগাইয়া" তুলিয়াছে। ইহার অর্থ বোধ করি এই যে, রসময় বাবু ইতিপূর্ব্বে গম্ভীররসাত্মক অর্থাৎ Serious—কবিতারই রচনা করিতেন; সম্প্রতি তিনি সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞ হওয়ায়, শুষ্ক জগতের নীরস ঘটনাবলি লক্ষ্য করিয়া, সত্যের খাতিরে পরিহাস-কবিতা-প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাই, "এককালে" যে "চারুস্বপ্ন"—"মহান ছবি" "মোহের ঘোরে" হেরিয়াছিলেন, এক্ষণে সে স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে; এবং তিনি বাস্তব-জগতের রীতি-নীতি দেখিয়া পরিহাস-কবি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু পুস্তকখানির শেষভাগে রসময় বাবুর "পুষ্পাঞ্জলি"র বিজ্ঞাপনটি না থাকিলে এই চারি ছত্রের অর্থবোধ হইত না।

বইখানির নাম "আরাম" রাখা হইয়াছে। এরূপ নূতন নাম পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ হইবে, এই আশঙ্কায় কবি স্বয়ং দুইটি কবিতা লিখিয়া পুস্তিকা-খানির চারি পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। এই কবিতাদ্বয়ের অধ্যয়নে এইটুকুমাত্র জানা যায় যে, আরামের অর্থ,—উপবন। আরাম অর্থ যে কানন, তাহা

* শ্রীযুক্ত রসময় লাহা প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

সকলে জানেন না বলিয়াই কবির এই সুদীর্ঘ প্রয়াস! এই দুইটি কবিতা নিতান্ত অনাবশ্যক, এবং বস্তুতঃই "—গঙ্গারামের" উপযুক্ত হইয়াছে।

অতঃপর "করুণা"য় পাঠকের প্রতি কবি কিঞ্চিৎ করুণা করিয়াছেন। ইহা একটি প্রকৃত হাসির কবিতা। কিন্তু, "অন্ধের হাতেতে টাকা নিতে" এই Stanzaটিতে রসিকতার অভাব ঘটিয়াছে। ইহা বাদ দিলে ক্ষতি ছিল না।

"উষার প্রতি"—Tenneysonএর Tithamus কবিতার অনুবাদ। কবিতাটি অনুবাদ হিসাবে মন্দ নহে।

"বিড়ম্বনা"য়—রসিকতার যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। কবিতাটি বেশ। কিন্তু, স্থানে স্থানে ছন্দঃপতন হইয়াছে। যথা—"অন্নপ্রাশন হ'ল যেদিন, দিদিমা নিয়ে কোলে" ইত্যাদি। "শৈশব স্মৃতি"—Wardsworthএর "Ode to Immortality" কবিতার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ শব্দানুক্রমিক হইলেও স্থানবিশেষে অর্থবোধ হয় না, অত্যন্ত দুরূহ অনুকৃতি। "আত্ম হত্যায়"—বিশেষত্ব আছে। রসিকতা সফল হইয়াছে। "চিত্রকরবেশী রাজা"—ভাবপ্রবণ কাল্পনিক কবিতা। "অযাচিত পদ-মর্য্যাদা তরে" রাণী "ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ"তর হইলেন, এবং ক্রমে "পতিপ্রেমে বাঁধা সে হেমলতা" ঝরিয়া পড়িল। শুধু একটা Sentimentএর চোটে এতখানি হওয়া অস্বাভাবিক; এবং সেই হিসাবে এ গল্পটি অপ্রীতিকর বোধ হইল। ইহাও ইংরাজীর অনুবাদ; কিন্তু, সে কথা কবি স্বীকার করেন নাই। অনুবাদ হিসাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

"পত্নী কোথা পাই?"—বেশ নূতন ভাব; সুপাঠ্য। তবে, ভাবী পত্নীর কথাটাই বারংবার বলা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ছন্দঃপতন ও পুনরুক্তিদোষ লক্ষিত হইল।

"প্রদোষে"—Serious রচনা। বিশেষত্ব নাই।

"সোজাপথ"।—চলন সই।

"স্রোতস্বতী"—স্বচ্ছ, তরল, অগভীর। প্রথম তিনটি শ্লোক (Stanza) সুমধুর। চতুর্থ শ্লোকটি অসংযুক্ত ও অনর্থক।

"ক্যাবলা ও হাব্‌লায়"—রসিকতার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এটি বিরক্তি-জনক। ছন্দ অত্যন্ত শিথিল ও ভগ্ন।

"পূজায় শঙ্কর"—ইহা শুদ্ধ হাসির কবিতা নহে, ইহার মধ্যে অন্তর্নীরা ফল্গুর মত একটি নির্ম্মল কারুণভাব নীরবে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কবিতাটি হাস্য ও করুণ রসের সংমিশ্রণে উপাদেয় হইয়াছে।

"চীনের পটে"—রসিকতা অত্যন্ত অস্পষ্ট। পাঠকেরা ভাবার্থ বুঝিবেন কি না, জানি না।

"অনুতাপ"—চমৎকার। এরূপ ধরণের হাস্যরসের কবিতা বাঙ্গলায় এই নূতন বলিতে হইবে। ইহাতে কবির মৌলিকতা আছে। গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সহসা এরূপ হাস্যরসের উচ্ছ্বাস উপভোগ্য।

"ভালবাসার চক্ষু নাই।"—

"লিপি যদি লেখে ভাবী প্রণয়িনী
মধু-ঢালা ভাবি' প্রণয়ী অমনি
না পড়িয়া সুখে আগে ধরে মুখে করিতে লেহন,
কারণ—সে অন্ধ, দুই চক্ষু বন্ধ জন্মান্ধ যেমন!"

পড়িলে হাসি পায় বটে; কিন্তু সে অন্য কারণে। বারবার শেষ ছত্রটির পুনরুক্তি করা ভাল হয় নাই। পংক্তিটিতে এমন কিছু নূতন সৌন্দর্য্য নাই।

"বিজনতা"—পড়িয়া পাঠকের মন "তিরপিত নাহি ভেল।"

"মাধুরীর প্রেম"—এক রসিক ও এক জন নৈয়ায়িক এই দুই জনে মাধুরী-নাম্নী একটি যুবতীর—"সকাশে যাইয়া দু জনে

কহিল—'মাধুরী আমাদের সনে
যেতে হবে আজি তব উপবনে।'
মাধুরী হইল রাজি!"

এই কয়টি ছত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, মাধুরী কুল-নারী নহে। অতএব, এই কবিতাটি যে জন্য লিখিত, সে উদ্দেশ্য—সে "রূপক" সার্থক হয় নাই। কুললক্ষ্মীদেরও পতিতার রুচিতে স্বর্গ-নরক প্রভেদ। সুতরাং, "রূপক"টি অন্য প্রকারে লিখিলে সুন্দর হইত।

"জন্মতিথি"—দুর্ব্বোধ।

"প্রত্যাবর্ত্তন"—করুণ কাহিনী। পড়িলে সহানুভূতিতে হৃদয় প্লাবিত হয়। পড়িয়া বিশ্ব-বিশ্রুত কবি Shelleyর সেই লাইনটি মনে পড়িল,—

"Our sweetest songs are those that tell of sadest thought".

"দম্পতি-সংবাদ"—বড় ভাল নহে। কবিতাটি মার্জ্জিত রুচির বিরোধী। শত বচসা হইলেও কোনও স্ত্রীর পক্ষে মৃত্যুর পরেও

"প্রেতিনী হইয়া ফিরিব তোমার পাশে,
বিছানায় তুমি সে ছায়া দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিবে ত্রাসে।"

স্বামীকে এমন কথা বলা, আদৌ রসিকতার পরিচায়ক নহে। ইহা অতিশয় অস্বাভাবিক ও গর্হিত হইয়াছে। এরূপ অতিরঞ্জিত বিসদৃশ কল্পনা অক্ষমতার পরিচায়ক, এবং কতকটা বালকোচিত।

"মাতালে" কোনও বৈচিত্র্য নাই। ইহার ছন্দও ত্রুটিপূর্ণ।

"সুখের সংসার"—এমনই বটে! খাঁটি কথা। লিখন-ভঙ্গী হাস্যোদ্রেক করিয়াছে। বিষয়টি চিত্তাকর্ষক।

"আলবোলা"—বিষয় ও বক্তব্যের তুলনায় একটু অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় রসিকতা তেমন জমে নাই। বিষয়টি উপভোগ্য বটে।

"ভিক্ষা"—অত্যুত্তম। প্রকৃত হাসির কবিতা ইহাকেই বলে।

"অদ্ভুত করুণা"—বাস্তব জীবনের একটি চিত্র। বেশ হইয়াছে।

"হিসাব"—মিলিয়াছে।

"কবির প্রতি"—নামের সহিত বক্তব্যের কোনও সংস্রব নাই। বক্তব্যটুকু কিন্তু মর্ম্মান্তিক।

"শেষ"—কিছু হয় নাই।

"শেষোক্তি"—ভাল। ইহাতে কবির সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, কবিপ্রিয়া কবিকে যতটা সহজে "চোর" বলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন, সাধারণে ততটা পারিবে কি না, সন্দেহ। কবির চুরি করিবার প্রবৃত্তিটা "মুগ্ধা" ইতিপূর্ব্বে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। অন্যথা, এ চুরি বিলাতী চুরি, সহজে ধরিবার সাধ্য নাই।

কাব্যগত প্রত্যেক কবিতার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। এক্ষণে, সংক্ষেপে কাব্যের গুণাগুণের বিচার করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাব্যখানিতে হাস্য-গম্ভীর উভয়বিধ রসের কতকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "প্রত্যাবর্ত্তন" ও "কবির প্রতি" এই কবিতা দুইটি গম্ভীররসাত্মক কবিতানিচয়ের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং হাস্যরসের কবিতাগুলির মধ্যে "অনুতাপ", "ভিক্ষা", "পূজায় শঙ্কর", "আত্ম-হত্যা", এই চারিটি মনোরম। আরও কতকগুলি কবিতা সুখ-পাঠ্য; কিন্তু, সেগুলির রচনায় বিবিধ ত্রুটি দৃষ্ট হওয়ায়, পৃথক্‌ভাবে তাহাদের আর নামোল্লেখ করিলাম না।

কাব্যখানিতে রসময়বাবুর ক্ষমতার পরিচয় প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। কবির রসিকতার নূতনত্ব এই যে, তাহা প্রথমে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অতি সুমধুর ছলনায় পাঠককে গম্ভীর করিয়া তোলে; কিন্তু, পরমুহূর্ত্তেই, সহসা

চকিতে স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া, পাঠককে হাস্যামোদে বিহ্বল করিয়া ফেলে। এ শ্রেণীর হাসির কবিতা বঙ্গভাষায় যে অভিনব, এ কথা বোধ হয়, অত্যুক্তি না করিয়াও বলা যাইতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যে হাস্যোদ্দীপক কবিতার প্রবর্ত্তক—রসরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁহার রচনায় অশ্লীলতা দেখা যায়। শ্লীলতা ও রসিকতার একত্র সমাবেশ, প্রাচীনকালের কথা দূরে থাক, এ কালেও দুর্ল্লভ না হউক, বিরল। একালে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল নির্দ্দোষ রসিকতাকে সারল্যের শুচি-শুভ্র পরিচ্ছদে ও উজ্জ্বল অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সহচর সার্থকনামা রসময় বাবুর লেখাও সুমার্জ্জিত, নির্ম্মল।

কিন্তু, কাব্যখানির রচনায় যে ত্রুটি নাই, এ কথা বলা যায় না। রসময় বাবুর কাব্যের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান দোষ,—ছন্দঃপতন। পুস্তকস্থ কতকগুলি কবিতা এই দোষাক্রান্ত। কাব্যের দ্বিতীয় দোষ,—কষ্টকল্পনা। পুস্তকখানির অনেক স্থলেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ "দম্পতি-সংবাদ", "সোজাপথ", "হাবলা ও ক্যাব্‌লা" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এ কবিতাগুলি পড়িলে স্বতঃই এই মনে হয় যে, কবি যেন রসিকতা করিতে হইবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকলের মধ্যে রসিকতার যাহা জীবনীশক্তি,—অর্থাৎ, একটা অনায়াসগতি ও স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা, তাহার একান্তই অভাব। এ অভিযোগ যথেষ্ট লঘু না হইলেও, আশা করা যায় যে, ক্রমশঃ কবির এই অক্ষমতা ঘুচিয়া যাইবে; এবং কালে বঙ্গদেশ যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ অকলঙ্ক যশঃসম্পদে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে পারিবে।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

সহযোগী সাহিত্য।

শিশুর অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

জানুয়ারী মাসের Pearson's Magazine পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন,—১৯০৪ সালে যে সকল শিশু অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা এক বৎসরের ন্যূনবয়স্ক, কেবল তাহাদেরই সংখ্যা,—১৩৭,৪৯০ জনের কম নহে। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে, ইহার অর্দ্ধেক শিশু এমন সকল কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে যে, সে কারণ চেষ্টা করিলে সহজেই বিদূরিত হইতে পারিত। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "যে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইতেছে, তাহা

প্রত্যেকেরই চিন্তা করিবার বিষয়; ইহা ভাবিতে গিয়া একদিকে যেমন হৃদয় অবসন্ন হয়, অন্যদিকে মনে হয়, ইহা কম কৌতূহলোদ্দীপক নহে। সমস্ত মনুষ্যজাতির শুভাশুভ ইহার দ্বারা বহুল-পরিমাণে অনুশাসিত হইতেছে।"

"এক বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুদিগের অকালমৃত্যু যেমন এক দিকে অধিক হইতেছে, অন্য দিকে সেই সঙ্গে জন্ম-তালিকাও দিন দিন হ্রাসের দিকেই কেন যে এত নামিয়া যাইতেছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে এই প্রতীতি হয় যে, জাতীয়তার হিসাবে আমরা অধোগতির পথে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছি। এই অধোগতি, ঠিক সেই অধোগতি,—যাহাতে গ্রীস ও রোমের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। দেশে মানুষ ছিল না, মানুষের অভাবে এমন বিশাল সাম্রাজ্য কোথায় অন্তর্হিত ও অদৃশ্য হইয়া গেল!"

সম্পাদক মহাশয় তার পর অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এত অকালমৃত্যুর কারণ কি, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে খুব সম্ভবতঃ ইহা নিবারিত হইতে পারে। বড় বড় লেখকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এক বৎসর বয়সের অতিক্রম না করিতেই খুব কম হইলেও প্রতি ৭ জন শিশুর মধ্যে এক জন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সার উইলিয়ম ব্রড্বেণ্ট বলিয়াছেন—"শৈশবে স্কার্ভি নামক রক্তদোষ ও রিকেট নামক অস্থিগত বালরোগ যে যে কারণে সমুৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে কুৎসিত দুগ্ধ, কৃত্রিম খাদ্য ও পিতৃজ ও মাতৃজ ব্যাধির প্রাবল্যই অধিকপরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। শৈশবে অকালমৃত্যু কতক পরিমাণে এই জন্য ঘটে। তার পর দ্বিতীয় কারণ, শনিবারে রবিবারে মদ খাইয়া মাতাল অবস্থায় শয্যায় সন্তানের উপর চাপিয়া শয়ন করিয়া মা শত শত শিশু মারিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত আর একটি কারণ, অর্দ্ধাহারে, নিদারুণ পরিশ্রমে, ভগ্নদেহ জননী যে সন্তান প্রসব করেন, সে সন্তান স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হইয়া জন্মে; তাহার অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক নিন্দনীয় হইতেছে, আপন শ্রী নষ্ট হইবার আশঙ্কায় জননী সন্তানকে একেবারেই স্তন্যপান করিতে না দেওয়া। স্তন্যের অভাব দুগ্ধের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বড় বড় সহরের কুলি মজুর দরিদ্রলোকের পক্ষে ছেলেকে দুধ কিনিয়া খাওয়ান একবারেই অসম্ভব। তার পর দরিদ্রগ্রামে যে দুগ্ধ মিলে, তাহা হয় বাসী, না হয় মাখন-তোলা, পাছে টকিয়া বা দুর্গন্ধ হইয়া যায়, এই জন্য সোডা প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া; আবার সে দুধ হজম করা শিশু কেন, সকলের পক্ষেই ভয়ানক কঠিন।"

এই অকালমৃত্যুতে কি করিয়া সমগ্র জাতি ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, রেজিষ্টার-জেনারল যে 'রিটার্ণ' দাখিল করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, সমস্তই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহার শেষ বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৮৯১ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ওয়েল্সে, খুব কম করিয়া ধরিলেও, মোট অকালমৃত্যুর সংখ্যা হাজারে ১৫৪ জন। এই সঙ্গে জন্ম-সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। ১৯০৪ সালে এই দুই দেশে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা কি পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহা ভাবিলে বুক কাঁপিতে থাকে! হাজার করা মৃত্যু-সংখ্যা ২২৯।

লিভারপুলের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ডাক্তার হোপ এ সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ মৃত্যু-

সংখ্যা কত, তাহা ঠিক করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যে বাড়ীতে শিশু অকালমৃত্যুতে পতিত হইয়াছে, এমন পর পর ১০৮২ ঘর লোকের মধ্যে যে সংখ্যক শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহার মোট সংখ্যা ৪৫৭৪। কিন্তু ইহার মধ্যে ২২২৯ জন শিশু যথার্থ শৈশবে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে, হাজার করা ৪৮৭। সচরাচর যাহা ঘটে, ইহা তাহার ৫ গুণ অধিক।

ইহা ব্যতীত ১২ ঘরের কথা আরও ভয়াবহ। সর্ব্বশুদ্ধ এই কয়েক ঘরে ১১৭ জন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার মধ্যে ৯৮ জন ঠিক শৈশবেই মারা পড়ে।

এ বিষয়ে যত প্রকার কারণই নিরূপিত হউক না কেন, কদাহারে যে মৃত্যুসংখ্যা অতিরিক্ত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। শিশুর অকালমৃত্যুনিরোধের ব্যবস্থা-বিধান, আর কি করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ সংগ্রহ হইতে পারে,—তাহার উপায়-পরিচিন্তন, একই কথা। এ দেশে দুগ্ধদোহন যে প্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়, এক জন তাহার বর্ণন করিতে গিয়া রসিকতার সহিত বলিয়াছেন,—'খাঁটি জিনিসকে কি করিয়া মাটি করিতে হয়, ইহা তাহারই বিজ্ঞানসঙ্গত অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত।' বাস্তবিকই ভাল ভাল গোশালাতেও দুগ্ধের মত এমন পুষ্টিকর তরল পদার্থ যখন ময়লায় পরিপূর্ণ দেখি, তখন সে দুঃখের কথা আর কাহাকে বলিব।

ভারতবাসী বড় বড় ডাক্তার এই কৃত্রিম খাদ্য এ দেশে চালাইয়া দেশের কি সর্ব্বনাশ না করিতেছেন!

নানারকম বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া ইউনাইটেডষ্টেটের চেষ্টায় সহরের মিউনিসিপ্যালিটি যে খাঁটি দুগ্ধ যোগান, তাহা কেমন খাঁটি শুনিবেন?—নমুনার দুগ্ধ পরীক্ষা করা হইলে দেখা গেল, তাহার এক কিউবিক সেনডিমিটারে ১৪,০০০ ব্যাক্‌ট্রিয়া বিরাজিত! সহরের দুগ্ধে সেইরূপ পরীক্ষায় পাওয়া গেল ২৩৫,০০০।

তাই বলিতেছি, বিলাতে খাঁটি দুগ্ধ কোথায়? খাঁটি দুধ পাওয়া গেলে শিশুর অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ ত সহজেই দুরীভূত হইত। যাহাতে তাহা পাওয়া যায়, তাহার উপায় অবধারণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গোদোহনের পূর্ব্বে বৎসকে স্তন্যপান করিতে দিলে ব্যাক্‌টিরিয়ার সংখ্যা কম হয় কি না, পরীক্ষা করা উচিত।

তার পর দ্বিতীয় উপায়,—জননী যাহাতে নিজে সন্তানকে স্তন্যপান করাইতে পশ্চাদপদ না হন তাহার বিধান। শ্রীর হানি হইবে, এ কি একটা কথা! যেখানে রূপলালসায় জননীরা আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত, সেখানে জোর করিয়া (সামাজিক শাসনে) তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, জননীর দায়িত্ব কি? সে দায়িত্ব পালন না করিলে শাস্তিভোগ করিতে হয় কি না? এই জন্য এখানে 'ন্যাশানাল লীগ' নামে একটি সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল সমিতি নহে, এমন সকল গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইতেছে যে, যাহাতে লোকে সহজেই আপন কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে।

ইংরাজাগমনের পূর্ব্বে ভারতে শৈশবে মাতৃস্তন্যেই অধিকাংশ শিশু প্রতিপালিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষেও যাহাতে এইরূপ শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, আজ কাল তাহার বিধান করা আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। যে বিদেশী দুগ্ধ লইয়া এত ঘোরতর আন্দোলন, জানি না, এ দেশের খ্যাতনামা ডাক্তারগণ কি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সন্তানকে মাতৃস্তন্য ছাড়াইয়া সদ্যোজাত গো-দুগ্ধ না খাওয়াইয়া স্বদেশী শিশুর কণ্ঠে সেই বিষ ঢালিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর!

Condensed দুগ্ধের ও কৃত্রিম খাদ্যের যে এখানে এত কাট্‌তি, তাহার পরিণাম এই দাঁড়াইতেছে যে, ভারতের গোবংশ ধ্বংসপ্রায়। বড়লোকের বাটীতে চিকিৎসা করিবার সময় ভারতীয় চিকিৎসকগণ এই বিদেশসমাগত দূষিত খাদ্য ও দুগ্ধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া যদি জোর করিয়া বলেন, "একটি সবৎসা ভাল গাভী কিনিয়া আনুন, রোগীর পথ্য তাহার দুগ্ধে নিষ্পন্ন করিতেই হইবে", তাহা হইলে চিৎপুরের গাভী সকল গয়লার গৃহে যায় কি? গয়লার গৃহে ফুকা দেওয়া সম্পন্ন হইলে সেই গাভী কশায়ের হাতে রাজপথে এরূপ লাঞ্ছিত হয় কি? কি হৃদয়ভেদী দৃশ্য! অধঃপতিত হিন্দুজাতির উপর অভিসম্পাত করিতে করিতে গাভীগণের অশ্রুপূর্ণলোচনে বধ্যভূমির দিকে যাত্রার কথা মনে পড়িলে হৃদয় অস্থির ও অবসন্ন হয়।

যে দেশে 'দুধি ভাতি' খাইয়া লোক দীর্ঘজীবন লাভ করিত, সেই দেশে যে এত অকাল-মৃত্যু,—আমাদের মনে হয়, ইহার প্রধানতম কারণ,—এই সম্পূর্ণ পুষ্টিকর, স্বভাবজাত, শিশু ও বৃদ্ধের সৎপথ্য দুগ্ধের অসদ্ভাব। পিতা মাতা কয় জন সন্তানকে পেট ভরিয়া দুধ খাইতে দিতে পারে, টাকায় ৬ সের জলো দুধ দেশের সর্ব্বত্র। কোথায় ২০ সের খাটী দুগ্ধ, আর কোথায় অর্দ্ধেক (অতি কুৎসিত অপরিষ্কৃত) জল মিশান ৬ সের দুগ্ধ। দুগ্ধের এত অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কারণ গোজাতির অবনতি।

গোজাতির ধ্বংসের উপস্থিত তিনটি কারণ প্রবল বেগে কার্য্য করিতেছে। ১ম,—ডাক্তারগণের বিদেশী পথ্যের গুণাগুণ বিবেচনা না করিয়া অন্ধভাবে তাহারই ব্যবস্থা। সুতরাং দুগ্ধের জন্য গৃহস্থকে ব্যস্ত হইতে হয়। ডিস্‌পেন্‌সারী হইতে বাক্‌ট্রিয়া-পরিপূর্ণ বিদেশী খাদ্য নির্দ্দোষ বলিয়া কিনিয়া আনিলেই হইল।

২য়,—গোমাংসের জন্য গাভীর বলিদান। ইউরোপে আমেরিকায় বৃষ-মাংস উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়; আর এই দুর্ভাগ্য দেশে যবনদিগের অসৎ দৃষ্টান্তে, পাঁটার মাংসের মত গাভীর মাংস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক জন দরিদ্র দুগ্ধব্যবসায়ী রাস্তায় যাইতে যাইতে দুঃখ করিয়া বলিতেছিল, "দুধের এমন দুরবস্থা কেন শুনিবে? কলিকাতায় যে গাভী বিক্রয়ার্থ আসিতেছে, তাহা আর ফিরিয়া যাইতেছে না। এক বৎসর না যাইতেই উদরসাৎ হইয়া যাইতেছে।" কি ভয়ানক কথা! চিৎপুর গো-হাটায় সুন্দর সুন্দর পশ্চিমে গাই এত যে আসে, আহা! তাহাদের পরিণাম কি কোন হিন্দু চিন্তা করেন?

পাষণ্ডেরা দেশ কুড়াইয়া গরু আনিতেছে,—কেন? জিজ্ঞাসা কর। অভিসম্পাতের দুই হস্ত তুলিয়া ঐ শুন হিন্দুজাতিকে দেবী ভগবতী কি বলিতেছেন। শিশুর অকালমৃত্যুতে আমাদের প্রতি গৃহে প্রতি পল্লীতে যে এত হাহাকার উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া—মশা তাহার প্রকৃত কারণ নহে, প্রকৃত কারণ এই অভিসম্পাত।

শিশু প্রাণ ভরিয়া দুধ পায় না, দাঁত না উঠিতে ভাত ধরে,—দুধের অভাবে বার্লি খায়, মুড়ি খায়, চালভাজা খায়, গুড় খায়। কেবল শ্বেতসার চিনি খাইলে, চিনি শ্বেতসার হজম করিতে পারে,—এমন মানুষের চোখেই ছানি পড়ে; কুকুর কাণা হইয়া যায়; তা ক্ষুদ্র শিশু! শ্বেতসার starch ভাল করিয়া হজম করিবার শক্তি হয় নাই, তখন দুধের অভাবে যদি ভাত দেওয়া হয়, তাহা হইলে শিশু অন্ধ না হউক, এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, মশায় কামড়াইলে সে মরিয়া যায়। শুধু ম্যালেরিয়া কেন,

সহজেই তাহাকে যে কোন রোগ আক্রমণ করে। কেবল মশায় ম্যালেরিয়া আনে তাহা নয় Slow starvation এ মশা উপলক্ষ মাত্র।

এখন তৃতীয় কারণ কি তাই বলিতেছি ;—চতুর্দ্দিক বেড়াইয়া দেখ, দেখিবে, দেশে ষাঁড় নাই। সমস্ত ষাঁড় মিউনিসিপ্যালিটীর গো-থানায়। ধর্ম্মের ষাঁড় ময়লার গাড়ী টানিয়া আমাদের পিতৃভক্তির শ্রাদ্ধ করিতেছে। গাভী পূর্ব্বে বুক সমান উচু ছিল, এখন কোমর সমান। আগে গরু ৩।৪ সের দুধ দিত, এখন দেয় দেড় পোয়া, আধ সের। গাভী এখানে মানুষের মত অবনত হইয়াছে। Pearson's magazine পত্রিকার সম্পাদক যেমন বলিয়াছেন, দেশে মানুষ ছিল না তাই এমন সাম্রাজ্য রোম ও গ্রীস, জাহন্নমে গেল, আমরাও তেমনই আজ সাশ্রুনয়নে সকাতরে বলিতেছি— "As a nation we are slipping down that precipice of degeneracy that brought destruction on the Empires of Greece and Rome. Men were wanting and for the want of men those Empires perished. !! দেশে চিন্তাশীল প্রকৃতি স্বদেশবৎসল, আত্মত্যাগী লোক নাই, তাই আমাদেরও এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। এখন আমরা কাণে দেখি, কাণে ভাবি, সাহেবেরা যাহা বুঝায় তাই অমৃততুল্য মনে করি ; দেশ কোথায়, আমরা কোথায়, দেখিও না ভাবিও না। কাণের উপর নির্ভর করিয়া চক্ষু ও মস্তিষ্ককে আমরা চিরবিদায় দিয়াছি। দেশের উন্নতির তরণী অধোগতির স্রোতের অনুকূলে সজোরে সবেগে বাহিয়া লইয়া চলিয়াছি।

মার্কিন মহিলার অপযশ।

বিলাতের "Grand Magazine" নামক পত্রে ডাক্তার Emil Reich "ইতিহাসে নারী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটিতে লেখক মনোজ্ঞভাবে পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান জাতি-গুলির স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্নজাতীয় নারীর-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ, তাহা "সাহিত্যে"র পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা প্রবন্ধটির সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

লেখক বলেন, ফরাসী-স্ত্রী উৎসাহময়ী ও যুক্তিপরায়ণা, এবং তাঁহার কৃত্রিমতার প্রতি বিরাগ, ইংরাজ-মহিলার অপেক্ষা অধিক। জর্ম্মণ-নারীতে ইংরাজ ও ফরাসী উভয় জাতীয় স্ত্রী-প্রকৃতি বর্ত্তমান। বার্লিনের "নব্যাঙ্গনা" নারীত্ব হারাইয়াছে। ডাক্তার Reich ইংরাজ-মহিলাদিগের কতকগুলি দোষের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ফরাসী ও আইরিশ স্ত্রীলোকের গুণাবলী যদি ইংরাজ-রমণীতে একাধারে সন্নিবিষ্ট হয়, এবং তাহারা যদি আর একটু কর্ম্মপরায়ণা ও শক্তিমতী হয়, তাহা হইলে বড়ই সুখের হইবে।

কিন্তু, মার্কিন-সুন্দরীগণের সম্বন্ধেই ডাক্তারের অভিমত বিশেষ চিত্তাকর্ষক। তাঁহার নিজের কথা এই, —

"আমার মতে,—এবং ইহাই আমার অভ্রান্ত বিশ্বাস,—মার্কিন-রমণীতে নারীসুলভ গুণ নাই সে নারী নামের যোগ্যই নয়।"

"আমেরিকায় স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির উপর প্রভুত্ব করে। পুরুষ সেখানে কিছুই নয়। আমে-

রিকার শেষ পুরুষ কলম্বস্। আজ আর পুরুষের অস্তিত্ব নাই। সেখানে পুরুষ বৈঠকখানায়, কথা কহিতে পায় না,—সে যেন "কাণা বিন্তি" খেলার কাণা। স্ত্রী এক ভাবে জীবনযাপন করে, পুরুষ আর এক ভাবে,—পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নারীর জীবন কেবল সুসময়ের জন্য কেবল "মজা"য় থাকিবার জন্য। আমি তাহাকে দোষ দিতেছি না,—তাহাকে তিরস্কার করিতেছি না। পুরুষে তাহার মন নাই। সে একলা থাকিতে চায়; এবং একলা থাকিতে গেলেই, আজ রসায়ন, কাল প্রাণিতত্ব, পরাহে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, এবং তদনন্তর তারহীন বার্ত্তাবহ, অথবা মেরী করেলির উপন্যাসের প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞান, দর্শন ও গণিতের দু' চার পাতা উল্টাইয়া, সে ভাবে,—সব শিক্ষা সাঙ্গ হইল, আর সে 'অবলা' নহে। মনে করে, সে 'একটা নূতন কিছু' হইল। একটা অভিনব আন্দোলন, কোন অসাধারণ কাজ, একটা খুব নূতন ধরণের কিছুর প্রতি কি প্রবল অনুরাগ! তখন তাহার মতে, Aspasias, Gretcheus, Ophelius প্রভৃতি নিতান্ত 'সেকেলে';—আর চলে না। সদ্যোজাত মানব-শিশুর মত সে যেন একান্ত নূতন। পঁচিশ না পার হইতেই তার জীবন অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু, মার্কিন-নারী কি সুন্দরী! জগতে তেমন বর্ণ আর কই? ইউরোপের অন্য সকল রমণীর বর্ণ তাহার কাছে পরাজিত। তাহার দেহখানিও সুগঠিত ও কমনীয়। Kentucky ও Massachusettsএ মার্কিন রমণীর সুন্দর নমুনা দেখিতে পাইবে। ইংরাজ-ললনার সহিত তাহার কোনও সাদৃশ্য নাই; সে কৌলীন্য-গর্ব্ব বা পারিপাট্য লইয়া থাকে না; শুধু মুখের কথায় সে পুরুষকে বশ করিতে চায়,—বাক্য ছাড়া আর কিছুতে না। তাহার বাসনা নাই, প্রেমানুরাগ নাই—এ সব তাহার কাছে অপরিচিত বস্তু। তাহার নিকট গৃহ-সংসার বা স্বামী কিছুই নয়,—নিজের শিশুসন্তানের প্রতিও তাহার তেমন মায়া নাই।"

লেখকের মতে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্পার্টার অঙ্গনাও এই মার্কিন নারীরই মত। রোমের কামিনীও এইরূপ ছিল। তিনি বলেন, বড় বড় সাম্রাজ্যে নারীর অবনতির দিকেই স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, ইহার ফলে সাম্রাজ্যেরও বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

একখানি অভিধান।

অধ্যাপক Joseph Wright একখানি বিরাট অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। অভিধানখানির নাম—"English Dialect Dictionary", অর্থাৎ ইংরাজী প্রাদেশিক ভাষার অভিধান। কোনও বিলাতী পত্রিকায় এতৎ-সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

এই অভিধানের সঙ্কলনে অধ্যাপকের নয় বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রথম খণ্ড ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, এবং শেষ খণ্ড গত বৎসরের (১৯০৫) অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপকের বয়স এখন পঞ্চাশ বৎসর। বিস্ময়ের বিষয়, তিনি যথাসময়ে শিক্ষালাভের অবকাশ পান নাই। শৈশবে, সাত বৎসর মাত্র বয়স হইতে তাঁহাকে সপ্তাহে সাত সিকা বেতনে একটি কলে কাজ করিতে হইত। যৌবনের প্রারম্ভেও তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা হয় নাই। কিন্তু, জীবিকার জন্য প্রত্যহ নয় ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও, তিনি বর্ণপরিচয়ের আট বৎসর পরে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরে তিনি

Oxfordএর আচার্য্য মোক্ষমূলরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত অভিধান-খানিতে এক লক্ষ শব্দ ও প্রায় পাঁচ লক্ষ উদ্ধৃত বাক্য ও দুরূহ শব্দের অর্থোল্লেখ আছে।

বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে যত কিছু প্রাদেশিক শব্দ প্রচলিত ছিল, এবং আছে, তৎসমুদয়ই এই অভিধানে সংগৃহীত হইয়াছে; অধিকন্তু, আমেরিকা বা উপনিবেশসমূহের যে সকল কথা বিলাত ও আয়ারল্যাণ্ডে চলন হইয়াছে, সে সকলও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। দেশ-বিশেষে যে সকল লিখিত ও কথিত শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাও ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। কি বিপুল অধ্যবসায়! কি নিরলস সাধনা!

এই অভিধানে বহুল প্রবাদ, নানা স্থানের সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার, গ্রাম্য ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদের উল্লেখ আছে। এই অমর গ্রন্থের প্রচারকল্পে বিংশ সহস্র পাউণ্ড (এখনকার হিসাবে তিন লক্ষ টাকা) ব্যয় হইয়াছে। বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে, এই ব্যয় অল্প মনে হয়। তাহার কারণ, মুদ্রিত হইবার ছয় মাস পূর্ব্বে, ইহার পাণ্ডুলিপি সহকারী সম্পাদকের দ্বারা সযত্নে পরীক্ষিত হইয়াছিল। ইহার ফলে, মুদ্রণের সময়ে গ্রন্থকারকে বেশী ভুল সংশোধন করিতে হয় নাই। অধ্যাপকের সহধর্ম্মিণীই সহ-সম্পাদিকা ছিলেন। এবং, এই গ্রন্থ-রচনে অধ্যাপককে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উচ্চ বেতনে নিযুক্তা বিদুষী মহিলা। দৈনিক সংবাদপত্র যেমন যথাসময়ে প্রকাশিত হয়, এই অভিধানও তদ্রূপ বিজ্ঞাপিত সময়ে প্রচারিত হইয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "দেশে কলার বিস্তার" নামক সুবিস্তৃত প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগ "উপায়;—উৎপাদন" এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে লেখক যথেষ্ট গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের পরামর্শ ও উপদেশ এই যে,—"আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের সুপবন প্রবাহিত না করিলে আশানুরূপ ফলের আশা নাই। কারণ, এমন কলা কি আছে, যাহাতে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই, কিংবা যাহার বিজ্ঞানচর্চ্চা ব্যতীত উন্নতি সম্ভাবিত হইতে পারে।" ইহার প্রত্যেক বর্ণ সত্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে? দুর্ভাগ্যক্রমে যাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাহাতেও আমাদের অনুরাগ নাই; জাতীয় জীবনের উৎকর্ষবিধানকল্পে যাহার অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাও সুসম্পন্ন করিবার আমাদের শক্তি নাই। বিজ্ঞানের আরাধনায় যে অধ্যবসায় ও একাগ্রতা আবশ্যক, জাতীয় চরিত্রে তাহার সংস্থান নাই। যে উদ্যোগ, যে অর্থরাশি, যে স্বার্থত্যাগ নহিলে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা একেবারে অসম্ভব, এ দেশে তাহা মরু-মরীচিকা,—নিশার স্বপ্ন! আমাদের জরাজীর্ণ, জীবনীশূন্য, অকর্ম্মণ্য সমাজে বিজ্ঞান-ভারতীর পূজার

উপকরণ নাই। বিজ্ঞানসম্মত কলা-শিক্ষার সুব্যবস্থার আশা, সুতরাং আকাশপ্রসূনের ন্যায় মনে হয়। এ দেশে এক 'কলা'র প্রসার আছে, এবং বিজ্ঞানের আরাধনা না করিয়াও সোনার বাঙ্গলায় সেই সনাতনী গলাবাজী কলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। কণ্ঠের কলরবে যদি ভারত জাগে ত জাগুক; খবরের কাগজে লিখিলে ও সভা করিলে যদি দেশের শিল্প বাঁচে ত বাঁচুক; কাগজে-কলমে বড় বড় কল্পনার খশড়া করিলে যদি দেশে নূতন শিল্পকলার উদ্ভব হয় ত হউক;—আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যাহাতে শক্তি আবশ্যক, ত্যাগ অপরিহার্য্য, তাহা এ দেশে চিরকাল অসম্ভব হইয়াই থাকিবে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ফারসী ইতিহাসের সাগর মন্থন করিয়া "কবি-বচন-সুধা" সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, ইহাতে "গৌড়জন * * আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" লেখক সূচনায় লিখিয়াছেন,—"ফারসীতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবির উক্তি আছে। * * * আজ যাহা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল, তাহা এ সব কবিদের প্রসিদ্ধ লেখা হইতে লওয়া হয় নাই, এবং সাধারণের কাছে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নূতন। এগুলি ফারসী ইতিহাস হইতে তোলা; এবং যে ঘটনার সংস্রবে এই সব কবিতা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার একটু বর্ণনা দেওয়াতে ইতিহাসপ্রিয় পাঠকের নিকট ভাল লাগিবে, এবং অন্য সব কবিতা হইতে একটু বিশেষত্ব ও প্রভেদ রক্ষিত হইবে।" অনুবাদকের সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। এক বিন্দু কবি-বচন-সুধা আমরা পাঠকের জন্য আহরণ করিলাম;—

> "ভাগ্য আর বাতাসের একই আচরণ,
> বায়ু খোলে কলিকার মুখ-আবরণ
> কত স্নেহে! তার পর দুই দিন গেলে
> উদ্যান-ধূলায় সেই ফুলে পায় ঠেলে!"

লেখকের গদ্যে "পাঠকের নিকট ভাল লাগিবে"—প্রভৃতি জড়তা আছে, কিন্তু পদ্য অনুবাদে সে দোষ নাই। অনুবাদের ভাষায় প্রবাহ ও প্রাণ আছে, তাই কবিতাগুলি বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হতভাগা" নামক কবিতাটি পড়িতে পড়িতে সহৃদয় পাঠক অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিবেন না। কবিতাটির আদ্যোপান্তে সমবেদনা ও করুণার উচ্ছ্বাস; তাহা যেমন সংযত, তেমনই স্বাভাবিক। যে কবি এই দুঃখময়ী পৃথিবীর চিরদৈন্য সহৃদয়তার অশ্রুজলে পূত ও স্নিগ্ধ করিতে পারেন, তিনি ধন্য! শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভ্রমণে" যদিও বিশেষত্ব নাই, তবু সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু লেখকের নিজের কথা ও ঘরের কথা বড় বেশী। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "স্বতঃ-জনন" সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। বুঝাইবার প্রণালী জটিল না হইলে রচনাটি আরও সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ হইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষাবিন্যাসে বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী "কেন ভালবাসি" নামক কবিতায় যে পবিত্র গার্হস্থ্য ভাবের স্তব-গান করিয়াছেন, তাহা এই 'জোছনা' ও 'চাঁদিনী', 'কুহু কুহু' ও 'উহু উহু' প্রভৃতির অত্যাচারে জীবন্মৃত, সৌখীন প্রেমাভিনয়ের উত্তেজনায় হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত পাঠক-পাঠিকার পক্ষে বাস্তবিকই স্বাস্থ্যপ্রদ মহৌষধ বলিয়া মনে হয়। কবিত্বের মাত্রা অল্প হউক, ভাবের শুচিতায় সে ন্যূনতা পূর্ণ হইয়াছে। সাধু যাহার উদ্দেশ্য, তাহার সাত খুন মাপ। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার ঘোষ তাঁহাদের ছাপাখানার মক্কা-প্রত্যাগত খাজাঞ্চী বাবুর প্রমুখাৎ মক্কার বিবরণ শুনিয়া "মক্কাযাত্রা" নামক

সুখপাঠ্য তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ-বিবরণ লিখিয়াছেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াও এরূপ লিখিতে পারেন না। রচনাটি রমণীয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সুস্বপ্নে" দেখিলাম,—

"অন্নবিহীন নিঃস্ব : চিনেছে বিত্ত স্ব স্ব,
দেখুক অদ্য বিশ্ব চিত্ত বিগতভয়!"

ইহা কি কবিতা? কবিতার এই দুঃস্বপ্নের পর চারুবাবুর "মাতৃযজ্ঞ" নামক আর একটি কবিতা আছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, সে জন্য তিনি ধন্যবাদভাজন। কিন্তু কেবল বিষয়ের গৌরবেই ছন্দোবদ্ধ 'বাক্য' কবিতায় পরিণত হয় না; সঙ্কল্পের সাধুতাই সব সময়ে কবিত্বের নির্ঝরিণী বা কবিতার প্রসূতি হয় না;—এই স্বদেশী ভাবের প্লাবনের সময় 'স্বদেশী' কবিতা উপলক্ষ করিয়া এ কথা বলিতে কষ্ট হয়, কিন্তু কথাটি অত্যন্ত সত্য। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের "দুঃখিনী" সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? এমন সার্ব্বভৌমিক ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেই বা ক্ষতি কি? হৃদয়ের তটে আজ যে ভাব আঘাত করিতেছে, তাহা যে প্রত্যেক কবিতায়—প্রত্যেক আত্মবিকাশে সফল হইবে, এমন আশা করা যায় না। যাঁহারা মাতৃপূজার জন্য রাশি রাশি কবিতা ও গানের সম্ভার লইয়া সারস্বতকুঞ্জে উপস্থিত,তাঁহাদের বন্দনা করিয়া বলি, আজিকার বিফল চেষ্টা কাল সফল হইতে পারে। হাসি বাঁশী এখন চুলায় যাক, শিকায় তোলা থাক; আপনারা যে যে সুরে পারেন, মার নামগান করুন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "টিয়ে চন্দনা" নামক কবিতায় কবির স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি নাই। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাজপুতানী" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি রমণীয়। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে ফুলার সাহেবের মন্তব্য" নামটি যেরূপ সুদীর্ঘ, প্রবন্ধটি সেরূপ যোজনপ্রমাণ নয়। যাঁহারা সংস্কৃতশিক্ষার অনুরাগী, বা পক্ষপাতী, এই "বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি"টি তাঁহাদের কাজে লাগিবে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রবাসীর স্বদেশী ভাবের হাটে যে ছয়টি কবিতা লইয়া বেসাতি করিতেছেন, তাহার একটিতে দেখিলাম,—কবি মাতৃভূমিকে বলিতেছেন,—

"হাসিতে হাসিতে
প্রাণ দিতে পারি তোর অরাতি নাশিতে!"

কিন্তু প্রিয় কবি যদি ক্ষমা করেন ত বলি, এ কথায় বিশ্বাস হয় না। কবিতার এই অত্যুক্তি বোধ করি, দেশভক্তি লইয়া 'বেলে খেলা'। কেন না, জাপানীদের মত বাঙ্গালীর প্রাণ এত সস্তা নয় যে, ধাঁ করিয়া দান করা চলে। বিশেষতঃ, আমাদের প্রাণ প্রায়ই গিন্নীর আঁচলে বাঁধা থাকে; সে বিষম গেরো খুলিতে খুলিতেই প্রতিজ্ঞা ঠাণ্ডা হইয়া আসে, কাঁচা-ঘুম-ভাঙ্গা প্রাণ-দিবার-প্রবৃত্তি আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করে। সুতরাং প্রাণ দিবার আর আবশ্যক হয় না। প্রাণ যাহারা দিতে পারে, তাহারা দিয়া ফেলে। কথায় কথায় প্রাণ-দানের সঙ্কল্প ঘোষণা করে না। দৃষ্টান্ত জাপানে দেখুন।—স্বদেশী আন্দোলনেও দেখা যাইতেছে, যাঁহারা অম্লানবদনে রাজদণ্ড সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের অস্তিত্বও ইতিপূর্ব্বে কেহ জানিত না। ঢোলসহরতে তাঁহাদের আত্মত্যাগের কথা এই ভবের বাজারে প্রচার করিতে কখন শুনিয়াছেন কি? মুখে বলিয়াই যদি সব মিটিয়া যায়, তাহা হইলে কাজ করিবার শক্তি থাকে না। ইহা চিরন্তন সত্য। তাই, 'ঝিকে মেরে বউকে শিখাইতে হয়',—এই নীতির অনুসরণ করিয়া আমরা বলি,—

আপনাদের প্রাণ আপাততঃ আমরা চাহি না,—আপনারা ষষ্ঠীর দাস হইয়া অখণ্ড পরমায়ু সম্ভোগ করুন। বহুমূল্য প্রাণের বদলে যা পারিবেন,—ধরুন, এই দুর্ভিক্ষ "অরাতি"র সংহারের জন্য, বা প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার অধ্যাপনার জন্য, প্রাণের অপেক্ষা অনেক সহজে যাহা দান করা যায়, এবং যে দানে আপাততঃ তদপেক্ষা অধিক মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী,—তাহাই, অর্থাৎ 'যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য' মার ভাণ্ডারে দান করুন। কালী কলম লইয়া এত আস্ফালন আমাদের মত জননী জন্মভূমির 'যোত্রহীন অক্ষম ঋণী' ভক্তের পক্ষে সান্ত্বনার বিষয় হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মীপ্যাঁচার বরপুত্রগণ যদি সকলেই কেহ কবিতা লিখিয়া, কেহ বক্তৃতা করিয়া, কেহ সভাপতি হইয়া মাতৃপূজার দক্ষিণান্ত করেন, তাহা হইলে বেচারী বঙ্গমাতা নাচার! ন্যাশ্যা-নাল ফণ্ডের ধনকুবের স্বদেশভক্তদের এই নির্জ্জলা কৃপণা ভক্তি দেশের লোকের চক্ষুঃশূল, চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া এ কথা আজ ছাপাইয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "গোয়ালিয়রে চাষের সুবিধা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা সে বিষয়ে শিক্ষিত যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "লাট-বিদায়" কেন মুদ্রিত হইল? এই বস্তা-পচা কবিত্বের পরে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মা" নামক একটি গান আছে। গানটি ভাল হয় নাই। আরব্যোপন্যাসে এক চুম্বকের পাহাড়ের গল্প পড়িয়াছি। তাহার আকর্ষণে বড় বড় জাহাজ পাহাড়ে ঠেকিয়া বান্‌চাল হইত। সেইরূপ এখনকার মুদ্রাযন্ত্রও কেবল কবিত্ব টানিতেছে আর ভাঙ্গিতেছে। ফলও তদ্রূপ। সুধীন্দ্রনাথের ন্যায় ক্ষমতাশালী সুকবি অবশ্যই সাবধান হইবেন।

---*---

ফিরিঙ্গি বণিক্।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ,—শেষ।

ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্য-কলহের সহিত ধর্ম্ম-কলহ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান-বিদ্বেষ ও খৃষ্টধর্ম্মানুরাগ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া ফিরিঙ্গি বণিকের আত্মত্যাগকে তাহাদের নিকট মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। ফিরিঙ্গিগণ হাসিতে হাসিতে জীবনবিসর্জ্জন করিতে পারিত; কারণ, তাহাদের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ,—ধর্ম্মবিস্তারের প্রধান পথ। ফিরিঙ্গি বণিক হাসিতে হাসিতে অসহায় স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকার প্রাণবধ করিতে পারিত; কারণ, তাহাদের নরহত্যা কেবল বিধর্ম্মি-হত্যা! একালের ইতিহাসলেখকগণ যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে শিহরিয়া উঠিতেছেন, সেকালের ইতিহাসলেখকগণ তাহার কীর্ত্তন করিবার সময়ে গৌরববোধ করিতেন। সে যুগ ইউরোপের মধ্য-যুগ। তখনও বর্ব্বরতা বিদূরিত হয় নাই; তখনও বাহুবল সুসংযত হয় নাই; তখনও সমগ্র মানবসমাজকে সমুন্নত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইউরোপকে নবজীবন দান করে নাই। তখন হত্যাই ধর্ম্মলাভের প্রধান সোপান বলিয়া পরিচিত ছিল।

তরবারিহস্তে ধর্ম্মপ্রচার প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রাচ্য যখন ধর্ম্মপ্রচারে প্রথমবার পদবিন্যাস করে, তখন সন্ন্যাসীর সৌম্যমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়াছিল। তাহাই প্রাচ্যরাজ্যের ধর্ম্মপ্রচারের আদর্শ। সেই পুরাতন আদর্শের অনুকরণ করিয়া খৃষ্ট ও খৃষ্টশিষ্যগণ ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম এসিয়া ছাড়িয়া ইউরোপে উপনীত হইবার পর তাহার মূলপ্রকৃতি এত দূর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, বাহুবলই প্রবল বল বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহার সম্মুখে জ্ঞান ও ধর্ম্ম ভাল করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। আলবুকার্ক এই বাহুবলের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াই প্রাচ্যসাগরে উপনীত হইয়াছিলেন।

বাহুবলের ইতিহাস কলঙ্কের ইতিহাস। সে কথা বিস্মৃত হইয়া, ফিরিঙ্গি ইতিহাসলেখকগণ ফিরিঙ্গি বণিকের অলৌকিক দিগ্বিজয়ের বর্ণনা করিতে গিয়া,

[illegible] বাহুবলেরই গৌরবঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইস্লাম পরাভূত হইবামাত্র [illegible]নের ন্যায় বাহুবলের উপাসক হইয়া উঠিল। তাহারাও ধর্মযুদ্ধে জীবন [illegible]জন করিব্যার জন্য লালায়িত হইল। তখন ভারতসাগরে কেবল সমরকোলাহলই প্রবল হইয়া উঠিল। ঐ আসিতেছে!—ঐ আসিল,—এই কথাই উভয় পক্ষের প্রধান কথা হইয়া দাঁড়াইল। বাণিজ্যের বিজয়লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইবামাত্র, জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের রাজশক্তি ইহার সন্ধান পাইল না; তখন তাহা মোগল পাঠানের মধ্যে কাহাকে বরণ করিয়া লইবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফিরিঙ্গি-বীর আল্‌বুকার্ক কাল-কবলে নিপতিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার পদে অন্য রাজপুরুষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে না করিতে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রাণে মুসলমানাতঙ্ক আবার প্রবল হইয়া উঠিল। ডিউ নগরের সম্মুখে জলযুদ্ধে বিজয়লাভ করিবার পর, ফিরিঙ্গি বণিক তদ্দেশে নিতান্ত নিশ্চিন্তচিত্তে কালক্ষয় করিতে পারেন নাই। এডেন বন্দর আক্রমণ করিয়া দীর্ঘকালেও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারেন নাই। মিশরের সুলতানের বাণিজ্যশক্তি কিয়ৎপরিমাণে বিধ্বস্ত হইলেও, সম্পূর্ণরূপে পরাহত হয় নাই। কেবল আল্‌বুকার্কের অসাধারণ প্রবল প্রতাপে প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাঁহার পদচ্যুতির অপেক্ষায় কিছু কালের জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার জীবন-বায়ুর অবসান হইলে, মুসলমান-শক্তি আবার প্রাধান্যলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তুরস্কের সুলতান যত দিন মিশরের সুলতানকে পরাভূত করিবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তত দিন মুসলমানের পক্ষে প্রবলপ্রতাপে ফিরিঙ্গি বণিকের গতিরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। আল্‌বুকার্কের মৃত্যুকালে সেই সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল। মিশর তুরস্কের নিকট পরাভূত হইবামাত্র, তুরস্কের সুলতান ফিরিঙ্গি বণিকের সহিত শক্তিপরীক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বাণিজ্য-বিস্তার।

The main object of the Portuguese in Asia was a monopoly of the Indo-European trade.—Sir. W. Hunter.

ভারত-বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভ করিবার জন্যই ফিরিঙ্গি বণিক্ যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। যত দিন কেবল জলপথে বাহুবল বিস্তৃত করিয়া সেই

উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সম্ভাবনা ছিল, তত দিন স্থলপথে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন স্বীকৃত হয় নাই। আল্‌বুকার্কই তাহার প্রথম পথপ্রদর্শক। কিন্তু তাঁহাকেও কেবল বাণিজ্য-বিস্তারের অনুরোধেই রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

বাণিজ্য-চিন্তাই প্রধান চিন্তা বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাতে আত্মহারা হইয়া, যখন যাহা করিতে হইয়াছে, ফিরিঙ্গি বণিক্ তখনই তাহা অম্লানবদনে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে ফিরিঙ্গি বণিকের নাম কলঙ্কযুক্ত হইলেও, কেহ তাহাতে লজ্জাবোধ করেন নাই। বরং যাঁহারা এরূপ কার্য্যে প্রাণত্যাগ করিতেন, তাঁহারা স্বদেশের ইতিহাসে অমরকীর্ত্তি লাভ করিতেন। ইতিহাসের কল্যাণে এইরূপে কত নরাধম দস্যু তস্করও মহাবীর বলিয়া পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে!

কেবল বাহুবলেই ফিরিঙ্গি বণিক্ আত্মশক্তি বিস্তৃত করিতে পারিতেন না। তাহার সহিত যে শাসন-কৌশল সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহাই দিগ্বিজয়লাভের প্রকৃত কারণ। কালিকটের ইতিহাসে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কালিকট-রাজ ভারত বাণিজ্যের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণপণে ফিরিঙ্গি বণিকের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে পরাভূত করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার হৃদয়ে রাজ্যলোভ প্রবল হইবামাত্র, আল্‌বুকার্কের পথ সহজ হইয়া উঠিল। ভ্রাতা যদি বিষপ্রয়োগে ভ্রাতৃহত্যা করিতে পারেন, তবে আল্‌বুকার্ক ভ্রাতৃঘাতককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন,—এই মর্ম্মে গুপ্ত সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইবার পর, ভ্রাতৃহত্যা সংঘটিত হইয়া গেল। এই উপায়ে যিনি কালিকটের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তিনি প্রথমে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ও তাহার পর ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে আত্মবিক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। * শেষ সন্ধিসূত্রে কালিকট-রাজ পর্ত্তুগালের সামন্ত হইতে স্বীকৃত হইয়া অঙ্গীকার করিলেন,—পর্ত্তুগালের শত্রুগণ কেহ কখনও কালিকটে আশ্রয়লাভ করিতে পারিবে না; খৃষ্টানগণ বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিবেন; দেশীয় খৃষ্টানেরাও সেই অধিকার লাভ করিবেন; কালিকট-রাজ অন্য লোকের নিকট যে শুল্ক

* In 1513 the Zamorin of Calicut was hostile, his brother friendly, to Portugal. Albuquerque offered, if the brother would poison the Zamorin, to secure for him the throne; and the compact was duly carried out.—Sir W. Hunter's Histry of British India, vol 1. 169.

প্রাপ্ত হইবেন, তাহার অর্দ্ধাংশও পর্ত্তুগাল-রাজ প্রাপ্ত হইবেন! * এই মর্ম্মে সন্ধিপত্র লিখিত হইবার পর, কালিকটের পুরাতন বন্দরে ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠীবাড়ী নির্ম্মিত হইল। রাজা যাহা রক্ষা করিবার আশায় প্রাণপণ করিতেন, ভ্রাতৃঘাতক রাজভ্রাতা তাহাই ফিরিঙ্গি বণিককে দান করিয়া, সিংহাসন লাভ করিলেন!

কোচিনরাজ প্রলোভনে পড়িয়া অসময়ে আশ্রয়দান না করিলে, ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে ভারত-বাণিজ্যে একাধিপত্য-লাভ কখনও সহজ হইত না। ফিরিঙ্গির বাহুবলে কোচিন-রাজ কালিকটের সিংহাসন লাভ করিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট হইতে পারিবেন, এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াই কোচিন-রাজ স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইয়া কালিকটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ফিরিঙ্গি বণিক্ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেল। কোচিনরাজের স্বদেশ-দ্রোহই সার হইল। কালিকটের রাজসিংহাসনে আর এক জন স্বদেশদ্রোহী উপবেশন করিলেন। তখন মর্ম্মাহত কোচিন-রাজ পর্ত্তুগালের অধিপতির নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই আবেদনপত্র এখন ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। ইহার প্রতি পংক্তিতে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের মূলতথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশের লোকে যে সকল অলীক আশায় ভারতবর্ষের নগণ্য ব্যক্তিগণকে প্রলুব্ধ করিয়া, তাঁহাদের সহায়তায় শক্তিবিস্তার করিয়া লইয়া, তাহাদিগকে জীর্ণবস্ত্রবৎ অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুনঃপুনঃ লিখিত হইয়া রহিয়াছে। কোচিন-রাজ তাহার প্রথম পাত্র বলিয়া তাঁহার আবেদনপত্র-খানি উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে কোচিন-রাজ যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত পর্ত্তুগাল-রাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আপনি আমাকে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্ সাজাইয়া উপহারস্বরূপ স্বর্ণমুকুট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আপনার প্রতিনিধি মহাশয় আমার অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া, আমাকে সমগ্র ভারতবর্ষের অধিপতি করিয়া দিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। আমার বিরুদ্ধে কেহ মস্তকোত্তলন করিলে, সাহায্য করিবার কথাও স্বীকৃত হইয়াছিল। আমিও তাঁহাকে যথাসাধ্য সহায়তা প্রদান করিয়া তাঁহার

* Treaty Dated 26 February 1515.

শত্রুদলনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; তাহার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। এইরূপে এই সকল কথা আপনাদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ধর্ম্ম-মন্দিরে শপথ করা হইয়াছিল। তাহার কি পরিণাম হইল ?"*

তাহার কি পরিণাম হইল ? সে কথা জনৈক সহৃদয় ইংরাজ ইতিহাসলেখক একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার আর কি হইবে ? যাহা হইবার, তাহাই হইল। কথা কথাই রহিয়া গেল; দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কোচিন-রাজের সর্ব্বনাশসূচক সন্ধিপত্রে, কালিকট-রাজের সহিত ফিরিঙ্গি বণিকের মিত্রতা সুসংস্থাপিত হইয়া গেল ! † ফিরিঙ্গির ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা যে যথাধর্ম্ম প্রতিপালিত হইবে না, কোচিন-রাজ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়াই, কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন। এই আর্ত্তনাদ আধুনিক ভারতবর্ষের বিস্ময়াবহ ইতিহাসের অপরিহার্য্য আকুল আর্ত্তনাদ ! তাহাতে ভারতবর্ষের কত শাসন-কর্ত্তাকে হায় ! হায় ! করিতে হইয়াছে,—একদিনের জন্যও ফিরিঙ্গি বণিকের সমবেদনা আকর্ষণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই।

পারস্যোপসাগর একটি পুরাতন বাণিজ্যপথ বলিয়া সুপরিচিত ছিল। সে পথেও ফিরিঙ্গি বণিকের অধিকার বিস্তৃত হইল। অরমজ বন্দরে ফিরিঙ্গি-দুর্গ নির্ম্মিত হইবার পর, জলে স্থলে ফিরিঙ্গির প্রতাপ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অরমজ বন্দরের অধিপতিকেও কালিকট-রাজের ন্যায় অকীর্ত্তিকর সন্ধিসূত্রে আত্মরক্ষা করিতে হইল। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসূত্রে অরমজ বন্দরের অধিপতি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার রাজ্য, প্রকৃত-পক্ষে পর্ত্তুগালের অধীন হইয়া গেল। পর্ত্তুগালরাজ ইচ্ছামাত্রে সে রাজ্য

---

* Your Highness sent me a golden crown, as a sighn that I was crowned the chief King of the whole of India. And your Governor specially crowned me as king, and he declared on oath that he would make me the chief king of all India ; and assist me against any one who should come upon me. And I also promised to assist him against whoever should come upon them and to stand to the defence of your fortress until death ; and in this manner they swore to it by oath in the Church.—Letter dated 11 December, 1513.

† Yet after twelve years these fine promises remained empty words, and here was Albuquerque in 1513 making treaties with Calicut to the detriment of Cochin.—Sir W. Hunter's History of British India, vol 1. 144.

হস্তগত করিবার অধিকার লাভ করিলেন। অরমজ বন্দরের অধিপতি কেবল নামসর্ব্বস্ব অধিপতি রহিলেন। ফিরিঙ্গি বণিক বিনাশুল্কে পণ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন;—অরমজ বন্দরের অধিপতি পর্ত্তুগালকে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন;—যে সকল ফিরিঙ্গি তাঁহার রাজ্যে পলায়ন করিয়া স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে হইল;—রাজা ও নগরপালের দেহরক্ষক ভিন্ন অন্য কোনও মুসলমানের পক্ষে অস্ত্রব্যবহার বা অস্ত্রাদি লইয়া গমনাগমনের ক্ষমতা রহিল না;—কেহ দ্বিতীয়বার সেরূপ অপরাধ করিলে বেত্রাঘাত ও তৃতীয়বারে একেবারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়া গেল! মুসলমান হইলে বাণিজ্য ব্যাপারে শুল্ক দান করিতে হইবে, ফিরিঙ্গি হইলে বিনা শুল্কেই বাণিজ্য করিতে পাইবে,—এইরূপ রাজাজ্ঞা মুসলমান রাজাকে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিতে হইল!

এইরূপে ভারতসাগরের প্রধান বাণিজ্যপথে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য বিস্তৃত হইবার সময়ে, লোহিতসাগরের বাণিজ্য-পথ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। সে পথে ফিরিঙ্গির বাহুবল বা শাসন-কৌশল সহসা বিজয়লাভ করিতে পারিল না। এডেন বন্দর তাহার জন্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই বন্দর, আরব-বণিক্‌দিগের প্রধান আশ্রয়স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। মিশরের সুলতান এডেন হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ফিরিঙ্গি বণিকও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আলবুকার্ক ভগ্নমনোরথে সে চেষ্টা আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকার্কের প্রচণ্ড পীড়নে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও, এডেনদুর্গ পরাভূত হয় নাই। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে মিশরাধিপতির আক্রমণেও এডেনদুর্গ আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু উভয় শত্রুর যুগপৎ আক্রমণে এডেনদুর্গের পক্ষে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। তৎকালে এডেনদুর্গের অধিপতি "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতি অবলম্বন করিয়া কখন কখন ফিরিঙ্গির সহিত মিত্রতাস্থাপনে স্বীকৃত হইয়া, আবার সুযোগ পাইবামাত্র স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বিবিধ বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াও এডেনদুর্গ প্রকৃতপ্রস্তাবে কাহারও পদানত হইল না। কিন্তু ভারত-সাগরের প্রধান বন্দরগুলি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগালের অধীনতা স্বীকার করায়, ভারতবাণিজ্যে পর্ত্তুগালের আধিপত্য ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যযাত্রার প্রথম উদ্যোগের সহিত ধর্ম্মপ্রচারের আড়ম্বর সংযুক্ত ছিল। তাহার জন্যই অনেক সময় পোপের ঘোষণা-পত্র গৃহীত হইত; কখনও বা ধর্ম্মোন্মত্ত প্রচারকগণকেও ভারতবর্ষে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইত। তথাপি ফিরিঙ্গি বণিকের প্রধান লক্ষ্য বাণিজ্য,—তাহা কখনই অস্বীকৃত হয় নাই। ভারতবাণিজ্যে ধর্ম্ম-কলহ প্রবল হইলে ফিরিঙ্গি বণিকের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতে পারিত। সে কথা বুঝিতে পারিয়া, সময় থাকিতে ফিরিঙ্গি বণিক্ সাবধান হইয়াছিলেন। যে ধর্ম্মোন্মাদ একদিন তাঁহাদিগকে মুসলমানের ধর্ম্মমন্দির চূর্ণ করিবার জন্য নিয়ত উত্তেজনা করিত, তাহা ক্রমে অবসন্ন হইয়া গেল। এমন কি, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম-মন্দির রক্ষা করিবার কথাও বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে লিখিত হইতে লাগিল। এইরূপে ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারতবাণিজ্যে আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে চেষ্টা সফল হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের পণ্যদ্রব্য সিংহলে পুঞ্জীকৃত হইত। তাহা আর হিন্দু মুসলমানের করতলগত রহিল না। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্যদ্রব্য জলপথে মুসলমান রাজ্যে বাহিত হইত, তাহা আর সে পথে বাহিত হইবার অবকাশ রহিল না। এডেনদুর্গ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত না হইলেও, ভারত-বাণিজ্যে ফিরিঙ্গি বণিকেরই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

এই প্রতিষ্ঠার মূলে যে নৌশক্তি বর্ত্তমান আছে, সে কথা ফিরিঙ্গি বণিক বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। জলযান-নির্ম্মাণ, জলযান-চালন-কৌশল ও জলযুদ্ধের কৌশল-উদ্ভাবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানবসমাজ তুল্যভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল। যাহারা তাহাতে উৎকর্ষলাভ করিবে, তাহারাই যে উত্তরকালে ভারত-বাণিজ্যের আধিপত্য অধিকার করিতে পারিবে, তাহাতে কাহারও সংশয় ছিল না। সুতরাং ভারতবর্ষের লোকে যাহাতে জলযান নির্ম্মাণ করিতে না পারে, তাহারা যাহাতে জলযান-নির্ম্মাণ-কৌশল বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার জন্যই ফিরিঙ্গি বণিক্ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে জলযানের সংখ্যা অধিক ছিল না। যে সকল জলযান হিন্দু মুসলমানের পণ্যদ্রব্য বহন করিত, তাহা ধ্বংস করিলে, সহসা জলযান পুনর্গঠিত করিবার সম্ভাবনা ছিল না। যুদ্ধ-কলহে ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারতীয় জলযানসমূহের ধ্বংস করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; পুনর্গঠনের পথ রুদ্ধ করিবার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ডিউ নগরের সম্মুখে যে জলযুদ্ধে ফিরিঙ্গি বণিক্ জয়লাভ করিয়াছিলেন,

তাহাতে ভারতীয় জলযান গঠন-প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ফিরিঙ্গি বণিক্ চিন্তিত হইয়াছিলেন। সন্ধি-সংস্থাপনের সময়ে সে কথা বিস্মৃত হন নাই। কালিকট ও গুজরাটই জলযান-নির্ম্মাণ-কৌশলে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সন্ধিসূত্রে এই উভয় স্থলের জলযান-নির্ম্মাণের ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া যায়! অবশেষে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রে গুজরাটের জলযান-নির্ম্মাণের ভবিষ্যৎ অধিকার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষের জলযান উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। শত বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের জলযান-নির্ম্মাণের অধিকার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল! তাহার কথা এখন কেবল স্বপ্নবৎ ইতিহাসে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

গোয়া, বেসিন, দামন ও ডিউ, এই চারিটি ফিরিঙ্গি দুর্গে ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্রতটে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, ভারতবাসীর পক্ষে আর গোপনে জলযান-গঠনের উপায় রহিল না। যে শিল্পকৌশল অনুশীলন-বলে ক্রমে জলযাননির্ম্মাণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিত, তাহা এইরূপে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

পারস্যোপসাগর হইতে যে সকল অর্ণবযান ভারতবর্ষে উপনীত হইত, তাহা প্রথমে ডিউ নগরের বন্দরে দৃষ্টিপথে পতিত হইত, তাহা আর ভারতবাসীর দৃষ্টিগোচর হইবার উপায় রহিল না। এই সময়ে বিজাপুর রাজ্যের প্রবল প্রতাপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আদিল শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশুপুত্রের সিংহাসন রক্ষা করাই মন্ত্রিবর্গের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিজাপুরের অধিকারভুক্ত গোয়া দ্বীপ এই সময়ে অধিকার করিয়া লইতে ফিরিঙ্গি বণিককে অধিক উদ্বেগ সহ্য করিতে হয় নাই। যে জলদস্যু ফিরিঙ্গি বণিককে ইহার সন্ধান প্রদান করে, তাহার নাম টিমোজা। সে ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়াও স্বার্থলোভে ফিরিঙ্গির সহায়তা করিয়াছিল। তাহার সেনাদলের সহায়তা লাভ না করিলে, গোয়া দ্বীপ ফিরিঙ্গির অধিকারভুক্ত হইত না। টিমোজা যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষ একরূপ অরাজক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন কত লোকে কত উপায়ে কত রাজ্য-গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। টিমোজার সাহস ছিল, সেনাদল ছিল, জলপথে আধিপত্য ছিল; স্বয়ং সমুদ্রতটে বিস্তৃত রাজ্য সংস্থাপিত করিবার সম্ভাবনা ছিল। সে তাহাতে ব্যাপৃত না হইয়া জলদস্যুরূপে পণ্য লুণ্ঠন করিত; লাভের লোভে ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষভুক্ত হইয়া গোয়া অধিকার করিয়া দিয়াছিল। তাহার নাম

এখন বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু গোয়া নগরী এখনও তাহার স্বদেশদ্রোহের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান আছে। টিমোজা কৃতজ্ঞ ফিরিঙ্গি বণিকের অধীনে জায়গীর ও রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু এক বৎসরের অধিক তাহার ফলভোগ করিতে পারে নাই;—এক বৎসরের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিল!

আলবুকার্কের বাণিজ্যনীতি ও টিমোজার বাহুবল যে গোয়া নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা এখন পুরাতন নগরী বলিয়া পরিচিত। সেখানে কেবল পুরাতন ধ্বংসাবশেষ! কোনও স্থানে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, কোনও স্থানে ধর্ম্মমন্দিরের ভগ্নচূড়া,—সকল স্থানেই শ্মশানের শোক-চিহ্ন! একদিন কিন্তু এই গোয়া নগরী "স্বর্ণপুরী" নামে ইউরোপের সকল দেশেই সুপরিচিত হইয়াছিল! পর্ত্তুগীজগণ বলিত,—"যে গোয়া নগরী দর্শন করিয়াছে, তাহার পক্ষে লিসবন্ নামক পর্ত্তুগালের রাজধানী দর্শন করিবার প্রয়োজন নাই!"

গোয়া নগরী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যসমাজের প্রথম সম্মিলনক্ষেত্র। গোয়া নগরী ফিরিঙ্গি বণিকের প্রথম পরাক্রান্ত রাজধানী। গোয়া নগরী পর্ত্তুগালের অভ্যুদয় ও অবনতির বিস্ময়াবহ বিচিত্র ক্ষেত্র। গোয়া নগরী ভারতবর্ষের ইতিহাসের চিরস্মরণীয় শ্মশানভূমি। এই মহাশ্মশানে কোটী কোটী ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয় ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য।

এক সময়ে গোয়া নগরী সমগ্র ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। প্রাকৃতিক সংস্থানে গোয়া নগরী তৎকালে প্রধান বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া পরিচিত হয় নাই। ফিরিঙ্গি-বণিক রচনা-কৌশলে তাহাকে বাণিজ্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মালাবার উপকূলে এরূপ স্থান অনেক ছিল; যে কোনও স্থান এইরূপ সৌভাগ্যলাভ করিতে পারিত। কিন্তু এইখানে আসিয়া ফিরিঙ্গি বণিক্ প্রাণপণে নবরাজধানীর গঠন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, গোয়া নগরী অল্প দিনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কোচিন, কালিকট প্রভৃতি পুরাতন বাণিজ্য-বন্দরের তিরোভাবের জন্যই গোয়া নগরীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিছুকাল তাহার প্রবল প্রতাপে সমগ্র সভ্যজগৎ বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহা আবার ধীরে ধীরে বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইতেছে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বাণিজ্যনীতি।

Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.—*Psalm.* ii. 8. 9.

ফিরিঙ্গি বণিকের অভ্যুদয়ের যুগ, ইউরোপের ইতিহাসের অশান্ত ধর্ম্মোন্মাদের যুগ। সে যুগের খৃষ্টান ইউরোপ ধর্ম্মের নামে যে সকল অত্যাচার উৎপীড়নে জলস্থল কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। তাহার কথা স্মরণ করিতে আধুনিক খৃষ্টান লেখকবর্গও লজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন। ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তৃত করিবার সময়ে, কাহারও কিছুমাত্র লজ্জাবোধ ছিল না। যে ধর্ম্মোন্মাদে পর্ত্তুগালের সমুদ্রোপকূল হইতে নাবিকগণ উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিবার আশায় পোতারোহণ করিত, তাহার সহিত লুণ্ঠনলোভ সংযুক্ত হইয়া তাহাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। কালে লুণ্ঠনলোভ প্রবল হইতে লাগিল; লোকে তাহার পক্ষসমর্থনের জন্য খৃষ্ট-ধর্ম্মের শাসনবাক্য উদ্ধৃত করিতে শিক্ষা করিল। এইরূপে ফিরিঙ্গির বাণিজ্যনীতি লুণ্ঠননীতিতে পরিণত হইল। কোনও কোনও ইতিহাসলেখক ফিরিঙ্গির দোষক্ষালনের আশায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"তাহারা যে সকল নির্দ্দয় ব্যবহারের জন্য নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ ছিল। তাহা কালধর্ম্ম; ফিরিঙ্গি বণিক্ এসিয়াতে আসিয়া যেরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারই তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইবার যোগ্য! তাহাদের সংখ্যা এত অল্প, তাহাদের অবস্থা এত বিপদ্‌সঙ্কুল, —তাহারা নিষ্ঠুর ব্যবহার না করিলে, আত্মরক্ষা করিতে পারিত না।" এ সকল কথা একালের ইতিহাসলেখকদিগের নিজের কথা,—তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত উপাখ্যানমাত্র। সেকালের ইতিহাসলেখকগণ এরূপ কৈফিয়তের অবতারণা করেন নাই। যাহারা অলঙ্কারলুণ্ঠনের লোভে অসহায় মহিলাবর্গের নাসাকর্ণ চ্ছেদন করিতে কুণ্ঠিত হইত না, তাহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের পক্ষসমর্থন করা অসম্ভব। তাহা বর্ব্বরতামাত্র। সেকালের ইউরোপ এরূপ বর্ব্বরতা পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারে নাই;—যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই ফিরিঙ্গির বর্ব্বরতায় মানবসমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বভাবসুলভ বর্ব্বরতার সহিত

ধর্ম্মান্ধতা মিলিত হইয়াছিল; স্বার্থচিন্তায় তাহা উত্তরোত্তর বীভৎসমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সেনাপতিগণ যুদ্ধজয়ের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে অম্লানবদনে লিখিয়া পাঠাইতেন,—"কুক্কুরগুলাকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহারা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারে?" কেহ বা লিখিয়া পাঠাইতেন,—"এক জনকেও ছাড়া হয় নাই,—কি স্ত্রীলোক, কি বালক, সকলকেই হত্যা করা হইয়াছে।" এক জন সুবিখ্যাত আধুনিক ইতিহাসলেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—"পর্ত্তুগালের লোকে তাহাদের ক্ষমতার অতীত দিগ্বিজয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই, এই সকল গর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল!" *

সেকালে এই সকল উপায় গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইলে, ধারাবাহিক ঘটনায় ইহার আতিশয্য লক্ষিত হইত না। তখনও ইউরোপে মনুষ্যত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা ও পদ্ধতি খৃষ্টানসমাজে সুপরিচিত হয় নাই। তখনও সমগ্র খৃষ্টানসভ্যতা নররক্তে অনুরঞ্জিত হইয়া মানবসমাজে কেবল বিভীষিকার উৎপাদন করিতেই ব্যস্ত ছিল। ভারতবর্ষে খৃষ্টানের নাম এত ঘৃণাস্পদ হইবার ইহাই প্রথম ও প্রধান কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের লোকে এখনও খৃষ্টানকে ধর্ম্মানুরক্ত সাধুপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। এখনও অনেকের বিশ্বাস,—স্বার্থই ফিরিঙ্গির একমাত্র নীতি-রহস্য; তাহার জন্য কোনও কার্য্যই অকরণীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না! সেকালে এই নীতি সগর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে প্রচারিত হইত। ফিরিঙ্গি বণিকের ইতিহাস কেবল এইরূপ পাশব-নীতির ইতিহাস।

ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া যে বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ভারতবর্ষে ইউরোপীয় শিল্পদ্রব্যবিক্রয়ের সংস্রব ছিল না। তখনও ইউরোপীয় শিল্পদ্রব্য সভ্যসমাজে সমাদর লাভ করিতে পারে নাই; তখনও এসিয়া ও ইউরোপের সমস্ত সভ্যদেশে প্রাচ্য শিল্পেরই একাধিপত্য বর্ত্তমান ছিল। সেই শিল্পদ্রব্যসংগ্রহের ও বিক্রয়ের একাধিপত্য লাভ করিবার আশায় ফিরিঙ্গি বণিক্ ব্যাকুল ছিলেন। সেকালের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রোমক সাম্রাজ্যের ন্যায় পর্ত্তুগালের লোকেও রৌপ্যবিনিময়ে ভারতবর্ষ হইতে

* Terrorism had to take the place of strength. It was a device to which the Portuguese were compelled by plans of conquest beyond their national resources.—Sir W. Hunter's History of British India. vol. I. 141.

বিবিধ কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিয়া ইউরোপে বিক্রয় করিতেন; তাহার সহিত বহুমূল্য মণিমুক্তা হীরকাদিও সংযুক্ত ছিল। শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া ভারতবর্ষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার আকাঙ্ক্ষা তখনও ইউরোপকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে নাই।

এই বাণিজ্যনীতি রক্ষা করিবার জন্য জলপথে আত্মশক্তি প্রবল করিবার আশায়, ফিরিঙ্গি বণিক্ পোত ও দুর্গের নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়া, ভারতসমুদ্রে একাধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগালের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের নাবিক ও সৈনিকগণের চেষ্টায় এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহার জন্য ভারতবর্ষের লোকের সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। ফিরিঙ্গি বণিক্ তাহার জন্য জলে স্থলে ভাতরবর্ষের লোকের বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ভারতবর্ষের লোকের পরাজয়সাধন করিয়াছিলেন। উত্তর-কালে যে সকল উপায়ে ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গি বণিকের দ্বারাই তাহা সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের লোকের গৃহকলহের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া, এক পক্ষের সহায়তা সাধন করিতে গিয়া, উভয় পক্ষকেই পদানত করিবার পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিপ্লবযুগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তখনও মোগলশাসন সংস্থাপিত হয় নাই; তখনও দাক্ষিণাত্যের গৃহকলহ প্রবলপ্রতাপে বর্ত্তমান; তখনও জলে স্থলে কেবল বাহুবলেরই প্রাধান্য। ফিরিঙ্গি বণিক্ তাহার সন্ধানলাভ করিয়াই ভারতবাণিজ্যের একাধিপত্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পর্ত্তুগালের অধীশ্বর ভারতবাণিজ্যের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া ইউরোপে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পোপের আদেশপত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহার শাসন-ক্ষমতা কেহই অস্বীকার করিতে সাহস করিতেন না। পর্ত্তুগাল-রাজ এইরূপে যে বাণিজ্যনীতি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ফিরিঙ্গির বাণিজ্যকে রাজকীয় বাণিজ্য বলিতে পারা যায়। রাজার নামেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। যাহারা ভারতযাত্রা করিত, তাহারা রাজার কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইত। তাহাদিগকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিবার আশায় পর্ত্তুগাল-রাজ এক প্রবল প্রলোভনের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহারা অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া রাজকীয় বাণিজ্যবিস্তারের জন্য ভারতবর্ষে গমন করিত, তাহারা সকলেই পদমর্য্যাদা-অনুসারে কিছু কিছু পণ্যদ্রব্য আনয়ন

করিয়া ইউরোপে বিক্রয় করিতে পারিত। লোকে এই উপায়ে অতি অল্পকালের মধ্যে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেছে দেখিয়া, সকলেই ভারতযাত্রার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতে প্রথমে পর্ত্তুগালরাজের লাভ হইলেও, পরিণামে সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হইল।

রাজার ন্যায় রাজমন্ত্রিবর্গও ভারতবাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জন করিবার আশায়, কর্ম্মচারিনিয়োগের সময়ে গোপনে উৎকোচ গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিলেন। যাঁহারা এইরূপে রাজকর্ম্মচারী হইয়া ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন, তাঁহারাও সর্ব্বাগ্রে আত্মোদর পূর্ণ করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের যাহা কিছু পার্থক্য ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। রাজদত্ত যৎসামান্য বেতন উপলক্ষমাত্র, ভারতবাণিজ্যের প্রচুর লাভই সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর প্রকৃত লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ইহাতে ভারতবর্ষে এক অভিনব উৎপীড়নের সূত্রপাত হইল। যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া উঠিলেন; স্বার্থের চরণতলে বিচারবুদ্ধি নিয়ত নিহত হইতে লাগিল!

যে সকল রাজকর্ম্মচারী এইরূপে গুপ্ত বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যেই ধনোপার্জ্জনের নিত্য নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পোতাধ্যক্ষ প্রথমে নিজের লাভের সংস্থান না করিয়া, রাজার লাভের কথা চিন্তা করিতে পারিলেন না। কুঠিয়ালগণও সেই পথ অবলম্বন করিলেন। এই সকল কার্য্য গোপনে সুসিদ্ধ করিবার আশায় ভারতবাসীর সহিত "বেনামী"তে বাণিজ্য করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ভারত-বর্ষের লোক স্বাধীন-বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, ফিরিঙ্গির অধীনে এইরূপ গুপ্ত-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে ইতস্ততঃ করিল না।

এরূপ গুপ্ত-বাণিজ্যে পর্ত্তুগাল-রাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেই আবার অল্পসংখ্যক ফিরিঙ্গির পক্ষে ভারতবাণিজ্যে প্রাধান্যলাভের সুবিধা উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষের লোকে "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—এই পুরাতন প্রবাদবাক্য স্মরণ করিয়া, ফিরিঙ্গির অধীনে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বদেশের প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হইল।

অল্প দিনের মধ্যে ফিরিঙ্গি রাজকর্ম্মচারিবর্গ সমরক্ষেত্র ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের সহজ পথের পথিক হইতে লাগিলেন। সমরের সহিত জয় পরাজয়ের সংস্রব আছে; আহত বা নিহত হইবার আশঙ্কা আছে; নিয়ত ক্লেশ স্বীকার করিবারও প্রয়োজন আছে;—সুতরাং তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি রহিল না। সকলেই

রাজধানীতে বসিয়া রাজভোগ সম্ভোগ করিবার আশায়, রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

পর্ত্তুগালের অধিবাসিগণকে ভারতযাত্রায় উৎসাহিত করিবার আশায় পর্ত্তুগালের অধীশ্বর তাহাদের জন্য ভারতবর্ষে বিবাহ করিবার সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিবাহিত হইলে, রাজকর্ম্মচারিগণ শান্ত শিষ্ট হইয়া, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন,—এই আশায় রাজা যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে বিপরীত ফল সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। যাঁহারা ভারতবর্ষে বিবাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অধিক লালায়িত হইয়া উঠিলেন।

অভিনব অজ্ঞাত রাজ্যের আবিষ্কার কামনা, তদ্দেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের প্রবল উৎসাহ, জলে স্থলে বিজয়গৌরবলাভের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা, কালক্রমে কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইল। সকলেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। প্রথমে ভারতবর্ষের লোক ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারিগণের গুপ্তবাণিজ্যের সহকারী হইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবার সুবিধা পাইত, কালে তাহাও দূরীভূত হইতে লাগিল। ফিরিঙ্গি রাজকর্ম্মচারিগণ রাজা প্রজাকে তুল্যরূপে প্রতারিত করিয়া, আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। ক্রমে রাজকীয় বাণিজ্যের লাভের অংশ অল্প হইতে লাগিল ; অবশেষে ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া, পর্ত্তুগাল-রাজ যখন কারণানুসন্ধানে লিপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন,—কর্ম্মচারিগণকে শাসন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে ; মন্ত্রিদল উৎকোচবশে রাজকর্ম্মচারিগণের ক্রীতদাস হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহার প্রতীকারসাধনের জন্য রাজা এক অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করিয়া ভারতবাণিজ্যের কার্য্য পরিচালন না করিয়া স্বদেশের ধনাঢ্যগণের "কোম্পানী" নামক সমিতিকে বাণিজ্যের অধিকারপত্র প্রদান করিয়া, অর্থলাভের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে পর্ত্তুগালেই "কোম্পানী"র জন্ম হইল। কিন্তু তাহা সফল হইল না।

যাঁহারা রাজাদেশ লাভ করিয়া, এইরূপে "কোম্পানী" নাম গ্রহণ করিয়া, ভারত-বাণিজ্যে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা লাভ করিতে পারিলেন না। পর্ত্তুগালের শাসনপ্রণালী এরূপ বাণিজ্যের অনুকূল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। দেশের লোকে কৃষি শিল্পের ভার ক্রীতদাসের উপর নির্ভর করিয়া, বাণিজ্য লইয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিল। অল্পসংখ্যক লোক এইরূপে ধনশালী হইবার পথ প্রাপ্ত হইলেও, দেশের অধিকাংশ লোকে ফললাভ করিত না ; তাহারা নানা দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত

হইয়া, স্বদেশে ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল লোকই ভারতবর্ষে প্রেরিত হইত। তাহারা উপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত হইত না; যে যাহা প্রাপ্ত হইত, তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনেরও সংকুলন হইত না। এই শ্রেণীর লোক ভারতবর্ষে আসিয়া যে কোনও উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, ফিরিঙ্গি বণিকের সর্ব্বনাশসাধন করিতে সমুদ্যত হইল।

এরূপ বাণিজ্য-নীতি দীর্ঘকাল জয়লাভ করিতে পারে না। ফলেও তাহাই হইল। বিশ্বাসই বাণিজ্যের জীবন। তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষের লোকে ফিরিঙ্গি বণিককে বিশ্বাস করিতে পারিল না; রাজা রাজকর্ম্মচারিগণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কর্ম্মচারিগণ পরস্পর পরস্পরকে আর বিশ্বাস করিবার উপায় দেখিলেন না;—সকলই যেন সহসা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল! অবশেষে ভারতপ্রবাসী ফিরিঙ্গিরাও পর্ত্তুগালের অধীশ্বরের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন,—"রক্ষা কর! রক্ষা কর!"*

রাজা বহু দূরে অবস্থিত থাকিয়া রক্ষা করিতে পারিলেন না। যাহারা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ভারতবর্ষে উপনীত হইতে লাগিল, তাহাদের উপদ্রবে খৃষ্টানের নাম কলঙ্কযুক্ত হইল,—ফিরিঙ্গির নাম বিভীষিকার আধার হইয়া উঠিল;—সকলে তাহাকে ভয় করিত বটে, কিন্তু কেহই ঘৃণা করিতে বিরত হইত না! †

যে বাণিজ্য-নীতি কেবল আত্মোদর পূর্ণ করিবার জন্য লালায়িত, তাহা কিছু দিন জয়লাভ করিলেও, এক দিন না একদিন পরাভূত হইবে। সময় থাকিতে এই ঐতিহাসিক সত্যে আস্থাস্থাপন করিতে পারিলে, পর্ত্তুগাল ভারতবাণিজ্যের একাধিপত্য হইতে চিরবঞ্চিত হইত না। রাজা তাহা স্বীকার না করিয়া, স্বয়ং

---

* "In India there is no justice, either in your Viceroy, or in those who are to mete it out" * * * "There is no Moor who will trust a Portuguese" * * * "Senhor, we beg for mercy, mercy, mercy, Help us Senhor, help us Senhor; for we are sinking"—Letter of the Judge and Aldermen of Goa to the King, 25 November 1552.

†The ravenous hordes thus let loose on India made the race name of Christian (Firingi) a word of terror,—until the strong rule of the Mughal Empire turned it into one of contempt.—Sir W. Hunter's History of British India, vol I, 184.

সকল লাভ আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন; রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, আত্মোদর পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবেই ভারতসাগরে ফিরিঙ্গির আধিপত্য বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু তাহার প্রকৃত প্রতাপ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষের লোকে চেষ্টা করিলে, অনায়াসে ফিরিঙ্গি বণিক্‌কে তাড়িত করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তখন গৃহকলহে ব্যতিব্যস্ত!

ফিরিঙ্গি বণিকের রাজধানী গোয়া নগরী এই সকল কারণে নানা প্রকার অসৎ কার্য্যের আধার হইয়া উঠিল। বাহ্যসম্পদে গোয়া নগরী পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বনকেও পরাভূত করিয়া দিল, কিন্তু অভ্যন্তরে নরকের বীভৎস দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। যে প্রবল শক্তি একদিন সন্ন্যাসী রাজকুমার হেন্‌রীর অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাঁহার স্বদেশের অকর্ম্মণ্য নরাধমদিগের আত্মসম্ভোগে যৌবনে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভোগাভিলাষ।

An arsenal in ruins, palaces in ruins, quay-walls in ruins,—all in ruins.—*Sir W. Howard Russel.*

ফিরিঙ্গি বণিকের যে ইতিহাসবিখ্যাত প্রাচ্য রাজধানীর ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব একদিন সমগ্র ইউরোপকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত;—তাহার আয়তন পঞ্চ ক্রোশের অধিক হইবে না। কেবল প্রাকৃতিক-সংস্থান-গুণে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপ বিপুল বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল।

এখন আর সে দিন নাই। সকলই ধীরে ধীরে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে। নূতন ভাবে নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছে। তথাপি পুরাতনের কথা ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও পরিব্রাজকগণ তাহার ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিবার জন্য কৌতূহল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন সে অস্ত্রশালা,—সে প্রমোদশালা,—সে ঐশ্বর্য্যলীলার সৌধ-শোভা আর লোকলোচনের আনন্দ-বর্দ্ধন করে না; সমস্তই যেন শ্মশানের ন্যায় শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছে!

নগর-রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না;—সমুদ্র ও সমুদ্রের খাড়ি দুর্গপরিখার ন্যায় চারি দিকে বর্ত্তমান থাকিয়া সমরকুশল সমুদ্রপোতের

সাহায্যে নগররক্ষা করিত। নগর আক্রান্ত হইবার আশঙ্কামাত্র বর্ত্তমান ছিল না। যাহারা আক্রমণ করিতে পারিত, সে বীরবংশোদ্ভব হিন্দু-মুসলমানগণ ফিরিঙ্গির দাসত্ব গ্রহণ করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকার্জ্জন করিত। যে সকল অর্ণবযান সহসা সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুত্থিত জলদৈত্যের ন্যায় পক্ষবিস্তার করিয়া তীরাভিমুখে অগ্রসর হইত, তাহার সমুন্নত পতাকারাজি ফিরিঙ্গি বণিকেরই বিজয়-ঘোষণা করিত। এক দিকে অতুল ঐশ্বর্য্য, অন্য দিকে অসীম প্রতাপ অল্প দিনের মধ্যেই ফিরিঙ্গি বণিকের বিলাসবাসনা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সেকালে ইউরোপের সম্মুখে ভোগাভিলাষের যে আদর্শ বর্ত্তমান ছিল, তাহা প্রাচ্য আদর্শ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কেবল ইউরোপ কেন, এসিয়া ও ইউরোপের সকল স্থানেই ভারতবর্ষের বাহ্যাড়ম্বরের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান সওদাগরগণ এসিয়ার সকল স্থানে বিবিধ ভোগাভিলাষের অনুকূল যে সকল বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, তাহা সমগ্র ইউরোপকে ভোগাভিলাষী করিয়া তুলিয়াছিল। ইউরোপের কিয়দংশে মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর, সমগ্র ইউরোপ ভোগাভিলাষের নূতন পদ্ধতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন ঐশ্বর্য্যলাভ করিবামাত্র ইউরোপীয়গণ ভারতীয় হাবভাবের অনুকরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না; ভারতবর্ষের লোকের নাম শুনিলেও নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিত না।

ক্ষুদ্র রাজ্য পর্ত্তুগাল ভারত-বাণিজ্যে অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, শারীরিক শ্রমে বিরত হইয়াছিল। কৃষি-শিল্পের অনুশীলনভার ক্রীতদাসগণের উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যাহারা কষ্টসহিষ্ণু বীরজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা নবাবী করিবার জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই ঐশ্বর্য্য-বিকাশের বাহ্যাড়ম্বরকে মানব-জীবনের পরম পুরুষার্থ ভাবিয়া, প্রাণপণে ঐশ্বর্য্য-সঞ্চয়ে যত্নশীল হইয়াছিল। গোয়া নগরী তাহার জন্য ভুবনবিখ্যাত রহিয়াছে।

নাগরিকগণের উচ্চ অট্টালিকা রাজপ্রাসাদকে লজ্জিত করিত। রাজপথ-পার্শ্বে যে সকল প্রমোদশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার অট্টহাস্যে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। জনসমাজ প্রকাশ্যভাবে প্রাচ্য হাবভাব প্রকাশিত করিয়া প্রাচ্যের অনুকরণে বসনভূষণের আড়ম্বর প্রকাশিত করিত। নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্র-বেলা কি এক প্রাকৃতিক মোহ-মদিরায় নরনারীকে নিয়ত আবিষ্ট করিয়া রাখিত,তাহার কথা বিবিধ কাব্যে বর্ণনা করিয়াও ফিরিঙ্গি কবির মনস্কামনা পূর্ণ হইত না। চিরবসন্তের চিরচিত্তমনোহর চপল সৌন্দর্য্য নরনারীকে নৌকা

পথে আকর্ষণ করিত, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া ইউরোপীয় ইতিহাস-লেখকগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন!

গৃহমধ্যে পর্ত্তুগীজ স্ত্রী-পুরুষ অধিক বসন-ভূষণের ব্যবহার করিত না; বালক-বালিকারা উলঙ্গশরীরেই গৃহ-প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, কিন্তু রাজপথে বাহির হইতে হইলে, আড়ম্বরের অবধি থাকিত না। মহিলাগণ দোলারোহণে বহির্গত হইতেন,—তাঁহাদের পরিচ্ছদশোভা ও দোলার আবরণ-বস্ত্রের চাক-চিক্যে রাজপথ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক দাসদাসী পদ-ব্রজে গমন করিত। বসনভূষণে কেবল স্বর্ণ-রৌপ্য মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি,—তাহার উপর সুচিক্কণ আবরণ বিস্তৃত করিয়া ফিরিঙ্গি সুন্দরীগণ তাঁহাদের হাস্যলাস্য ও আস্য-শোভা সমধিক বিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেন। নগ্ন-চরণপ্রান্তে মণি-মাণিক্যবিভূষিত বিচিত্র পাদুকা তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের অলৌকিক আড়ম্বর সূচিত করিত। পুরুষেরা অশ্বারোহণে বাহির হইতেন, সঙ্গে সঙ্গে আশা সোঁটা, ছত্র, চামরাদি ধারণ করিয়া ভৃত্যগণ অনুগমন করিত। যাহারা নিতান্ত নির্ধন, তাহারা নিতান্তপক্ষে এক জন ছত্রধারী ভাড়া করিয়া লইত। দেখিলে মনে হইত,—ফিরিঙ্গিমাত্রই এক একটি ক্ষুদ্র নবাব!

রমণীগণকে গৃহে রাখিয়া পুরুষসমাজ নিয়ত বাহিরের প্রমোদশালায় বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া পশুত্বের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহারা স্বামিসুখবঞ্চিতা হইয়া অন্তঃপুরে পড়িয়া রহিল, তাহারা নারীধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না! চারি দিকে প্রবল পাপস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল; ধর্ম্মকর্ম্ম ভাসিয়া গেল;—তাহা কেবল প্রথারক্ষার্থ ভজনালয়কে সমধিক আড়ম্বর-পূর্ণ করিয়া তুলিল। সেকালের পর্য্যটকগণ গোয়া নগরীর যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পুরুষেরা একাদিক্রমে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ্য প্রমোদশালায় সময় অতি-বাহিত করিতেন; পরিত্যক্তা পরিণীতাগণ অন্তঃপুরে বসিয়া তাহারই প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা কখনও কখনও স্বামীকে ঔষধপ্রয়োগে অচেতন রাখিয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহারই শয্যার অবমাননা করিতেও কুণ্ঠিতা হইতেন না। মানুষ কত দূর পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, গোয়া নগরী তাহারই প্রসিদ্ধ প্রদর্শনক্ষেত্রে পরিণত হইতে লাগিল!*

* The travellers who visited Goa during its prime tell strange tales of the hardihood with which the Portuguese matrons pursued their

এই সকল কারণে ফিরিঙ্গির নাম, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই বিভীষিকার আধার হইয়া উঠিতে লাগিল। লোকে ফিরিঙ্গির নামে এখনও যে সকল কাহিনীর আলোচনা করিয়া থাকে, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার উপায় নাই। স্বদেশ হইতে বহুসহস্র যোজন দূরে আসিয়া, অসীম ঐশ্বর্য্যের আভাস লাভ করিবামাত্র এইরূপে ফিরিঙ্গি বণিকের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল।

ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গি সেনার সংখ্যা কখনই অধিক ছিল না। অধিক সেনাবলের প্রয়োজন অনুভূত হইবামাত্র, ফিরিঙ্গিরা ভারতবর্ষের লোকদিগকে সেনাদলে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহারাই জলে স্থলে ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্য ও বিজয়গৌরবের প্রধান রক্ষক হইয়া উঠিল। ফিরিঙ্গির সংসারে ক্রীতদাসের প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষেও বহুসংখ্যক ক্রীত-দাস পালন করিতেন। এই সকল ক্রীতদাসদিগের মধ্যে অনেকে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, অনেকে সেনাদলেও প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার বিন্যস্ত করিয়া, ফিরিঙ্গি বণিক্ যখন আলস্যে বিলাসে অভিভূত হইয়া নবাবী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তরের সূত্রপাত হইল।

ইউরোপ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। সে জাগরণের মূলে ভারতবর্ষের প্রভাবই প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান ছিল। ভারতবাণিজ্যে আধিপত্য-লাভ সেকালের ইউরোপের পক্ষে ঐশ্বর্য্যলাভের একমাত্র পথ বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই পথে সকল জাতিই ধাবিত হইয়াছিল। পর্ত্তুগালরাজ ভারত-বাণিজ্যের জলপথ অধিকার করিয়া ভারতসাগরে প্রাধান্যলাভ করিলেও, তাঁহার অধিকার কেবল বাহুবলে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইউরোপের যে কোনও জাতি তাঁহাকে বাহুবলে উৎখাত করিতে পারিত। কিন্তু পোপের আদেশপত্র অগ্রাহ্য করিবার সাহসের অভাবে ইউরোপীয় জনসমাজ উত্তমাশা অন্তরীপের পথে একমাত্র পর্ত্তুগালের অধিকার থাকা স্বীকার করিয়া, অন্য পথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে চেষ্টা সফল হইল না। পশ্চিম সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার চেষ্টা আমেরিকার আবিষ্কারসাধন করিল; উত্তর সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার চেষ্টা বহু লোকের অকাল-মৃত্যুর কারণ হইতে লাগিল। এই সকল প্রবল চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইলেও,

---

amours;—not scrupling to stupify the husband with drugs, and admitting the paramour into his chamber.—Sir W. Hunter's History of British India, vol I. 157.

পর্ত্তুগালের বাণিজ্যাধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোক পর্ত্তুগাল হইতেই ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে বিক্রয় করিত।

ভারতবর্ষ কিরূপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র সভ্যসমাজের অভ্যুদয়-লাভের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে, ইউরোপ ভারতবর্ষের প্রাধান্যের কথা ক্রমে ক্রমে অস্বীকার করিতে চাহিতেছে! তথাপি ফিরিঙ্গি বণিকের ইতিহাস কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাস; তাহার সকল কথাই ভারতবর্ষের কথা।

ভারতবর্ষ কোথায়?—এই চিন্তায় একদিন সমগ্র ইউরোপে যে প্রবল অনু-সন্ধিৎসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, পর্ত্তুগালের কল্যাণে তাহা জনসাধারণের প্রথম কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পর্ত্তুগাল হইতে দলে দলে ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারতবর্ষে গমন করিত; দলে দলে পর্ত্তুগালে প্রত্যাগত হইয়া অলৌকিক ঐশ্বর্য্যবিস্তারে ইউরোপের জনসমাজকে বিস্ময়াপন্ন করিত। সুতরাং ভারতবর্ষ কোথায়, এবং সে দেশে যাতায়াতের উপায় কি, তাহা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু পর্ত্তুগালের অধিপতি ভিন্ন, অন্য কাহারও পক্ষে, ধর্ম্মাচার্য্য পোপের অমোঘ শাসন উল্লঙ্ঘন না করিয়া ভারতবাণিজ্যে অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। তখনও পোপের শাসন উল্লঙ্ঘন করিবার সাহস জন্মে নাই বলিয়া, ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোক ভারতবর্ষে উপনীত হইবার অন্য কোনও জলপথের আবিষ্কার-কামনায় নিয়ত ব্যাপৃত হইয়াছিল। সমগ্র ইউরোপে এই সকল কারণে ভারত-বর্ষের কথাই প্রধান কথা হইয়া উঠিয়াছিল। বাণিজ্যে ভারতশিল্পের একাধিপত্য, নৌবিদ্যালয়ে ভারতযাত্রার জলপথের কথাই একমাত্র কথা ও ধনাঢ্যগণের স্বপ্নেও ভারতবাণিজ্যের স্বপ্নই একমাত্র স্বপ্ন!

ফিরিঙ্গি বণিকের ভোগাভিলাষ যত প্রবল হইতে লাগিল, ইউরোপের দেশে দেশে তাহার পরিচয় তত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কবিকল্পনা তাহাকে নানা ভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া ভাবুক-চিত্তে মোহবিস্তার করিতে ত্রুটি করিল না; পর্য্যটকবর্গ নানা কাহিনী প্রচারিত করিয়া, তাহার কথাই দেশব্যাপ্ত করিতে লাগিলেন। সমগ্র সাহিত্যের ভিতর দিয়াও ইউরোপের দেশে দেশে ভোগাভিলাষের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। নৌ-গঠন ও নৌ-চালন শিক্ষাদান করিবার জন্য বিবিধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সাহসী সুচতুর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নাবিকগণ নানা পথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার আশায় ইউরোপের বিবিধ বন্দর হইতে পোতারোহণ করিতে লাগিলেন।

সমগ্র ইউরোপ যখন এইরূপে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার জলপথের সন্ধানে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়িতেছিল, পর্ত্তুগাল সেই সময়ে ভারত-বাণিজ্যের একাধিপত্য সম্ভোগ করিয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য দেশ বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ত্তুগাল বৃহৎ রাজ্য হইলে, ইউরোপের ক্ষুদ্র রাজ্যের লোকে নিরস্ত হইতে পারিত। পর্ত্তুগাল ক্ষুদ্র রাজ্য। সুতরাং দিনেমার, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ক্ষুদ্র রাজ্যও সাহসে নির্ভর করিয়া পর্ত্তুগালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে ধাবিত হইল। এই চেষ্টাই যে আধুনিক ইউরোপের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূল কারণ, তাহাতে সংশয় নাই। যে সকল ইউরোপীয় জাতি ইহাতে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ-পরম্পরার অভাব নাই।

যাহারা এইরূপে সমগ্র ইউরোপে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, সেই পর্ত্তুগীজগণ কিন্তু বিলাসাতিশয্যে অল্পদিনের মধ্যেই অবসন্ন হইতে লাগিল। তাহাদের দিগ্বিজয়ের গতিরোধ হইল; তাহাদের বীরকীর্ত্তির অবসাদ উপস্থিত হইল; তাহাদের সকল চিন্তা কেবল সম্ভোগের অভিনব উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষ এই সন্ধিকালে অবসন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল। তাহার রাজ-শক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; বাণিজ্যশক্তি ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল পীড়নে পদে পদে প্রতিহত হইয়াছিল; তাহার অধ্যবসায় ও উদ্যম কেবল রাষ্ট্রবিপ্লবের অবসরে রাজ্যগঠনের জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠান-শক্তি খসিয়া পড়িতেছে, মোগল-শক্তি গঠিত হইয়া উঠিতেছে,—এই গৃহকলহের অবসর লাভ করিয়া, সকলেই স্বার্থসাধনের আপাতরম্য প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া জাতিগত প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া গেল।

সেকেন্দর শাহ এসিয়া জয় করিয়া সমগ্র এসিয়াকে গ্রীস দেশের অনুকরণে গঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সে ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়া-ছিল। এসিয়া গ্রীকবেশ ধারণ করে নাই; বরং নানা বিষয়ে গ্রীসদেশেই এসিয়ার শিল্পবিজ্ঞান ও আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারত-বর্ষে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া ভারতরাজ্যে ফিরিঙ্গির প্রভাব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় ফিরিঙ্গি সেনার সহিত ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজা তাহার জন্য নবদম্পতীর কল্যাণকামনায় রাজকোষ হইতে বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু

ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের সংসর্গে ফিরিঙ্গি সেনা দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; তাহাদের সন্তান সন্ততি স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়া ফিরিঙ্গির নাম ক্রমে অধিকতর ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলিল। যাহা অধ্যবসায়ে গঠিত হইয়াছিল, তাহা বিলাসতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া, কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু অধঃপতনের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

বাণিজ্যব্যাপারে রাজার লাভ অধিক থাকিবার সময়ে সেনাদল যথাসময়ে বেতন প্রাপ্ত হইত। রাজার লাভ সঙ্কুচিত হইবামাত্র তাহাদের বেতনপ্রাপ্তির অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তখন তাহারা আর কি করিবে? কেহ ভারতবর্ষের লোকের নিকট বন্দুক বিক্রয় করিয়া, কেহ বা সুযোগ প্রাপ্ত হইলে দেশলুণ্ঠন করিয়া, কেহ কেবল দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্নসংস্থান করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে হতাদর হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, তাহাদের সন্তান সন্ততির দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। এইরূপে গোয়া নগরী এক দিকে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে মত্ত ও অন্য দিকে দৈন্যদুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। যাঁহারা ধনী, তাঁহারা ধনাতিশয্যে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য; যাহারা দরিদ্র, তাহারা উদরের দায়ে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য;—সমগ্র রাজধানী এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিল।

ফিরিঙ্গি বণিকের অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ভারতীয় সেনা ফিরিঙ্গির দিগ্বিজয়সাধনের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধন-শালী হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা ধনশালী হইয়াছিল, তাহারা ফিরিঙ্গির বিলাস-লালসার অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। যাহারা নির্ধন অবস্থায় রাজদত্ত বেতন অথবা লুণ্ঠনের লোভে সেনাদলে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শৌর্য্যবীর্য্যে এই সকল ভারতীয় সেনা সর্ব্বাংশে ফিরিঙ্গি সেনার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা ফিরিঙ্গি বণিকের কাগজপত্রে মুক্তকণ্ঠে পুনঃপুনঃ স্বীকৃত হইয়াছে।* কিন্তু ইহাদের প্রভুভক্তি বা সমরকৌশল ইহা-দিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। পর্ত্তুগালের মন্ত্রিদল সেনাদলের বেতনের মুদ্রা আত্মসাৎ করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না। দেশীয় সেনাদল নানা কারণে ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল।

---

* Certify to your Highness that they are as good as our.—Pedro de Faria's letter I8 January I522.

যে নৌসেনাবল ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল সহায় বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহাও দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পোতাধ্যক্ষগণ বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জনের আশায় বন্দরে বন্দরে যাতায়াত করিয়া সমগ্র নৌসেনাকে বাণিজ্যলুব্ধ করিয়া তুলিলেন। তাহারাও বিলাসের স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে নাগরিকগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিল।

প্রেম।

শিকারীর ডায়েরীর কয় পৃষ্ঠা।

সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে সংবাদস্তম্ভে একটি নাট্যবৈচিত্র্যসম্পন্ন প্রণয়-কাহিনী পাঠ করিলাম! পুরুষটি যখন রমণীকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মঘাতী হইয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই তাহাকে ভালবাসিত। পুরুষই হউক, আর রমণীই হউক, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না, তাহাদের ভালবাসা লইয়াই কথা।

প্রেমকাহিনীটি পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত, বিচলিত, করুণায় আপ্লুত, অথবা ভাববিহ্বল হইয়াছিলাম বলিয়াই যে বিষয়টি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা নহে। ইহাতে আমার যৌবনের একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। সে একদিনকার শিকারের বিচিত্র স্মৃতি। যেমন করিয়া আদিম খ্রীষ্টীয়ানদিগের নয়ন-সমক্ষে অন্তরীক্ষে ক্রুশ-চিহ্ন আবির্ভূত হইয়াছিল, সে দিনও তেমনই করিয়া প্রেম আমাকে দেখা দিয়াছিল।

আমি আদিমমানবোচিত সংস্কার ও মনোবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সেগুলি তত স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিকার করিতে বড় ভালবাসিতাম। রুধিররঞ্জিত বিহঙ্গমটিকে হাতে তুলিয়া লইলে যখন রক্তে আমার হাত ভাসিয়া যাইত, তখন প্রবল আবেগ-প্রবাহে আমার হৃদয়-স্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম হইত।

সে বৎসর সহসা হেমন্তের শেষভাগে প্রবল শীত পড়িয়াছে, এমন সময় একদিন Kare de Ranville নামক আমার এক ভ্রাতা, প্রত্যূষে বিলে তাঁহার সহিত হংস শিকার করিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

আমার ভ্রাতা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। কেশ-

কলাপ রক্তবর্ণ, দেহ স্থূল, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুসমাকীর্ণ। পল্লীবাসী, অর্দ্ধসভ্য ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হইলেও, তিনি এমন অমায়িক ও সুরসিক ছিলেন যে, তাঁহার দিনগুলি অতি সুখ স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইত। বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্যে তাঁহার পল্লীভবন। এই উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বহিয়া গিয়াছে। দক্ষিণে ও বামে শৈলমালাও অরণ্যানীপরিবৃত। কত দিনের পুরাতন অরণ্য! তন্মধ্যে বহুদিনের প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষসমূহ দণ্ডায়মান। এই স্থানই ফরাসীদেশীয় দুর্লভদর্শন শিকারোপযোগী বিহঙ্গমসমূহের আবাসস্থল। মধ্যে মধ্যে সেই বনে ঈগল পক্ষী বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায়। যে সকল ঋতু-বিহঙ্গ (Birds ef passage) অত্যন্ত জনবহুল স্থানে কখনও দেখা যায় না, তাহারা এই প্রাচীন অরণ্যের শত শত বর্ষের পুরাতন বৃক্ষশ্রেণীর আশ্রয়ে প্রায়ই আসিয়া বিশ্রাম করে; যেন তাহারা বিলক্ষণ অবগত আছে যে, সে কালের বৃহৎ অরণ্যানীর অংশবিশেষ তাহাদের রাত্রিবাসের উপযোগী করিয়া রাখা হইয়াছে।

উপত্যকাভূমি বিশাল ক্ষেত্রমালায় বিভক্ত, বৃতিসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং পয়ঃপ্রণালীর জলধারায় অভিষিক্ত। এই ক্ষেত্ররাজির সুদূরপ্রান্ত অবধি আসিয়া স্রোতস্বিনী সহসা বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া বিলের জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই বিলের মত উৎকৃষ্ট শিকারের স্থল আর আমি কখনও দেখি নাই। লোকে যেরূপ যত্নসহকারে উদ্যান রক্ষা করে, আমার ভ্রাতাও এই বিলটি ঠিক সেইরূপ ভাবেই রাখিয়াছিলেন। এই বিশাল বিল সুদীর্ঘ তৃণপুঞ্জে সমাকীর্ণ। বিলের অসমশীর্ষ তৃণরাজি কখনও বায়ুভরে মৃদুভাবে হেলিতেছে, দুলিতেছে, কোমল মর্ম্মর-রবে মুখরিত হইতেছে। এই তৃণসমাকীর্ণ বিলের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে। সেই পথে বদ্ধ জলের উপর দিয়া বেণুদণ্ডচালিত তরণী নিঃশব্দে গমনাগমন করে। তরণীতে তৃণের সংস্পর্শমাত্র ভীত মীনদল দ্রুতবেগে নল-বনের মধ্যে লুক্কায়িত হয়। কৃষ্ণবর্ণ জলচর বিহঙ্গমগণ সহসা জলতলে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমি জল বড় ভালবাসি। সমুদ্র সুবিশাল ও চিরচঞ্চল,—তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। স্রোতস্বিনী লীলাললিতগামিনী, অমিতবেগশালিনী—অবারিত-গতি। সর্ব্বাপেক্ষা বিলই অদ্ভুত। এখানে অপরিজ্ঞাত জলচর প্রাণিকুলের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। পৃথিবীতে বিলই একটি স্বতন্ত্র জগৎ। ইহার অস্তিত্বও স্বতন্ত্র। বিলের অধিবাসী ও আগন্তুক, সকলই বিচিত্র। ইহার জয়ধ্বনি বিচিত্র, কোলাহলও বিচিত্র, সর্ব্বাপেক্ষা ইহার রহস্যরাশির মত বিচিত্র আর

কিছুই নাই। জলাভূমির মত বিরক্তিকর, অপ্রীতিকর, এমন কি, সময়বিশেষে ভয়ঙ্কর,—এমন আর কিছুই নাই।

জলাকীর্ণ এই নিম্নভূমির দিকে চাহিলে হৃদয়ে এমন আতঙ্কের সঞ্চার হয় কেন? জলজ তৃণপুঞ্জের অস্ফুট মর্ম্মরধ্বনি, অদ্ভুত আলেয়ার সমাবেশ, অথবা শান্ত নিশীথের সর্ব্বব্যাপী গভীর নিস্তব্ধ-ভাবই কি এই ভয়ের কারণ? কিংবা যে কুজ্ঝটিকা-জাল শব-বসনের ন্যায় বিলের উপর বিলম্বিত থাকে, তাহাই ভয়াবহ? অথবা বিলের সেই জলোৎক্ষেপণ-শব্দ, যাহা অতি মৃদু, অতি কোমল, অথচ সময়বিশেষে দেবতার বজ্র ও মানবের কামানের ভীষণ গর্জ্জন অপেক্ষা অধিক ভয়ানক,—সেই শব্দই কি বিলকে অপরিজ্ঞাত-বিপদ্-সঙ্কুল, অচিন্ত্য-রহস্যপূর্ণ, স্বপ্নদৃষ্ট লোকের ন্যায় ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে?

না, তাহা নহে;—আরও একটি গভীর ও গম্ভীর রহস্য বিলের নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালের গর্ভে প্রচ্ছন্ন থাকে। বুঝি সে রহস্য বিশ্বসৃষ্টিরই রহস্য। একদিন কি নিবিড়বাষ্পাবগুণ্ঠিতা ধরণীর পঙ্কিল ও স্থির জলে রবিরশ্মিস্পন্দিত প্রথম জীবন-বীজ অঙ্কুরিত ও দিবালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই?

সন্ধ্যাকালে আমি আমার ভ্রাতার গৃহে পৌছিলাম। বড় শীত। দুরন্ত শীতে পাথর ভাঙ্গিবার উপক্রম হইতেছে।

যে কক্ষে বসিয়া আমরা আহার করিতেছিলাম, তাহার ছাদ, প্রাচীর ও 'সাইড্-বোর্ড' বিবিধ সজীব-বৎ পক্ষিসমূহে সুশোভিত। বাজ, বক, পেচক, শকুন প্রভৃতি কত পক্ষী,—পক্ষীগুলি কীলকবিদ্ধ;—কেহ প্রসারিতপক্ষ, কেহ বা শাখাসীন। আমার ভ্রাতা 'সীল'-চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া শীতপ্রধান দেশের একটি অদ্ভুত জন্তু বলিয়া বোধ হইতেছিল। শিকারের কি কি আয়োজন হইয়াছে, আহারে বসিয়া তিনি আমাকে তাহার পরিচয় দিলেন।

আমরা রাত্রি ৩৷৷০ ঘটিকার সময় শিকারে বাহির হইব, নচেৎ ৪৷৷০টার পূর্ব্বে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌছিতে পারিব না। উষার প্রবল হিমবায়ু হইতে কিয়ৎপরিমাণে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেখানে একটি তুষারকুটীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সে বায়ু এত শীতল যে, উহার সংস্পর্শমাত্র বোধ হয়, অঙ্গ যেন করাত দ্বারা ছিন্ন, ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ণ, বিষসূচীর দ্বারা বিদ্ধ ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া গেল। আমার ভ্রাতা হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "আমি এমন শীত কখনও দেখি নাই।"

আহারান্তে আমি শয়ন করিলাম, এবং অগ্নিকুণ্ডস্থ উজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে নিদ্রাভিভূত হইলাম। ঠিক তিনটার সময় আমার ভ্রাতা আমাকে ডাকিয়া তুলিলেন। আমি মেষচর্ম্মপরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। আমার ভ্রাতা ভল্লুক-চর্ম্মে দেহ আবৃত করিলেন। দুই জনে দুই পেয়ালা অত্যুষ্ণ কাফি ও গ্লাস কতক তরল ব্রাণ্ডি পান করিবার পর, আমাদের শিকার-রক্ষক ও Plougeon এবং Pierrot নামক কুকুর দুটিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাহিরে আসিবামাত্র মনে হইল, অস্থিমজ্জা যেন হিমে জর্জ্জরিত হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, যেন সমস্ত পৃথিবী শীতে মৃতপ্রায় হইয়াছে। ঘনীভূত বাতাসে এরূপ যন্ত্রণা হইতে লাগিল যে, বায়ু স্পর্শগম্য ও দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হইল। বায়ু একেবারে নিশ্চল ও স্পন্দহীন; লেশমাত্র বায়ুসঞ্চার অনুভূত হইতেছে না। এই শীতবায়ু অঙ্গে দংশন করিতে লাগিল, অস্থি ভেদ করিতে লাগিল, আমাদিগকে শুষ্ক করিতে লাগিল। তরু, লতা, কীট, পতঙ্গ এই হিম-বায়ুসংস্পর্শে মরিয়া যাইতেছে। বৃক্ষশাখাচ্যুত ক্ষুদ্র বিহঙ্গমগণ দৃঢ় ভূমির উপর পড়িয়া তুষারবৎ কঠিন হইয়া যাইতেছে।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর ক্ষীণ শশাঙ্ক সুদূর গগনপ্রান্তে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ব্বলতাবশে অস্তাচলের দিকে আর পা উঠিতেছে না। তাই দুরন্ত শীতে জর্জ্জরিত ও স্পন্দহীন হইয়া অন্তরীক্ষে স্থির হইয়া আছে। ম্লানমন্দ চন্দ্রালোকে সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রতিমাসে কৃষ্ণপক্ষের শেষভাগে এমনই মৃদু জ্যোৎস্নায় পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়।

বগলে বন্দুক লইয়া, পকেটে হাত লুকাইয়া, আনতদেহে আমি ও কারল্ পাশাপাশি চলিতেছিলাম। হিমশিলায় পরিণত নদীবক্ষ দিয়া যাইবার সময় পদস্খলননিবারণের জন্য পশমমণ্ডিত পাদুকা পায়ে দিয়াছিলাম। তাই কোনরূপ পদশব্দ হইতেছিল না। আমাদের কুকুর দু'টির মুখনিঃসৃত নিশ্বাসে বাষ্প উৎপন্ন হইতেছিল।

শীঘ্রই আমরা বিলের ধারে আসিয়া শুষ্কতৃণপরিবৃত সংকীর্ণ বনপথে প্রবেশ করিলাম। আমাদিগের কফোনীতে পথের উভয়পার্শ্বস্থ তৃণরাজির সংস্পর্শে মৃদু মৃদু শব্দ হইতে লাগিল। বিলে আসিলেই আমার মন অপূর্ব্ব মোহে আবিষ্ট হয়, কিন্তু এবারে আমি যেমন অভিভূত হইয়া পড়িলাম, এমন আর কখনও হই নাই। রসলেশহীন তৃণবীথির ভিতর দিয়া আমরা যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই বোধ হইতেছে, বিলটি শীতের প্রকোপে মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

অকস্মাৎ পথের প্রান্তদেশে আসিয়া তুষারনির্ম্মিত আশ্রয়কুটীর দেখিতে পাইলাম। আমি কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। জলচর বিহঙ্গমকুলের নিদ্রাভঙ্গের এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে দেখিয়া, শীতনিবারণের জন্য কম্বল মুড়ি দিলাম।

আমি শয়ন করিয়া ঈষৎ-স্বচ্ছ তুষারপ্রাচীরের মধ্য দিয়া বিকৃতদেহ চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম;—দেখিলাম, চন্দ্রের যেন চারিটি শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

বিলের হিমবায়ু, প্রাচীরের শৈত্য ও বাহিরের শীতলতা এমন ভাবে আমার শরীরে প্রবেশ করিল যে, আমি কাশিতে আরম্ভ করিলাম।

আমার ভ্রাতা কিছু চিন্তিত হইলেন; বলিলেন, "যদি আমরা আজ বেশী কিছু শিকার করিতে না পারি, কি হইবে? তাই বলিয়া তোমাকে ঠাণ্ডা লাগাইতে দিব না। এস, আমরা আগুন জ্বালি।" এই বলিয়া শিকার-রক্ষককে কতকগুলি শুষ্ক তৃণ কাটিয়া আনিতে বলিলেন।

আমরা সেই তুষারকুটীরের মধ্যে শুষ্ক তৃণ-পর্ণের স্তূপ রচনা করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলাম। ছাদের মধ্যভাগে ধূমনির্গমের জন্য একটি রন্ধ্র ছিল। যখন অগ্নি রক্তবর্ণ উজ্জ্বল শিখাপুঞ্জ বিস্তার করিয়া গৃহের মধ্য দিয়া উত্থিত হইল, তখন তাপসংস্পর্শে সে গৃহের তুষারপ্রাচীর ও ছাদ অল্প অল্প গলিতে লাগিল। মনে হইল, তুষারশিলাসমূহের স্বেদস্রুতি হইতেছে। কারল্ বাহিরেই ছিলেন। তিনি আমায় ডাকিলেন, "এস, এখানে এসে দেখ।" আমি কুটীরের বাহিরে গেলাম, এবং বিস্ময়ে বিহ্বল হইলাম। আমাদিগের হিম-গৃহ বিলের বিশাল তুষারবিস্তারমধ্যে একখানি সুবৃহৎ অগ্নিগর্ভ হীরকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কুটীরমধ্যে দুইটি বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমাদিগের কুকুর দুইটি আগুন পোহাইতেছিল।

অকস্মাৎ আমাদের মাথার উপর দিয়া অদ্ভুত দিগন্তব্যাপী স্বরতরঙ্গ বহিয়া গেল, এবং আমাদের অগ্নিকুণ্ডের আলোকে বন্যপক্ষিসমূহ দেখিতে পাইলাম। শীতপ্রভাতের প্রথম ক্ষীণ রশ্মিরেখা দিগন্তে প্রকটিত হইবার পূর্ব্বে তিমিরাবগুণ্ঠিত গগনের মধ্যপথবাহী, অতিদ্রুত ও দূরগামী অলক্ষিত জীবের প্রথম কলশব্দে মানব যেমন বিচলিত হয়, এমন আর কিছুতে নয়। হিমক্লান্ত প্রভাতে সেই দিগন্তব্যাপী কলধ্বনি পৃথিবীর কোনও আত্মার দীর্ঘনিশ্বাস বলিয়া মনে হইল।

কারল্ বলিলেন, "আলো নিবিয়ে ফেল, ভোর হোয়ে আস্‌ছে।"

বাস্তবিকই আকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। দ্রুতগামী ও দীর্ঘ রেখাবৎ হংসশ্রেণী দেখিতে দেখিতে আকাশপটে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

অকস্মাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটি আলোকরেখা দেখা দিল,—কারল গুলি করিয়াছে! কুকুর দু'টি সম্মুখে ছুটিয়া গেল।

তাহার পর প্রতি মুহূর্ত্তেই তৃণের উপর বিহঙ্গমদলের ছায়া পড়িবামাত্র, কখনও বা কারল, কখনও বা আমি, গুলি চালাইতে লাগিলাম।

পিয়ারেট ও প্লন্‌জন্ দ্রুতনিঃক্ষিপ্তশ্বাসে আনন্দভরে আমাদের জন্য রক্তাক্ত পাখীগুলি কুড়াইয়া আনিতে লাগিল। তখনও আহত পাখীগুলি এক একবার আমাদের দিকে চাহিতেছিল।

সূর্য্য উঠিয়াছে। আকাশ ঘননীল। দিনটি অম্লান ও উজ্জ্বল। আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিব মনে করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, দুইটি পক্ষী গ্রীবা প্রসারিত ও পক্ষ বিস্তৃত করিয়া আমাদের মস্তকের উপর দিয়া দ্রুতবেগে উড়িয়া যাইতেছে। আমি গুলি করিলাম। একটি পাখী ঠিক আমার পদপ্রান্তে পতিত হইল। চাহিয়া দেখি, সেটি রজতবক্ষ (Teal) 'বিগড়ী' হাঁস*। আমি পাখীটিকে তুলিয়া লইলাম। ঠিক সেই সময়ে বিহঙ্গের আকুল আর্ত্তরবে নীলিমা-মণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল। সে ধ্বনি কি হৃদয়ভেদী! কি তীব্র! অনাহত বিহঙ্গমটি তাহার গতজীবন সহচরের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমাদিগের মস্তকোপরি আকাশমার্গে মণ্ডলাকারে উড়িতে লাগিল।

কারল জানু পাতিয়া, বন্দুক তুলিয়া, সাগ্রহে পাখীটিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। বন্দুকের অগ্নিবর্ষণসীমার মধ্যে আসিলেই তিনি পাখীটিকে গুলি করিবেন। কারল বলিলেন, "তুমি পক্ষিণীকে মারিয়াছ; পক্ষীটি উড়িয়া যাইবে না।"

সত্যই পাখীটি উড়িয়া গেল না। ক্রমাগত আমাদের মস্তকোপরি মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে চীৎকার করিতে লাগিল। আর্ত্তনাদ আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এই পাখীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক আকুল-আহ্বান,—দিগন্তব্যাপী, তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি আমার হৃদয়ে যেরূপ বেদনার সঞ্চার করিতেছিল, এমন আর কখনও হয় নাই।

---

* বঙ্গের সুপ্রথিত জীবতত্ত্ববিৎ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সান্ন্যাল মহাশয় আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—"স্কুল-মাষ্টারী ভাষায় বলিতে গেলে, 'Teal' হংসবিশেষ। সচরাচর দুই প্রকার Teal দেখিতে পাওয়া যায়। (1) Common Teal. Bengali name *Naroib* কিংবা *Gulsia Bigri*, বিগড়ী হাঁস। (2) Blue-winged Teal. Bengali name *Gangroib*, or *Giria*. 'জীবতত্ত্ব' আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত নয় বলিয়া বোধ হয় পরিভাষা নাই। Teal অন্যান্য হাঁসের মত শীতকালে এ দেশে আসে, গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে চলিয়া যায়।"—সাহিত্য-সম্পাদক।

এক একবার গুলি করিবার উপক্রম করিবামাত্র বন্দুকের সম্মুখ হইতে পাখীটি পলায়ন করিতে লাগিল। দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন আর ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু আবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আপনার সহচরীর অন্বেষণ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিতেছিল।

কারল্ বলিল, "আহত পাখীটি মাটীর উপরে রাখ। ক্রমে ক্রমে পাখীটি বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিবে।"

বাস্তবিকই পাখীটি প্রাণিসুলভ প্রেমবশে সদ্যোনিহত পক্ষিণীর ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া আমাদের নিকটবর্ত্তী হইল।

অমনই কারল্ গুলি করিল। মনে হইল, যে সূত্র অবলম্বন করিয়া পক্ষীটি শূন্যমার্গে বিচরণ করিতেছিল, কে যেন সহসা তাহা ছিন্ন করিয়া দিল। দেখিলাম, একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ মাটীতে পড়িতেছে। তৃণপুঞ্জমধ্যে একটা পতন-শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিয়ারেট পক্ষীটিকে আমার কাছে আনিয়া দিল।

আমি হিমাঙ্গ পক্ষিযুগলকে একই শিকারের থলির ভিতর রাখিলাম। সেই রাত্রেই পারিস নগরীতে পৌঁছিলাম। *

বিধবা।

গভীর দুপুর পৌর্ণমাসী নিশি;
নিস্তব্ধ, নিঃস্পন্দ, দশ দিশি;
স্তব্ধ ভুবন, স্তব্ধ গগন;
ধরণীটি নিদ্রামগন;
চাঁদের কিরণ পড়েছে তার মুখে,
শস্যক্ষেত্রে, বনস্থলে,
কালো দীঘির কালো জলে,
বিজন পথে, বিজন মাঠের বুকে।

গাভীরা সব ঘুমায় পীড়ে;
পাখীরা সব ঘুমায় নীড়ে;

* গীদে মোপাসাঁ হইতে অনুদিত।

মানুষরা সব ঘুমায় নিজের ঘরে ;
আকাশে মেঘ ঘুমিয়ে আছে ;
পুষ্পগুলি ঘুমায় গাছে ;
ঘুমায় সবাই বিশ্ব-চরাচরে।
কেবল ধীরে, অতি ধীরে,
ঢেউয়ের মত, বিশ্বতীরে—
মাঝে মাঝে বাতাস লাগ্‌ছে আসি ;
কেবল দূরে, অতি দূরে,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, মেঠো সুরে,
উঠ্‌ছে কোন্ এক হতভাগ্যের বাঁশী।

* * * *

এমন সময়, শূন্য ঘরে,
কে গো তুমি ভূমে পড়ে,
বসে' মুক্ত বাতায়নের মূলে ?
একাকিনী আছো চেয়ে,
কে তুমি সুন্দরী মেয়ে,
স্রস্তবসন, স্রস্ত এলোচুলে ?
ছড়িয়ে দুটি রাঙ্গা পায়ে,
হেলান দিয়ে কবাট-গায়ে,
মরালগ্রীবা বাঁকিয়ে বাইরের দিকে ;
একটি হস্ত ন্যস্ত ক্রোড়ে,
একটি গরাদেটি ধোরে,
চেয়ে আছো কে গো অনিমিখে ?
দেখছো কি মা ? পথে, গাছে,
এমন কি মা ! দেখ্‌বার আছে,
এতক্ষণ যা দেখ্‌তে লাগে ভালো ?
কুঞ্জ-বনের শ্যামল কায়া ?
মাঠের হরিৎ ? গাছের ছায়া ?
দীঘির জলে, চাঁদের সাদা আলো ?

আকাশ সুনীল, ধরা শ্যামা,
কিছুই তুমি দেখ্‌ছ না মা ;
দেখ্‌ছো, বসে' বাতায়নের ধারে,—
জীবন-গ্রন্থখানি খুলি',
অতীত কালের পৃষ্ঠাগুলি,
উল্‌টে পাল্‌টে তাহাই বারে বারে।

দেখ্‌ছো মানস চক্ষু দিয়ে,
ভূতকালে ফিরে গিয়ে,
(এখন থেকে ষোড়শ বর্ষ পাছে,
স্মৃতিবলে কর্‌ছ চারণ ;)
কর্‌ছ অতীত জীবনধারণ ;—
চর্ম্ম-চক্ষু চেয়ে মাত্র আছে।

* * * *

কত কথা মনে আসে ;
কত লুপ্ত ইতিহাসে,
—গাঢ়ভাবে ছেয়ে আছে স্মৃতি।
কত ক্ষুদ্র সুখ ব্যথা,
বাল্যকালের কত কথা,
কত হাস্য, কত গল্প, গীতি।

মনে পড়ে,—সকাল বেলা,
বাড়ীর ছায়ায়, ঘুঁটি খেলা ;
ফল্‌সা পাড়্‌তে গাছের উপর ওঠা।
মনে পড়ে,—চাঁপায় ঘিরে
ভোমরাগুলো ঘোরে ফিরে ;
মনে পড়ে অশোক কুসুম ফোটা।

মনে পড়ে,—বেলা দুপর,
ছায়ায়, শ্যামল ঘাসের উপর,
রৈতে বসে'—দেখ্‌তে চেয়ে চেয়ে
পুরুষগুলো নাইছে ঘাটে,

গাভীগুলো চর্‌ছে মাঠে,
পদ্মগুলো কালো দীঘি ছেয়ে।

মনে পড়ে,— সন্ধ্যাকালে,
ফেরে গাভী পালে পালে;
অস্তগামী রবির শোভা কত,—
কিরণ, আকাশ ছাপিয়ে এসে,
পৃথিবীতে পড়েছে সে,
সাজিয়ে তারে বিয়ের কনের মত।

রাত্রিকালে—ঘরের কোণা,
দিদিমায়ের গল্প শোনা;
রামের বিয়ে, কীর্ত্তি ভুলো ক্ষ্যাপার,
জটাই বুড়ী, হীরের মাটী,
মরণ-কাটী, জীয়ন-কাটী,
ভূতের যত অনাসৃষ্টি ব্যাপার।

কত সুদিন, এমনি এসে,
ভেসে চলে গিয়েছে সে,
সকাল, দুপর, সন্ধ্যা, রাত্রিবেলা;
ভাবনা চিন্তা নাহি জানে;
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি মানে,
কেবল হাস্য, গীতি, গল্প, খেলা।

পরে একদিন—মনে পড়ে,—
শুভ কোলাহল-স্বরে,
শুভবাদ্যে, শুভ শঙ্খরবে,
দীপোজ্জ্বল গৃহাঙ্গনে,
শুভলগ্নে, শুভক্ষণে,
সুসজ্জিত শুভ মহোৎসবে,—
আপন জনে করে' পর,
গেলে তুমি পরের ঘর,—
কর্‌তে গেলে পরেরি জনে আপন;

বুঝ্‌লে পতি কারে বলে,
বাস্‌লে ভালো ধরাতলে,
করলে দুটি মধুর বর্ষযাপন।

* * * *

কি মধুর সে বর্ষ দুটি!
যেন একটা লাগাও ছুটী;
যেন একটা অবিশ্রান্ত গীতি;
যেন একটা মলয় হাওয়া;
যেন শুদ্ধ ভেসে যাওয়া;
যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে স্থিতি।

এ জীবনে সে সুখ পরম!
সর্ব্ববিধ সুখের চরম!
সে সুখে নাই কলঙ্ক কি ত্রুটি;
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে;
মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে;
প্রেমের সেই সে প্রথম বর্ষ দুটি!

আজি, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
সে সব কথা মনে পড়ে,—
মনে পড়ে প্রাণের কথা নানা;
প্রথম দিনে, শুভক্ষণে,
অজানিত-পূর্ব্ব জনে
এ সংসারে আপন বলে' জানা।

মনে পড়ে,—শ্বশুরঘরে,
কত ক্ষুদ্র ছলভরে
নিত্য পতির কাছ দিয়ে যাওয়া;
তাহার মুখটি অতুল সৃষ্টি;
তাহার স্বরটি সুধাবৃষ্টি;
লুকিয়ে শোনা, লুকিয়ে তারে চাওয়া।

মনে পড়ে,—পতির, বধূর,
নিভৃতে সে মিলন মধুর ;—
সে চাহনি, সেই যুক্তপাণি ;
অন্ততঃ একদিনের জন্য
বুঝ্‌তে পারা ভাষার দৈন্য ;
অসংলগ্ন সে অস্ফুট বাণী ;

অর্থশূন্য নানা উক্তি ;
ভালবাসা নিয়ে যুক্তি,—
"তুমি ভালবাস না, তা জানি !"
"বাসি", "বাসি", "বাসি",—তারে
বল্‌তে হ'বে বারে বারে ;
অবিশ্বাস্য তথাপি সে বাণী।

অভিমানে ফিরে চাওয়া ;
হস্ত দুয়েক দূরে যাওয়া ;
দাঁড়ানো ; ও ফিরে গিয়ে সাধা ;
চেষ্টা করে' বিবাদ-সৃষ্টি ;
চেষ্টা করে' বিরাগ-দৃষ্টি ;
প্রাণপণে চেষ্টা করে' কাঁদা।

দুটি বর্ষ গেল কি এ ?
চলে' গেল কোথা দিয়ে ?
বিধির বিধি এমনি পরিপাটী !
সুখের বছর হয় সে গত
একটি ছোট দিনের মত,
দুখের বছর যুগের মত কাটে।

একদিন, এখন মনে আসে,
প্রথম একদিন, চৈত্রমাসে,
পূর্ণচন্দ্রজ্যোৎস্নালোকে, একা,
বসেছিলে বাড়ীর ছাদে,
ছিলে চেয়ে পূর্ণ চাঁদে ;

ঝাউয়ের প্রান্তে যাচ্ছিল সে দেখা ;—

বইতেছিল বাতাস মধুর ;
গাইতেছিল দোয়েল অদূর
বকুলগাছে ; এমনি সুনীল গগন ;
সেও যে এমনি রাত্রি দুপর,
একা তুমি ছাদের উপর
ছিলে বসে', স্বামীর চিন্তায় মগন।

কি যে গাঢ় চিন্তা ভয় সে ;
কি সন্দেহ অনিশ্চয়, সে ;
হৃদিতলে কি সে অন্তর্দাহ ;
নাইক নিদ্রা নেত্রপুটে ;
হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠে ;
কেন ?—পত্র পাওনি দু' সপ্তাহ।

সে শঙ্কা,—উভয়ের ভবে
হয় ত আর না দেখা হ'বে ;
অমনি বিশ্ব লুপ্ত অন্ধকারে।
তবে তারো মধ্যে লেখা
ছিল একটি আশার রেখা ;—
'হয় ত আবার দেখা হতেও পারে।'

কিন্তু আজি, শুভাশুভ
জীবনের যা', জানো ধ্রুব ;—
দেখ্ছো তুমি স্পষ্টাক্ষরে লেখা,
নিবিড় ভাবে, কালো ছত্রে,
বিশ্ব-খাতায় জীবন-পত্রে,—
তার সঙ্গে আর হ'বে নাক দেখা !

যত আছে নিগূঢ় তথ্য,
এর চেয়ে নয় কিছু সত্য,
সেটা আজি দেখ্ছো বসে' তুমি ;

যতখানি হেঁটে যাচ্ছ,
যতখানি দেখ্‌তে পাচ্ছ,—
ধূ ধূ কচ্ছে জীবন মরুভূমি।
মহাশূন্য, দগ্ধ সে যে,
জ্বল্‌ছে অন্ধ-কারী তেজে,
অগ্নি নিয়ে খেলা কচ্ছে বায়ু;
নাইক বারি, নাইক তরু,
কেবল বালু, কেবল মরু,
শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

* * * *

রাত্রি গভীর হ'তে গভীর!
পট-প্রান্তে বিশ্ব-ছবির
জ্যোৎস্নারেখা মুছে গেল ধীরে;
অলস হয়ে' এলে আঁখি;
গরাদেতেই মাথা রাখি'
ঘুমিয়ে পড়্‌লো আমার জননী রে।

* * * *

হায় রে মানুষ! বিধির কৃত্য
চোখের সাম্‌নে দেখছি নিত্য;
তবু আমরা চক্ষু বুজে' থাকি!
খোসামোদের মন্দির খুলে,
মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে,
উচ্চৈঃস্বরে, "দয়াল!" বলে' ডাকি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

অনর্থক।

সংসারে অনেক কথার অর্থ নাই। অনেক কথার অর্থ থাকিলেও, তাহা আমরা সে অর্থে ব্যবহার করি না। অনেক কথার অর্থ ভাবিতে গেলে

অনর্থক সময় নষ্ট হয়! "কর্ম্ম" নামক কথাটা ইহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বিশ্বসংসারই কর্ম্মময়, অথচ কর্ম্মটা যে কি, তাহা ভাবিতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু না ভাবিয়াও থাকা যায় না। তাই ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে শুনিতে পাই, কর্ত্তা কর্ম্ম করেন না। কর্ম্মের রূপ পরিবর্ত্তনশীল, এবং এক কথায় তাহা শক্তি কিংবা মায়ার বিকাশ। সেটা স্বপ্নের মত। অন্য কথায়, প্রকৃতি দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়। কর্ম্মের উপাদান, কিংবা মাল্ মশলা, কিংবা কল কারখানা, সেটাও জড়ভরতের মত। তাহার অন্য একটা নাম দেহ। দেহ কর্ম্ম করিলে তাহার নাম হয় ভূত। অতি ক্ষুদ্র ভূতের নাম পরমাণু। কর্ম্ম বন্ধ হইলে, মুল উপাদান, কিংবা দেহের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। সেটাও মায়া।

কর্ম্মের বিকাশে, কিংবা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হাতযশে, নানাপ্রকারের ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা রাসায়নিক ভূতগণকে দেখিয়াছি। তাহা অপেক্ষাও নাকি সূক্ষ্ম ভূতগণ আছে। এবং ইহারা সাতটা লোক অধিকার করিয়া থাকে। নানাবিধ ভূতগণ, কিংবা প্রজাগণ, যে শক্তি দ্বারা, কিংবা যে মায়া দ্বারা এই বিশ্বরাজ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার নাম ক্রিয়াশক্তি।

এই গেল কর্ম্মের প্রথম রূপ।

কিন্তু ভূতগণ কেবল ঘুরিয়া বেড়ায় না। ইহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। এটা সমূহ ল্যাঠা। একটা ভূত আর একটা ভূতের সহিত মিলিয়া ভাগ হয়। কোনটা অন্য একটার সহিত মিলিয়া জল ও স্থল হয়। কতকগুলির সংমিশ্রণে অগ্নি হয়, বায়ু হয়, এবং কত কি হয়। অর্থাৎ, দুইটা কর্ম্ম মিশিয়া একটা কর্ম্ম-ফল হয়। কর্ম্মফলে একটা নূতন রকমের ভূত হয়, এবং খানিকটা ভাগবিশিষ্ট হইয়া হয় ত মূল-রূপে পরিণত হয়।

হাইড্রোজেন নামক ভূত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল হয়। সেই সময় খানিকটা উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। জল নামক ভূত একটু ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। উত্তাপটা কাজেই নিজের রাস্তা দেখিয়া অন্য স্থানে যায়। এটা পূর্ব্বের মোট কর্ম্মের খানিক অংশমাত্র। এইরূপ অনেক ভূত আছে, যাহাদিগকে সংযুক্ত করিলে তাড়িত নামক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়। কোনটাতে শব্দও বাহির হয়।

যেমনই হউক না কেন, কর্ম্মের বিনাশ নাই। যতখানি কর্ম্মের গুণে ভূত একটা রূপ লইয়াছিল, আবার ততখানি কর্ম্ম নিযুক্ত করিলে ভূত পূর্ব্বের আকার

গ্রহণ করিতে পারে। কর্ম্ম কিংবা শক্তির সাতত্যই একটা বিশ্বমায়ার অনির্ব্বচনীয় মহিমা। ভূতগুলিকে যুক্ত করিতেও যাহা পরিশ্রম, ভূত ছাড়ানও তদ্রূপ। উভয়ই স্থষ্টির লীলা। উভয়ই প্রকৃতির বাহাদুরী।

কর্ম্মের একটা আড়ত নিশ্চয় আছে। যদি মনে করা যায়, সেখানে যত শক্তি নিহিত ছিল, কিংবা সেটাকে যদি কেন্দ্র বলিয়া কল্পিত করা হয়, তাহা হইলে, খানিকটা শক্তি প্রথমতঃ ভূতগণকে ব্যক্ত করিতেই যায়, অর্থাৎ ভূতগণকে একটা কর্ম্ম হইতে বহুকর্ম্মবিশিষ্ট করিতে ব্যয় হইয়া থাকে। উত্তাপরূপ কর্ম্ম পাইয়া ভূতগণ বর্দ্ধিত হয়। এ দিকে কেন্দ্রস্থলে কর্ম্মের অবশিষ্ট অংশ কমিতে থাকে। সূর্য্য নামক কেন্দ্রে উত্তাপ কমিতেছে; কারণ, ভূতগণের বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার। চট্টোপাধ্যায়ের বংশবিস্তারে তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিতেছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এইরূপে ক্রমান্বয়ে হইতে পারে না। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অন্য একটা বাহাদুরী আছে; তদ্দ্বারা তিনি ভূতগণকে একত্র করিতে থাকেন, এবং তাহা হইতে, অর্থাৎ কর্ম্মফল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া ক্রমে কেন্দ্রস্থল অলক্ষ্যভাবে পরিপুষ্ট করিতে থাকেন। শেষে কেন্দ্রস্থলে যত কর্ম্ম ও অকর্ম্ম গিয়া একত্র হয়। ইহার ফলে সব ভূতই অদৃশ্য হয়।

তাই শাস্ত্র বলেন, ভূতগণ মধ্যস্থলে ব্যক্ত। তাহাদিগের আদি ও অন্ত অব্যক্ত। ইহার নাম প্রণয়। কেন্দ্রের নাম লয়স্থান। ইহা রুদ্রমূর্ত্তিবিশিষ্ট। যে শক্তি দ্বারা ভূতগণ লয় পাইয়া থাকে, তাহা ইচ্ছাশক্তি।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াশক্তি ও তদ্বিপরীত লয়শক্তির মধ্যে যে অদ্ভুত বিশ্ব-লীলা প্রকটিত হইয়া থাকে তাহার সাক্ষী কে? কে সেটা জানে? তাহার প্রমাণ কি?

শাস্ত্র বলেন যে, কর্ত্তা যদিও কর্ম্ম করেন না, যেহেতু প্রকৃতিবশে তাহা হইয়া থাকে, তথাপি কর্ত্তা আসল কথাটা জানেন। কর্ত্তার মধ্যে কর্ম্মও আছে, কর্ম্মটা বুঝিবার যন্ত্রও আছে। কর্ম্মটা উভয় দিকে ভাগ হইয়া গেলে কর্ত্তা মধ্যস্থলে থাকেন। কর্ত্তার নাম আত্মা। যে শক্তি দ্বারা এই লীলাটুকু বুঝা যায়, তাহা জ্ঞানশক্তি, কিংবা চিৎশক্তি। শক্তি বলিয়া আমরা যাহা বুঝি, তাহাও নয়; এটা কর্ম্মের কোনও অংশ নয়, কিন্তু কর্ম্মের সংঘর্ষণেই বিকাশ পায়। ইহার কাজ কেবল কর্ম্মফলের প্রতিবিম্বগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখা। তাহাদিগের লালন পালন করা। সেই মায়াসন্তানগুলির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করা। তাহাদিগকে লইয়া বিচার করা। একবার তাহাদিগকে নিদ্রাবস্থায় আনা, এবং অন্যবার

তাহাদিগকে জাগরিত করা। এটাও একটা সুন্দর মায়া, এবং পূর্ব্বোক্ত উভয় মায়ার মধ্যস্থলে। এই চিৎশক্তি চৈতন্যময়ী।

এই চিৎ নামক অপূর্ব্ব দর্পণ না থাকিলে বিশ্বের কোনও প্রমাণ থাকিত না। মহাশূন্যে থাকিয়াও ইহা সত্য। ক্রিয়াশক্তি ও লয়শক্তি—উভয়ের প্রতিবিম্ব ইহাতে প্রতিনিয়তই পড়িতেছে। বিশ্বের সাধারণ কেন্দ্রে ইহা অচিন্তনীয়। সেখানে ইহার নিকট লয় ও বিকাশের মায়া থাকিয়াও নাই। উভয়ই আছে, উভয়ই নাই। সেখানে অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান প্রতিভাত। সেখানে ভূতগণ লয় পাইলেও, যেন বোধ হয় আছে; এবং বিকাশ পাইলেও, যেন বোধ হয়, নাই। যত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রতিবিম্ব এইখানে।

এই অপূর্ব্ব কেন্দ্র কিংবা চৈতন্যস্থল প্রত্যেক ভূতের মধ্যেই আছে। এবং আছে বলিয়াই তাহার মধ্যে "আমিত্বে"র একটা ভাব। এই ভাবটায় কোনও পরিশ্রম নাই। এটা চিরকুমার ভাব। ইহার যৌবন নাই, জরাও নাই; জন্মও নাই, মরণও নাই। ইহার যথার্থ ভাবটা শূন্য।

শাস্ত্র বলেন, ভগবান এই মহাশূন্যে অবস্থিত। তিনি সৃষ্টিমায়া ও লয় কিংবা সংহার-মায়া উভয়কেই ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট সৃষ্টি ও সংহার উভয়ই এক। যদি তাঁহাকে উভয় মায়াতেই অধিষ্ঠিত করিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি সৃষ্টি ও সংহার উভয় কর্ম্মই করিতেছেন। কিন্তু যখন একটা সৃষ্টির অর্থ অন্যটার সংহার, কিংবা এক কর্ম্মের অর্থ অন্য দিকে ত্যাগ, সুতরাং ফলে তিনি কোনও কর্ম্মই করেন না। নূতন কর্ম্মের কিংবা প্রাণের একটা রূপ দৃশ্য হইলে বুঝিতে হইবে, অন্য একটা কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া এটা গড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট অভাবও নাই, প্রাচুর্য্যও নাই। তিনি সর্ব্বভূতে থাকিয়াও নাই, অথচ ভূতগণ তাঁহাতেই ব্যক্ত হয়, এবং লয় পায়। তিনি দর্পণ ধরিয়া সাক্ষিরূপে দেখেন মাত্র।

যদি প্রত্যেক ভূতের মধ্যে এই চিৎশক্তির কেন্দ্র আছে, তবে ভেদাভেদ-জ্ঞান কেন? তবে জন্ম মরণের ভাব কেন? তবে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য কেন? তবে কর্ম্মফল ও ভোগকামনা কেন? চৈতন্যের ইতর-বিশেষত্ব কেন?

কথাটা কেবল সাধারণ ও ইতর কেন্দ্র লইয়া।

ইহার উত্তর যে, সর্ব্বভূতে লয় ও ক্রিয়াশক্তির ফলে চিৎ দর্পণে সমানভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না। ক্রিয়াশক্তি বহু আরাধনা করে, লয়শক্তি সেটাকে ছোট

করিতে চাহে, কাজেই দর্পণে সুখ ও দুঃখের—উভয়েরই ভাব আসে। ক্রিয়া-শক্তি হইতে কল্পনা আসে, ইচ্ছা কিংবা লয় হইতে কামনা, কিংবা কাম আসে। ক্রিয়াশক্তি বহুবিধ করিয়া দেয়, ইচ্ছাশক্তি সেটাকে একত্র করিয়া "আমার" করিতে চায়। ইহার ফলে বহু ভূত একত্র হইয়া জীব হয়। চিৎশক্তি যেখানে দর্পণ খাড়া করে, সেটা মন। ভূতগণের কর্ম্ম যে প্রণালী দ্বারা কেন্দ্রস্থানে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়। বহিঃস্থ ভূতগণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির কর্ম্মগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা সঞ্চারিত করিয়া দর্পণে নানাবিধ কল্পনা-ভাব উত্তেজিত করে; অমনই তাহারা ইচ্ছাশক্তির গুণে ধৃত হয়, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সেই ইচ্ছাশক্তিকে দেহস্থ ভূতগণের মধ্যে বিস্তার করিয়া অন্য ভূতকে তদ্দ্বারা আকর্ষণ করে। ইহা হইতে আহার বিহারের চেষ্টা, মারামারি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি, বিরোধ ও সংসারকলহ। আহারের ফলে উত্তাপ হয়, সেটা দেহস্থ রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আরাম বোধ হয়। রূপ, স্পর্শ, শব্দাদির মাধুরীও মন্দ লাগে না। এইরূপে ভূতের কর্ম্মগুলি একত্রিত হইয়া এবং তজ্জাত ফলগুলি ইন্দ্রিয় বাহিয়া মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া, সুখ দুঃখের, কর্ম্ম অকর্ম্মের, পাপ পুণ্যের, ধর্ম্মের অধর্ম্মের ভাব আনিয়া দেয়।

চিৎ সেই ভাব লইয়া দেখে।

কিন্তু কবে দেখিতে আরম্ভ করে? শাস্ত্র বলেন যে, দুইটি বিপরীত মায়ার কিংবা শক্তির ফলে জীব। যখন ইহার ফলে দেহ সম্পূর্ণ বিকাশ পায়, তখন চিৎশক্তির উন্মেষ হয়। তাহার পূর্ব্বে বুঝিতে হইবে যে, চিৎশক্তির কেন্দ্রস্থল মন বলিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট আসন অধিকার করে নাই।

এই স্থানে বসিয়াও আসন জয় করিতে বহু সময় লাগে। এইখানে বসিয়া কর্ম্মের বিচার করিলে বোধ হইবে যে, কর্ম্মটা সম্পূর্ণ চালাকী, এবং কর্ম্মের ফলে যে "আমি", তাহাও ফাঁকা।

যখন ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়, মনে হয়, আমি কল্পনা করিতেছি। যেন আমিই সঙ্কল্প করিলাম। অমনই ইচ্ছা সেই ভাবটাকে আমার করিতে চাহে। বিশ্ব বসন্তের কল্পনায় আমি সবই সুন্দর দেখি (কেবল গৃহিণী বলেন, তাঁহাকেই দেখি না!) অমনি মন্মথ ফুলশর লইয়া হাজির। মনোমত ভূত (কিংবা স্ত্রীলিঙ্গে পেত্‌নী) পাইলে ক্ষণিক সুখ, না পাইলে দুঃখ। আবার সুখের পরে দুঃখ, এবং দুঃখের পরে আত্ম-সান্ত্বনা। ভাবের টানে সঙ্কল্প, সঙ্কল্পের টানে দৈহিককর্ম্ম, কর্ম্মের ফলে ভূতযোনির পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনের ফলে সুখ-দুঃখ-ভোগ, সুখ-দুঃখ-

ভোগের ফলে জ্ঞান। কাজেই জ্ঞানযোগে বলে, কর্ম্মের মূলেও ভগবান, কর্ম্মও ভগবানের মায়া, আর কর্ম্মের ফলেও ভগবান। ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, তিনটিই অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, এবং অপ্রতিহতভাবে বিশ্বে খেলিতেছে।

কিন্তু মজা এই যে, রহস্যটার যথার্থ মর্ম্ম খানিকটা বুঝিলেও, দর্পণটা স্থির হইতে বহুদিন লাগে। কাজেই অনর্থক বাক্যজঞ্জাল।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

৮। শিবের নৌকা।

বলা বাহুল্য, এই নৌকাখানা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইলেও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী,—কতকগুলা হাল্‌কা বাঁশে নির্ম্মিত। তিন-'ডেক্‌'-ওয়ালা জাহাজ অপেক্ষাও ইহা বড় ;—এক প্রকার পরী-প্রাসাদ বলিলেও হয়। ইহার পৃষ্ঠভাগ,—সোনালি-পাতমোড়া মোটা কাগজের, অথবা রেশমের। ইহাতে মন্দিরের ন্যায় কতকগুলা চূড়া, কাগজের ঘোড়া, কাগজের হাতী রহিয়াছে ; আর কতকগুলা ছোট ছোট নিশান উড়িতেছে। আমরা য়ুরোপীয়,—আমাদের চোখে, ইহার সব দোষ খণ্ডিয়া যায়—ইহার অতিমাত্র বৈদেশিকতায়, ইহার অদ্ভুত বিচিত্র কল্পনা-লীলায়, ইহার সেকেলে ধরণের সাজসজ্জায়।

এখন অপরাহ্ন দুই ঘটিকা। সরোবরের উপর,—উহার বিজন তটভূমির উপর,—প্রখর রৌদ্র। মান্ধাতার আমলের সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, এই নৌকাখানা এইখানেই, প্রকাণ্ড ঘাটের সিঁড়িতে বাঁধা রহিয়াছে। এই সময়ে শিবের নৌকারোহণ করিবার কথা। কিন্তু কেহই আসে নাই,—এখনও কাহারও সাড়াশব্দ নাই।

এই সরোবরটি মানুষের হাতে খনিত—চতুষ্কোণ ; তটের ঘের ৯০০ কিংবা ১২০০ গজ হইবে। ভক্তগণ যাহাতে সরোবরে নামিতে পারে, এই জন্য উহার চারিধারেই পাথরের সিঁড়ি। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ—সরোবরেরই ন্যায় চতুষ্কোণ। এই দ্বীপের উপর একটি ধপ্‌ধপে সাদা মন্দির ;—উহার প্রত্যেক কোণ হইতে এক একটি ক্ষুদ্র চূড়া সমুত্থিত। সরোবরের তটসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমি—জনতার পক্ষে খুব অনুকূল—এই সময়ে সূর্য্যের প্রখর কিরণে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিয়াছে; উহার চারিধারে উদ্ভিজ্জের হরিৎশ্যামল যবনিকা—তালীবন-রাজি, আর কতকগুলি মন্দির; এ সমস্ত, দেবীর বৃহৎ মন্দির হইতে বহুদূরে—প্রায় গ্রামপল্লীর অভ্যন্তরে।

ঢাকঢোলের শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। * * সমারোহের ঠাট্ আসি-তেছে;—একটা ছায়াপথ হইতে বাহির হইয়া উহারা মুক্তালোকে, এই তাপদগ্ধ ক্ষুদ্র মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িল—যেখানে সরোবর ও সরোবরের নৌকাখানা এখনও নিদ্রামগ্ন। প্রথমে মানুষের কাঁধে,—১০।১৫ ফীট উচ্চ, কতকগুলা কাগ-জের বিরাটমূর্ত্তি,—মানুষের পিঠে কতকগুলা কৃত্রিম হাতী ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে আসিল, তাহার পর, ৬টা সত্যিকার হাতী—চুম্‌কি বসানো, লম্বা, লাল পোষাকে সজ্জিত; ২০টা প্রাচ্যদেশীয় পুরাতন প্রকাণ্ড লাল ছত্র—যাহা এককালে ব্যাবিলন্ ও নিনিভায় খুব প্রচলিত ছিল; তাহার পর ঢাক ঢোল, তীক্ষ্ণস্বর শানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র; সর্ব্বশেষে শিবের জন্য ও তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য দেবতার জন্য সোনার গিল্টিকরা পাল্কী। সমারোহের এই সমস্ত ঠাট্। ইহার সঙ্গে কোনও জনতা নাই। এই ঠাট্ মাদুরার মধ্য দিয়া আসিবার সময়, মাদুরার লোক-দিগের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য হয় নাই। সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া ঠাট্‌টি নৌকার সম্মুখে আসিয়া থামিল। কিন্তু কেহই কুতূহলী হইয়া এখানে দেখিতে আসিল না।

শুনিলাম, এইবার উহারা নৌকায় উঠিবে; কে আগে, কে পরে উঠিবে, তাহাও পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথমে শিবের দুই পুত্র, পরে শিব, এবং সর্ব্বশেষে পার্ব্বতী,—শিবের পত্নী। যাহারা বহুদিন হইতে এই কর্ম্মে নিযুক্ত,—সেই চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত পুরাতন মাঝিমাল্লারা—টসটস্ করিয়া গা-বাহিয়া জল ঝরিতেছে, এই অবস্থায়,— জল হইতে উঠিয়া পাল্কীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদেবের রথারোহণের সহিত ইহার কত প্রভেদ; সেই শ্রীরাগমে, রহস্যময় বিষ্ণুদেব—গভীর রাত্রে, কত অবগুণ্ঠন-বস্ত্রে আবৃত হইয়া, তবে রথে উঠিয়াছিলেন! এইখানে আমি খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উহারা তাহাতে কিছুমাত্র উদ্‌বেজিত হইল না—আমাকে দূরে যাইতেও অনুরোধ করিল না। পাল্কীর ঘেরাটোপ্ খোলা ছিল;—তাই, আজ এই প্রথমবার সেই সব বিগ্রহ দেখিতে পাইলাম,—যাহাদিগকে কত শতাব্দী ধরিয়া এখানকার লোকে ভয় ও ভক্তি করিয়া আসিতেছে। * * *

জম্‌কাল গদীর উপর উপবিষ্ট এই বিগ্রহগুলিকে, যখন কতকগুলি নগ্নকায় বৃদ্ধ স্বীয় বলিরেখাঙ্কিত বাহুর উপর বসাইয়া লইয়া গেল, তখন আমার যেকি

বিস্ময়—এমন কি, আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল—তাহা আর কি বলিব! কতক-গুলি অশুভদর্শন পুত্তলিকা;—দেখিতে নরম-তল্‌তলে; গ্রীবাদেশ কাঁধের মধ্যে যেন ঢুকিয়া গিয়াছে; গোলাপী রঙ্গের ছোট ছোট মূর্ত্তি—কমলানেবুর মত ট্যাবাটোবা। (কি জন্য গোলাপী রঙ্গ?—ভারতবাসীর রঙ্গ তাম্রাভ বলিয়াই কি?) ওষ্ঠাধর পাতলা; চক্ষু নিমীলিত ও পক্ষ্মশূন্য;—দেখিলে মনে হয়, মনুষ্যের ভ্রূণ,— * * * মৃতশিশু; এই চিরনিদ্রার অবস্থাতেও মুখের ভাব ভীষণ; কিন্তু এই ভীষণতার সঙ্গে একপ্রকার ভোগতৃপ্ত হৃষ্টপুষ্ট ভাব, প্রমত্ততার ভাবও প্রকটিত রহিয়াছে। রাশি রাশি রত্নমালা, হীরা চুণির অলঙ্কার, সূক্ষ্ম মুক্তার ঝালর—এই সমস্তের মধ্যে বিগ্রহগুলি নিমজ্জিত। বহুমূল্য কাণবালার ভারে ভারাক্রান্ত বড় বড় সোনার কাণ উহাদের মাথার দুই পাশে ঝুলিতেছে। উহাদের হাতের উপর খুব বড় বড় সোনার হাত বসানো,—তাহাতে লম্বা লম্বা নখ। আবার উহাদের জঙ্ঘার শেষপ্রান্তে বড় বড় সোনার পা। এইরূপ একটা বিপরীত-প্রমাণ কৃত্রিম হাতের মধ্য হইতে উহাদের একটা আসল হাত বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—ইহা বানরের হাতের ন্যায়, কিংবা ভ্রূণশিশুর হাতের ন্যায় ক্ষুদ্র। হস্তপুট শম্বূকাকৃতি। হাতের রঙ্গ দেহের রঙ্গেরই মত গোলাপী। * *

সূর্য্যের প্রখর তাপ; ঢাক্ ঢোল শানাইয়ের ঘোর বাদ্যঘটা। এ দিকে চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত সেই মাঝিমাল্লারা মৃতজাত-শিশুপ্রায় পুতুলগুলাকে রত্নালঙ্কার ও কিংখাব-বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া নৌকায় লইয়া গেল; এবং নৌকার অন্তরতম প্রদেশে সিংহাসনের উপর বসাইয়া, মোটা কাপড়ের পর্দ্দার আড়ালে উহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া রাখিল।

এইখানেই সমস্ত শেষ। সমারোহের ঠাট্—হস্তী, ছত্র, সমস্তই চলিয়া গিয়াছে। সরোবরের তটদেশ আবার মরুভূমিতে পরিণত হইল। কেবল আজ রাত্রে একবার বিগ্রহগুলিকে সরোবরের চারিধারে ঘুরাইয়া আনা হইবে।

দিবসের প্রখর অত্যাচার এবং রশ্মি ও বর্ণচ্ছটার উন্মত্ত উৎসব-লীলা থামাইয়া দিয়া,—বৃদ্ধ ভারতকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য, আবার রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। নীলিম কৃষ্ণবর্ণে ধরাপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন ছিল,—এক্ষণে মধুর চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া, ধীরে ধীরে সমস্ত পদার্থ রজতকিরণে রঞ্জিত করিল। এই সময়ে ভক্তগণ দলে দলে সরোবরের ধারে আসিয়া, তিনটি প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটের প্রত্যেক ঘাটের সিঁড়িতে নামিয়া, তিন-সারি তৈলসিক্ত দীপ-শলিতা জ্বালাইবার জন্য আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকাণ্ড চৌকোণা সরোবরের চারিধারেই

তিন-সারি ছোট ছোট প্রদীপ সজ্জিত রহিয়াছে। সরোবরমধ্যস্থিত দ্বীপে যে মন্দিরাদি রহিয়াছে, তাহাতেও দীপাবলী জ্বালান হইল। শুভ্র চন্দ্রালোকে সমস্তই ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে—তথাপি, অনলশিখাচ্ছটা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল।

সূর্য্যাস্ত-সময় হইতে জনতার আরম্ভ হইয়াছে। যে সব ছায়াতরুর পথ,—আলুলায়িত-কেশ-বটবৃক্ষ-শোভিত পথ এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই পথগুলি,—নগর গ্রামাদি হইতে মানব-জনতার প্রবাহধারা, এই সরোবরের ধারে অজস্র ঢালিয়া দিতেছে।

শিবপূজার জন্য এই লোকসমাগম। সরোবরের চারিধার মাথায় মাথায় আচ্ছন্ন। মাথাগুলা এত ঘেঁসাঘেসি যে, নদীতীরের উপল-রাশি বলিয়া মনে হয়। ভারতবাসীদের এই সরু সরু তমসাচ্ছন্ন মাথাগুলা, আমাদের য়ুরোপীয় মাথা অপেক্ষা অনেক ছোট। মনে হয়, এই নব মস্তকে গূঢ়-তান্ত্রিকতা (Mysticism) ও জ্বলন্ত ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বুঝি আর কিছুরই জন্য স্থান নাই। (কথাটা একটু বিরক্তিকর হইলেও বলিতে হইবে,—এই দুই জিনিস প্রায় যুগলমূর্ত্তিতেই দেখা দেয়)। এই শিবের সরোবরে আসিবার সময়, প্রত্যেকেই এক একটা সপত্র খাগ্‌ড়ার ডাল কাঁধে করিয়া লইয়া আইসে;—দেখিলে মনে হয়, যেন একটা তৃণের ক্ষেত আসিতেছে।

রাত্রির প্রারম্ভেই, বৃহৎ মন্দির হইতে যে সকল হস্তী এখানে আসিয়াছে, তাহারা এই সব চিন্তাশীল-মস্তকরূপী কন্দুকরাশির মধ্যে—গণ্ডশৈলের ন্যায়, ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায়, ইতস্ততঃ সমুত্থিত।

এই পরী-নৌকার পার্শ্বে,—এই স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজচূড়া-সমন্বিত ভাসন্ত প্রাসাদের পার্শ্বে—যেখানে অবিরাম মশাল জ্বলিতেছে—একটা তুমুল মানব-জনতা, বাদ্যোদ্যম-সহকারে, আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা, নৌকার গুণটানা রশি মাটির উপর লম্বাভাবে ছড়াইয়া রাখিল; এবং ভক্তদিগের মধ্য হইতে শত শত লোক আসিয়া, আনন্দধ্বনি করিতে করিতে, ঐ রশিটা ধরিল। এই দীর্ঘ প্রসারিত রজ্জুর পার্শ্বে তাহারা দাঁড়াইবার স্থান পাইল না; তাহারা সকলের উপর জল ছিটাইয়া, সরোবরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আ-কটি জলে নিমজ্জিত হইয়া উহারা পিছন হইতে—পার্শ্ব হইতে নৌকাকে ঠেলিবে—অন্ততঃ নৌকার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

আবার ঘোর কোলাহল;—ঢাক ঢোল শানাইয়ের উন্মত্ত বাদ্যঘটা। এইবার নৌকা ছাড়িয়াছে। সরোবরের প্রস্তরময় কিনারা দিয়া নৌকা বেশ সহজে

চলিতেছে। দেব ও দেবীর নৌকাযাত্রা এইবার আরম্ভ হইয়াছে। যে স্বর্গীয় শুভ্রকিরণ ঢালিয়া আজ রাত্রে চন্দ্রমা সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা শিবের এই উৎসব-আড়ম্বর শতগুণে পার্থিব, সন্দেহ নাই। সরোবরের তীরে, ঘণ্টিকাজাল-সমাচ্ছন্ন শান্তশিষ্ট হস্তিগণ ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে এই তুমুল জনতার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, এবং তাহাদের গুরুপদভারে পাছে কোনও শিশু বিদলিত হয়, এই জন্য ধীরে ধীরে অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিতাকুঞ্জ।

প্রেম-সাধন।

কত আর সাধি তোরে বল্?
আরণ্য রূপের ডালা, স্বাধীন বিহগ-বালা,
উদাস, উদ্ভ্রান্ত-চিত, সদা সুচঞ্চল ;—
কিসে আমি সাধি তোরে বল্?

আকুল সমুদ্র-আশে, তুই রে তটিনী,
দৈবাৎ খেলায় ভুলে, এ মোর হৃদয়-কূলে
চকিতে পরশি' যাস তরঙ্গ তরল ;—
কিসে আমি বাঁধি তোরে বল্?

নবীন যৌবন তোর, নূতন বাসনা ;
মত্ত শত আশা, হায়, শত পথপানে ধায়,
আপন পূর্ণতা ল'য়ে আপনি পাগল ;—
কিসে আমি ধরি তোরে বল?

গণিয়া আড়াই ছত্র পত্রের রচনা ;
তা'ও অনুরোধে লেখা, শতযুগ পরে দেখা ;
একটু বিদায়-দৃষ্টি, তাতেও বিফল :—
কিসে আমি লভি তোরে বল্?

৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

রাণী লছিমা দেবী।

প্রদীপ্ত-প্রতিভা-লক্ষ্মী,—রাজরাজেন্দ্রাণী,
কবিচিত্ত পদ্মবনে মত্ত মধুকরী!
বরাঙ্গ-বাতাস মধু সমীরণ মানি'
ফুটিল উল্লাসে কবি-কল্পনা মঞ্জরী!
তব পুণ্য রূপরাশি—অপূর্ব্ব অঞ্জন
ফুটাইল দিব্য দৃষ্টি কবির নয়নে,
অপরূপ প্রেমোন্মাদে পূর্ণ প্রাণ-মন
দেখিল সুষমা-স্বর্গ, দুর্লভ ভুবনে!
কোথা রাধা? কোথা কৃষ্ণ? কোথা বৃন্দাবন?
তব রূপ বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণ তব প্রেম,
কবির হৃদয় রাধা! বিচিত্র মিলন!
মণি সনে মিলিয়াছে নিকষিত হেম!
প্রেমকাব্যে অমর সে প্রেম তব সতী!
অমর প্রেমের যোগী কবি বিদ্যাপতি!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রেম ও মৃত্যু।

মৃত্যু কহে,—যাও ভালবাসা,
কেন তুমি আসিলে ধরায়?
এ যে গো আমারি রাজ্য—
অন্য রাজা সাজে না।

প্রাণপণে দু' বাহু আঁকড়ি'
একটুকু অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
পারিস্ কি রাখিতে ধরিয়া
আমি তারে করিলে আহ্বান ?

প্রেম কহে,—সত্য, হে মরণ,
মোর গৃহ পৃথিবীর পার,
হেথা তব ক্ষণিক প্রতাপ,
সেথা কিছু নাই অধিকার।

সে আলয় চিরজ্যোতির্ম্ময়,
অন্ধকার তোমার ভুবন ;
তাই আমি আলো লয়ে আসি,
পথ চিনে' যায় যাত্রিগণ।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

উপহার।

নিদাঘের নিশিশেষে,
দাঁড়াইল হেসে হেসে,
অপরূপ বালা এক কবির শিয়রে।
শশীর সোহাগ পেয়ে
নদী উঠে শিহরিয়ে,
বকুল আলসে খসে ধরণীর' পরে।
আকুল কুন্তল মাঝে
কুরুবক কিবা সাজে,
কর্ণেতে শিরীষ ফুল দুল-দুল দোলে।
সরসিজ থরে থরে
কবির মানস হরে'
বিছান রয়েছে, মরি, পদ্ম-পদতলে।
পীনোন্নত পয়োধরে
চাঁদের কিরণ ক্ষরে,
অঙ্গের সৌরভে পূর্ণ দরিদ্রের গেহ।
শত চামেলীর বাসে
স্মৃ[illegible] ভেসে আসে,—
আবা দিনের কত ভালবাসা, স্নেহ।
ছ।

নেত্রযুগ বিকশিয়া
পুষ্প শত ফুটাইয়া
চাহিল রমণী যবে সরমে হরষে,—
কবির স্বপন টুটে,
মোহনিদ্রা যায় ছুটে,—
কি এক মধুর ভাব হৃদয় পরশে।
রমণীর স্বর্ণ-কোলে
নধর বালিকা দোলে ;
আধ আধ কথা ক'য়ে হৃদয় জুড়ায় ;
ঝাঁপাইয়া শয্যা 'পরে
কবির কুন্তল ধরে ;
মুখে মুখে মুখ দিয়ে কত চুমো খায়।
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে
রমণী কহিল ধীরে,—
কোকিলের কলকণ্ঠ যেন গো ডাকিল!
দিক্‌বালা আনমনে
হরষে আকুল প্রাণে
মোহন মুরলী-ধ্বনি নীরবে শুনিল।—
"শুন ওগো প্রিয় কবি!
মানস-মোহন ছবি
এনেছি এ বালিকায়, দিতে উপহার,—
তুমি বহুদিন হ'তে
কায়মনে পূত-চিতে
পূজেছিলে নিশিদিন পদ কমলার।"
ছড়াইয়া কেশরাশি
আকুলিয়া দশ দিশি,
ইন্দিরা নিমেষ মাঝে হ'ল অন্তর্দ্ধান ;
দীপশিখা হয় ম্লান,
নিস্তব্ধ বীণার তান,
প্রভাতের শুকতারা যেন অবসান!

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

———

প্রকৃতি ।

১

দশ মাস লক্ষ্য-হারা পথিকের মত
ঋতুরাজ বসন্ত যে ঘুরি' দেশে দেশে,
নব কিশলয়ে, পুষ্পে, মঞ্জুল মুকুলে
তোমারে সাজাতে আসে অভিনব বেশে !

২

মোহিনী, প্রকৃতিরাণী, শ্যামলসুন্দরী !
পরিপূর্ণ করিবারে তোমার ভাণ্ডার ;
গ্রীষ্ম যে তোমারি তরে, কান্তারে প্রান্তরে
অবিরত রাশি রাশি বহিছে সম্ভার ।

৩

বর্ষা তব ধীরে ধীরে শিয়রে আসিয়া
তোমার সৌন্দর্য্য হেরি হ'য়ে আত্মহারা,
বিজলীজড়িত মেঘ তুলিয়া আকাশে
তোমারি চরণে ঢালে প্রেম-অশ্রুধারা !

৪

কাশ-পুষ্পে শুভ্রবাসে অঙ্গ আবরিয়া
শেফালী ও শ্যাম-শস্যে পূর্ণ করি' ভার,—
শুভ্রভালে সমুজ্জ্বল চন্দ্রমা তিলক !—
শরৎ আনিছে বহি' অর্ঘ্য, উপহার ।

৫

তুষিতে তোমায়, লয়ে লক্ষ্মীর প্রসাদ,—
অনন্ত অক্ষয় তব সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার,—
তোমারি সোনার ধানে ডালি পূর্ণ করি'
সোনার হেমন্ত দ্বারে নমিছে আবার ।

৬

তুষার-কিরীট পরি' আসে শীত ঋতু,
শুভ্র মেরু ভ্রমি' শেষে মাতৃ-বক্ষ'পরে
ছুটে এসে, বিন্দু বিন্দু শিশিরাশ্রু দিয়া,
কমল-চরণে তব অভিষেক করে !

৭

সন্ধ্যা বিথারিয়া দেয় আঁধার অঞ্চল ;—
দিনমান কর্ম্ম দেছে ; ঊষা, জাগরণ ;—
ঘুম-পাড়াইতে, গায় ঝিল্লী-কণ্ঠে, রাত্রি ;
পবন করিছে তোমা শীতল ব্যজন ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় ।

মহম্মদ ঘোরী ।

সেনাপতি মহম্মদ ঘোরী (১) লাহোর রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া ভারত-বর্ষের রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লীনগরীতে মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইলেন ।

গজনীর রাজবংশের ধ্বংস সাধিত হইবার সমকালে দিল্লীর রাজসিংহাসনে

---

(১) কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী ঘোর নামক স্থানে শূর বংশীয় পাঠানগণ অতি প্রাচীনকালে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে এই রাজবংশ ঘোর নামে প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গিয়াসউদ্দীন ঘোর রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ-ভ্রাতা মহম্মদ ঘোরীর হস্তে যুদ্ধসম্বন্ধীয় যাবতীয় [illegible] অর্পণ করেন। মহম্মদ ঘোরী সাহাবুদ্দীন নামেও পরিচিত।

পৃথ্বীরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দিল্লীর অধীশ্বরগণ ভারতবর্ষের চক্রবর্ত্তী রাজা বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। পৃথ্বীরাজও দিল্লীর রাজসিংহাসন লাভ করিয়া চক্রবর্ত্তিত্ব করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কণোজের অধিপতি জয়-চাঁদ তাঁহাকে তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিতে অস্বীকৃত হন। পৃথ্বীরাজের পূর্ব্বে অনঙ্গপাল দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি আজমীরের তদানীন্তন অধিপতি সোমেশ্বরের হস্তে স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যাকে সমর্পণ করেন। পৃথ্বীরাজ এই দুহিতার সন্তান। অনঙ্গপাল কণোজের অধিপতি বিজয়পালকে আপন জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। জয়চাঁদ এই দুহিতার সন্তান। পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদ, উভয়েই অনঙ্গপালের দৌহিত্র। পৃথ্বীরাজ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন; মাতামহের হৃদয়ের স্নেহ তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিয়াছিলেন। অনঙ্গপাল পুত্রহীন ছিলেন। তিনি অন্তিমকালে জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র জয়চাঁদকে উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠ দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকেই আপন বিশাল সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। মাতামহের এই পক্ষপাতিতার ফলে জয়চাঁদের হৃদয়ে তীব্র ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যে কোনও প্রকারেই হউক, পৃথ্বীরাজের বিনাশসাধন ব্যতীত তাঁহার এই হৃৎশল্যমোচনের অন্য কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের চক্রবর্ত্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজও দুর্ব্বল ছিলেন না। জয়চাঁদের সমস্ত যত্ন ব্যর্থ হইল। তখন তিনি কোনও প্রবল ও প্রতাপান্বিত রাজার সহায়তা গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময় মহম্মদ ঘোরী লাহোর রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়া বীরসমাজে বরেণ্য হইয়াছিলেন। জয়চাঁদ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তাঁহাকেই আহ্বান করিলেন। মহম্মদও পূর্ব্ব হইতেই দিল্লীর দুর্গ-প্রাকারে মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। তিনি জয়চাঁদের আহ্বানে আপন মনোরথ পূর্ণ করিবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহার নিমন্ত্রণরক্ষার্থ উদ্যোগী হইলেন; এবং ১১৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া বিতুন্দর অধিকার করিলেন।

শত্রুর আগমনসংবাদ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি তিন সহস্র রণহস্তী ও দুই লক্ষ সৈন্য সহ মুসলমানের গতিরোধ করিতে ধাবিত হইলেন। মহম্মদ ঘোরীও দিল্লীর অভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিরোরীর বিশাল ক্ষেত্রে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। সংখ্যাধিক্যে হিন্দু সৈন্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ঘোরী হিন্দুর সৈন্যাধিক্যে ভীত হইলেন না।

তিনি অংশে অংশে আক্রমণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য দুর্ব্বল করিয়া লইয়া, তাহার পর সমগ্র সৈন্য সহ তাহাদের উপর প্রবল প্রবাহের ন্যায় পতিত হইবার মনন করিলেন। সুতরাং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহম্মদ ঘোরী শত্রুসৈন্যের মধ্য-শ্রেণী বিধ্বস্ত করিবার জন্য উপর্য্যুপরি সৈন্যের পর সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রবল আক্রমণেও সে সৈন্যশ্রেণী অচল অটল রহিল; মুসলমানেরা তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও বিচলিত করিতে পারিল না। হিন্দু সৈন্যের মধ্যশ্রেণী মুসলমান সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করিতে নিযুক্ত রহিল; আর দক্ষিণ ও বাম অংশ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। মুসলমান সৈন্য পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহম্মদ ঘোরী নিজে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন না, স্বয়ং সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি গোবিন্দ রায় তাঁহার নিপাত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মহম্মদ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন; প্রবল আঘাতে তাঁহার সম্মুখস্থ দন্তদ্বয় ভগ্ন হইল। গোবিন্দ রায় ইহার প্রতি-শোধ লইবার জন্য তাঁহার বাহুতে আঘাত করিলেন। মহম্মদ ঘোরী পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার অভিপ্রায়ে অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। কিন্তু ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকিতে না পারিয়া পতনোন্মুখ হইলেন; এক জন সাহসী খিলজী তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সলম্ফে তাঁহার পশ্চাতে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া তীরবেগে রণক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন। জয়শ্রী হিন্দুর গলদেশে বিজয়মাল্য অর্পণ করিলেন। মহম্মদ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া বিতুন্দর দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। হিন্দুগণ এই দুর্গ অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ত্রয়োদশমাসব্যাপী অবরোধের পরও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন। (১)

ঘোরী হিন্দুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নিকট উপনীত হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া স্বস্থান গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিরৌরীর পরাজয় তাঁহার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। এ কারণ তিনি কোনও স্থানেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিরৌরীর যুদ্ধের দুই বৎসর পরে মহম্মদ এক জন অন্তরঙ্গকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে প্রফুল্লচিত্ত দেখ, কিন্তু নিদ্রাতেও আমার শান্তি নাই, মানসিক

(১) চাঁদ কবির মতে, মহম্মদ ঘোরী শত্রুহস্তে বন্দী হন; পৃথ্বীরাজ অর্থগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করেন।

কষ্ট ও দুশ্চিন্তাই আমার নিত্যসহচর হইয়াছে। নষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে আমি এই সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছি। হয় যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরবভাজন হইব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" মহম্মদের সংগৃহীত সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ছিল। তিনি এই বিপুল বাহিনী সহ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ তিরৌরীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইবার দুই বৎসর পরে, পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন।

পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর আগমনসংবাদ অবগত হইয়া অগণ্য সৈন্য সহ ধাবিত হইলেন। পবিত্রসলিলা দৃষদ্বতীর তীরভূমে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। পৃথ্বীরাজ বিনা রক্তপাতে ঘোরীকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার সৈন্য অসংখ্য; তাহারা সকলেই পরাক্রমশালী ও রণকুশল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জয়শ্রী আমার পক্ষই অবলম্বন করিবেন, এবং আপনি সসৈন্যে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু আমার রক্তপাত করিবার ইচ্ছা নাই। এ জন্য এখনও আপনাকে নিরাপদে ফিরিয়া যাইতে দিতে পারি।" মহম্মদ ঘোরী প্রত্যুত্তরে বিনীতভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞাবহ, তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রতিগমন করিতে পারি না; সুতরাং তাঁহার নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিতেছি। তাঁহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত থাকুক।" পৃথ্বীরাজ এই উত্তর পাইয়া মনে করিলেন, মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধ করিবার তত ইচ্ছা নাই। এ জন্য হিন্দুরা অসতর্ক হইয়া পড়িল। কিন্তু অন্য দিকে মহম্মদ ঘোরী তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পরদিন অতি প্রত্যুষে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। আকস্মিক আক্রমণে হিন্দু সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অগণ্য ছিল বলিয়া মুসলমান সৈন্য সম্মুখবর্ত্তী হিন্দুসৈন্যসঙ্ঘ ভেদ করিতে না করিতেই পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। হিন্দুগণ বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের অস্ত্রাঘাতে বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য কালনিদ্রায় অভিভূত হইল। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ হইল। অতঃপর মহম্মদ ঘোরী সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে করিতে শৃঙ্খলারক্ষাপূর্ব্বক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে মুসলমান সৈন্য ক্রমশঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। হিন্দুগণও যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের ব্যূহভঙ্গ ঘটিল, এবং তজ্জন্য অচিরে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কিন্তু মহম্মদ

ঘোরীর কৌশলে মুসলমান পক্ষের সৈন্যশৃঙ্খলা অটুট রহিল। হিন্দু সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে ঘোরী দ্বাদশ সহস্র বলদৃপ্ত অশ্বারোহী সৈন্য সহ তাহাদের উপর বিপুলবিক্রমে পতিত হইলেন। বিশৃঙ্খল হিন্দু সৈন্য এ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না; তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সেনাপতি গোবিন্দ রায় শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। শত্রুরা পৃথ্বীরাজকে বন্দী করিয়া হত্যা করিল। হিন্দুর শিবির লুণ্ঠিত হইল। হিন্দুর স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। (১)

মহম্মদ ঘোরী জয়লাভ করিয়া আজমীরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি পথিমধ্যে হানশী প্রভৃতি নগরী অধিকার করিয়া তরবারিহস্তে আজমীরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। ঘোরী আজমীর অধিকার করিয়া সমগ্র দেশ শোণিত-পাতে সিক্ত করিয়া তুলিলেন, এবং দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ করিবার জন্য বহুসংখ্যক হিন্দুকে বন্দী করিলেন। মহম্মদ ঘোরীর উৎকট সাধনাবলে হিন্দুস্থানে মুসলমানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। তাঁহার সাধনাকালে ক্রীতদাস কুতবউদ্দীন তাঁহার প্রধান উত্তরসাধক ছিলেন। বিজয়ী মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে পঞ্জাব ও নববিজিত রাজ্যের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ভারত-

---

(১) আমরা এই প্রসঙ্গে একটি তথাকথিত ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিতেছি। তিরৌরীর যুদ্ধের ন্যূনাধিক দুই বৎসর পরে দৃষদ্বতীর তীরে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই বৎসর মহম্মদ ঘোরী বলসঞ্চয়ে নিরত ছিলেন, এবং পৃথ্বীরাজ প্রিয়তমা মহিষীর সহিত বিলাসব্যসনে কাল-যাপন করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের এই প্রিয়তমা মহিষীর নাম সংযুক্তা। পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার পরিণয় ব্যাপার 'রোমান্টিক'। আমরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর কৃত রাজস্থানের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—"সংযুক্তা কণোজরাজ জয়চাঁদের দুহিতা। জয়চাঁদ আপন দুহিতার স্বয়ংবরকালে তদানীন্তন সমস্ত নৃপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাদ নিবন্ধন তিনি এবং তদীয় মিত্র সমর সিংহ স্বয়ংবরসভায় গমন করেন নাই। ইহাতে জয়চাঁদ তাঁহাদের উভয়ের দুইটি হৈম প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বারপাল-স্বরূপ দ্বারদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংযুক্তা সভাস্থ কোন নৃপতির গলে বরমাল্য প্রদান না করিয়া পৃথ্বীরাজের স্বুবর্ণমূর্ত্তির কণ্ঠদেশে তাহা স্থাপিত করিলেন। পৃথ্বীরাজ তখন রাজভবনের পার্শ্বদেশে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ছিলেন। এতদ্বিবরণ অবগত হওয়া মাত্র তিনি সতেজে সভাস্থলে উপনীত হইলেন, এবং রাজকুমারী সংযুক্তাকে লইয়া স্ব নগরে গমন করিলেন। সভাসীন কোন রাজকুমারই তাঁহার প্রচণ্ড গতিরোধ করিতে পারিলেন না।" আমরা এই 'রোমান্সে' আস্থাস্থাপন করিতে পারি না। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের মাতৃস্বস্পুত্র জয়চাঁদের দুহিতা, স্বতরাং ভ্রাতুষ্পুত্রী। এরূপ বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বর্ষ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুতব দিল্লীতে রাজধানীস্থাপন করিয়া মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে আলিগড় অধিকার করিলেন। প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক এক বৎসর শাসন কার্য্য পরিচালিত হইবার পর, অর্থাৎ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে, ঘোরী কণোজ ও বারাণসী আক্রমণ করিবার কল্পনা করিয়া হিন্দুস্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুতব (১) প্রভুর প্রত্যুদ্গমনার্থ লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহম্মদ কুতবের বীরত্বে ও ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকেই বারাণসী-আক্রমণার্থ অগ্রগামী সৈন্যদলের অধিনায়কের পদে বরণ করিলেন। কুতব বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া বিপুলবিক্রমে রাজা জয়চন্দ্রকে নিহত করিয়া জয়শ্রী লাভ করিলেন। কুতব সহজে এই জয়শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। জয়চন্দ্র আত্মরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে

---

(১) কুতবউদ্দীন প্রথমে তুর্কিস্থানের এক জন ক্রীতদাস ছিলেন। জনৈক বণিক, শিশু কুতবউদ্দীনকে নিশাপুরের শাসনকর্ত্তা ফকীরউদ্দীনের নিকট বিক্রয় করে। ক্রেতা ফকীরউদ্দীন সদাশয় ছিলেন। কুতব তাঁহার পুত্রগণের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন, এবং অচিরে কোরাণ-পাঠ, অশ্বারোহণ ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই পুরুষোচিত গুণগ্রামের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ফকীরউদ্দীন তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভে হস্তান্তরিত করেন, এবং বণিকগণ তাঁহাকে লইয়া গজনীতে উপস্থিত হয়। মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে ক্রয় করেন। কুতব সর্ব্বগুণের আধার ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল। তাঁহার একটি অঙ্গুলি ছিন্ন ছিল।

একদিন মহম্মদ আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া দাসদিগকে বহুসংখ্যক ধনরত্ন উপহার দেন। কুতবও এই সময় অংশমত ধনরত্ন লাভ করেন। কিন্তু তিনি নিজের জন্য এক কপর্দ্দকও না রাখিয়া সমস্তই বিতরণ করেন। এই বিষয় ঘোরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি কুতবের ব্যবহারে প্রীতিপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার পর হইতেই কুতব ক্রমশঃ রাজানুগ্রহ লাভ করিতে থাকেন; অবশেষে অশ্বশালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। মহম্মদ ঘোরী খোরসানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, কুতব শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হন। এই সময় তিনি একদিন কার্য্যোপলক্ষে অসতর্কভাবে বহির্গত হন; এবং কতিপয় শত্রুসৈন্য তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যায়। খোরসানের অধিপতি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর খোরসানের অধিপতি পরাজিত হইলে তিনি মুক্তিলাভ করেন, এবং মহম্মদ ঘোরী তাঁহার মুক্তিলাভে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে

বীরোচিত বাহুবল প্রদর্শন করিয়া অসিহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করেন। তাঁহার সেনাগণ রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবার জন্য প্রাণপণে শত্রুসেনার গতিরোধ করিতে গিয়া শবরাশির মধ্যে জয়চন্দ্রকে প্রোথিত করিয়া ফেলিয়াছিল। যুদ্ধশেষে বহু ক্লেশে স্বর্ণমণ্ডিত দন্তপংক্তি দেখিয়া জয়চন্দ্রের শব খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। বারাণসী বিজিত হইবার পর মহম্মদ ঘোরী আসিয়া কুতবের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাহার পর তিনি সসৈন্যে বিহার প্রদেশের সীমা পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত ও প্রায় সহস্রসংখ্যক দেবালয়ের ধ্বংস করিয়া অগণিত মণিমুক্তাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক গজনীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দিল্লী প্রভৃতির শাসনভার কুতবের হস্তেই পুনর্ব্বার সমর্পিত হইল।

পর বৎসর, অর্থাৎ ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে, মহম্মদ ঘোরী পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। এবার তিনি গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। মুসলমান সৈন্য গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করিলে, দুর্গবাসিগণ অমিতপরাক্রমে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। এই ভাবে কতিপয় মাস অতিবাহিত হইলে, মহম্মদ ঘোরী দুর্গজয় সম্পন্ন না করিয়াই, কোনও গুরুতর কারণে স্বদেশে প্রস্থান করেন।

ইহার পর মহম্মদ ঘোরী আর হিন্দুস্থানে আগমন করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমন করিবার কয়েক বৎসর (১১৯৫-১২০২) পর্য্যন্ত খারিজম সাম্রাজ্যাধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন; তাহার পর ১২০২ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হইলে, খারিজম রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া রাজপদ গ্রহণ করেন, এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধানে অভিনিবিষ্ট হইয়া একবারে অবসরশূন্য হন। এ জন্য কুতবউদ্দীন অপ্রতিহতপ্রভাবে দিল্লীতে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ জয় করিয়া আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার বীরকীর্ত্তি ও সৌভাগ্যশ্রী দর্শন করিয়া মহম্মদের দরবারের প্রধান রাজপুরুষগণ অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কুতবের সর্ব্বনাশ বা বিনাশসাধনের জন্য তাঁহাকে স্বাধীনতা-প্রয়াসী বলিয়া সুলতানের নিকট প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কুতবউদ্দীন এই সংবাদ অবগত হইয়া ত্বরায় গজনীতে গমন পূর্ব্বক মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি রজনীযোগে তথায় উপনীত হন, সুতরাং চক্রিগণ সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতঃকালে

মহম্মদ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া কুতবকে তন্নিম্নে লুক্কায়িত রাখেন। কুচক্রিগণ রাজদরবারে উপনীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে কুতবের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারা তদুত্তরে কহিলেন, "কুতব বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, তিনি স্বাধীনতা-প্রয়াসী, তাহাতে সন্দেহ নাই।" তাঁহাদের বাক্য শেষ হইলে মহম্মদ সিংহাসনে পদাঘাত করিলেন, এবং করতালি দিয়া কুতবের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কুতব রাজ-আহ্বানে গুপ্তস্থান হইতে অভিযোগ-কারিগণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে তাঁহারা অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন, এবং ভূবিলুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সুলতান বলিলেন, "আমি এবার তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম; ভবিষ্যতে আইবকের বিরুদ্ধাচরণ-কালে সতর্ক হইও।" অতঃপর কুতব দিল্লীতে প্রতিগমন করিলেন।

এই সময় গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধুর তীরবর্ত্তী প্রদেশখণ্ডে দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুতব এই বিশাল ভূমির আধিপত্যলাভেও পরিতৃপ্ত না হইয়া, বঙ্গদেশে মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজীকে নিযুক্ত করিলেন। বক্তিয়ার অল্পকালমধ্যেই (১২০৩ খৃঃ) তৎপ্রদেশে মুসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বঙ্গবিজয়ের সমকালে মহম্মদ ঘোরী স্বরাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধান সম্পন্ন করেন, এবং তাহার পর খারিজম সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্য বিপুল বাহিনী সহ বহির্গত হন। ঘোরী খারিজমের সৈন্য পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজধানী অবরোধ করিলেন। তাঁহার আক্রমণে খারিজমের অধিপতি বিপন্ন হইয়া পরিত্রাণলাভের জন্য খিতান-বাসীদের শরণাপন্ন হইলেন। খিতান-বাসীরা তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিল। খারিজমের অধিপতি নবাগত সৈন্যের সাহায্যে ঘোরীকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া গজনীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। খারিজম-সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ঘোরী শত্রুকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। শত্রুসৈন্য রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিল; তিনি বিপুল অর্থ প্রদান করিয়া পরিত্রাণলাভ করিলেন। এই ঘোর যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জনরব উঠে। এই সংবাদে তদীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গজনীর শাসনকর্ত্তা এলাদাজ খাঁ মহম্মদ ঘোরীকে আপন আধিপত্যাধীন স্থানে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আর এক জন সেনাপতি মুলতানে গমন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পূর্ব্বক সমগ্রদেশ লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অনেকেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। কিন্তু কুতব বিশ্বস্ত থাকেন। মহম্মদ ঘোরী কিছুতেই নিরুৎসাহ না হইয়া সৈন্য-সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রথমে মুলতানের পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন; তাহার পর গজনী উদ্ধার করিয়া স্নেহাধিক্য-নিবন্ধন কৃতঘ্ন শাসনকর্ত্তা এলাদাজ খাঁকে ক্ষমা করিলেন। তদনন্তর তিনি কুতবের সঙ্গে মিলিত হইয়া গোক্ষুরদিগকে আক্রমণ করেন, এবং তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া পঞ্জাবের পুনরধিকারে সমর্থ হন। গোক্ষুরগণ তাঁহার সন্তোষবিধানের জন্য ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

অতঃপর মহম্মদ ঘোরী আনন্দোৎফুল্লচিত্তে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি সিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া শিবিরস্থাপন করিলেন। এই স্থানে একদা রাত্রিকালে ঘোরী গ্রীষ্মাধিক্যনিবন্ধন পট্টাবাসের যবনিকা উত্তোলিত রাখিয়া শয়ন করেন। এই সুযোগে স্বজাতির রক্তপাতের প্রতিশোধপ্রয়াসী কতিপয় গোক্ষুর আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করে;—মহম্মদ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। (১২০৬ খৃঃ।)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

শ্রীযুত পণ্ডিত সুন্দরলাল।

এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ "পায়োনীয়র" পত্রিকায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নির্ব্বাচিত ভাইস্-চ্যান্সেলার মাননীয় পণ্ডিত সুন্দরলালের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের তাহা প্রীতিকর হইতে পারে। পণ্ডিত সুন্দরলাল এক জন অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী; এলাহাবাদ হাইকোর্টের দেওয়ানী বিভাগে তাঁহার অসাধারণ পশার। ওকালতী আরম্ভ করিবার পর হইতে তিনি যেরূপ শ্রমশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এতদিন তিনি আইন-ব্যবসায়ে তাঁহার সমগ্র উৎসাহ ও শক্তির বিনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। গত দুই বৎসর হইতে তাঁহাকে সাধারণ দেশ-হিতকর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যাইতেছে। পণ্ডিত সুন্দরলাল অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে স্বদেশীয়গণের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন; তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক জন কার্য্যদক্ষ সভ্য। এলাহাবাদে ম্যাক্‌ডনেল বোর্ডিং-হাউসের প্রতিষ্ঠায় তিনি

হইলেও তাঁহার আচার ব্যবহারে হিন্দুর সকল লক্ষণ সুপ্রকাশিত। দেশী সমাজে তাঁহার যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি, ইউরোপীয় সমাজেও তাঁহার মান সম্ভ্রম তাহা অপেক্ষা অল্প নহে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২১শে মে এলাহাবাদ নগরে পণ্ডিত সুন্দরলাল জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা গুর্জ্জর প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া এই অঞ্চলে বাস করেন। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে গুর্জ্জর হইতে এলাহাবাদে উঠিয়া আসিলেও, ইহাঁরা স্বদেশীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। পণ্ডিত সুন্দরলালের পিতা ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়াছিলেন। তিনি সমর-বিভাগে হেড্‌ক্লার্কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা। সুন্দরলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার চারি পুত্রই হাইকোর্টের উকীল হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে পণ্ডিত সুন্দরলাল বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; তাঁহার পঠদ্দশায় কেহই তাঁহার প্রতিভা বা অসাধারণতার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। যে বৎসর তিনি বি, এ, পাশ করেন, সেই বৎসরেই বি, এল, পাশ করিয়া এলাহাবাদের জেলা কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতিলাভ হয়, এবং জুনীয়ার উকীল হইলেও কার্য্যনৈপুণ্যে তিনি মক্কেলগণের যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন হইতে সমর্থ হন। এই সময়ে এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ উকীল মুন্সী রামপ্রসাদ এলাহাবাদ জেলা-কোর্টে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তিনি কখনও স্বপ্নেও মনে করেন নাই, এই যুবক গুজরাটী পণ্ডিত আইন-ব্যবসায়ে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইবেন। হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত সুন্দরলাল ব্যারিষ্টার মিঃ চার্লস্ হেনরী-হীলের সহায়তা লাভ করেন। তিনি যখন কলেজে আইন-বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, সেই সময় মিষ্টার হীল্ মুইর সেণ্ট্রাল কলেজের আইনের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় মিঃ হীল্ পণ্ডিত সুন্দরলালের বিদ্যা, বুদ্ধি ও আইন-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অবশেষে সুন্দরলাল হাইকোর্টে আসিয়া মিঃ হীলের জুনীয়াররূপে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। তিনি কার্য্যনৈপুণ্যে মিঃ হীল্‌কে এরূপ সন্তুষ্ট করেন যে, মিঃ হীল্ তাঁহার মক্কেলগণকে পণ্ডিত সুন্দরলালের হাতে তাঁহাদের মকদ্দমার ভার সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই সময়ে হইতেই তাঁহার পশার বাড়িতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের জনসাধারণ জানিতে পারিল, পণ্ডিত সুন্দরলালের ন্যায় সুদক্ষ উকীল যুক্তপ্রদেশে আর নাই। এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে সকল জটিল মামলার নিষ্পত্তি হইত, সেই সকল মামলার বিচারপদ্ধতি পণ্ডিত সুন্দরলাল বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্য-বেক্ষণ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিশ্বাস করিতেন, পণ্ডিত সুন্দরলাল ন্যায়-পক্ষেরই সমর্থন করেন, এবং সুবিচারের সাহায্যার্থ তিনি পরিশ্রমেও কখনও বিমুখ হন না। পণ্ডিত সুন্দরলালের বাগ্মিতা বিলক্ষণ প্রশংসনীয়। বস্তুতঃ, ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইন-ব্যবসায়িগণের সহিত তুলনা করিলেও, পণ্ডিত সুন্দরলালকে দ্বিতীয় স্থানে স্থাপন করা যায় না। পণ্ডিত সুন্দরলাল বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানগৌরবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদের যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের

তিনি যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়া তিনি যে যুক্তপ্রদেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তসমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত সুন্দরলাল জাতীয় মহাসভার এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক; গত বৎসর বারাণসী-ধামে জাতীয় মহাসমিতির বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন; জাতীয় মহাসমিতির জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়া থাকেন। কেবল জাতীয় মহাসমিতি কেন, দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই তিনি মুক্তহস্তে ধনদান করিয়া থাকেন। এত বিদ্যা ও ধন অর্জ্জন করিয়াও পণ্ডিত সুন্দরলাল একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আছেন। * * * প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও পণ্ডিত সুন্দরলাল বিলাসে এক পয়সাও ব্যয় করেন না; তাঁহার বেশভূষারও আড়ম্বর নাই। কিন্তু পুস্তকক্রয়ে তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হয়। তাঁহার পুস্তকালয়ে আইন-সম্বন্ধীয় এত পুস্তক আছে যে, ভারতের অন্য কোনও প্রদেশের কোনও উকীলের গৃহে আছে কি না সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় আইন সম্বন্ধে অনেক দুষ্পাপ্য পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। ছুটীর সময় তিনি হিমালয় প্রদেশেই বাস করিতে ভালবাসেন, এবং বৎসরে অন্ততঃ দুই মাস তিনি সিমলা, মুসৌরী, নাইনিতাল, আলমোরা প্রভৃতি পার্ব্বত্য নগরে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার এই পর্ব্বত-প্রবাস তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ছাত্রগণের ন্যায় পণ্ডিত সুন্দরলাল জরাজীর্ণ ও নানারোগগ্রস্ত নহেন।

বেগম সমরু।

বেগম সমরুর জীবন-কথা বড়ই বিচিত্র। ভারতের ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে এমন কত বিচিত্র জীবন-কাহিনী জানিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৫৩ অব্দের কাছাকাছি) কাশ্মীরে বেগম সাহেবার জন্ম হয়। প্রথম যৌবনে তিনি নর্ত্তকীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। সেনাপতি সমরুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল কি না, তাহা বলা কঠিন।

সেনাপতি সমরুর আসল নাম ওয়ালটার রেণহার্ট (Walter Rainhardt), তাঁহার পিতা জর্ম্মণ ও মাতা ফরাসী-মহিলা ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসে সমরু নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন না। মোগল-সম্রাটের কার্য্যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া তিনি সিরধানা রাজ্য পুরস্কারলাভ করেন। এই রাজ্যের আয় হইতে তাঁহাকে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যের পোষণ করিতে হইত। রাজ্যভারলাভ করিয়া সমরু নবাব খেতাবে পরিচিত হন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার বেগমকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান।

সমরুর ভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত এক পুত্র ছিল। মোগল-সম্রাট সেই পুত্রকে সমরুর ত্যক্ত-সম্পত্তির অধিকার না দিয়া, বেগমকেই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করেন। বেগম সাহেবার সৈন্য সংখ্যায় অল্প ছিল না; আসাইএর যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশ সেনাপতি ওয়েলিংটনের সহিত সিন্ধিয়া মহারাজার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বেগমের অনেক সৈন্য সিন্ধিয়ার পতাকামূলে সমবেত হইয়াছিল। দিল্লীর যুদ্ধের পর, ১৮০৩ অব্দে, দোয়াব প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইলে, বেগম সমরু ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৭৮১ অব্দে বেগম সমরু খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টান হন, এবং যোহানা নাম গ্রহণ করেন।

নবাব সমরুর মৃত্যুর পর বেগম সাহেবা দীর্ঘকাল বৈধব্যভোগ কষ্টকর জ্ঞান করিলেন। এই সময় তাঁহার সৈন্যদলে এক ফিরিঙ্গী সেনাপতি ছিলেন; তাঁহার নাম কর্ণেল ভাইস্থ (Col. le Vaisseau)। এই যুবকের প্রেমে বেগম আত্মহারা হইলেন। তাঁহার এই প্রেমের ফলে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া, বেগম ও তাঁহার প্রণয়ী কর্ণেল রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। বিদায় গ্রহণ করিবার সময় প্রণয়িযুগল প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহাদের এক জনের মৃত্যু হইলে, অন্য জনও আত্মহত্যা করিবেন। পলায়নকালে বিদ্রোহিগণ রাজধানীর কিছু দূরে তাঁহার পাল্কী ধরিয়া ফেলে। অপমান হইতে পরিত্রাণলাভের উদ্দেশ্যে বেগম প্রাণত্যাগের সংকল্পে নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করেন। তাঁহার প্রণয়ী এই কথা শুনিবামাত্র বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু কর্ণেলের আত্মহত্যাই সার হইল; ছুরিকাঘাতে বেগম সাহেবার প্রাণ বাহির হইল না; বিদ্রোহীরা তাঁহাকে বন্দিনী করিয়া দুর্গে উপস্থিত হইল। বেগমের সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তচ্যুত হইল, কিন্তু তাঁহার সম্মানে কেহ হস্তক্ষেপ করিল না। পুরাতন সেনাপতি জর্জ্জ টমাসের চেষ্টায় বেগম সাহেবা তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ফিরিয়া পান।

১৮০২ অব্দে বেগমের সপত্নীপুত্রটি পানদোষে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার একটি কন্যা ছিল। বেগমের অন্যতম সেনাপতি ভাইস্থ এই কন্যাটিকে বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। সেই পুত্রের নাম ডেভিড অক্টরলোনী ভাইস্থ সোম্বার। ১৮৫১ অব্দে প্যারিসে ডেভিড অক্টরলোনীর মৃত্যু হয়। তিনি সেণ্ট ভিন্‌সেণ্টের ভাইকাউণ্টের কন্যা মেরী এন্‌-ফরেষ্টারকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ডেভিড অক্টরলোনীকে বেগম দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন। ভারতের নর্ত্তকী ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কুলীনের 'বেয়ান'!—বিচিত্র ঘটনা নহে কি?

বেগম সমরুর রাজ্যশাসনে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রজাপুঞ্জের সুখ-শান্তির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার শাসনকালে কোনও দুর্দ্দান্ত জমীদারই প্রজাপীড়ন করিতে পারিত না; তাঁহার রাজ্যে কোনও জমী বিনা চাষে পড়িয়া থাকিতে পাইত না। তিনি ভয়প্রদর্শন করিয়া অনেককে ভূমিকর্ষণে বাধ্য করিতেন। তাঁহার সেনাপতি তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধেও দুই এক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বেগম সমরু খর্ব্বদেহা ছিলেন; নিতান্ত ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন না; বর্ণ গৌর ছিল; এবং আয়ত চক্ষু দুটিতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি ভারতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন।* তিনি যখন দরবার করিবার জন্য রাজসভায় প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকিত। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন, তখন অবগুণ্ঠন দূর করিয়া টেবিলে গিয়া বসিতেন। দাসী তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিত। ঝান্‌সীর লক্ষ্মীবাইয়ের ন্যায় তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিতেন। গোকুলগড়ের যুদ্ধে তিনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার যে মহা উপকারসাধন করেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ দিল্লীশ্বর তাঁহাকে 'জেবউন্নিসা' উপাধি প্রদান করেন।

যৌবনকালে বেগম সমরু যথেচ্ছার ও খেয়ালের অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঔদ্ধত্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই; তাঁহার হৃদয় দয়া ও উদারতায় পূর্ণ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল রাজ-

১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বেগমের সুপ্রসিদ্ধ সেণ্টপিটারের গীর্জ্জার আদর্শে বহু মুদ্রা ব্যয়ে একটি গীর্জ্জা নিজের এলাকায় স্থাপন করেন। তাঁহার গৃহে দুই জন খৃষ্টান পুরোহিত ছিলেন। এক জন আইরিশ, অন্যটি ইটালীয়ান। কলিকাতা, আগ্রা, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যে সকল ক্যাথলিক গীর্জ্জা ছিল, সেই সকল গীর্জ্জার ও মীরাটের ক্যাথলিক চ্যাপেল ও সিরধানার একটি অনাথাশ্রমের ব্যয়ভার তিনি নিত্য বহন করিতেন। তিনি সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য কলিকাতার বিশপের হস্তে লক্ষ টাকা দান করেন। হিন্দু ও মুসলমান কোন সম্প্রদায়েই তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানের মঙ্গলকল্পেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বেগম সমরুর মৃত্যু হয়। সিরধানায় তাঁহার সমাধির উপর তদীয় মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। পৌষ। "উদ্বোধন" কবিতাটির উদ্দেশ্য মহনীয়; ইহা ভিন্ন আর কোনও প্রশংসার অবকাশ নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী ভ্রমণকারী এর্নেষ্ট পিরিউর প্রণীত ফ্রেঞ্চ ভারতভ্রমণ হইতে "সমসাময়িক ভারত" নাম দিয়া যে ধারাবাহিক প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য-পাঠ্য। এবার ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা আলোচিত হইয়াছে। এর্নেষ্ট পিরিউ বলেন,—"এই আর্থিক অবস্থার প্রশ্নটি দুই ভাগে আলোচিত হইতে পারে;—এক, ইংরাজের দিক্ দিয়া, আর এক ভারতবাসীর দিক্ দিয়া। প্রথম স্থলে,—ইংরাজের ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে খরচ খরচা বাদে যে মোট লাভ হয়, তাহার হিসাবাদি হইতেই ইহার উত্তর [illegible]ওয়া যায়। যদি সরকারী তথ্য-বিবরণীতে কার্পাসের জয়ঘোষণা করা হয়, যদি কোম্পানীদিগের [illegible]র'—থাল-কর্ত্তনের শেয়ার—এই সকল শেয়ারের মূল্য বিলাতের 'ষ্টক-এক্শ্চেঞ্জে' চড়িয়া [illegible]দি ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতের দুঃখদৈন্য সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করে, তাহা হইলেই [illegible]ারত সুখী, ভারত সমৃদ্ধ, ভারত সৌভাগ্যশালী! ইহারই জন্য ভারতকে ইংরাজ-[illegible]র শতমুখে প্রশংসা করিতে হইবে! যে 'ব্রিটানিকী শান্তি' স্বীয় অনুচরবর্গের [illegible]রোহে বিজয়-পথে চলিয়াছেন,—হে হিন্দু মুসলমান! তোমাদের উষ্ণীষ খুলিয়া [illegible]তলে নিঃক্ষেপ কর! * * * কিন্তু এই সমস্যার আর একটা দিক্ [illegible]র—ধনপতিদিগের—ইঙ্গ-ভারত-রাজ্যের অথবা বিলাত-রাজধানীর ইংরাজ [illegible]র যে ত্রিশ কোটী ভারতবাসী ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে, তাহাদের [illegible]র এক দিকে দেখ:—একটা বৃহৎ উৎসব; কতকগুলা লোক [illegible] প্রস্তররাশির মধ্যে, খাজনার দাখিলার মধ্যে, স্ফীতোদর 'বজেটে'র [illegible]ছ; অন্য দিকে:—কত অসংখ্য গৃহস্থ—শীর্ণ, নগ্ন, দুর্ভিক্ষপীড়িত—কঙ্কাল দুর্ব্বল পায়ের উপর ভর দিয়া, ধৈর্য্য-সহকারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা [illegible]। ছবির দুইটা দিকই সত্য। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের যে সকল

রিপোর্ট সুখবাদীর উজ্জ্বলতম বর্ণে রঞ্জিত, প্রকৃতপক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মস্পৃক্। কেন না, কে বলিতে পারে—কত আত্মবলিদানের মূল্যে—কত দুঃখ কষ্টের মূল্যে, এই ইউরোপীয় প্রণালীর চাকচিক্যময় মহার্ঘ্য আড়ম্বর-সকল অর্জ্জিত হইয়াছে। 'শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য, রেল-পথ-নির্ম্মাণের জন্য, সৈন্যসামন্ত-রক্ষণের জন্য, আমাদের অত্যন্ত ব্যয় হয়—ভয়ঙ্কর ব্যয় হয়।' ইহাই কর-দাতা প্রজাগণের অভিযোগ; কিন্তু এই অভিযোগ-বাণীর প্রতিধ্বনি নাই! যাঁহাদের উপর শাসনের ভার, তাঁহারা এই কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, প্রজার আবাস-কুটীরের কোন গুপ্ত কোণে, এখনও কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে;—কেন না, রমণীরা হাতে ও পায়ে চিরদিন গহনা পরিয়া থাকে। তবে আর কি!—ইস্ক্রুর আর এক প্যাঁচ ঘুরাইয়া দেও—ইহার বিরুদ্ধে দুঃখবাদীরাও কোন কথা বলিতে পারিবে না।" সূচনার যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই এই ফরাসী ভ্রমণকারীর প্রতিপাদ্য বুঝিতে পারা যায়। "রমণীর স্বদেশ-ব্রত"প্রবন্ধে যে শুভানুষ্ঠানের শুভসংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হউক। "রমণীর স্বদেশব্রত" সকল সংবাদপত্রে মুদ্রিত হউক। সত্য, "বঙ্গরমণীর নাম ব্রতপালনের জন্যই বিখ্যাত।" যাহারা ধর্ম্মহীন কাপুরুষ, তাহারা অনায়াসে ব্রতভঙ্গ করিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের পুণ্যে এখনও ভারতবর্ষে দেবতার ছবি ম্লান হয় নাই, তাঁহাদের লক্ষ্মী-পূজা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। এবারকার ভারতীর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—"নৌচালন-বিদ্যা"। লেখক শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক উপন্যাসের ভাষায় নৌচালন-বিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। রচনাটি শিক্ষনীয়, সুখ-পাঠ্য। "স্বদেশের প্রতি" কবিতাটি স্বদেশী ভাবপ্রবাহের অন্যতর উচ্ছ্বাস। "আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে" শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত বাকলার প্রত্নতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "ঘরের কথা" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর "আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রে"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সাময়িক আন্দোলন ও অবান্তর প্রসঙ্গ অতিক্রম করিয়া বক্তব্য বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

বঙ্গদর্শন। পৌষ। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী "ঈশ্বর ও পূর্ব্ব মীমাংসা" প্রবন্ধে "পূর্ব্ব মীমাংস- গণ কোন যুক্তি ও তর্কবলে ঈশ্বরের অপলাপ করিয়াছেন, দর্শনপ্রিয় পাঠকগণের কৌত- নিবরণ জন্য, * * নাতিবিস্তররূপে নিবদ্ধ" করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "ন- প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"বাঙ্গালী নবজীবন লাভ করিয়াছে।" লেখকের আশায় - ভাষায়, এই স্বপ্ন সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বদেশভক্ত ঐতিহাসিকের সুখস্বপ্ন সফল হ- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত "দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতে,—হৈদরাবা- চমৎকার কাব্যচিত্র। পড়িয়া মনে হয়, আরব্যোপন্যাসের ইন্দ্রজালপুরী - এক কোণে বিরাজ করিতেছে। "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" উল্লেখযোগ্য। নিপুণহস্তে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপকথার ভাষায় দা- প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য "উণাদিতত্ত্বে" পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরি- "অজ-বিলাপে"র বাঙ্গলা অনুবাদ প্রায় সর্ব্বত্র মূলের অনুগত বিলাপে অনুকরণের অতীত ভাষায় প্রিয়াবিয়োগ-বিধুর রাজা- দিয়াছেন, সে সৌন্দর্য্য যথাযথ প্রতিফলিত করিবার শক্তি ও বৈভ

সাহিত্য, ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

ফিরিঙ্গি বণিক্।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিদ্বন্দ্বী।

The Portuguese soon found that they had other rivals in the East than the Turks.—*Sir W. Hunter.*

এক সময়ে মুসলমানেরাই ফিরিঙ্গি বণিকের একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহারা যথাসাধ্য ফিরিঙ্গি বণিকের ভারত-বাণিজ্যের গতি-রোধের চেষ্টা করিয়াছিল; পদে পদে পরাভূত হইয়াও, ফিরিঙ্গি-দলনের সংকল্প সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু ভারত-বাণিজ্যে ফিরিঙ্গি বণিকের একাধি-পত্য দিন দিন যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে মুসলমানের পক্ষে সহসা বিজয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না। ফিরিঙ্গি বণিক্ রাজ্য বিস্তৃত করিয়া, রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া, রাজদুর্গে জল স্থল সুরক্ষিত করিয়া, ভারত-বাণিজ্যের সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভ্যুদয় দর্শন করিয়া, মুসলমানগণ ক্রমে ক্রমে নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে আর এক ...ীর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

...থিবীর আকার কিরূপ, তাহার প্রকৃত তথ্য প্রাচ্যসমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল ...রণাতীত পুরাকাল হইতে বৃহৎ বাহ্য জগতের বিবিধ বৃহৎ বস্তুর সহিত ...িয়া, প্রাচ্য সমাজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিবিধ বৈজ্ঞানিক সত্য পর্য্য- ... পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু পাঁচ শত বৎসর ... খৃষ্টানসমাজে তদ্বিষয়ে কত ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল! পৃথিবীর ...স্থাপন করিত না। যাহারা ভূমধ্যসাগরের স্থলবেষ্টিত ... তরণীচালনা করিয়া উপকূল প্রদেশের বাণিজ্য ব্যাপার ...াহস করিয়া উন্মুক্ত মহাসাগরে পোতচালনা করিতে ...দের পক্ষে সহসা পৃথিবীর গোলত্বে আস্থাস্থাপন করি- ... না। স্পেন পর্ত্তুগালের বাণিজ্য-কলহের মীমাংসা ...র সুবিখ্যাত শাসনলিপি প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে

দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রপথে স্পেন ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্রপথে পর্ত্তুগাল অনন্ত বাণিজ্য-রাজ্যের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল! এক জন নিয়ত পশ্চিমাভিমুখে, আর এক জন পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলে, কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না,—এই বিশ্বাসে সকলেই উৎফুল্লহৃদয়ে পোপের শাসন-পত্র শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা একটু অধিক দূর অগ্রসর হইলেই পরস্পরের উপর আপতিত হইবে, আবার কলহ কোলাহলে খৃষ্টানসমাজের অকল্যাণ উপস্থিত হইবে,—সেকালের ইউরোপীয় খৃষ্টানসমাজে এরূপ আশঙ্কা আদৌ কাহারও চিত্তক্ষেত্রে উদিত হইতে পারে নাই। পোপের শাসনপত্রে উত্তর সমুদ্রপথের উল্লেখ ছিল না। সে পথে স্পেন পর্ত্তুগালের অগ্রসর হইবারও অধিকার ছিল না। সুতরাং ইউরোপের অন্যান্য উদ্যমশীল খৃষ্টানসমাজ পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম-দক্ষিণ সমুদ্রপথ পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথেই ধাবিত হইত। এই দুইটি অবারিত সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার আশায়, দিনামার, ফরাসী ও ইংরাজ অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াও, পুনঃ পুনঃ বিজয়লাভের আয়োজন করিয়া, অকাতরে জীবনবিসর্জ্জন করিত;—যে পথে এক দল পরাভূত হইত, সেই পথে অন্য দল অগ্রসর হইত! পৃথিবীর গোলত্বের কথা সুপরিজ্ঞাত হইবার পর, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

ভিনিসীয় বণিক্‌গণ প্রাচ্য বাণিজ্যের সুপরিচিত পুরাতন পথ পরিত্যাগ ক[illegible]
অভিনব পথের আবিষ্কারসাধনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নাই। [illegible]
লোহিতসাগরের পথে ভারতবাণিজ্যে অধিকারলাভের আশায়, খৃষ্টান[illegible]
মিশরের মুসলমান সুলতানের সহিত মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের [illegible]
চেষ্টা করিতেছিল। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহার জন্য সময়ে [illegible]
নিকট ভিনিসীয় খৃষ্টানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইত [illegible]
বা মিশরীয় চক্রান্তে পর্ত্তুগীজদিগের বিশেষ কোনও ক্ষতি হই[illegible]

যত দিন ইউরোপের খৃষ্টানসমাজে খৃষ্টধর্ম্মাচার্য্যের শ[illegible]
ছিল, তত দিন অন্য কোনও খৃষ্টান প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে ভা[illegible]
করিবার বিশেষ কোনও আশঙ্কা বর্ত্তমান ছিল না। কে[illegible]
দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে পোতচালনা করিতে করিতে দ[illegible]
করিয়া ভারতসাগরে উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল [illegible]

সে পথ নিতান্ত দুর্গম ; তাহাতে সহসা অগ্রসর হইবার পক্ষে স্পেনের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত না। যাহারা উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, তাহারা যে কখনও সেই পথে ভারতবর্ষে উপনীত হইতে পারিবে, কেহ তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে সাহস পাইত না। সে পথের যে সকল কাহিনী ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই বুঝিয়াছিল,—মেরুমণ্ডলের তুষারাবৃত সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার উপায় থাকিলেও, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। এই সকল কারণে, ফিরিঙ্গি বণিক্ একরূপ নিরুদ্বেগে ভারত-বর্ষে নবাবী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহারা আদ্যন্ত সকল কথার বিচার করিয়া দেখিত, তাহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিত,—ফিরিঙ্গি বণিকের বাণিজ্যাধিকার যাবচ্চন্দ্রদিবাকর অক্ষুণ্ণপ্রতাপে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিবে। তাহা যে কখনও বিচলিত হইতে পারে,—তাহা যে এক দিন না এক দিন পর্ত্তুগীজ-দিগের হস্তচ্যুত হইতে পারে,—তাহা যে উত্তরকালে অন্য কোনও প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বীর সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিতে পারে, ফিরিঙ্গি ইতিহাসলেখকগণ তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের বিশেষ অপরাধ ছিল না। সে দিন সমগ্র সভ্যজগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, সকলকেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইত। তখন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগালই সমগ্র ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ নাবিক-দলের জন্মভূমি বলিয়া সুপরিচিত ছিল। তাহারা পোতনির্ম্মাণকৌশলে, বাহু-[illegible]র, অসীম সাহসে, অতুল অধ্যবসায়ে মানব-সমাজে এমন বিভীষিকার সঞ্চার [illegible]দিত করিয়াছিল,—তাহারা যেন সত্য সত্যই অপরাজেয় জলদৈত্যের ন্যায় বিচরণ করিত। ভারতসাগরের ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জে ও বাণিজ্যবন্দরে [illegible] যে সকল সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর রচিত হইয়াছিল, তাহা যে কালক্রমে ধূলি-[illegible]ত পারে, কে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিত ?

[illegible]দ্ধে এই অটল বিশ্বাস টলিয়া উঠিল। স্পেনদেশের অর্ণবযান [illegible]প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতসাগরে উপনীত হইবামাত্র পুনরায় [illegible]ণিজ্য-কলহের সূত্রপাত হইল। যে সুবিখ্যাত নাবিকপ্রবর [illegible]ম্ভব করিলেন, তাঁহার নাম ম্যাগেলন। ম্যাগেলন কিছু-[illegible]নে ভারতসাগরে পোতাধ্যক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ; [illegible]গুল প্রদক্ষিণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। অকৃতজ্ঞ [illegible]রে ম্যাগেলন পর্ত্তুগালের আশ্রয় ত্যাগ করিয় স্পেনের

আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ্যের পাঁচখানি অর্ণবযান ম্যাগেলনের অধীনে পশ্চিমসমুদ্রপথে ভারতযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। ম্যাগেলন ফিলিপাইন দ্বীপে উপনীত হইয়া নিহত হইলেন; চারিখানি অর্ণবপোত বিনষ্ট হইয়া গেল; একখানি উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া স্পেন রাজ্যে প্রত্যাগত হইল। সে দিন পৃথিবীর ইতিহাসের কি স্মরণীয় দিন! সে দিন স্পেনরাজ্যের সম্মুখে ভারতবাণিজ্যের তোরণদ্বার সহসা উন্মুক্ত হইয়া পড়িল; পর্ত্তুগালের অক্ষুণ্ণ অধিকারের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইল; পোপের শাসনলিপির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, পর্ত্তুগালের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিল না! সকলেই বুঝিতে পারিল,—পোপের শাসনলিপি কত অসার!

পর্ত্তুগাল কি বলিবে? এত কাল অন্যান্য ইউরোপীয় অর্ণবপোত ভারতসাগরাভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র পোপের শাসনলিপির বলে লুণ্ঠিত হইয়াছে। স্পেনের অর্ণবপোত সেরূপ নহে। তাহা পোপের শাসনলিপির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই ভারতসাগরে উপনীত হইয়াছে। তাহাকে দণ্ডদান করিবার উপায় নাই!

পর্ত্তুগালরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। স্পেনের অধিপতি পঞ্চম চার্লস্ তখন ইউরোপে পোপের দক্ষিণহস্ত বলিয়া সুপরিচিত। তিনি খৃষ্ট সাম্রাজ্যের প্রধান সম্রাট্,—ধর্ম্মাচার্য্য পোপ ও সম্রাট্ চার্লস্ সেকালের সমগ্র খৃষ্টানসমাজের সর্ব্ববাদিসম্মত প্রবল পুরুষ। তাঁহাদিগের উভয়ের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করা পর্ত্তুগালের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সম্রাট চার্লস্ তখন ইউরোপের স্থলযুদ্ধে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত। আমেরিকার একাংশে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছি[ল;] তাহাতে বর্ষে বর্ষে রৌপ্য সংগৃহীত হইত। আমেরিকা অপেক্ষাকৃত নি[কটে;] রৌপ্য অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে সংস্কৃত হইয়া মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে প[ারিত;] ভারতবর্ষ বহুদূরে; বাণিজ্যের লাভ অধিক হইলেও, পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ক[রিয়া অর্থ] সংগৃহীত করা সহজ নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতবাণিজ্যে অধিক অবসর প্রাপ্ত হইয়াও, সম্রাট্ চার্লস তাহাতে বিশেষ ঔৎসুক্য প্র[কাশ করেন] না। পর্ত্তুগাল-রাজ সময় বুঝিয়া অর্থদান করিতে উদ্যত [...] বিনিময়ে মোলাক্কস দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যাধিকার পর্ত্ত[ুগালকে] বিক্রয় করিলেন।

ম্যাগেলনের ভূপ্রদক্ষিণব্রত সফল হইয়া ইউরোপের [...] উপস্থিত করিয়া দিল। এত দিন এসিয়া কেবল পর্ত্তু[গালের অধিকারে] ছিল। এক্ষণে আফ্রিকা হইতে মোলাক্কস পর্য্যন্ত পর্ত্তুগ[...]

দিকে যাহা কিছু থাকে, তৎসমস্ত স্পেনের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এতদিন এসিয়ার সমুদ্রে কেবল পর্ত্তুগালের অর্ণবযানেরই অব্যাহত গতি প্রচলিত ছিল, এখন তাহাতে পর্ত্তুগালের ন্যায় স্পেনরাজ্যের বিজয়পতাকাও আকাশে অঙ্গ-বিস্তার করিল। কালে ইহাতে অনর্থ উৎপন্ন হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতে না উঠিতে, আবার নিরস্ত হইয়া গেল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল স্পেন সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া গেল; এসিয়ার সমুদ্রপথে একটিমাত্র ইউরোপীয় রাজ-শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা সুসময় প্রাপ্ত হইবামাত্র, অতি অল্প কালের মধ্যেই যুগান্তর উপস্থিত করে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থপাদ এইরূপ একটি অল্পকাল;—অল্প হইয়াও, চিরস্মরণীয়। সেই অল্পকালে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। সেই অল্পকালের মধ্যে রাজা ফকীর হইবার এবং ফকীর রাজমুকুট কুড়াইয়া পাইবার অবসর লাভ করিয়াছিল।

তখনও ইউরোপের অবস্থা প্রশংসাযোগ্য হয় নাই। কৃষিশিল্প তখনও সমাদর-লাভ করে নাই; সভ্যতা ও শিক্ষা তখনও ভাল করিয়া প্রভাববিস্তার করিতে পারে নাই; জ্ঞানানুরাগ ও অন্ধ অজ্ঞানতা তখনও সমগ্র খৃষ্টান-সমাজকে -গপৎ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে; বর্ব্বরতা পরিহার করিবার প্রাণপণ চেষ্টা পুরাতন -বতাকে যেন আরও প্রবল করিয়া তুলিয়াছে; নররক্তে জলস্থল কলঙ্কিত হইয়া -ছে;—সর্ব্বত্র কেবল বাহুবলের প্রাদুর্ভাব প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আন্দোলন -বড়াইতেছে। ধর্ম্ম আত্মরক্ষার আশায় বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, -সকল তর্কের মীমাংসাভার গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া -নেব দানব-রূপে বিধাতার বিশ্বরচনার বিপর্য্যয় সম্পন্ন করিবার -করিতেছে।

-উরোপে এক অভিনব কলহের সূত্রপাত হইয়াছিল। সে কলহ -বিহার্য্য কলহ। একদিন যে খৃষ্টানসমাজ একবাক্যে মুসল-জন্য অসিহস্তে জলে স্থলে ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান -পড়িয়াছিল, সেই খৃষ্টান সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া -জাতিকলহে লিপ্ত হইতেছিল। যাহারা পুরাতনবাদী, -চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া, খৃষ্টান-সমাজকে বাহুবলে

মুক্তিক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। যাহারা নূতনবাদী, তাহারা পোপের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া, বাহুবলে স্বাধীনতালাভের জন্য খৃষ্টানসমাজকে আহ্বান করিতেছিল। উভয় দলের মধ্যে ইহার জন্য যে ধর্ম্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই আধুনিক ইউরোপের অভ্যুদয়লাভের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। পুরাতনের মোহ ইউরোপকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে, ইউরোপ জ্ঞানলাভ করিত না।

যে জ্ঞান এক সময়ে প্রাচ্যরাজ্য হইতে সমগ্র সভ্যসমাজে প্রচারিত হইত, তাহা মুসলমানের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের দক্ষিণাংশে উপনীত হইয়া সহসা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানসমাজ তখনও সমুন্নত গণিত বিজ্ঞানের অমোঘ সত্য গ্রহণ করিবার যোগ্য হয় নাই; তখনও বিদ্যা কেবল ধর্ম্মগ্রন্থনিহিত ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্রার্থবিচারে পর্য্যবসিত হইয়া অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসীর নিকট সমাদর-লাভ করিত। ইউরোপ মোহনিদ্রার অবসানে জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; অনুকূল সময় সেই ব্যাকুলতাকে বিবিধ চেষ্টায় কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া দিল। বাঁধন ভাঙ্গিয়া গেল; বন্যাস্রোতের ন্যায় জ্ঞানস্রোত সমগ্র ইউ-রোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। পোপের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিল; অসভ্যেরা সভ্যতালাভের জন্য প্রাণপণে স্বাধীনতালাভের আয়োজন করিল। পোপ পদে পদে পরাভূত হইয়া, তর্জ্জন গর্জ্জনে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ইউরোপের নবজীবন খৃষ্টানসমাজকে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া তাহার সম্মুখে এক অভিনব কীর্ত্তিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিল।

ইউরোপের কোনও দেশেই রাজকার্য্যপরিচালনায় স্বাধীনতার অভাব ছি[illegible]
রোমকসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ইউরোপের সকল দেশই স্বতন্ত্র হইয়া
ছিল। কিন্তু জনসমাজের চিত্তক্ষেত্র অজ্ঞানতায়, অন্ধবিশ্বাসে, অলী[illegible]
পরাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা জাগিয়া উঠিতে লাগিল; তা[illegible]
বর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল; তাহারা মানুষ হইয়া উঠিবার অ[illegible]
ছাড়িয়া বিপুল বিশ্বরাজ্যে ছুটিয়া বাহির হইল। এক দিকে ন[illegible]
অন্য দিকে নূতন নূতন সত্যের আবির্ভাব, প্রবুদ্ধ ইউরোপ[illegible]
কর্ম্মে সমুন্নত করিতে লাগিল। ফরাসী, দিনামার ও [illegible]
সূচনা হইতে না হইতেই, জার্ম্মাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করি[illegible]
বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে [illegible]
হইয়া পড়িল। স্পেন ও পর্ত্তুগাল পোপের পদমর্য্যাদা

অত্যাচারে, অবিচারে, উৎপীড়নে, অহঙ্কারে খৃষ্টানসমাজকে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া দিল। যাহারা পোপের শাসন অস্বীকার করিবার সাহস লাভ করিল, তাহারা নূতন পথে, নূতন শক্তিতে, নূতন উৎসাহে ধাবিত হইল।

কি নূতন, কি পুরাতন, সকল দলের লোকেই ভারতবাণিজ্যে অধিকার-লাভের জন্য লালায়িত ছিল। ধর্ম্মকলহ প্রবল হইবার পূর্ব্বে, পোপের শাসনলিপি লঙ্ঘন করিয়া, কেহ ভারতবর্ষে উপনীত হইবার আশায় উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিতে সাহস করিত না। সকলেই অন্য কোনও নূতন পথের সন্ধানে নিযুক্ত হইয়া, কখনও আশায় উৎফুল্ল হইত, কখনও বা নিরাশায় অভিভূত হইয়া পড়িত। যখন ধর্ম্মকলহ প্রবল হইয়া পোপের শাসন শিথিল করিয়া দিল, তখন সকলেই ভারতবর্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য অধিক উৎসাহে চেষ্টা করিতে লাগিল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ ভারতবাণিজ্যের অদ্বিতীয় অধিপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন; শত বর্ষের অবসর প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা একাধিপত্য প্রবল করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের ভারতবাণিজ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রবল সংঘর্ষ।

are of the true faith, what you from the West may be; for me from the place where the followers of Christ were first hristians.—Reply of the Syrians to the Portuguese.

াল পরস্পরের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী দেশ হইলেও, এই উভয় দেশের া চরিত্রগত পার্থক্যের অভাব ছিল না। তাহারা এক রাজার ক্তিলাভ করিতে পারিল না। আপাততঃ উভয়ের কলহ নিরস্ত হাতে উভয় দেশের লোকই ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। যে দিন পর্ত্তুগালের দিগ্বিজয়লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া-বসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; কেবল ধর্ম্মান্ধতাই দিন

র অন্যান্য দেশে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল; া রাখিয়া নূতনের সেবা করিবার জন্য লোকচিত্ত উন্মত্ত

হইয়া উঠিতেছিল। স্পেন পর্ত্তুগাল তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্যই অগ্রসর হইতে লাগিল। এ দিকে দিনামার ও ফরাসী—এবং তাহাদের দেখাদেখি,—দ্বীপনিবাসী ইংরাজ আত্মোন্নতির সুযোগলাভের প্রতীক্ষায় শক্তিসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইল।

স্পেন পর্ত্তুগালের সহিত ইংলণ্ডের মিত্রতার অভাব ছিল না। ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেন্‌রী সেই পুরাতন মিত্রতা রক্ষা করিয়াই রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছিলেন। রাজ্ঞী মেরী মিত্রতার মাত্রা বর্দ্ধিত করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময়ে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সূত্রপাত হইল। কিছুদিন ইতস্ততেরও অভাব ছিল না। রাজ্ঞী এলিজেবেথ অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সকল কথায় সম্পূর্ণরূপে উৎসাহদান করিতে সাহস করেন নাই। অবশেষে স্পেন ও ইংলণ্ডের মধ্যে সমরকলহ উপস্থিত হইয়া সকল 'ইতস্ততঃ' ভাব ভাসাইয়া লইয়া গেল।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে "আরমাডা" নামক স্পেন রাজ্যের ইতিহাসবিখ্যাত নৌবাহিনী ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে আসিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে পরাভূত হইয়া গেল। ইহাই ইংরাজদিগের সৌভাগ্যলাভের প্রথম সোপান বলিয়া কথিত হইতে পারে। ইংরাজেরা এতকাল আত্মশক্তিতে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিত না; জনসাধারণ সেরূপ ব্যাপারে অগ্রসর হইবার জন্য উন্মত্ত হইলেও, রাজশক্তি তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতে ইতস্ততঃ করিত। এবার ইংলণ্ডের রাজা প্রজা এক হইয়া গেল;—আত্মশক্তির সমুচিত বিকাশ না হইলে ইংলণ্ডকে সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে,—সে কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হই[illegible]

এতদিন ইংরাজেরা পোপের শাসনলিপির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জলবা[illegible] অভিনব বাণিজ্যপথের সন্ধানে শক্তিক্ষয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে পোপে[illegible] লিপি লঙ্ঘন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। পোপ এতকাল [illegible] অদ্বিতীয় সম্রাট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। খৃষ্টান নরনারী তাঁহাকে অবতারজ্ঞানে ভয় ভক্তি করিয়া অবনতমস্তকে তাঁহার শাসনভ[illegible] তাঁহার নামে তাঁহার অনুচরবর্গ মুক্তিপত্র বিক্রয় করিয়া [illegible] ইউরোপীয় খৃষ্টানসমাজ বহু ব্যয়ে স্বর্গরাজ্যের প্রবেশপত্র[illegible] ক্ষিত মুক্তিপত্র সঞ্চিত করিয়া রাখিত। যাহারা তাহ[illegible] অসম্মত হইত, তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিয়া করিত। ইউরোপে এমন দেশ ছিল না, যেখানে এই সমাজকে পীড়িত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত।

উৎপীড়িত নরনারী অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হইবার সময়ে খৃষ্টান জনসমাজ নরহত্যাকে পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ভগবানের নামের জয়ধ্বনি তুলিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করিত না! লোকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিত না; তাহা যে ভাষায় লিখিত, তাহা জনসমাজের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, জনসমাজ তাহাকেই আপ্ত-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। এই অজ্ঞানান্ধ নরনারীর উপর পোপের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশায় পোপের অনুগত রাজন্যবর্গ ও পুরোহিতগণ যথা-সাধ্য জ্ঞানালোচনায় বাধা প্রদান করিতেন। কোনও নূতন তত্ত্ব অধিগত ও আবিষ্কৃত হইলেও, তাহা জনসমাজে প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হইতে পারিত না; গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইলে, সে গ্রন্থ পোপের আদেশে ভস্মীভূত হইত।

খৃষ্টধর্ম্মের নামে পোপের অনুচরগণ ইউরোপীয় জনসমাজের পক্ষে যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিতেন, তাহা প্রচলিত থাকিলে, ইউরোপ ধর্ম্মান্ধতায় দিন দিন বর্ব্বরভূমিতে পরিণত হইত। কিন্তু জ্ঞানের অমোঘ প্রতাপে বাহুবলের উৎকট অত্যাচার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। ধর্ম্মাচার্য্যের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছিল। জর্ম্মণদেশেই ইহার প্রথম প্রকাশ লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে দিনামার, ফরাসী ও ইংরাজেরাও তাহার ফললাভ করিয়া,প্রকাশ্যভাবে পোপের শাসনক্ষমতা অস্বীকার [illegible]রিবার সাহস লাভ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে স্পেনরাজ্যের অধীশ্বর পোপের শাসনক্ষমতা রক্ষা করিবার জন্য [illegible]দলের পক্ষ গ্রহণ করিলে, উদার দলের সহিত তাঁহার কলহ উপস্থিত [illegible]। তাঁহার ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবামাত্র ইংলণ্ডের [illegible]কাশ্যভাবে পোপের শাসনক্ষমতা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। [illegible]জদিগের আত্মশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল।

[illegible]লের সহিত ইংলণ্ডের মিত্রতা বর্ত্তমান থাকিতে, ইংলণ্ডের পক্ষে [illegible]ণিজ্যে লিপ্ত হইবার উপায় ছিল না। ইংরাজেরা কেবল [illegible]জ্যের ফললাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। যে সকল [illegible] লিস্‌বনে আনীত হইত, তাহা তথা হইতে হলাণ্ডের [illegible]মক নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। ইংরাজেরা [illegible] ক্রয় করিয়া স্বদেশে বিক্রয় করিতেন। ইহাতে ভারত-[illegible]গণের করতলগত থাকিত; দিনামারগণ যাহা কিছু

লাভ প্রাপ্ত হইতেন, ইংরাজদিগের পক্ষে তাহাও দুর্লভ ছিল। তথাপি আণ্টোয়ের্পের ভাগ্যোন্নতির কথা স্মরণ করিলে, বিস্মিত হইতে হয়। কেবল ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারেই আণ্টোয়ের্প সেকালের ইউরোপীয় বাণিজ্যবন্দরের শীর্ষস্থানে আরূঢ় হইয়াছিল।

ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। পৃথিবীতে সেরূপ ক্ষুদ্র দ্বীপের অভাব নাই। দেশের আয়তনের প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহাকে নিতান্ত নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে দেশের লোকের পক্ষে অভ্যুদয়লাভ করা দূরে থাকুক, কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। হলণ্ড দ্বীপ না হইলেও, ইংলণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্য। তাহার পক্ষেও বিদেশের সংস্রব অনিবার্য্য। সুতরাং এই দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে বাণিজ্যই একমাত্র জীবিকার্জ্জনের উপায় বলিয়া পরিচিত ছিল। দিনামারদিগের ন্যায় ইংরাজেরাও কেবল বাণিজ্য ব্যবসায়ে যথাসম্ভব অর্থোপার্জ্জনের আশায় ভুবন-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পোপের শাসনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্রপথে বিচরণ করিবার অধিকার হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া, দিনামার ও ইংরাজ অসাধ্যসাধনের চেষ্টায় উত্তর সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রাচ্য বাণিজ্যই সকল জাতির একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তর সমুদ্রপথে প্রাচ্যবাণিজ্যে অধিকার বিস্তৃত করিবার উপায় থাকিলে, ইংলণ্ডের পক্ষে পোপের শাসন লঙ্ঘন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। কিন্তু চিরতুষারাবৃত মেরুমণ্ডলের সমুদ্রপথে ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইবার আশা যতই তিরোহি[illegible] হইতে লাগিল, পোপের শাসন ইংরাজদিগের নিকট ততই অন্যায় [illegible] বিবেচিত হইল। তাঁহারা এতদিন কোনরূপে পোপের অবিচার সহ্য[illegible] ছিলেন। ক্রমে তাহার প্রতীকারসাধনের ইচ্ছা বলবতী হইয়[illegible] পর্ত্তুগালের আনীত ভারতীয় পণ্যদ্রব্য কুড়াইয়া লইয়া জীবিকার্জ্জনে[illegible] থাকিলেও, ইংরাজের পক্ষে পোপের শাসন লঙ্ঘন করিবার কল্পনা[illegible] সময়ক্ষয় হইত। ঘটনাক্রমে আণ্টোয়ের্পের বাণিজ্যস্রোত [illegible] ধর্ম্মবিপ্লবে দিনামারগণ উদারনীতির পক্ষাবলম্বন করায়, অন[illegible] সহিত কলহ উপস্থিত হইল। দিনামারগণের পক্ষে[illegible] ভারতীয় পণ্য-সংগ্রহ করিবার উপায় রহিল না[illegible] ইংরাজগণ পোপের শাসন লঙ্ঘন করিয়া, জলদস্যু[illegible] বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তম[illegible] দিগের কলহকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

এক সময়ে সমগ্র খৃষ্টানসমাজ পোপের শাসন শিরোধার্য্য করিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে খড়্গধারণ করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ যখন ভারতসাগরে উপনীত হইয়া মুসলমান-দলনের নূতন ব্রত গ্রহণ করেন, তখন সমগ্র খৃষ্টানসমাজে পর্ত্তুগীজদিগের ভারতবাণিজ্যও ধর্ম্মকলহের অন্তর্গত বলিয়া প্রশংসালাভ করিয়াছিল। কালক্রমে ইউরোপের ধর্ম্মনৈতিক একতা বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন খৃষ্টানসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। আর এক ভাবে ধর্ম্মকলহ জাগিয়া উঠিল। লাভের লোভে অন্ধ হইয়া সকলেই বাহুবলকে প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরাতন মিত্রতা বিনষ্ট হইয়া গেল।

দিনামারগণ উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতসাগরে উপনীত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরাও সেই পথে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজ্ঞী এলিজেবেথ প্রথমতঃ প্রকাশ্যভাবে পোপের শাসন লঙ্ঘন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাকেও প্রকারান্তরে সম্মতিদান করিতে হইল। এক দিকে সমগ্র ইংরাজজাতির জীবন মরণের কথা, অন্য দিকে বিলুপ্তপ্রায় পুরাতন মৈত্রভাব;—রাজ্ঞী এলিজেবেথ উভয় কুল রক্ষা করিতে পারিলেন না। দিনামারগণ "কোম্পানী" নামক বণিক্‌সমিতি গঠিত করিয়া যে ভাবে ভারতবাণিজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইংরাজেরা সেই ভাবে অগ্রসর হইবার আশায় আবেদন করিলে, তাঁহারাও অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

পর্ত্তুগাল নবজীবন লাভ করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র ইউরোপে অভিনব আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দিয়াছিল। তাহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া ...পর সকল দেশের লোকেই গৃহকোটর ছাড়িয়া চারি দিকে ধাবিত হইয়া ...ত দেশের আবিষ্কারসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। যে দেশের লোক ... বাহিরে যে অভিনব রাজ্যের আবিষ্কারসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, ... লইয়া সুখী হইলে, ভারতসাগরে পর্ত্তুগালের প্রাধান্যই প্রবল ... সকলেই ভারতবর্ষে উপনীত হইবার আশায় ভুবনভ্রমণে ...। ভাগ্যক্রমে অন্যান্য দেশ আবিষ্কৃত হইলেও, তাহা ... কোনও দেশের লোক তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ...ইবার আকাঙ্ক্ষা ইউরোপের সকল দেশের লোকের ...ছিল। পর্ত্তুগাল এইরূপে সমগ্র ইউরোপে যে অশান্ত ...য়াছিল, তাহা সকল দেশেই উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া

ইতিহাসলেখকগণ বলিয়া থাকেন,—পর্ত্তুগালের এই অশ্রুতপূর্ব্ব গৌরব কেবল রাজবংশের গৌরব, তাহাকে জাতিগত গৌরব বলিয়া অভ্যর্থনা করা যায় না। যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজকুমার হেন্‌রী পর্ত্তুগীজ জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই রাজবংশের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কীর্ত্তিকলাপও তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। ইহাকে ব্যক্তিগত বা বংশগত গৌরব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্পেনরাজ্যের পদানত হইবার পর পর্ত্তুগালের অপদার্থ অধিবাসিগণ আবার অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্পেনরাজ্যের অধিপতি ধর্ম্মকলহে লিপ্ত হইয়া ভারতবাণিজ্য রক্ষা করিবার যথাযোগ্য আয়োজন করিতে পারিলেন না। দিনামার ও ইংরাজগণ অবসর লাভ করিয়া স্পেনের ধর্ম্মকলহকে বাণিজ্য-কলহে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা জলে স্থলে বাহুবলে প্রবল হইয়া উঠিলেন। স্পেন পর্ত্তুগালের পক্ষে তাহার গতিরোধ করিবার আশা দিন দিন তিরোহিত হইতে লাগিল।

ফিরিঙ্গি বণিকের অসংযত অত্যাচারে মুসলমানশক্তি কিছু দিনের জন্য সঙ্কুচিত হইলেও, একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। পারস্যের অধিপতি ভারতবাণিজ্যের অধিকার পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া, উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিয়া দিন গণনা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গ পারস্যোপসাগরপথে স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সংগৃহীত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। সে পথে ফিরিঙ্গি বণিকের আধিপত্য প্রবল হইলেও, পারস্যাধিপতি পুনরায় প্র[illegible] সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আরবদেশের মুসলমান বণি[illegible] নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ফিরিঙ্গি বণিকের অভ্যুদয়লাভের সময়ে সমস্ত [illegible] তাঁহাদের অনুকূল ছিল। মিশরের অধিকারলাভের জন্য এক [illegible] মানের সহিত কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও মুসলমা[illegible] সমুদ্রোপকূলে ভাল করিয়া অধিকারবিস্তার করিতে পারে [illegible] পাঠানদিগের যাহা কিছু আধিপত্য ছিল, তাহাও রাষ্ট্রবিপ্লবে বি[illegible] মোগলশাসনশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের [illegible] অধিকার বিস্তার করায়, ফিরিঙ্গি বণিকের পক্ষে জ[illegible] প্রতিকূলে সজ্জীভূত হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল।

ভারতসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ [illegible] বাসিগণ এইরূপে বিবিধ আয়োজনে লিপ্ত হইবার [illegible] দিনামার ও ইংরাজগণ ভারতসাগরে উপনীত হইলে[illegible]

এক সঙ্গে এই সকল প্রবল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণবেগ সহ্য করিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে চলিল।

আর সে দিন নাই। রণকুশল পোতাধ্যক্ষগণ বাণিজ্যবন্দরের রাজপ্রাসাদ-তুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিয়া বিবিধ বিলাসলালসায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। সেনাদল তাহাদের পূর্ব্বশিক্ষা বিস্মৃত হইয়া নেতৃবর্গের অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সংযম ভাসিয়া গিয়াছে,—সম্ভোগ প্রবল হইয়া সকল শক্তি অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে!

ইউরোপের শান্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পোপের পদমর্য্যাদা এতকাল সমগ্র ইউরোপে যে শক্তিতে শান্তিরক্ষা করিত, সে শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজেরা তাহার অবশ্যম্ভাবী পতনকাল লক্ষ্য করিয়া দিনামারদিগের পদানুসরণ করিতে করিতে ভারতবাণিজ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। ছলে বলে কৌশলে পর্ত্তুগীজের দুর্ব্বল হস্ত হইতে বাণিজ্যাধিকার কাড়িয়া লইবার জন্য ইংরাজ-কোম্পানী কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

সে কথা সহসা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিবার সাহস থাকিলে, ইংরাজগণ তাহার ক্রটি করিতেন না। কিন্তু তখনও প্রকাশ্যভাবে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। "আরমাডা" নামক নৌবাহিনী বিনষ্ট হইবার পর স্পেন পর্ত্তুগালের নৌবল কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজেরা [illegible]হা জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন,—ইউরোপে যাহাই হউক, এসিয়ায় [illegible]ন প্রবল করিবার জন্য স্পেন পর্ত্তুগাল সহসা যথাযোগ্য আয়োজন করিবার [illegible] প্রাপ্ত হইবে না। ইংরাজেরা বলিতে লাগিলেন,—তাঁহারা পোপের [illegible]র মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতে অসম্মত; পোপের এরূপ [illegible] প্রচারিত করিবার ক্ষমতা নাই। তবে পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে [illegible]পুর বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা যেখানে যেখানে কুঠী [illegible]ন, ইংরাজেরা তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য।

[illegible]নীতি নূতন আকার ধারণ করিল। পোপের শাসন-[illegible]ী অধিকারমাত্র মর্য্যাদা লাভ করিল। কিন্তু এসিয়ায় [illegible]রও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময় [illegible]র রাষ্ট্রনীতির পার্থক্য সংস্থাপিত করিবার প্রয়োজন [illegible]য়া ইউরোপ নহে; এসিয়া এসিয়া। সে দেশে [illegible]মর্য্যাদা রক্ষা করিবার কথা কার্য্যকালে পুনঃ পুনঃ

অস্বীকৃত হইতে লাগিল। ইউরোপের সন্ধিপত্র এসিয়ায় আসিয়া পদবিদলিত হইল; ইউরোপের ধর্ম্মনীতি এসিয়ায় আসিয়া ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল;—যাহা ইউরোপে সর্ব্ববাদিসম্মত সদাচার, তাহাও এসিয়ায় আসিয়া পদে পদে পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। এসিয়া ইউরোপ নহে;—এসিয়া এসিয়া। উত্তমাশা অন্তরীপ যেন ভূমণ্ডলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিল; পূর্ব্বভাগে স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারই প্রবল হইয়া উঠিল! যে দিনামারগণ ইউরোপে ইংরাজদিগের অকৃত্রিম আশ্রয়দাতা ও পথ-প্রদর্শক, এসিয়ায় আসিয়া ইংরাজগণ সেই দিনামারদিগের সহিত কলহ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। স্বার্থে মানবসমাজ কত দূর অধোগতি লাভ করে, এসিয়ার ইতিহাসে ইউরোপীয়গণ তাহার যে সকল প্রমাণসৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মানবসমাজের ইতিহাসে সেরূপ প্রমাণ দুর্ল্লভ। সকল শিক্ষা ভাসিয়া গেল, স্বার্থই পরমার্থ হইয়া উঠিল!

এসিয়াকে বুঝিতে হইলে, ইউরোপের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হয়। এসিয়া ইউরোপের প্রাণদান করিয়াছিল; ইউরোপ এসিয়ার প্রাণহরণ করিবার জন্যই অগ্রসর হইতে লাগিল। এসিয়া না থাকিলে, ইউরোপ বড় হইয়া উঠিত না; ইউরোপ না থাকিলে, এসিয়া এত ছোট হইয়া পড়িত না।

মানবদেহের পরিণতি।

এই প্রাচীন ধরা মানবের বাসোপযোগিনী হইতে বহু ত্যাগস্বীকার
ইহার সেই জ্বলন্ত অঙ্কে মানবের স্থান হয় নাই। তৎপরে ইহার
প্লাবিত পৃষ্ঠেও মানবের যোগ্য স্থান কুত্রাপি বিদ্যমান ছিল না।
ইহার ভয়ঙ্কর অত্যুচ্চ নিবিড় জঙ্গল-কণ্টকিত দেহেও মানবকে
পর হয় নাই। ঐ সকল যুগে ধরিত্রী মানবের অভ্যর্থনা ক
না। তাঁহার ঊর্দ্ধাধঃ-বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলও মানবকে
করিতে পারিত না। সেই অঙ্গার, অম্ল, ক্ষার ও লবণাদি
তাহার মানবলীলা শেষ করিয়া দিত। ঐ সকল পদার্থ
হইয়া, তাহাকে পরিষ্কৃত ও প্রধানতঃ অম্লজানবহুল ন
জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইত না। তাই, ধরিত্রী বহু

স্বীকার করিয়া, সুন্দর পরিচ্ছন্ন নাতিশীতোষ্ণ আবাস রচনা করিবার পর মানবকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু মানবের এই দেবমূর্ত্তি একদিনে গঠিত হয় নাই। মানবদেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষের সমষ্টিমাত্র হইলেও, সেই ক্ষুদ্র কোষ বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কথায় বলে, "লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মানবজন্ম লাভ হয়।" আমরাও এ স্থলে মানবদেহের ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার করিয়া লইতেছি। এ প্রবন্ধে যে সকল বিষয় আখ্যাত হইবে, তাহা ঐ অভিব্যক্তিরই একাংশমাত্র।

১ ২ ৩ ৪

পার্শ্বের ১ চিহ্নিত বৃত্তটি একটি জীবকোষ। উহার বহিরাবরণ জীববস্তুতে (Protoplasm) গঠিত। উহার অভ্যন্তরেও বিন্দু বিন্দু জীববস্তু তরল পদার্থে ভাসমান অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। ঐ বিন্দু বিন্দু জীববস্তু স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত ঘন ও পুঞ্জীকৃত। এই ঘন স্থান বৃত্তাকার। উহার কেন্দ্রকে আমরা কেন্দ্র-বিন্দু নামে অভিহিত করিলাম। ১ চিহ্নিত কোষের মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত দেখা যাইতেছে, উহাই ২ চিহ্নিত বৃত্ত। জীববিন্দু ও জীবকোষ কুঞ্চন-প্রসারণ-শক্তি-যুক্ত। এই শক্তিই জীব-
ষের জীবন। যে তরল পদার্থে জীববিন্দু ভাসমান থাকে, উহাতেই
সকলের দেহপোষণ হয়। জীবকোষ একাধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া
করে। ৩ ও ৪ চিহ্নিত চিত্রে এই বিভাগক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।
হজ ও আদিম জীবকোষেই প্রথমজ (Protozon) জীবগণের দেহ
ন ক্রমে জীব যতই উন্নত হয়, ততই জীবকোষের বহিরাবরণের মধ্যে
কেন্দ্রিক আবরণ প্রস্তুত হয়। ইহা জীববিন্দু সকলের চক্রাকারে
। এই আবরণত্রয়কে কেন্দ্রাবরণ, মধ্যাবরণ ও বহিরাবরণ
ক ইংরাজীতে Hypoblast, Mesoblast ও Epiblast
ীতে অভিব্যক্ত হয়, ততই দেখা যায় যে, বহিরাবরণ হইতে
উৎপন্ন হয়; মধ্যাবরণ হইতে আভ্যন্তরিক শারীর-যন্ত্র
ও অস্থি, কোমলাস্থি (Cartilege), শিরা ও পেশী সকল
জীবকোষ ক্রমে বিভক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে,
সমস্তই গঠিত হইয়াছে। এই জীবকোষকেই আমরা

এ স্থলে কৌষিক স্বীকার করিলাম। ইহা কিরূপে উৎপন্ন হইল, সে আলোচনা এ স্থলে প্রাসঙ্গিক হইবে না।

নিম্নতম জীব একটি জীবকোষমাত্র। পরে ঐ কোষ বহুধা বিভক্ত হইয়া কতিপয় কোষ সঞ্জাত হয়; এবং তাহারই সমষ্টিতে সম-কৌষিক জীবগণ উৎপন্ন হইয়াছে। পরে যখন ঐ কোষের এক আবরণের অভ্যন্তরে আরও দুইটি আবরণ উদ্ভূত হইল, তখন অস্থি, মাংস, শিরা, পেশী ইত্যাদি গঠিত হইয়া, পরিণামে বিভিন্নকৌষিক মানবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সহিত তুলনায় মানব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কখনও বা ক্ষতিগ্রস্থ, কখনও বা লাভবান্ হইতে হইতে, এক্ষণে এই পরমবিস্ময়কর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই কি শেষ পরিণতি? যে পরিবর্ত্তনস্রোত যুগযুগান্তর হইতে বহিয়া আসিতেছে, তাহা কি এই স্থানে আসিয়াই অকস্মাৎ রুদ্ধ হইল? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। মানবদেহ আমাদের সমক্ষেই অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের গতি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে, বিস্ময়ে অভিভূত ও আনন্দে পরিপ্লাবিত হইতে হয়। আমি দৈনিক, বার্ষিক, কি সপ্তবার্ষিক পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি না। সে পরিবর্ত্তনে মূল ঠিক থাকে। কিন্তু আমি অদ্য আপনাদিগের সমক্ষে যে পরিবর্ত্তনের কথা উপস্থিত করিতেছি, তাহা কৌলিক। তাহার ফলে, এই স্থূল দেহ সুদূর ভবিষ্যতে আদৌ বিদ্যমান থাকিবে কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। আমি একে একে কতিপয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা আলোচনা করিব। আশা ক আমার অক্ষমতা মার্জ্জনা করিয়া আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন।

প্রথমতঃ, হস্ত ও পদের অগ্রভাগের, অর্থাৎ অঙ্গুলির কথা বিবেচন এ বিষয়ে আমি গত বৈশাখ মাসের "সাহিত্য" পত্রে কিঞ্চিৎ করিয়াছি। এ স্থলে বক্তব্য বিষয়টি অন্যভাবে দেখিবে আমাদিগের অব্যবহিত নিম্নতর জীবগণের পদাঙ্গুষ্ঠ সূক্ষ্ম কোণে, এবং কিছু দূরে অবস্থিত। যেমন আমাদিগের তর্জ্জনীর অবস্থান, তাহাদিগের পদের ঐ দুই অঙ্গুলিরও তদ্রূ পদের অঙ্গুলি তর্জ্জনীর একবারে সন্নিহিত, তাহার সহিত বানরগণের পদাঙ্গুলি সকল বিশেষ কার্য্যক্ষম; অর্থা হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের পদাঙ্গুলি সকল ঐ যোগী হইয়াছে। তাহাদিগের শিরা ও পেশী সকল (কোনটি বা ক্ষীণ, কোনটি বা অঙ্গুলিমূল হইতে বিচ্ছিন্ন

হস্ত ও পদ।

য়াছে। সুতরাং বানরগণের ন্যায় আমরা আর পদাঙ্গুলিসঞ্চালনে কিংবা কার্য্যে ব্যবহার করিতে সক্ষম হই না। ব্যবহার গেলেই সে অঙ্গ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবার সূত্রপাত হয়, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পদের ও হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং অন্যান্য অঙ্গুলির বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য অঙ্গুলিগুলির সন্ধিও তিন-তিনটি, পর্ব্বও তিন-তিনটি। কিন্তু বৃদ্ধের সন্ধি ও পর্ব্ব দুই দুইটি মাত্র! আর একটি কি হইল? অতিপূর্ব্বে জীবরাজ্যে এরূপ ছিল না। আমাদিগের এরূপ কেন হইল? বৃদ্ধের দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি পর্ব্ব, সুতরাং সন্ধি হারাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রকৃতি তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত স্থূল করিয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু মানবজীবনে পদাঙ্গুলির ব্যবহার কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহার কার্য্যক্ষমতা আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কখনও কখনও দ্বিখণ্ডিত হইয়া থাকে; কখনও বা বৃদ্ধের নিকটে ও নিম্নে আর একটি ছোট বৃদ্ধ উৎপন্ন হয়। ইহাতেও বৃদ্ধের যথেষ্ট বলক্ষয় হয়, এবং তাহাকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করে। হস্তপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী, অথবা কনিষ্ঠা ও অনামিকা কখনও কখনও এক ত্বকে আবদ্ধ, কিংবা যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতেও অঙ্গুলিগুলির স্বাধীন ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া পরায়ত্ত হয়।

এক্ষণে অঙ্গুলি সকলের খণ্ডাস্থি-(Phalanges)-গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। উহাদিগের মধ্যভাগ ক্ষীণ ও শীর্ণ। সকল অঙ্গুলিরই অগ্রভাগের [অ]স্থি অতি ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র। দেখিলে মনে হয়, যেন খসিয়া পড়িবার উপক্রম [হইয়া]ছে। তাহা হইলে, সকল অঙ্গুলিই বৃদ্ধের ন্যায় দুই দুই সন্ধি ও পর্ব্বযুক্ত ... পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির তিনখানি খণ্ডাস্থি এত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ যে, প্রায় ... হইয়াছে। উহার নড়াচড়ারও শক্তি নাই। অনামিকাও প্রায় তদ্রূপ

...ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, উহারা ধ্বংসের দিকে ... ডাক্তার Weidersheim বলেন যে, কালে হয় ত পদের ...গুলি থাকিতে পারে।* কিন্তু আমার মনে হয় যে, কেবল ...ত পারে; কিন্তু তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না। এই ..., বানরগণের ন্যায় আমরা পদাঙ্গুলি সকলকে বস্তুগ্রহণ

...re be predicted of the human foot that it ... only two, and two-jointed toes, the great ...ructure of Man. p. 90.

কার্য্যে আর ব্যবহার করি না। সুতরাং ব্যবহার কমিয়া যাওয়াতেই উহারা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু হস্তের অঙ্গুলি সকলের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না যে, উহাদেরও কালে ধ্বংস হইবে। কারণ, উহাদিগের ব্যবহার তত কমে নাই। যাহা কিছু কমিয়াছে, তাহাতে উহাদিগের নাশের আশঙ্কা করা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহাই বা সম্পূর্ণ সাহস করিয়া কিরূপে বলিব? দেখুন, পক্ষীদিগের অঙ্গুলিতে এক এক খণ্ড দীর্ঘ ও গোটা অস্থি; আর আমাদিগের তিন খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রা মাত্র। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাস্থি সকলও ক্রমে ক্ষুদ্রতর ও ক্ষীণতর হইতেছে; মধ্যভাগ শীর্ণ হইতে হইতে প্রায় খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পেশীগুলি আর তেমন কাজ করে না। বৃদ্ধ যিনি, তিনি একাংশ হারাইয়াছেন। কনিষ্ঠ অতীব সঙ্কটাপন্ন। সুতরাং কালে ইহাদিগের ধ্বংসের আশঙ্কা অমূলক নহে।

এক্ষণে হস্ত ও পদের বিষয় আলোচনা করিব। ইহাদিগের কুর্চিনামা এইরূপ।—

বহিরাবরণ (Epiblast)
স্থায়ী ও অস্থায়ী। পদ অথবা কর, যাহা বলুন।
⋮
ডানা ও ফড়ে (rays)
|
পাখা ও পদ (অগ্রপদ = হস্ত; পশ্চাৎপদ = পদ)।

পার্শ্বে যে প্রথমজ জীবটির চিত্র দেওয়া গেল, উহার বহিরাবরণ স্থানে স্থানে বাহির হইয়া গিয়াছে। ঐ বহির্গত অংশ অস্থায়ী; উহা আবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; এবং অন্য স্থান হইতে ঐরূপ অংশ বহির্গত হয়। তদ্দ্বারা ঐ জীব আহার অন্বেষণ করে, এবং পা[illegible] দেহমধ্যে চলিয়া যায়। আবার এইরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারি[illegible] ঐ জীব এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। সুতরাং বহিরাব[illegible] বাহির হইয়াছে, উহাদিগকে হস্ত অথবা পদ, উভয় নামই [illegible] আবার * ইহাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত সিলে[illegible] শ্রেণীস্থ জীবগণের দেহ হইতে ঐরূপ অংশ যাহা বাহি[illegible] প্রবেশ করে না; সুতরাং তাহাকে স্থায়ী বলা যায়[illegible]

* Protozoa.

ডানা। মৎস্যগণের ডানা দেহের সহিত সমকোণে বাহির হয়। এক জোড়া ডানা মস্তকের নিকট, আর এক জোড়া ডানা পিছনের দিকে। এই ডানার অস্থির অগ্রভাগ হইতে কতিপয় ফড়ে বাহির হয়। ক্রমে উহা সূক্ষ্মাগ্র চ্যাপটা কোমলাস্থিতে পরিণত হয়। তাহার সেই কোমলাস্থি ক্রমে (কঠিন) অস্থিতে পরিণত হইতে, কতকগুলি লোপ হয়, আর কতকগুলি একত্রিত হইয়া থাকে। এইরূপে ফড়ে কালক্রমে দুইখণ্ড মোটা অস্থিতে পরিণত হয়। ইহাই আমাদিগের অগ্রহস্তের (arm) ও পদযষ্টির (leg) দুই দুই খণ্ড অস্থি। আর সেই ডানার গোড়ার অস্থি, যাহা মৎস্যাদির দেহলগ্ন, তাহাই আমাদিগের বাহুর ও জঙ্ঘার এক এক খণ্ড অস্থিতে পরিণত হইয়াছে। নিম্নের চিত্রিত মৎস্যের একটি ডানা ও ফড়ে বড় করিয়া অঙ্কিত করিয়া ১।২।৩।৪।৫ চিহ্ন দেওয়া গেল।
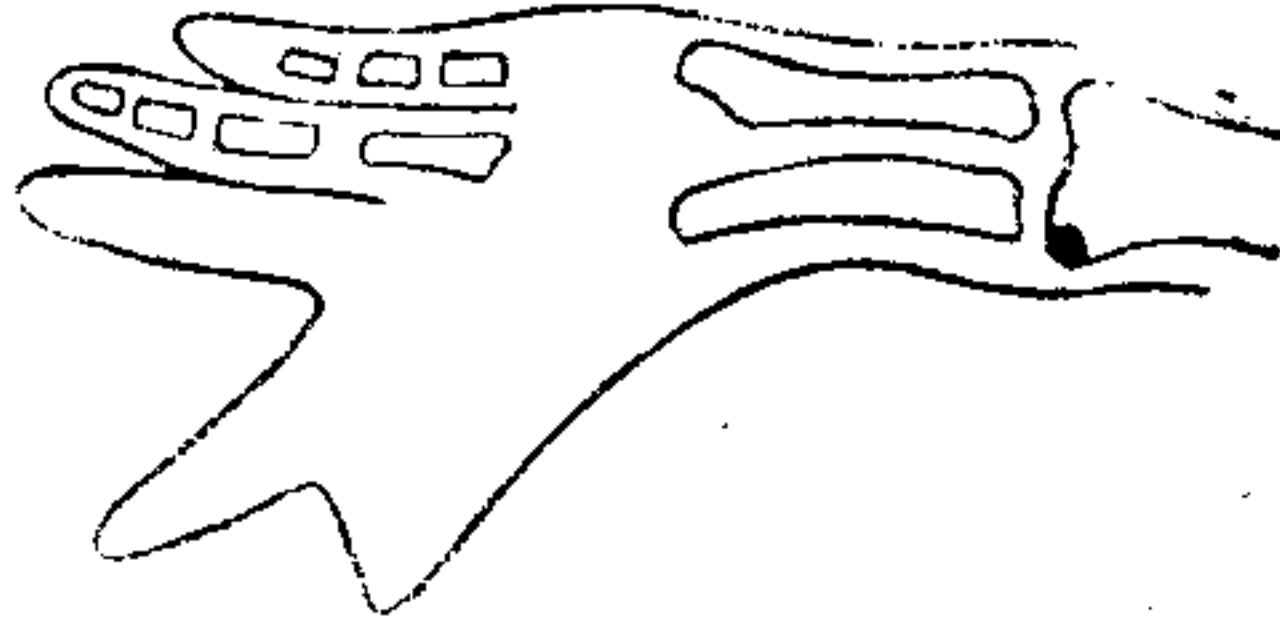
ক্রমে ডানার অস্থি মোটা হইয়া ৫—এর ন্যায় হইল। এবং ফড়েগুলি ১।২ হইতে ৪ পর্য্যন্ত যেরূপ আকৃতি, ঐরূপ হইল। কালে ঐ ফড়ের কোমলাস্থি সকল দৃঢ় অস্থিতে পরিণত ও স্থূল হইল। এই প্রকার হইতে ৩ অবধি ২. পর্য্যন্ত অংশ পরিত্যক্ত হইয়া গেল। তাহার ফল এই হইল যে, ৫ চিহ্নিত খণ্ডের সহিত কেবল ১।২ চিহ্নিত অস্থিখণ্ড থাকিল। তাহাই ক খ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। খণ্ডের অগ্রভাগে ত্বক্‌বৃদ্ধির ন্যায় বোধ হইতেছে। খ-এর অগ্রভাগে ত্বক্‌বৃদ্ধির ন্যায় বোধ হইতেছে। পরিশেষে উহা গ চিত্রের ন্যায় হইল। তাহাতে অগ্রভাগে অর্থাৎ অঙ্গুলিগুলিতে খণ্ডাস্থি হইয়াছে। অনামিকাতে ৪ খানি
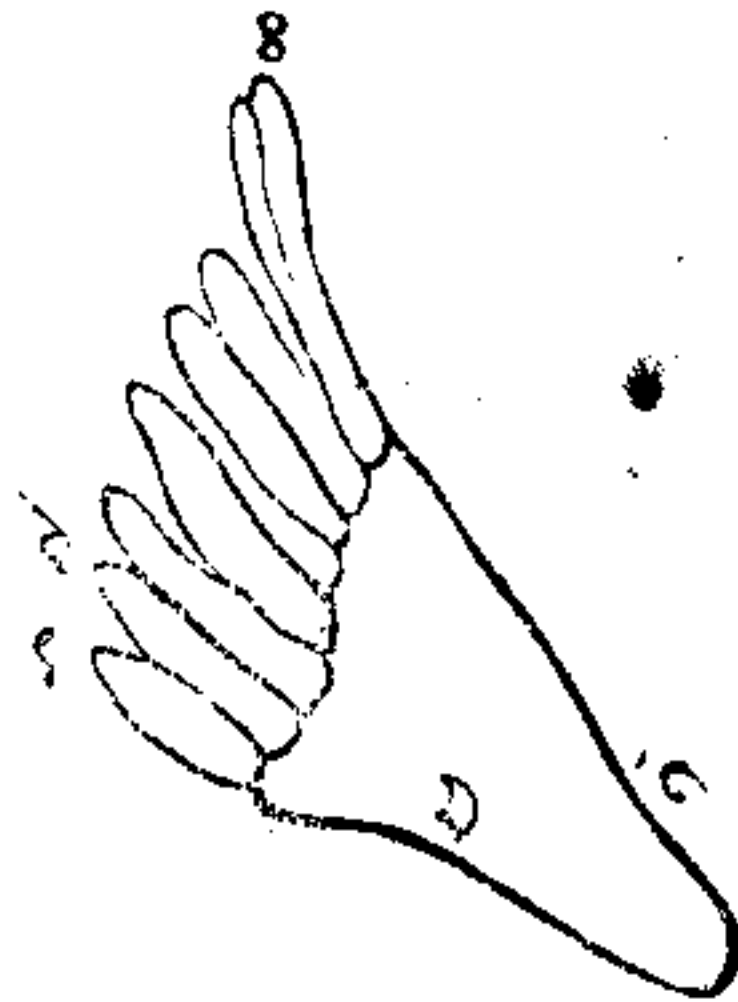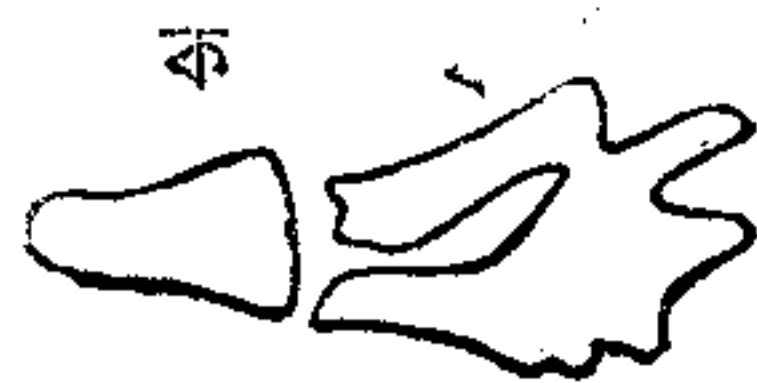
খণ্ডাস্থিদেখিবেন। ইহা একটি সরীসৃপের হাত। দেহলগ্ন অংশে একটি অস্থি, এবং তন্নিম্নে দুইটি অস্থি। ইহা এক্ষণে উচ্চশ্রেণীস্থ জীবগণের হস্ত ও পদের সাধারণ গঠন। ফড়ের সংখ্যা বহু ছিল, তাহা কমিয়া গিয়া দুই-এ পরিণত হইল; কেবল ক্ষতিপূরণস্বরূপ উহারা কঠিন ও মোটা হইল। এইরূপে লোপ ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জীব-রাজ্যে হস্ত ও পদ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ডানা, দেহ হইতে সমকোণে বাহির হইয়াছিল। হস্ত ও পদ সহজ অবস্থায় সমান্তরাল-ভাবে থাকে; সুতরাং উহারা মানবদেহে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৯০ ডিগ্রী দেহের দিকে সরিয়া আসিয়াছে। এই ব্যাপার মৎস্যাবস্থা হইতেই সাধিত হইতেছে। কিন্তু যখন ডানা হস্ত পদ রূপে পরিণত হইল, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত উহাদিগের দৈর্ঘ্য ও অবস্থান কি এক ভাবেই আছে? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। শুধু যদি নর-বানর শ্রেণীই বিবেচনা করেন, তাহা হইলেও দেখিতে পাইবেন যে, হস্ত ও পদের দৈর্ঘ্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উহারা পূর্ব্বের ন্যায় লম্বা নাই, অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। পদের Tibia নামক অস্থিখানি, সমস্ত অস্থি অপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা জঙ্ঘাস্থির সহিত এক লাইনে ছিল না; পূর্ব্বোক্ত মতে সরিয়া আসিয়া তাহার ঠিক্ নীচে আসিয়াছে। তজ্জন্য দণ্ডায়মান অবস্থায় দেহের সমস্ত ভার প্রায় উহাকেই বহন করিতে হয়। কাজেই উহা যেন চাপালাগা মত হইয়া ছোট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু পদের দেহভার বহন ও ভ্রমণ কার্য্যের আবশ্যকতা বশতঃ পদযষ্টির উপরভাগের পেশী শক্ত, বলিষ্ঠ ও স্থূল হইয়াছে। বাহুর পেশীও ব্যবহারবশতঃই ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু হস্ত ও পদের অবস্থানের পর্য্যালোচনা করিলে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। হস্ত এখন আমরা কোথায় দেখিতেছি? স্কন্ধ প্রদেশ হইতে। অর্থাৎ, যে স্থান হইতে বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর বাহির হইয়াছে, তাহার উপরেই স্কন্ধ, তৎসংলগ্নই বাহুমূল। পৃষ্ঠবংশ মস্তকের নীচে হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ু পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। মস্তকের নীচেই গ্রীবাদেশ, উহাতে (এখন) পঞ্জর নাই। গ্রীবার নিম্নভাগ হইতে পৃষ্ঠবংশের দুই দিকে পঞ্জর বাহির হইয়া পীঠ হইতে বুকের দিকে আসিয়াছে, তাহাতেই বক্ষঃ-গহ্বর গঠিত হইয়াছে। এই সকল পঞ্জর, সংখ্যায় দ্বাদশটি। ইহাদিগের মধ্যে সকলের উপরকার পঞ্জর, যাহাকে বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর বলা যাইতে পারে, তাহার উপরেই স্কন্ধ, এবং তৎসংলগ্ন বাহু। গ্রীবা প্রদেশে পৃষ্ঠবংশ হইতে এখন প্রায় পঞ্জর বাহির হয় না; কিন্তু পূর্ব্বে এ প্রদেশেও পঞ্জর

বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা উপরে ছিল; সুতরাং স্কন্ধও উপরে ছিল, বাহুমূলও উপরে ছিল। কালক্রমে বাহুদ্বয় নীচে নামিয়া আসিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে যে, গ্রীবাদেশে, বর্ত্তমান পঞ্জর সংস্থানের উর্দ্ধে আরও পঞ্জর, থাকার প্রমাণ কি? পৃষ্ঠবংশে সর্ব্বসমেত ৩৩ খানি খণ্ডাস্থি (vertebræ) আছে। উহার উপরের ৭ খানি গ্রীবাদেশের মধ্যে আছে। (৮ম) অষ্টম খণ্ডাস্থি হইতে দুই দিকে যে পঞ্জর বাহির হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর। ইহার উপরে, অর্থাৎ পৃষ্ঠবংশের প্রথম সাতখানি খণ্ডাস্থিতে, আর এখন কাহারও পঞ্জর দেখা যায় না। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিৎ (P. Albrecht) সাহেব এক জন ব্যক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার (৭ম) সপ্তম খণ্ডাস্থিতে পঞ্জর ছিল। তবেই এখনকার প্রথম খণ্ডাস্থির উপরের একখানিতেও পঞ্জর থাকা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। * কিন্তু প্রথম খণ্ডাস্থি হইতে ষষ্ঠ খণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত যে ছয়খানি খণ্ডাস্থি আছে, তাহার আকৃতি দেখিলেই সহজেই অনুমান হইবে যে, উহাদিগের পূর্ব্বে পঞ্জর ছিল। পার্শ্বের খণ্ডাস্থির চিত্রে দেখিবেন যে, দুই দিকে দুই খণ্ড লম্বা কোমলাস্থি বাহির হইয়া আসিয়াছে। উহাই অতীত পঞ্জরের মূল-ভাগ। অতীত পঞ্জর সম্ভবতঃ যে ভাবে ছিল, তাহা বিন্দু বিন্দু লাইনের দ্বারা প্রদর্শিত হইল। ঐ ভাবে ঘুরিয়া গ্রীবাদেশ হইতে কণ্ঠের দিকে আসিত। কালক্রমে উহাদিগের বিন্দু বিন্দু ভাগ ক্ষয় হইয়া মূলভাগমাত্র আছে। এই অবস্থা ষষ্ঠ খণ্ডাস্থিতে বিলক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু আর ৫ খানি খণ্ডাস্থিতে যদিও এই অবস্থা স্পষ্ট দেখা যায় না, তথাপি খণ্ডাস্থি-গুলির দুই দিকে পূর্ব্বচিহ্ন অনেকাংশে বুঝিবার উপায় আছে। তবেই গ্রীবাদেশ হইতে কণ্ঠের দিকেও প্রাচীনকালে পঞ্জর বিদ্যমান ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। উহারা গ্রীবাস্থ সাতখানি খণ্ডাস্থি হইতে বাহির হইত। সুতরাং পৃষ্ঠবংশের

১ ৭ ৮ ১ ৭ ১০ ১১ ১১ ১২ ২৪ ২৯ ৩৩

৬

* ৬ চিহ্নিত চিত্র দেখুন।
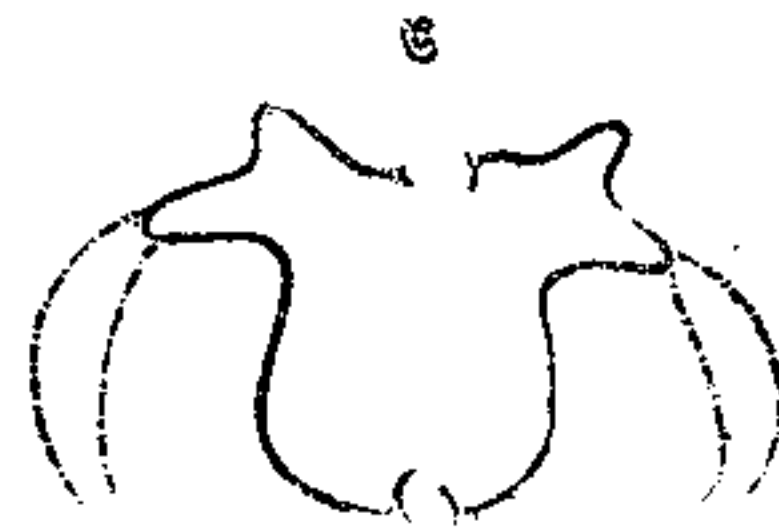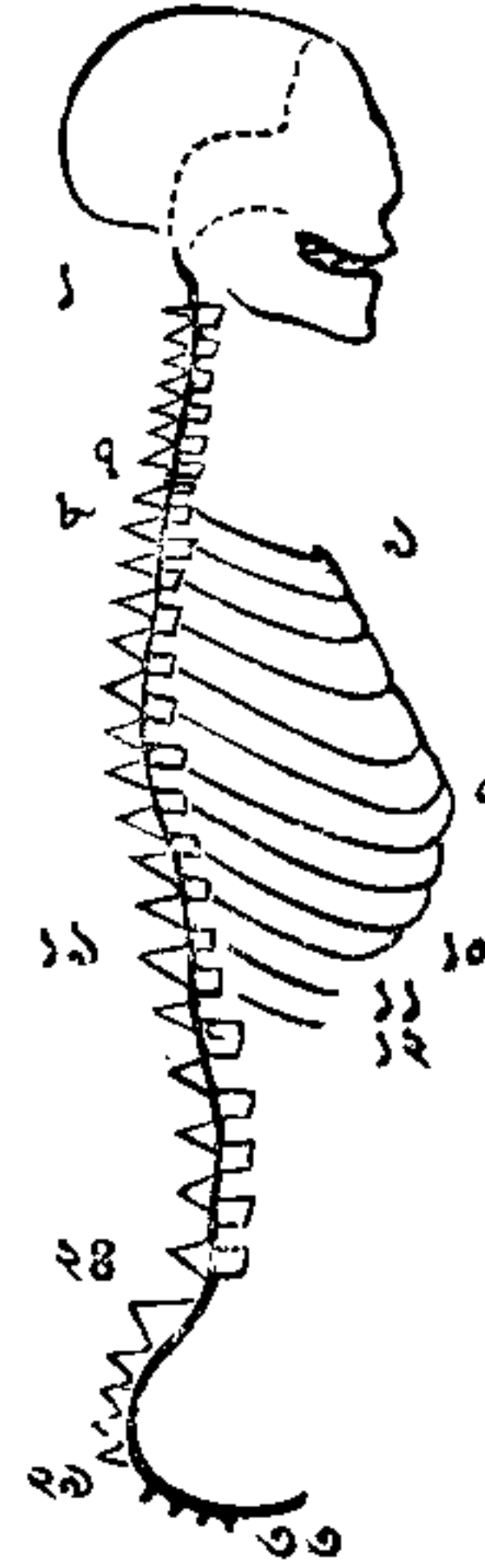
প্রথম খণ্ডাস্থি ও তৎসংলগ্ন পঞ্জর, আরও প্রায় পাঁচ অঙ্গুলি উপরে ছিল ; কাজেই স্কন্ধও উপরে ছিল ; বাহুমূল ও বাহুও উপরে ছিল ; এক্ষণে বাহু তাহার অপেক্ষা ঐ পরিমাণ নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে! কিন্তু আরও কি নীচে নামিবে? গ্রীবাভাগ আদৌ ছিল না ; এখন যদি বা কিঞ্চিৎ হইয়াছে, আরও কি লম্বা হইবে? কারণ, পঞ্জর আরও নীচে নামিলেই ঐ ফল অনিবার্য্য। এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায় যে, আরও কিছু নামিবে। বেশীও নামিতে পারে। কিন্তু কিছু না কিছু নিশ্চয়ই নামিবে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর পৃষ্ঠবংশের অষ্টম খণ্ডাস্থি হইতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই পঞ্জর এখন কাহারও কাহারও ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেখা যায়। প্রাণীতত্ত্ববিৎ Struthers, Grosse, Turner প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কোন কোন ব্যক্তির অষ্টম খণ্ডাস্থি লগ্ন বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জরের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। † সুতরাং বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জর যখন ইহারই মধ্যে বিকৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহার আর কোনও আশা করা যায় না। উহার যে ভবিষ্যতে ধ্বংস হইবে, তাহা নিশ্চিত। তাহা হইলে পৃষ্ঠবংশের নবম খণ্ডাস্থি হইতে প্রথম পঞ্জর বাহির হইবে। সুতরাং স্কন্ধ ও বাহুমূল, সুতরাং বাহুও একটু নীচে নামিবে। এইরূপে অন্যান্য পঞ্জরও লুপ্ত হইতে পারে। ক্রমে এক একটি পঞ্জর লুপ্ত হইবে, আর স্কন্ধ নীচে নামিবে, গ্রীবা বড় হইবে, এবং বাহুও নীচে নামিবে, অবশেষে?—আর পঞ্জরও নাই, সুতরাং বুক পীঠও নাই, বাহুও নাই। কি সর্ব্বনাশ! আমরা কি হইতে চলিলাম! আপনারা ভীত হইবেন না, এ অবস্থাপ্রাপ্তির বহু বিলম্ব আছে। হয় ত এ অবস্থা নাও হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত শ্বাস-যন্ত্র ও হৃদপিণ্ড বক্ষোগহ্বরে বিদ্যমান আছে, সে পর্য্যন্ত পঞ্জরগুলির একেবারে লোপ হওয়া বড় একটা সম্ভবপর নহে। হস্তের বহু ব্যবহারে বক্ষের শিরাপেশী সকল সবল হইবে। আর শ্বাস-যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের যে সকল স্থান পঞ্জরের সহিত সংযুক্ত আছে, অথবা পঞ্জরের সাহায্য অপেক্ষা করে, পঞ্জর লুপ্ত হইলে সেই সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে ; এবং ঐ যন্ত্রদ্বয় আর পঞ্জরের সাহায্য পাইবে না। তাহা হইলে ঐ দুই অত্যাবশ্যক যন্ত্রের বর্ত্তমানরূপ অবস্থিতি

---

† The fact that in man the first thoracic rib is probably beginning to degenerate and is in the present time in process of atrophy is established by the not infrequent recurrence of undoubted cases of abortive development. Heidersheim's Structure of Man p. 43.

থাকিতে পারে না। অর্থাৎ, উহারা স্থানচ্যুত হইবে। তাহা হইলে যে মানব-জীবনই যায়! সুতরাং ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত মানবজীবন আছে, সে পর্য্যন্ত সমস্ত পঞ্জর লুপ্ত হইতে পারে না। তবে এখনকার বক্ষোলগ্ন কয়েকটি যে লুপ্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলেই হস্ত আরও নীচে নামিল। কিন্তু অন্যান্য পঞ্জর যে নিতান্তই অক্ষয়, তাহাও বলা যায় না। যদি সেগুলিও যায়, তবে বাস্তবিকই শ্বাস-যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড স্থানচ্যুত হওয়ায় মানবদেহের ও মানব-জীবনের অন্যরূপ অভিব্যক্তি হইবে, এইমাত্র।

তাহার পর পদের অবস্থান বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, নিম্নতম জীবগণের পশ্চাৎপদ দেহের যে ভাগ-সংলগ্ন, মানবের পদ তাহা অপেক্ষা উপরের দিকে, অর্থাৎ মস্তকের দিকে উঠিয়া আসিয়াছে। পৃষ্ঠবংশের প্রায় শেষভাগ হইতে কটিদেশের আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই নিম্নভাগ হইতে আমাদের উরুর আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু নিম্নতম জীবগণের পৃষ্ঠবংশের খণ্ডাস্থি সকলের সংখ্যা (আমাদিগের) ৩৩ খানি অপেক্ষা বেশী। তাহাদিগের অনেকের কটিদেশের খণ্ডাস্থি ১১ খানি, এবং তন্নিম্নস্থ লেজভাগের (Coccygeal region) খণ্ডাস্থি ১৫ খানি। মানবের কটিদেশের খণ্ডাস্থি ১০ খানি ও লেজভাগের খণ্ডাস্থি ৪ খানি মাত্র। সুতরাং দেহের যে ভাগ হইতে তাহাদিগের উরু বাহির হইতেছে, মানবের উরু তাহা অপেক্ষা উপর হইতে বাহির হইয়াছে। তবেই দেখুন কি দুর্দ্দশা!

হস্তের গতি নীচের দিকে; † আর পদের গতি উপরের দিকে। সুতরাং হস্ত ও পদ ইহাদিকের দুইএর পরস্পর মিলিত হইবার চেষ্টায় গরীব মানবজাতির কি দশা হইবে, তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই চিন্তার ভার আপনাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া, আমি বুক ও পীঠের অবস্থার পর্য্যালোচনা করি।

হাত ও পায়ের কথা বলিতেই প্রসঙ্গক্রমে বুক ও পীঠের বিষয় কিছু বলিতে হইয়াছে। এক্ষণে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বেই

বুক ও পীঠ। বলা হইয়াছে যে, পৃষ্ঠবংশ হইতে দুই দিকে পঞ্জর বাহির হইয়া বক্ষাস্থির (Sternum) সহিত মিলিত হইয়াই বক্ষোগহ্বর ও পৃষ্ঠের রচনা করিয়াছে। অতিনিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীরও (কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি) দেহের এক দিক উপরে, আর এক দিক নীচে থাকায়, বুক পীঠ পৃথকরূপে দেখা যায়।

* Whereas the shifting of the forelimb takes place from before backwards, that undergone by the hindlimb is from behind forwards, i. e. towards the head. Weidersheim's Structure of Man p, 94-95.

কিন্তু উহাদিগের অস্থি না থাকায়, বুক ও পীঠে বড় বেশী প্রভেদ নাই। ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবগণের বুক পীঠের প্রভেদ বাড়িয়াছে। পরিশেষে আমাদিগের অত্যন্ত বিভিন্নরূপ বুক ও পীঠ উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমেই মানবের ও উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের সহিত নিম্নতর প্রাণীর বুক পীঠের আকারের এক বাহ্যিক প্রভেদ লক্ষিত হয়। আমাদিগের বুক পীঠের দৈর্ঘ্য পাশাপাশি, অর্থাৎ এক কক্ষ হইতে আর এক কক্ষ পর্য্যন্ত মাপে যতটা হয়, তাহাই দৈর্ঘ্য। এবং গলমূল হইতে বক্ষাস্থির (Sternum) শেষ পর্য্যন্ত মাপে যতটা হয়, তাহাই প্রস্থ। প্রথমোক্তটা শেষোক্ত অপেক্ষা মাপে বেশী। কিন্তু নিম্নতর প্রাণিগণের শেষোক্তটি প্রথমোক্ত অপেক্ষা মাপে বেশী। আমাদের উঠিয়া দাঁড়াইবার ফলে দেহের ভারকেন্দ্র নীচের দিকে ও পীঠের দিকে সরিয়া গিয়াছে; আর চতুষ্পদগণের দেহের ভারকেন্দ্র বুকের দিকে সরিয়া গিয়াছে; ইহার ফলে শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডাদির ভার চতুষ্পদ অবস্থায় যেমন বুকের দিকের পঞ্জরকে বহন করিতে হইত, দণ্ডায়মান অবস্থায় তেমনই পীঠের দিকের পঞ্জরকে বহন করিতে হইতেছে। তাহাতেই, অর্থাৎ ঐ যন্ত্র সকল পীঠের দিকে সরিয়া যাওয়াতে, পঞ্জর সকলেরও যে দিকে পৃষ্ঠবংশে সংলগ্ন, সেই দিক শক্ত ও সবল হইয়াছে; এবং ঐ সংযোগ দৃঢ়তর হইয়াছে। আর পঞ্জরের যে ভাগ বক্ষাস্থির দিকে, তাহার কার্য্যের ভার হ্রাস হওয়ায়, বক্ষাস্থির সহিত পঞ্জরের সংযোগ দুর্ব্বল ও নরম হইয়া যাইতেছে; এবং কোনও কোনও পঞ্জরের সংযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পৃষ্ঠবংশের (৮ম) অষ্টম খণ্ডাস্থি হইতে এক্ষণে পঞ্জর আরম্ভ হইয়াছে। আর ষষ্ঠ সমষ্টিতে আমাদিগের দ্বাদশটি পঞ্জর আছে। উপরের চিত্র হইতে দেখিবেন যে, ঐ দ্বাদশটির মধ্যে সাতটি পঞ্জর বক্ষাস্থি (ক) সংলগ্ন। তাহার নীচের তিনখানি কোমলাস্থি দ্বারা যথাক্রমে ঊর্দ্ধতর পঞ্জরের সহিত সংলগ্ন। আর অবশিষ্ট দুইখানি, অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্জর বক্ষাস্থিতেও লগ্ন নহে, ঊর্দ্ধতর পঞ্জরেও যুক্ত নহে; তাহাদিগের অগ্রভাগ মুক্ত। অতি পূর্ব্বে এমন ছিল না। অদ্যাপি কোনও কোনও ব্যক্তির ও উন্নত বানরগণের অষ্টম পঞ্জর বক্ষাস্থির সহিত সংলগ্ন
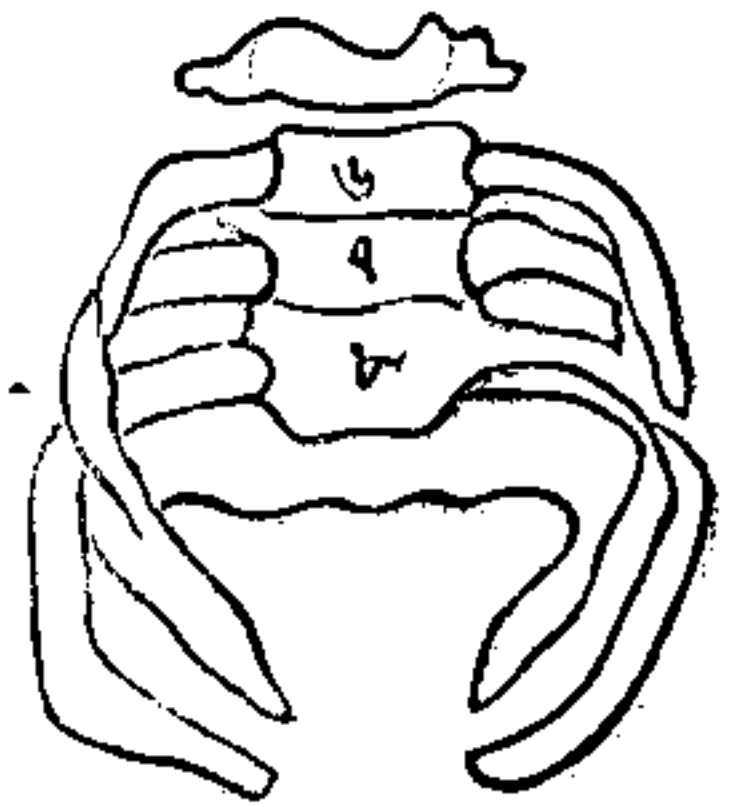
সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রথম ৭টি পঞ্জরের পৃষ্ঠবংশের সংযোগ দৃঢ়, এবং দৈর্ঘ্যেও তাহারা ক্রমেই বেশী, অর্থাৎ প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি, তদপেক্ষা তৃতীয়টি, এইরূপে সপ্তমটি পর্য্যন্ত পঞ্জরের দৈর্ঘ্য ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টম পঞ্জর হইতে দৈর্ঘ্য কমিতে থাকে; অবশেষে কমিতে কমিতে একাদশ ও দ্বাদশটি অতি ছোট হইয়া গিয়াছে। এই দুই পঞ্জরের দৈর্ঘ্য আবার অস্থায়ী। উহারা দুইটি কখনও একটু বড়, কখনও একটু ছোট, এইরূপ হইতেছে। যখন এই ভাবে পরিবর্ত্তনের পথে পড়িতে পড়িতে অস্থায়ী দৈর্ঘ্য লাভ করিয়াছে ও ক্ষুদ্রতম হইয়াছে, তখন উহারা নিশ্চয়ই ধ্বংসের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। উহাদিগের একেবারে লোপ পাওয়া কালসাপেক্ষ মাত্র, কিন্তু নিশ্চিত। প্রথম সাতটি পঞ্জরের পৃষ্ঠবংশের সংযোগ দৃঢ়, তাহা বলাই হইয়াছে; কিন্তু অষ্টম হইতে দ্বাদশ পঞ্জর পর্য্যন্ত পাঁচখানি পঞ্জরের ঐ সংযোগ দুর্ব্বল ও বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অগ্রভাগ মুক্ত, অথবা বক্ষাস্থির সহিত অসংলগ্ন; পশ্চাৎভাগের সংযোগও বিকৃত হইতেছে। সুতরাং এই কয়েকখানি পঞ্জর যে অদূর ভবিষ্যতে লোপ পাইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই উদর-গহ্বর আর একটু বাড়িল। এই সর্ব্বনাশী অন্নকষ্টের দিনে উদর-গহ্বরের আয়তন-বৃদ্ধি দুশ্চিন্তার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান দ্বাদশ পঞ্জরের নীচে চতুষ্পদগণের আরও কয়েকটি পঞ্জর আছে। আমাদিগেরও ঐ পঞ্জরের নীচে পৃষ্ঠবংশের যে সকল খণ্ডাস্থি আছে, তাহাদিগের আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদিগের সংলগ্ন আরও পঞ্জর পুরাকালে বর্ত্তমান ছিল। দ্বাদশ পঞ্জর পৃষ্ঠবংশের উনবিংশ খণ্ডাস্থির সংলগ্ন। বিংশ খণ্ডাস্থি হইতে আর আমাদিগের পঞ্জর নাই। কিন্তু বিংশ হইতে চতুর্ব্বিংশ খণ্ডাস্থির দুই দিকেই, অর্থাৎ বুকের ও পীঠের দিকে অতি ক্ষুদ্র অস্থি বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এইরূপ কারণে গতকালে পঞ্জরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঐ পাঁচখানি খণ্ডাস্থিতেও পূর্ব্বে পঞ্জর সংযুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তখন উদর কত ছোট ছিল? আর বুক? সে ত একেবারে মস্তক হইতে প্রায় নাভিমূল পর্য্যন্তই ছিল; কারণ গ্রীবাপ্রদেশেও পঞ্জর থাকা উপরে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই জন্যই চতুষ্পদগণের বক্ষ, গলা হইতে পেট পর্য্যন্ত যত লম্বা, কক্ষ হইতে কক্ষ পর্য্যন্ত তত নহে। ইহা উপরেও দেখা গিয়াছে। পঞ্জরের সংখ্যা যে পূর্ব্বে দ্বাদশটি অপেক্ষা অধিক ছিল, ইহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, মানবের ভ্রূণের ঐরূপ অদ্যাপি দেখা যায়। ভ্রূণ বড় হইলে, আর ঐ অতিরিক্ত পঞ্জর সকল থাকে না।

আমরা দেখিলাম, পঞ্জরগুলি উপর হইতে লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রথম পঞ্জরে, এখনই ধ্বংসের পূর্ব্বলক্ষণ অনেক সময় দেখা যাইতেছে। আর একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্জর ত ধ্বংসের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং অতি দূর ভবিষ্যতে বুকেরও যে অনেক অংশ লুপ্ত হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে। তবে উপরের দিক অপেক্ষা বুকের নীচের দিকেই পঞ্জরের ধ্বংসের গতি কিছু দ্রুততর। উপরের দিকে পঞ্জর শীঘ্র লুপ্ত হইবার যে সকল বিঘ্ন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেই জন্যই ডাক্তার ওয়েডারশেম বলেন যে, "Should reduction at the upper end of the thorax advance, it will do far more slowly than at the lower." *

বক্ষাস্থি।

তা'র পর বক্ষাস্থির কথা। উহা নিম্ন জীবগণের এক খণ্ড ছিল। আমাদিগের বেলায় যেন ফাটিয়া তিন খণ্ড হইয়াছে। তাহার তিনটি ভাগ এখন স্পষ্টই দেখা যায়। আর নিম্নভাগে পঞ্জরের পূর্ব্ব সংযোগস্থানও যেন স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং বক্ষাস্থিও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর। আমাদিগের পঞ্জর কমিতেছে, বুক সুতরাং পীঠ কমিতেছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, পৃষ্ঠবংশের খণ্ডাস্থিগুলিও সংখ্যায় কমিয়াছে। সুতরাং ইহাদিগের পরিণাম বুঝিতে আর বাকী থাকিল না।

আভ্যন্তরিক যন্ত্র; পাকস্থলী।

বুক ও পীঠের কথা বলিতে, উদর-গহ্বরের কথা বলিতে হইয়াছে। আমরা দেখিলাম যে, এই গহ্বর বাড়িতেছে; কিন্তু নিম্ন প্রাণিগণের সহিত তুলনায় মানবের পাকস্থলী ও গলনালী (æsophagus) বৃহৎ অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র ও নিম্ন অন্ত্র (cœcum) প্রভৃতি সকলই ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। পাকস্থলীর অভ্যন্তর যেন একাধিক অংশে বিভক্ত হইয়া একাধিক কাম্‌রা প্রস্তুত হইতেছে। পাকস্থলীর বহিরাবরণ স্থানে স্থানে সঙ্কুচিত ও খণ্ডিত হইবার সূত্রপাত দেখা যায়। তাহা হইলে এই যন্ত্রের আয়তনের হ্রাস হইবে, এবং উহার অভ্যন্তর নানা ভাগে বিভক্ত হইবে। সুতরাং প্রত্যেক ভাগ স্বল্পায়তন হইবে। † যে সকল স্থলের সংস্কোচবশতঃ পাকস্থলী নানা ভাগে

---

* Structure of Man. p. 45.

† Attention may however be drawn to the Saccus Coecus which is as it were indicative of the commencement of process of chambering in the stomach, the autrum polyricum, and a constriction.

Structure of Man. p. 165.

বিভক্ত হইতেছে, ঐ সকল স্থানের অবস্থা শ্রীযুক্ত হাউস সাহেব (G. B. Howes) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "There was at the constricted part a ring like specialisation of the circular musculature. এইরূপে বিভাগের সূত্রপাত হয়। একটি ভাঙ্গিয়া একাধিক হইতেছে; বৃহৎ, ক্রমে ক্ষুদ্র হইতেছে। শেষে থাকিবে ত? বিকৃত হওয়া একবার আরম্ভ হইলে, শেষ ফলের আশঙ্কা সঙ্গতরূপেই উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই যন্ত্রটা যদি লুপ্ত হয়, অথবা গুরুতররূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা মানব-জন্ম হইতে উদ্ধার পাইব। এই অন্নময় কোষ, এই জরা-ব্যাধি-প্রপীড়িত স্থূলদেহ, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইবে। এ চিন্তা, এ কল্পনা হৃদয়কে আনন্দে মাতাইয়া তোলে।

অন্ত্র।

যাহা হউক, যেমন পাকস্থলীর এই অবস্থা হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তেমনই অন্ত্রও দৈর্ঘ্যে কমিয়া আসিতেছে। চতুষ্পদদিগের, এমন কি, নিম্নশ্রেণীস্থ বানরগণের অন্ত্র অপেক্ষা ও সভ্য মানবের অন্ত্র ক্ষুদ্র। সবই যেন সেই এক পরিবর্ত্তনের দিকেই যাইতেছে।

শ্বাসযন্ত্র। হৃৎপিণ্ড।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শ্বাস-যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড এখন বুকের দিক হইতে পীঠের দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নহে; চতুষ্পদ অবস্থায় উহারা মস্তকের নিকটবর্ত্তী ছিল; এক্ষণে কিছু নীচে নামিয়াছে। শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড যদি স্থানচ্যুত হইতে আরম্ভ করিল, তবে মানবজীবনের আর কি আশা করা যাইতে পারে?

এই অঙ্গকে উত্তমাঙ্গ কহে। বস্তুতঃ ইহার মধ্যস্থ মস্তিষ্ক-পদার্থই মানবকে উন্নত ও মানব-নামকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এই অঙ্গকে দুই ভাগে বিভাগ

মস্তক।

করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভ্রুযুগের ঊর্দ্ধভাগ; এবং ভ্রুযুগের অধোভাগ। ঊর্দ্ধভাগে কপাল ও মাথার খুলি, এবং অধোভাগে চক্ষু, কর্ণ, তালু, উভয়-হনু ও দন্ত আছে। প্রথমতঃ ঊর্দ্ধভাগের কথা বিবেচনা করুন। নিম্নতম জীবগণের ও বানরাদিরও মস্তকের তুলনায় কপাল অতি ছোট; কিন্তু মানবের কপাল, তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক বড়। মাথার খুলিও অন্য জীবগণের অপেক্ষা মানবের বড়। কিন্তু প্রকৃত মুখ-অংশ অনেক ছোট। পার্শ্বে তিনটি চিত্র অঙ্কিত হইল।

১
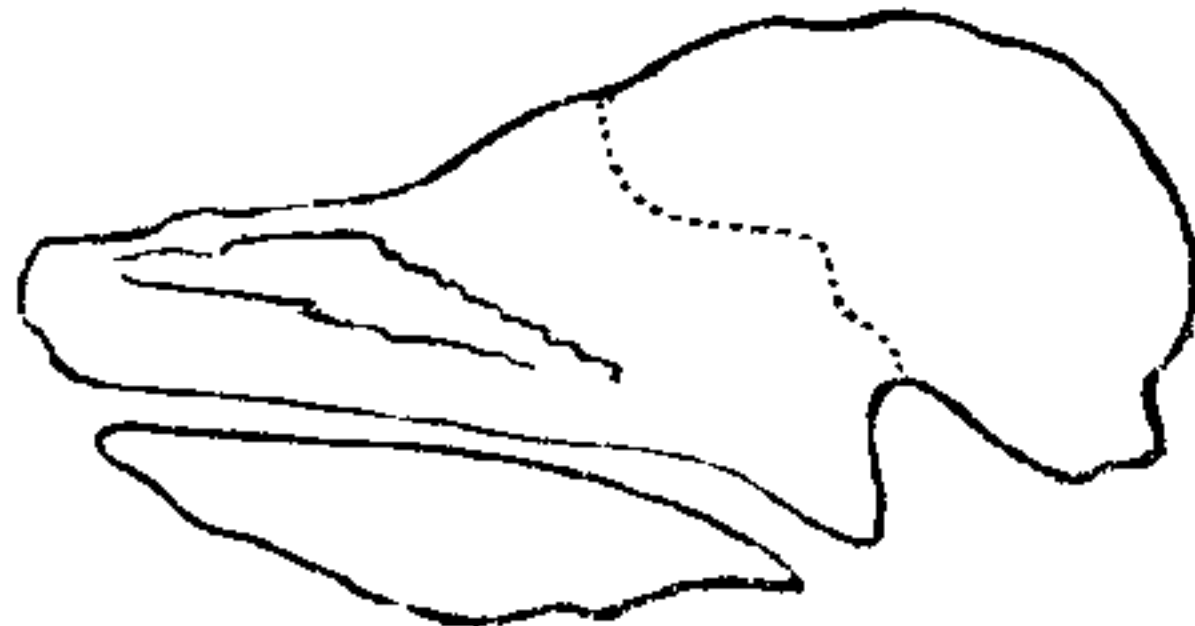
১নং চিত্র একটি হরিণের মস্তক; ২নং চিত্র, একটি ওরাংওটাং, অর্থাৎ বানরের ও ৩নং চিত্র একটি মানুষের মস্তক। ১নং চিত্রের মাথার উপর ভাগ অতি ছোট; এবং মুখ-অংশ অনেক বড়, এবং সম্মুখের দিকে অনেক দূর বাহির হইয়া আসিয়াছে। ২নং চিত্রের মাথার খুলি, অর্থাৎ উপরিভাগ, ১নং চিত্র অপেক্ষা বড়; কিন্তু মুখ-অংশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর, এবং এই অংশই খুলি অপেক্ষা বড়। কিন্তু ৩নং চিত্রের মস্তকের খুলি অনেক বড়। মুখ-অংশের প্রায় তিনগুণ। এবং মুখ-অংশ সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া আসে নাই। মুখ-অংশ এক ও দুই নম্বর চিত্র অপেক্ষা অনেক ছোট। এই তিনটি চিত্র মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মানবের চোয়াল ও মুখভাগ ক্রমে খর্ব্ব হইয়া ভিতরের দিকে আসিয়াছে। এই ভাগ চতুষ্পদদিগের অপেক্ষা অনেক ছোট হইয়াছে; কিন্তু মস্তকের উপর ভাগ অপরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মানবের মাথার খুলি এত বড় হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। এত বড় মস্তিষ্ক আবরণ করিবার জন্যই এত বড় মাথার খুলি আবশ্যক। মাথার খুলিও বড় হইয়াছে; কপালও বড় হইয়াছে। সুতরাং ভ্রূযুগের উপরের অংশ সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।
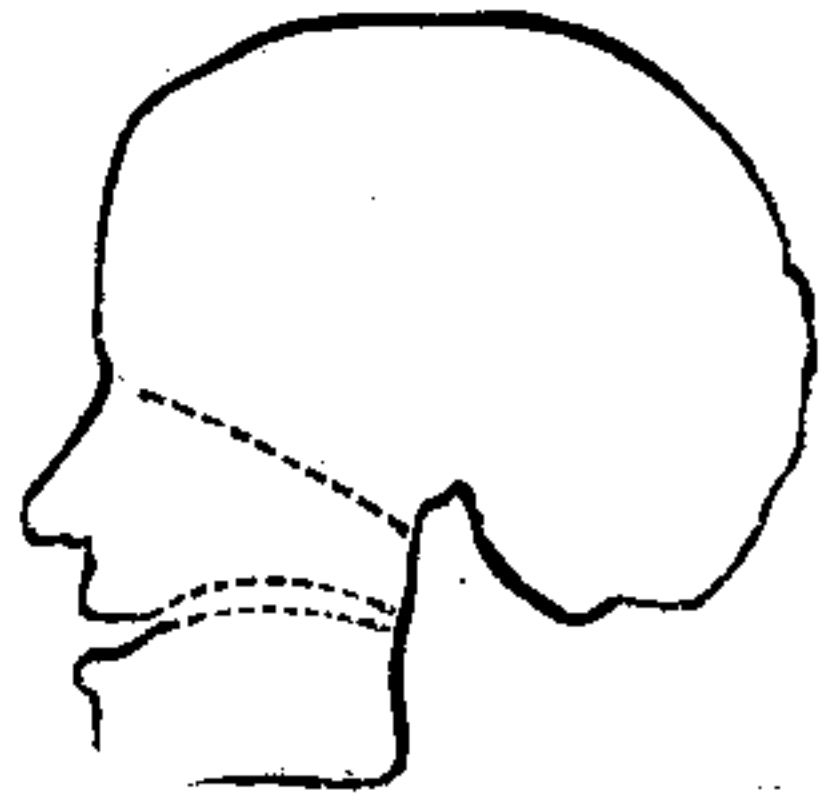
ভ্রূযুগের নীচের কথা বিবেচনা করিতে, প্রথমে দন্তের কথা বিবেচনা করিব। জীব-রাজ্যে অতিনিম্ন শ্রেণীতে, দন্তের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, কঠিন মাংস ও ত্বকে দন্তের কার্য্য সম্পন্ন হইত। পরে একটি গোটা আইলের মত অস্থি সঞ্জাত হইল; এবং তাহাতেই দন্তের কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে ঐ এক অবিভক্ত গোটা অস্থি, নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, পৃথক পৃথক দন্তের উৎপত্তি হইল। দন্তের আরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে জীবের

দন্ত।

তাহাদিগের দন্ত তীক্ষ্ণ শূলাগ্রের ন্যায়; এবং মুখের ভিতরের দিকে দন্তের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র। মৎস্য তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে পারে না। তাহারা চর্ব্বণ করে না। সেই জন্য অন্য প্রকার দন্তের আবশ্যক নাই। যাহারা গোটা জন্তুর আম-মাংস খায়, তাহাদিগের তীক্ষ্ণ, সরল ও উচ্চ দন্তের আবশ্যক; ঐ দন্ত পরস্পর কিছু ব্যবধানে থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে, ঐ দন্ত শিকারের শরীরে একাধিক স্থানে সুবিধা মত বিঁধাইয়া দিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগের শিকারের আম-মাংস ও অস্থি চর্ব্বণ করিবার আবশ্যক থাকায়, অসম চ্যাপ্‌টা ও বিস্তৃত পেষণ-দন্ত থাকে। যাহারা দূর্ব্বা অথবা অন্য কোনও শস্য আহার করে, তাহাদিগের কর্ত্তনোপযোগী দন্ত থাকা প্রয়োজন হয়। সুতরাং দন্তও তদ্রূপ হইয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে তীক্ষ্ণ ও উচ্চ শ্ব-দন্ত, বিস্তৃত ও অসম পেষণ-দন্ত ও ছেদন-দন্তের উৎপত্তি হইয়াছে।† আমরা মানবজাতি সর্ব্বভুক্‌; আমাদিগের দন্তের গঠনও সর্ব্বপ্রকারই আছে। যাহার যেরূপ দন্তের আবশ্যক নাই, তাহার সেইরূপ দন্ত বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার উৎপত্তির ও বংশক্রমের পরিচয় দেয়। ইহা অভিব্যক্তিবাদের একটি আনুষঙ্গিক প্রমাণ। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দন্তের সমষ্টি, আমাদিগের বত্রিশটি (৩২) মাত্র; বানরগণেরও তাহাই; তবে কোনও কোনও বিশেষ শ্রেণীর বানরের ৩৪ চৌত্রিশটি দন্ত দেখা যায়। আর নিম্নতর স্তন্যপায়ী জীবগণের মধ্যে অনেকের ৪৪ চুয়াল্লিশটি দন্ত আছে। তাহার নিম্নে *জীবরাজ্যে দন্তের সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়।* যাহা হউক, উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবগণের দন্তের সংখ্যা যে ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল সংখ্যায় নহে; বর্ত্তমানকালে দুই পাটি দন্তমাত্র আছে। পূর্ব্বে অনেক অধিক ছিল। তালুর অগ্রভাগ হইতে প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কঠিন তালু ভাগ সমস্তই (Hard palate) এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত দন্তশ্রেণীবিশিষ্ট ছিল। এক শ্রেণীর পশ্চাৎভাগে অন্য শ্রেণী, এইরূপ বর্ত্তমান উপর পাটির পশ্চাদ্ভাগে আরও কতিপয় দন্তপাটি বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে সেই সকল দন্তপংক্তির স্থলে কেবল কয়েকটি ঈষৎউচ্চ মাংস ও ত্বকের রেখামাত্র বর্ত্তমান আছে। তালুর অগ্রভাগে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ঐ সকল রেখা সেই বিলুপ্ত দন্তপংক্তির পূর্ব্বস্থান দেখাইয়া দিতেছে। বর্ত্তমান উপর পংক্তির পশ্চাতে এক্ষণে আর দন্ত উৎপন্ন হয় না; কিন্তু সময় সময় কাহারও

---

† Molar ...

কাহারও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, কোনও কোনও ব্যক্তির উপর পংক্তির পশ্চাতে দুই একটি দন্ত আছে; আমার এক জন বন্ধু, যিনি সাহিত্য-জগতে অপরিচিত নহেন, তাঁহার এইরূপ আছে। তালুর এই সকল প্রস্থব্যাপী (Transverse) দাগ বৃদ্ধ বয়সে প্রায় থাকে না, বাল্যাবস্থায় অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট থাকে। সুতরাং প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদিগের দন্তসংখ্যার এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়াছে; আর উহারা দুর্ব্বলও হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় সবল নাই। কোনও কোনও দন্ত উপরস্থ মাংস ভেদ করিয়া উঠিতেই সক্ষম হয় না। বাল্য অথবা যৌবনে ত্বক্ ছিন্ন করিয়া না দিলে উহারা ত্বকের নীচেই থাকিয়া যায়। আহারেই দেহধারণ; আর সেই আহারসম্পর্কীয় তিনটি প্রধান যন্ত্র, (দন্ত, পাকস্থলী ও অন্ত্র) ক্রমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ক্ষীণ, খর্ব্ব, বিভক্ত ও হ্রস্ব হইতেছে। সুতরাং এই যন্ত্র সকলের শেষ পরিণাম ধ্বংস, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তবে এই দেহ? ইহার কি হইবে?

হনু। উভয় চোয়ালের আকার, আয়তন ও প্রসার যে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, তাহা উপরের চিত্র-ত্রয় পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

এক্ষণে চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। আপনাদিগের সহিষ্ণুতার উপর অতিরিক্ত আক্রমণ করিতে সাহস করি না। সেই জন্য এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রম-অভিব্যক্তির দিকে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করুন।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা। কেঁচো শ্রেণীর জীবগণের চক্ষু নাই; তাহাদিগের ত্বকেই সূর্য্যালোক প্রবেশ করে, এবং শিরোভাগের গাঁইটকে উত্তেজিত করে। বোধ হয়, ইহাতেই তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তির কার্য্য হয়। তাহার পর চিংড়ি মাছ শ্রেণীতে বহু চক্ষু থাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, তাহাদিগের শুঁড়ের অগ্রভাগে যে কাল ক্ষুদ্র গোলক আছে, উহাই চক্ষু; এবং উহার প্রত্যেকটিতে বহু স্বচ্ছ বৃত্তসূচি (Pyramid) বিদ্যমান থাকিয়া নিম্নস্থ কাল-কোষে বিষয়কে প্রতিফলিত করে, এবং তাহাতেই দৃষ্টির কার্য্য সম্পন্ন হয়। মক্ষিকা-শ্রেণীতেও ঐরূপ বহু স্বচ্ছ ক্ষুদ্র পর্দ্দা দ্বারা চক্ষু গঠিত। এই জন্য তাহারা সকল দিক হইতেই দেখিতে পায়। সেই স্থলে আমাদিগের চক্ষুতে একটি মাত্র স্বচ্ছ পর্দ্দা বর্ত্তমান। তার পর, পক্ষি-শ্রেণীস্থ কতিপয় প্রাণীর তিনটি অক্ষিপত্র বিদ্যমান আছে, কিন্তু আমাদিগের দুইটি

রাখিয়াছে। পরিশেষে আমাদিগের চক্ষুর অসাধারণ বলক্ষয়ের কথা আর বলিতে হইবে না। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় আমাদিগের চক্ষু প্রায় গিয়াছে বলিলেই হয়; আর কিছুদিন পরে চশমা চক্ষে দিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। আমাদিগের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও প্রসার একেবারেই কমিয়া গিয়াছে; এমন কি, অসভ্য মনুষ্য যত দূর যেরূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়, সভ্য মনুষ্য তাহাও পায় না। আমি ১৮৭৬।৭৭ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের নিকট রাজপথে একটি ব্যক্তিকে বসিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম। সে অন্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহার চক্ষু-কোটরই ছিল না; সুতরাং তাহার চক্ষু আদৌ নির্ম্মিত হয় নাই, কেবল নাসিকামূলের দুই দিকে দুইটি সমান চ্যাপটা স্থান মাত্র ছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চক্ষুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আশা করা যায় না।

আর, কর্ণের ব্যবহার আমাদিগের অনেক অল্প। নিম্নপ্রাণিগণের জীবন নানা বিপদ-সঙ্কুল। সুতরাং বিপদনিবারণের ও আহারান্বেষণের জন্য কর্ণের সর্ব্ব দিকে প্রয়োগ অত্যাবশ্যক হয়। তাহারা নানা দিকে কর্ণ ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে। তাই, বাহ্যকর্ণসংলগ্ন পেশী কর্ম্মক্ষম। কিন্তু আমাদিগের ঐ পেশী প্রায় অকর্ম্মণ্য। আমরা কর্ণ ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি না। তবে, কদাচিৎ দুই এক জন ব্যক্তি কর্ণসঞ্চালন করিতে পারেন। আমি দুই জনকে অতি সামান্যভাবে কর্ণসঞ্চালন করিতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, এই শক্তি মানবের অনাবশ্যকতাবশতঃ লুপ্ত হইয়াছে।

আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিম্নস্থ অনেক জীব অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এবং নাসিকাও ক্ষুদ্র।

এক্ষণে পূর্ব্ববিভাগ স্মরণ করুন। ভ্রূযুগের নিম্নে সকলই পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইতেছে। আর ভ্রূযুগের উপরে সকলই বড় হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের মস্তিষ্ক সকল প্রাণী অপেক্ষা বৃহৎ ও গুরু। উহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্রিয়োপযোগী। এই জন্যই জীবরাজ্যে আমরা জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছি।

আমরা দেখিলাম যে, হস্ত, পদ, পৃষ্ঠবংশ, পঞ্জর, পাকস্থলী, অন্ত্র, হনু, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, সকলই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমেই উন্নত হইতেছে। একের ধ্বংস অপরের উন্নতি; এই স্থূলদেহের ধ্বংসের সহিত যেন বিপরীত অনুপাতে জ্ঞান ও বুদ্ধির বৃদ্ধি

পঞ্চকোষ ও মুক্তি।

হইতেছে। এই স্থূলদেহ ক্রমে যেরূপ ক্ষীণ, খর্ব্ব ও ক্ষুদ্র হইতেছে, তাহাতে সুদূর ভবিষ্যতে ইহার অস্তিত্বলোপ অতীব সম্ভব। ক্রম-অভিব্যক্তি মানবকে সেই দিকেই লইয়া যাইতেছে। কিন্তু মন, বুদ্ধি ও জ্ঞান, ক্রমেই উন্নত, পরিষ্কৃত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকোষ হইতে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; আবার এই দেহ যখন পরিত্যক্ত হইবে, তখন উন্নত জ্ঞান, উন্নত চৈতন্য সেই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়াই স্বকার্য্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। দেহ সহ চৈতন্যের ক্ষয় বা বিকৃতি কখনও হয়ও নাই, হইবেও না; বরং দেহক্ষয়ে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এবং হইবেও। আমরা এই অন্নময় কোষে আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ থাকিয়া অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশ। ইহার পরের অবস্থা এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়, এবং অনেকাংশে মুক্ত ও স্ফুরণপ্রাপ্ত। মৌলিক জীব নানা শাখা প্রশাখায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া যুগযুগান্তর হইতে উন্নত হইতেছে। সুতরাং এই স্থূলদেহ, এই অন্নময় কোষ হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত চৈতন্যময় জীবরূপে এত দিন যে কোনও জীবই পরিণত হয় নাই, এ কথা সম্ভবপর নহে। উচ্চ ও নিম্ন, উন্নত ও অনুন্নত জীব পাশাপাশি জগতে বাস করিতেছে। এক সম্প্রদায় উন্নত হইতেছে, কিন্তু তাহার পার্শ্বেই অনুন্নত সম্প্রদায়ও বাস করিতেছে। অবশ্য কালে অনেক জীব লোপ পাইয়াছে। কিন্তু তথাপি উন্নত অনুন্নতের একত্রবাস প্রকৃতিরই নিয়ম। আমাদিগের নিম্নতর জীবগণ সকলে উন্নত হয় নাই; তথাপি তাহাদিগের সম্প্রদায়বিশেষ উন্নত হইয়া মানবরূপে তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতেছে। তেমনই মানব যদিও সকলে উন্নত হয় নাই, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ই যে উন্নত হয় নাই, এবং মানবের সহিত বর্ত্তমান সময়ে একত্র বাস করিতেছে না, এ কথা কোনও মতেই বলা যায় না। মানব উন্নত ও অভিব্যক্ত হইয়া যে সূক্ষ্মদেহময় হওয়া অতীব সম্ভব, হয় ত তাহা মানবের কোনও সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, এবং আমরা তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতেছি। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। তবে সেই উন্নত সূক্ষ্মদেহধারী অতীন্দ্রিয় জীবগণ, বোধ হয়, এই ঘনবায়ু-প্রপীড়িত, প্রখরসূর্য্যকিরণদগ্ধ কঠিন ক্ষিতিপৃষ্ঠে বাস করিতে সক্ষম নহেন। এ ধরা বোধ হয় তাঁহাদিগের উপযুক্ত নহে। কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদিগের বাসোপযোগী স্থানের অভাব নাই। সেই সূক্ষ্মদেহধারী জ্ঞানোন্নত পবিত্র প্রাণিগণ, (তাঁহাদিগকে দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব যে নামেই অভিহিত

কর) তাঁহাদিগের উপযুক্ত লোকে তাঁহারা স্বকর্ম্ম সাধন করিতেছেন, ইহাই প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত। আমরাও তদবস্থ হইলে উপযুক্ত লোকে উন্নীত হইবার আশা করিতে পারি। কিন্তু অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চ কোশের প্রত্যেকটির অভিব্যক্তি ব্যতীত অপরটিতে উন্নীত হইবার আশা করা যায় না। যে স্থূলদেহের ধ্বংশ আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিতেছি, তাহার ক্ষয়েই প্রাণময় কোশ প্রাপ্তি। প্রাণের ক্রিয়াই সেই অশান্ত কোশকে তদীয় (পৃথক) জীবনব্যাপারে লিপ্ত রাখে। এই চাঞ্চল্য * অপগত হইলেই মনোময় কোশ প্রাপ্তি। এ অবস্থায় প্রাণ শান্ত, এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মনের ক্রিয়া বশতই এই কোশ ক্রিয়াশীল। এই ক্রিয়া স্তম্ভিত অর্থাৎ শান্ত হইলেই জ্ঞানময় কোশ প্রাপ্তি। এই অবস্থায় প্রশান্ত জীবাত্মা স্বীয় বিশুদ্ধ ও অবিকৃত জ্ঞান লাভ করতঃ আত্মধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন। সর্ব্বশেষে সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিণতিতে সেই একাগ্রধ্যানের সফলতাতে আনন্দময় কোশে নিত্যানন্দ উপভোগ করিয়া জীবাত্মা পরম মুক্তিপ্রাপ্ত হন। এই অবস্থাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এই পথই মানবের প্রকৃত পথ, এই গতিই জীবের পরমগতি। ক্রমাভিব্যক্তিমূলক জীব-বিজ্ঞান এই কথা লইয়াই ধীরে ধীরে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। †

শ্রীশশধর রায়।

পৃথক ফল।

বুড়া বনে কাটে কাঠ; নগরে যে বসে হাট,
বুড়ী তথা লয়ে গিয়ে করে তা' বিক্রয়।
বুড়ার বয়স আশী, বুড়ি তার পাশাপাশি,
দরিদ্র, সরল, শান্ত, দম্পতী নিশ্চয়।
যে বনে কাটিত কাঠ, তারই ধারে বাস;

---

* তৈত্তীরীয় উপনিষৎ দ্রষ্টব্য।

† এই প্রবন্ধ রাজসাহী সাহিত্য সভায় পঠিত।

বড়ই গভীর বন, শেষ নাই,—সুবিজন,
কোন দিকে নাহি পড়ে মানুষের শ্বাস।
ছোট ঘর, ছিটে বেড়া, ছাওয়া সে পাতায়,
দিনে তারা খাটে খোটে, সন্ধ্যায় একান্ন জোটে,
নিশায় বিশ্রাম, হাত রাখিয়া মাথায়;
তার বেশী নাহি জানে অবকাশ ছুটী।
এমতে যাপিত দিন কাঠুরিয়া দুটি।

ইদানী বলিত বুড়া বুড়ীর সকাশে,
"গাছগুলা এ কালের রোদ্দুরে বাতাসে
হইয়া উঠেছে কড়া বেয়াড়া রকম—
কুড়ুল বসে কি গাছে না হ'লে নরম?
বনের ভিতরে দূরে, পাঁচ ছয় ক্রোশ ঘুরে
মোলায়েম গাছ মেলে গোটা দুই তিন,
আধ ঝুড়ি না হ'তেই কাটে তাই দিন।"
বুড়ী বলে—"কাটো তাই ওই কথা কও,
বোঝ যদি এক দিন মাথায় তা' বও।
ঘাড় যেন ভেঙ্গে পড়ে, এত তায় ভর,
আগে যাহা ছিল শোলা, আজ তা পাথর।
তবু সেকালের মত হয় নাকো বোঝা,
এ কালে এ কাজ করা নয় বড় সোজা।"
তা'দের সরল মনে হ'ত না উদয়,—
কামার প্রাচীন হ'লে লোহা শক্ত হয়।

এক দিবা দ্বিপ্রহর—বৈশাখী উত্তাপ,
রবিকর নহে আশীর্ব্বাদ—অভিশাপ।
গ্রীষ্ম বটে! বিশ্ব যেন ডুবিয়া অনলে;
সূর্য্যের গরমে মাথা চিরকালই জ্বলে
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে; সর্ব্বসহা ধরা
নীরবে সহেন তাপ, বৃথা দুঃখ করা।

জগত মুমূর্ষু স্তব্ধ; কখন ক্বচিৎ
ঘুঘুর কাতর কণ্ঠ হয় অনুমিত।
হেন দিবা দ্বিপ্রহরে, কাতর, কুঠার-করে
ভ্রমিতেছে বৃদ্ধ বনে; দারুণ তৃষ্ণায়
ছাতি ফেটে যায় তার, জল কোথা পায়?
কুটীর সেথান থেকে পাঁচ ক্রোশ হ'বে—
তত দূর—তত ক্ষণ তৃষ্ণা করি' নিবারণ
জল খেতে গেলে, স্থির, প্রাণ নাহি রবে।
বনের ভিতরই সুধু হয় অগ্রসর,—
এ দিকে ও দিকে চায়,—নদী কি তড়াগ হায়!
যদি পায় এ আশায় করি শুধু ভর।
বদন-বিবর শুষ্ক, নাক চোখ জ্বলে,
গা হাত কাঁপিছে,—প্রাণ যায়, তবু চলে।
তৃষ্ণাই এগোয়—কবে এগিয়েছে জল,
পতঙ্গ অনলে ছোটে—ছোটে না অনল।
হা জল! কোথায় তুমি! তুমি যে জীবন!
ভ্রমিতে লাগিল বৃদ্ধ আরও কতক্ষণ।

বনের ভিতরে এত দূর, কখনও সে
আসেনি—পিপাসা তার শত সিন্ধু শোষে!
সুধু সে বেগেতে বৃদ্ধ চলেছে সম্মুখে;
সাপ কি বাঘের ভয় নাহি আজ বুকে।
আশায় বিফল আশা—ধরিত্রী সে দিন
হয়েছিল তাহারে বধিতে বারি-হীন।
"আর মিছে যাই,—ফিরি;—ফিরিয়া কি ফল?
ফিরিলেও মরণ ত—নাহি পথে জল।
তার চেয়ে চলে যাই যতক্ষণ পারি।"
ভাবে বুড়া, "মৃত্যু আজ আছে ত আমারি।"
আরও কিছুক্ষণ চলে,—হায়! হায়! হায়!
সত্য গেল প্রাণ!—বৃদ্ধ থমকি দাঁড়ায়।

এসেছে যেথানে, তার সম্মুখে আ মরি!
এই রুক্ষ শুষ্কবনে ও কি—হরি হরি!

বনের সে খণ্ডে বনলীলা-বিলাসিনী
প্রকৃতির—অনাহত-দৃষ্টি সীমন্তিনী
রূপসীর অবাধ উলঙ্গলীলা মত—
যথেচ্ছ তরঙ্গ—অকপট অসংযত;
দেখিল সে কাঠুরিয়া—মৃত উঠে বসে
নিরখি তা'—বড় জোর মুমূর্ষু ছিল সে।
দেখিল সে, অসরমা লতারা সেখানে
যে যা' পারে তরু ধরে' আলিঙ্গনে টানে
আবেগে আপনা ভুলি,' তরুলতা কোলাকুলি
করিয়া, করেছে সেথা দিনে অন্ধকার;
উচ্চে নীচে ফুলে ফুল! পুষ্পগুচ্ছ সমুকুল,
বহে সেথা যৌবনের মত্ত পারাবার।
প্রকৃতির ফুলশয্যা দেখে মনে হয়,—
শ্যাম-সুখকুঞ্জ সুশীতল ছায়াময়।
শুধু সে ছায়ায় আসি' বৃদ্ধের অর্দ্ধেক
শ্রান্তির হইল লয়,—দাঁড়ায়ে ক্ষণেক
বাহিরে, সে প্রবেশিল কুঞ্জ-অভ্যন্তরে
ভয়ে ভয়ে, পাছে তারে নিরখি' শিহরে
তরু কি লতা কি ফুল,—অথবা ভিতরে
হয় ত দেবতা কেহ নিদ্রাগতা আছে,
চরণ-শবদে তার জেগে উঠে পাছে!
ভয়ে সে পশিল কুঞ্জে; কুঞ্জে অকস্মাৎ
দেখিল স্ফটিক-শুভ্র সলিল-প্রপাত।
যেই দেখা, কথা নাহি, ছুটে পুরি' প্রাণ
সে সলিল-সুধা বৃদ্ধ করিল ত পান।

মধু হ'তে মিষ্টতর সুস্বাদু সে জল,
নিশীথ-নীহার হ'তে লাগিল শীতল।

শুধু তাই নয়,—পান করিবার পর
বুঝিল সে সুরা হ'তে প্রাণোন্মাদকর।
সহসা সহস্র বাঁশী এক সুরে বাঁধা, ভাসি'
মনের ভিতর তারে করিল পাগল।
কি মন-মাতান রব, সে লয়ে নাচিল সব
বিশ্বের যা কিছু,—গায়ে মত্ত-হস্তি-বল।
বোধ হ'ল ধরা যেন আনন্দের নদী।
যেন বিলাসের বান ছোটে তায় খরটান
ডুবিছে উঠিছে জীব,—পাগল জলধি!
পুনঃ বোধ হয় যেন অপ্সরার দল
অদূরে আসিছে এক, প্রমোদে বিহ্বল!
সব পিচকারী হাতে, পেশোয়াজে ওড়্‌নাতে
বহে আবীরের ঢেউ—হোলির তুফানে;
এক সুরনারী তারে দেখিয়া কুঙ্কুম মারে,
কুঙ্কুম আঘাতে তা'র অঙ্গ ভেদি' প্রাণে।
সে কুঙ্কুম ভেঙ্গে গিয়ে গোলাপ, মল্লিকা,
বেলা, শেফালিকা, লেবু, চম্পা সুরসিকা
অজস্র ফুটিল প্রাণে; তা'দের মাদক ঘ্রাণে
কাঠুরিয়া হইয়া পড়িল নিদ্রালস;
আধ ধ্যানে, আধ জ্ঞানে, গাইল সরস
(বুড়া হ'ক) চিত্ত-ত্রাসী প্রণয়-সঙ্গীত—
নহে সে অপ্সরা-শ্রেণী-শ্রুতির উচিত!
তার পর,—তার পর কিছু মনে নাই,—
কতক্ষণ পরে উঠে বসে চক্ষু চাই'।
তখনও প্রফুল্ল প্রাণ, তবে পরিমিত—
উন্মাদ ও অধীরতা তখন স্থগিত।
উঠিল কুঠার করে, যত বড় গাছ ধরে
মুহূর্ত্তে সাবাড় করে দুই এক ঘায়—
শুধু কুঠারের আঁচ, ভূমিশায়ী হয় গাছ;
কুঠার পড়িছে কিসে? কাঠে, না কাদায়!

বৃহৎ কাঠের বোঝা কাঁধে কাঠুরিয়া
সন্ধ্যায় কুটীরে স্বীয় আসিল ফিরিয়া।
হরষে উৎফুল্ল মুখ—স্বাস্থ্যে যেন ফোলে বুক,
ফেলি' কাষ্ঠ এক কোণে, কহিছে হাসিয়া,—
"অ বুড়ী! কাঠের বোঝা দেখ রে আসিয়া!
এত কাঠ কত দিনে নিয়ে যা'বি হাটে,—
অন্য কাঠুরিয়া এত এক মাসে কাটে।"
ঘরের বাহিরে এসে বুড়ীও কহিল হেসে,—
"ও মা তাই ত গো! এত? কেটেছ, বয়েছ?
ধন্য তুমি! খাবে এস—কত না খেটেছ!"
বলিয়া বুড়ার পানে চাহিল, হঠাৎ প্রাণে
কে যেন দড়াম্ করে দাগিল কামান!
মাথার কাপড় মুখে টানিয়া কম্পিতবুকে
কহিল,—"আপনি? তুমি?" ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
"কে বট আপনি?" বুড়ী পুনশ্চ জিজ্ঞাসে,
বুড়ী আমি—কেন মোরে ডুবাও তরাসে?"
কাঠুরিয়া উত্তরিল,—"আরে রে সোহাগী!
সাধে আমি চিরদিন তোর অনুরাগী?
আনন্দে ঘোমটা টানি সাজিলে যুবতী,
এত কাঠ রোজ তব কেটে আনে পতি।
ঘোম্‌টা তোল রে, খোলো কমল-বয়ান।"
বুড়ী কহে,—"মহাশয়! কর অবধান,—
নারী আমি, বৃদ্ধা তায়, তায় একা অসহায়,
আমারে এ সব কথা কভু কি বিহিত?"
হেসে কাঠুরিয়া কয়,—"কথা ত বিহিত নয়,
অদন্ত বদনে তব চুম্বন উচিত!"
এ কথায় রেগে বুড়ী দেখে অন্ধকার,
কহিল,—"আরে রে ছোঁড়া! এত অহঙ্কার?
কে তুই? হইব আমি বয়সে যে তোর—"
বুড়ীর চাপিয়া মুখ তাড়াতাড়ি জোর

কহে কাঠুরিয়া,—"কেন রাগিয়া চেঁচাও—
কে আমি তা' বলি, যদি শুনিতেই চাও।
তোমার পিতা মাতার আমিই জামাই,
ভগিনীর ভগ্নীপতি, ভ্রাতারও তাহাই।
কে আমি বুঝেছ? তবু বল মোরে ছোঁড়া,
অকথা কুকথা কত কহ জোড়া জোড়া।"
এত বলি' কাঠুরিয়া হেসে আটখান—
এ হাসি শতাব্দী-অর্দ্ধ হাসেনি পরাণ।

লজ্জায়, বিস্ময়ে, ক্রোধে, বৃদ্ধার বচন রোধে,
ভাল ক'রে এতক্ষণ কাঠুরিয়া পানে
চাহেনি সে, চেয়ে দেখে মনে পড়ে একে একে
অতীতের;—ও মা! ও কে দাঁড়ায়ে উঠানে—
কে ও?—ও যে—কেঁদে বুড়ী জোড় করি' কর
কহে,—"হে ঠাকুর! তুমি দয়ার সাগর,
যে হও—আমার প্রতি,—আমি বুড়ী ভীমরতি,
হ'ও না নিদয়—কটু কহিয়াছি ভুলে;
মানুষ সবাই তোমাদের ছেলে পুলে।
বুড়ো মোর যেমনটি ছিল যুবা-কালে,
তেমনি তাহারি বেশে— কে তুমি আমারে এসে,
দেবতা, ছলিয়ে মোর পাতক ঘটালে।"
ত্রাসে কাঁপে বুড়ী, চক্ষে সমুদ্র জলের;
কথা কি কহিতে যায়,—কেঁদে ওঠে ফের।

কাঠুরিয়া ভাবে এ কি! বুড়ীর কি ভাব দেখি
এ ত নয় রসিকতা, চ'খে এত জল?
কেন বকে, কেন কাঁদে, হ'ল বা পাগল!
কহিল নামায়ে স্বর,— "ও পাগলী! কে ঠাকুর?
কে যুবো! আমি যে বুড়ো চোখ চেয়ে দ্যাখ্,
আমি অন্য নই—আমি তোরই সেই এক।
নরম তুলো'র মত গাছ গোটা কত

পেয়ে আজ এনেছি রে কাঠ অই অত !
আনন্দে তাইতে দুটো পরিহাস করি,
ভয়ে বুড়ী কেন তায় উঠিলি শিহরি ?”
এত বলি' বলে বৃদ্ধ দিনের বারতা,
অবাক হইয়া বৃদ্ধা শুনিল সে কথা।
বুড়া শেষে বলে,—“ভাই! জল যেন মদ,
মাতাল করিয়াছিল, এমনি আপদ!
আমি যেন আমি নই, এত জোর গায়!
খানিকটা পায়চারী, যৌবন-হাওয়ায়
করিয়াছিলাম সত্য!”
উঠি' বর্ষীয়সী
ঘর হ'তে পুরাতন আনিয়া আরসী,
“দেখ!” বলি দিয়া তার করে, কহে তারে,
“তুমি যদি যুবা নও, যুবা বল কারে ?”
প্রাচীন হাসিয়া চাহি' প্রাচীন দর্পণে
দেখিল, আপন মূর্ত্তি তরুণ যৌবনে।
তখন ডুবিল বৃদ্ধ গভীর বিস্ময়ে!
বুঝিল, কেন যে বৃদ্ধা কেঁদেছিল ভয়ে।
তার পর, তার পর, কত কথা পরস্পর,
উভয়ে কত না তর্ক! সে তর্কের ফল,
স্থির হ'ল দেবতার 'পড়া' সেই জল।
শেষে, শেষ-রাতে দু'য়ে শুইল যখন,
তখন হইল ধার্য্য করিবে গমন
কাঠুরিয়া-রমণী সে জীবন-প্রপাতে
প্রকৃতির রত্নকুঞ্জে পরদিন প্রাতে।
বুড়ীও খেয়ে সে জল হইবে যুবতী,
ছুটিতে থাকিবে বনে, কপোত কপোতী

ভোরে না ডাকিতে কাক, বুড়ী বাজাইয়া শাঁক,
পতি সহ শুভযাত্রা করিল কাননে ;

বুড়ার (হালের ছোঁড়া) হাসি ঠাট্টা আগাগোড়া,
বুড়ীর উদ্বেগ, আশা, কত শত মনে।
পূর্ব্ব দিন হাটে বুড়ী, বাতাসা মুড়কি মুড়ি
কাঠের বদলে কিছু এনেছিল ঘরে ;
নিল তা' আঁচলে বাঁধি, বিধি না হইলে বাদী—
প্রেরিত হইবে যুবা-যুবতী-উদরে !
অরণ্যে অনেক দূর আসিলে দু' জন,
কান্তারে দেখায়ে পথ কান্ত কহে,—"মনোরথ
সফল হউক তব, করহ গমন
বরাবর এই পথে, করিলে ভ্রমণ
পাকা দুই ক্রোশ পথ, মিলিবে সে স্থান ;
আসিবে সে জল খেলে মরা গাঙ্গে বান।
আমি মিছে কেন হাঁটি, হেথা ব'সে কাঠ কাটি,
তুমি অতি দ্রুতগতি, করো পথ শেষ।"
বুড়ী তবে চলে স্মরি' শ্রীহরি গণেশ।

এই আসে এই আসে, যেতে বা আসিতে
আরও লাগে কত ক্ষণ ? ভাবিতে ভাবিতে
পতি তার পুরোভাগে পথ পানে চায়,
দুরন্ত যুবতী কোন দেখিতে না পায় !
আবার আপন কাজে নিবেশে মানস।
কল্পনা সোনার জলে, মনে কত ছবি তোলে,
নিদাঘ মুছিয়া আঁকে বসন্ত সরস।
আজিকার সন্ধ্যা আহা ! কি সন্ধ্যা তাহার—
আজ ফুলশয্যা-রাত। কি মধু মলয়-বাত
খেলিবে অঞ্চল টানি' হাসন্ত জোৎস্নার !
আবার সম্মুখে চায়, কিছু না দেখিতে পায় ;
"ও সোহাগী ! কত দূর ?" জোরে শেষ হাঁকে,
প্রতিধ্বনি ফিরে দেয় শেষ কথা তা'কে।
"পথ কি ভুলিল ?—আর অন্য পথ নাই ;—
ঘুমায়ে পড়িল না কি ?—সম্ভব তাহাই।

অথবা”—হইল ভয়, বন ত শ্বাপদময় ;
রবিও চলিছে নীচে, চলে কাঠুরিয়া,—
জান কেউ ? কি ভাবে সে পাবে তার প্রিয়া ?

অতি দ্রুত সে নিসর্গ-স্থবর্ণ-মন্দিরে
উপনীত বৃদ্ধ-যুবা ; পথে রমণীরে
পায় নি দেখিতে, অতি ত্রস্ত মন তাই,
কুঞ্জেরও সম্মুখে দেখে—জনপ্রাণী নাই !
ডাকিল, “সোহাগী !” কেহ না করে উত্তর,
অবশেষে প্রবেশিল কুঞ্জের ভিতর।

দেখিল,—একটি মেয়ে বছর দুয়ের
ঘুমায় একাকী ; ঘুম গাঢ়, শৈশবের ;—
কাঠুরিয়া চিনিতে পারিয়া তারে দুখী—
বলে’ ওঠে, “বুড়ী ! তুই হ’য়ে গেলি খুকী !”
বুড়ীর কি অপরাধ ! বিধাতার চির বাদ,—
নারীর যৌবন বড় ক্ষণিক চপল ;
সে যৌবন ফিরে পাবে, যা’তে আর নাহি যাবে,
সারা রাত, ভেবেছিল বুড়ী তা’ কেবল।
আহা ! সে প্রপাত-বারি, অঞ্জলি পুরিয়া নারী,
আকণ্ঠ খাইয়াছিল জালা পরিমাণ,
যৌবন ছাড়ায়ে তা’ই শৈশবে প্রয়াণ !
কাঠুরিয়া চীৎকার করিলে শিশু জাগে ;
দেখে তারে করুণ-নয়নে অনুরাগে !
হাসে, নাড়ে হস্ত-পদ, বড় শান্ত মুখী,—
বুড়ো-যুবা কোলে ক’রে যায় বুড়ো খুকী !

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান পারসীক-সমাজ।

পারসীকগণ বহু কাল ইরাণে বাস করেন; এবং দেব-পূজক হিন্দুগণ ভারতে বাস করিতে থাকেন। দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জান্দর কর্ত্তৃক ৩২৯ খৃঃ পূঃ পারস্য-বিজয়ের পর হইতে পারসীকদিগের অধঃপতন আরব্ধ হয়। সাইরাস্-সংস্থাপিত লক্ষসৌধ-মালিনী, বিলাসবৈভববিভ্রমশালিনী, অমরাবতীসদৃশী পার্সিপোলিস্ নগরীর ধ্বংসে পারসীকজাতির সাহিত্য-ভাণ্ডার একেবারেই ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই নগরে ধর্ম্মযাজকগণের লক্ষগ্রন্থ-সংবলিত এক পুস্তকালয় ছিল; কিন্তু হুতাশনের করাল-গ্রাসে সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সেই সমস্ত সাহিত্যের আর উদ্ধার হইল না। অবশেষে বল্‌খাস বা ভলোজেসিস্ নামক এক জন পারসীক বা পারদজাতীয় রাজা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া অবেস্তা, যশ্ন, গাথা ও বেন্দিদাদ্ প্রভৃতির কিছু কিছু সঙ্কলন করেন। পরে আদ্রেশির বাবেকান্ নামক এক পারসীক নরপতি ২২৬ খৃঃ সাসানিয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পারসীকধর্ম্মের অনেক উন্নতি করেন। এই সাসানিয়ান্ বংশ ৬৫১ খৃঃ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই সময় মুসলমানগণ পরাক্রান্ত হইয়া পারস্য রাজ্য একেবারেই বিধ্বস্ত করিল। তাহারা নিষ্ঠুরতার বীভৎস কাণ্ডে সমস্ত পুরুষদিগকে নিহত করিয়া লাবণ্যবতী পারসীক-রমণীদিগকে কল্‌মা পড়াইয়া অঙ্কশায়িনী করিল। ইহার পর পারসীক জাতি পৃথিবীতে আর মস্তকোত্তোলন করিতে পারেন নাই।

এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় কয়েক সহস্র পারসীক মুসলমানের কৃপাণকলঙ্কিত কর হইতে স্বীয় ধর্ম্মরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের হিন্দুরাজ্যে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করি লেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা বাণিজ্যব্যপদেশে গুজরাট, সুরাট ও ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যের সহিত পরিচিত ছিলেন; এবং হিন্দুদিগের সদয় শাসন-নীতির বিষয় অবগত ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জুলাই খোরাসান প্রদেশে "জামে-এ-জম্‌শেট" নামক এক হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহাতে পারসীকদিগের ভারতাগমনবৃত্তান্ত সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। ঐ পুস্তক গুজরাটী ভাষায় অনূদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। উহার নাম "কিস্ সে-সঞ্জান," অর্থাৎ ভারতবর্ষের সঞ্জানরাজ-ঘটিত উপাখ্যান। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পারসীকদিগের ভাগ্যপরিবর্ত্তনে অশ্রু-সংবরণ করা যায় না। পারসীকগণ কোহিস্থান পর্ব্বতে কিছু কাল আত্মরক্ষা করিয়া, পরে বন্দরআব্বাস্ নামকস্থ জাহাজে আরোহণ করিতে

চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অত্যাচারী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া অনেকে জলমগ্ন হইলেন; এবং অল্পসংখ্যক অহুরমজ্‌দ (বর্ত্তমান নাম অর্ম্মজ) দ্বীপে উপনিবিষ্ট হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে পারসীকগণ সপরিবারে যজ্ঞীয় অগ্নি লইয়া ভারতবর্ষে যাইবার জন্য পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিলেন। কিন্তু ভীষণ ঝটিকায় সাতখানি জাহাজের মধ্যে চারিখানি জলমগ্ন হইল; অবশিষ্ট তিনখানি অতিকষ্টে ছয় মাসে কাটিয়াবাড়ের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে উপস্থিত হইল। তাঁহারা সঞ্জানের হিন্দুনরপতির আদেশে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই নৃপতির নাম জাড়েরাণা বা যাদুরাণা। উইল্‌সন্‌ ইঁহাকে অনহিল্লপত্তনের বাণরাজার সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৮৫ সংবৎ বা ৭২৮ খৃঃ তাঁহারা ১৬টি সংস্কৃত শ্লোকে হিন্দু-নরপতির নিকট আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।* সঞ্জান-রাজ পারসীক রমণীদিগকে গুজরাটী রমণী-দিগের ন্যায় শাড়ী পরিধান করিতে আদেশ করেন। তদবধি পারসীক রমণীগণ স্বজাতীয় পরিচ্ছদের উপরে শাড়ী পরিয়া আসিতেছেন, এবং ইঁহাদিগের আদর্শ শাড়ী পার্সীশাড়ীর সঙ্গে সকলেই বিশেষ পরিচিত আছেন।

ভারতাগত পারসীকগণ হিন্দুস্বাধীনতাসূর্য্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের হস্তে বিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিলেন। মহম্মদ বিগাড়ার কথা আপনারা জানেন। তৎপরে ভারতে ইংরাজ-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পর হইতে পারসীকদিগের প্রতি আর কোন অত্যাচার হয় নাই। পারসীকগণ মাতৃভাষা ভুলিয়া এক্ষণে গুজরাটী ভাষাকে মা বলিয়াছেন, এবং অনেক সাহিত্যভূষা জননীর অঙ্গে প্রদান করিয়াছেন। সহস্রাধিক বর্ষ ভারতে থাকিয়া পারসীকগণ অনেক হিন্দুভাবের যে অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক।

কিন্তু পারস্য দেশে মুসলমান-রাজ্য-ধ্বংসের পরে যে মুষ্টিমেয় পারসীক জাতি ছিল, তাহা কালক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এক্ষণে ইঁহাদিগের সংখ্যা ৯০০০ মাত্র;

---

* পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত দুইটি শ্লোক লিখিত হইল।—

সূর্য্যং ধ্যায়ন্তি যে বৈ হুতবহমনিলং ভূমিমাকাশমাদ্যং
তোয়েশং পঞ্চতত্ত্বং ত্রিভুবনমদনং ধ্যায়মন্ত্রৈস্ত্রিসন্ধ্যং।
শ্রীহোর্ম্মজদং সুরেশং বহুগুণগরিমানন্তমেকং কৃপালুং
গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ ॥১॥

ভারতীয় পারসীকদিগের সংখ্যা এক লক্ষের কিছু অধিক। তন্মধ্যে বোম্বাই নগরেই প্রায় ৮০০০০ পারসীক বাস করেন। ইহাদের সকলেরই গুজরাটী মাতৃভাষা, এবং তদ্ভিন্ন সকলেই ইংরাজী জানেন। বর্ত্তমান পারসীকসমাজ বিদ্যা-বুদ্ধি ও কার্য্যকারিতায় ভারতীয়গণের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতেছেন। দাদাভাই নৌরজী ও ফেরোজশা মেটার কথা সকলেই জানেন। বর্ত্তমানে মাণিক্‌জী দিন্‌শা পেটিট সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ ব্যক্তি—ইঁহার চারি কোটী টাকার সম্পত্তি আছে।

বর্ত্তমান পারসীক-সমাজের অভিজ্ঞতা।

গত বর্ষে আমি প্রায় আড়াই মাস বোম্বাইয়ে বাস করিয়াছিলাম। তাহাতে পারসীক-সমাজের যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই বলিব। বোম্বাইয়ের পঞ্চাঙ্গশোধন-সমিতির অধ্যক্ষগণের মধ্যে সার ভালচন্দ্র ভাটবেড়কর ও পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় উক্ত সভার কার্য্যবিবরণ ইংরাজীতে লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমি সমুদ্রতীরবর্ত্তী চৌপাঠী-শিবিরে থাকিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করি। তখন ভারতীয় অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ স্বদেশে গিয়াছেন। কেবল কাশীর বিনায়ক শাস্ত্রী বেতাল, বরোদার অমৃতনারায়ণ শাস্ত্রী ও মহীশূরের আদি বিদ্বান গোপালাচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কার্য্যবিবরণ লিখিবার জন্য তথায় ছিলেন। আমি নারিকেলপত্রাচ্ছাদিত পর্ণকুটীরের মধ্য হইতে প্রত্যহ অপরাহ্নে দেখিতাম,—লাবণ্যবতী পারসীকরমণীমণ্ডলীর সমাগমে সমুদ্রতীরে অমরাবতীর কাল্পনিক সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমান হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। চৌপাঠীর পঞ্চাঙ্গশোধন-শিবির হইতে চর্চ্চ গেট পর্য্যন্ত সিন্ধুতীরবর্ত্তী প্রস্তর-গ্রথিত পথে সপ্তবর্ণমনোহর রামধনুর ন্যায় বিচিত্রনেপথ্যশালিনী, শুভ্রবস্ত্রবদ্ধকবরী, বিচিত্রচীনাংশুকবিমণ্ডিতা, অসমগ্রভূষণা, উপানন্নিহিতচরণা, অচঞ্চলনয়না, অলৌকিকলাবণ্যবতী শত শত পারসীক সুন্দরীমণ্ডলীর প্রীতিমধুর শুচিস্মিত বিলাসবিলোলস্নিগ্ধশোভা এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন-রাজ্যের আবির্ভাব করিত। তদ্দর্শনে পারসীকজাতির বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ব জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। অবিলম্বে সুযোগও উপস্থিত হইল। নৌরজী-বংশীয়—কার্ত্তক নৌরজী ও মাণিকজী পেটিট্‌বংশীয় দিনশা ওয়াডিয়া নামক দুই পারসীক যুবক একদিন প্রাতঃকালে আমাদের পঞ্চাঙ্গশিবিরে মোটর-গাড়ীতে চড়িয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা চারি জনে তখন কার্য্যবিবরণ মিলাইতেছি; এবং ছাপাখানার প্রুফ দেখিতেছি। তখনও আমাদের পর্ণশালায় কোলাবা নানমন্দির হইতে আনীত

দূরবীক্ষণ, থিওডোলাইট প্রভৃতি যন্ত্র সকল নির্দ্দিষ্ট শঙ্কুদণ্ডে বিলম্বিত ছিল। আমরা সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে বসিয়া শনি-বৃহস্পতির মিলনমাধুর্য্য দেখিতাম। যাহা হউক, চটের উপরে বোম্বাই-মিলের সাদা চাদর, তদুপরি আমাদের চারিটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি;—কাশীর বিনায়কশাস্ত্রী বেতাল দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রুরাজিতে ভূষিত প্রাচীন ভারতের ভরদ্বাজের ন্যায় উপবিষ্ট;—রামানুজসেবক গোপালাচার্য্য দীর্ঘকেশ, কিন্তু শ্মশ্রুগুম্ফবিরহিত ও তাঁহার মুখ রামনামের ছাপে অঙ্কিত। অমৃতনারায়ণ শাস্ত্রী মুণ্ডিতশীর্ষ ও দীর্ঘশিখাভূষিত; আর মাদৃশ অধমের এই অদ্ভুত বেশ। মিঃ ওয়াডিয়া ও নৌরজী আসিয়া চারি জনকে অভিবাদনপূর্ব্বক বহু দূরে উপানৎ রাখিয়া সেই ধূলিধূসর চটের উপর উপবেশন করিলেন। পরে আমাকে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়া, ঠিকুজী দেখাইবার অভিপ্রায় ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিলেন। আমি তাহা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতত্রয়কে বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। বিনায়ক শাস্ত্রী ও গোপালাচার্য্য কেবল ফলিত-জ্যোতিষ জানিতেন, কিন্তু অমৃতনারায়ণ এ বিষয়ে অজ্ঞ। পণ্ডিতদিগের সহিত পারসীকদিগের কথা চলিল না; আমাকেই পরস্পরকে বুঝাইতে হইল। কিছুক্ষণ পরে আমি উক্ত দরবার-গৃহ হইতে আমার নিজ প্রকোষ্ঠে আসিলাম। পারসীক-দ্বয়ের সহিত আমার অনেক কথা হইল; আমি তাঁহাদের সামাজিক বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, তাঁহারা সব জানাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার পর পুনর্ব্বার আমি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের করকোষ্ঠী ও ঠিকুজী পরীক্ষা করিলাম। তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া টাকা দিতে উদ্যত হওয়ায়, আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম। তৎপর দিন হইতে প্রাতে প্রায় ২০।২৫ জন পারসীক নরনারী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ভাগ্যতত্ত্ব জানিতে লাগিলেন। কিন্তু ওয়াডিয়া ও নৌরজী আমার বিশেষ বন্ধু রূপে গণ্য হইলেন; এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে আমি বোম্বাইয়ের নানা স্থানের তত্ত্ব অবগত হইতে লাগিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত প্রত্যহ ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত মোটর-গাড়ীতে বেড়াইয়া বোম্বাইয়ের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলাম। অনেক সম্ভ্রান্ত পারসীকপরিবারের সহিত আমার পরিচয় হইল। তাহাতে সর্ব্বদা তাঁহাদের আবাসে যাতায়াতে আচারব্যবহারাদি জানিতে পারিলাম।

হিন্দুর দশসংস্কার শাস্ত্রোক্ত হইলেও, এক্ষণে পালন অপেক্ষা লঙ্ঘনেই তাহা পরিলক্ষিত হয়। কেবল জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি, এই পাঁচটিই প্রধান। পারসীকদিগের মধ্যেও ঠিক এই পাঁচটি এক্ষণে

বর্ত্তমান আছে; অন্যান্য সংস্কার অন্তর্হিত হইয়াছে। পারসীকদিগের উপনয়ন-সংস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি তিন বার উপনয়নে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। পারসীক উপনয়নের নাম—"নবজাত্", অর্থাৎ নবজাত উৎসব। গাথা পুস্তকের ২য় অধ্যায় ১-৯ শ্লোক এবং মেহেরষষ্টের ১২৬ শ্লোকে এই সংস্কার সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। বাহুল্যভয়ে অত্র সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিব না। ৭ বৎসর হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে বালকবালিকাদিগের উপনয়ন দিতে হয়। হিন্দুর দেশে পূর্ব্বে রমণীগণেরও উপনয়ন হইত। বাণভট্ট কাদম্বরীতে উপবীতিনী মহাশ্বেতার কথা বলিয়াছেন;—দেবীগণের ধ্যানে উপবীতিনী শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মনুর সময় হইতে দ্বিজ-স্ত্রীগণের উপনয়ন রহিত হইয়াছে। পারসীকদিগের উপবীতের নাম 'কুস্তি' ও 'সাদ্‌রা'। কুস্তিটি মেষলোমনির্ম্মিত সূতায় নির্ম্মিত, এবং উহা ত্রিতন্ত্রী। কিন্তু প্রত্যেক তন্ত্রীতে ২৪ গাছী ঊর্ণা-সূত্র থাকে; অর্থাৎ মোট ৭২ খেই সূতা। 'সাদ্‌রা' বা 'গারেবান'—একটি বক্ষঃসংলগ্ন ছোট জামা বিশেষ। প্রত্যেক পারসীক-নরনারী ইহা ধারণ করিতে বাধ্য। বালক বা বালিকা পূর্ব্বমুখে বসিয়া থাকেন। তখন দস্তর বা পুরোহিত মহাশয় গ্রন্থিদানপূর্ব্বক 'নিরাং-এ-কুস্তি' নামক গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে থাকেন। তৎপরে উপনীত বালকবালিকার মস্তকে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণপূর্ব্বক নারিকেল-কোরা, দাড়িম্ব-দানা, বাদামচূর্ণ, কিস্‌মিস্ ও খৈ নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার পর উপনীত বালক দস্তর ও পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমি তদ্দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পকেট হইতে একটি টাকা লইয়া কহিলাম,—"আশীর্ব্বাদচিহ্নস্বরূপ ইহা গ্রহণ কর।" কিন্তু বালকের ভগিনী ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতে একটি সশীর্ষ নারিকেল দিয়া টাকা ফিরাইয়া দিল; এবং গুজরাটী ভাষায় কহিল,—"ইহা দিয়া আশীর্ব্বাদ কর।"

বিবাহ।—পারসীকদিগের বিবাহ এক অপরূপ দৃশ্য। বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক বর ও কন্যার কোষ্ঠী মিল করিয়া তবে বিবাহ নিরূপিত হয়। বেন্দিদাদ্ ও গাথা নামক ধর্ম্মগ্রন্থে বিবাহের উপযোগিতা লিখিত আছে। জোরোয়াস্তর স্বীয়া কন্যা পুরুচিস্তিকে বিবাহ বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু পারসীকগণের মধ্যে স্বজন-বিবাহ বিশেষ প্রশংসার কথা। পূর্ব্বে সহোদরার পাণিগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু হেরোডোটাসের ইতিহাসে লিখিত আছে যে,—ক্যাম্বাইসেসের সময় হইতে উক্ত প্রথা রহিত হয়। ক্যাম্বাইসেস্ সুষিণা নামক লাবণ্যবতী ভগিনীর প্রেম-লাভাশায় বিচারকদিগের অনুমতি চাহেন; কিন্তু বিচারকগণ তাহাতে অনুমতি দান

করেন নাই। যাহা হউক, সহোদরা-বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল ভগিনীর পাণিগ্রহণ পারসীকসমাজে প্রচলিত; অর্থাৎ মাস্‌তুত, খুড়্‌তুত, জ্যেঠতুত, মামাত, পিসতুত—সকল প্রকার ভাই ভগিনীতে বিবাহ হয়। পূর্ব্বে ভারতীয় পারসীকদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। এক্ষণে সংস্কারক মধ্য-যস্নিয়ান সভার যত্নে পুনরায় যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। আমি চারিটি পারসীক-বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তাহার বর্ণনা অনেক সময়সাপেক্ষ। তজ্জন্য অতি সংক্ষেপে বিবাহের কথা বলিব। এই বিবাহের বর-কন্যা, মাসতুত ভাই ভগিনী। সমুদ্রসন্নিহিত বিবাহমণ্ডপে * সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে জনসমাগম হইতে লাগিল। আমি নৌরজী মহাশয়ের গাড়ীতে সেই বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে ২০০ শত বরযাত্রী এবং ৪০০ কন্যাযাত্রী বর-কন্যা সহ উপস্থিত হইলেন। মুক্তাকাশের নিম্নে সহস্রাধিক সুন্দর চেয়ার সজ্জিত। বিবাহকার্য্যে অধিকসংখ্যক রমণীর সমাগম দেখিয়া আমার মনে পড়িল, "প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরস্ত্রীণাং প্রগল্‌ভতা।" বিবাহ-হর্ম্ম্যের মধ্যে পাঁচ শত চেয়ার সর্ব্বদা সজ্জিত আছে। রমণীগণ সেই মণ্ডপে উপবেশন করিলেন। মধ্যস্থলে সমুন্নত বেদীর সম্মুখে বর-কন্যা উপবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে দস্তুর মহোদয়ের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তিনি আমাকে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণজ্ঞানে বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দস্তুর মহোদয় আমাকে বিবাহ-বেদীর নিকট লইয়া গিয়া এক বহুমূল্য আসন প্রদান করিলেন। আমি উপবিষ্ট হইলে বিবাহ আরব্ধ হইল। চতুর্দ্দিকে উপবিষ্টা বিচিত্রোজ্জ্বল-বেশা বিবাহ-বাসরসুলভপরিহাসকুশলা পারসীকললনামণ্ডলীর মুখরসৌন্দর্য্য ও বৈদ্যুতিকদীপাবলিপ্রজ্বলিত অপূর্ব্বচিত্রশোভিত বিবাহমন্দিরের চন্দ্রিকাসুন্দর অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া কৃষ্ণকান্তি নিরুষ্ণীষ আমার মনে হইল, আমিই এই সৌন্দর্য্য-চন্দ্রের কলঙ্কস্বরূপ। কন্যার জননী বরকে বরণ করিলেন। বরণ-ডালা একখানি ক্ষুদ্র রূপার কুলা; তাহাতে পান, সুপারি, খৈ, নারিকেল প্রভৃতি রহিয়াছে। বরের বরণ হইলে বরের মাতা কন্যাকে বরণ করিলেন। তৎপরে বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার দক্ষিণহস্ত রাখিয়া বন্ধনপূর্ব্বক দস্তুর জেন্দ ভাষায় অনর্গল মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। খানিক পরে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, সেগুলি আমাদের বিবাহমন্ত্রের অনুরূপ। সে সমস্ত আমি লিখিয়া

* বিবাহের জন্য পঞ্চায়ৎবাটী প্রস্তুত আছে। ৪৲ টাকা হইতে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া গৃহীত হয়।—পুরোহিতের বাঁধা দক্ষিণা ৩৲ টাকা। তবে বড় দস্তুর আনিতে হইলে ১৫৲ টাকা লাগে।

আনিয়াছি। "বেদ ও অবেস্তা" নামক এই প্রবন্ধের উত্তরাংশে তাহা বিবৃত করিব। পরে শুভদৃষ্টি হইল। যদিও নবোঢ়া নিরবগুণ্ঠনা ছিলেন, তথাপি তৎকালে ঘোম্‌টা দিয়া একটু অন্তরাল করিয়া শুভক্ষণে শুভেক্ষণ হইল। বিবাহ সমাপ্ত হইলে স্ত্রী-আচার ও পুরন্ধ্রীদিগের আশীর্ব্বাদ হইতে লাগিল। দস্তুর মহোদয় গুজরাটী ভাষায় ললনাকুলকে সম্বোধন করিয়া এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"অদ্য বর-কন্যার সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এই বিবাহসভায় সমাগত। তিনি অবেস্তার সমস্ত তত্ত্ব অবগত,—তিনি তোমাদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিবেন। মধুচক্রে লোষ্ট্রক্ষেপে চঞ্চল মধুকরের ন্যায় বিবাহকৌতুকোৎফুল্লা কামিনীরা বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আশীর্ব্বাদিকাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। শ্বাশুড়ী ও শালীর দল। শ্বাশুড়ীগণ চিবুকস্পর্শ ও শ্যালিকার দল গণ্ডস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ ও পরে লাজবর্ষণ করিয়া বরণ করিলেন। বরণান্তে বর ও কন্যার জননীদ্বয় আমার হস্তে দুই গাছি ফুলের মালা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে কহিলেন; বর-কন্যা সমীপস্থ হইয়া আমাকে প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে, আমি মাল্য দ্বারা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলাম; এবং বরের সহিত একটু কথাবার্ত্তা কহিলাম। বর নবোঢ়া পত্নীকে হীরাবাই * বলিয়া ডাকিলেন; এবং আমাকে অভিবাদন করিতে কহিলেন। পরে, পুরুষ ও স্ত্রী-ভোজন আরম্ভ হইল।

পারসীকদিগের ভোজন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বিবাহমণ্ডপের নিকটে বৃহৎ ভোজনাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ অট্টালিকার মধ্যস্থলে শতাধিক হস্ত দীর্ঘ ও দুই হাত বিস্তৃত টেবিল শুভ্রবস্ত্রে আবৃত। টেবিলের দুই ধারে বহুসংখ্যক চেয়ার শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। মিঃ নৌরজী মহাশয় আমাকে ভোজন দেখাইতে সেই স্থলে লইয়া গেলেন। প্রথমেই দেখিলাম, রমণীগণ ভোজনে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। ভোজনের উপকরণ বঙ্গদেশের লুচী ফলাহারের অবিকল অনুরূপ। উক্ত বস্ত্রাবৃত টেবিলের দুই পার্শ্বে কদলীপত্রে রক্ষিত লুচী, তরকারী, মিষ্টান্ন এবং নানাবিধ ফল। আমার মনে হইল, আমার উপস্থিতি বশতঃ রমণীগণের আহারে সঙ্কোচ হইতেছে। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক নৌরজী মহাশয়ের সহিত ভোজনগৃহ হইতে বাহিরে আসিলাম। নৌরজী মহাশয় আমাকে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলাম না। তখন বর-কন্যার পিতামাতা ও দস্তুর মহোদয় আমাকে চারিটি সশীর্ষ

* এই নামকরণ-প্রথা মহারাষ্ট্রীয় অনুকরণে কৃত।

নারিকেল ও স্বর্ণবর্ণরঞ্জিত মোচাগ্রের ন্যায় ত্রিকোণাকার ঠোঙ্গায় করিয়া চারি ঠোঙ্গা তালের মিছরী উপহার দিলেন। দস্তুর মহোদয়ের শাস্ত্রীয় তর্কে আমাকে উহা গ্রহণ করিতে হইল। পরে বর-কন্যার জননীদ্বয় আমার কণ্ঠে দুই গাছি বড় বড় সপ্ততন্ত্রী পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন, এবং দস্তুর মহোদয় দুইটি প্রকাণ্ড পুষ্পস্তবক উপহার দিলেন। নৌরজী মহাশয় স্বয়ং আসিয়া আমাকে শকটযোগে পঞ্চাঙ্গশোধন-শিবিরে রাখিয়া গেলেন। বারান্তরে পারসীক জাতির অন্যান্য সামাজিকপ্রথা ও অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতির বিবরণ প্রদান করিব।

উপসংহার।

পরিদৃশ্যমান পৃথিবীতে প্রবর্ত্তমান জাতি সকলের পুরাতন ও নূতন তত্ত্বের মধ্যে পারসীক ও হিন্দু জাতির যত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে উভয় জাতিকে কখনও আকস্মিক সাদৃশ্য-সংঘটনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। দেবাসুরগণ পরস্পর ব্যবচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে আর্য্য জাতির আদিম নিকেতনে পৃথিবীর প্রাচীন জাতিসমূহ যে সকল বৃহদ্দেবতার স্তুতিগান কীর্ত্তন করিতেন, হিন্দু ও পারসীকগণ আজিও সেই প্রাচীনতম স্মৃতি উজ্জীবিত রাখিয়াছেন। পারসীকগণ সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ ও পৃথ্বী, এই চারিটি দেবতার উপাসনা সমভাবে পবিত্রতর প্রণালীতে প্রচলিত রাখিয়াছেন। হিন্দুর নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, মিত্র, বরুণ, হুতাশনের পূজা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। কৃষ্ণ গোকুল হইতে ইন্দ্রপূজা রহিত করিয়াছিলেন, পৌরাণিকগণ তাহার হেতুনির্ণয় করিবেন। তবে স্থূলদৃষ্টি আমাদের স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, যখন স্বর্গমধ্যে কৃষ্ণ-মন্দিরের স্মৃতিশিলা প্রতিষ্ঠিত হইল, অথবা অনন্তশয়নে বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর স্থান দৈবকীনন্দন অধিকার করিলেন, বজ্রধারী ইন্দ্র, গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণের নিকট সেই দিন পরাভূত হইলেন। বৈদিক যুগের বিশ্বামিত্র ও পৌরাণিক যুগের শ্রীকৃষ্ণ পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট এক অপূর্ব্ব বস্তু। ইহাদের বিপ্লবের নিকট ফরাসী-বিপ্লব তুচ্ছতম অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। পারসীক বিশ্বামিত্র অঙ্গ্রমৈন্যুসের পরে আর কোনও সমাজবিপ্লবের কাহিনী দেখিতে পাই না। অথবা তাহা যবনবীর দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের অগ্নিদাহে পার্সীপোলিস্‌ ধ্বংসে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ম্যাক্‌সমূলার সাহেব মহিমান্বিত আর্য্য শব্দের যেরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহাতে সে শব্দের আর ব্যবহার চলে না! তবে আমি বৈদিক ঋষির 'আর্য্য' (অর্থাৎ ব্রহ্মসমীপে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারাই আর্য্য) ও পারসীকগণের 'আরিয়ান্' শব্দ (যাহা হইতে ইরাণ শব্দ উদ্ভূত) ব্যবহার করিব। আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে ও আরিয়ানগণ

ইরাণভূমিতে বহুকাল ধরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। ইরাণে ও আর্য্যাবর্ত্তে সমিধপ্রাপ্ত হুতাশন উজ্জ্বলার্চ্চি হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। উভয় স্থলেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। কিছু কাল পরে আর্য্য ও আরিয়ান্ জাতির প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইল। আর্য্যগণ নৈমিষারণ্য কিংবা বদরিকাশ্রমের তপোবনে অনন্ত সারস্বত সমুদ্র মন্থন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বরূপ স্বর্গীয় সুধা উত্তোলন করিতে লাগিলেন। আর আরিয়ানগণ চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী ম্লেচ্ছ জাতিগণের সাহচর্য্যে ও সংঘর্ষে পারত্রিক অপেক্ষা ঐহিক সভ্যতার অধিক উপাসক হইয়া উঠিলেন। জাতীয় আদর্শ হইতে জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। উপাসক-সম্প্রদায় উপাস্যদেবের প্রকৃতি অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। ক্রমে ক্রমে উভয় জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যদর্শনে নানাদিগ্দেশবর্ত্তী অনার্য্য ও ম্লেচ্ছগণ আরিয়ান ও আর্য্যাবর্ত্তের প্রতি লোভলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আরিয়ানে মিদিয় বা মদ্র ও পার্থিয় বা পারদ জাতির সহিত ইরাণীয়গণের বিরোধ চলিতে লাগিল। অনেক জয় পরাজয়ের পরে ইরাণে সাইরাস্ বা 'কুরু'র অধীনে প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

বাহ্য বৈভবের বিভ্রমবিলাসে পার্সিপোলিস্ ভুবনবিদিত হইয়া পড়িল। পারসীকগণ রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। পরাক্রান্ত গ্রীক জাতির সহিত পারসীক জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। প্রাচীন মিশরের পিরামিড-গাত্রে পারসীক পতাকা উড়িতে লাগিল। দরায়ুস বহুরাজ্য বিজয় করিয়া সিন্ধুতীরবর্ত্তী হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। অসুরপূজক পারসীকগণ অজেয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। সার্ডিসের যুদ্ধে আরিয়াণগণ আইওনিয়ান বা যবনগণকে পরাজিত করিলেন। গ্রীকগণ সালামিসের যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও, মিলিটাসের যুদ্ধে পারসীকদিগের জয় হইল। ম্যারাথনের যুদ্ধে পারসীক পরাক্রম ভুবন-বিখ্যাত হইলেও, অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে গ্রীকগণ জয়লাভ করিলেন। দরায়ুসের পরে জরক্সিস্ গ্রীসের ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত অগণ্য অক্ষৌহিণী লইয়া যাত্রা করি-লেন। অবশেষে স্যালামিস্ ও প্লাটিয়ার যুদ্ধে পারসীক প্রভাব ইউরোপ হইতে বিলুপ্ত হইল। শতবর্ষের মধ্যে আলেক্জান্দারের দিগ্বিজয়ে ইরাণ রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পারসীক জাতির তদানীন্তন সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া আলেক্জান্দার গ্রীক জাতিকে পারসীক জাতির সহিত একীভূত করিবার চেষ্টা করেন। ইরাণে যবনপতাকা উড্ডীন হইল। তৎপরে আবার কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ইস্লামের অভ্যুদয়ে পারসীক জাতিও নির্ম্মূল ও নির্ব্বাসিত হইল।

এই সমস্ত ভাগ্যপরিবর্ত্তন ও নির্য্যাতনের ইতিহাসে হিন্দুর সহিত পারসীকের বিশেষ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পারসীকগণ বাহ্য বৈভবে বিমুগ্ধ হইয়া যৎকালে পারিপার্শ্বিক জাতিগণের সহিত অন্তর্বিদ্রোহে শস্ত্রশাসনে সাম্রাজ্য-সীমা বর্দ্ধিত করিতেছিলেন,—তৎকালে হিন্দুগণ শাস্ত্রসমুদ্র-সন্তরণে ব্যস্ত থাকিয়া সারস্বতস্মৃতিস্তম্ভাবলী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তখন অসুর-যুদ্ধের ভয়ে তাঁহা-দিগকে বজ্রনির্ম্মাণের জন্য দধীচির দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। তাঁহারা নির্ব্বিবাদে ও নির্বিরোধে তপোবনের শান্তিশীতল শ্যামলচ্ছায়ায় বসিয়া বৃহদারণ্যকের সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তথাপি, জানি না, কর্ম্মের কোন অবশ্যম্ভাবী ফলে, নিয়-তির কোন দুরধিগম্য দুর্দ্দৈবে ভারতবাসী আর্য্যগণ নানারূপে বৈদেশিক আক্রমণ ও অভিযানে ক্রমে ক্রমে হৃতসর্ব্বস্ব ও বীতবীর্য্য হইতে লাগিলেন। আর্য্যের ন্যায় নির্বিরোধ জাতির দৃষ্টান্ত জগতে দুর্ল্লভ। তথাপি ক্রমে ক্রমে পারসীক, হূন, শক, যবন, তুরাণীয়, মোগল, মুসলমান, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ইংরাজ— আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের বক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তথাপি যে ভারতের আর্য্যগণ আজিও কোনও প্রকারে স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়! আরিয়াণগণ বৈদেশিক বিপ্লবতরঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়া জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া অসুরদ্বেষী হিন্দুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং দৈবের নিগ্রহে উদারহৃদয় হিন্দুরাজা জাড়েবাণা বা জয়দেবের অনুগ্রহে বিমাতা আর্য্যভূমিকে 'মা মা' বলিয়া আহ্বান পূর্ব্বক জননীর অঙ্কে স্থানলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা ভারতীয় গুর্জ্জর-ভাষাকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করিতেছেন; আর্য্যের আচারব্যবহারের সদনুকরণ পূর্ব্বক প্রতিদিন উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতেছেন; ইহা আর্য্য-ভূমির বড় গৌরবের কথা। ইরাণের দুই মহাশত্রু—গ্রীক ও মুসলমান। এই দুই জাতিই ইরাণীয় আরিয়াণ জাতির ধ্বংসসাধন করিয়াছে। মুসলমান আর্য্য-ভূমিরও মহানিষ্ট সাধন করিয়াছেন। ইস্‌লামের লগুড়াঘাতে ইরাণ ও আর্য্যভূমি যে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লৌহলেখনী দুঃখে দ্রবীভূত হইয়া যায়, পাষাণ রোদন করে, এবং বজ্রের হৃদয় দলিত হয়। ইস্‌লামের প্রভাবে ভারতে যে রাহুগ্রাস হইয়াছিল, এখনও সর্ব্বত্র তাহার করাল কবলের চিহ্ন দেদীপ্যমান। বন্দ্য কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"ওরে অগ্রবণ সরযূগাতকী
রাহুগ্রাস চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মখি,

কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যা ধাম?

মোক্ষদায়িকা অযোধ্যা ফৈজাবাদে পরিণত হইয়াছিল। মথুরা ইস্‌লামাবাদে নামান্তরিত হইয়াছিল। কাশী মহম্মদাবাদে সমাহিত হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গোরক্তের নদী বহিয়াছিল। হিন্দুর পবিত্র দেববিগ্রহ পদাঘাতে বিচূর্ণিত হইয়া মস্‌জেদের পাদপীঠে পরিণত হইয়াছিল। পবিত্র পূজা-প্রদানের পীঠাসন পণ্যাঙ্গনার পাপপাংশুল পদরেণুতে পঙ্কিল হইয়াছিল।

কিন্তু জানি না, নিয়তির কোন অজ্ঞাত নিয়মে, কর্ম্মের কোন প্রচ্ছন্ন শক্তিতে, আজি ভারতে কেন, সমস্ত ভূমণ্ডলে, ব্রাহ্মণ্যের পুণ্যময় মহিমা ও আর্য্যের বিলুপ্ত গৌরব পরিব্যাপ্ত হইতেছে। প্রাচীন পৃথিবীর পরিবর্ত্ত-প্রবাহের পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ইহাই প্রতীত হয় যে, উত্থান পতন, আবির্ভাব তিরোভাব, উন্নতি অবনতি, পরিবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত, শৃঙ্খলের অন্যান্য গ্রন্থিমাত্র। অতি দীর্ঘ তমস্বিনীও প্রভাতা হয়। ভারতীয় দেবগণের ভাগ্য বড়ই প্রসন্ন যে, তাঁহারা আজিও ভক্ত ব্রাহ্মণের ফুল বিল্বদলে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দেবগণের দুঃখদর্শনে অশ্রু-সংবরণ করা যায় না। মিশর, গ্রীস ও রোমের দেবতাগণ—যাঁহারা মুসলমানের লগুড়াঘাত সহ্য করিয়াও বিদ্যমান ছিলেন—এক্ষণে চিত্রশালিকায় দর্শকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতেছেন। পারসীকদিগের সেই প্রাচীন পাবকশিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তাহা চিরতরে নিবিয়াছে। ধন্য দেবভূমি ভারতবর্ষ—যেখানে অসুর-পূজক পারসীকগণ আবার নির্ব্বিরোধে জলজ্জিহ্ব হুতাশনে আহুতি দিতেছেন। বহুশ্রুতগণ এই নিগূঢ়তত্ত্বের মীমাংসা করিবেন। প্রাচীন পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডে অবতারবাদের মহিমা দেখিতে পাই না। সে সকল দেশে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিন্তু তথায় সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত দুষ্কৃতদিগের বিনাশের নিমিত্ত বিধাতৃশক্তি অবনীতে অবতীর্ণ হন নাই।

ভগবান্ যেন ভারতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পাঞ্চজন্যের নিনাদের সহিত বলিয়া গিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

ভগবানের আশাপ্রদ এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া ভারতবাসী এখনও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে পারিবে। জানি না, বৈজ্ঞানিকের নৈসর্গিক নির্ব্বাচন ও যোগ্যতমের অমুজীবিত্বে পৃথিবীর গতি কোন্ পথে প্রধাবিত হইবে!

সহযোগী সাহিত্য।

পশ্চিমভারতের গুহামন্দির।

সম্প্রতি বোম্বাই নগরে 'স্যার জামশেটজী জিজীভয় শিল্পবিদ্যালয়'-গৃহে একটি সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহোদয় উক্ত সভায় পশ্চিম-ভারতের পার্ব্বত্য-গুহামন্দির সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। "টাইম্‌স্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া" পত্রে এই বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাণ্ডারকর মহোদয় বলেন,—

আজ আমি আলোক-চিত্রের সাহায্যে পশ্চিম-ভারতের গুহামন্দির সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষের সমগ্র গুহামন্দির ও তাহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বিবরণের উল্লেখ বহুসময়সাপেক্ষ। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, কেবল পশ্চিম-ভারতের গুহামন্দিরগুলির বিশদ বর্ণনাই দুই চারি দিবসে শেষ করা যায় না। তজ্জন্য অদ্য আমি পশ্চিম-ভারতের কতিপয় প্রসিদ্ধ গুহার বিষয় উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইব। গুহাগুলি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উত্থান ও পতনকালের সমসাময়িক বলিয়া, উহাদিগের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শাক্যমুনি বা গৌতমের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। বুদ্ধের বংশমর্য্যাদা, তেজোদীপ্ত সুকুমার কলেবর, অসাধারণ বাগ্মিতা ও কঠোর তপস্যার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য শ্রেণীর নরনারী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জৈন ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রবর্ত্তিত জাতি-ভেদ রূপ কঠোর নিগড়ের যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তি জাতিভেদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারা বসন-ভূষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতগুহায় বা অরণ্যে ভগবানের আরাধনায় কালযাপন করিতেন। শাক্যমুনি বা গৌতম ইঁহাদিগের অন্যতম। তিনি আর্য্যবংশসম্ভূত। তাঁহার পিতা অযোধ্যার উত্তরাংশস্থিত কপিলাবস্তু নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭০ সালে বুদ্ধের জন্ম হয়। ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৌতম স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। কঠোর সংযম ও অনশন-ব্রত ধারণপূর্ব্বক শাক্যমুনি ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। বহু দিবস অনশনের পর তিনি বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী একটি অশ্বত্থবৃক্ষমূলে সমাধিস্থ হন। তদবস্থায় তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। খৃষ্ট-জন্মের ৫২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর গৌতম বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। বুদ্ধ শব্দ বুধ্‌ ধাতু হইতে উদ্ভূত। বুধ্‌=জ্ঞান।

বেদান্ত ও ব্রাহ্মণধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ আছে। উহাতে আত্মার মোক্ষ বা নির্ব্বাণলাভের কোনও উপায় নাই। শ্রেষ্ঠ স্বর্গলাভের পর আত্মা পরিবর্ত্তনের নিয়মাধীন হইয়া পুনরায় জঠরযন্ত্রণা ভোগ করে। বৌদ্ধধর্ম্ম মানবকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণরূপ মহাদুঃখ হইতে মুক্তি বা নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া দেয়। বুদ্ধ জাতিভেদপ্রথা মানিতেন না। তাঁহার মতে, মানবমাত্রই ভগবানের তুল্য

সকল প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা এই নবধর্ম্মকে প্রগাঢ় ভক্তি-ভরে গ্রহণ করিল। বুদ্ধ শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া ৪৫ বৎসর কাল গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে স্বীয় মতের প্রচার করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮০ সালে তাঁহার নির্ব্বাণলাভ হয়। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর উহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করে। অশোক মৌর্য্যবংশের তৃতীয় নৃপতি। তিনি খৃঃ পূঃ ২৬৩ হইতে ২২৯ সাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা তাঁহার রাজধানী ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম মনুষ্যকে কঠোর সংযমী ও সন্ন্যাসী হইতে শিক্ষা দেয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে স্থানে স্থানে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের নির্জ্জন-আবাসস্থলের প্রয়োজন হইয়াছিল। সাধারণ লোকে যাহাতে তপস্যারত বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের ঈশ্বরারাধনার ব্যাঘাত করিতে না পারে, এ জন্য লোকালয় হইতে বহু দূরে মঠনির্ম্মাণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া, মহারাজ অশোক পাহাড় কাটিয়া মন্দিরসমূহের নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ অশোক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই সকল গুহামন্দিরের পাষাণপ্রাচীরে ঐতিহাসিক ও অন্যান্য ঘটনাবলীর বিবরণ ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস-রচনার পক্ষে এই সকল গুহামন্দিরে ক্ষোদিত অনুশাসনলিপি অতি প্রয়োজনীয়, এবং বহু মূল্যবান। উহা দ্বারা সেকালের লোকের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার ও প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। জৈন-ধর্ম্মও বৌদ্ধধর্ম্মের সমসাময়িক। এই ধর্ম্মের শেষ তীর্থঙ্কর বা গুরু খৃঃ পূঃ ৫৬৬ সালে নির্ব্বাণলাভ করেন। সুতরাং তিনি বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি হ্রাস হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জৈনধর্ম্ম জনসমাজে তাদৃশ আদরণীয় হয় নাই। ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনকালে উহা বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষাও অধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রথমতঃ গুহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৌদ্ধমন্দিরের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মান্দ্রাজ বিভাগের 'নর্দারণ সার্কল্' পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিমে কাথিয়াওয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বভারতে, মহারাজ অশোকের রাজধানীর কয়েক ক্রোশ দূরে, সর্ব্বপ্রথম কতিপয় গুহামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিহার প্রদেশের বারাবার ও রাজগৃহের, এবং উড়িষ্যায় কটক প্রভৃতি স্থানের গুহামন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতাও মহারাজ অশোক। পশ্চিম-ভারতে প্রায় এক সহস্র গুহামন্দির বিদ্যমান আছে। এই সকল মন্দির প্রাচীন ভারতের ভাস্করশিল্প, রীতিনীতি ও সামাজিক আচার ব্যবহারের ইতিহাস-স্বরূপ। বিশেষতঃ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব ও অব্যবহিত-পরবর্ত্তী কালে যে তিনটি বিশাল ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, এই সমুদায় গুহামন্দিরের প্রাচীরগাত্রে ক্ষোদিত অনুশাসনলিপি-পাঠে আমরা তাহা-দিগের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে বহুবিধ বিবরণ অবগত হইতে পারি। বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপে সমগ্র ভারত-বর্ষে পরিব্যাপ্ত ও প্রধান ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল, এবং কেমন করিয়াই বা উহা শেষে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছিল, এই সকল অনুশাসনলিপি তাহার পরিচয়স্থল ও প্রমাণস্বরূপ। জৈন ও ব্রাহ্মণধর্ম্মের সংঘর্ষে অতঃপর বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপে হীনপ্রভ হয়, তাহার ইতিহাসও এই সকল পাষাণমন্দিরের অঙ্গে অঙ্গে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৪৬ সালে মহারাজ অশোকের রাজত্বের সপ্তদশতম বর্ষে পশ্চিম-ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এই প্রদেশে কোনও গুহামন্দির বিদ্যমান ছিল না। এই সময় মহারাজ অশোক বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে

লইয়া একটি বিরাট সভা করেন। পণ্ডিতগণ তথায় আপনাদের ধর্ম্মমত নির্দ্ধারিত করেন। মহারাজ অশোক ধর্ম্মমত-প্রচারের জন্য কাশ্মীর, কান্দাহার, মণিমণ্ডল (মহীশূর হইতে অপরান্তক পর্য্যন্ত প্রদেশ; ইহার অপর নাম কঙ্কণ।) মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, হিমবন্ত বা নেপাল ও সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্মদেশে উপদেষ্টা বা ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা কতিপয় উপদেষ্টা ও বোধিদ্রুমের (যে বৃক্ষমূলে বসিয়া বুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন) একটি শাখা সহ, ধর্ম্মমত-প্রচারার্থ সিংহলে গমন করেন।

৯২০টি গুহামন্দিরের মধ্যে ৭২০টি মন্দির বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের নির্ম্মিত। ব্রাহ্মণগণ ১৬০টি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। অবশিষ্টগুলি জৈনদিগের প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরনিচয় পঞ্চাশটি শ্রেণীতে বিভক্ত। অধিকাংশ গুহা বোম্বাই প্রদেশ বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। প্রাচীনতা হিসাবে বৌদ্ধমন্দিরগুলি প্রথম। এই সকল গুহামন্দির খৃষ্টজন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে এবং খৃষ্ট-জন্মের ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হয়। ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরনিচয় খৃষ্টীয় চতুর্থ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। জৈনমন্দির সংখ্যায় অতি অল্প। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জৈন-মন্দির খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে, এবং আধুনিক মন্দির খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে যে সকল মন্দির আছে, তাহাদিগের তালিকা এইরূপ :—

(১) কাথিয়াবার বা প্রাচীন-সৌরাষ্ট্র ;—এখানে ছয় শ্রেণীর গুহামন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল শ্রেণীতে প্রায় ১৪০টি ভিন্ন ভিন্ন গুহা আছে।

(২) কন্‌হেরি প্রদেশ ;—সালসেট দ্বীপ ও হস্তীগুম্ফায় গুহামন্দিরের সংখ্যা ১৩০।

(৩) পুণা জেলার অন্তর্গত জুন্নার তালুকে (বোম্বাই হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে) প্রায় অশীতিসংখ্যক গুহামন্দির বিদ্যমান।

(৪) পুণা জেলার অন্তর্গত মাভাল নামক তালুকের মধ্যে কার্লি নামক স্থানে (লোনাভ্‌লা ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে) কতিপয় বৌদ্ধ-বিহার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে চৈত্য বা বুদ্ধের সমাধি-স্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

(৫) কার্লির পূর্ব্বভাগে ভজ নামক স্থানে গুহামন্দিরের সংখ্যা ১০।

(৬) পুণার দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী সহ্যাদ্রি বা পশ্চিম-ঘাট-পর্ব্বতমালার সমান্তরাল রেখায় সার্ভাল, ওয়াই ও কারাদ প্রদেশে কতিপয় শ্রেণীতে প্রায় ৮০টি গুহামন্দির আছে।

(৭) কঙ্কণ প্রদেশে তত্রত্য পর্ব্বতমালার পশ্চিমপ্রান্তে, সমুদ্র ও অদ্রিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী কুডা, নিবার ও চিপ্‌লন নামক স্থানে ৮০টি গুহামন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

(৮) নাসিকেও কতিপয় গুহামন্দির আছে।

(৯) বেলগম্‌-প্রদেশস্থ বাদামী নামক স্থানে কয়েকটি গুহামন্দির বিদ্যমান।

এতদ্ব্যতীত বোম্বাই প্রদেশের সীমান্তে, অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত অজন্তা ও ইলোরায়, বহুতর গুহামন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল শ্রেণীর গুহা ব্যতীত আরও এক জাতীয় মন্দির আছে; তাহাদিগকে চৈত্যগুহা বলে। চৈত্যগুহা এক একটি বিস্তৃত কক্ষ, বা মন্দির। ঈশ্বরের আরাধনার জন্য এই চৈত্যগুহাগুলি

ব্যবহৃত হইত। চৈত্য চিতা শব্দ হইতে উদ্ভূত। চৈত্য অর্থে, সমাধি-স্তম্ভ বা স্মৃতি-বেদী। ইহার অভ্যন্তরে বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও স্থবির বা প্রধান উপদেষ্টার চিতাভস্ম রক্ষিত হইত। চৈত্য-গুহাগুলি কেবল ঈশ্বরারাধনার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের অবস্থানের জন্য স্বতন্ত্র কোনও কক্ষ নাই। যে কোনও বৌদ্ধমন্দিরের সংলগ্ন এক বা ততোধিক চৈত্য-গুহা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কার্লির চৈত্যমন্দির বা ইলোরার বিশ্বকর্ম্মার মন্দিরের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক চৈত্যগুহায় এক একটি দাগোবা দেখিতে পাওয়া যায়। দাগোবা অর্থে, গুম্বজাকৃতি বেদী, বা স্মৃতি-স্তম্ভ। ইহার নিম্নভাগ গোলাকার, উপরিভাগ গম্বুজের ন্যায়। উহার নাম গর্ভ। হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণ প্রাচীন গুহাসমূহে যে সকল স্মৃতিবেদীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপ সমতল ও চিহ্নবর্জ্জিত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের ইলোরা ও অজন্তা গুহার সমাধিস্তম্ভ-নিচয়ের উপরিভাগে মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ বুদ্ধের এক একটি প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন। এই সকল গম্বুজের উপরিভাগে একটি করিয়া চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত বাক্স আছে, তাহাদের নাম 'তি'। এই বাক্সগুলি সাধারণতঃ ফাঁপা নহে; এবং তাহাদের চারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রাকার প্রস্তর শ্রেণীবদ্ধভাবে সংন্যস্ত। সর্ব্বোপরি একটি ছত্র প্রসারিত। কার্লির চৈত্যগুহায় ইহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 'বিহার' বা বৌদ্ধমঠগুলির মধ্যে একটি করিয়া উপবেশনাগার, এবং কোনও কোনও মঠে এক একটি উপাসনা-গৃহ আছে। কোনও কোনও বিহারমঠে সন্ন্যাসীদিগের অবস্থানের জন্য বিশ্রাম-কক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গহ্বরে বা কক্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীরা বর্ষাকালে ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ ও কঠোর অনশন-ব্রত পালন করিতেন। এই সকল গুহা দুইটি কক্ষে বিভক্ত। অভ্যন্তরস্থ কক্ষে এক একটি প্রস্তরনির্ম্মিত শয্যাধার আছে। কার্লির বিহার-মন্দিরে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কক্ষমধ্যে একটি করিয়া উৎস বা 'পক্কি' আছে। ইলোরার তিন্তালগুহায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অনশনব্রতধারী সন্ন্যাসীদিগের জন্য পৃথক 'ভিক্ষু-গৃহ' বা সন্ন্যাসাশ্রম আছে। যে কোনও শ্রেণীর গুহামন্দিরসমূহের সন্নিকটে ধর্ম্মশালা বা বিশ্রামাগার দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতাকালে সন্ন্যাসিগণ সমবেত হইতেন। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ মঠে অবস্থান করিতেন বলিয়া আশ্রমকুটীর ও ধর্ম্মশালার নির্ম্মাণ তৎকালে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর গুহামন্দিরে বুদ্ধকে নানাবিধ মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে,—

(১) ধর্ম্মচক্রমুদ্রা—বুদ্ধ এই অবস্থায় বিধানচক্রের নেমি পরিচালিত করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। বুদ্ধ একখানি সিংহাসনে উপবিষ্ট। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে এক একটি সিংহমূর্ত্তি। প্রস্ফুটিত কমলদলের উপর বুদ্ধের চরণ স্থাপিত। তিনি এই অবস্থায় বসিয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্থাপনপূর্ব্বক করযুগল বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

(২) জ্ঞানমুদ্রা—বুদ্ধের এই মূর্ত্তি জৈন তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তির অনুরূপ। তিনি উভয় জানু আকুঞ্চিত করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট। একটি হস্ত অপর হস্তোপরি স্থাপিত, এবং করতল তদুপরি রক্ষিত।

(৩) বজ্রাসনভূমিস্পর্শমুদ্রা—বুদ্ধের বাম কর চরণোপরি স্থাপিত; এবং দক্ষিণ হস্ত জানুদেশে রক্ষা করিয়া তিনি মৃত্তিকার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রাচীরগাত্রেও বুদ্ধের নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকটিত। কোনও মূর্ত্তিতে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া যেন আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কোনও মূর্ত্তিতে ভিক্ষাপাত্রহস্তে বা সন্ন্যাসিবেশে দাঁড়াইয়া আছেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির অবস্থাও মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত আছে। এই মূর্ত্তিতে বুদ্ধ উত্তর দিকে মস্তকরক্ষাপূর্ব্বক দক্ষিণপার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিয়া আছেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইলে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধমন্দিরের অনুকরণে গুহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই গুহামন্দিরনিচয় আধুনিক বৌদ্ধবিহারমন্দিরের অনুরূপ। তবে ব্রাহ্মণধর্ম্মে বৌদ্ধসন্ন্যাসাশ্রমের অনুরূপ অনুষ্ঠান ছিল না বলিয়া, এই সকল গুহামন্দিরমধ্যে স্বতন্ত্র কক্ষ নির্ম্মিত হয় নাই। বৌদ্ধ ও জৈন গুহামন্দির হইতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত গুহামন্দির বাছিয়া লইবার আর একটি উপায় আছে। শেষোক্ত গুহাসমূহে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরে তাহা নাই। এ জন্য ব্রাহ্মণদিগের নির্ম্মিত গুহায় চৈত্যমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা বৌদ্ধবিহারের আদর্শে গুহামন্দিরের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বেশীর ভাগ কেবল মন্দিরপ্রাচীরে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল। জৈনগুহাও বৌদ্ধবিহারের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গুহামন্দিরের সহিত জৈনগুহারও পার্থক্য ছিল। তাঁহারা গুহাপ্রাচীরে তীর্থঙ্করদিগের অসংখ্য মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার উপসংহারে শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহোদয় আলোক-চিত্রের সাহায্যে গুহামন্দিরাবলির সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। প্রথমতঃ, তিনি ভজের একটি চৈত্যগুহার চিত্র প্রদর্শন করেন। এই চৈত্যগুহা অতি প্রসিদ্ধ। হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণ খৃষ্ট-জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে উহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কার্লির চৈত্যগুহা খৃষ্ট-জন্মের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতঃপর ভাণ্ডারকর মহোদয় অজন্তাগুহার আর একটি চৈত্যমন্দিরের চিত্র প্রদর্শন করেন। ইহার অভ্যন্তরভাগে একটি সুদৃশ্য দাগোবা আছে। তৎপরে ইলোরার গুহামন্দিরের চিত্র প্রদর্শিত হইল। এই স্থানের গুহামন্দিরনিচয় ভারতবর্ষের সমুদায় গুহা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভাণ্ডারকর মহোদয় সর্ব্বসমেত আটচল্লিশ খানি চিত্র প্রদর্শন করেন। সকলগুলিই সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক।

সেকেন্দর বেগম।

ভূপালে পুরুষের সিংহাসনলাভের অধিকার নাই। রাজ-কন্যাই সেখানে গদীর উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল বেগম ভূপালে রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সেকেন্দর বেগম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি যেরূপ রাজ-কার্য্যে সুনিপুণা, সেইরূপ প্রতিভাময়ী রমণী ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দোস্ত মহম্মদ নামক এক জন আফগান বীরপুরুষ মোগলশাসনছত্রচ্ছায়ায় ভূপালে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন মোগলের করতল হইতে শাসনদণ্ড স্খলিত

হইয়া পড়িতেছিল; মোগল-গৌরবসূর্য্য তখন প্রায় অস্তমিত। দোস্ত মহম্মদ অল্পদিনের মধ্যেই নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভূপালের মন্ত্রী নজর মহম্মদ ব্রিটীশ গবর্মেণ্টের সহিত এক সন্ধিস্থাপন করেন। এই সন্ধি-সূত্রে ভূপালের সিংহাসন তাঁহার করতলগত হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে রাজ-পরিবারে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। নজর মহম্মদ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। এই ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর মহম্মদ খাঁ। পিতৃব্যের প্রাণ সংহার করিয়াও জাহাঙ্গীর মহম্মদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইল না। ব্রিটীশের সহায়তায় তাঁহার পিতৃব্যানী মৃত নজর মহম্মদের বিধবা পত্নী ভূপালের সিংহাসন লাভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে গৃহবিচ্ছেদ প্রশমিত হইল না দেখিয়া, নজর মহম্মদের বিধবা কুদসিয়া বেগম তাঁহার একমাত্র কন্যা সেকেন্দরের সহিত জাহাঙ্গীর মহম্মদের বিবাহ দিলেন। অতঃপর জাহাঙ্গীর মহম্মদ নানা ভাবে ব্রিটীশ গবর্মেণ্টের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তৈল-সেচনে গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; ভক্তকে বর-দান করিতে হইল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশ গবর্মেণ্ট কুদসিয়া বেগমকে পেন্‌সন গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিলেন। জাহাঙ্গীর মহম্মদ খাঁ ভূপালের গদী প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু জাহাঙ্গীর মহম্মদ খাঁ রাজ্যশাসনে তেমন দক্ষ ছিলেন না। তিনি উচ্চ রাজগুণে ভূষিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার পত্নীর শাসন-দক্ষতা ও রাজোচিত গুণ অনেক অধিক ছিল। সেকেন্দর বেগম নারী হইলেও, উচ্চাভিলাষ, চিত্তের দৃঢ়তা ও সংকল্পের গভীরতায়, অনেক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্বামী উপযুক্ত না হইলে তাঁহাকে অনেক সময়ই স্ত্রীর নিকট নিগৃহীত ও বিড়ম্বিত হইতে হয়। জাহাঙ্গীর মহম্মদের অদৃষ্টেও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। রাজ-দম্পতির মধ্যে দিবারাত্রি বিবাদ বিসংবাদ চলিত। অবশেষে সেকেন্দর বেগম পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার জননী পেন্সনপ্রাপ্তা ভূতপূর্ব্ব বেগমের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জাহাঙ্গীর প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন; সুরা ও বারাঙ্গনা তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল। কিন্তু তিনি দীর্ঘজীবী হন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার ভবের খেলা সাঙ্গ হইল।

জাহাঙ্গীর মহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার একমাত্র শিশুকন্যা গদীর উত্তরাধিকারিণী হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেকেন্দর বেগম কন্যার অভিভাবিকা-রূপে রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হন। তখন তিনি আর পর্দ্দানশীন থাকা আবশ্যক মনে করিলেন না; রমণীসুলভ লজ্জা, সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা দূর করিয়া, তিনি স্বয়ং স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী জাহাঙ্গীর মহম্মদের শাসনকালে সুশাসনের অভাবে রাজ্যে বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল; অতি ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল; রাজকীয় ঋণ পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেকেন্দর বেগম অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত রাজকীয় ঋণের পরিশোধ করিলেন। রাজকোষ আবার অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নিয়ম করেন, রাজার ও প্রজার মধ্যে অন্য কোনও ভূম্যধিকারীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে না। জমীদারগণ যে প্রজার অর্থে উদর পূর্ণ করিবে, সে পথ তিনি রুদ্ধ করিলেন; ব্যবসায় বাণিজ্যে কাহারও একচেটিয়া অধিকার রহিল না। এ কাল পর্য্যন্ত ভূপালরাজ্যে শান্তিস্থাপক পুলিশের অনেক ত্রুটী ছিল; প্রজার ধন-প্রাণ-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া ভক্ষণের স্পৃহা তাহাদের অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। উদ্দাম পুলিশ তাঁহার কঠোর দণ্ডে শান্ত ও সংযত ভাব ধারণ করিল। তিনি

রাজ্যমধ্যে স্থবিচার-বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন। টাঁকশাল নূতন আকার ধারণ করিল। চারি দিকে নূতন নূতন পথ প্রস্তুত হইল। শত শত জলাশয় খনিত হইল। প্রজারা দুই হাত তুলিয়া বেগম সাহেবাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। তাঁহার স্বামীর দুর্ব্বল হস্ত হইতে অনেক ভূ-সম্পত্তি স্খলিত হইয়া অন্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিনি সেই সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইলেন। ভূপালরাজ্যে তখনও দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল; সেকেন্দর বেগম রাজ্য হইতে এই কণ্টক সবলে উৎপাটিত করেন। মুসলমান রাজপুরীতে খোজার বড় আদর; খোজা-ভিন্ন মুসলমান নবাব বাদশাহের অন্দরমহল সুরক্ষিত হয় না। কিন্তু সেকেন্দর বেগম খোজা-সংগ্রহের প্রথা রহিত করেন। তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহু বিদ্যালয় ও অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেকেন্দর বেগমের ন্যায় মনস্বিনী-রমণী প্রাচ্যভূখণ্ডের কোনও দেশের সিংহাসনে গত শতাব্দীতে উপবিষ্ট হন নাই।

সেকেন্দর বেগম যখন তাঁহার কন্যার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন, তখন ব্রিটীশ গবর্মেণ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয় যে, নাবালিকা কন্যা সাবালিকা হইলেই তিনি রাজ্যশাসনের ভার কন্যার হস্তে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী কন্যা সাবালিকা হইয়াও জননীর যোগ্যহস্ত হইতে শাসনভার-গ্রহণে উৎসুক হইলেন না। সেকেন্দর বেগমই ভূপালের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

সেকেন্দর বেগম কেবল যে বুদ্ধিমতী মনস্বিনী নারী ছিলেন, তাহাই নহে। তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব, জ্ঞান, সাহস, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ধর্ম্মভয়, তাঁহাকে নারীসমাজের বরণীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের মহাঝটিকায় ভারত হইতে ইংরাজের অস্তিত্ব তিরোহিত হইবার উপক্রম হয়। মধ্যভারতে ইংরাজ আশ্রয়হীন হইয়া পড়েন। হোলকারের অগণ্য সৈন্যতরঙ্গে মধ্যভারতে ইংরাজ সেনাপতি সার হেনরী ডুরাণ্ড ও তাঁহার সহযোগিবর্গকে হাবুডুবু খাইতে হয়। ইন্দোর হইতে ইংরাজকে দোকানপাট গুটাইয়া প্রাণভয়ে পলাইতে হয়। সেই সময় সেকেন্দর বেগম স্নেহময়ী জননীর ন্যায় স্বীয় অঞ্চলচ্ছায়ায় তাঁহাদিগকে আশ্রয়দান করেন; সেকেন্দর বেগমের নিকট বিপন্ন ইংরাজসৈন্য অভয় লাভ করে। এ সময়ে ভূপালরাজ্য যেন ঘোর ভূকম্পনে টলমল করিতেছিল। তাঁহার সহস্র সহস্র সৈন্য বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া তাঁহার একটি-মাত্র ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সহস্র সহস্র প্রজা ফিরিঙ্গী-বংশ সদলে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহার উপর সেকেন্দরের জননী ও তাঁহার মাতুল প্রভৃতি গুরুজনেরা ক্রমাগত তাঁহাকে ফিরিঙ্গীদলনের জন্য উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করেন; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল,—সেকেন্দর যদি একবার ইংরাজের বিরুদ্ধে অসিধারণ করেন, একবারমাত্র যদি ভূপালসৈন্য বুঝিতে পারে,—বিধর্ম্মী, অনধিকার-চর্চ্চানিরত ফিরিঙ্গী-ধ্বংসে বেগম সাহেবার সম্মতি আছে, তাহা হইলে, মধ্যভারত হইতে ইংরাজ নির্ম্মূল হইবে, ভূপালরাজ্য চিরদিনের জন্য স্বাধীন হইবে।

কিন্তু সেকেন্দর বেগম অটল। স্তুতি মিনতি, ভয়প্রদর্শন, অসহিষ্ণুতা, কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—'ইংরাজ বিপন্ন হইয়া আমার আশ্রয় লইয়াছে, আমি তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।' অবশেষে সিপাহীবিদ্রোহের ঝটিকা প্রশমিত হইল, সেকেন্দর বেগমের ন্যায় দয়াবতী মহিলা ও সদয়হৃদয় যোধগণের সহায়তায়,

ইংরাজ-প্রভাব ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। লর্ড ক্যানিং প্রকাশ্য দরবারে সেকেন্দর বেগমের গুণগ্রামের কথা ঘোষণা করিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের হস্তে তিনি উচ্চ রাজসম্মান ও সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি লাভ করিলেন। বস্তুতঃ, সেকেন্দর বেগম তাঁহার রাজ্যের যেরূপ সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধানে সমর্থা হইয়াছিলেন, সে সময় মধ্যভারতের আর কোনও নরপতিই সে বিষয়ে তেমন যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেকেন্দর বেগমের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যের উন্নতি কামনা ও মঙ্গলচিন্তা করিয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। পৌষ ও মাঘ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু "আর্য্যসাহিত্যে অপ্সরাগণের অভিশাপ" প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—"পৌরাণিক আর্য্যসাহিত্যে যে এত অভিশাপের ছড়াছড়ি দেখা যায়, হিন্দুর মনে অভিশাপ-রূপ ভয় জাগরূক করিয়া রাখাই তাহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার জন্য অভিশাপ-ভয়।" শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত "স্বর্গীয় আনন্দনাথ সেনে"র জীবনচরিত সঙ্ক্ষিপ্ত হইলেও সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "বঙ্গে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টা" প্রবন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ডষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েশনে'র ইতিহাস আছে। তাহা 'স্বদেশী'র ইতিহাস। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের "স্ত্রীপুংভেদ"—ষষ্ঠ প্রবন্ধ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার "চীনদেশের সন্তান চুরি" প্রবন্ধে চীন ও ব্রহ্মের নানা কথার অবতারণা করিতেছেন। দশম প্রবন্ধ "মা-বির কথা" উপন্যাসের ন্যায় মনোহর। ভাষার জড়তায় রচনাটির যথেষ্ট সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। মা-বির জীবন বিচিত্র ও বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। সম্পাদকের "স্বদেশ-সেবা" উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন,—"নেতাদিগের অধীনতার হস্ত হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ আর রক্ষা নাই। কেশবচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন যে, 'রিপুর অধীনতা যেমন পাপ, গুরুর অধীনতাও সেই প্রকার পাপ।' অধীন হওয়াই পাপ।" আমাদের এক জন বন্ধু বলেন, "নেতারা সব 'স্নাতা' হইয়া গিয়াছেন!" এ কথা সত্য! যখন নেতাই দেখিতে পাই না, তখন কাহার অধীনতা স্বীকার করিব? নেতার সৃষ্টি সভাসমিতি বা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্য নয়। নেতা আপনার শক্তিবলে আপনি উদ্ভূত হন, আপনার শক্তিবলে আপনি সমাজকে শাসন করেন। বারোয়ারীর বড় পাণ্ডা 'নেতা' নহেন। যখন 'শিরো নাস্তি', তখন 'শিরোব্যথা'র চিন্তা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

বঙ্গদর্শন। মাঘ। "বিদ্যা এবং জ্ঞান" নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। সংক্ষেপে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য এই,—"বিদ্যা নানা, আর ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভিন্ন সত্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত। জ্ঞান এক, আর সেই এক জ্ঞানের লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় সত্য।" শ্রদ্ধাস্পদ লেখক প্রসঙ্গক্রমে এই প্রবন্ধে বিবিধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। যেরূপ

বিশদভাবে তিনি এই সকল গুরুতর তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার তুলনা নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্কলিত "দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে—গল্পগুচ্ছ" উপভোগ্য। "উৎসব" কবিতায়, দার্শনিকতায়, আধ্যাত্মিকতায় প্রচণ্ড উৎসব। যদিও দুর্বোধ, তথাপি 'উৎসব' বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "একটি কুন্দের প্রতি" নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখক ক্ষমতাশালী সুকবি, এই কবিতায় তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু কবি "অশ্রুতুষারের মূর্ত্তি কুন্দ"কে রহস্য-কুহেলিকায় প্রচ্ছন্ন করিলেন কেন? কুজ্ঝটিকার যবনিকা কবিতার পক্ষে সর্ব্বত্র আবশ্যক বা সৌন্দর্য্যসাধক নহে। "দুঃখমূর্ত্তি" কবিতায় 'ম্যানারিজম্‌' আছে, অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "তুলার চাষ" নামক সুলিখিত প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞ লেখক তুলার চাষের অভিজ্ঞতা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেশের উপকার করিয়াছেন, এবং সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "বালিকা বধূ" উল্লেখযোগ্য কবিতা। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের "ভীমচুল্‌হা" চলনসই নক্সা,—প্রীতিপ্রদ।

উদ্বোধন। মাঘ। "শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মণ যে সকল অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা চর্ম্মচক্ষে অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একটি ঘটনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—"রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে নিয়ম মত মা কালীর পূজা করিতে পারিতেন না। হৃদয় নিয়মমত পূজা করিতেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে পূজা করিতেন, এবং পূজান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতেন, আর আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। একদিন তিনি শ্যামার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে ঐরূপ গান করিতেছেন, এমন সময় রাণী রাসমণি তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব হঠাৎ গান বন্ধ করিয়া রাণীর পৃষ্ঠদেশে এক দৃঢ় চাপটাঘাত করিয়া কহিলেন, 'অ্যাঁ! এখানেও মোকদ্দমা?' রাণীর মন প্রকৃতই ভগবৎ বিষয়ে বিবিষ্ট ছিল না, তিনি একটী মোকদ্দমার চিন্তাই করিতেছিলেন। 'রামকৃষ্ণ মনোভাব জানিতে পারেন?' ইহা দেখিয়া রাণী অবাক হইলেন। 'রামকৃষ্ণ আমার প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন? নতুবা আমি মোকদ্দমা ভাবিতেছিলাম কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন? ইনি সাধারণ লোক নহেন,'—এই প্রকার চিন্তা করিয়া রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল।"

স্বামীজীর জনৈক সেবক "বর্ত্তমান সমস্যা"র যে আলোচনা করিতেছিলেন, বর্ত্তমান সংখ্যায় চতুর্থ প্রস্তাবে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে, বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলনে সংসৃষ্ট স্বদেশহিতৈষীদিগকে এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত অবহিতভাবে পাঠ করিতে বলি। 'সেবক' প্রস্তাব করিয়াছেন,—"একদল স্বদেশহিতব্রত ত্যাগী সম্প্রদায় গঠিত হউক। অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভিত্তিতে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। ইহার মূলমন্ত্র—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগ ইহার ভিত্তি। স্বদলকে দৃঢ় করা ও তাহার বিস্তার প্রথম কার্য্য। সাধারণের জন্য কার্য্য প্রথম হইতেই কিছু কিছু আরম্ভ হইতে পারে, দলে অধিক-সংখ্যক লোক হইলে ইহার বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য বিভিন্নরূপে আরম্ভ হইতে পারে। ইহার কতকগুলি কার্য্যের মোটামুটি উল্লেখ করা যাইতেছে। (১) পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচার,

(২) ভারতে ধর্ম্মপ্রচার, (৩) তৎসঙ্গে বিদ্যাপ্রচার, (৪) শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার্থ পাশ্চাত্যদেশে ছাত্রপ্রেরণ, (৫) তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া আসিলে তাঁহাদের বিদ্যা কাযে লাগাইবার জন্য বিদ্যালয় ও কারখানা সমূহ স্থাপন, (৬) এই সকল কার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ।" সেবক বলিতেছেন,—"বাঙ্গালীরা তিনটী গুরুতর কার্য্যে হাত দিয়াছেন। ১ম—ফিডারেশন হল, ২য়—জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, ৩য়—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। আমরা যে দল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র এই ফিডারেশন হলে হইতে পারে। জাতীয় ভাণ্ডারের অর্থ ইঁহাদের ভরণপোষণে অনায়াসে ব্যয়িত হইতে পারে—কারণ, ইঁহারা জাতীয় উন্নতির জন্য সমুদয় ব্যক্তিগত উন্নতির চেষ্টাশূন্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মন্তব্য পাঠ করিলাম, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার কোন স্থান না দেখিয়া আমারা হতবুদ্ধি হইয়াছি। আমাদের জাতীয় যাহা কিছু, ধর্ম্মই তাহার মূল ভিত্তি। যেখানে তাহার স্থান নাই, সে বিদ্যালয় কার্য্যে পরিণত কত দূর হইবে, এ বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।" বলা বাহুল্য, এ সন্দেহ সেবকের ন্যায় আরও অনেকের মনে উদিত হইয়াছে। কিন্তু যে দেশে মতান্তর শব্দের প্রতি শব্দ মনান্তর, এবং যোগ্যতার নিদর্শন ঐশ্বর্য্য, সে দেশে 'সেবকে'র নিবেদন কর্ত্তাদের কানে উঠিবে, এমন আশা করিতে পারি না। 'সেবক' যে প্রস্তাব করিয়াছেন, অনেক অনুষ্ঠানে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠান একত্র গ্রথিত ও "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" পরিচালিত হইলেই মঙ্গলের আশা করা যায়। কালসাগরে বাক্য-বুদ্বুদের কোনও মূল্য নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র।

তোমার হৃদয়-কন্দর হ'তে
কোন এক দিন পুণ্য প্রভাতে
বয়েছিল যেই ক্ষুদ্র নির্ঝর
তোমারি গৃহের কোণে ;—

দেখ আজি তার প্রবাহ প্রবল।
চলেছে কি বেগে করি' কোলাহল
সজন প্রান্তরে দেশ দেশান্তরে
কি গভীর গরজনে!

যে মহা রাগিণী ও হৃদি-যন্ত্রে
বেজেছিল ধীরে তন্ত্রে তন্ত্রে

আজি সে কি মহা-মিলন-মন্ত্রে
ছাইয়া ফেলেছে দেশ—

মলিন শ্রীহীন অধীন ভারত
আছিল পড়িয়া নির্জ্জীববৎ
নবীন জীবনে নব উদ্যমে
পরেছে নবীন বেশ।

কোন গ্রহে পুনঃ পেতেছ আসন,
সেথা কি এ বার্ত্তা বহে সমীরণ ?
আজিকে তোমার সফল সাধন
তোমারি জন্মভূমে—
স্বধু তুমিই মগন ঘুমে !

শ্যামলা সুজলা জননী তোমার
তোমারে স্মরিয়া মুছে অশ্রুধার।
"বন্দে মাতরং" বল একবার
সকলে মায়েরে ঘেরি ;
দাও মুছায়ে নয়নবারি।

আজি পূর্ণযুগ,—জীবন তোমার
ধরায় হ'য়েছে শেষ।
কভু কি গো আর অভাব তোমার
পূরাতে পারিবে দেশ ?

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

—:*:—

প্রাচীন বৌদ্ধ কবি ধর্ম্মদাস।

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে, কেবল পদবিন্যাসের চাতুরী যাহাতে আছে, এরূপ সাহিত্যকেও কাব্য বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। উহার সাধারণ নাম চিত্র-কাব্য। সংস্কৃত ভাষায় চিত্রকাব্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আমরা অদ্য একখানি চিত্রকাব্যের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। উহার নাম "বিদগ্ধমুখ-মণ্ডন"। বিদগ্ধ শব্দের অর্থ পণ্ডিত, তাঁহাদের মুখ মণ্ডিত (অলঙ্কৃত) করে যে, অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যে কাব্যের শ্লোক মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া সচরাচর জনসাধারণকে চমৎকৃত করেন, তাহারই নাম "বিদগ্ধমুখমণ্ডন।" বিদগ্ধমুখমণ্ডন নামটি নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে, এই নামে একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত পুস্তক বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ পণ্ডিতের গৃহেই বিদ্যমান আছে। আমার নিকটেও ঐরূপ একখানি বিদগ্ধমুখমণ্ডনের হস্তলিপি আছে। উহা অনেক দিন পূর্ব্বের লিখিত। এখনও বিদগ্ধমুখমণ্ডন মুদ্রিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা দেশের বিদগ্ধমুখমণ্ডনখানি কোন হিন্দু গ্রন্থকারের লেখনী-প্রসূত, উহার নামান্তর "ব্যাসকূট।"

অদ্য আমরা যে বিদগ্ধমুখমণ্ডনের পরিচয় দিব, ইহা বাঙ্গালা দেশের বিদগ্ধমুখমণ্ডন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এমন কি, বাঙ্গালা দেশের গ্রন্থের সহিত ইহার একবর্ণেরও সাদৃশ্য নাই। তদ্ভিন্ন এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, এবং বাঙ্গালার বিদগ্ধমুখমণ্ডন অপেক্ষা কবিত্বাংশে উৎকৃষ্ট। ইহার স্থানে স্থানে অতি উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশীলতা দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম ধর্ম্মদাস। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিলে ধর্ম্মকীর্ত্তি, ধর্ম্মাকর, ধর্ম্মমিত্র, ধর্ম্মসেন, ধর্ম্মরক্ষিত, ধর্ম্মঘোষ, আর্য্য ধর্ম্মত্রাতা, ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য প্রভৃতি অনেক গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ধর্ম্মদাসের নাম কোথাও দেখি নাই। জৈনশাস্ত্রে ধর্ম্মদাস গণি, ধর্ম্মপ্রভ-সূরি, ধর্ম্মচন্দ্র গণি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থকারের নাম আছে। ইনি তাঁহাদের কেহই নহেন। কারণ, গ্রন্থপাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এই কবি

বৌদ্ধ, জৈন নহেন। ধর্ম্মদাস কত দিন পূর্ব্বে কোন্ দেশে কোন্ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার লেখা দেখিয়া বোধ হয়, তিনি অতি পুরাকালের লোক নহেন। ধর্ম্মদাস বিদগ্ধমুখমণ্ডনের মধ্যে এক স্থানে মহাকবি বাণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোকটি এই ;—

রুচির-স্বরবর্ণ-পদা
রসভাববতী জগন্মনো হরতি।
তৎকিং তরুণী নহি নহি
বাণী বাণস্য মধুরশীলস্য॥

মনোহর স্বরবর্ণ ও পদবিশিষ্টা, রস এবং ভাবসম্পন্না হইয়া জগতের মন হরণ করিতেছে। তবে কি যুবতীর কথা বলিতেছ? না না, মধুর-স্বভাব-বিশিষ্ট বাণকবির বাণীর কথা।

কাদম্বরী ও হর্ষচরিতের রচয়িতা মহাকবি বাণ স্থাণ্বীশ্বরের অধিপতি মহারাজ শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীহর্ষ যখন ভারতের সার্ব্ব-ভৌম পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময় চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থ সাঙ্ স্থাণ্বীশ্বরের রাজসভায় আগমন করেন। উক্ত পরিব্রাজকের আগমনের সময় ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব বর্ত্তমান সময় হইতে ১৩৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে মহারাজ শ্রীহর্ষ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত বাণকবি বিদ্যমান ছিলেন। এই কবি ঐ সময়ের পরবর্ত্তী, কিন্তু অব্যবহিত পরবর্ত্তী নহেন। লেখার রীতি দেখিয়া অনুমান হয়, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কবি ধর্ম্মদাস "বিদগ্ধ মুখমণ্ডন" রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার সময়েও বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তখনও মগধে বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রতি জনসাধারণের প্রীতি ছিল। কবি লিখিয়াছেন,—

ভিক্ষবো রুচিরাঃ সর্ব্বে সুরসাশ্চ জনপ্রিয়াঃ।
ক্ষমায়ামতিসম্পন্না দৃশ্যন্তে মগধে পরম্॥

মগধপ্রদেশে মনোহর, দয়ালু, ক্ষমাবান্ ও জনপ্রিয় ভিক্ষু সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগেই মগধ দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের চরমাবস্থা ঘটে। অতএব তাহার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ, কিংবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, এই বৌদ্ধ কবি জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান,

বোধ হয়, একান্ত অসঙ্গত নহে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বহু সংস্কৃত কবিই কাব্য লিখিয়াছেন; তাঁহাদের সকলের কথা উল্লেখ না করিয়া, ধর্ম্মদাস শুধু মহাকবি বাণের নাম উল্লেখ করিলেন কেন? আমার মনে হয়, এক বাণ ব্যতীত অন্যান্য কবি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তত সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই বলিয়াই, ধর্ম্মদাস তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। দণ্ডী, ভবভূতি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের কাব্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি দৃষ্ট হয় না। নিরপেক্ষ কবি বাণের রচনায় বৌদ্ধধর্ম্মের যথার্থ আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি হর্ষচরিতে বিন্ধ্যারণ্যস্থিত বৌদ্ধযতি দিবাকরমিত্রের আশ্রমের যে অপূর্ব্ব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, বৌদ্ধযতিদের আদর্শ কিরূপ মহীয়ান্ ছিল। বাণ স্বয়ং যে নিজের জীবনবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায়, তিনি বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন; একমাত্র মহারাজ শ্রীহর্ষের সাহচর্য্যই তাঁহার অভ্যুদয়ের মূল। অতএব, যাঁহার কঠোর অথচ সস্নেহ মধুর শাসনে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, সেই মহারাজ শ্রীহর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে অতীব আস্থাবান্ ছিলেন। এমন কি, তিনি জীবনের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সর্ব্বপ্রধান অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চনীতি প্রকারান্তরে বাণকবির জীবনেরও অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। তজ্জন্য, বৈদিকমার্গের পথিক, পরম আস্তিক, মহাকবি বাণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার নিরপেক্ষ লেখনীর মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চনীতি অতিনৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধকবিরাও তজ্জন্যই বাণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং কবির ধর্ম্মদাস অন্যান্য কবিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু বাণের কবিত্বেরই প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রবন্ধে উল্লিখিত কবি ধর্ম্মদাস যে বৌদ্ধ ছিলেন, গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রথমেই মঙ্গলাচরণস্থলে লিখিয়াছেন,—

সিদ্ধৌষধানি ভবদুঃখ-মহাগদানাং
পুণ্যাত্মনাং পরমকর্ণরসায়নানি।
প্রক্ষালনৈকসলিলানি মনোমলানাং
শৌদ্ধোদনেঃ প্রবচনানি চিরং জয়ন্তি॥

ভবদুঃখরূপ মহাব্যাধির সিদ্ধ ঔষধ, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের কর্ণের পরম তৃপ্তিদায়ক, এবং মানসিক-মালিন্য-প্রক্ষালনের একমাত্র সলিল, শুদ্ধোদন-তনয় বুদ্ধের বাক্য সকল চিরকাল জয়লাভ করুক।

আবার আর এক স্থলে লিখিয়াছেন ;—

সত্যশীলো দয়োপেতো দাতা শুচিরমৎসরঃ।
জিনঃ সর্ব্বাত্মনা সেব্যঃ পদমুচ্চৈরভীপ্সিতা॥

যদি উচ্চপদলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে সত্যশীল, দয়াবান্, দাতা, পবিত্র ও মাৎসর্য্যহীন বুদ্ধকে সর্ব্বপ্রকারে সেবা কর।

এইরূপ আরও অনেক স্থলেই বৌদ্ধধর্ম্মের কথা আছে। এই কাব্যে মগধ ও গৌড় উভয় দেশেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি এক স্থলে গৌড় নিতম্বিনীদের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। মগধদেশের যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, মগধই তাঁহার জন্মভূমি ছিল। এই পুস্তক চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে ৫৯, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৬৯, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৭৩, চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৭১, সর্ব্বসমেত ২৭২ শ্লোকে এই গ্রন্থখানিসমাপ্ত হইয়াছে। অনেক স্থলেই ছন্দোবন্ধের চাতুর্য্য ও শ্লেষালঙ্কারের মাধুর্য্য লক্ষিত হয়। এ স্থলে আমরা দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

কীদৃশং হৃদয়হারি কূজিতং
কঃ সখা যশসি ভূপতের্মতঃ।
কস্তবাস্তি বিপিনে ভয়াকুলঃ
কীদৃশশ্চ ন ভবেন্নিশাকরঃ॥

মনোহর কূজন কাহাকে বলে? ভূপতির যশোবিস্তারে বন্ধু কে? কাননে ভয়জনক তোমার কে আছে, নিশাকর কি প্রকার হয় না?

এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর,—"কলঙ্কবিরহিতঃ"। সকলেই জানেন, মনোহর কূজনকে "কলং" বলে। আর ভূপতির যশোবিস্তারে বন্ধু "কবিঃ"। কাননে ভয় হয় "অহিতঃ" অহি (সর্প) হইতে, আর নিশাকর কখনও "কলঙ্ক-বিরহিত" হন না। বলা বাহুল্য, শেষ চরণের উত্তর সমস্ত অংশ (অর্থাৎ কলঙ্কবিরহিতঃ)। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ভাষায় ইহাকে ব্যস্তসমস্তজাতি (শ্লেষ) বলে।

সদারিমধ্যাপি ন বৈরিযুক্তা
নিতান্তরক্তাপি সিতৈব নিত্যম্।

যথোক্তবাদিন্যপি নৈবদূতিকা
কা নাম কান্তেতি নিবেদয়াশু॥

সদা অরিমধ্যে থাকিলেও বৈরিযুক্ত নহে, নিতান্তরক্তা (অনুরক্তা) হইলেও সর্ব্বদাই সিতা (শুভ্রা) যথোক্তবাদিনী (যাহা বলা যায়, তাহাই বলে) হইলেও দূতী নহে, হে কান্ত! শীঘ্র বল, সে কি?

ইহার উত্তর "সারিকা"। কারণ, সন্ধিবিচ্ছেদ করিলেই উহার মধ্যে 'অরি' দেখিতে পাওয়া যায়। নিতান্তরক্তা—অর্থ অনুরক্তা, অথচ সিতা, শুভ্রবর্ণা, এবং যথোক্তবাদিনী; সারিকাকে যাহা বলা যায়, তাহাই বলে; অথচ দূতী নহে।

ন করোতু নাম রোষং, ন বদতু পরুষং ন হন্তু বা শত্রূন্।
রক্ষয়তি মহীমখিলাং তথাপি ধীরস্ত বীরস্ত॥

ক্রোধ, কর্কশ-বাক্য-ব্যবহার, অথবা শত্রুবধ না করুক, তথাপি এই ধীর বীরের সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করাইতেছে। এখানে কর্তৃকারক গুপ্ত আছে। সন্ধিবিচ্ছেদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, "ধীঃ" অস্ত" অর্থাৎ এই বীরের ধী=বুদ্ধি, সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করাইতেছে।

এইরূপ কর্ম্মগুপ্ত, করণগুপ্ত, সম্প্রদানগুপ্ত, অধিকরণগুপ্ত, সম্বন্ধগুপ্ত, ক্রিয়াগুপ্ত প্রভৃতি নানাবিধ শ্লেষ আছে।

এই কাব্যের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নানাবিধ বন্ধযুক্ত কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন চক্রবন্ধ, পদ্মবন্ধ, কাকপদবন্ধ, গোমূত্রিকাবন্ধ, সর্ব্বতোভদ্রবন্ধ, নাগপাশবন্ধ, একান্তরিত-শৃঙ্খলাবন্ধ প্রভৃতি। আমরা এখানে সর্ব্বতোভদ্র বন্ধটি উদ্ধৃত করিলাম। কারণ এই বন্ধটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। নানা বৈচিত্র্যযুক্ত অন্যান্য বন্ধগুলি অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে অনেকটা দুরূহ, তজ্জন্য ঐ সমুদয় উদ্ধৃত হইল না।

সর্ব্বতোভদ্রবন্ধ।

অসুরসুরনরেন্দ্রৈরুহ্যতে কা শিরোভিঃ
তনুরপি শুচিবস্ত্রে কোঽতিবিস্তারমেতি।
বদতি কমলযোনিঃ সেব্যতে কেন পুষ্পং
মধুরমসৃণমৃদ্বী কা ভবেদুৎপলস্য॥

অসুর, সুর ও রাজারা কাহাকে মস্তকে ধারণ করেন? সূক্ষ্ম হইলেও

শুভ্রবস্ত্রে কি অতিবিস্তার প্রাপ্ত হয়? কমলযোনি (ব্রহ্মার নাম) কি? কে পুষ্পের সেবা করে? পদ্মের মধুর, মসৃণ ও মৃদু কোন্ অংশ?

	না	
মা	লি	কা
	কা	

এখানে পূর্ব্বোক্ত কবিতার প্রথম প্রশ্নের উত্তর 'মালিকা' (মালা); দ্বিতীয় 'কালিমা' (মসীচিহ্ন); তৃতীয় 'ক' (ব্রহ্মা); চতুর্থ 'অলিনা' (ভ্রমর); পঞ্চম 'নালিকা' মৃণাল।

অন্যান্য বন্ধগুলিও বিশেষ কৌশলপূর্ণ। উহার পাঠ করিবার রীতি-স্বতন্ত্র। বাহুল্যভয়ে আমরা বসন্ততিলক, মালিনী, শিখরিণী, শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি ছন্দের কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ঐ সকল কবিতায় কবির ছন্দঃ, অলঙ্কার ও ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যে আদিরসের বর্ণনার অভাব নাই, কিন্তু উহা পরিমিত ও সুরুচিপূর্ণ। কবি যে শুধু সংস্কৃত ভাষাতেই কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা নহে। প্রাকৃত, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি ভাষায় রচিত কবিতাও এই কাব্যে আছে। আবার দুই চারিটি শ্লোক মিশ্রভাষায় লিখিত হইয়াছে। যেমন, সংস্কৃত, প্রাকৃত, সংস্কৃত-মাগধী, সংস্কৃত-পৈশাচী প্রভৃতি।

এই পুস্তকরচনার প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় বাঙ্গালী-কবি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন' রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু উহা শুধু অনুকরণজাত নহে, কবিত্বাংশেও অনেক হীন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত বিদগ্ধমুখমণ্ডনের সহিত উহার তুলনাই হইতে পারে না। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

* ডাক্তার জন্ হেবর্‌লিন্ নামক কোনও ইংরেজ, এই পুস্তকখানি, সংগ্রহ করিয়া সংবৎ ১৯১৮ অব্দে মুদ্রিত করেন। উহাতে ভূমিকা, টীকা, অনুবাদ কিছুই নাই। এখন সংবৎ ১৯৬৩। অতএব বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে।

রুদ্রাক্ষ।

বিহারীর বৈরাগ্যের উদয় হইতেই আবার বসন্তকাল আসিল। শীত-কালটা কাটিয়াছিল ভাল। বসন্তকালটা যেন কেমন কেমন বোধ হইল। মেজাজটা একটু গোলাপী আভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। বিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক বিহারী দেখিল,—বৈরাগ্যের ভাবটা কিছু টলিতেছে।

বৈঠকখানায় বসিয়া মন চক্রবৎ ঘুরিতেছে। আত্মারাম সেই চক্রের মধ্যে এখানে ওখানে, পলকে পলকে, নৃত্য করিতেছেন। এমন সময় কেবল তামাকই ভাল লাগে।

বিহারী ডাকিল, "নসি!"

ভৃত্য নসিরাম আসিলে বিহারী তাহাকে তামাক সাজিতে বলিল। তামাক খাইয়া বিহারী একবার বাজারে গেল।

বাজারে কিনিবার অনেক দ্রব্য ছিল। কিন্তু বিহারীর উদ্দেশ্য এক ছড়া রুদ্রাক্ষ।

দুই দিন ধরিয়া একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা দর করিয়াছিল। দামটা অস-ম্ভব রকমের বলিয়া লয় নাই। এক ছড়া মালার দাম উনপঞ্চাশ টাকা!

কিন্তু মালা ছড়াটি বড় সুন্দর। বিহারী কিনিবার সঙ্কল্প করিল। দোকানে আবার গেল। তখন একটি বৃদ্ধা ও একটি তরুণী সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

উভয়েই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রত্যূষে স্নানের ঘটাটা কিছু বেশী। বিহারী ভাবিল, আপদ দুইটি সরিলে বাঁচি।

কিন্তু আপদের উপর আবার বিপদ ঘটিল। ঘটনাক্রমে তাহার বাঞ্ছিত মালাছড়াটি তরুণী হাতে করিয়া লইল। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে তরুণী বলিল, "মা, আমাকে এই ছড়াটি কিনিয়া দাও।

কিন্তু সেই স্বর! কতই উদাসীনতা, কতই বৈরাগ্য, কতই করুণাপূর্ণ!

বিহারী বুঝিতে পারিল, অবগুণ্ঠনের মধ্যে একটি রত্ন আছে। সে রত্ন সংসারে দুর্লভ, তাহাই সংসার চিনিতে পারে নাই। বালিকা বিধবা।

অঙ্গে আভরণ নাই। পরিধেয় বসন নিদারুণ শুক্লবর্ণ! তাই বুঝি রুদ্রাক্ষের এত আদর?

কিন্তু উনপঞ্চাশ টাকা!

অত টাকায় দরিদ্র রুদ্রাক্ষ কিনিতে পারে? মাতা ও কন্যা মলিন-মুখে ফিরিল।

স্বরেই বিহারীর প্রাণ উদাস করিয়াছিল,—ভাবিল, না জানি রূপ কেমন। একবার সাহস করিয়া বলিল, "আপনারা ফিরিবেন না, আমি সামান্য দামে কিনিয়া দিব।"

উভয়ে চাহিয়া দেখিল।

যাহা ভাবিয়াছিল, তাই। অবগুণ্ঠনবতী বালিকা, সে আঁখির মধ্যে কোনও কামনা নাই। সে রূপ, স্বচ্ছ প্রভাতকিরণ অপেক্ষাও মধুর। অতি স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। সে তারকা দুইটির লক্ষ্য সংসারভ্রষ্ট হইয়া অন্তরে গিয়াছে, তাই চক্ষু অত উদাসীন।

বৃদ্ধা মাতা বলিল, "বাবা! তোমার নিকট আমরা দান লইতে পারি না, আমরা দরিদ্র, কিন্তু ভিক্ষুক নহি"।

বিহারী বলিল, "আপনি দান লইবেন না, মালার পরিবর্ত্তে অন্য কোনও দ্রব্য দিতে পারেন।"

বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল। সে বলিল—"বাবা! আমাদিগের নিকট মূল্যবান দ্রব্য কিছুই নাই, কেবল শান্তির একটা অঙ্গুরীয় আছে, সেটা আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, তাহার দাম দশ টাকাও নহে।"

বিহারী বলিল,—"ওটার দাম আরও বেশী;—দেখি।" বিহারী অঙ্গুরীয় লইয়া দেখিল। দোকানদারের নিকট গিয়া তাহার সহিত অন্তরালে পরামর্শ করিল। অঙ্গুরীয়ের দাম উনপঞ্চাশ টাকাই সাব্যস্ত হইল।

বিহারী আবার বলিল, "মা! সংসারে দর দস্তুর একটা মায়া! এক ছড়া মালার দাম যদি উনপঞ্চাশ টাকা হয়, তবে একটা অঙ্গুরীয়ের দাম এক শত হওয়া বিচিত্র নয়।"

তখন অঙ্গুরীয় বিনিময়ে বিহারী রুদ্রাক্ষের মালা ছড়াটি দিল। সংসারের শেষ ভূষণ ছাড়িয়া, শ্মশানের প্রথম ভূষণ বালিকা আগ্রহ করিয়া লইল। উভয়ে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আর বিহারী? সে বৈরাগ্যের বিনিময়ে কি লইয়াছিল? শান্তির অঙ্গুরীয়? অঙ্গুরীয়ে কি আছে?

কোথাকার অপরিচিতা বালিকা, তাহার অঙ্গুরীয় হাতে দিয়া শরীর এত অবশ হইল কেন?

বিহারী ভাবিয়া দেখিল। বোধ হয়, অদৃশ্যজগতে একটা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ আছে। বিহারী এক জন বিলক্ষণ বুদ্ধিমান লোক। পঞ্চবিংশতি বৎসর হৃদয়কে পাষাণ অপেক্ষাও দৃঢ় করিয়াছিল, সংসারের মায়াকে তুচ্ছ করিয়াছিল, আজ কেন এ অভাবনীয় ভাব? হঠাৎ কোন্ পথ দিয়া মায়ায় মোহিত হইল?

সন্ধ্যার সময় শয়নগৃহে একাকী বসিয়া ভাবিতেছিল। যতই ভাবনা ততই শরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সেটা কি কুহক? সেটা কি আশা? কিসের আশা? সে ত তাহাকে চাহে নাই। বালিকার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ হইলেই বা কি? একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

শৈল আসিয়া দ্বারের নিকট বোধ হয় প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা! ঘরে যাই?"

শৈল আসিল।

শৈল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। বোধ হয়, ভ্রাতা বিহারীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। সে ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেল।

প্রেম সকলে জানে না। জলন্ত অগ্নিতে প্রেম আহুতি দিলে, অগ্নি আরও বলবান হয়। বিহারীর জ্ঞানের ভস্মস্তূপে এক ছিটা প্রেমবিন্দু পড়িয়াছিল। নিহিত অগ্নিটা যেন একটা আধার পাইয়া চিন্তা-রূপে জাগিয়া উঠিল।

বিহারীলাল প্রত্যূষে শৈলকে ডাকিয়া বলিল, "দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিবার ইচ্ছা আছে?"

শৈল এই অভাবনীয় প্রস্তাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শৈলের স্বামী বিনোদের তাহাতে কোনও বাধা নাই। বিনোদ ডাক্তার। শ্বশুরের ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত। বিহারীলাল ধনী হইয়াও স্বপ্নময় সংসারে উদাসীন। বিনোদই বিস্তীর্ণ সংসারের পরিচালক।

ভ্রাতা ও ভগ্নী নিঃশব্দে হাঁটিয়া ঘাটে গেল। বিহারী গিয়া কিয়দ্দূরে একটি সোপানে বসিল। শৈল স্নান করিল।

দূরে শান্তি স্নান করিয়া উঠিয়াছিল। শান্তির কণ্ঠে সেই রুদ্রাক্ষের মালা। শান্তি অতিযত্নে সেটাকে ধরিয়াছিল।

শৈল ভ্রাতার নিকট আসিয়া বলিল, "দাদা! তুমি স্নান করিলে না? তুমি একদৃষ্টে কি দেখিতেছ?"

বিহারীর মুখটা ঈষৎ রক্তিমাভ হইল।

"বোধ হয়, মেয়েটি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে।"

শৈল শান্তিকে দেখিয়া বলিল, "ও যে নবীন ডাক্তারের শালী!"—শৈল ডাকিল, "শান্তি! এ দিকে শোন্ ত!" শৈল ধনীর কন্যা। গর্ব্বিতা শৈল শান্তির উপর চটিয়া গেল। শৈলের নিকট সংসারে বিহারীর তুল্য কেহ নাই। শান্তির এমন কি গুণ আছে যে, বিহারী তাহার দিকে চাহিবে?

বিহারী ইত্যবসরে জলে অবগাহন করিল।

শৈল বলিল, "শান্তি! তুই কাশীতে থাকিস্, আর আমাদের বাড়ীতে একদিনও আসিস না? তোর গলায় ওটা কি দেখি?"

শান্তির কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টি শৈলের ভাল লাগিল না।

"তোর লজ্জা কি? আমার দাদা এবার কলেজে এম. এ. পাস্ করিয়া ফার্ষ্ট্ হইয়াছে। আমার দাদাকে দেখিস্‌নি বুঝি,—ঐ ছাখ্। কত যায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল। কিন্তু দাদার কি জেদ—বিবাহ করিবে না। আচ্ছা এতটুকু মেয়ে, তোর রুদ্রাক্ষের মালা কেন? কচি বয়সে বিধবা হইলে আমরা ত গহনা পর্য্যন্ত পরিতে দেখিয়াছি!"

শান্তি কাঁপিতেছিল। শৈল জানিত, শান্তি মূর্চ্ছা যায়। শান্তির মাতা অবসর বুঝিয়া শৈলের দয়া উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধা বলিল, "মা, তুমি বড়মানুষের মেয়ে, আমার শান্তি তোমার দাসী। ও অনাথা—তোমারি বাল্যকালের সঙ্গিনী, ওর উপর একটু দয়া যেন থাকে।"

শৈল শান্তিকে কোলের দিকে টানিয়া লইল। মুখখানি চুম্বন করিল। শান্তি কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শৈলের স্নেহসম্ভাষণ হৃদয়ে প্রতিদান করিল।

নবীন ডাক্তার শান্তি ও শান্তির মাতাকে ভরণপোষণ করে। নবীন ডাক্তার বিনোদের বন্ধু, এবং বিনোদেরই সাহায্যে কাশীতে অর্থোপার্জ্জন করে। নবীন কাজেই বিহারীর সংসারের ডাক্তার। নবীন বিনোদকে ভয় করে।

নবীনের স্ত্রীর মৃত্যুর পর, নবীন বিবাহ করে নাই। বাঁচিয়া থাকিতে নবীন স্ত্রীকে বড় একটা যত্ন করে নাই। নবীনের স্বভাবও বড় ভাল ছিল না।

শান্তির স্বামীর মৃত্যুসংবাদে নবীনের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। নবীন ত্রয়োদশবর্ষীয়া শান্তির রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিল। আগ্রহ করিয়া শান্তির মাতাকে কাশীবাসের লোভ দেখাইয়া আনিয়াছিল।

শান্তি গৃহকর্ম্ম করিত। নবীনের মাতা শান্তিকে ভালবাসিতেন। সুযোগ পাইলে নবীন শান্তিকে আদর ও যত্ন দেখাইতে ত্রুটী করিত না।

শান্তি অন্তরে নবীনকে ভয় করিত। শান্তি বুঝিয়াছিল, তাহার স্নেহময়ী সহোদরা স্বামীর অযত্নে উপেক্ষায় জীবনে সুখ পায় নাই।

শান্তি ঘাট হইতে ফিরিয়া রন্ধনশালায় গেল। দুধ জ্বাল দিল। ভাত রাঁধিল। ঘরে আসিল। রুদ্রাক্ষের মালাছড়াটি তাহার কৌটার মধ্যে রাখিতে গেল। রাখিতে গিয়া দেখিল। আবার দেখিল। একটা দুইটা করিয়া গণিয়া দেখিল, উনপঞ্চাশটা। ইত্যবসরে নবীন সেই ঘরে আসিল। নবীন বলিল,"শান্তি! অনেক দিন ধরিয়া একটি কথা বলিব মনে করিয়াছি।"

শান্তি মালাছড়াটি ত্রস্তভাবে হৃদয়ের বসনে লুকাইয়া বলিল,—"কি?"

নবীন। আমি তোমাকে ভালবাসি।

শান্তি। আমাকে কষ্ট দিও না। আমি তোমার অন্নে প্রতিপালিতা। আমি অনাথিনী।

নবীন। আমি তোমাকে বিবাহ করিব।

শান্তির মুখ তেজঃপূর্ণ হইল। শান্তি দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাহা কখন হইতে পারে না।"

নবীন। বিধবার বিবাহ হয়। সমাজে দোষ দিলেও তাহাতে অধর্ম্ম নাই। আমি তোমাকেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি।

শান্তি। আমি এক কথায় বলিতেছি, আমাকে অপমান করিও না। যদি অন্ন দিয়া ঋণী করিয়া থাক, আমি ভিক্ষা করিয়া শোধ করিব। কাশীতে ভিক্ষা মিলে।

কৈ, শান্তি ত পূর্ব্বে এমন কথা কহে নাই? শান্তি কত ভীরুস্বভাবা! কাতরহৃদয়া! আজ এত পরিবর্ত্তন কেন? নবীনের সন্দেহ হইল। নবীন মনে মনে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নবীন বলিল, "শান্তি! রাগ করিও না, ভালবাসিলে জ্ঞান থাকে না। তোমার সহিত আমার সম্বন্ধটা ভুলিয়া গিয়া, যদি রূঢ় ভাবে কিছু বলিয়া থাকি, তবে মার্জ্জনা করিও।"

শান্তি লজ্জিতা হইল। কাঁদিল। নবীন সান্ত্বনা করিতে গিয়া হাত দু'খানি বাড়াইল।

এমন সময় বাহির হইতে শৈল ডাকিল, "ডাক্তার বাবু কৈ ?"

নবীন ডাক্তার, শৈলবালা দেবীর শুভাগমনে অবাক হইয়া গেল। শৈল ঘরের ডাক্তারকে লজ্জা করিত না। শৈল অতি ত্রস্তভাবে নবীনকে অন্ত ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

শৈল বলিল, "ডাক্তার বাবু! এ আংটী কাহার ?"

নবীনচন্দ্র অঙ্গুরীয়টি ভাল করিয়া দেখিল। নবীন বলিল, "এ ত শান্তির আংটী, এটা আপনি কোথায় পাইলেন ?"

শৈল জ্ঞানহারার ন্যায় বলিল, "দাদার কাল রাত্রি হইতে অত্যন্ত জ্বর, আজ বিকারের মত। ডাক্তার সাহেবকে ডাকা হইয়াছিল। তিনি আপনার সহিত পরামর্শ করিবেন।"

নবীন বুঝিতে পারিল না। অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে বিকারের কি সম্বন্ধ ?

নবীন। আমি যাইতেছি। কিন্তু এ আংটির কথা কি বলিতেছিলেন ?

শৈল কিছু চিন্তা করিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা, শান্তির কথা, বিহারীর গোপনে অঙ্গুরীয়টি লুকাইয়া রাখিবার কথা, এবং বিকারের সময় বিহারীর শান্তির নাম করিবার কথা, একটি একটি একত্র করিয়া চতুরা বুঝিল যে, বিহারীর ও শান্তির ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা তাহার অজ্ঞাত।

শৈল বলিল, "ওটা ঘাটে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।" শৈল শান্তির নিকট গিয়া বলিল, "শান্তি! আমার বিপদের সময় একবার যাইতে হইবে। দাদার সঙ্কটাপন্ন জ্বর! সাবুটা, বার্লিটা জ্বাল দিবার কেহ নাই।"

নবীনচন্দ্র তাহা অনুমোদন করিল। কিন্তু নবীনের মনে একটা বৃহৎ সন্দেহভাব আসিয়া পড়িল; শান্তি ঊনপঞ্চাশটি মালাই জপিয়াছিল। প্রত্যেক জপই শূন্য। প্রত্যেক শূন্যের মধ্যেই বিহারী।

ভালবাসিয়া আত্মহারা হইতে সময় বেশী লাগে না। একটা অসীম স্নেহের আধারস্বরূপা রমণীর হৃদয় কুঁড়ি হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। উদাসিনী আপনারই ভাবে বিহ্বলা। সে ভাবের সাথী কোথায় ? শান্তি সেই ভাব দেখাইতে বিহারীকে আহ্বান করিয়াছিল। শান্তি বুঝিয়াও বুঝে নাই। মন হইতে তাড়াইয়াও তাড়াইতে পারে নাই।

শান্তি নিকটে গেলে বিহারী শান্ত হয় ? বিহারীর চক্ষু কোমল হইয়া

আসে। নবীন ডাক্তারের বুঝিতে আর সময় লাগিল না। সহস্র বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। নবীন ডাক্তার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া মনঃস্থ করিল।

বসন্তপূর্ণিমার রাত্রি। আজ রোগীর পক্ষে বড় ভাল সময় নয়। ডাক্তার সাহেব বিনোদকে ডাকিয়া বলিলেন, "একটু ক্লোরাল দিও। নিদ্রার বিশেষ প্রয়োজন।"

বিনোদ বেচারা ভীত হইয়াছিল। বিনোদ নবীনকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি একটা মিকশ্চার করিয়া রাখিয়া যাও।"

নবীন ক্লোরাল হাইড্রেটের শিশি লইল। পিশাচের ন্যায় হাসিল। আট গুণ মাত্রা বর্দ্ধিত করিল। নবীনের আজ সুযোগ উপস্থিত। একতলে নবীন শুইয়া থাকিল।

শৈল বলিল, "শান্তি! আজ রাত্রি তুই দাদার নিকট বসিয়া থাক্। নবীন বাবু বলিয়াছেন, রাত্রি বারটার পর এই ঔষধটা খাওয়াইতে হইবে। এটা একেবারে খাওয়াইতে হইবে। আমি কাছেই শুইয়া থাকিব, কিন্তু কি জানি, যদি ঘুমাইয়া পড়ি।"

শান্তি কোনও কথা কহিল না। ঔষধটি সযত্নে রাখিল।

নিস্তব্ধ রজনী আরও নিস্তব্ধ হইল। কয় দিন রাত্রি জাগিয়া শৈল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রোগীর ঘুম নাই। জ্বর কমে নাই। শান্তি ভাবিল, পদসেবা করি। দাসীর আবার লজ্জা কি? শান্তি দেখিল,—বিহারীর পদতল অতি শীতল। শান্তি কোমল করের উষ্ণতা দিয়া পদতল উষ্ণ করিল। বোধ হয়, একবার চুম্বনও করিল।

তাহার পর শান্তি গলদেশ হইতে রুদ্রাক্ষের মালা লইল। অতি কাতরে করে জড়াইয়া প্রাণের সহিত বলিল, "বিশ্বনাথ! তুমি আমাকে এ রুদ্রাক্ষ হইতে তোমার প্রেম শিখাইয়াছ। আমি একমনে নিশিদিন তোমাকেই ডাকিয়াছি! আমার একটা কথা রাখ! আমাকেই লও, উঁহাকে সংসারে রাখ।"

বিশ্বনাথ ভক্তের প্রার্থনায় ফাঁপরে পড়িলেন। দুইটি পাগলের মেলায় একটাকে লইয়া আর একটাকে সংসারে রাখা অসম্ভব। তিনি একটা পরামর্শ আঁটিলেন।

অতি ধীরে ঘড়িতে দ্বিপ্রহর বাজিল। রোগী জাগ্রতে অজ্ঞান। শান্তি

জ্ঞানেও স্বপ্নময়ী। স্বপ্নে শান্তির মনে পড়িল, ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে। জগৎ জ্ঞানে স্বপ্নময় হইলে একটাকে দুইটা দেখে, এবং দুইটাকে এক দেখে। বিশ্বনাথের ইহা অপূর্ব্ব লীলা।

শান্তি শিশিটা লইতে গিয়া দেখিল, দুইটা শিশি। একটা রক্তবর্ণ, একটা শূন্য।

শান্তি ভাবিল, কি আপদ! কাহার ঔষধ? কাহার জন্য? কিছুই ত মনে পড়ে না! অনেক চেষ্টা করিয়া শান্তির মনে পড়িল,—নবীন ডাক্তার ঔষধটাকে একেবারে খাওয়াইতে বলিয়াছে। শান্তি ভাবিল, শৈলকে ডাকি।

আবার ভাবিল, কাজ কি? শান্তি পুনর্ব্বার শিশির দিকে চাহিয়া দেখিল,—কেবল একটাই। ঔষধটা এমন চঞ্চল কেন? শান্তির অন্তরে একটা ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। কে যেন শান্তিকে ইঙ্গিতে বলিয়া দিল, "ঔষধটা বিবেচনা করিয়া দিও।"

এটা ঘুমাইবার ঔষধ ত? শান্তি খানিকটা লইয়া খাইয়া দেখিল। শান্তি ভাবিল, "খাইয়া দেখি, যদি অন্য কোনও ঔষধ হয়, তবে আমারই উপর দিয়া যাউক।"

ভাবিতে ভাবিতে শান্তির হাসি পাইল। ইন্দ্রিয় চঞ্চল হইল। চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। শান্তি উচ্চৈঃস্বরে হাসিল! শান্তির তখন বাহ্য জ্ঞান নাই। শান্তি দেখিল সম্মুখে দ্বার উন্মুক্ত।

দ্বারের পার্শ্বে নবীন ডাক্তার।

শান্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "পিশাচ! তোমার ঔষধ আমি খাইয়াছি। আমি থাকিতে নাথের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না!"

নবীন অন্ধকার দেখিল। এক দৌড়ে বাটীর বাহির হইল। একেবারে গৃহ সংসার ছাড়িয়া গেল।

শৈলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, শান্তি পাগলিনীর ন্যায় চাহিয়া আছে।

"শান্তি! তোর কি হইয়াছে শান্তি?"

শান্তি বুঝাইতে পারিল না। শৈল ছুটিয়া গিয়া বিনোদকে ডাকিল। শান্তিকে কোলে লইল।

বিনোদ বলিল, "ঐ শিশিটা আন ত।"

বিনোদ ঔষধ আস্বাদন করিয়া বুঝিল, ক্লোরালের ভাগটা অত্যন্ত অধিক। বিনোদ বলিল, "ভয় নাই।"

বিনোদ শান্তিকে নানা রকম ঔষধ খাওয়াইল। অবশেষে বলিল, "না, বেশী খায় নাই, সারিয়া যাইবে।"

শৈলের গা কাঁপিতেছিল। "দাদা খায় নাই ত?" দাদার অবস্থা তখন মন্দ নয়। জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

সারা রাত্রি শৈল শান্তির সেবা করিল।

বেলা আটটার সময় বিহারী অতি ক্ষীণস্বরে বলিল "শৈল! একটু জল আনিয়া দে; তৃষ্ণা পাইয়াছে।"

তাহার পর আর বিনোদের জ্বর আসিল না।

দিবা দ্বিপ্রহরের পর শান্তি জাগিল।

শৈল বলিল, "শান্তি! সব জানিতে পারিয়াছি। নবীন পলাইয়াছে। সে একখানা পত্র লিখিয়া বাহিরের ঘরে রাখিয়া গিয়াছে। তুই আমাদের লক্ষ্মী সতী।

শৈল অধীর হইয়া শান্তিকে বারাংবার হৃদয়ে লইয়া চুম্বন করিল।

বিহারী ভাল হইয়াছে। শান্তি রুদ্রাক্ষের মালাটি লইয়া মাতার নিকট যাইতে চাহিল।

শৈল বলিল, "কোথায় যাবি?"

শান্তি। যেখানে দুই চক্ষু যায়।

শৈল বলিল, "আর ন্যাকামি করিস্‌নে। এইবার তোর ঘর সংসার নে, আর রুদ্রাক্ষের মালা আমাকে দে।"

কুতব ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ।

কুতব (১২০৬—১০ খৃঃ)

মহম্মদের অপঘাতমৃত্যুর সংবাদ ঘোর রাজ্যে পঁহুছিলে, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ ঘোরী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। মহম্মদ অতিশয় দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন; তাদৃশ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। তিনি কুতবকে আপনার পক্ষভুক্ত রাখিবার কল্পনায় তাঁহাকে

সুলতান উপাধি প্রদান করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি দিলেন। কুতব তদনুসারে স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিয়া স্বাধীনভাবে শাসন আরম্ভ করিলেন।

দুর্ব্বলচিত্ত মহম্মদ বলসঞ্চয়ের আশায় কুতবকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াও আপন প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। গজনীর শাসনকর্ত্তা এলাদাজ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মহম্মদ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইলেন না। এলাদাজ গজনীর অধিকার লইয়াই পরিতৃপ্ত রহিলেন না; রাজ্যবিস্তারে কৃতসংকল্প হইয়া সসৈন্যে লাহোরে উপনীত হইলেন। কুতব তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য পঞ্জাবে গমন করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে এলাদাজের সৈন্য বায়ুমুখে শুষ্কপত্রের ন্যায় উড়িয়া গেল। কুতব তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গজনীতে উপনীত হইলেন, এবং শত্রুপক্ষকে অতিশয় দুর্ব্বল দেখিয়া সে দেশ গ্রাস করিয়া বসিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাবারিবর্ষণে কুতব বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হইয়া ব্যসনে মত্ত হইলেন। গজনীর অধিবাসীরা তাঁহাকে বিলাসাসক্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং এলাদাজকে রাজ্যের উদ্ধারার্থ আহ্বান করিল। এলাদাজ তাহাদের আহ্বানে উৎসাহিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক গজনী নগরীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। কুতব শত্রুর আকস্মিক আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া গজনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুস্থানের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কুতব গজনী হইতে পলায়ন করিয়া আপন বিলাসপরায়ণতার জন্য অনুতপ্তচিত্তে দিল্লীতে উপনীত হইলেন, এবং পুনর্ব্বার হিন্দুস্থানের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি সবিশেষ উৎসাহসহকারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২১০ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোর নগরে ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কুতবকে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও শৌর্য্যবীর্য্যশালী নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অর্থবিতরণে মুক্তহস্ত ছিলেন; এ জন্য লোকে তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা-প্রদাতা উপাধি দিয়াছিল। উত্তরকালে কেহ দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ হইলে লোকে তাঁহাকে দ্বিতীয় কুতব-উদ্দীন নামে অভিহিত করিত। বস্তুতঃ, তিনি নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।

বলিয়া ভারতবর্ষে মুসলমানের জয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়া স্থায়ী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আরাম শাহ।

সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবক পরলোকগত হইলে, তদীয় পুত্র আরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হইতে পারে নাই। আরাম শাহ রাজকার্য্যে অতিশয় অপটু ছিলেন, এই জন্য তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর অল্পকালের মধ্যেই শাসনব্যাপারে নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল। অমাত্যগণ সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আরাম শাহের ভগিনীপতি বদায়ূনের সুযোগ্য জায়গীরদার শমসউদ্দীন আলতমাসকে রাজসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তিনি সসৈন্যে দিল্লীতে উপনীত হইলেন।

আলতমাস।

আলতমাস যুদ্ধক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। (১) তিনি দিল্লীর সাম্রাজ্য করতলগত করিয়া সুশাসন ও প্রজাপালনে

---

(১) আলতমাস প্রথমে এক জন ক্রীতদাস ছিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে রাজপদ প্রাপ্ত হন। আমরা তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ পূর্ব্ব-জীবনীর সার-সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। আলতমাসের পিতা সমৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আলতমাস বাল্যকালেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চরিত্রমাধুর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার অলৌকিক রূপরাশির সহিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চরিত্রমাধুর্য্য মিলিত হওয়ায় তিনি সকলের আদরভাজন হন। আলতমাসের একাধিক ভ্রাতা ছিল। তাঁহার তাদৃশ আদরলাভ ভ্রাতৃগণের বিষম ঈর্ষ্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য তাঁহারা আলতমাসকে বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হন, এবং একদিন মৃগয়াব্যপদেশে তাঁহাকে বিজনস্থানে আনয়ন করিয়া কতিপয় বণিকের নিকট বিক্রয় করেন। বণিকগণ তাঁহাকে বোখারার প্রধান কাজীর এক জন আত্মীয়ের নিকট বিক্রয় করেন। এই স্থানে তিনি পরম যত্নে পালিত হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই সময় একদিন তিনি আঙ্গুর ক্রয় করিতে বাজারে প্রেরিত হন। কিন্তু পথিমধ্যে মুদ্রাখণ্ড হারাইয়া ফেলেন, এবং তিরস্কারের ভয়ে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করেন। সেই পথে এক জন ফকীর গমন করিতেছিলেন। তিনি রূপবান বালকটিকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হন, এবং তাঁহাকে কতকগুলি আঙ্গুর প্রদান করিয়া বলেন, "ভবিষ্যতে তুমি রাজ্যলাভ করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইবে। তখন ফকীর ও অন্যান্য ধার্ম্মিক

প্রবৃত্ত হইলেন। সুলতান আলতমাস ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ন্যায়বিচার ও উৎপীড়িতের দুঃখ অপনয়নের জন্য প্রবল আগ্রহই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কাহারও কোনও অভিযোগের কারণ থাকিলে, তাহাকে রঙ্গিন পোষাক পরিধান করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবাসী শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। সুলতান রাজ-দরবারে আগমন করিয়া, অথবা ভ্রমণার্থ অশ্বপৃষ্ঠে রাজপথে বহির্গত হইয়া কাহাকেও রঙ্গিন বস্ত্র পরিহিত দেখিলেই তাহাকে আহ্বান করিয়া তাহার অভিযোগের বিষয় শ্রবণ করিতেন, এবং তাহার পর অত্যাচারীর শাস্তিবিধান ও উৎপীড়িতের দুঃখ অপনয়নে যত্নশীল হইতেন। তিনি সুবিচারের জন্য কেবল এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ক,

---

ব্যক্তিকে সম্মান করিও, এবং তাঁহাদের স্বত্ব রক্ষা করিতে যত্নশীল থাকিও।" এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তদীয় প্রভু তাঁহাকে এক জন বণিকের নিকট বিক্রয় করেন। এই বণিক তাঁহাকে জামাল নামক আর এক জন বণিকের নিকট বিক্রয় করেন। জামাল আলতমাসকে গজনীতে লইয়া আইসেন। মহাম্মদ ঘোরী তাঁহাকে ক্রয় করিতে অভিলাষী হইয়া উপযুক্ত অর্থ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জামাল অত্যধিক অর্থ প্রার্থনা করায় তিনি বিরক্ত হইয়া ঘোষণা-প্রচার পূর্ব্বক আলতমাসের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন। জামাল এক বৎসর কাল গজনীতে অবস্থিতি করিয়া বোখারায় ফিরিয়া যান। তথা হইতে তিন বৎসর পরে পুনরায় গজনীতে আগমন করেন। কিন্তু এবারও গজনীর কোনও অধিবাসীই রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল না। এই সময় কুতবউদ্দীন গজনীতে উপনীত হন, এবং আলতমাসের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্রয় করিবার জন্য মহাম্মদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইহাতে তিনি বলেন, "আলতমাসকে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হইলে ক্রয় করিতে পার।" কুতবের অভিলাষানুসারে জামাল আলতমাসকে লইয়া দিল্লীতে উপনীত হন। কুতব তাঁহাকে পঞ্চাশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করেন। এখানে আলতমাস অল্পদিন মধ্যেই কুতবের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত হন। গোক্কুর জাতির সহিত যুদ্ধকালে আলতমাস কুতবের সহগামী ছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি শৌর্য্য-বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কুতব তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন, এবং স্বীয় কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে সম্বন্ধ করিয়া তাঁহাদের বৃত্তির জন্য বদায়ুন জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। কুতবের মৃত্যুর পর তিনি জায়গীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তার পর অমাত্যগণের আহ্বানে সসৈন্যে দিল্লীতে গমন করিয়া রাজপদ অধিকার করেন।

তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অনেকে রাত্রিকালে উৎপীড়িত হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধেও সুবিচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি আপন প্রাসাদের দ্বারদেশে দুইটি শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহ স্থাপন করেন। এই সিংহদ্বয়ের গলদেশে লৌহশৃঙ্খলে দুইটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বিলম্বিত ছিল। কেহ রাত্রিকালে উৎপীড়িত হইয়া এখানে আসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেই সুলতান তাহা শুনিতে পাইতেন, এবং তৎক্ষণাৎ সুবিচার করিয়া তাহার সন্তোষবিধান করিতেন।

সুবিচারক আলতমাসের সমগ্র রাজত্বকাল কেবল প্রজাপালনে অতিবাহিত হয় নাই। তাঁহার রাজত্বকালে সমরস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ আলতমাস সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সময় সিন্ধুদেশ মালিক নাসীরউদ্দীনের অধীন ছিল। আলতমাসের প্রেরিত সৈন্য সিন্ধুদেশে উপনীত হইলে নসীরউদ্দীন সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। নাসীরউদ্দীন পলায়ন করিয়াও জীবনরক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি পথিমধ্যে দৈবাৎ সিন্ধুনদে সপরিবারে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

সিন্ধু বিজয়ের পরেই বঙ্গদেশে যুদ্ধ আরব্ধ হয়। আলতমাসের রাজত্বের প্রারম্ভে গিয়াসউদ্দীন নামক বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিজ নামে খোতবা ও সিক্কা প্রচলিত করিয়া স্বাধীনভাবে আধিপত্য করিতেছিলেন। এ জন্য সুলতান বাঙ্গলা, বিহার বিজয়ের জন্য সৈন্য নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং লক্ষ্ণৌতী নগরীতে উপনীত হয়েন। গিয়াসউদ্দীন আপনাকে সম্রাটের সহিত যুদ্ধে অক্ষম বিবেচনা করিয়া ভীতচিত্তে ৩৮টা হস্তী, ৮৮০০০ সহস্র মুদ্রা ও অন্যান্য বহু উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপহার দিয়া, রাজসংসারের এক জন হিতকামী বলিয়া গণ্য হইবার প্রার্থনা করেন। সুলতান বাঙ্গলার খোতবা ও সিক্কা নিজ নামে প্রচার করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নাসীরউদ্দীন (১) উপাধি দিয়া লক্ষ্ণৌতীর শাসনভার অর্পণ করেন এবং তাহার পর তাহাকে রাজছত্র ও দুরবাস প্রদান করিয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রত্যাগত হন।

সুলতান বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মালব প্রদেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ইহার পূর্ব্বে এই দেশ আর কখনও মুসলমানের তাণ্ডবে উৎপীড়িত

(১) নাসীরউদ্দীন আলতমাসের জীবদ্দশাতেই কালগ্রাসে পতিত হন।

হয় নাই। সুলতান আলতমাসই প্রথমে এই দেশে মুসলমানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি মালব-বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে রিন্তাম্বর; তার পর সুপ্রশস্ত মাণ্ডু নগর অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি গোয়ালিয়রে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া ভীলসা ও পুরাতন উজ্জয়িনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিছুকাল যুদ্ধের পরেই এই দুই নগরী অধিকৃত হয়। এই দুই নগরী অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মালব-বিজয় সমাপ্ত হয়। তখন আলতমাস সগৌরবে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। সুলতান আলতামাস প্রজাপালনে ও রাজ্য-বিস্তারে পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিবাহিত করিয়া ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

আলতমাসের রাজত্বকালেই ভুপ্রথিত চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয় হইয়াছিল। মোগলবংশোদ্ভব চেঙ্গিস খাঁ, প্রথমে এক ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি ছিলেন; তার পর সমগ্র তুর্কিস্থান বিধ্বস্ত করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, এবং খিতা (উত্তর চীন) রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে খারিজম নামে এক সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। চেঙ্গিস খাঁর অভ্যুদয় ও মোগল সৈন্য কর্তৃক খিতা রাজ্য বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, খারিজমের অধিপতি সুলতান মোহাম্মদ প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য দূত প্রেরণ করেন। চেঙ্গিস খাঁ, রাজদূতকে সাদরে গ্রহণ করেন। উভয় রাজ্যে যেন অবাধে বাণিজ্য চলিতে পারে, এই মর্ম্মে চেঙ্গিস খাঁ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া স্বীয় দূতসহ বহু মূল্য পণ্যদ্রব্যপূর্ণ পঞ্চ শত উষ্ট্র বাণিজ্যার্থ খারিজম রাজ্যে প্রেরণ করেন। খারিজমের অধিপতি সুলতান অর্থ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই বণিকদলকে সমূলে বিনষ্ট করেন। কেবল মাত্র এক জন উষ্ট্রচালক দৈবক্রমে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া চেঙ্গিস খাঁকে এই দুষ্কার্য্যের সংবাদ প্রদান করে। এই শোচনীয় সংবাদে, চেঙ্গিস খাঁর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং উহাতে সমগ্র খারিজম সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। চেঙ্গিস খাঁর নির্ম্মম আক্রমণে সিন্ধু নদের সীমান্ত প্রদেশ হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সহস্র যোজনব্যাপী ভূখণ্ড মহা শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছিল। চেঙ্গিস খাঁ, সমগ্র খারিজম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন; খারিজমের অধিপতি সুলতান ভগ্নহৃদয়ে কালগ্রাসে পতিত হইয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন; রাজ-কুমার জালালউদ্দীন নানা স্থানে বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় বিঘূর্ণিত

হন। তিনি মোগল সৈন্যের তাড়নায় কোন স্থানেই তিষ্টিতে না পারিয়া, সাত জন অনুচর সহ সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, এবং আলতমাসের আশ্রয়প্রার্থী হন। কিন্তু তিনি চেঙ্গিস খাঁর ভয়ে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। জালালউদ্দীন ভারতবর্ষে আশ্রয় লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, গোক্কুর জাতির সহিত যোগ প্রদান পূর্ব্বক সিন্ধু কূলবর্ত্তী নানা স্থানে উপদ্রব করিয়া বেড়ান, তার পর পারস্যের অন্তর্গত কিরমনের অভিমুখে ধাবিত হন। তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলে মোগল সৈন্য নিশ্চয়ই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং তাহাদের প্রবল প্রবাহে ভারতবাসীর সুখ শান্তি ভাসিয়া যাইত। সুতরাং আলতমাস তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান না করিয়া দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলতমাসের পরলোক গমন কালে তাঁহার পাঁচ পুত্র রুকনউদ্দীন, মইজউদ্দীন, গিয়াসউদ্দীন, নাসীরউদ্দীন ও কুতবউদ্দীন এবং এক কন্যা (রিজিয়া) বর্ত্তমান ছিল।

রুকনউদ্দিন।

রুকনউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রুকনের চরিত্র অতিশয় কলুষিত ছিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন। সুরা ও নর্ত্তকী তাঁহার সভার ভূষণ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উদ্দাম চিত্ত-বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই অহোরাত্র অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তদীয় মাতা শাতুর্কান রাজকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তুর্কান এক জন ক্রীতদাসী ছিলেন। আলতমাস তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য দর্শনে পুরমহিলারা ঈর্ষ্যাকুল চিত্তে তাঁহাকে ক্রীতদাসী বলিয়া অবজ্ঞা করিত। রুকনের সিংহাসনারোহণের পর, তিনি ক্ষমতা হাতে পাইয়া তাহাদের ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় জ্ঞানহারা হইয়া তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এই সকল দুষ্কার্য্যে জনসাধারণের হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রুকন ও তাঁহার মাতার পাপের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রাজকুমার কুতবউদ্দীনকে হত্যা করিলেন। তাঁহাদের এই নৃশংসাচরণে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রবল অসন্তোষ

ধ্বনি উত্থিত হইল। প্রথমে আলতমাসের অন্যতম পুত্র অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তার পর বদায়ূনের শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ এবং লাহোরের শাসনকর্ত্তা খানি, মুলতানের প্রতিনিধি ও হাসির শাসনকর্ত্তা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন। রুকন বিপুলবাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রধান মন্ত্রী জুনেদি তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহিগণের সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে লাহোরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রুকন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে দৃকপাত না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি মনসুরপুর নামক স্থানে উপনীত হইলে, সাত জন সেনানায়ক তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহারা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আলতমাসের দুহিতা রিজিয়াকে রাজপদ প্রদান পূর্ব্বক রুকনের মাতাকে কারারুদ্ধ করিলেন।

রিজিয়া।

সেনানায়কগণের নিয়োগ ক্রমে রিজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সংবাদ রুকনের নিকট পৌঁছিলে তিনি দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রিজিয়া তাঁহার

---

(১) আমরা ফেরিস্তা ও তাবেক্ত নাশেরী অবলম্বনে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম। ইবন বতুতা অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, সহোদর ভ্রাতা কুতবের শোচনীয় মৃত্যুতে রিজিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হন, এবং চিত্তাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রুকনকে যথোচিত ভৎর্সনা করেন। ইহাতে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হন। একদিন শুক্রবার তিনি নমাজ পড়িবার জন্য মস্‌জিদে গমন করিতে-ছিলেন, এই সময় রিজিয়া মস্‌জিদের সংলগ্ন দৌলতখানা প্রাসাদের উপর রঙ্গীনবস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান হন, এবং জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া বলেন, "রুকনউদ্দিন আমার ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছে, এখন আমাকেও নিহত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে।" তার পর তিনি প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় আলতমাসের রাজত্বকালে প্রজাকুল কিরূপ সুখী ছিল, তাহা বর্ণনা করেন। জনসাধারণ রুকনের ব্যবহারে পূর্ব্বেই বিরক্ত ছিল; তাহারা রিজিয়ার বাক্যে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক রিজিয়ার নিকট আনয়ন করে। রিজিয়া রুকনকে তদবস্থায় দেখিয়া বলেন, "হত্যাকারীকে হত্যা করাই অবশ্যকর্ত্তব্য।" তদনুসারে ক্রোধোন্মত্ত জনসাধারণ তাঁহাকে বধ করে; তার পর সকলে মিলিত হইয়া রিজিয়াকে সাম্রাজ্যেশ্বরী বলিয়া স্বীকার করে।

প্রতিরোধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল রুকনকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিল। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি কারাগারে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। (১) রুকন উন্মূলিত হইতে না হইতেই আর এক প্রবল শত্রু দিল্লীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী জুনেদ বিদ্রোহীদলের সহিত যোগ দিবার জন্য লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি রিজিয়ার সিংহাসনারোহণের সংবাদ অবগত হইয়া সসৈন্যে দিল্লীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। রিজিয়ার কৌশলে শত্রুদলমধ্যে অচিরে আত্মকলহ উপস্থিত হইল, এবং এই আত্মকলহেই তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

সুলতানা নিষ্কণ্টক হইয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজন্যকুলে একমাত্র রিজিয়াই স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার রাজ্যোচিত গুণগ্রামের অভাব ছিল না। আলতমাস পুত্রগণের সঙ্গে তুলনা করিয়া রিজিয়াকেই বিদ্যা, বুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন; এইজন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজধানী হইতে অনুপস্থিত হইবার সময়, তাঁহার হস্তেই রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া যাইতেন। রাজপদলাভের পর তিনি পুরুষের বেশে প্রকাশ্যভাবে দরবারে বসিতেন, এবং ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতা সহকারে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। এই ভাবে সার্দ্ধ তিন বৎসরকাল রাজত্বের পর তাঁহার অদৃষ্টচক্র নিম্নগামী হইল। এই সময় এক জন হাবশী ক্রীতদাস তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। রিজিয়া তাহাকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহাতে প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ অত্যন্ত বিরক্ত হন; বিতুন্দার শাসনকর্ত্তা মালিক আলতুনিয়া বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধঘোষণা করেন। রিজিয়া তাঁহার বিষদন্ত ভগ্ন করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে সেনানায়কগণ শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হাবশীকে বধ করেন, এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলতুনিয়ার হস্তে সমর্পণ করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে, আলতমাসের অন্যতম পুত্র মইজউদ্দীন বহরাম মন্ত্রীসমাজের নিয়োগক্রমে রাজপদ অধিকার করেন।

মইজউদ্দীন বহরাম।

মালিক আলতুনিয়া রিজিয়ার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন, এবং উভয়ে মিলিত হইয়া রাজসিংহাসন উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ-

ঘোষণা করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরব্ধ হয়; রিজিয়া ও তাঁহার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু অচিরাৎ শত্রুহস্তে ধৃত হইয়া নিহত হন। (১) রিজিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার পর বহরাম নিরাপদ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। বহরাম দুই বৎসর এক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইয়া শাসনকার্য্য বিশৃঙ্খল ও রাজশক্তি নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছিল। বহরাম দুর্ব্বলচিত্ত বিলাসপটু শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান মন্ত্রী তিগি নামক এক জন বিশিষ্ট রাজপুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়া সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস করিয়া বসেন। তাঁহাদের অতুল প্রতিপত্তি ক্ষমতা দর্শনে বহরাম ঈর্ষ্যাকুল হইলেন, এবং মত্ততার ছলে তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য দুই জন ক্রীতদাসকে নিয়োজিত করিলেন। একদিন সুলতান প্রকাশ্য দরবারে উপবিষ্ট হইলে, ক্রীতদাসদ্বয় মত্ততার ভান করিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। তিগি তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইলে, তাহারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল; তাহার পর তাহারা প্রধান মন্ত্রীর দিকে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে দুইবার অস্ত্রাঘাত করে। তিনি জনতার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রক্ষা পান। এই দুর্ব্বৃত্ত দুই জনকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল; কিন্তু কিছুদিন পরেই সুলতান তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিয়া মুক্তি দিলেন।

ইহার পর শঙ্কর রুমি নামক এক জন প্রধান রাজপুরুষ রাজবিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। প্রধান মন্ত্রীও এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রকারিগণের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন; কিন্তু মনে মনে বহরাম শাহের পক্ষপাতী ছিলেন।

---

(১) ইবন বতুতা অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রিজিয়া রণক্ষেত্র হইতে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পলায়ন করেন। পথিমধ্যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন, এবং পথিপার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রে এক জন কৃষককে কার্য্যরত দেখিয়া, তাঁহার নিকট কিছু আহার্য্য সামগ্রী প্রার্থনা করেন। কৃষক তাঁহাকে রুটী ও জল প্রদান করে। পরিশ্রান্তা রিজিয়া আহারান্তে ক্ষেত্র মধ্যে নিদ্রিত হন। কৃষক নিদ্রিত রিজিয়ার পোষাকের নীচে মূল্যবান অলঙ্কার দেখিতে পায়, এবং লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

এই জন্য তিনি একদিন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। বহরাম এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন গোপনে শ্রবণ করিবার জন্য এক জন বিশ্বাসী ভৃত্যকে তাঁহাদের সম্মিলনস্থলে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্য রাজাজ্ঞায় তথায় গমন করিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শ্রবণ পূর্ব্বক সুলতানের নিকট তৎসমুদয় প্রকাশ করিল। দূতবাক্যে তিনি প্রধান বিচারপতির অভিযোগ যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য এক দল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রধান প্রধান ষড়যন্ত্রকারিগণ ধৃত হইয়া নৃশংসভাবে নিহত হইল। ঐ দিন মন্ত্রণাকক্ষে প্রধান মন্ত্রী দৈবক্রমে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া এবারও রক্ষা পাইলেন।

বহরাম শাহ ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়া আপমুক্ত হইলেন। কিন্তু এক বিপদের অবসান হইতে না হইতেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। এই বিপদ মোগল সৈন্যের ভারত-আক্রমণ। তাহারা ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া লাহোর অধিকার করিল; এবং তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে লাহোর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ছার খার হইয়া গেল। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে, বিপুল বাহিনী সহ প্রধান মন্ত্রী মোগলের বিষদন্ত ভগ্ন করিতে প্রেরিত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী বহরাম শাহের ধ্বংসকামী ছিলেন। এই জন্য রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি সেনানায়কগণকে রাজদ্রোহী করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। তিনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট সুলতানের অত্যাচার ও অবিচারের নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধবাদী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। অন্য দিকে তিনি সুলতানের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সেনানায়কগণ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। এই লিপি তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি প্রধান মন্ত্রীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, সেনানায়কদিগকে সুযোগ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত শান্ত রাখিতে, এবং তাহার পর সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশলিপি প্রধান মন্ত্রীর নিকট পৌঁছিলে, তিনি উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিলেন। ইহাতে সেনানায়কগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং প্রধান মন্ত্রীকে অধিনেতৃপদে বৃত করিয়া রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা রাজধানীর

দ্বারদেশে উপনীত হইয়া নগর অবরোধ করিলেন। তিন মাস ব্যাপী অবরোধের পর তাঁহারা নগরমধ্যে প্রবেশলাভে সমর্থ হইলেন, এবং বহরাম শাহকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। (১)

সেনানায়কগণ বহরাম শাহকে কারারুদ্ধ করিয়া সুলতান রুকনউদ্দীনের পুত্র আলাউদ্দীন মসায়ুদকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

আলাউদ্দীন মসায়ুদ।

আলাউদ্দীন মসায়ুদ রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়পরবশ ও রাজকার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই নানাবিধ গোলযোগের সূত্রপাত হইল। এই সকল গোলযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে, আমীর ওমরাহগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। (১) তার পর মন্ত্রিসমাজের নিয়োগ-ক্রমে সুলতান আলতমাসের পুত্র নাসিরউদ্দীন মহম্মদ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

নাসিরউদ্দীন মহম্মদ।

নাসিরউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামও নাসিরউদ্দীন ছিল। ইনি পিতার জীবদ্দশাতেই কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দীন মহম্মদ জন্মপরিগ্রহ করেন। শোকাকুল পিতা মৃত পুত্রের নামানুসারে নবজাত কুমারের নামকরণ করেন। নাসিরউদ্দীন "তাপসের ন্যায় সরল ও বিলাসবিদ্বেষী ছিলেন।" তিনি নির্জ্জনে বাস করিতেই ভালবাসিতেন; রাজকার্য্যে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল না। এই জন্য তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর অল্পকালমধ্যেই প্রধান মন্ত্রী গিয়াসউদ্দীন রাজকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। নাসিরউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমেই গিয়াসউদ্দীন বলবনকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি উৎসাহী, দৃঢ়চিত্ত ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। বস্তুতঃ নাসিরউদ্দীন তাঁহাকে শুভক্ষণেই প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কারণ,

---

(১) বহরাম্ কারাগারেই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

(১) মসায়ুদ রাজ্যচ্যুত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং চারি বৎসর পরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার রাজত্বকালে যেরূপ পুনঃপুনঃ মোগলের উৎপাত ও অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গিয়াসউদ্দীনের ন্যায় এক জন রাজনীতি-বিশারদ দৃঢ়চিত্ত রাজপুরুষ প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, কর্ম্মোৎসাহহীন নাসিরউদ্দীনের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িত। (১)

---

(১) গিয়াসউদ্দীন অধ্যবসায়ের অবতার। তিনি প্রথমে আলতমাসের ক্রীতদাস ছিলেন। এক সময় সুলতান আলতমাস দাস ক্রয় করিবার জন্য জনৈক কর্ম্মচারীকে সমরখণ্ড, বোখারা ও তরমুজ প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করেন। রাজকর্ম্মচারী এক শত দাস ক্রয় করিয়া লইয়া আইসেন। এই এক শত দাসের মধ্যে বলবনও এক জন ছিলেন। আলতমাস তাহাদের প্রত্যেককেই পছন্দ করেন; একমাত্র বলবনই তাঁহার শুভদৃষ্টিলাভে বঞ্চিত হন। সুলতান বলেন, "আমি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না।" তখন বলবন কাতরকণ্ঠে নিবেদন করেন, "পৃথিবীপতি, কাহার জন্য এই সকল দাস ক্রীত হইয়াছে?" সুলতান হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "আমার নিজের জন্য।" বলবন প্রত্যুত্তরে বলেন, "তাহা হইলে আমাকে ক্রয় করুন, দোহাই ঈশ্বরের।" আলতমাস এই বাক্যে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে ক্রয় করেন। বলবন কদাকার ও খর্ব্বকায় ছিলেন বলিয়াই প্রথমে সুলতানের শুভদৃষ্টিলাভ করিতে পারেন নাই। সুলতান তাঁহাকে জলবহন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। একদিন এক জন জ্যোতির্ব্বিদ সুলতানকে বলেন, "জাঁহাপনা, আপনার এক জন ক্রীতদাস আপনার পুত্রের হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিবে।" সুলতান জ্যোতির্ব্বিদের বাক্যে আস্থাস্থাপন করেন নাই। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী রাজমহিষীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি ভীত হন, এবং সুলতানকে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি জ্যোতির্ব্বিদকে আহ্বান করেন। জ্যোতির্ব্বিদ রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া সুলতানের প্রশ্নোত্তরে বলেন, "সমস্ত দাস সম্মিলিত হইলে আমি রাজলক্ষণাক্রান্ত দাসকে বাছিয়া বাহির করিতে পারিব।" অতঃপর রাজপ্রাসাদস্থিত দাসদিগকে এক স্থানে সমবেত করা হয়। তৎকালে বলবন অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি সমঅবস্থাপন্ন দাসগণের অনুরোধে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাজারে গিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহার সহচরগণ তাঁহার পরিবর্ত্তে আর এক ব্যক্তিকে লইয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার উপস্থিতির সময় ঐ ব্যক্তিই হাজীর হইয়াছিল। বলবনই জ্যোতির্ব্বিদের কথিত দাস ছিলেন। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদের পরীক্ষা নিষ্ফল হয়, এবং বলবন রক্ষা পান। অগ্নি দীর্ঘকাল ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না। তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভা অচিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি জলবাহী দাসগণের সর্দ্দার নিযুক্ত হন। ইহার পর ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি ঘটে। আলতমাস তাঁহার কৃত কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার কন্যার সহিত পরিণীত করেন। ইহার পর হইতেই তিনি প্রথমশ্রেণীর রাজপুরুষগণের মধ্যে পরিগণিত হন; এবং নানাপ্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। আলতমাসের মৃত্যুর পর রুকন, রিজিয়া, বাহরাম ও মসায়ুদের রাজত্বকালে তিনি

নাসিরউদ্দীনের রাজত্বের প্রারম্ভে মোগলের আক্রমণ আরম্ভ হয়, এবং সিন্ধুনদের পশ্চিমবর্ত্তী স্থানসমূহ তাঁহাদের হস্তগত হইয়া পড়ে। বলবন মোগল-আক্রমণ-নিবারণের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিবার অভিপ্রায়ে সমগ্র সীমান্তপ্রদেশ এক জন শাসনকর্ত্তার অধীন করেন। তাহার পর তিনি নাসিরউদ্দীনকে পঞ্জাবে গমন করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে তিনি সসৈন্যে তথায় গমন করেন। গোক্ষুরগণ মোগল-আক্রমণকালে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিত; এই কারণে সুলতান পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। পঞ্জাবের জায়গীরদারগণ স্ব-প্রধান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধকালে উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য সহ উপস্থিত হইতেন না। নাসিরউদ্দীন এই সকল অবাধ্য জায়গীরদারকে বিপন্ন করিয়া তুলেন; এবং তাঁহারা নিয়মিতরূপে সৈন্য প্রেরণ করিতে অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা পান।

পঞ্জাব-রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া নাসিরউদ্দীন রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের দুর্ব্বলতানিবন্ধন বহু হিন্দু রাজা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বলবনের পরামর্শে নাসিরউদ্দীন এই সকল হিন্দুরাজাকে বশীভূত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ দিল্লী হইতে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের অবাধ্য হিন্দু রাজাদিগকে আপন প্রভুত্বাধীন করিলেন। তাহার পর মেওয়ারের পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিলেন, এবং মারওয়াড় ও চান্দেরী দুর্গে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময় মালব দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল; চান্দেরী-বিজয়ান্তে বলবন এই দেশের বিদ্রোহী অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সকল যুদ্ধকালে পঞ্জাব প্রদেশে মোগলগণ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা শের খাঁ পরাক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি মোগলদিগকে প্রত্যেকবারেই পরাজিত করেন।

অধিকাংশ রণক্ষেত্রেই নাসিরউদ্দীন সৈন্যের সঙ্গে গমন করিতেন। এই জন্য তিনিই লোকতঃ এই বিজয়গৌরবের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলবনই সমস্ত সাফল্যের মূলাধার ছিলেন, এই জন্য নাসিরউদ্দীন মনঃক্ষুণ্ণ

বিশিষ্ট-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পর নাসিরউদ্দীন মহম্মদের রাজত্বের প্রারম্ভে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

হন, এবং ইমামউদ্দীন নামক এক জন কৌশলী পারিষদের প্ররোচনায় বলবনকে পদচ্যুত করিয়া ইমামউদ্দীনকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন, এবং বলবনের সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে বিদায় দিলেন। শাসনকার্য্যে ইমামউদ্দীনের কিছুমাত্র যোগ্যতা ছিল না। তাঁহার কুশাসনে অল্পকালমধ্যেই রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং প্রকৃতিপুঞ্জ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। দশ জন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সম্মিলিত হইয়া ইমামউদ্দীনকে পদচ্যুত করিবার জন্য সুলতানকে দৃঢ়তাসহকারে অনুরোধ করিলেন। সুলতান তাঁহাদের তাদৃশ অনুরোধ উপেক্ষা করা অসমীচীন বিবেচনা করিয়া ইমামউদ্দীনকে পদচ্যুত করিলেন। অতঃপর বলবনই পুনর্ব্বার প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পদচ্যুত ইমামউদ্দীন বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিলেন। বলবন সহজেই তাঁহার বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া দিলেন। সন্তর নামক স্থানের হিন্দু রাজা ও সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা ইমামউদ্দীনের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। বলবন ইমামকে বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন, এবং দুইবৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর তাঁহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন।

ইহার পরবৎসর কারা মাণিকপুরের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হওয়াতে বলবন তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কারা মাণিকপুরের শাসনকর্ত্তা উপায়ান্তর না দেখিয়া বশ্যতাস্বীকার করিলেন। কারা মাণিকপুরে শান্তি সংস্থাপিত হইতে না হইতেই, মেওয়ারে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। বলবন স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর তত্রত্য অধিবাসীরা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিল।

মেওয়ার যুদ্ধের অল্পদিন পরেই সুলতান নাসিরউদ্দীন মহম্মদ বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। (১)

নাসিরউদ্দীন এক জন সংসারে অনাসক্ত নরপতি ছিলেন। তিনি দরবেশের ন্যায় সামান্যভাবে জীবনযাপন করিতেন। তিনি নিজের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পুস্তক নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন। তাঁহার খাদ্য অতি সামান্য ছিল; তদীয় মহিষী উহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন; রাজমহিষীর সাহায্যার্থ দাস দাসীও ছিল না। একদা তাঁহার হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, তিনি এক জন

---

(১) ইবন বতুতা লিখিয়াছেন যে, বলবন নাসিরউদ্দীনকে হত্যা করেন।

দাসীর প্রার্থনা করেন। নাসিরউদ্দীন তদুত্তরে বলেন যে, প্রজার অর্থ তিনি নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিতে পারেন না। নাসিরউদ্দীন একমাত্র রাজ্ঞীতে অনুরক্ত ছিলেন, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই; তাঁহার কোনও উপপত্নী ছিল না। নাসিরউদ্দীন অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তাঁহার ধনভাণ্ডার সাহিত্যসেবিগণের সাহায্যার্থ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত; তদীয় রাজসভা বিদ্বজ্জনপূর্ণ ছিল। তাঁহার উৎসাহেই তাবেক্ত নাসিরী নামক উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। নাসিরউদ্দীন নিজেও পারসী রচনায় পারদর্শী ছিলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ফিরিঙ্গি বণিক।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাণিজ্য-কলহ।

Wherever the English had gone they encountered the hostility of the Portuguese.—*Sir W. Hunter.*

ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা বলেন,—"ইংরাজেরা যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাদিগকে পর্ত্তুগীজদিগের শত্রুতাচরণ সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। পর্ত্তুগীজেরা বলিতে পারেন,—তাঁহারা যেখানে নিরুদ্বেগে বাণিজ্য করিতেন, সেখানে ইংরাজেরা উপনীত না হইলে, কলহ সংঘটিত হইত না।

পর্ত্তুগীজেরাই সর্ব্বাগ্রে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাচার্য্য পোপ তাঁহাদিগকেই ভারতবাণিজ্যের অধিকারপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তখন ইউরোপের আর কোনও দেশের লোক তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই। এত কাল কেহ স্বপ্নেও পোপের অধিকারপত্র-প্রদানের ক্ষমতা থাকা অস্বীকার করিতে সাহস করেন নাই। পোপের এরূপ ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, ইউরোপীয় খ্রীষ্টান-

সমাজ তাঁহার ক্ষমতা অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এখন সেই ক্ষমতা অস্বীকার করিবার পক্ষে ইউরোপের খ্রীষ্টান-সমাজের অধিকার কোথায়? তাহাকে অস্বীকার করিতে হইলে অনেক ধর্ম্মশপথ—অনেক অকাট্য সন্ধিপত্র—অনেক পুরাতন মিত্রতাবন্ধন—বিস্মৃত হইতে হয়। ইংরাজেরা লাভের লোভে তাহাই করিয়াছিলেন। তথাপি এত কালের সকল কথা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং ইংরাজদিগকে পূর্ব্বাপর সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নূতন তর্ক উত্থাপিত করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা পোপের অধিকারপত্র অস্বীকার করিয়াও পর্ত্তুগীজদিগের পূর্ব্বাধিকার অস্বীকার করিতে পারেন নাই। যেখানে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকার ছিল, সেখানে,—তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত—ইংরাজদিগের বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। অথচ কার্য্যকালে ইংরাজেরা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে ইংরাজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলহ করিতে আসিয়া মিত্রতালাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে ভর্ৎসনা করা শোভা পায় না।

ভারত-বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জন করা সকল শ্রেণীর ফিরিঙ্গি বণিকের সমান লক্ষ্য হইলেও, সকলের বাণিজ্য-নীতি একভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। পর্ত্তুগীজদিগের ভারত-বাণিজ্য রাজবংশের বাণিজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। যিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তাঁহার স্বতন্ত্র শাসননীতি ভারত-বাণিজ্যের স্বতন্ত্র নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত। তাহার সহিত পর্ত্তুগীজ জনসাধারণের সংস্রব থাকিত না। যাহারা ভারতবর্ষে আগমন করিত, তাহারা রাজকর্ম্মচারিমাত্র;—তাহাদের কোনরূপ স্বতন্ত্র বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার ছিল না। ভারতবর্ষে আসিয়া যে সকল রাজকর্ম্মচারী গোপনে গোপনে বাণিজ্য করিয়া স্বয়ং অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিত, তাহারাও কোনও স্বতন্ত্র বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে সাহস করিত না।

হলণ্ডের ভারত-বাণিজ্য এরূপ ছিল না। হলণ্ড একটি ক্ষুদ্র রাজ্য,—নানা ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত,—তথাপি এক প্রজাতন্ত্রের অধীন। তাহার শাসনভার রাজহস্তে ন্যস্ত ছিল না,—জনসাধারণের প্রতিনিধির শাসনই রাজশাসনের স্থান অধিকার করিত। দিনামারদিগের ভারত-বাণিজ্যেও তাহার প্রভাব লক্ষিত হইত। জনসাধারণ মিলিত হইয়া বণিক্‌সমিতি গঠিত করিয়াছিল। সেই সমিতির সদস্যগণ রাজকর প্রদান করিয়া বাণিজ্য

করিত ;—বাণিজ্য বিষয়ে তাহারাই ইচ্ছামত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিত। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই মূলধন দিয়া বণিকসমিতির সদস্য হইয়া ভারত-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিত ; অন্য কেহ স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করিতে পারিত না।

ইংরাজদিগের বাণিজ্য-নীতি দিনামারদিগের অনুরূপ হইলেও, সর্ব্বাংশে অনুরূপ ছিল না ; অনেকাংশে রাজশাসনের অধীন ছিল। সুতরাং ইংরাজ বণিক্ ইচ্ছামত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে মুখে রাজাজ্ঞা স্বীকার করিয়াই বাণিজ্যাধিকার গ্রহণ করিতে হইত।

পর্ত্তুগালের বাণিজ্যাধিকার, রাজার বাণিজ্যাধিকার বলিয়াই পরিচিত ছিল। রাজা ইচ্ছামত রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া সেই অধিকার পরিচালিত করিতেন। ইংলণ্ডের বাণিজ্যাধিকার ও রাজার বাণিজ্যাধিকার বলিয়াই কথিত হইত ; কিন্তু রাজা স্বয়ং তাহা পরিচালিত না করিয়া বণিক্-সমিতিকে অধিকারপত্র প্রদান করিতেন। হলণ্ডের বাণিজ্যাধিকার প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার ; তাহারা তাহার জন্য কেবল কর প্রদান করিলেই অধিকার পরিচালিত করিতে পারিত।

পর্ত্তুগীজগণ রাজার নামে যথেচ্ছাচার করিত ; দিনামারগণ আত্মশক্তিতে যথেচ্ছাচার করিত ; ইংরাজদিগের পক্ষে সেরূপ আচরণ করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং ইংরাজেরা ভারতসাগরে উপনীত হইয়াও ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে পারিলেন না ; তাঁহারা দিনামার ও পর্ত্তুগীজ বণিকৃগণের পদানত হইয়া প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম হইতেই ইংরাজ-বণিকৃসমিতি ইহার অসুবিধা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং প্রথম হইতেই ইউরোপের সন্ধিপত্রের মর্য্যাদালঙ্ঘনের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন।

রাজ্ঞী এলিজেবেথের অনুমতিপত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, ইংরাজগণকে ভারত-বাণিজ্যের আশা পরিত্যাগ করিতে হইত। রাজ্ঞী এলিজেবেথের সাহস অতিসাবধানতার সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। ইউরোপের অন্য কোনও রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা তাঁহাকে সকল কার্য্যেই অতিসাবধানতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত। তিনি ইংরাজ বণিকৃসমিতিকে বাণিজ্যের অধিকারপত্র প্রদান করিবার সময়েও তাহা বিস্মৃত-হন নাই। যেখানে অন্য কোনও ইউরোপীয় রাজশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে, ইংরাজগণ তথায় গমন করিতে পারিবেন না, স্পষ্টাক্ষরে

এইরূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অগত্যা ইংরাজ বণিককে ভারতসাগরে আসিয়া পর্ত্তুগীজ দিনামারের অনুমতি লইয়া বাণিজ্যারম্ভ করিতে হইল।

ইহাতে লাভ হইল না। যাঁহারা লাভের লোভে এত দূরে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা ইউরোপের সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ভারত-বাণিজ্যে লাভবান্ হইবার আশা দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং অধিকারপত্রের নিয়মলঙ্ঘন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। এইরূপে ইউরোপের নীতি ও এসিয়ার নীতি পৃথক্ হইয়া পড়িতে লাগিল।

ইংরাজেরা দেখিলেন, মোগলেরাই ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি; পর্ত্তুগীজ অপেক্ষা মোগলের অধিকারই প্রবল। সুতরাং মোগল সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে কুঠী সংস্থাপিত করিতে পারিলে, পর্ত্তুগীজগণ বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না। এই আশায় ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের অভিনন্দনপত্র বহন করিয়া ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন হকিন্স আগ্রায় মোগল রাজধানীতে উপনীত হইলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহের দরবারে কাপ্তেন সাহেব উপযুক্ত উপঢৌকন দান করিয়া সুরাটে কুঠী-নির্ম্মাণের অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইবার আশায় দুই বৎসরের অধিক কাল যাতায়াত ও কুর্নীশ করিতে করিতে অবশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া প্রস্থান করিলেন। একবার যে সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজদিগের প্ররোচনায় তাহাও প্রত্যাহৃত হইল।

ইউরোপে সন্ধিসূত্রে যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, এসিয়ায় তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এসিয়ায় আসিয়া ফিরিঙ্গীরা পরস্পরের অনিষ্টসাধনের জন্যই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন মোগল-দরবার হইতে সনন্দলাভের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া গেল, তখন বাহুবলে পরস্পরকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা আরব্ধ হইল। ইংরাজদিগের প্রথম চেষ্টা সফল হইল না। স্যর হেন্‌রী মিডল্‌টন ১৬১১ খৃষ্টাব্দে সুরাটে বাণিজ্য করিবার আশায় অগ্রসর হইবামাত্র পর্ত্তুগীজদিগের বাহুবলে পরাভূত হইয়া, প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা লিখিয়া গিয়াছেন,—যেখানেই ইংরাজেরা পদার্পণ করিতে চাহিয়াছেন, সেখানেই পর্ত্তুগীজদিগের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরাজেরা ভারত-বাণিজ্যে অগ্রসর হইবার সময়ে পোত লুণ্ঠন করায় পর্ত্তুগীজদিগের হৃদয়ে যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া-

ছিল, তাহাতেই পর্ত্তুগীজগণকে ইংরাজবিদ্বেষে পরিপূর্ণ করিয়া থাকিবে। ইংরাজেরা যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন,—ইহা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও, ইহার মূল কারণ কি, ইতিহাসে তাহার যথাযোগ্য আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে সুরাটে প্রবেশ করিতে না পারিলেও, ইংরাজেরা সুরাটের আশা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সুরাটে উপনীত হইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। এবার ইংরাজ-পর্ত্তুগীজের প্রকাশ্য যুদ্ধে সমুদ্রতীর কম্পিত হইয়া উঠিল। মোগল সেনা তীরে দাঁড়াইয়া ফিরিঙ্গিদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। ইংরাজের জয় হইল; পর্ত্তুগীজগণ পলায়ন করিল; ইংরাজেরা সুরাটে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের বাদশাহী ফারমান্ ইংরাজদিগকে সুরাটের বাণিজ্যাধিকার প্রদান করায়, পর্ত্তুগীজদিগের পক্ষে ভারতবর্ষে ইংরাজের বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা আর অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না।

এতকাল ফিরিঙ্গি বণিক যে অধিকারসূত্রে ভারত-বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পর্ত্তুগীজগণ পোপের শাসনলিপিকেই অধিকারপত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন; সেই অধিকার-পত্রের বলে তাঁহারা ভারতবর্ষ বা ইউরোপ কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না; বাহুবলে জলে স্থলে অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবিত করিতেন। তাহার জন্য ন্যায় অন্যায়ের তুলাদণ্ড অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়াছিল; লুণ্ঠনও বাণিজ্য নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা পোপের শাসন মানিলেন না; পর্ত্তুগীজদিগের একাধিপত্য স্বীকার করিলেন না; মোগলশাসনশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাহুবলে পর্ত্তুগীজ-দমনের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাহার জন্য ইউরোপের সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কাহারও দ্বিধা উপস্থিত হইল না। এই সময় হইতে যে নীতি প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা যেন সভ্যসমাজে সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল,—ইউরোপ এসিয়া নহে; ইউরোপ ইউরোপ,—এসিয়া এসিয়া।

এসিয়ার তখন জীবনসন্ধ্যা; ইউরোপের জীবনপ্রভাত। এসিয়া বুঝিল না; বরং ইউরোপকে বাণিজ্যাধিকার প্রদান করিবার সময়ে উৎকোচ-লোভে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিচার করিতেও চেষ্টা করিল না। যাহারা

পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালন করিতে ত্রুটি করিতেছে না, তাহারা যে মোগলের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না, মোগল রাজশক্তি সে কথা ভাবিয়া দেখিল না।

যাহা এতকাল কেবল ইউরোপের বাণিজ্য-কলহ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা ক্রমে এসিয়া ইউরোপের বাণিজ্য-কলহে পরিণত হইবার সূত্রপাত হইল। ফিরিঙ্গির অত্যাচারে এসিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে উপনীত হইলে, ভারতবর্ষের লোকে তাঁহাদিগের ফিরিঙ্গিদলনের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহপ্রদান করিতে গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

ইংরাজেরা এইরূপে মোগল রাজশক্তির আশ্রয়লাভ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্যাধিকার বিনষ্ট করিয়া, ইংরাজের বাণিজ্যাধিকার সংস্থাপিত করিবার অবসরলাভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পর্ত্তুগীজদিগের প্রবল প্রতাপ চূর্ণ হইয়া গেল; অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজদিগের অধ্যবসায় জয়যুক্ত হইয়া উঠিল। কিরূপে ফিরিঙ্গি বণিক্ ভারত-বাণিজ্যে অধিকারলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে। কিরূপে তাহা পর্ত্তুগীজদিগের হস্তবিচ্যুত হইয়া ইংরাজদিগের ভাগ্যোন্নতি সাধিত করিয়াছে, তাহার ইতিহাস "কোম্পানী বাহাদুরে"র ইতিহাস। তাহা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইবে।

সমাপ্ত

পুরাণে বিজ্ঞান।

(১) স্থাবর ছয় প্রকার;—বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্সার, বিরুধ ও দ্রুম।

লতার আরোহণাপেক্ষা আছে, কাঠিন্য হেতু বিরুধের আরোহণাপেক্ষা নাই। পুষ্প ব্যতিরেকে ফলশালী উদ্ভিদের নাম বনস্পতি। পুষ্প হইতে ফলশালী উদ্ভিদের নাম দ্রুম।

(২) তাল, খর্জ্জুর, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ তৃণজাতীয়। তালের অপর-নাম তৃণরাজ।

(৩) সত্য-যুগে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় নাই। ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে জল-কণা হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়; তাহাতে বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীতে বৃক্ষ জন্মে।

(৪) পৃথিবীতে বারংবার বৃক্ষের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়াছে।

(৫) আদিতে বৃক্ষের, তৎপরে তির্য্যগ্‌ যোনির, তৎপরে দেবতার, সর্ব্বশেষে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৬) পৃথিবী, কোনও সময়ে বৃক্ষে ও নরাকৃতি বহু-বাহু জীবে পরিপূর্ণ ছিল।

(৭) বৃক্ষাদি নিরেট পদার্থ বহু-ছিদ্র-বিশিষ্ট।

(৮) বৃক্ষের সুখ-দুঃখ-বোধ আছে।

(৯) গো, অজ, মহিষ, কৃষ্ণ, শূকর, রুরু, অবি, উষ্ট্র, ইহারা দ্বিশফ।

(১০) খর, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ, চমরী—ইহারা একশফ।

(১১) শ্বা, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, মার্জার, শশ, শল্লক, সিংহ, কপি, গজ, কূর্ম্ম, গোধা, মকরাদি, কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লূক, বর্হী, হংস, সারস, চক্রাহ্ব, কাক, উলূক,—ইহারা পঞ্চনখ।

(১২) বর্ণানুসারে অশ্বজাতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। শৈব্য,—সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক।

শৈব্যস্তু শুকপত্রাভঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
মেঘপুষ্পস্তু মেঘাভঃ পাণ্ডরো হি বলাহকঃ॥

(১৩) গোজাতি আট বর্ণের হয়;—শ্বেত, ধূম্র, কপিল, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর, গৌর, রক্ত ও নীল। পাণ্ডুর বর্ণের গো কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

(১৪) শরৎকালে রুরু মৃগের বিষাণ খসিয়া পড়ে।

(১৫) মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্বে বরাহ, শরভ, নরসিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা অনবরত বিবাদ করিত। অদ্ভুত নরসিংহ নামক জীব, দুই ভাগে বিভক্ত হইলে, নর ও সিংহের উৎপত্তি হইল। শরভ হইতে মনুষ্যের ন্যায় জীববিশেষের উৎপত্তি হইয়াছিল।

(১৬) ভয়ঙ্কর সত্যযুগ উপস্থিত হইলে নানাবিধ প্রাণীর এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, পৃথিবী ভারপীড়িতা হইয়া জলমগ্ন হইয়াছিল।

(১৭) মনুষ্যের কর্ণমূলে পিঙ্গল ও শৃঙ্গলী নামক দুই কৃমি বাস করে।

(১৮) নাসিকাগ্রে চপল ও পিঙ্গল নামক দুই কৃমি বাস করে।

(১৯) ১৫০টি কৃমি কপালে বাস করে।

(২০) মনুষ্যশরীরে লোমসংখ্যা সাড়ে তিন কোটী।

(২১) গর্ভমধ্যে বীর্য্য একাহে কলল, পঞ্চ রাত্রে বুদ্‌বুদ অবস্থায় থাকে। এক মাসে গ্রীবা, শির, স্কন্ধ, ও পৃষ্ঠবংশের উদয় হয়। দুই মাসে পাণি, পাদ, পার্শ্ব, কটি ও গাত্র জন্মে। তিন মাসে শত শত অঙ্কুরের উদ্গম হয়। চারি মাসে অঙ্গুলাদি হয়। পাঁচ মাসে মুখ, নাসা ও কর্ণ হয়। ছয় মাসের মধ্যে দন্তপংক্তি, জিহ্বা, নখ, কর্ণের দুই ছিদ্র, পায়ু ও জননেন্দ্রিয় হয়। সাত মাসে গাত্রসন্ধি হয়। আট মাসে অবয়ব বিভক্ত হয়।

(২২) জরায়ুকোষ, অষ্ট গবাক্ষে বিভক্ত।

(২৩) শরীরে তিন শত পঁয়ষট্টি শত পেশী আছে।

(২৪) জন্মগ্রহণকালে জীবের ভয়ানক জ্বর হয়। সেই জ্বরে তাহার মহামোহ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য তাহার আর পূর্ব্বস্মৃতি থাকে না। কিন্তু গর্ভবাসকালে পূর্ব্বস্মৃতি থাকে।

(২৫) শরীরের রোগসংখ্যা একোত্তর শত, মতান্তরে অষ্টোত্তর শত।

(২৬) প্রথম প্রহরে জন্ম হইলে অল্পায়ু, দ্বিতীয় প্রহরে মধ্যায়ু, তৃতীয় প্রহরে দীর্ঘায়ু ও চতুর্থপ্রহরে অতি দীর্ঘজীবী হয়।

(২৭) সূর্য্যের মুহূর্ত্ত গতি, একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যোজন।

(২৮) ধ্রুব কর্ত্তৃক বাতময়-রজ্জুবদ্ধ হইয়া সূর্য্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করে।

(২৯) সূর্য্য, রশ্মি দ্বারা চন্দ্রের এক এক কলা পান করেন; শুক্লপক্ষে আবার দান করেন; তজ্জন্য চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি হয়।

(৩০) বৃহস্পতি শুক্রাদি গ্রহগণ, ধ্রুব কর্ত্তৃক বাতরজ্জুবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে।

(৩১) "চন্দ্রঋক্ষগ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ।" অর্থাৎ চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহগণ সূর্য্যসম্ভব।

(৩২) সূর্য্য হইতে যে সহস্র রশ্মি নির্গত হয়, তাহার চারি শত দ্বারা বৃষ্টি, ত্রিশটি দ্বারা হিমোদ্ভব, ত্রিশটি দ্বারা গ্রীষ্মের উৎপত্তি হয়; অন্য রশ্মিগুলিকে গ্রহ নক্ষত্রাদি পান করে।

(৩৩) সূর্য্য হইতে চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ আলোক পায়।

(৩৪) মনুষ্যমানের তিন হাজার ত্রিশ বর্ষে সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক বৎসর হয়।

(৩৫) নয় হাজার নব্বই বৎসরে ধ্রুবের এক বৎসর হয়।

(৩৬) চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সূর্য্য। "বৃদ্ধিক্ষয়ৌ হি সোমস্য কীর্ত্ত্যতে সূর্য্যকারিতৌ।"

(৩৭) সূর্য্যমণ্ডলের পরিধি, নয় হাজার যোজন।

(৩৮) পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশ কোটী যোজন। আবার কোন স্থানে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারও পঞ্চাশৎ কোটী লিখিত আছে। মহর্ষি ভৃগু, এই মতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩৯) সূর্য্য ৯০১৪৫০০০ যোজন পরিভ্রমণ করেন।

(৪০) বিষুবরেখার বিস্তার, ৩০১০০০ ৮১ যোজন।

(৪১) সূর্য্য, এক লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

(৪২) সূর্য্য, ১৮৩ দিনে ভুবন ভ্রমণ করেন।

(৪৩) আকাশমণ্ডলে বিস্তৃত শিশুমার পুচ্ছে ধ্রুবতারা অবস্থিত। ধ্রুবের সহ বাতরজ্জু্র দ্বারা নক্ষত্রগণ ও চন্দ্র সূর্য্যাদি বদ্ধ আছে। ধ্রুব, ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় জগৎ এই কারণে ভ্রমণ করে।

(৪৪) শিশুমার, ধ্রুব, মরীচি ও কশ্যপ, এই চারি তারা অস্ত যায় না।

(৪৫) পুরাণের মতে, চন্দ্র জলময়।

(৪৬) পৃথিবী হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদির যথাক্রমে দূরত্ব—সূর্য্য, নক্ষত্র, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, সপ্তর্ষি ও ধ্রুব,—সকলেই পরস্পরের দুই লক্ষ যোজন দূরবর্ত্তী।

(৪৭) সূর্য্য বিশাখা হইতে, চন্দ্র কৃত্তিকা হইতে, শুক্র পুষ্যা হইতে, বৃহস্পতি ফল্গুনি হইতে, মঙ্গল পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে, শনি রেবতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৪৮) পৃথিবী, বায়ুকোণের দিকে কিঞ্চিৎ নিম্ন।

(৪৯) নক্ষত্রগণ, অত্যন্ত বৃহৎ, দূরত্ব প্রযুক্ত তাহাদিগকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখায়।

(৫০) পুরাণকারেরা পরমাণুর এই লক্ষণ করেন; যথা,—

চরমঃ সদ্‌বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ॥

অর্থাৎ, কোন বস্তুর যে চরম অংশ, যার অংশ নাই, যাহাতে মনুষ্যের অবয়বী বুদ্ধি হয়, তাহাই পরমাণু।

(৫১) প্রলয়ের পূর্ব্বে বায়ুতে পার্থিব জলীয় পদার্থ বিলীন হইবে; বায়ু

আকাশে মিশিয়া যাইবে ; পরে অগ্নিতে সমুদায় পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যাইবে। কোন সময়ে পৃথিবী জল-বায়ু-শূন্য মৃতগ্রহে পরিণত হইবে।

(৫২) জোয়ারে সমুদ্রের জল, ১১৫ অঙ্গুলি বৃদ্ধি পায়।

(৫৩) জলের পরিমাণ ভূমির দশগুণ ; তেজের পরিমাণ জলের দশগুণ ; বায়ুর পরিমাণ তেজের দশগুণ ; বায়ুর দশগুণ ব্যোম।

(৫৪) জল হইতে ধূম, ধূম হইতে মেঘ জন্মে।

(৫৫) কতকগুলি বস্তু সংবর্ত্তক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও সলিল দ্বারা সংসক্ত হইয়া স্থির হইয়া আছে ; উহাই পর্ব্বত হইয়াছে। পর্ব্বে পর্ব্বে অর্থাৎ স্তরে স্তরে আছে বলিয়া, পর্ব্বত নাম হইয়াছে।

(৫৬) মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুদগ্নি বায়ু হইতে হয়।

(৫৭) মহাভারত বলেন, "সূর্য্যকিরণের অবস্থান্তরবিশেষে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়।"

(৫৮) সূর্য্যকিরণে ভূমির রস আকৃষ্ট হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া মেঘরূপে পরিণত হয়।

(৫৯) অগ্নি সূর্য্য হইতে দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়।

(৬০) মহর্ষি ভৃগু বলেন, "কোনও বস্তুর এককালে নাশ হয় না, অবস্থান্তর হয় মাত্র। পুরাণের মতকে প্রাচীন আর্য্য বৈজ্ঞানিকদেরই মত বিবেচনা করিলে, ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। পৌরাণিক মত, জনসাধারণের মত মনে করাই সঙ্গত। তবে সে জনসাধারণ নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল না।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

হিন্দু ও পারসীক জাতির সাদৃশ্য।

প্রাচীন হিন্দু জাতি ও পারসীক জাতির প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, ভাষা-বিজ্ঞান, দেবতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির পুনঃপুনঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত-পরিষদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উভয় জাতিই এক অতি প্রাচীন জাতির বৈমাত্রেয় বংশবল্লী। বিবিধ বিষয়ের সাদৃশ্য, সাজাত্য ও সামান্য দ্বারাই শাস্ত্রদর্শী মনীষিগণ উক্ত সত্য সিদ্ধান্তে

উপস্থিত হইয়াছেন। চারি সহস্র বৎসরের অনুমানের দুরধিগম্য প্রাচীন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিলেও, বর্ত্তমানে উভয় জাতির অর্ব্বাচীন আচার ব্যবহার রূপ বিরাট প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সমীচীনভাবে প্রত্যক্ষ করিলেও পুনঃপুনঃ ইহাই বলিতে হইবে যে, উভয় জাতিই এক অভিন্ন অখণ্ড জাতির অধস্তন বংশধর, অথবা কোনও কশ্যপকল্প প্রজাপতিসন্ততির ঔরসজাত বিভিন্ন-ক্ষেত্রজ পুত্র। সপত্নী-হিংসা, বৈমাত্রেয়-বিদ্বেষ প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম উপাস্য দেবতা লইয়া উপাসকমণ্ডলীর কলহ ও বৈরিতা চির-প্রসিদ্ধ। গোঁড়া শাক্ত ও গোঁড়া বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের বিবাদ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিদ্বেষ খৃষ্টসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যাঁহারা ইউরোপের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহা জানেন। তবে হিন্দু ও পারসীকগণ কোন্ অজ্ঞাত কারণে পরস্পর বৈরভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আজিও নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের আলোকে এই বিষয়ের কিছু মীমাংসা হইতে পারে। কশ্যপ ঋষির দিতি, অদিতি, দনু, মনু, কদ্রু, বিনতা প্রভৃতি অনেক পত্নী ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন ;—তাহাতেই দৈত্য, আদিত্য, দানব, মানব প্রভৃতি জাতি জন্মলাভ করেন। এই হিসাবে দেবগণ দৈত্যগণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার দেব বা সুরগণ, দৈত্য বা অসুরগণের চির-বিদ্বেষ্টা ছিলেন। স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য লইয়া, উভয়ের নানা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। কখন দেবগণ, কখন অসুরগণ স্বর্গের আধিপত্য লাভ করিতেন।

তবে যুদ্ধবিগ্রহে দেবতারাই অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেন। বাহুবলে অসুরগণই চিরদিন বিজয়লাভ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর সমুদ্রবৎ শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার স্মৃতিকাহিনী আজিও উজ্জ্বল রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়-গণ আমাকে ক্ষমা করিবেন ; কারণ, আমি সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অতিবীর্য্য, পরাক্রান্ত মধুকৈটভাসুর স্বয়ং ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে গিয়াছিল। সেই অতিবলোন্মত্ত অসুরদ্বয়ের সহিত ভগবান্ হরি পঞ্চ সহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া অসুরদ্বয় দেবশ্রেষ্ঠ হরিকে কহিল,—"কেশব ! তুমি বেশ যুদ্ধ করিয়াছ, আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর।" অসুরভয়ে বিভীষিকাগ্রস্ত হরি, অসুরের পরাক্রমে নিস্তার নাই দেখিয়া অম্লানবদনে বলিলেন,—"তোমরা আমার বধ্য হও," সত্য-প্রতিজ্ঞ অসুরদ্বয় প্রতিজ্ঞাপালন করিল। এই যুদ্ধেও অসুরের প্রাধান্য

...াম অহুর, অ... ...ান দেবতার নাম "অহুর-মজদ"। সকলেই মনে করিবেন যে, 'অসুর' শব্দ, 'সুর' শব্দের বিপরীতার্থ-সূচক। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, 'সুর' শব্দ অতীব আধুনিক। ঋগ্বেদের কোনও স্থলেই 'সুর' শব্দের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু 'অসুর' শব্দের শত শত উল্লেখ আছে। সংস্কৃতের 'স' জেন্দ ভাষায় 'হ'-এর ন্যায় উচ্চারিত হইয়া থাকে। সুতরাং, অবস্তার 'অহুর'ও বেদের অসুর অভিন্ন। বর্ত্তমান কালে 'অসুর' শব্দ কতকটা দৈত্য দানবের ভাব সূচিত করে। কিন্তু বৈদিক যুগে 'অসুর' শব্দের সে অর্থ ছিল না। আবস্তিক "অহুর" শব্দ, প্রভুত্ব ও জীবিতত্ব-বোধক। অর্থাৎ-'অসু' ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদেও "অসুর" শব্দের অর্থ আবস্তিক 'অহুর' শব্দের অনুরূপ। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ১ ৩৫।৯ ঋকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"অসুরঃ সর্ব্বেষাং প্রাণদঃ।" দশম ঋকের ব্যাখ্যায় 'অসুর' শব্দের উক্ত অর্থই অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং কালবশে 'দেব' ও 'অসুর' এই দুইটি শব্দ ভিন্নার্থবাচী হইয়াছে। বস্তুতঃ, উভয় শব্দের অর্থে কোন ভিন্নতা উপলব্ধ হয় না। উত্তরকালীন হিন্দু শাস্ত্রকারগণ, অসুরগণকে দেবদ্বেষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং পারসীক শাস্ত্রকারগণ দেবগণকে অসুরদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বেদসংহিতার মধ্যে দেব-বাচক 'সুর' শব্দের একেবারেই অস্তিত্ব নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। চণ্ডী-গ্রন্থেও 'সুর' শব্দের উল্লেখ থাকিলেও, দেবাসুরের যুদ্ধ, এইরূপ সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। "দেবাসুরৈর ভুদ্‌যুদ্ধং—জিত্বা চ সকলান্ দেবান্ ইন্দ্রোঽভূন্মহিষা-সুরঃ" ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী ভাবের স্থলে, সুরাসুর শব্দের পরিবর্ত্তে প্রাচীন ভাবদ্যোতক দেবাসুর কথাই লিখিত আছে।

হিন্দু ও পারসীকগণের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের পৌরাণিক আখ্যান ও দেবতত্ত্ব কিরূপ ছিল, তাহা কতকটা নিঃসংশয়রূপে অনুমান করা যাইতে পারে। তাহাতে দেবগণের জ্যেষ্ঠতা ও কনিষ্ঠতা বুঝা যায়। কারণ, পারসীক ও হিন্দু, এই দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় যে দিন হইতে একান্নবর্ত্তিতা ও একদেশবাস্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথগন্ন ও পৃথক-দেশবাসী হইলেন, সেই সময়ে তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডার পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বার্জ্জিত সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার হইতে, তাঁহাদের পূর্ব্বপ...মিগণের অনেক ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে হিন্দুর শাস্ত্রসমুদ্র বেদের কথা সকলেই জানেন, সুতরাং

দেখা যায়। তাহার পরে ...সুরের যুদ্ধে... গ্না
সম্মুখযুদ্ধে সর্ব্বদাই পরাজিত হইতেন। দেবাসুরমভূদ্‌যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা—পুরাকালে দেবাসুরের শতাব্দীব্যাপী মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে মহাবীর্য্য অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হন। জিত্বা চ সকলান্ দেবান্ ইন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ। দেবগণ স্বর্গ হইতে নিরাকৃত হইয়া মনুষ্যের ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে অসুরবধে চণ্ডিকার রণসজ্জা ও বিপুল আয়োজন দেখিলেও অসুরদিগের ঐশ্বর্য্য ও বাহুবল বুঝিতে পারা যায়। শুম্ভের সহিত কাত্যায়নীর যুদ্ধে শুম্ভের উচ্চচরিত্র ও ভীম পরাক্রমের আভাষ পাওয়া যায়, এবং মনে হয়, শত শত ইন্দ্রও শুম্ভের সমকক্ষ নহেন। যুদ্ধস্থলে আসিয়াই শুম্ভ দেবীকে বহুশক্তিপরিবৃতা দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন,—"অন্যানাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী।" তাহাতে দেবী লজ্জিতা হইয়া সমস্ত বিভূতি স্বীয় শরীরে তিরোহিত করিলেন। তখন সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইল। শুম্ভের পতন হইলেও অসুরের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে যাঁহারা দেবপূজক, তাঁহারা অসুরের নিন্দা করিবেন না, ইহা স্বাভাবিক। আবার অসুর পূজকগণ দেবতারও নিন্দা করিবেন। কিন্তু অনেক অসুরচরিত্র বিশ্লেষণ করিলে উদারতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমার পরলোকগত পূজ্যপাদ পিতৃদেব দেবচরিত্র অপেক্ষা অসুর-চরিত্রের অধিকতর মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া উদাহরণস্থলে গয়াসুরের কীর্ত্তি ব্যাখ্যা করিতেন।

বেদ ও অবস্তা।

পুরাকালের অদৃশ্যমান জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত কঙ্কালমালা মাতৃকল্পা সর্ব্বসংহা বসুন্ধরার বিশাল অঙ্কে অঙ্কিত দেখিয়া যেমন ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ তাহাদের আবির্ভাবকাল অনুমানের অধিগম্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ অবিরামবাহী সাহিত্য-স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার স্তরবিন্যাস পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বাগ্‌বৈজ্ঞানিক বুধগণ মানবিক পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যদি কেহ বেদ ও অবস্তা লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে বিবিধ বিষয়ের সাদৃশ্যদর্শনে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইবেন। পারস্য বা ইরাণ দেশের ভূগর্ভ হইতে কোণাকার বা কীলকাকৃতি অক্ষরে লিখিত যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর পহ্লবী ভাষার হইলেও, ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের অবিকল অনুরূপ।